সূচী।

বিষয়। ... পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়	পৃষ্ঠা ।

বঙ্গদর্শন।

ভোরের পাখী।

ভোরের পাখী ডাকে কোথায়
ভোরের পাখী ডাকে!
ভোর না হ'তে ভোরের খবর
কেমন করে' রাখে!
এখনো যে আঁধার নিশি
জড়িয়ে আছে সকল দিশি
কালীবরণ পুচ্ছ-ডোরের
হাজার লক্ষ পাকে!
ভোরের পাখী সুপ্ত-বনে
তবু কোথায় ডাকে!

ওগো তুমি ভোরের পাখি
ভোরের ছোট পাখি!
কোন্ অরুণের আভাস পেয়ে
মেল তোমার আঁখি!
কোমল তব পাখা'পরে
সোনার রেখা থরে থরে,
বাঁধা আছে ডানায় তব
উষার রাঙা রাখী!
ওগো তুমি ভোরের পাখি,
ভোরের ছোট পাখি!

রয়েছে বট, শতেক জটা
ঝুল্‌চে মাটি ব্যেপে,
পাতার 'পরে পাতার ঢেউ
উঠ্‌ছে ফুলে' ফেঁপে।
তাহারি কোন্ কোণের শাখে
নিদ্রাহারা ঝিঁঝির ডাকে
বাঁকিয়ে গ্রীবা ঘুমিয়েছিলে
পাখায় মুখ ঝেঁপে!
যেথায় বট দাঁড়িয়ে একা
জটায় মাটি ব্যেপে!

ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ—
ছায়ায় ঢাকা দ্বিগুণ রাতে
যখন ঘুমে রহ,
হঠাৎ তব কুলায়-'পরে
কেমন করে' প্রবেশ করে
আকাশ হ'তে আঁধারপথে
আলোর বার্ত্তাবহ?
ওগো ভোরের সরল পাখি
কহ আমায় কহ!

কোমল তব বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে,
উড়্‌বে বলে' পুলক জাগে
তোমার পাখাপুটে!
চক্ষু মেলি পূবের পানে
নিদ্রাভাঙা নবীন গানে
অকুণ্ঠিত কণ্ঠ তব
উৎসসম ছুটে!
কোমল তব বুকের তলে
রক্ত নেচে উঠে।

এত আঁধারমাঝে তোমার
এত অসংশয়!
বিশ্বজনে কেহই তোরে
করে না প্রত্যয়!
তুমি ডাক—"দাঁড়াও পথে,
সূর্য্য আসে স্বর্ণরথে,
রাত্রি নয়, রাত্রি নয়,
রাত্রি নয় নয়!"
এত আঁধারমাঝে তোমার
এত অসংশয়!

আনন্দেতে জাগো আজি,
আনন্দেতে জাগো।
ভোরের পাখী ডাকে যে ঐ
আর নিদ্রা না গো।
প্রথম আলো পড়ুক্ মাথে,
নিদ্রাহীন আঁখির পাতে,
প্রথম উষা-কিরণের
আশীর্ব্বাদ মাগো!
ভোরের পাখি-সাথে আজি
আনন্দেতে জাগো।

রাজকুটুম্ব।

"নিয়ু ইণ্ডিয়া" ইংরাজি কাগজখানি আমরা শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করি। ইহার রচনায় পাঠক ভুলাইবার বাঁধাবুলি ও সহজ কৌশলগুলি দেখি না। সম্পাদক যে-সমস্ত প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে রস অথচ গাম্ভীর্য্য আছে, তাহাতে বলের অভাব নাই অথচ পদে পদে সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার লেখা সাময়িক সংবাদের তুচ্ছতাকে অনেক-দুর ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া থাকে।

১২ই মার্চ্চের পত্রে সম্পাদক "ভারতবর্ষে য়ুরোপীয় ক্রিমিনাল্" নাম দিয়া একটি উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বৃথা অনুবাদের চেষ্টা না করিয়া ক্রিমিনাল্-শব্দটা আমরা বাংলায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি।

যুরোপীয় ক্রিমিনাল্‌দের সম্বন্ধে কেন যে সদ্বিচার হয় না, সম্পাদক বিচারকের মত ধীরভাবে তাহার মীমাংসা করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

তিনি বলেন, একপক্ষে অপরিসীম সহিষ্ণুতা ও আর একপক্ষে অপ্রতিহত শক্তি যেখানে সম্মুখীন হয়, সেখানে স্বভাবতই এই-রূপ ঘটিতে বাধ্য। এস্থলে আমরা হইলেও এমনিই করিতাম—এমন কি, সম্পাদক টিপ্পনী দিয়া বলিয়াছেন, এসিয়াবাসী হয় ত সুযোগ পাইলে রিফাইণ্ড্‌ পাশবিকতায় য়ুরোপীয়কে জিনিতে পারিত।

—শুদ্ধমাত্র প্রসঙ্গক্রমে আমরাও একটি মনস্তত্ত্বের কথা বলিয়া লই। সম্পাদকের এই টিপ্পনীটুকুতে একটি দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইতেছে। তিনি নিজের বক্তব্যকে সবল করিবার জন্য অপক্ষপাতিতা দেখাইবার প্রলোভনটুকু সংবরণ করিতে পারেন নাই। স্বজাতির প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতও যেমন স্থলবিশেষে একপ্রকার কৌশলমাত্র, জাতি-নির্ব্বিশেষে একান্ত অপক্ষপাতও স্থলবিশেষে সেইরূপ কৌশল ছাড়া আর কিছু নহে। নিয়ুইণ্ডিয়ার সম্পাদকের পক্ষে এটুকুর কোন প্রয়োজন ছিল না, কারণ, তিনি দুর্ব্বল নহেন।

প্রাচ্যদের সম্বন্ধে ইংরাজদের কতকগুলি বাঁধিবুলি আছে, আমাদের "রিফাইণ্ড্‌" নিষ্ঠুরতা তাহার মধ্যে একটা। পূর্ব্বদিক্‌টা একটা মস্তদিক্‌—এইদিকে যাহারাই বাস করে, তাহাদের সকলকে এক নামের অধীনে এক শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া ভূগোলবৃত্তান্ত রচনা করিলেই যে তাহারা দানা বাঁধিয়া এক হইয়া যায়, তাহা নহে। বিদেশীরা সামান্য বাহ্য সাদৃশ্যের ভিতর দিয়া বৈসাদৃশ্য ধরিতে পারে না। একজন চাষার চক্ষে এক গোরার সঙ্গে আর এক গোরার ভেদ সহজে ধরা পড়ে না—ইংরাজের অনভ্যস্ত দৃষ্টিতে একজন বাঙালিও যেমন, আর একজনও প্রায় সেইরূপ। এই কারণেই য়ুরোপীয়েরা সমস্ত প্রাচ্যজাতিকে একটা পিণ্ড পাকাইয়া দেখে এবং সকলের দোষগুণকে একটা নামের ঝোলার মধ্যে ভরিয়া "ওরিয়েণ্টাল্‌" লেবেল আঁটিয়া দেয়।

য়ুরোপীয়েরা আমাদের আধুনিক গুরু, সুতরাং তাঁহাদের কাছ হইতে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে অন্ধতাটুকুও আমরা শিখিয়াছি। রিফাইণ্ড্‌ পাশবিকতায় এসিয়া য়ুরোপীয়ের চেয়ে অধিক বাহাদুরী বি পাইতে পারে, ইতিহাস ঘাঁটিয়া তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিতে চাহি না। কিন্তু স্বজাতিপক্ষপাতের অপবাদটুকু শিরোধার্য করিয়া একথা অন্তরের সহিত, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি যে,—হিন্দুকে অকর্ম্মণ্য বল, অবোধ বল, দুর্ব্বল বল, সহ্য করিয়া যাইব, কারণ, সহ্য করা আমাদের অভ্যাস আছে কিন্তু হিন্দুজাতির সত্য-মিথ্যা নানা অপযশের মধ্যে রিফাইণ্ড্‌ পাশবিকতার অপবাদট সব চেয়ে অন্যায়। আর এসিয়াটিক্‌-নামক বন্ধনবিহীন একটা প্রকাণ্ড বিচিত্র ব্যাপারের সহিত য়ুরোপীয় বলিয়া একটি ক্ষুদ্র ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের পশুত্ব, মনুষ্যত্ব বা দেবত্বর তুলনা একেবারেই অসঙ্গত, অনর্থক। একটা মান-কচুর সহিত একটা বাগানের তুলনা হইতেই পারে না।

এটা একটা অবান্তর কথা। মোটের উপর, সম্পাদক যে প্রবন্ধটি লিখিয়াছেন, তাহার প্রশংসা করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে চাপা কথা ঢের আছে, তাহা চাপাই থাক্! আমরা কেবল একটি কথা যোগ করিতে চাই মাত্র।

যাহার হাতে শক্তি আছে, সে যে স্বসম্প্রদায়ের দিকে টানিয়া অবিচার করিবে, ইহা মানুষের স্বভাব। ইংরাজও মানুষ, তাই সে ইংরাজ-ক্রিমিনাল্‌কে সাজা দিয়া উঠিতে পারে না। যাহার হাতে শক্তি নাই, সে প্রবলের অন্যায় বিচার অগত্যা সহ্য করে, ইহাও মানুষের স্বভাব। আমরাও মানুষ, তাই আমাদিগকে ইংরাজের আক্রমণ চুপ করিয়া সহ্য করিতে হয়। এই এক জায়গায় মনুষ্যত্বের সমনিম্নভূমিতে ইংরাজের সঙ্গে আমরা একত্রে মিলিতে পারিয়াছি।

নূতন ইস্কুল্ হইতে বাহির হইয়া যখন সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী প্রভৃতি বিদেশী বচনগুলি বাংলায় তর্জ্জমা করিবার ভার আমরা গ্রহণ করিয়াছিলাম, তখন আমরা এই জানিতাম যে, য়ুরোপ বাহুবলে প্রবল হইলেও মনুষ্যত্বের অধিকারসম্বন্ধে দুর্ব্বলের সহিত আপনার সাম্য স্বীকার করেন! তখন আমরা ইস্কুলের উত্তীর্ণ ছেলেরা একেবারে অভিভূত হইয়া গিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, ইহারা দেবতা। আমরা চিরকাল ইহাদিগকে পূজা করিব এবং ইহারা চিরকাল আমাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিবে—ইহাদের সহিত আমাদের এই সম্বন্ধই শাশ্বত। আমরা মনের ভিতর হইতে ইহাদের কাছে সম্পূর্ণ হার মানিয়াছিলাম।

আজ যখন বুঝিতেছি, ইহারা আমাদের অসমকক্ষ নহে—আমরাও দুর্ব্বল, ইহারাও দুর্ব্বল—আমাদের অক্ষমের দুর্ব্বলতা, ইহাদের সক্ষমের দুর্ব্বলতা—তখন অভিভূতির ভার কাটিয়া গিয়া আমরা মাথা তুলিতে পারি। ইংরাজ ক্রমাগত আমাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে, ন্যায়পরতা প্রভৃতি সম্বন্ধে তোমাদের স্বশ্রেণীর কোন জাতির সহিত আমাদের তুলনাই হয় না। এক সময়ে ইংরাজ যেন এই ধর্ম্মশ্রেষ্ঠতার প্রেষ্টিজ্ চালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। যে ব্যক্তি অক্ষমের নিকট ধর্ম্মরক্ষা করিয়া চলে, তাহার কাছে হার না মানিয়া থাকা যায় না—সেকালে আমাদের মন হার মানিয়াছিল। এখন ইংরাজ প্রতাপের প্রেষ্টিজ্ সর্ব্বাগ্রগণ্য করিয়াছে—স্বদেশী ও এদেশীকে ধর্ম্মের চক্ষে সমান করিবার বল ও সাহস এখন তাহার নাই—এখন ইংরাজের কাছে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট্ দুর্ব্বল। এখন ম্যাঞ্চেষ্টার্ রাজা, বার্মিংহাম্ রাজা, নীলকর রাজা, চা-কর রাজা, চেম্বর্ অফ্ কমার্স্ রাজা,—তাই আজকাল আমাদের প্রতি ভয়-দ্বেষ-ঈর্ষার নানা লক্ষণ দেখিতে পাই। দেখি, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ্ হইতে আমরা তাড়া খাইতেছি, আপিস্ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ডাক্তারিশিক্ষায় বাধা পাইতেছি, বিজ্ঞানশিক্ষায় গূঢ়ভাবে প্রতিহত হইতেছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা আছে, কিন্তু এই সান্ত্বনাটুকু পাইতে পারি যে, কর্ত্তারা আমাদের চেয়ে বেশি বড় নহে। ইহারা আমাদের অগ্রাহ্য করিয়া বাঁচে না—ইহাদের মনে এ আশঙ্কাটুকু আছে যে, সুযোগ পাইলে আমরা বিদ্যায়, ক্ষমতায়

ইহাদের সমান হইয়া উঠিতে পারি। ইংরাজ-ক্রিমিনাল্ দেশীয়ের প্রতি অন্যায় করিয়া ন্যায়সঙ্গত শাস্তি পাইলে ইংরাজকে দেশীয় আপন সমতুল্য বলিয়া জ্ঞান করিবে, এই ভয়টুকু যখন ইংরাজের মনে প্রবেশ করিয়াছে, তখন তাহার আত্মসম্মান নষ্ট হইয়াছে। এই উপলক্ষ্যে আমাদের চিত্তও ইংরাজের কাছে নতিস্বীকারের দায় হইতে নিষ্কৃতি-লাভ করিতেছে—প্রত্যহ তাহার প্রমাণ পাইতেছি।

সম্পাদকমহাশয় বলেন, আমরা যদি ঘুষির পরিবর্ত্তে ঘুষি ফিরাইতে পারি, তবে রাস্তায়-ঘাটে ইংরাজকে অনেক অন্যায় হইতে নিরস্ত রাখিতে পারি। কথাটা সত্য—মুষ্টিযোগের মত চিকিৎসা নাই—কিন্তু সম্পাদকের উপদেশ সহসা কেহ মানিতে রাজি হইবে না। তাহার গুটিকতক কারণ আছে।

একটি কারণ এই যে, আমরা একান্নবর্ত্তী পরিবারে মানুষ হইয়াছি—পরস্পর মিলিয়া-মিশিয়া থাকিবার যত-কিছু আদেশ-উপদেশ-অনুশাসন, সমস্তই শিশুকাল হইতে আমা-দিগকে প্রত্যহ পালন করিতে হইয়াছে। ঘুষাঘুষি করা, বিবাদ করা, পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও নিজের অধিকার লড়াই করিয়া রাখা, একান্নবর্ত্তী পরিবারে কিছুতেই চলে না। আমাদের পরিবার ভালমানুষ হইবার, পরস্পরের অনুকূলকারী হইবার, একটি কারখানাবিশেষ। অতএব ঘুষি শিক্ষা করিলেও মানুষের নাসিকাগ্রে ও চক্ষুতারকায় তাহা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করিবার ক্ষিপ্র-কারিতা আমাদের অভ্যাস হয় না। নিজের অসুবিধা করিয়াও পরস্পরের সহিত মিলিবার ভাবই আমাদের স্বভাব ও অভ্যাস সঙ্গত—পরস্পরের সহিত লড়িবার ভাব আমাদের সমাজব্যবস্থার মধ্যে কোথাও স্ফূর্ত্তি পাইবার স্থান পায় নাই।

এক, ইস্কুলের ছেলেদের মধ্যে যেটুকু বীররসের অবসর আছে, কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সহজে প্রশ্রয় দিতে চান না। তাঁরা কেবলি বলেন, আমাদের ছাত্রদিগকে যথেষ্ট শাসনে রাখা হয় না। তাঁহাদের স্বদেশে ছাত্রেরা যে ভাবে মানুষ হয়, এদেশের ছাত্রদের ব্যবহারে তাহার আভাসমাত্রও তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন না। যাহা দলন করিতে হইবে, তাহা অঙ্কুরেই দলন করা ভাল, এ কথা ইংরাজ জানে। একটা দৃষ্টান্ত দিই। কোন কলেজের ছাত্র ফুটবল্ খেলিতে খেলিতে আহত হইয়াছিল। তাহার সঙ্গীরা শুশ্রূষার প্রয়োজনে কাছের একটি সরোবর হইতে কাপড়ে ভিজাইয়া জল লইয়া-ছিল। সেই সরোবর সাহেবদের পানীয়জলের জন্য সুরক্ষিত ছিল। সেখানে ছাত্রকে নাবিতে দেখিয়া পাহারাওয়ালা নিষেধ করে। সেই উপলক্ষ্যে উভয়পক্ষে বচসা, এমন কি, হাতাহাতিও হইয়া থাকিবে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেই ছাত্রকয়টিকে লইয়া দীর্ঘকাল তাঁহার ডিষ্ট্রীক্টের যত দুর্গম স্থানে যে কৌশলে ঘুরাইয়া-মারিয়া অবশেষে জরিমানা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, তাহা সেই ছাত্রগণ ও তাহাদের অভিভাবকেরা কোনকালে ভুলিতে পারিবে না। বাল্যলীলার এরূপ দণ্ডবিধি ইংরাজের নিজের দেশে যে নাই, সে কথা সকলেই জানেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের মত বিদ্যালয়েও, দেশীয় প্রিন্সিপালের বিচারেও,

ছাত্রদিগকে যে সকল লঘুপাপে গুরুদণ্ড সহ্য করিতে হয়, তাহাতে তাহাদের পৌরুষচর্চ্চা হয় না।

এই ত গেল ঘরে এবং বিদ্যালয়ে। তাহার পরেও যদি ইংরাজ-অন্যায়কারীর গায়ে ঘুষি তুলিবার মত স্ফূর্ত্তি কাহারো থাকে, তবে বিচারালয় আছে। দেশীয়দের বিরুদ্ধচারী ইংরাজ-ক্রিমিনালের প্রতি ইংরাজ-বিচারকের মানবস্বভাবসঙ্গত পক্ষপাত সম্পাদকমহাশয় স্বীকার করেন—সেই স্বাভাবিক পক্ষপাত দেশীয় অপরাধীর পক্ষে কি আকার ধারণ করিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে। একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমানযুবা গড়ের মাঠে গাড়ি হইতে অন্য গাড়ির একজন ইংরাজকে চাবুক মারিয়া জেলে গিয়াছিল মনে আছে—এলাহাবাদের সোমেশ্বর দাসের কথাও আমরা ভুলিতে পারি না। ইংরাজের গায়ে হাত দিতে গিয়া গ্রামসুদ্ধ দোষি-নির্দ্দোষী বহুতর লোকের কিরূপ অসহ্য লাঞ্ছনা ঘটে, তাহার দৃষ্টান্ত আছে। তাহার কারণ, এদেশে পোলিটিকাল্ নীতিতে অন্য নীতিকে জটিল করিয়া ফেলে। এদেশে ইংরাজকে মারার মধ্যে ব্যক্তিগত মার এবং পোলিটিকাল্ মার, দুই আছে—ইস্কুলের ছেলের তুচ্ছ ক্রীড়ার মধ্যে ভাবিকালের পোলিটিকাল্ সঙ্কটের বীজ প্রচ্ছন্ন আছে—সুতরাং আমাদের ব্যক্তিগত অপমানের প্রতিকার করিতে গিয়া আমরা হঠাৎ পোলিটিকালের মধ্যে পা দিয়া ফেলি—তখন সহসা কাঁধের উপরে যে দণ্ডটা আসিয়া পড়ে, তাহার সম্পূর্ণ তাৎপর্য্য বুঝিতে আমাদের কিছু বিলম্ব হয়। দেশীয়ের প্রতি উপদ্রব করিয়া ইংরাজ অল্প দণ্ড ও ইংরাজের গায়ে হাত দিয়া আমরা গুরুদণ্ড পাই, ইহার মধ্যে শুধু যে মনুষ্যধর্ম্ম আছে তাহা নহে, তাহার সঙ্গে রাজধর্ম্মও যোগ দিয়াছে। এস্থলে ঘুষি-তোলা কম কথা নহে।

মনুষ্যস্বভাবে সাহসের একটা সীমা আছে। জাহাজের একজন কাপ্তেন্ হাজার অন্যায়কারী হইলেও তাহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় নাবিকদল সংখ্যাধিক্যসত্ত্বেও সকলপ্রকার অপমান ও দৌরাত্ম্য অগত্যা সহ্য করিয়াছে, এরূপ ঘটনার কথা অনেক শুনা গিয়াছে। আইনের শাসনকে উপেক্ষা করা শক্ত। জাষ্টিস্ হিল্ ইংরাজ-ক্রিমিনাল্কে উপদেশ দিবার প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, তোমার স্বদেশীয় ভৃত্য তোমার এরূপ ব্যবহার সহ্য করিত না। না করিবার কারণ আছে। বিচারের চক্ষে স্বদেশীয় ভৃত্য ও স্বদেশীয় মনিব সম্পূর্ণ সমান। সে স্থলে মনিবের দুর্ব্যবহার সহ্য না করিবার প্রভূত বল ভৃত্যের আছে। সে বল ভৃত্যের একলার বল নহে, তাহা তাহার সমস্ত স্বজাতির বল। এই বিপুল বলের সহিত একজন দেশীয় ভৃত্যের একলার বলের তুলনা করা ঠিক নহে।

এখানেও একান্নবর্ত্তী পরিবারের কথা পাড়িতে হয়। একজন ইংরাজের উপর অল্প লোকেরই নির্ভর—আমরা প্রত্যেকেই বহুতর আত্মীয়ের সহিত নানাসম্বন্ধে আবদ্ধ। সেই সকল সম্বন্ধ আমাদিগকে ত্যাগপরতা, সংযম, মঙ্গলনিষ্ঠা প্রভৃতি মনুষ্যত্বের উচ্চতর গুণে ভূষিত করিয়াছে—সেই সকল সম্বন্ধই হিন্দুজাতিকে রিফাইণ্ড্ ও অকৃত্রিম পাশবিকতা হইতে দূরে রাখিয়াছে—আমাদের

পক্ষে হঠকারিতা সহজ হইতেই পারে না, আমাদিগকে জেলের দিকে আকর্ষণ করিলে অনেকগুলা শিকড়েই সাংঘাতিক টান পড়ে। অতএব আমাদের জীর্ণ-প্লীহা ইংরাজের বুটাগ্রের পক্ষে যেরূপ সহজ লক্ষ্য, ইংরাজের নাসাগ্র আমাদের বদ্ধমুষ্টির পক্ষে সেরূপ সুন্দর সুগম নহে। সেজন্য ইংরাজ যদি নিজেকে আমাদের চেয়ে বেশি বাহাদুর মনে করেন ত করুন—কিন্তু আমরা কেন ইংরাজের তরফ হইতে স্বজাতিকে বিচার করি? যেভাবে আমরা চিরকাল মনুষ্যত্বচর্চ্চা করিয়া আসিতেছি, ইংরাজের সহিত সংঘাতে তাহাতে আমাদের অসুবিধা ও অপমান ঘটিতেছে। তা হইতে পারে—কিন্তু তাই বলিয়া মনুষ্যত্বে আমরা খাট, এ কথা আমরা ত স্বীকার করিতে পারিব না। মানুষ হইতে গেলে দাঁত-নখের খর্ব্বতা ঘটিয়া থাকে—তাই বলিয়া কি লজ্জা পাইব? রোমের সম্রাট্ নগ্ন-নিরস্ত্র খৃষ্টান্-দিগকে ক্রীড়াঙ্গনে পশু দিয়া হত্যা করিয়াছিলেন—ধর্ম্মরাজ যদি তাহার বিচার করিয়া থাকেন, তিনি কি রোমরাজের পৌরুষকেই সম্মান দিয়াছেন? আমরা যদি যথার্থভাবে সহ্য করিতে পারি, আমরা যদি সহিষ্ণুতার জন্য নিজেকে হেয় বলিয়া অন্যায় ভ্রম না করি, তবে ধর্ম্ম আমাদের বিচার গ্রহণ করিবেন। কিন্তু রচনারীতির খাতিরে বা যে কারণেই হউক্, এ কথা আমরা যেন অনায়াসেই উচ্চারণ করিয়া না বসি যে, আমরা হইলেও ঠিক এইরূপ করিতাম বা ইহাদিগকেও ছাড়াইয়া যাইতাম। না, আমরা হইলে এরূপ করিতাম না! ইহাই আমাদের সান্ত্বনা। আমাদের সমাজের, আমাদের ধর্ম্মের যে আদর্শ, আমাদের শাস্ত্রের যে অনুশাসন, আমাদের স্বভাবের যে গতি, তাহাতে অক্ষমকে আমরা আত্মীয়শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইতাম। আমরা ভিক্ষুককে, দুর্ব্বলকে, প্রাচীনকে কখনো অবজ্ঞা করি নাই।

রাজা এবং রাজকুটুম্ব ঠিক এক নহে, কিন্তু তবু রাজসম্পর্কের গন্ধ থাকিলেও কুটুম্বদের উৎপাত সহ্য করিতেই হয়। মৃচ্ছকটিকের রাজশ্যালকের কথা পাঠকগণ স্মরণ করিবেন। প্রভেদ এই যে, উক্ত কুটুম্ববর্গের সংখ্যা এখন অনেক বাড়িয়া গেছে।

মৃচ্ছকটিকের সেই রাজশ্যালকটি যতই উপদ্রব করুক না কেন, প্রজাবর্গের কাছে তাহার সম্মান ছিল না—সকলেই তাহাকে উৎপাত বলিয়াও জানিত, অথচ তাহাকে মনে-মুখে পরিহাস-বিদ্রূপ করিতে ছাড়িত না। এখনকার রাজশ্যালকগণের নিকট হইতে ঠিক সে-পরিমাণ হাস্যরস আদায় করা কঠিন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহারে তাঁহারা প্রত্যহ আমাদের কাছে যে পরিমাণে সম্ভ্রম হারাইতেছেন, তাহা যেন আমাদের মাথা তুলিবার সহায়তা করে!

অশোকের অনুশাসন।

বৌদ্ধধর্ম্মই জগতের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রচার-ধর্ম্ম এবং বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যেরাই সর্ব্বপ্রথম প্রচারক। বুদ্ধদেব জন্মজরামৃত্যুর অতীত যে পরিপূর্ণ শান্তি, এই কর্ম্মকোলাহল-সঙ্কুল জীবনে নিজ আত্মার নিভৃত কন্দরে যে আশ্রয় প্রাপ্ত হন, সমস্ত জগৎকে তাহার অবলম্বন দিবার জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। বুদ্ধত্বপ্রাপ্তির পর বারাণসী-বাসের পাঁচমাস পরে তিনি তাঁহার ষাটটি শিষ্যকে আদেশ করিয়াছিলেন—"হে ভিক্ষু-গণ, তোমরা লোকহিতের জন্য, তাহাদের কল্যাণ ও শান্তির জন্য দয়াপরবশ হইয়া দিকে দিকে গমন কর এবং যে ধর্ম্ম আদ্যন্ত-মধ্যে মহিমান্বিত, যাহা সত্য এবং সুন্দর, তাহাই লোকমধ্যে প্রচার কর। দুইজন একদিকে গমন করিও না। লোকসমাজে পরিপূর্ণ, নির্ম্মল, পবিত্র, কল্যাণময় জীবনের মহিমা কীর্ত্তন কর।" তাঁহার সেই আদেশ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হইয়া-ছিল এবং তাহার ফলে আজও পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিন্তু বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের প্রায় তিনশত বৎসর পরে, মগধরাজ অশোক তাঁহার এই বাক্য যেরূপে প্রতিপালন করেন, পৃথিবীতে আর কোন রাজা যে, কোন ধর্ম্মের জন্য কখন সেরূপ করিয়াছিলেন, ইতিহাস তাহার প্রমাণ দেয় না। দীপবংশ ও মহাবংশ হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি কাশ্মীর, গান্ধার, মহিশা (মহীশূর), বনবাস (রাজপুতানা), পাঞ্জাব, যোনালোক (বাক্‌ট্রিয়া ও অন্যান্য গ্রীক্ রাজ্য) এবং সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচারক প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রস্তরলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি অ্যান্টিয়োকাসের রাজ্যে এবং আরও পাঁচটি গ্রীক্‌রাজ্যে প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। বিশেষত পুত্র 'মহিন্দ'কে তিনি যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সিংহলে পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই তাঁহার উৎসাহ কতকপরিমাণে অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু যে ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মের জন্মভূমি এবং যেখানে এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য অশোক বহু-সহস্র স্তূপ এবং প্রস্তরস্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেশে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র অনুশাসন-সমূহ খোদিত করান, সেখানে আজ বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কি অবশিষ্ট আছে, কতটুকু জীবিত আছে? আজ শুধু কয়েকটি মূক-কঠিন শিলাখণ্ড তাহাদের জীর্ণদেহে অজ্ঞাত-রহস্যময় নির্ব্বাক্ লিপি লইয়া বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধিস্তম্ভের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। মহা-রাজ অশোকের বহুসংখ্যক শিলালিপির মধ্যে আজ পর্ব্বতগাত্রে খোদিত চতুর্দ্দশটি এবং স্তম্ভে লিখিত আটটি মাত্র আমাদের নিকট পরিচিত। উপস্থিত প্রবন্ধে তাহাদের মধ্যে একটি আমাদের আলোচ্য।

বর্ত্তমান দিল্লী হইতে মথুরা যাইবার পুরাতন পথের ধারে সহর হইতে প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ দূরে ফিরোজাবাদের যে সকল ভগ্নাব-

শেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই মধ্যে এই সরল নিরলঙ্কার উন্নত স্তম্ভ সর্ব্বাগ্রে পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কানিংহামের মতে অশোকস্তম্ভের মধ্যে ইহাই ঐতিহাসিকের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই স্তম্ভের দৈর্ঘ্যসম্বন্ধে অনেক বাদানুবাদ আছে—যাহা হউক, এখন সকলেরই মতে ইহা ৪২ফুট ৭ইঞ্চি উচ্চ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহা সাধারণ বালুকা-প্রস্তরে (Sand Stone) নির্ম্মিত, কিন্তু এই উপাদান লইয়া যে সকল হাস্যকর ভ্রমপ্রমাদ ছিল, তাহার দুইএকটা উদাহরণ দিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। Tom Coryat ইহাকে পিত্তলনির্ম্মিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার মনোমুগ্ধকর বর্ণনা পাঠে Edward Terry ইহাকে "Very great pillar of marble" বলিয়া ইহার গৌরব বাড়াইয়াছেন। বিশপ্ হিবর ইহাকে Pillar of cast metal" বলিয়াছেন। কানিংহ্যাম সাহেবের মতে এই স্তম্ভের উপরের ব্যাস ২৫·৩ ইঞ্চি এবং নিম্নভাগের ব্যাস ৩৮·৮ ইঞ্চি। এই বৃহৎ স্তম্ভ প্রস্তর-নির্ম্মিত গৃহের সর্ব্বোচ্চ তলের ছাদের উপরে স্থাপিত। বাদশাহ আকবরের সময়ে ইহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে মহম্মদ আমিন্ রাজি তাঁহার 'তকৃত-ই-খালিম'-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"এই লালপ্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ স্তম্ভ ত্রিতল প্রাসাদের উপর দণ্ডায়মান।" এক্ষণে ইহার গঠনবর্ণনায় বেশী সময় ব্যয় না করিয়া অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করা যাউক।

এই স্তম্ভ এস্থানে অশোককর্ত্তৃক স্থাপিত হয় নাই। ইহা পূর্ব্বে মিরাটের নিকট যমুনাতীরবর্ত্তী নাহেরা-নামক গ্রামে ছিল। ইহা দিল্লী হইতে প্রায় ১২০ মাইল দূরে। ১৩৫৬ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফিরোজশাহ কর্ত্তৃক এই স্তম্ভ নাহেরা হইতে তাঁহার নূতন রাজধানী ফিরোজাবাদের শোভাবর্দ্ধনার্থ আনীত হইয়াছিল। কিন্তু কিপ্রকারে এই সুবৃহৎ প্রস্তরস্তম্ভ এতদূর হইতে আনয়ন করা হয়—সৈয়দ আমেদখাঁ তাহার যে বৃত্তান্ত দিয়াছেন, তাহা অতিশয় কৌতুকপ্রদ। অপ্রাসঙ্গিক হইবে না বিবেচনায় আমরা এস্থলে তাহার উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন—সর্ব্বপ্রথমে ইহার চতুর্দ্দিক্ শিমুলতুলা-দ্বারা আবৃত করিয়া ইহার নিম্নের মাটি খুঁড়িয়া লওয়া হইল এবং ধীরে ধীরে ইহাকে তুলার বস্তার উপর শায়িত করা হইল। তৎপরে বিয়াল্লিশখানি-চক্র-বিশিষ্ট এক যানের উপরে এই বিশাল স্তম্ভকে উঠান হইল। প্রত্যেক চক্রের নিকট একগাছি করিয়া রজ্জু বাঁধিয়া বিপুল চেষ্টায় ও বহুসংখ্যক লোকের দ্বারায় ইহাকে যমুনাতীরে আনা হইল। এই স্থানে বাদশাহ স্বয়ং ইহার অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। এখানে অনেকগুলি সুবৃহৎ নৌকা সংগৃহীত ছিল—বহু আয়াসে এই স্তম্ভকে তাহাদের উপর উঠাইয়া দিল্লীতে আনা হইল ও নূতন রাজধানী ফিরোজাবাদে স্থাপনের উদ্যোগ চলিতে লাগিল। প্রথমে এক সুপ্রশস্ত, নাতি-উচ্চ প্রস্তরভিত্তির উপর ইহাকে স্থাপিত করা হইল। এই-প্রকারে এক একটি সোপানের পর সোপান নির্ম্মাণ করিয়া ইহার মূলকে উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানে উঠাইয়া কৌশলে ইহাকে

দাঁড় করান হইল। ইহার পরেও বহু চেষ্টায় ও কৌশলে এই স্তম্ভকে বর্ত্তমান উচ্চস্থানে স্থাপিত করা হইয়াছে।

এক্ষণে ইহার গাত্রে খোদিত লিপির আলোচনা করা যাউক। সর্ব্বপ্রথমে Captain Hoare এই লিপির একটা প্রতিলিপি ১৮০১ সালের Asiatic Researchesএ প্রকাশ করেন—কিন্তু তখন পণ্ডিতমণ্ডলীর কেহই ইহার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই এবং ১৮৩৭ সাল পর্য্যন্ত এই লিপি কেবল কৌতূহলের সামগ্রী হইয়া তাঁহাদের সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়াছিল। অবশেষে James Prinsep সাহেব এই লিপির অক্ষরপাঠের একটা উপায় উদ্ভাবন করেন। তিনি যখন সাঁচি-স্তূপের স্তম্ভে-খোদিত অক্ষর পড়িবার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন লক্ষ্য করিলেন যে, যদিও তাহার অন্যান্য সমস্ত অংশ পৃথক্, তথাপি ইহাদের শেষ দুই অক্ষর একই। তাঁহার মনে হইল যে, ধার্ম্মিক বৌদ্ধগণ ধর্ম্মার্থে স্তম্ভ এবং স্তূপের শোভাবর্দ্ধক অন্যান্য অলঙ্কার-সকল দান করিতেন। এরূপ হইতে পারে যে, এই শেষ অক্ষর দুইটি "দানম্" এবং তাহা যদি ঠিক হয়, তবে এই "দানম্"এর পূর্ব্বে ষষ্ঠী বিভক্তির চিহ্ন "স্য" অক্ষর আছে। তাঁহার অনুমান যথার্থ হইল। তিনি এই অক্ষরকয়টি অবলম্বন করিয়া বিপুল চেষ্টায় একমাসের মধ্যে উক্ত সাঁচি-স্তূপের লিপির পাঠোদ্ধার করিলেন। তাঁহার এই অক্ষর-পরিচয় হইতেই অশোকস্তম্ভের পাঠোদ্ধারের সূত্রপাত। এই নব-আবিষ্কৃত পুরাতন ভাষার নাম হইল স্তম্ভলিখিত পালি বা ভারতবর্ষীয় পালি।

আলোচ্য স্তম্ভের গাত্রে দুইপ্রকার লেখা দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমটি অশোকের খোদিত পালিভাষায়—দ্বিতীয়টি সংস্কৃত-ভাষায় চোহনবংশীয় রাজা বিশালদেবের জয়বার্ত্তা। শেষোক্তটি ১২২০ সংবতে অর্থাৎ ১১৬৩ খৃষ্টাব্দে লিখিত। ইহা আমাদের আলোচনার বিষয়ীভূত করিবার ইচ্ছা নাই। অশোকের লিপি এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে অতি পরিষ্কার এবং সুন্দর রূপে খোদিত এবং চারিদিকে ফ্রেমের মত অঙ্কিত। ইহার প্রত্যেকটিতে একএকটি পৃথক বিষয়ের আদেশ লিপিবদ্ধ আছে।

এক্ষণে আমরা এই স্তম্ভোপরি খোদিত অনুশাসনলিপির আলোচনা করিব। প্রয়াগ, লৌরিয়া, সাঁচি প্রভৃতি স্থানে অশোকের যে সকল লিপি খোদিত আছে, তাহাতে মোটের মাথায় ছয়টি অনুশাসন দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর এই স্তম্ভে এতদ্ব্যতিরিক্ত আর দুই অনুশাসন লিপিবদ্ধ আছে। আমরা এই সকলের বিস্তৃত অনুবাদ না দিয়া বিষয়-বিশেষ-হিসাবে তাহাদের উল্লেখ করিব।

১। অশোক তাঁহার পুরোহিত ও প্রচারকদিগকে একান্ত মঙ্গলভাবে প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করিতে আদেশ ও শিক্ষা দিয়াছিলেন; তাঁহার অনুশাসনে আছে:—

"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—কল্যাণকর কার্য্য যাঁহা কিছু করিয়াছি, আমার অনুসরণকারিগণের পক্ষে তাহা কর্ত্তব্যকার্য্যরূপে বিধিবদ্ধ হউক। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যের দ্বারা, ধর্ম্মাচার্য্যের সেবায় এবং বয়োবৃদ্ধগণের প্রতি সসম্মান ব্যবহারের দ্বারা, ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, পিতৃমাতৃহীন

অনাথ এবং চারণগণের প্রতি দয়া এবং সৌজন্যের দ্বারা তাঁহাদের প্রভাব প্রকটিত হউক।

"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—ধর্ম্মজ্ঞ পুরোহিতগণ সাহায্য-দানে সক্ষম ধনিগণের মধ্যে প্রবেশ করুন, অবিশ্বাসিগণের মধ্যে প্রবেশ করুন, গৃহী এবং সন্ন্যাসী সকলেরই নিকট গমন করুন। আমার অনুরোধে সংঘসমূহের মধ্যে তাঁহারা প্রবেশ করুন; ব্রাহ্মণ ও নিতান্ত দীনগণের মধ্যে আমার অনুরোধে তাঁহারা গমন করুন। যাহারা গৃহস্থধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, আমার অনুরোধ, তাঁহারা তাহাদের নিকটও গমন করুন। শুধু প্রবেশ করা নহে—এই সকল শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করুন। * *

"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—আমার দানশীলা রাজ্ঞীগণ এবং অন্যান্য অন্তঃপুরবাসিনীগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুণ্যকর্ম্মে দীক্ষিত পুরোহিতগণ ও জ্ঞানিগণ ইঁহাদের ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তনের জন্য শ্রদ্ধা ও বিচক্ষণতার সহিত তাঁহাদের চেষ্টার সুব্যবহার করুন। বালকবালিকাগণের হৃদয়েও তাঁহাদের প্রভাব পূর্ব্বোক্তপ্রকারে বিস্তার করুন।"

২। দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্যপ্রাণতা এবং পবিত্রতাই যে ধর্ম্ম, তাহা তিনি তাঁহার অনু-শাসনে বিশেষভাবে প্রচার করিয়াছেন। এই স্তম্ভের উত্তরদিকে লিখিত আছে:—

"ধর্ম্মদৃষ্টি এবং ধর্ম্মপ্রাণতা স্বতই ক্রমশ বর্দ্ধিত হইবে। আমার প্রজাবর্গ, কি গৃহস্থ কি ভিক্ষু, সকল জীবই এক সূত্রে গ্রথিত, এবং সেই একই পথ নির্দ্দেশ করিবে। সর্ব্বোপরি, সকল রিপু জয় করিয়া তাহারা জ্ঞানী হইবে, কারণ ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। যে ধর্ম্ম, পালন করে, যাহা পুণ্যশিক্ষা দেয় এবং যাহা একমাত্র প্রকৃত আনন্দ দান করে, জ্ঞান সেই ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিত এবং সেই ধর্ম্মের সহিত সংগ্রথিত।

"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—ধর্ম্মেই চরম উৎকর্ষ। সৎক্রিয়া এবং পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তিই ধর্ম্ম। দয়া, দান, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই সকলই আমার মতে সংস্কারের অভিষেক। যাহারা দরিদ্র, যাহারা আর্ত্ত, দ্বিপদ, চতুষ্পদ, খেচর এবং জলচর, এই সকলেরই জন্য আমি নানা হিতকর কার্য্য করিয়াছি। জড়ের প্রতিও কৃপাপরবশ হইয়া আমি নানা সৎকর্ম্ম করিয়াছি। বর্ত্তমান অনুশাসন এই উদ্দেশ্যে প্রচারিত হইল—সকলে অবধান কর; ইহা যেন সুদূর ভবিষ্যতেও থাকে; যে এই অনু-সারে কার্য্য করিবে, সে সুগতের সহিত মিলিত হইবে (অর্থাৎ অনন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইবে)।"

অন্যত্র আছে:—"সমস্ত জগতে দয়া, দানশীলতা, সত্যনিষ্ঠা, পবিত্রতা, দাক্ষিণ্য এবং সাধুতা বৃদ্ধি করাই ধর্ম্মের যথার্থ উপাসনা।"

৩। আপনার কর্ম্মের বিচার এবং যাহা কিছু পাপ তাহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করার উপদেশ অশোক সকল স্থানেই দিয়া-ছেন। এই স্তম্ভে লিখিত আছে:—"সকলেই আপনার কর্ম্মের মধ্যে যাহা ভাল, তাহাই দেখে ও বলে—'আমি এই সৎকর্ম্ম করিয়াছি।' কিন্তু নিজকৃত পাপানুষ্ঠান কেহ দেখে না,

কেহই বলে না—'আমি এই দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, ইহা পাপ।' এরূপ আত্মবিচার কষ্টকর সন্দেহ নাই—কিন্তু এইপ্রকার বিচার করা ও বলা আবশ্যক—'এই সকল কর্ম্ম অসৎ, ইহা হিংসা, ইহা দ্বেষ, ইহা ক্রোধ, ইহা মাৎসর্য্য।' আত্মহৃদয়কে বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিতে হইবে—'আমি হিংসাকে হৃদয়ে স্থান দিব না, পরনিন্দা করিব না।'"

৪। বর্ত্তমান স্তম্ভে লিখিত অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়—অশোক ধর্ম্মপ্রচারার্থ রাজুকসকল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। যাহারা বধদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাদিগকে তিন-দিন সময় দেওয়ার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।—"তাহাদিগকে জ্ঞাত করা হইবে যে, তাহারা এই দিবসত্রয়মাত্র জীবিত থাকিবে। এইপ্রকার জ্ঞাত হইয়া তাহারা পরজন্মের হিতাকাঙ্ক্ষায় দান করিবে এবং অনশনব্রত গ্রহণ করিবে।"

৫। জীবহিংসাসম্বন্ধে অশোকের অনুশাসন এই যে—"জীবিত প্রাণীকে কেহ দগ্ধ করিবে না। অকারণ আমোদের জন্য জীব-হিংসা করিবে না, এক প্রাণীকে বধ করিয়া কেহ অন্য জন্তুকে খাওয়াইতে পারিবে না। কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট পুণ্যতিথিতে কোনপ্রকার পক্ষী, মৎস্য, গো, মেষ, ছাগ বা শূকর কেহ হিংসা করিতে পারিবে না।"

৬। অশোকের অনুশাসনের ষষ্ঠ বিষয়—তাঁহার সমস্ত প্রজাবর্গের প্রতি তাঁহার মঙ্গলভাব এবং তাহাদের কল্যাণকামনা। তিনি তাহাদের আত্মার কল্যাণকামনায় প্রণোদিত হইয়া সকলকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। "আমি আমার প্রজাবর্গের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নানা-প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছি। * * * এইজন্য আমি আমার কর্ম্মচারীদিগের উপর সর্ব্বদা সতর্কদৃষ্টি রাখিয়া থাকি। সকলেই জাতিনির্ব্বিশেষে আমার নিকট উপকার প্রাপ্ত হয়—কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন আমি প্রধান কর্ত্তব্য মনে করি।"

৭। মহারাজ অশোক তাঁহার এই সকল ধর্ম্মানুশাসনসম্বন্ধে লিখিয়াছেন:— "* * তাহারা (প্রজাবর্গ) আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া অনন্ত মুক্তির অধি-কারী হইবে। এইজন্য আমার অভিষেকের সপ্তবিংশ বর্ষে এই ধর্ম্মানুশাসন প্রচারিত হইল।" অন্যত্র—"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—আমি ধর্ম্মের বচন-সকল প্রচার করাইয়াছি, ধর্ম্মের বিধানসকল নির্দ্দেশ করিয়াছি, সকলে তাহা শ্রবণ করিয়া সত্যপথে নীত হইবে।"

৮। এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে যে লিপি খোদিত, তাহা হইতে আমরা অশোক জন-সাধারণ, এমন কি, পশুপক্ষীদিগেরও কল্যাণার্থ যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ জানিতে পারি।

"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন—বর্ত্তমানকালে সংস্থাপনসমূহ আমার দ্বারা আহূত হইয়াছে।—আমি ধর্ম্মে সুপ্রবীণ ব্যক্তিসকলকে নিযুক্ত করি-য়াছি এবং ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বহু আয়াস স্বীকার করিয়াছি।

"দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী পুন-রায় বলিতেছেন—রাজপথসমূহের পার্শ্বে আমি ন্যগ্রোধবৃক্ষসকল রোপণ করাইয়াছি

—তাহারা পথশ্রান্ত মনুষ্যগণকে এবং জন্তুদিগকে ছায়াদান করিবে।

"আমি বহু আম্রবৃক্ষ রোপণ করাইয়াছি এবং অর্দ্ধক্রোশান্তরে কূপ খনন করাইয়াছি —রাত্রিকালে বিশ্রামার্থ বাসভবনসমূহ নির্ম্মাণ করাইয়াছি। মনুষ্য এবং পশুগণের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আমি কত স্থানে কত বাসস্থান নির্ম্মাণ করাইয়াছি, তাহার ইয়ত্তা আছে কি? মনুষ্যগণ পথে এই নব বাসভবনসমূহে নানাবিধ সুখ পাইয়া যেমন আনন্দিত হইবে, তেমনি তাহারা যেন আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া দয়াব্রত গ্রহণ করে।—ইহাই আমার উদ্দেশ্য—এইরূপই আমি করিয়াছি। * * এই সমস্ত বিধি এই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইল—আমার পুত্র—পুত্রের পুত্র পর্য্যন্ত —যতকাল সূর্য্যচন্দ্র থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত —ইহারা বর্ত্তমান থাকিবে। * * আমার রাজত্বকালের সপ্তবিংশ বর্ষে আমি এই ধর্ম্মানুশাসন লিপিবদ্ধ করাইয়াছি। দেবতাদিগের প্রিয় রাজা প্রিয়দর্শী বলিতেছেন— প্রস্তরফলক এবং স্তম্ভসমূহ নির্ম্মিত হউক এবং তদুপরি এই সকল ধর্ম্মানুশাসন খোদিত হউক। সে সকল যেন অনন্তকাল পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে।"

অধ্যাপক—
শান্তিনিকেতন, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম।

চৈত্রের গান।

ওরে আমার কর্ম্মহারা ওরে আমার সৃষ্টিছাড়া
ওরে আমার মনরে আমার মন!
জানিনে তুই কিসের লাগি কোন্ জগতে আছিস্ জাগি,
কোন্ সেকালের বিলুপ্ত ভুবন!
কোন্ পুরাণো যুগের বাণী অর্থ যাহার নাহি জানি,
তোমার মুখে উঠ্‌চে আজি ফুটে!
অনন্ত তোর প্রাচীন স্মৃতি কোন্ ভাষাতে গাঁথ্‌চে গীতি
শুনে চক্ষে অশ্রুধারা ছুটে!
আজি সকল আকাশ জুড়ে যাচ্চে তোমার পাখা উড়ে
তোমার সাথে চল্‌তে আমি নারি!

তুমি যাদের চিনি বলে'　　　　টান্‌চ বুকে নিচ্চ কোলে
আমি তাদের চিন্‌তে নাহি পারি!

আজ্‌কে নবীন চৈত্রমাসে　　　　পুরাতনের বাতাস আসে,
খুলে গেছে যুগান্তরের সেতু।
মিথ্যা আজি কাজের কথা,　　　　আজ জেগেছে যে সব ব্যথা
এই জীবনে নাইক তাহার হেতু!
গভীর চিত্তে গোপন-শালা　　　　সেথা ঘুমায় যে রাজবালা
জানিনে সে কোন্ জনমের পাওয়া,
দেখে নিলেম ক্ষণেক তারে,　　　　যেম্‌নি আজি মনের দ্বারে
যবনিকা উড়িয়ে দিল হাওয়া!
ফুলের গন্ধ চুপে চুপে　　　　আজি সোনার কাঠিরূপে
ভাঙাল তার চিরযুগের ঘুম।
দেখ্‌চে লয়ে' মুকুর করে　　　　আঁকা তাহার লালাট'পরে
কোন্ জনমের চন্দন-কুঙ্কুম!

আজকে হৃদয় যাহা কহে　　　　মিথ্যা নহে সত্য নহে,
কেবল তাহা অরূপ অপরূপ!
খুলে গেছে কেমন করে'　　　　আজি অসম্ভবের ঘরে;
মর্চে-পড়া পুরাণো কুলুপ।
সেথায় মায়াদ্বীপের মাঝে　　　　যক্ষশালায় বীণা বাজে,
ফেণিয়ে ওঠে নীল সাগরের ঢেউ,
মর্ম্মরিত-তমাল-ছায়ে　　　　ভিজে-চিকুর শুকায় বায়ে
তাদের চেনে চেনে না বা কেউ!
শৈলতলে চরায় ধেনু　　　　রাখালশিশু বাজায় বেণু
চূড়ায় তারা সোনার মালা পরে।
সোনার তুলি দিয়ে লিখা　　　　চৈত্রমাসের মরীচিকা
কাঁদায় হিয়া অপূর্ব্বধন-তরে!

গাছের পাতা যেমন কাঁপে　　　　দখিন বায়ে মধুর তাপে,
তেম্‌নি মম কাঁপ্‌চে সারাপ্রাণ!

কাঁপ্‌চে দেহে কাঁপ্‌চে মনে হাওয়ার সাথে আলোর সনে,
মর্ম্মরিয়া উঠ্‌চে কলতান!
কোন্ অতিথি এসেছে গো কারেও আমি চিনিনে গো,
মোর দ্বারে কে কর্‌চে আনাগোনা!
ছায়ায় আজি তরুর মূলে ঘাসের 'পরে নদীর কূলে
ওগো তোরা শোনা আমায় শোনা—
দূর আকাশের ঘুমপাড়ানি মৌমাছিদের মনহারানি
জুঁই-ফোটানো ঘাস-দোলানো গান,
জলের গায়ে পুলক-দেওয়া ফুলের গন্ধ কুড়িয়ে-নেওয়া
চোখের পাতে ঘুম-বোলানো তান!

শুনাস্‌নে গো ক্লান্ত বুকের বেদ্‌না যত সুখের দুখের
প্রেমের কথা, আশার নিরাশার!
শুনাও শুধু মৃদুমন্দ অর্থবিহীন কথার ছন্দ
শুধু সুরের আকুল ঝঙ্কার!
ধারাযন্ত্রে স্নান করি' যত্নে তুমি এস পরি'
পীতবরণ লঘুবসনখানি।
ভালে আঁক ফুলের রেখা চন্দনেরি পত্রলেখা,
কোলের 'পরে সেতার লহ টানি'!
দূর দিগন্তে মাঠের পারে সুনীলছায়া গাছের সারে
নয়নদুটি মগ্ন করি চাও!
ভিন্নদেশী কবির গাঁথা অজানা কোন্ ভাষার গাথা
গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গাও!

দুর্ব্বল।

রে দুর্ব্বল, বুঝিয়াছি হৃদয়ের কথা,
দুর্লভ হারায়ে গেছে তাই শুধু ব্যথা!
আর কেহ পাছে তারে খুঁজে ফিরে পায়
তাই তোর এত ভয়, এত হায় হায়!

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

অনুতাপিনী সন্ন্যাসিনী।

(ফরাসী লেখক ইউজেন্-ডোরিয়াক্ হইতে)

১

১৭৩২ খৃষ্টাব্দে আষাঢ়মাসের আরম্ভভাগে একটি রমণী টুলুজ্-নগরীর রাজপথ-দিয়া দ্রুতপদে চলিতেছিল। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া লইবার জন্য, মধ্যে-মধ্যে থামিতেছিল, আবার চলিতেছিল। অবশেষে একটা মঠের নিকট উপনীত হইয়া বলিল :—"মঠ-ধাবিণীর সহিত আমি সাক্ষাৎ করতে চাই।" অমনি, লৌহ-গরাদিয়া-বেষ্টনের প্রবেশদ্বার উদ্ঘাটিত হইল।

একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী তাহাকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া, একটা কাম্‌রার মধ্যে লইয়া গেল। সেটি স্তবপাঠের স্থান ;— সুন্দর সজ্জায় সুসজ্জিত, কুসুমগন্ধে আমোদিত। সেই অপরিচিতা সন্ন্যাসিনী তাহাকে সেখানে একাকিনী রাখিয়া, একটি কথা না বলিয়া, প্রস্থান করিল। একটু পরেই, আর একজন রমণী গর্ব্বিত পদক্ষেপে প্রবেশ করিয়া, মস্তক ঈষৎ নত করিয়া অভিবাদন করিল। পরে, আগন্তুককে একখানি আসনে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া, দুইজনেই উপবেশন করিল।

বিলাসের সামগ্রী যতদূর- মূল্যবান্ ও ইন্দ্রিয়াকর্ষক হইতে পারে, সেই সব সামগ্রীতে এই কক্ষটি সুসজ্জিত ; এইরূপ সুসজ্জিত ঘরে, এই দুইটি রমণীকে যদি কেহ এই সময়ে দেখিত, সে নিশ্চয়ই মনে-মনে কত-কি ভাবিত, কিন্তু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিত না।

এই দুই রমণীর মধ্যে, একজনের দেহের উচ্চতা, সচরাচর স্ত্রীলোকের যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ। যৌবনে ইহারই মধ্যে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। পরিধানে মোটা ফ্ল্যানেলের কাপড় ; গলার নীচের দিকে একটু খোলা ; মিহি-সুতার "শেমিজ"-জামা ভিতর হইতে দেখা যাইতেছে। চোখের তারা কৃষ্ণবর্ণ ও অগ্নিময়। কপোলের দুই দিকে পাকানো সলিতার ন্যায় দুইটি কৃষ্ণাভ অলকদাম লম্বিত ; তাহাতে তাহার মুখের শুভ্রবর্ণ আরও যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে।

দ্বিতীয়া রমণীর মুখশ্রী কঠোর, মহত্ত্বসূচক, গুরুগম্ভীর, রাজমহিমদীপ্ত ; এবং তাঁহার সন্নিকর্ষের এরূপ প্রভাব যে, তাহাতে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। তাঁহার লৌকিক নাম 'গ্যাব্রিয়েল্', কিন্তু মঠের লোকেরা তাঁহাকে 'মাতাজি-অ্যান্-মারী' বলিয়া ডাকিত।

দ্বিতীয়ার অপেক্ষা, প্রথমা বয়সে ২০ বৎসরের ছোটো ; লম্বা, ছিপ্‌ছিপে, পাত্‌লা ; বাতাহত নতশির কুসুম-কলিকার ন্যায় ইনি যেন সর্ব্বদাই কাঁপিতেছেন ও নত হইয়াই আছেন। ইহার মুখশ্রী বাস্তব-পক্ষে সুন্দর কই-

লেও, চির-যন্ত্রণার ছাপ্ যেন উহাতে মুদ্রিত। ইহার সুনীল নেত্রের চারিধারে সুদীর্ঘ পক্ষ্ম-রাজি; দুইএকটি মোটা-মোটা অশ্রুফোঁটা যেন তাহাতে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। তাঁহার চিক্কণ কেশগুচ্ছ, কক্ষ-প্রবাহিত সুশীতল মৃদুমন্দ অনিলভরে, বক্ষের উপরে ক্রীড়া করিতেছে। মাতাজি অনেকক্ষণ নীরব থাকিয়া, পরে বলিলেন:—"ভদ্রে, আমি কি জিজ্ঞাসা করতে পারি, কি অভিপ্রায়ে তুমি আমার নিকটে এসেছ?"

তরুণীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে পরিপ্লুত ছিল, এক্ষণে চোখের জল মুছিয়া সে উত্তর করিল:—"মা, আমি আপনার কাছে সান্ত্বনা পাবার জন্য এসেছি। আমি হতভাগিনী, আমি পাপিষ্ঠা; কিন্তু আমার দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি যথেষ্ট কষ্টও পেয়েছি। আমার মা-বাপ আমার কাছে সর্ব্বদাই বল্‌তেন, 'অনুতাপ কর্‌লে ঈশ্বর মার্জ্জনা করেন।' কিন্তু আমার বিশ্বাস, অনুতাপ যথেষ্ট নয়, আমাদের মহাপ্রভু বলেন:—'যাদের ধন-ঐশ্বর্য্য আছে, তাদের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর।' যাতে আমার দোষের ক্ষালন হয়, যাতে আমার প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়, এইজন্য আমি আমার সমস্ত ধনসম্পত্তি বিসর্জ্জন করে', আপনার স্নেহময় কোলে আশ্রয় নিতে এসেছি। মা, দয়া করে' আপনার পবিত্র কন্যাদের মধ্যে আমাকে একটু স্থান দিন।"

মাতাজি বলিলেন:—"প্রভুর শান্তি-নিকেতনের দ্বার সকল পাপীর জন্যই উন্মুক্ত। তবু একটা কথা যদি তোমাকে বলি, কিছু মনে কোরো না। আমাদের আশ্রমে যে-সব ত্যাগস্বীকার করতে হয়, যে-সব কঠোর সাধনা কর্‌তে হয়, সে-সব তুমি যে সহ্য কর্‌তে পার্‌বে, তোমার শারীরিক অবস্থা দেখে তা' মনে হয় না। তোমার শরীর দুর্ব্বল, তোমার স্বাস্থ্য···"

তাঁহার কথা শেষ না হইতে-হইতেই আগন্তুক বলিল:—"হা ভগবান্! তা হ'লে পথহারা হয়েই কি এইভাবে আমায় চির-কাল ঘুরে বেড়াতে হবে? মাতাজি, আপনার দয়ার শরীর, আপনি মমতাময়ী; আপনাকে আমি অনুনয় কর্‌চি, আপনার কাছ থেকে আমাকে দূর করে' দেবেন না। এ সংসারে আমার আর কেউই নেই। এখন আর আমার স্বামী নেই—আর বোধ হয় পুত্রও নেই।"

বেচারি বাস্তবিকই বড় কষ্ট পাইতেছে মনে করিয়া, মাতাজির হৃদয় আর্দ্র হইল। তিনি আগ্রহভরে আরও কাছে ঘেঁষিয়া বসিলেন এবং অতীব মধুর বচনে বলিতে লাগিলেন:—"বাছা, তোমার চোখের জল মোছো। তোমাকে আমার কাছ থেকে দূর কর্‌বার কোন অভিপ্রায় নেই। তোমার প্রতিজ্ঞা যদি অটল থাকে, অন্য কাজে লিপ্ত হবার যদি তোমার স্বাধীনতা থাকে, আর যদি তোমার যথেষ্ট মনের বল থাকে, তা হ'লে আমাদের সঙ্গে তুমি থাকো। আমরা তোমাকে সান্ত্বনা দেব। আর এ কথা ভরসা করে' বলিতে পারি, তোমার প্রার্থনার সঙ্গে যদি আমাদের প্রার্থনার যোগ হয়, তা হ'লে ঈশ্বর নিশ্চয়ই তোমাকে ক্ষমা কর্‌বেন।"

বলিতে বলিতে তিনি একবার থামি-লেন এবং খুব মনোযোগের সহিত সেই

আশ্রয়প্রার্থিনীকে নিরীক্ষণ করিলেন; তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন:—"কিন্তু আমাদের আশ্রমের নিয়মঅনুসারে, প্রথমে আমাদের জানা আবশ্যক, তুমি কোথা হ'তে আস্‌চ। বোধ হচ্ছে তুমি বিদেশিনী। তুমি কে বল দিকি? তোমার কি কোন আত্মীয়স্বজন নেই? তুমি যে সঙ্কল্প করেছ, তার জন্য তাঁদের কাছে কি তোমার জবাবদিহি কর্‌তে হবে না?"

এই প্রশ্নগুলি পর-পর একসঙ্গে জিজ্ঞাসা করায়, আগন্তুক একটু থতমত খাইয়া গেল। তাহার পাণ্ডুবর্ণ কপোল ঈষৎ রক্তিমা-রঞ্জিত হইল।

কিন্তু একটু পরেই আপনাকে সাম্‌লাইয়ালইয়া, অবিচলিত-প্রশান্ত ভাবে ও সম্পূর্ণদৃঢ়তা-সহকারে উত্তর করিল:—"লণ্ডনের পার্শ্ববর্ত্তী কোন-এক পল্লিতে আমার জন্ম; আমার নাম, শ্রশ্‌বেরীর 'ক্যাথেরাইন্‌'। আমি ডামুর্থের কৌন্‌টেস্‌। আমি জন্মাবধি ক্যাথলিক্‌-ধর্ম্মাবলম্বী।"

এই কথাগুলি বলিয়া, ঐ আগন্তুক রমণী তাঁহার পরিচ্ছদের মধ্য হইতে একটি ইস্‌পাৎমণ্ডিত বাক্‌সো বাহির করিল। বলিল:—"মা, এই বাক্‌সোটি আপনি রাখুন, এর ভিতরে আমার যৌতুকের ধনরত্ন আছে। কিন্তু তার চেয়েও যে একটি মূল্যবান্‌ জিনিস আমার আছে, তার সন্ধান আপনি ওতে পাবেন। অবশ্য আপনার কাছে সেটি মূল্যবান্‌ নয়; কিন্তু এ সংসারে সেইটিই আমার একমাত্র ধন, সেইটিই আমার একমাত্র বন্ধন। আহা! আবার যে আমি তাকে দেখ্‌তে পাব, সে আশা আর আমার নেই ... আমার শিশুটিকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে; ফ্রান্‌সে নিয়ে যাবার জন্যে, তাকে আমার কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। সে যদি এখনও বেঁচে থাকে, আর যদি কোনোদিন আপনি তার কথা শুন্‌তে পান, তা হ'লে আপনি এই বাক্‌সোটি তাকে দেবেন, আপনার কাছে এটি গচ্ছিত রইল। ওরই মধ্যে, সে তার মায়ের অন্তিমকালের ইচ্ছে জান্‌তে পার্‌বে।"

২

উপরে যাহা বিবৃত হইল, তাহার দুই বৎসর পরে, টুলুজ্‌-নগরে সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে, ডামুর্থের কৌন্‌টেস্‌ মঠে গিয়া সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ করিয়াছেন।

এই উপলক্ষ্যে, মঠের ভজনালয় চিত্রিত পর্দ্দায় ও অতীব দুর্ল্লভ এবং সদ্যঃপ্রস্ফুটিত কুসুমগুচ্ছে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সেকালে মঠগুলি যার-পর-নাই জমকালো সাজসজ্জায় ভূষিত হইত। তাহার কারণ, সম্ভ্রান্তবংশের ও রাজপরিবারের মহিলারাও সে সময়ে কখন-কখন মঠের আশ্রয় লইতেন। এইজন্য মঠের ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও রাজকীয় আড়ম্বর ও ঘটা পরিলক্ষিত হইত।

প্রথমে ১০ই আষাঢ় দীক্ষার দিন স্থির হয়, কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি পীড়িতহওয়ায়, দশদিন আরও পিছাইয়া যায়। কেন না, শ্রদ্ধাস্পদ মাতাজি ভিন্ন দীক্ষাকার্য্য আর কাহারও দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না।

আজ সেই দীক্ষার দিন। অনুষ্ঠানের একঘণ্টা পূর্ব্বে, শুভ্রবসনা অবগুণ্ঠিতা কুসুম-কিরীটিনী দীক্ষা-প্রার্থিনী, স্বীয় ধর্ম্ম-

র্ম্মমাতা হস্তে সমর্পিতা হইলেন। ;কারণ, নিজ পরিবারবর্গের অভাবে, সেই ধর্ম্ম-মাতাই তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নগরে আনিয়াছিলেন। মঠের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া, মঠধারিণী মাতাজি দীক্ষার্থিনীকে বলিলেন:—"যাও বৎসে, তোমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্চি; সংসারে গিয়ে যদি সুখী হবার আশা থাকে, তা হ'লে, সেইখানেই থেকো, আর এখানে ফিরে এসো না।"

খুব জম্‌কালো বহুমূল্য পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, ডার্মুথের কৌন্‌টেস্ সমস্ত সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। উৎসবসজ্জার ন্যায় সুসজ্জিত নগর-গির্জা-গুলি পরিদর্শন করিলেন। কিন্তু সংসারের এই সমস্ত আড়ম্বর দেখিয়া তিনি তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—তিনি বিনা-পরিতাপে মঠের ভজনালয়ে আবার ফিরিয়া আসিলেন এবং সুপবিত্র বেদী-স্থানের প্রবেশপথে তাঁহার জন্য যে 'প্রার্থনা-ডেস্‌কো' প্রস্তুত হইয়াছিল, সেইখানে আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বামপার্শ্বে তাঁহার ধর্ম্ম-মাতা উপবিষ্ট হইলেন।

তখন কৌন্‌টেস্ দেখিলেন, সঙ্গীতের স্থানে অনেক মঠ-সন্ন্যাসিনী সমবেত হইয়াছেন। আরো দেখিলেন, দুটি 'ক্রুশ'—যাহার মধ্যে একটি অবগুণ্ঠনে আবৃত; কতকগুলি মোমবাতি—যাহা 'স্মৃতি-ভোজ' (communion) অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত; একটা প্যাঁট্রা—যাহাতে সন্ন্যাসিনীর পরিচ্ছদ রক্ষিত; একটি কাঁটার মুকুট; একটি রূপার চিলিমচা; একখানি কাঁচি—যাহা-দিয়া পরে তাঁহার সুন্দর কেশগুচ্ছ কাটিয়া ফেলিতে হইবে;—এই সকল সামগ্রী সেইখানে স্থাপিত হইয়াছে।

দীক্ষার্থিনীর সম্মুখে একটি বাতির ঝাড় রক্ষিত, তাহাতে একটি বাতি জ্বলিতেছে। 'খৃষ্টদেহ-স্মৃতিভোজ'-সংক্রান্ত উপাসনা (mass) হইতে আরম্ভ করিয়া 'নৈবেদ্য-উৎসর্গ-বন্দনা' (offeratory) পর্য্যন্ত এই বাতিটি জ্বলিবার কথা। একটু পরে, দীক্ষার্থিনী একাকিনী উঠিয়া পুরোহিতের হস্তে তাঁহার দেয় নৈবেদ্য অর্পণ করিলেন।

'মাস্'-উপাসনা শেষ হইলে, ক্যাথেরাইন্ স্বীয় ধর্ম্মমাতার সহিত বেদী-স্থানের (sanctorium) গরাদিয়ার নিকট ধীরে-ধীরে অগ্রসর হইলেন। মঠধারিণী মাতাজিও স্বীয় সহকারিণীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেইখানে আগমন করিলেন।

কৌন্‌টেস্ নতজানু হইয়া বসিলেন। মঠধারিণী মাতাজি দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাকে বলিলেন:—"বৎসে, তুমি কি চাও?"

ক্যাথেরাইন্ দৃঢ়স্বরে উত্তর করিলেন:—"আমি ঈশ্বরের কৃপা চাই; আপনার মঠে দীক্ষিত হ'তে চাই; এবং আপনি যে সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিনী, সেই সন্ন্যাসিনীর বেশ পরিধান করবার অনুমতি চাই।" মঠধারিণী আবার বলিলেন:—"বিশুখৃষ্টের যুগ-কাষ্ঠ চিরকাল বহন করবে বলে' কি তুমি দৃঢ়-সঙ্কল্প হয়েছ?"

—"হাঁ মাতাজি।"

—"ধর্ম্মজীবনের কঠোর-ব্রতাদি-সাধনের বল কি তোমার আছে?"

"হাঁ মাতাজি, আমি ভরসা করি,

ঈশ্বরের প্রসাদে এবং আপনাদের প্রার্থনার বলে আমার পক্ষে কিছুই দুষ্কর হবে না।"

——"বৎসে, ঈশ্বরের প্রসাদ তোমার উপর বর্ষিত হোক্, তুমি যেন অবশেষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ কর্‌তে পার, ঈশ্বরের কাছে আমার এই আন্তরিক প্রার্থনা।"

কতকগুলি অনুষ্ঠানের পর, দীক্ষার্থিনী মঠের দ্বার দিয়া মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইলেন। মঠের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্ব্বে, মঠের প্রথা-অনুসারে, তাঁহার কোন নিকটতম আত্মীয়কে তিনি আলিঙ্গন করিতে পারিলেন না। কেন না, তাঁহার কোন আত্মীয় ছিল না। তিনি পশ্চাতে একবার ফিরিয়াও দেখিলেন না।

একটু পরেই, তিনি মাতাজির পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। মাতাজির সহকারিণীগণ তাঁহার লৌকিক বসন খুলিয়া লইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে একটি লম্বা জামা, একটি কালো 'গাউন', বক্ষ-পৃষ্ঠের একটি আচ্ছাদন-বস্ত্র এবং একটি জপমালা তাঁহাকে প্রদান করিল। তাঁহার দীর্ঘ-চিক্কণ কেশ-গুচ্ছ তখনও তাঁহার স্কন্ধের দুই দিকে বিভক্ত হইয়া বিলম্বিত ছিল; কিন্তু মঠধারিণী মাতাজি তাহা ছেদন করিতে তিলার্দ্ধ বিলম্ব করিলেন না। ছেদন করিয়াই একজন সন্ন্যাসিনীকে উহা পুড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন। তাহার পর, একটি শিরোবন্ধনের ফিতা, একটি সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন, একটি কণ্টকময় কুসুম-কিরীট দীক্ষিতাকে প্রদান করিলেন। যে তিনদিন তাঁহাকে বিজন-বাসে থাকিতে হইবে, সেই তিনদিন এই কাঁটার মুকুটটি তাঁহার মাথা হইতে খুলিতে পারিবেন না।

এইরূপ সাজে সজ্জিত হইয়া, তাঁহার ব্রত-প্রতিজ্ঞা পষ্ট-পষ্ট করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গম্ভীর-ভাবে পাঠ করিলেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তাঁহার লৌকিক নাম 'ক্যাথেরাইনে'র পরিবর্ত্তে, 'মারী থেরেস্' এই নামে তাঁহার নামকরণ হইল, ঠিক সেই সময়ে একটা বিষম দুর্দ্দৈব উপস্থিত হইয়া অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত জন্মাইল। একজন বিদেশী ব্যক্তি—যে কিছুকাল হইতে "ইংরেজ" এই নামে নগরবাসীদিগের নিকট পরিচিত ছিল—সে সহসা একটা বিকট চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

পার্শ্ববর্ত্তী ভিন্ন-মঠের সন্ন্যাসীর দল, যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, তাহারা তাড়াতাড়ি আসিয়া ধরাধরি করিয়া তাহাকে তাহাদের মঠে শুশ্রূষার জন্য লইয়া গেল। তাহার সহিত একটি শিশু ছিল, সে-ও সঙ্গে গেল। সেই অবধি তাহার কিংবা সেই শিশুটির কোন সংবাদ পাওয়া গেল না।

৩

এই ভাবে অনেক বৎসর কাটিয়া গেল। একদিন দেখা গেল, একজন সন্ন্যাসিনী পূর্ব্ববর্ণিত মঠের সুরঙ্গ-গহ্বরের মধ্যে একটা প্যাঁচালো সিঁড়ি দিয়া নাবিতেছে।

মঠধারিণীগণ যেখানে কবরস্থ হইয়া থাকেন, সেই কবর-স্থানের শেষ কবরটির দিকে সেই সন্ন্যাসিনী অগ্রসর হইয়া নতজানু হইয়া প্রার্থনা করিতে বসিল। এবং ছোটো-খাটো একটা প্রার্থনা শেষ করিয়াই উচ্চৈঃস্বরে এইরূপ বলিতে লাগিল:—

"হে ঈশ্বর, আমি যদি কোন অন্যায় কাজ করে' থাকি, আমাকে ক্ষমা কর। আর তুমি মাতাজি—পবিত্র জননি—আমার উপকারী বন্ধু—তোমাকে আমি কত ভালবাস্‌তেম, তোমার মৃত্যুতে আমার কি কষ্টই হয়েছিল; এখন যে আমি এসে তোমার শান্তিভঙ্গ কর্‌চি, তার জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবে। কিন্তু সেই গোপনীয় কথাটা আমার বুকের ভিতর বোঝার মত চেপে রয়েছে। আর অল্পদিনের মধ্যেই আমারও শীতল দেহ এই মাটির মধ্যে প্রবেশ করবে। তুমি বেঁচে থাক্‌তে যে গুপ্তকথা সাহস করে' তোমার কাছে বল্‌তে পারি নি, সেই কথা আজ আমি তোমার কবরের সম্মুখে প্রকাশ করতে এসেছি। অনেকদিন ধরে' আমার দুঃখ-কষ্ট বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেম; এখন তা' প্রকাশ করলে আমার বুকের বোঝাটা নেবে যাবে, আর, ঈশ্বরের সম্মুখেও পাপ হ'তে আমি একটু মুক্ত হ'তে পার্‌ব।"

এই মুহূর্ত্তে সন্ন্যাসিনী কি-যেন একটা শব্দ শুনিতে পাইল; তাহার সমস্ত শরীর কম্পিত হইল। ভাল করিয়া শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু আর কিছু শুনিতে না পাইয়া, আশ্বস্ত হইয়া, পরে আবার বলিতে আরম্ভ করিল:—"আমি ব্রুশ্‌বেরি-ডিউকের কন্যা। আমোদ-প্রমোদেই দিন কাটাতেম। যে বায়ু আমি নিশ্বাসে গ্রহণ করতেম, যে আকাশ আমি চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তেম, তাতেই আমার আনন্দ হত; আমি আর কিছু চাইতেম না।......পরে ডার্ম্মুথের কৌণ্ট আমার প্রার্থী হলেন; অবশেষে আমাকে বিবাহ করলেন। তাতে আমার সুখের জীবনে কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘট্‌ল না; কেন না, আমি তাঁকে ভালবেসেছিলেম। তখন আমার কপালে একটুও ভাবনার রেখা পড়ে নি। লোকে আমাকে সুন্দরী বল্‌ত, রূপবতী বল্‌ত; আমার চিকণ চুল পিঠের উপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলিয়ে যেত। এ সব অতি তুচ্ছকথা, সন্দেহ নেই; কিন্তু গত-জীবনের এই ক্ষুদ্র কথাগুলি স্মরণ করলেও একটু সুখ হয়। এই কথাগুলি স্মরণ করে' আমি ৩০বৎসর কাল যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছি, তার বর্ণনা করতে একটু বল পাব।

"একসময়, 'বদান্য-মণ্ডলী' নামে একটি সভা লণ্ডননগরে স্থাপিত হয়। সেই সভার উদ্দেশ্য দুঃখী-কাঙালদের দুঃখ-মোচন। এই উদ্দেশে ধন উৎসর্গ করবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে আহ্বান করা হ'ত। তাই আমিও এই কাজে কিছু সাহায্য করব মনে করলেম। সভায় পাঠিয়ে দেবার জন্য কিছু টাকা আমাদের খাজাঞ্চি জর্জ রবিন্‌সনের হাতে রেখে দিলেম। আর, কতকগুলি দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আমাদের ভাণ্ডারীর জিম্মা করে' দিলেম। মনে করেছিলেম, সেইগুলি বিক্রয় করে' যে টাকা পাওয়া যাবে, সেই টাকা দরিদ্রদের বিতরণ করব।

"তার কিছুদিন পরে, একজন অপরি-চিত ব্যক্তির কাছ থেকে একখানা পত্র পেলেম; তাতে সে লিখেছে, গোপনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করতে চায়। আমি নিতান্ত অবজ্ঞা-ভরে সে পত্রের কোন

উত্তর দিলেম না। তার দুইদিন পরে, আর এক পত্র আমার হাতে এল। পত্র-খানা উদ্ধত আদেশের ভাবে লেখা; আর, তাতে ভয়প্রদর্শনও আছে। শেষে এই কথা লিখেছে :—'তুমি যদি আমার না হও, তাহা হইলে তোমার স্বামীর মরণ নিশ্চয় জানিবে।' এই পত্রখানা পেয়ে আমার অত্যন্ত ভয় হ'ল; কিন্তু পাছে আমার স্বামী উদ্বিগ্ন হন, এইজন্য আমি এই পত্রের কথা তাঁকে কিছুই বল্লেম না।

"সেইদিন রাত্রে আমার জ্বর হ'ল। আমি প্রলাপে গুপ্তহত্যার কথা ক্রমাগত বল্‌তে লাগলেম। তার পরদিন, জ্বরের কিছু উপশম হওয়ায়, মনে কর্‌লেম, একটু বাড়ীর বাহিরে যাই। এই মনে করে' বার-দর্জার চৌকাঠে যেম্‌নি পা দিয়েছি, অম্‌নি কে-যেন এসে আমায় জোর করে' ধর্‌লে, গুঁজি দিয়ে আমার মুখ বন্ধ করে' আমাকে একটা গাড়ির মধ্যে উঠিয়ে নিলে···আমি তখন অন্তঃসত্বা ছিলেম; আমার এই দুর্ব্বল অবস্থাতেই সেই কাপুরুষ জন্-টম্‌সন্ আমাকে হরণ করে' নিয়ে যায়। তখন থেকেই, আমি তাকে সর্ব্বান্তঃ-করণে ঘৃণা কর্‌তেম, ও যার-পর-নাই দুর্বাক্য বলে' তাকে ক্রমাগত ভৎসনা কর্‌তেম। কিন্তু এ সমস্ত ঘৃণা, অবজ্ঞা, ভৎসনা সত্বেও, পূরো দুইমাস সে আমাকে তার কাছে আট্‌কে রেখে দিলে। এই সময়ে আমার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হ'ল। তার নাম রাখ্‌লেম 'হ্যাঁরি'।···"

এই কথা বলিবাই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। তাহার মনে হইল, কে-যেন আবার হ্যাঁরির নাম উচ্চারণ করিল।

—"বোধ হয় আমার কথারই প্রতি-ধ্বনি।" এই বলিয়া, আবার জানু পাতিয়া বসিয়া তাহার নিজ বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল :—"পুত্র ভূমিষ্ঠ হবার পর, আমি যেই স্নেহভরে তার মুখচুম্বন কর্‌ব, অম্‌নি আবার সেই হতভাগা নরাধম এসে আমার কোলের শিশুটিকে কোল থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। জোর করে' নিয়ে যাবার দরুণ, বাছার ছোটছোট হাতদুটি থেকে সে সময়ে ঝর্‌ঝর্ করে' রক্ত পড়েছিল।

"হা ভগবান্! সেইদিন থেকে আমি কত কষ্টই পেয়েছি। কেঁদে-কেঁদে আমার চোখের জল যেন ফুরিয়ে গিয়েছিল। বাছাটি যখন বহুদূর চলে গেছে, তখনও আমি সেই প্রসব-শয্যায় শুয়ে-শুয়ে, 'হ্যাঁরি' 'হ্যাঁরি' বলে' ক্রমাগত ডেকেচি।"

সেই সময়ে একটা পদশব্দ শুনিতে পাওয়ায় সন্ন্যাসিনী সহসা পিছন ফিরিয়া দেখিল—এক জন পুরুষ-সন্ন্যাসী তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

একটি প্রদীপ কবরের উপর জ্বলিতে-ছিল; সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোকে আগন্তুক দেখিল, সন্ন্যাসিনীর মুখমণ্ডল অশ্রুজলে প্লাবিত।

সন্ন্যাসিনী বলিয়া উঠিল :—"কে তুমি? যে গোপনীয় কথা আমি আর কারও নিকটে বলি নি—যা' শুধু এই কবরের কাছে বিশ্বাস করে' বল্‌ছিলেম, তা'ই আমার অজ্ঞাতে শোন্‌বার জন্য তুমি কি এখানে এসেছ?"

—"আমি একজন অযোগ্য সামান্ত সন্ন্যাসি-ভ্রাতা। তোমাদের একজন সন্ন্যাসিনী ভগিনী পীড়িত হওয়ায়, তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য এই সুরঙ্গ-পথ দিয়ে তোমাদের মঠে আমি এসেছিলেম। তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমি এই গহ্বরে এসেছি ·· তোমার সমস্ত কথাও আমি শুনেছি, আমাকে ক্ষমা করবে। যেমন বল্‌ছিলে বলে' যাও, কিছুমাত্র সঙ্কোচ কোরো না।"

সন্ন্যাসিনী মুহূর্ত্তের জন্য একটু ইতস্তত করিয়া, পরে আবার কথা আরম্ভ করিল :—

"আমার গুপ্তকথা (Confession) শোন্‌বার জন্য নিশ্চয় স্বয়ং ঈশ্বর তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। বোধ হয়, ঈশ্বরের এই ইচ্ছা যে, এই কবর-স্থানে, আমার জ্বালা-যন্ত্রণা ও ছলনার কথা তোমার কাছে আমি প্রকাশ করে' বলি। আচ্ছা, শোনো তবে সন্ন্যাসি-ভাই!

"শরীরে একটু বল পেয়েই আমি লণ্ডনে ফিরে গেলেম। যেদিন আমাকে হরণ করে' নিয়ে গিয়েছিল, সেই দিনই আমার স্বামী কৌণ্ট ডার্মুথের বিষযোগে মৃত্যু হয়। খাজাঞ্চি জর্জ-রবিন্‌সন্ ও ভাণ্ডারী জন্-টমসন পঞ্চাশলক্ষ টাকা নিয়ে পলায়ন করে। পরে জর্জ ধৃত হয়, ও বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। যদিও সে নিজমুখে স্বীকার করে যে, এই চুরীর কাজে ও কৌণ্টের গুপ্তহত্যায় তাহারও কতকটা হাত ছিল, তবু লোকে বলাবলি কর্‌তে লাগল, আমিই আমার স্বামীকে হত্যা করেছি। ······ লণ্ডন তাই আমার পক্ষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল; তা ছাড়া, আমি খবর পেলেম, সেই হতভাগা জন্-টম্‌সন্ য়ুরোপের মহাদেশে পালিয়ে রয়েছে। আমি বিষয়কর্ম্মের একটা বন্দোবস্ত করে' দিয়েই, যত শীঘ্র পারি, ইংলণ্ড থেকে চলে যাব স্থির কর্‌লেম। কেন না, ইংলণ্ডে যতদিন থাক্‌ব, আমার সেই কষ্টযন্ত্রণার কথাই ক্রমাগত মনে পড়্‌বে।

"অনেক কাল ধরে', আমি সমস্ত ফ্রান্‌স্-ময় ঘুরে বেড়ালেম। যে হতভাগা, আমার বাছাটিকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায়, আমি তার অনেক সন্ধান কর্‌লেম। অবশেষে হতাশ হয়ে, এই টুলুজ্-নগরের মঠে এসে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌লেম। যদি এখানে থেকেও একটু শান্তি পাই—আমার এখন এই একমাত্র আশা।

"একটা বিষয়ের জন্য আমার অত্যন্ত অনুতাপ হয়—মনে মনে আপনাকে আপনি ধিক্কার দি। যাঁকে আমি ভালবাস্‌তেম—যিনি আমার স্বামী—কেন আমি তাঁকে সেই জঘন্য পত্রটা দেখাই নি? হায়! যদি দেখাতেম, তা হ'লে হয় তো এই সব দুর্দ্দিশা আমার কিছুই ঘট্‌ত না।

"এই বিজন আশ্রমে, এই বাক্‌সোটি এখন আমার একমাত্র সম্বল; যাঁর এই কবর দেখ্‌ছ, তাঁর হাতেই আমি এই বাক্‌সোটি পূর্ব্বে গচ্ছিত রেখেছিলেম; তার পর, তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে, তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেন। কৌণ্ট ডার্মুথের বিষয়-সম্পত্তিতে আমার পুত্রের যে স্বত্বাধিকার আছে, তারই দলিলপত্র এই বাক্‌সোটির মধ্যে রক্ষিত। আর, যখন আমার আর

কোন আশা-ভরসা ছিল না, আমার পুত্রটি আর বেঁচে নেই বলে' যখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, তখনি আমি পূজনীয়া মাতাজির কাছে এই বাক্সোটি লুকিয়ে রাখি। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, আমাকে সুপরামর্শ দিতেন···এখন এই নাও, তোমাকে আমি সেই বাক্সোটি দিচ্চি; কেন না, বেশ বুঝ্‌তে পার্‌চি, তোমাকে ঈশ্বরই আমার কাছে পাঠিয়েছেন। তোমার হাতেই তাই এটি বিশ্বাস করে' দিলেম। হয় তো তুমি কৃতকার্য্য হ'তে পার্‌বে;—যার জন্য আমি কেঁদে-কেঁদে বেড়াচ্চি, হয় তো তুমি তাকে সন্ধান করে' বের কর্‌তে পার্‌বে।"

ঠিক্ এই সময়ে, একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী, সেই যুবক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনী—এই দুই-জনের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভয়ে দুইজনই কাঁপিতে লাগিল।

ইনি সন্ন্যাসি-বাবা 'জাঁ'। জাঁ গভীর কণ্ঠস্বরে বিড়্‌বিড়্ করিয়া বলিলেন:—"এখানে কি কর্‌চ সন্ন্যাসি-ভাই? আর তুমি ভগিনি, এত স্থান থাক্‌তে বেছে-বেছে এই সুরঙ্গ-গহ্বরে স্তুতিপাঠের জন্য কেন এসেছ বল দিকি?" এই শেষ কথা-গুলি বলিবার সময়, বিদ্রূপের একটু হাসি যেন তার মুখে দেখা দিয়াছিল।

সন্ন্যাসিনী বিনীতভাবে উত্তর করি-লেন:—"সন্ন্যাসি-বাবা, আমার কথা না শুনেই আমাকে অপরাধী কর্‌বেন না। আমাকে অবশ্য আপনি চেনেন না। কেন না, এই মঠে যখন আমি প্রথম প্রবেশ করি, তখন থেকেই আমি এখানে একলা থাক্‌বার অনুমতি পাই। আমার দৈনিক কর্ত্তব্য শেষ করে', আমার নির্দ্দিষ্ট কোটরটির মধ্যে একলা থাক্‌তে আমার ভাল লাগে। আমার যে-স্বামীকে গুপ্তহত্যা করেছে, আমার যে-পুত্রটিকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে, সেই দুজনের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করাই আমার এখন একমাত্র সুখ ও সান্ত্বনা।

"আমাদের সেই মাতাজিকে হারিয়ে অবধি, এতদিনের পর আজ আমি তাঁর কবরের সম্মুখে আমার দুঃখ নিবেদন কর্‌তে এসেছি...সন্ন্যাসি-বাবা, আমার উপর কোন কু-সন্দেহ কর্‌বেন না! আমি সন্ন্যাসি-ভগিনী 'মারী থেরেশ'।"

সন্ন্যাসি-বাবা বলিয়া উঠিলেন:—"কি! তুমি মারী-থেরেশ?"

তাহার চোখে বিদ্যুৎ ছুটিল; তাঁহার সমস্ত শরীরে 'খেঁচুনী'-রোগের ন্যায় কম্প উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসিনীকে তিনি মনোযোগ-সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগি-লেন। পরে, সহসা উত্তেজিত হইয়া, তাহার হস্ত সজোরে ধরিয়া বলিতে লাগলেন:—"তুমি 'কেটি'? (ক্যাথেরাইন্-নামের অপভ্রংশ) সেই তুমি, যাকে আমি এত ভালবাস্‌তেম? তুমি আমাকে কাপুরুষ বলে', হতভাগা বলে', নরাধম বলে' কতই-না ঘৃণা করেছ, তবু তোমাকে আমি ভাল-বেসেচি। দুই বৎসর ধরে' তোমাকে আমি সমস্ত দেশময় খুঁজে বেড়িয়েচি। অবশেষে, যে সময়ে তুমি সন্ন্যাসব্রতের প্রতিজ্ঞা পাঠ কর্‌ছিলে, সেই সময়ে তোমাকে আমি দেখ্‌তে পেলেম···কিন্তু যে সময়ে তোমাকে

পাবার জন্য আমি উন্মত্ত হয়েছিলেম, আমার প্রতি তোমার সেইসময়কার অবজ্ঞা, ঘৃণা, ভর্ৎসনা বই, আমার মনে, তোমার সম্বন্ধে আর কোন স্মৃতি নেই। যে রমণী তার প্রেমোন্মত্ত নায়কের মর্ম্মে এইরূপ আঘাত দেয়, তারও মর্ম্ম-ক্ষত যতক্ষণ না সে দেখ্‌তে পায়, ততক্ষণ সে কিছুতেই তৃপ্ত হয় না, তার উন্মত্ততার উপশম হয় না। তাই আমি প্রতিশোধের জন্য তৃষিত। যে শিশুর মুখশ্রীতে তোমারই সৌন্দর্য্যের ছায়া প্রতিবিম্বিত, সেই শিশুর জন্য তোমায় পরিতাপ কর্‌তে হবে, ক্রন্দন কর্‌তে হবে,—এই কথা মনে করে' আমার যে কি সুখ হয়েছিল, তা যদি জান্‌তে! সেই শিশুটির উপর আমার যে একেবারেই ভালবাসা ছিল না, তা নয় কিন্তু তবুও তার জন্য কতকগুলি কষ্টের সৃষ্টি কর্‌তে আমার কেমন একটা দারুণ ইচ্ছে হয়েছিল। মঠের সন্ন্যাসব্রতে প্রথমে তার রুচি জন্মিয়ে দিলেম, কিন্তু তাকে কিছুতেই ব্রতের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর্‌তে দিলেম না। কেন না, সে যখন আবার সংসারে ফিরে যাবে—ফিরে গিয়ে যখন তার নিজের পদমর্য্যাদা জান্‌তে পার্‌বে, তার পিতৃহন্তাকে জান্‌তে পার্‌বে, তখন সে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট পাবে। তাকে যে কষ্ট দেবার ইচ্ছে হয়েছিল, সে কেবল তোমারই শরীরের অংশ মনে করে'; তোমারই মুখশ্রী তাতে দেখ্‌তে পেতেম বলে'।"

এই কথা বলিয়া বাবা-জাঁ তার হাত ধরিয়া সবেগে একটা ঝাঁকানি দিল। সন্ন্যাসিনী জাঁর কথা শুনিয়া এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। বাবা জাঁ আবার আরম্ভ করিলেন:—"তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, তুমি যখন সন্ন্যাসিনীর অবগুণ্ঠন গ্রহণ কর্‌লে, একজন আগন্তুক একটা চীৎকার করে' উঠে' সেই অনুষ্ঠানের ব্যাঘাত করে?

......"তুমি বোধ হয় দেখেছিলে, সেই আগন্তুকের সঙ্গে একটি শিশু ছিল; সেই শিশুই তোমার পুত্র। আর, আমি তোমাকে পূর্ব্বেই বলেছি, কৃতকটা তার উপর দিয়েই আমার প্রতিশোধতৃষ্ণার নিবৃত্তি করেছি। তোমাকে পাবার জন্যই আমি চৌর্য্যবৃত্তি করেছি—গুপ্তহত্যা পর্য্যন্ত করেছি; আর তোমার ঘৃণার প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি পাষাণ-হৃদয় হয়েছি—নিষ্ঠুর পিশাচ হয়েছি।"

পূর্ব্বাগত সন্ন্যাসী যুবকটি এতক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিল; বাবা-জাঁ সহসা তাহার হাত ধরিয়া সন্ন্যাসিনীর চক্ষের সম্মুখে তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিল এবং এই কথা বলিল:—"এর হাতের এই ক্ষতচিহ্নটি একবার দেখ...তুমি অবশ্যই চিন্‌তে পার্‌বে। কেন না, এই চিহ্নটি যে তোমাকে দেখাচ্চে, সে আর কেউ না, সে স্বয়ং জন্ টম্‌সন্।"

দুইটি নাম এক্ষণে সেই সুরঙ্গ-গহ্বরে প্রতিধ্বনিত হইল—হাঁরি, জন্-টম্‌সন্! ক্যাথেরাইন্ নিজ মনের আবেগ দমন করিবার জন্য একটু চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। দুর্ব্বল কণ্ঠস্বরে সে বলিয়া উঠিল:—"জন্-টম্‌সন্! তুই শিশুর পিতাকে হত্যা করেছিস্, তুই শিশুর জননীকে অবমানিত করেছিস্, আর ত্রিশ বৎসরেরও অধিক আমার বাছাটিকে কষ্ট দিয়েছিস্...তোর

সর্ব্বনাশ হোক্!—তোর সর্ব্বনাশ হোক্!—তোর সর্ব্বনাশ হোক্!"

এই কথা বলিয়া, সন্ন্যাসিনী হাঁরির উপর ঝাঁপাইয়া-পড়িয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিতে গিয়া দেখে,—হাঁরি এদিকে মুহূর্ত্তের মধ্যে নিজ পরিচ্ছদের বন্ধনরজ্জু নিঃশব্দে কোমর হইতে খুলিয়া বাবা-জাঁর গলায় জড়াইয়া সবেগে ও সজোরে টান দিতেছে। একটু পরেই সে ক্ষান্ত হইল। হতভাগ্য জাঁর মৃতদেহ ভূতলে গড়াইয়া পড়িল।

ক্যাথেরাইন্ নতজানু হইয়া তার পুত্রকে জড়াইয়া ধরিল; তার হৃদয়দেশ বিষম বেগে স্পন্দিত হইতেছিল। হাঁরি মাতাকে হাত ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইল; মাতা পুত্রের মুখচুম্বন করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; শুধু এই কয়েকটি কথা কোনও প্রকারে বলিতে সমর্থ হইল:—"বিদায়, বাছাটি আমার।" এই কথা বলিয়াই তার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত হইল। হাঁরি আবেগ-ভরে মৃত মাতার গলা জড়াইয়া-ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সেই হত্যাকারী জন্-টম্‌সনের নিদারুণ কথাগুলি কি কুক্ষণেই ফলিয়া গেল। সে বলিয়াছিল:—"আর তুই তোর পুত্রকে দেখতে পাবি নে, যদি আবার কখন দেখা হয়, তখন তার মুখচুম্বন করতে তুই কিছুতেই পার্‌বি নে।"

তাহার পরদিন, সন্ন্যাসিনীদিগের সেই কবর-স্থানে, একটি সদ্যোনির্ম্মিত সমাধি-স্তম্ভের উপর এই স্মৃতিলিপিটি খোদিত হইল:—

এইখানে কবরস্থ
ভগিনী মারী-থেরেস্ সন্ন্যাসিনী—
বয়ঃক্রম ৫৫বৎসর দুইমাস
এবং
সন্ন্যাসজীবনের কাল, ৩১বৎসর
৮দিন।
শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বরেন্দ্রভূমির প্রাচীন বিবরণ।

বঙ্গদেশে বরেন্দ্রভূমি অতি প্রাচীন স্থান। এই স্থানকে মহাদ্রি হিমালয়ের পাদদেশে সংস্থাপিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। হিমালয়সান্নিধ্যে কোচরাজ্যই উত্তরসীমা, পূর্ব্বসীমা করতোয়া-নদী, দক্ষিণে পদ্মা-নদী, পশ্চিমসীমা গঙ্গা ও মিথিলারাজ্য। ফেরিস্তা ও আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে পূর্ব্বসীমা ব্রহ্মপুত্র-নদ ও পশ্চিমসীমা মহানন্দা-নদী, এইরূপ নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু অতি প্রাচীনকালে পূর্ব্বসীমায় করতোয়া-নদী থাকাই সঙ্গত বোধ হয়। কারণ করতোয়ার পূর্ব্বভাগ তাদৃশ প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয় না।

অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি নামগুলি প্রাচীন সময় হইতেই যেরূপ বিস্তৃতভাবে

ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, বরেন্দ্র-নাম তাদৃশ বিস্তৃতভাবে ব্যবহৃত হয় নাই। অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি নাম পুরাণ ও তন্ত্রে দৃষ্ট হয়। কথিত আছে যে, চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম নামে পাঁচটি ক্ষেত্রজ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পিত্রাদেশে ইঁহারা যে যে স্থানে রাজত্ববিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নামানুসারেই সেই সকল স্থানের নামকরণ হয়। উক্ত পুণ্ড্র নামক ভূপাল বরেন্দ্রভূমিতে রাজত্ব স্থাপন করায় এই দেশের নাম পৌণ্ড্রদেশ হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বরেন্দ্রশূর * ও প্রদ্যুম্নশূর দুই ভ্রাতা। বরেন্দ্রশূর এদেশে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং এই বরেন্দ্রশূর ভূপালের নাম হইতেই এদেশের নাম বরেন্দ্রভূমি হইয়াছে। প্রদ্যুম্নশূরের নির্ম্মিত মন্দির বরেন্দ্রভূমিতে থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বরেন্দ্রশূর-নৃপতি-কর্তৃক এদেশ "বরেন্দ্র"-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকিলে, "বরেন্দ্র"-নামকরণ বহু প্রাচীন নহে।

সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ জেনারল কানিংহাম-সাহেব বলেন যে, তারানাথের বাক্যে বিশ্বাসস্থাপন করিলে পালবংশীয় বৌদ্ধ-নরপতি গোপালের পুত্র দেবপালকর্তৃক বরেন্দ্রভূমি অধিকৃত হওয়া প্রমাণিত হয়। কিন্তু তখনও পালবংশীয় ভূপালগণ বরেন্দ্র-ভূমির রাজা বলিয়া পরিচিত হন নাই। প্রকৃতপক্ষেও, বৌদ্ধ নরপালগণ পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের রাজা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। তজ্জন্যই উক্ত জেনারল মহোদয় অনুমান করেন যে, "বরেন্দ্র"নাম বারভূঞা হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। †

সুপ্রসিদ্ধ জেনারল মহোদয়ের বারভূঞা-সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। জেলা বগুড়ার নিকটবর্ত্তী মহাস্থান-গড়ের নিকট পৌষ-নারায়ণীযোগে স্নানের জন্য ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে লোকের সমাগম হয়। একদা

* বারেন্দ্রকুলাচার্য্য গ্রন্থে লিখিত আছে—

প্রদ্যুম্নশ্চ বরেন্দ্রশ্চ দ্বৌ সুতৌ নিভুজস্য চ।
প্রদ্যুম্নো যোগমার্গে চ বরেন্দ্রো রাজশাসনে॥

ইঁহাদিগের মতে আদিশূর, তৎপুত্র ভূশূর, তৎপুত্র ক্ষিতিশূর, তৎপুত্র ধরাশূর। ধরাশূরের পুত্র প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর। তাঁহার পর অনুশূর। তৎপরে বিজয়সেন ও বল্লালসেন।

† As for the name of the Barendra the people have no derivation of the kind. * * The old name of the county was certainly Paundradesh. * * * The name of the Barendra may be connected to the establishment of the twelve chiefships of "Bara Bhuihars." * * * That the common tradition of the county is that twelve persons of very high distinction and mostly named Pal, came from the west and settled at "Mahastan. মহাস্থান জেলা বগুড়ার নিকটবর্ত্তী এবং করতোয়া-তীরে অবস্থিত।

The first notice of Barendra that I have been able to find is in Taranatha's accounts of Pal Kings. To Gopal the first king he assigns the conquest of Behar and Magadha and to his son Deva Pala, the subjugation of Barendra and Orrissa. * * * The name is never mentioned in any of the inscriptions, the kings being only called the Lord of Gauda nd Paundradesh. This omission, is, I think rather favourable to my suggestion of its abeing a popular name from the Barabhuir chiefs.

দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় রাজা ওই যোগে স্নান করিতে আইসেন। কিন্তু পথিমধ্যেই যোগের সময় অতিবাহিত হইয়া যায় বলিয়া, তাঁহারা উহার পুনরাবৃত্তিকাল পর্য্যন্ত করতোয়ার * নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বাস করেন। প্রতি দ্বাদশবর্ষের পর এই পৌষনারায়ণীযোগ উপস্থিত হয়। পদ্মপুরাণ প্রভৃতিতে এই যোগের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

উক্ত জনপ্রবাদের দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় নরপালের বসতিহেতু নামকরণ হইলে এই প্রদেশের নাম বরেন্দ্র না হইয়া বারেন্দ্র হইতেছে। বরেন্দ্রখণ্ডের পালবংশীয় নরেশ্বরগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। প্রবাদ সত্য হইলে উক্ত দ্বাদশজন ক্ষত্রিয় নরপতি বৌদ্ধ নহেন। কেন না, তাঁহারা পৌষনারায়ণীযোগে স্নানার্থ এদেশে আগমন করেন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপালগণের বাহুবলে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী নরপালবর্গ বিতাড়িত হইবার বহুপূর্ব্বে সূর্য্যবংশীয় গৌড় ভূপাল, চন্দ্রবংশীয় পৌণ্ড্র ও কাম্বোজবংশীয় নৃপালগণের রাজত্ব করিবার বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সকল কারণে ঐ জনপ্রবাদের উপর আস্থাস্থাপন করা যাইতে পারে না।

প্রকৃতপক্ষেও বরেন্দ্রনাম সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় অধিকতররূপে প্রচলিত হয়, এইরূপ অনুমান করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, বল্লালসেন সদাচারসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের বাসের জন্য এই খণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার 'বরেন্দ্র' এই নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু এই অনুমানও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

এই প্রদেশের প্রাচীন স্থানসমূহের মৃত্তিকা "বরীণ" নামে অভিহিত হয়। বরীণ-শব্দ ভূমির শ্রেষ্ঠতা ও বর্ণবিশেষ প্রতিপাদনের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। পুরাকালে এই প্রদেশের ভূমিতে উৎকৃষ্ট রেশমের উপকরণ তুঁত এবং ধান্য, যব, গোধুম ও ইক্ষু প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। এই রেশমের জন্য চীন প্রভৃতি নানা জাতি এ দেশে আগমন করিত। সুতরাং ভূমির শ্রেষ্ঠতাবোধক বরীণ হইতে এই প্রদেশ বরেন্দ্র-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, ইহাই নির্দ্দেশ করা সঙ্গত।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, একদা পৌণ্ড্রনামক ভূপাল এ প্রদেশে রাজত্ব স্থাপন করেন বলিয়া ইহার নাম পৌণ্ড্র হইয়াছিল। পদ্মপুরাণের উত্তরপৌণ্ড্রীয় সূতসনকসংবাদে লিখিত হইয়াছে–

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুব্রতঃ শুদ্ধঃ সদাচারবিধায়কঃ।
পৌণ্ড্রকোটিশিলাদ্বীপে মহাপুণ্যেতি বিশ্রুতঃ॥"

উত্তরকালে এই পৌণ্ড্রখণ্ড ও শিলাদ্বীপের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ বরেন্দ্রনামে অভিহিত হইয়াছে। উক্ত পুরাণে করতোয়াতটস্থ যে স্থানকে পৌষনারায়ণীযোগের একমাত্র পবিত্র স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা বগুড়া-জেলার নিকটবর্ত্তী "মহাস্থান" নামে প্রসিদ্ধ আছে।

পুরাকালে ক্ষত্রিয়বংশজ রাজা মান্ধাতার দৌহিত্র গৌড়নামধেয় এক মহাবলপরাক্রান্ত

* হরগৌরীর বিবাহকালে করতল হইতে পতিত তোয়। স্মার্ত্তগণ শ্রাবণমাসে নদীদিগকে রজস্বলা বলেন। "অপাদৌ কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা। সর্ব্বা রক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী॥"

ভূপাল এদেশে রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গৌড়নগর সংস্থাপন করেন। তজ্জন্য একদা এদেশ গৌড়রাজ্য নামে কথিত হইত। সুবিখ্যাত গ্রীক্ টলেমীর কথিত Gangia regea নামক মহাজনপদ ও গৌড়নগর একই স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলে, খৃষ্টের ৭৩০ বৎসর পূর্ব্বে গৌড়নামক মহাজনপদের অস্তিত্ব উপলব্ধ হয়। বৌদ্ধ পরিব্রাজক হিয়ংসং গৌড়নগরের নামোল্লেখ করেন নাই। তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন হইয়া কামরূপ যাত্রা করেন। সম্ভবত তৎকালে গৌড়নগর শ্রীহীন, সম্পন্ন হইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে প্রসিদ্ধ ও প্রধান জনপদে পরিণত হইয়াছিল। পরিব্রাজকের বর্ণনানুসারে রাজমহলের পূর্ব্বদিকে ১০০শত মাইল দূরে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। সুতরাং উহা বরেন্দ্রভূমিরই মধ্যগত এবং বরেন্দ্রখণ্ড এক এক সময়ে এক এক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

বর্ত্তমান প্রস্তাবে বরেন্দ্রভূমির কতিপয় প্রাচীন বৃত্তান্তের বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। প্রাচীন প্রসিদ্ধ স্থানসমূহে যে সকল কীর্ত্তি-কলাপের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান থাকিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান রাজত্বের প্রাধান্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনের বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

প্রয়াণ।

চাহিয়া ও মুখপানে দুখনিশি-অবসানে
উঠিয়াছি জাগি'
হৃদয়ের তন্ত্রীরাজি ঝঙ্কারে উঠেছে বাজি'
দরশন লাগি'।
নূতন আনন্দলোক ডুবায়েছে সব শোক
তব প্রেমমাঝে,
দূরে তুমি ধ্রুবতারা হেথা আমি লক্ষ্যহারা
ছিনু মিছাকাজে।
অন্ধকারে চির দীন এ হৃদয় অর্থহীন
ছিল একাকার।
আজি দিভি তব দেখা প্রথম আলোকরেখা
ফুটিল তাহার।

ওই মুখে চাহি' চাহি' দীর্ঘ এ জীবন বাহি'
করিব ভ্রমণ।
বাড়িবে গৌরবদীপ্তি বিশ্বহৃদে চিরতৃপ্তি
করি বিতরণ।
দিব প্রেম স্বার্থহীন ঈর্ষাদ্বেষ হবে লীন
চির-অন্ধকারে !
সহস্র কিরণ দিয়া সযতনে মুছাইয়া
দিব অশ্রুধারে।
প্রীতির কুসুমরাজি নবীন আলোকে সাজি'
ফুটিয়া উঠিবে।
মধ্যাহ্ন-তপন-সম এ আলো সকল তম
দূর করি দিবে।

তার পরে দিনশেষে বিদায় মাগিব হেসে
দিগন্তের মাঝে।
আপন দুয়ার খুলি গেহ মোরে লবে তুলি
অভিনব সাঁঝে।
হে সুন্দরি ! তুমি আসি বিদায়ের তীরে হাসি'
দিবে না কি দেখা ?
তোমার প্রেমের তরে চির অনুরাগভরে
ঘুরিতেছি একা।
সায়াহ্নের মৃদু ঘোরে বিদায় লইতে মোরে
হবে কি বিফল ?
বিস্মরিয়া হেন প্রীতি তব উদাসীন স্মৃতি
রবে অচঞ্চল ?

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

নৌকাডুবি।

১

রমেশ এবার বি.-এ. এবং আইন পরীক্ষা একসঙ্গেই দিয়াছিল। সে যে পাস্ হইবে, সে-সম্বন্ধে কাহারো কোন সন্দেহ ছিল না। পরীক্ষায় পাস্ হয় নাই, রমেশের জীবনে এমন ঘটনা কখনো ঘটে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী বরাবর তাঁহার স্বর্ণপদ্মের পাপ্‌ড়ি খসাইয়া রমেশকে মেডেল্ দিয়া আসিয়াছেন—স্কলার্‌শিপ্‌ও কখনো ফাঁক যায় নাই।

পরীক্ষা শেষ করিয়া এখন তাহার বাড়ী যাইবার কথা। কিন্তু এখনো তাহার তোরঙ্গ সাজাইবার কোন উৎসাহ দেখা যায় নাই। পিতা শীঘ্র বাড়ী আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছেন। রমেশ উত্তরে লিখিয়াছে, পরীক্ষার ফল বাহির হইলেই সে বাড়ী যাইবে। শিশুকাল হইতে মাতৃহীন রমেশ পিতার আদেশের উপর কখনো দ্বিরুক্তি করে নাই—এবারকার পত্রটা তাহার পক্ষে অভূতপূর্ব্ব।

যাই হোক্, রমেশ তাহার পিতাকে চিনিত। সে মনে মনে বুঝিয়াছিল, তাহাকে শীঘ্রই বাড়ী যাইতে হইবে।

অন্নদাবাবুর ছেলে যোগেন্দ্র রমেশের সহাধ্যায়ী। পাশের বাড়ীতেই সে থাকে। অন্নদাবাবু ব্রাহ্ম। তাঁহার কন্যা হেমনলিনী এবার এফ্.-এ. দিয়াছে। রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ী চা খাইতে এবং চা না খাইতেও প্রায়ই যাইত। যোগেন্দ্রের সহিত বন্ধুত্বই যদি এই যাতায়াতের একমাত্র কারণ হইত, তবে পিতার পত্রের উত্তর না দিয়া রমেশ বাড়ী যাইতে দ্বিধা করিত না।

রমেশ ভাইয়ের সঙ্গেই দেখা করিতে যাইত, কিন্তু ভগ্নীর সঙ্গেও দেখা হইয়া পড়িত —সেরূপস্থলে যোগেন্দ্র কোন কারণে উপস্থিত না থাকিলেও রমেশ অত্যন্ত হতাশ হইত না।

হেমনলিনী স্নানের পর চুল শুকাইতে শুকাইতে ছাদে বেড়াইয়া পড়া মুখস্থ করিত। রমেশও সেই সময়ে বাসার নির্জ্জন ছাদে চিলকোঠার একপাশে বই লইয়া বসিত। অধ্যয়নের পক্ষে এরূপ স্থান অনুকূল বটে, কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠকদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, ব্যাঘাতও যথেষ্ট ছিল।

এ-পর্য্যন্ত বিবাহসম্বন্ধে কোন পক্ষ হইতে কোন প্রস্তাব হয় নাই। অন্নদাবাবুর দিক্ হইতে না হইবার একটু কারণ ছিল। একটি ছেলে বিলাতে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য গেছে, তাহার প্রতি অন্নদাবাবুর মনে মনে লক্ষ্য আছে। বিলাত যাইবার পূর্ব্বে হেমনলিনীর দিকে ছেলেটি একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাইয়াছিল, সেটুকু শেষপর্য্যন্ত টিঁকিবে কি না, সে সন্দেহ ছিল। এইজন্য অন্নদাবাবু রমেশকে হাতছাড়া করিতে পারেন নাই। রমেশের

কাগজ দুখানিই অন্নদাবাবু হাতে রাখিয়াছিলেন, কোন্‌টিতে হাতের-পাঁচ রক্ষা হইবে, খেলা শেষের দিকে আসিবার পূর্ব্বে তাহা ঠিক বুঝা যাইতেছে না।

রমেশ বুঝিয়াছিল, স্পষ্টকথা না হইলেও সে যেন পণে আবদ্ধ। সাহিত্য পড়িয়া তাহার যতটুকু অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহাতে সে বুঝিয়াছিল, হেমনলিনী তাহার প্রতি বিমুখ নহে। কবি বলেন, শ্রুত রাগিণীর চেয়ে অশ্রুত রাগিণী মিষ্টতর—হেমনলিনীর সম্বন্ধে রমেশের সেই রাগিণীরই চর্চ্চা বেশি করিয়া হইতেছিল। উচ্চারিত প্রতিজ্ঞার চেয়ে অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞার বাঁধন লোক-বিশেষের কাছে দৃঢ়তর—রমেশ সেই ধাতুর লোক।

সেদিন চায়ের টেবিলে খুব একটা তর্ক উঠিয়াছিল। অক্ষয় ছেলেটি বেশি পাস্ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া সে বেচারার চা-পানের এবং অন্যান্য শ্রেণীর তৃষা পাস্-করা ছেলেদের চেয়ে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং হেমনলিনীর চায়ের টেবিলে তাহাকেও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। সে তর্ক তুলিয়াছিল যে, মেয়েদের পাস্-করাটা বিড়ম্বনা। মেয়েদের পক্ষে লজিক্ মুখস্থ করা বৃথা—কারণ, স্বভাবে যাহা নাই, শিখিয়া তাহা হয় না, অন্ধের পক্ষে আলোক অনাবশ্যক। মেয়েরা হাজার পাস্ করুক্, তবু একজন অল্প-পাস্-করা পুরুষ তাহাদিগকে সকল বিষয়েই নির্ভর দিতে পারে। কারণ পুরুষের বুদ্ধি খড়্গের মত, শান বেশি না দিলেও কেবল ভারে অনেক কাজ করিতে পারে; মেয়েদের বুদ্ধি কলমকাটা ছুরির মত, যতই ধার দাও না কেন, তাহাতে কোন বৃহৎ কাজ চলে না—ইত্যাদি। হেমনলিনী অক্ষয়ের এই প্রগল্‌ভতা নীরবে উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিল। কিন্তু স্ত্রীবুদ্ধিকে খাট করিবার পক্ষে তাহার ভাই যোগেন্দ্রও যুক্তি আনয়ন করিল। তখন রমেশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না। সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া স্ত্রীজাতির স্তবগান করিতে আরম্ভ করিল। সে এই কথা বলিল যে, একসময় পৃথিবীতে ম্যাষ্টডন্, ডাইনোসরাস্ প্রভৃতি বিপুলদেহ জন্তুর প্রাদুর্ভাব ছিল, এখন কোমলকায় সূক্ষ্মস্নায়ু মানুষের রাজত্ব। তেম্‌নি সভ্যতার যত উন্নতি হইবে, ততই পুরুষের প্রভাব খর্ব্ব হইয়া স্ত্রীজাতির প্রভাবই বাড়িতে থাকিবে। স্ত্রীলোককে ছোট মনে করা তাহার মতে বর্ব্বরতার লক্ষণ। মানুষের সভ্যতা ক্রমশই নারীপূজার দিকে অগ্রসর হইতেছে।

এইরূপে রমেশ যখন নারীভক্তির উচ্ছ্বসিত উৎসাহে অন্যদিনের চেয়ে দু-পেয়ালা চা বেশি খাইয়া ফেলিয়াছে, এমন-সময় বেহারা তাহার হাতে একটুক্‌রা চিঠি দিল। বহির্ভাগে তাহার পিতার হস্তাক্ষরে তাহার নাম লেখা। চিঠি পড়িয়া তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া রমেশ শশব্যস্তে উঠিয়া পড়িল। সকলে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপারটা কি?" রমেশ কহিল, "বাবা দেশ হইতে আসিয়াছেন।" হেমনলিনী যোগেন্দ্রকে কহিল, "দাদা, রমেশবাবুর বাবাকে এইখানেই ডাকিয়া আন না কেন, এখানে চায়ের সমস্ত প্রস্তুত আছে।"

রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আজ থাক্, আমি যাই।"

রমেশ জানিত, তাহার পিতার চা খাইবার অভ্যাস নাই, অকারণে অভ্যাস করিবার কোন উত্তেজনাও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে।

অক্ষয় মনে মনে খুসি হইয়া বলিয়া লইল, "এখানে খাইতে তাঁহার হয় ত আপত্তি হইতে পারে।"

রমেশের পিতা ব্রজমোহনবাবু রমেশকে কহিলেন, "কাল সকালের গাড়িতেই তোমাকে দেশে যাইতে হইবে।"

রমেশ মাথা চুলকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিশেষ কোন কাজ আছে কি?"

ব্রজমোহন কহিলেন, "এমন-কিছু গুরুতর নহে।"

তবে এত তাগিদ কেন, সেটুকু শুনিবার জন্য রমেশ পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, সে কৌতূহল নিবৃত্তি করা তিনি আবশ্যক বোধ করিলেন না।

ব্রজমোহনবাবু সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার কলিকাতার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করিতে বাহির হইলেন, তখন রমেশ তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে বসিল। 'শ্রীচরণকমলেষু' পর্য্যন্ত লিখিয়া লেখা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। কিন্তু রমেশ মনে মনে কহিল, "আমি হেমনলিনী-সম্বন্ধে যে সত্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, বাবার কাছে আর তাহা গোপন করা কোন-মতেই উচিত হইবে না।" অনেকগুলা চিঠি অনেকরকম করিয়া লিখিল—সমস্তই সে ছিঁড়িয়া ফেলিল।

ব্রজমোহন আহার করিয়া আরামে নিদ্রা দিলেন। রমেশ বাড়ীর ছাদের উপর উঠিয়া প্রতিবেশীর বাড়ীর দিকে তাকাইয়া নিশাচরের মত সবেগে পায়চারি করিতে লাগিল। পুরাকালে যেমন রুক্মিণীহরণ, সুভদ্রাহরণ ঘটিয়াছিল, এখন যদি তেম্‌নি কোন বীরাঙ্গনা-বিশেষ সবলে রমেশহরণ করিত—যদি এই নিশীথে ছাদের উপরে এই চলচিত্ত যুবকটির হাত ধরিয়া কোন মৃণালবাহু তাহাকে পুষ্পক-রথে টানিয়া তুলিত এবং এই তারাখচিত অন্ধকারের মধ্য দিয়া তাহাকে হঠাৎ একটা বিবাহসভার মাঝখানে লইয়া উপস্থিত করিত, তবে সে আপত্তিমাত্র করিত না এবং তাহার চশ্‌মার মধ্য হইতে একবিন্দু অশ্রু কাহারো জন্য বিগলিত হইত না।

পুষ্পকরথ আসিল না—প্রতিবেশিনীর বাড়ীতে কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণমাত্র প্রকাশ পাইল না। রাত্রি নয়টার সময় অক্ষয় অন্নদাবাবুর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল—রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় রাস্তার দিকের দরজা বন্ধ হইল—রাত্রি দশটার সময় অন্নদাবাবুর বসিবার ঘরের আলো নিবিল, রাত্রি সাড়ে দশটার পর সে-বাড়ীর কক্ষে কক্ষে সুগভীর সুষুপ্তি বিরাজ করিতে লাগিল।

পরদিন ভোরের ট্রেনে রমেশকে রওনা হইতে হইল। ব্রজমোহনবাবুর সতর্কতায় গাড়ি ফেল্‌ করিবার কোনই সুযোগ উপস্থিত হইল না।

২

বাড়ী গিয়া রমেশ খবর পাইল, তাহার বিবাহের পাত্রী ও দিন স্থির হইয়াছে। তাহার পিতা ব্রজমোহনের বাল্যবন্ধু ঈশান যখন ওকালতী করিতেন, তখন ব্রজমোহনের অবস্থা ভাল ছিল না—ঈশানের সহায়তাতেই তিনি উন্নতিলাভ করিয়াছেন। সেই ঈশান

যখন অকালে মারা পড়িলেন, তখন দেখা গেল তাঁহার সঞ্চয় কিছুই নাই, দেনা আছে। বিধবা স্ত্রী একটি শিশু কন্যাকে লইয়া দারিদ্র্যের মধ্যে ডুবিয়া পড়িলেন। সেই কন্যাটি আজ বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, ব্রজমোহন তাহারি সঙ্গে রমেশের বিবাহ স্থির করিয়াছেন। রমেশের হিতৈষীরা কেহ কেহ আপত্তি করিয়া বলিয়াছিল যে, শুনিয়াছি মেয়েটি দেখিতে তেমন ভাল নয়। ব্রজমোহন কহিলেন, "ও-সকল কথা আমি ভাল বুঝি না—মানুষ ত ফুল কিংবা প্রজাপতি মাত্র নয় যে, ভাল দেখার বিচারটাই সর্ব্বাগ্রে তুলিতে হইবে! মেয়েটির মা যেমন সতী-সাধ্বী, মেয়েটিও যদি তেম্‌নি হয়, তবে রমেশ যেন তাহাই ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করে!"

শুভবিবাহের জনশ্রুতিতে রমেশের মুখ শুকাইয়া গেল। সে উদাসের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিষ্কৃতিলাভের নানাপ্রকার উপায় চিন্তা করিয়া কোনটাই তাহার সম্ভবপর বোধ হইল না। শেষকালে বহুকষ্টে সঙ্কোচ দূর করিয়া পিতাকে গিয়া কহিল, "বাবা, এ বিবাহ আমার পক্ষে অসাধ্য।"

ব্রজমোহনবাবু মনে মনে আগুন হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "তোমাকে সেজন্য কিছুই ভাবিতে হইবে না, আমি সর্ব্ববিষয়েই সুসাধ্য করিয়া দিব—সে ভার আমার উপরে রহিল।"

রমেশ। আমি অন্যস্থানে পণে আবদ্ধ হইয়াছি।

ব্রজমোহন। বল কি! একেবারে পাণপত্র হইয়া গেছে?

রমেশ। না, ঠিক পাণপত্র নয়, তবে—

ব্রজমোহন। কন্যাপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা সব ঠিক হইয়া গেছে?

রমেশ। না, কথাবার্ত্তা যাহাকে বলে, তাহা হয় নাই—

ব্রজমোহন। হয় নাই ত! তবে এতদিন যখন চুপ করিয়া আছ, তখন আর ক'টা দিন চুপ করিয়া গেলেই হইবে!

রমেশ একটু নীরবে থাকিয়া কহিল, "আর কোন কন্যাকে আমার পত্নীরূপে গ্রহণ করা অন্যায় হইবে।"

ব্রজমোহন কহিলেন, "না করা তোমার পক্ষে আরো বেশি অন্যায় হইতে পারে। কিন্তু তুমি ছেলেমানুষ, তোমার সঙ্গে সে তর্ক কি করিব! ন্যায়-অন্যায়ের বিচারভারও আমার উপরেই থাক্, তুমি অধিক চিন্তা করিয়ো না।"

রমেশ আর কিছু বলিতে পারিল না। সে ভাবিতে লাগিল, "ইতিমধ্যে দৈবক্রমে সমস্ত ফাঁসিয়া যাইতে পারে।" রমেশের কোষ্ঠীপত্রে বিশ্বাস ছিল। সে গ্রামের একজন দৈবজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহস্থানটা কিরূপ দেখিতেছ?" সে কহিল, "যথেষ্ট ব্যাঘাত দেখা যাইতেছে।"

রমেশ কহিল, "বিবাহ যদি না ঘটে, তোমাকে পুরস্কার দিব।"

দৈবজ্ঞ কহিল, "না হইবারই গতিক বটে।"

এইটুকুতেই রমেশ অত্যন্ত সান্ত্বনা অনুভব করিল। তাহার কর্ত্তব্য দৈব সমস্ত করিয়া দিবেন, ইহা সে চোখ বুজিয়া বিশ্বাস করিল এবং বিবাহের আয়োজনসম্বন্ধে কোন কথাটি কহিল না।

রমেশের বিবাহের যে দিন স্থির হইয়াছিল, তাহার পরে একবৎসর অকাল ছিল—সে ভাবিয়াছিল, কোনক্রমে সেই দিনটা পার হইয়া তাহার একবৎসর মেয়াদ বাড়িয়া যাইবে।

কন্যার বাড়ী নদীপথ দিয়া যাইতে হইবে—নিতান্ত কাছে নহে—ছোট-বড় দুটো-তিনটে নদী উত্তীর্ণ হইতে তিনচারদিন লাগিবার কথা। ব্রজমোহন দৈবর জন্য যথেষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া একসপ্তাহ পূর্ব্বে শুভদিনে যাত্রা করিলেন।

যাত্রার পূর্ব্বে রমেশ দৈবজ্ঞকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কই ঠাকুর, তোমার গণনা ফলিল কই ?"

দৈবজ্ঞ কহিল—"শুভকর্ম্মে বাধা না পড়ুক—কিন্তু বাধা পড়িবার সময় এখনো অনেক আছে। কেবল 'শস্তঞ্চ গৃহমাগতং' নহে, বধূর সম্বন্ধেও সেই কথা।"

রমেশ ইহাতেও আরাম পাইল। নৌকা যখন পাল ফুলাইয়া ছুটিল, রমেশ মনে মনে বলিতে লাগিল—"গ্রহ পালের নৌকার আগে-আগে ছুটিতে পারে।"

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সমস্ত পথ কোথাও কোন বিঘ্ন হয় নাই—বরাবর বাতাস অনুকূল ছিল। সিমুলঘাটায় পৌঁছিতে পুরা তিনদিনও লাগিল না। বিবাহের এখনো চারদিন দেরি আছে।

ব্রজমোহনবাবুর দু'চারদিন আগে আসিবারই, ইচ্ছা ছিল। সিমুলঘাটায় তাঁহার বেহান্ দীন অবস্থায় থাকেন। ব্রজমোহনবাবুর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল, ইঁহার বাসস্থান তাঁহাদের স্বগ্রামে উঠাইয়া লইয়া ইঁহাকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখেন ও বন্ধুঋণ শোধ করেন। কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকাতে হঠাৎ সে প্রস্তাব করা সঙ্গত মনে করেন নাই। এবারে বিবাহ উপলক্ষ্যে তাঁহার বেহান্‌কে তিনি বাস উঠাইয়া লইতে রাজি করাইয়াছেন। সংসারে বেহানের একটিমাত্র কন্যা,—তাহার কাছে থাকিয়া মাতৃহীন জামাতার মাতৃস্থান অধিকার করিয়া থাকিবেন, ইহাতে তিনি আপত্তি করিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন, "যে যাহা বলে বলুক্, যেখানে আমার মেয়ে-জামাই থাকিবে, সেখানেই আমার স্থান।"

বিবাহের কিছুদিন আগে আসিয়া ব্রজমোহনবাবু তাঁহার বেহানের ঘরকন্না তুলিয়া লইবার ব্যবস্থা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিবাহের পর সকলে মিলিয়া একসঙ্গে যাত্রা করাই তাঁহার ইচ্ছা। এইজন্য তিনি বাড়ী হইতে আত্মীয় স্ত্রীলোক কয়েকজনকে সঙ্গেই আনিয়াছিলেন।

এইরূপ বন্দোবস্তই সমস্ত হইল। যতই একে একে দিন কাটিতে লাগিল, গ্রহনক্ষত্রের প্রতি রমেশের বিশ্বাস ততই শিথিল হইয়া আসিল। আকাশে এতগুলা জ্যোতিষ্কের কি প্রয়োজন ছিল, যদি তাহারা রমেশের এই অতি সামান্য কাজটুকুর সম্বন্ধেও লিখিত সত্য ভঙ্গ করিল ? আকাশের ঐ অবিশ্বাসী আলোকগুলার চেয়ে যদি ধূলিবিহারী নিজের পা-দুটোর উপর সে বেশি আস্থা স্থাপন করিতে পারিত, তবে একদৌড়ে কোন্‌কালে বিবাহের লগ্ন পার হইয়া যাইত। তবু এখনো সময় আছে। যুগযুগান্তর যে সকল গ্রহতারা জাগিয়া থাকে, তাহাদের কোন তাড়া নাই—তাহারা একমুহূর্ত্তে, এমন কি, শেষ মুহূর্ত্তেও ললাটের

লিখনকে সফল করিতে পারে। এই ভাবিয়া রমেশ নৌকার ছাদে বসিয়া চশ্‌মা আঁটিয়া বই পড়িতে লাগিল। পাড়ার কুতূহলী নারীগণ কলসকক্ষে ঘোম্‌টার ভিতর দিয়া রমেশকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যাইত—তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিত না। কোন অবগুণ্ঠিত দৃষ্টির সহিত তাহার চশ্‌মাবৃত চক্ষুর সংঘাত ঘটে নাই। খোঁটায় বাঁধা গোরু যেমন অদূরে সরস-শ্যামল মটর-কলাইয়ের ক্ষেত থাকা সত্ত্বেও শুক্‌নো খড় চিবাইয়া রোমন্থন করিতে থাকে, তেম্‌নি রমেশ তাহার সমস্ত কৌতূহলকে কেবল ছাপা-বহির শুষ্কপত্রেই অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তীরবর্ত্তী কলালাপপরায়ণ নারীসম্প্রদায়ের দিকে তাহাকে বিক্ষিপ্ত হইতে দেয় নাই। এইরূপে রমেশ আপন খুঁটির প্রতি সম্মানরক্ষা করিল। হেমনলিনীর চা-পান-মণ্ডপে স্থান পাইবার যোগ্যতা সে অতি যত্নে বাঁচাইয়া চলিয়াছিল!

৩

বিবাহের শুভলগ্নকে পৌঁছিয়া দিবার ভার যে গ্রহের উপর ছিল, সে নিজের কর্ত্তব্যে কোন ত্রুটি করিল না। প্রাতঃকালে ঢোল-রসুনচৌকি বাজিয়া গ্রামের কাকগুলাকে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিল। তাহারা চীৎকারশব্দে চিন্তাভার লঘু করিবার চেষ্টা করিল—কিন্তু একটি উচ্চশ্রেণীর দ্বিপদ ছিল, বর্ত্তমানক্ষেত্রে তাহার উদ্বেগ ও আশঙ্কা পক্ষীদের চেয়ে অনেক বেশি হইলেও আকাশময় শব্দ করিয়া বেড়াইবার অবারিত ক্ষমতা ও অসঙ্কুচিত অধিকার তাহার ছিল না। যদি সেই শক্তি থাকিত, তবে সে অস্ত প্রত্যূষে অস্তগামী গ্রহতারকাকে তারস্বরে ধিক্কার দিয়া আকাশ বিদীর্ণ করিয়া দিত।

আজ সন্ধ্যাবেলায় রমেশের উদ্বাহবন্ধন। তাহার পূর্ব্বে যথাস্থানে বিদায়পত্র লিখিবার জন্য সে কাগজকলম লইয়া বসিল। কি লিখিবে, কেমন করিয়া লিখিবে! যে হৃদয় বন্ধনবাক্যের দ্বারা কখনো জড়িত হয় নাই, ভাষা যাহাকে আজো স্পর্শ করে নাই, বাক্যের দ্বারা আজ তাহার গ্রন্থি খুলিবে কি উপায়ে? নীরব নেত্রের যেখানে অধিকার আছে, বাক্যের পক্ষে সেখানে পদার্পণ স্পর্দ্ধামাত্র। রমেশ লিখিল, "দেবি, অপরাধ করিতে চলিলাম! ক্ষমা প্রার্থনা করিবার এবং ক্ষমা আশা করিবার অধিকার আমার নাই। যে দুঃখভার আজ হইতে বহন করিতে উদ্যত হইয়াছি, দণ্ডদাতা বিধাতা তাহা অপেক্ষা গুরুতর অভিশাপ আমাকে দিতে পারেন না। তোমাকে যদি বেদনা দিয়া থাকি, চিরজীবনের বেদনার দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে। এ কথা শুনিয়া তোমার কোন সুখ আছে কি না, জানি না—কিন্তু বলিয়া আমার তৃপ্তি হয় যে, হৃদয়ের যে অংশ তোমাকে উৎসর্গ করিয়াছি, সেখানে কোনদিন আর কেহ পদার্পণ করিবে না।"

এই চিঠি রমেশ অনেক কাটাকুটি করিয়া লিখিয়া বহুযত্নে ভাল কাগজে নকল করিয়া খামে পুরিয়া হেমনলিনীর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া গালা দিয়া মুড়িয়া একবার অনেকক্ষণ দক্ষিণহস্তে ধরিয়া রাখিল। তাহার পরে বাক্সর ভিতর রাখিয়া দিল। এ চিঠি রমেশ কখনো ডাকে দেয় নাই। ইহা হেমনলিনীর উদ্দেশে লিখিত মাত্র। জীবনটাকে রমেশ যে

বলি দিতেছে এবং দুঃখকে সে যে চিরসহচর করিয়া লইতেছে, ইহা অন্ত নিশ্চয় স্থির করিয়া কঠিন-ব্রত-মাহাত্ম্যে সে একটা সান্ত্বনা লাভ করিল।

সন্ধ্যাবেলায় রমেশকে চতুর্দ্দোলায় চড়িতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে আলোকমালা চলিল, বাজনা বাজিতে লাগিল, পথের দুই ধারে কুটীরদ্বারে উলঙ্গ ছেলে ও ঘোম্‌টাবৃত বধূরা বাহির হইয়া আসিল, কুকুরগুলা অত্যন্ত সন্দেহ ও বিরক্তি জানাইয়া মুখ তুলিয়া ডাকিতে লাগিল,—রমেশ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যাহাকে বিবাহ করিতে যাইতেছে, তাহাকে কোনকালে সে স্ত্রী বলিয়া গণ্য করিবে না।

বিবাহকালে রমেশ ঠিকমত মন্ত্র আবৃত্তি করিল না, শুভদৃষ্টির সময় চোখ বুজিয়া রহিল, বাসরঘরের হাস্যোৎপাত নীরবে নতমুখে সহ্য করিল, রাত্রে শয্যাপ্রান্তে পাশ ফিরিয়া রহিল, প্রত্যূষে বিছানা হইতে উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। শ্বশুরপল্লীর প্রগল্‌ভা প্রৌঢ়াগণ বরের এইরূপ নির্ব্বাক্ নিরীহতায় রাগ করিল, কিন্তু মুখচোরা ভালমানুষ বলিয়া স্ত্রীসমাজে রমেশের একটা খ্যাতিও জন্মিল। সকলেই বলিল, "আমাদের সুশীলা বরকে যেমন ইচ্ছা চালাইতে পারিবে।"

বিবাহ সম্পন্ন হইলে ফিরিবার উদ্যোগ হইল। মেয়েরা এক নৌকায়, বৃদ্ধেরা এক নৌকায়, বর ও বয়স্তগণ আর এক নৌকায় যাত্রা করিল। অন্য এক নৌকায় রসুনচৌকির দল যখন-তখন যে-সে রাগিণী যেমন-তেমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিল। দুই তীরের ছায়াচ্ছন্ন গ্রামের অনেক জায়গা হইতেই বিচিত্র বেসুরের বাদ্য ঘন তরুপল্লব ভেদ করিয়া গ্রাম্য উৎসবের উৎসাহ জগতে ঘোষণা করিতে চেষ্টা করিল। বর্ষব্যাপী অকালের পূর্ব্বে সেবার বাংলার গ্রামে গ্রামে বিবাহব্যাপার অত্যন্ত সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল—বরযাত্রের দুরন্ত বন্যার প্লাবনে এমন পল্লী ছিল না যে, আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

সমস্তদিন অসহ্য গরম। আকাশে মেঘ নাই, অথচ একটা বিবর্ণ আচ্ছাদনে চারিদিক্ ঢাকা পড়িয়াছে—তীরের তরুশ্রেণী পাংশুবর্ণ। গাছের পাতা নড়িতেছে না। দাঁড়িমাঝিরা গলদ্‌ঘর্ম্ম। সন্ধ্যার অন্ধকার জমিবার পূর্ব্বেই মাল্লারা কহিল, "কর্ত্তা, নৌকা এইবার ঘাটে বাঁধি—সম্মুখে অনেকদূর আর নৌকা রাখিবার জায়গা নাই।" ব্রজমোহনবাবু পথে বিলম্ব করিতে চান না। তিনি কহিলেন, "এখানে বাঁধিলে চলিবে না। আজ প্রথমরাত্র জ্যোৎস্না আছে, আজ বালুহাটায় পৌঁছিয়া নৌকা বাঁধিব। তোরা বক্‌শিস্ পাইবি।"

নৌকা গ্রাম ছাড়াইয়া চলিয়া গেল। একদিকে চর ধুধু করিতেছে, আর একদিকে ভাঙা উচ্চপাড়। কুহেলিকার মধ্যে চাঁদ উঠিল, কিন্তু তাহাকে মাতালের চক্ষুর মত অত্যন্ত ঘোলা দেখাইতে লাগিল।

এমন-সময় সেই দৈবজ্ঞকথিত দুর্গ্রহের হঠাৎ হুঁস্ হইল, তাহার কাজে মুল্‌তবি পড়িয়াছে। তাড়াতাড়ি কোনমতে কর্ত্তব্য সারিয়া লইবার জন্য সে তাহার একটা দ্রুতগামী দূত পাঠাইল। আকাশে মেঘ নাই কিছু নাই, অথচ কোথা হইতে একটা গর্জ্জনধ্বনি শোনা গেল। পশ্চাতে

দিগন্তের দিকে চাহিয়া দেখা গেল, একটা প্রকাণ্ড অদৃশ্য সম্মার্জ্জনী ভাঙা ডালপালা, খড়কুটা, ধূলাবালি আকাশে উড়াইয়া প্রচণ্ড-বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। 'রাখ্ রাখ্, সামাল্ সামাল্, হায় হায়' করিতে করিতে মুহূর্ত্তকাল পরে কি হইল, কেহই বলিতে পারিল না। একটা ঘূর্ণা হাওয়া একটি সঙ্কীর্ণ পথমাত্র আশ্রয় করিয়া প্রবলবেগে সমস্ত উন্মূলিত-বিপর্য্যস্ত করিয়া দিয়া নৌকা-কয়টাকে কোথায় কি করিল, তাহার কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। পার্ব্বত্য নদীপথে অকস্মাৎ জলপ্লাবনের ন্যায় মুহূর্ত্তের ঝড় মুহূর্ত্তের মধ্যে —অন্তর্দ্ধান করিল—কিন্তু তাহার সেই পথ-টুকুতে পূর্ব্বের সহিত পরের আর কোন সাদৃশ্য রহিল না।

৪

কুহেলিকা কাটিয়া গেছে। বহুদূরব্যাপী মরুময় বালুভূমিকে নির্ম্মল জ্যোৎস্না বিধবার শুভ্রবসনের মত আচ্ছন্ন করিয়াছে। নদীতে নৌকা ছিল না, ঢেউ ছিল না, রোগযন্ত্রণার পরে মৃত্যু যেরূপ নির্ব্বিকার শান্তি বিকীর্ণ করিয়া দেয়, সেইরূপ শান্তি জলে-স্থলে স্তব্ধভাবে বিরাজ করিতেছে।

সংজ্ঞালাভ করিয়া রমেশ দেখিল, সে বালির তটে পড়িয়া আছে। ঝড়ের বেগ তাহাকে এক পলকের আঘাতে মৃত্যুর মধ্যে ফেলিয়া আবার অবলীলাক্রমে মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে। কি ঘটিয়াছিল, তাহা মনে করিতে তাহার কিছুক্ষণ সময় গেল—তাহার পরে ধীরে ধীরে দুঃস্বপ্নের মত সমস্ত ঘটনা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। তাহার পিতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণের কি দশা হইল, সন্ধান করিবার জন্য সে উঠিয়া পড়িল। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কাহারো কোন চিহ্ন নাই। বালুতটের তীর বাহিয়া সে খুঁজিতে খুঁজিতে চলিল।

পদ্মার দুই শাখাবাহুর মাঝখানে এই শুভ্র দ্বীপটি উলঙ্গ শিশুর মত ঊর্দ্ধমুখে শয়ান রহিয়াছে। রমেশ যখন একটি শাখার তীর-প্রান্ত ঘুরিয়া অন্য শাখার তীরে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন কিছুদূরে একটা লাল কাপড়ের মত দেখা গেল। দ্রুতপদে কাছে গিয়া রমেশ দেখিল, লাল-চেলী-পরা নববধূটি প্রাণহীন-ভাবে পড়িয়া আছে।

জলমগ্ন মুমূর্ষুর শ্বাসক্রিয়া কিরূপ কৃত্রিম উপায়ে ফিরাইয়া আনিতে হয়, রমেশ তাহা জানিত। অনেকক্ষণ ধরিয়া রমেশ বালিকার বাহুদুটি একবার তাহার শিয়রের দিকে প্রসারিত করিয়া পরক্ষণেই তাহার পেটের উপরে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে বধূর নিশ্বাস বহিল এবং সে চক্ষু মেলিল।

রমেশ তখন অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকাকে কোন প্রশ্ন করিবে, সেটুকু শ্বাসও যেন তাহার আয়ত্তের মধ্যে ছিল না।

বালিকা তখনো সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ করে নাই। একবার চোখ মেলিয়া তখনি তাহার চোখের পাতা মুদিয়া আসিল। রমেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার শ্বাসক্রিয়ার আর কোন ব্যাঘাত নাই। তখন এই জনহীন জলস্থলের সীমায় জীবনমৃত্যুর মাঝখানে সেই পাণ্ডুর জ্যোৎস্নালোকে রমেশ বালিকার মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

কালিদাস প্রথম বয়সে মূর্খ ছিলেন, পশ্চাৎবয়সে অসামান্য কবি হইয়া উঠিয়াছিলেন, ইহা সকলেরই জানা কথা। ইহাতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, পণ্ডিতের এবং মূর্খের আছি'র মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ব্যবধান নাই। এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা বলিবার আছে; তাহা এই :—

কালিদাস যখন মূর্খ ছিলেন, তখন তিনি জানিতেন যে, তাঁহার নাম "কালি" এই এক-কথায় পরিসমাপ্ত। তাহার পরে যখন তিনি আপনার নামাক্ষর বানান্ করিতে শিখিতেছেন, তখন তিনি সেই এক কথার জায়গায় দুই কথা দেখিতেছেন;—দেখিতেছেন (১) কএ আকার কা, (২) লএ ইকার লি। আরো কিছুদিন পরে যখন তাঁহার প্রথম পাঠ সাঙ্গ হইল, তখন তিনি দুই কথার জায়গায় তিন কথা দেখিলেন;—দেখিলেন (১) কএ আকার কা + (২) লএ ইকার লি = (৩) কালি।

তৃতীয় বয়সের তিন কথা আর-কিছু না—দ্বিতীয় বয়সের দুই কথার সহিত প্রথম বয়সের এক কথার যোগ-বন্ধন;—কা এবং লি এই দুই কথার সহিত "কালি" এই এক কথার যোগ-বন্ধন। এই গেল উপমা—উপমেয় হ'চ্চে এই :—

সহজ জ্ঞান "আছি" এই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত। মনোবিজ্ঞান ঐ এক 'কথা'র পর্দার আড়ালে দুই কথা দেখিতে পা'ন; দেখিতে পান—আছি এবং আছে এই দুই যমক সহোদর পিঠোপিঠি জোড়া লাগানো। তার সাক্ষী—আমাকে দেখিয়া কেহ যদি বলে "এ ব্যক্তি আছে", তবে সে ব্যক্তি যাহাকে বলিতেছে "আছে", তাহাকেই আমি বলিতেছি "আছি"। তা ছাড়া—আমার আপনার নিকটেও আমার শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি আছে; আমি সেই আছে'র সহিত জড়িত-ভাবে আছি—এরূপ জড়িতভাবে যে, আমার শরীর-মন প্রভৃতি যত-কিছু পদার্থ আমার সাক্ষাতে আছে বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, সমস্তই যদি আমার জ্ঞান হইতে সরিয়া পালায়, তবে আছিও সেই সঙ্গে সরিয়া পালায়;—যেমন সুষুপ্তিকালে। এইজন্য বলিতেছি যে, সহজ জ্ঞান যেখানে দেখেন শুধুই কেবল আছি, মনোবিজ্ঞান সেখানে দেখেন আছে-আছি একসঙ্গে জড়ানো। তত্ত্বজ্ঞান আবার মনোবিজ্ঞানের অপেক্ষাও সূক্ষ্মদর্শী। মনোবিজ্ঞান আছে'র একপিটেই কেবল আছি দেখিতে পা'ন; তত্ত্বজ্ঞান আছে'র এ-পিট ও-পিট দুই পিঠেই আছি দেখিতে পা'ন। তত্ত্বজ্ঞানের অন্তরের কথা কিরূপ—যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে নিম্নে প্রণিধান করা হোক্ :—

তত্ত্বজ্ঞানের একটি অন্তরের কথা।

তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি বলি যে, "ইনি আছেন"—আমার ভাষায় আমি বলি "ইনি আছেন।" তোমার ভাষায় তুমি "ইনি আছেন" বলো না—তুমি বলো "আমি আছি।" একই বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া আমার ভাষায় আমি বলিতেছি "ইনি আছেন", তোমার ভাষায় তুমি বলিতেছ

"আমি আছি।" দুই কথার ভাবার্থ একই। ভাবার্থ একই বটে—কিন্তু তত্রাচ তোমার ভাষায় তুমি যে বলিতেছ "আমি আছি", এইটিই মূল কথা; আর, আমার ভাষায় আমি যে বলিতেছি "ইনি আছেন", এটা সেই মূলের অনুবাদ। ওটাকেই বা মূল বলি কেন—এটাকেই বা অনুবাদ বলি কেন? কেন যে বলি, তাহার কারণ দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে; কারণ আর-কিছু না—তুমি যে বলিতেছ "আমি আছি", এটা তোমার হওয়া-কথা; আর, আমি যে বলিতেছি "ইনি আছেন", এটা শুধু আমার দেখা কথা। তত্ত্বজ্ঞান বলেন যে, দেখা-কথার মূল যদি হওয়া-কথা না থাকে, তবে দেখা-কথা শুধুকেবল একটা কথার কথা হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই বলিতে হয় যে, তুমি যে বলিতেছ "আমি আছি", সেইটিই মূল কথা; আর, আমি যে বলিতেছি "ইনি আছেন", এটা তাহারই অনুবাদ। তুমি হয় তো বলিবে যে, দেয়াল তো বলে না "আমি আছি"—তুমিই বলিতেছ "দেয়াল আছে", —"দেয়াল আছে" ইহার ভিতরে দেখা-কথা ছাড়া হওয়া-কথা কোন্‌খানটায়? ইহার উত্তর এই যে, তুমি যখন বলিতেছ যে, দেয়াল আছে, তখন তাহার অর্থই এই যে, তোমার দেখা-কথার ও-পিটে দেয়ালের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে—যদিচ দেয়াল তাহা মনুষ্যের ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারে না। দেয়াল যদি মনুষ্যের ভাষায় কথা কহিতে জানিত—তাহা হইলে দেয়াল নিশ্চয়ই বলিত "আমি আছি।" দেয়াল নিতান্তই পর-দেশের লোক;—দেয়াল তোমার দেশের ভাষায় কথা কহিতে জানে না; তাই সে মুখে বলিতে পারে না যে, "আমি আছি।" তুমি দেয়ালের উকিল। দেয়াল আপনার অন্তরের কথা আপনি প্রকাশ করিয়া বলিতে অক্ষম—তাই তুমি দেয়ালের হইয়া এইরূপ ওকালতি করিতেছ যে, দেয়াল আছে; ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, "আমি আছি" এটা দেয়ালের অন্তরের কথা; যদিচ দেয়াল সে কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে জানেও না—বলিতে চাহেও না। দেয়ালকে মারো-ধরো—দেয়ালের তাহা গায়ে লাগে না; কাজেই "আমি আছি" এ কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য তাহার মাথাব্যথা হয় না; প্রকাশ করিয়া না বলুক্—ঠারেঠোরে বলিতে ছাড়ে না; এমন কি—দেয়াল তোমার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইতেছে "আমি আছি;" দেয়ালের অঙ্গুলি হ'চ্চে শ্বেতাংশু-প্রতিক্ষেপণী শক্তি; সেই তাহার অব্যর্থ শক্তি তোমার চক্ষের ভিতরে চালাইয়া দেয়াল মুখে না বলুক্—কাজে বলিতেছে "আমি আছি।"

তত্ত্বজ্ঞানের কথা এই যে, তুমি দেয়ালই হও, আর মনুষ্যই হও—তাহাতে আইসে যায় না;—যাহাই তুমি হও না কেন—তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আমি যদি বলি যে, "ইনি আছেন", তবে সেই "ইনি আছেন" কথাটির দুই পারেই "আমি আছি" বিরাজমান। এপারের "আমি আছি" আমার অন্তরের কথা—ও পারের "আমি আছি" তোমার অন্তরের কথা; আর

তোমার সেই অন্তরের কথাটিকে আমি আমার ভাষায় অনুবাদ করিয়া বলিতেছি যে, "ইনি আছেন" অথবা "এটা আছে।"

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য যে কাহাকে বলে, তাহা এতক্ষণে বুঝিতে পারা গেল। দেখিতে পাওয়া গেল যে,

প্রথমত, দেখা-কথা'র দুই পারেই হওয়া-কথা থাকা চাই। এপারে দ্রষ্টার, অর্থাৎ আমার, আমি আছি থাকা চাই—ওপারে লক্ষ্য বস্তুর, অর্থাৎ তোমার, আমি আছি থাকা চাই।

দ্বিতীয়ত, দেখা কথা'র এপারের হওয়া-কথা'র সহিত ওপারের হওয়া-কথা'র ঐক্য থাকা চাই।

তৃতীয়ত, এপারের হওয়া-কথার সহিত ওপারের হওয়া-কথার সেই যে ঐক্য, তাহারই নাম আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের স্থূল দৃষ্টান্ত।

"আমি তোমাকে দেখিতেছি" এই যে একটি দেখিতেছি-ব্যাপার, এই দেখিতেছি'র এপারে আমি বলিতেছি "আমি আছি", ওপারে তুমি বলিতেছ "আমি আছি।" "আমি তোমাকে দেখিতেছি" এ কথাটি একটি বই কথা নহে, অথচ সেই একটিমাত্র কথা'র দুই পারে দুই আছি বিরাজমান।

দুইটি কথা দ্রষ্টব্য।

প্রথম কথা এই যে, দেখিতেছি'র এপারে দাঁড়াইয়া আমি যে বলিতেছি "আমি আছি", তাহার অর্থ এই যে, দেখিতেছি = দেখিতে + আছি অর্থাৎ দেখিতেছি-রকমে আছি। তবেই হইতেছে যে, দেখিতেছি আছি'রই রকমভেদ বা প্রকারভেদ। রূপকের ভাষায় —দেখিতেছি আছি'রই তরঙ্গ-ভঙ্গ। দার্শনিক ভাষায়—দেখিতেছি একপ্রকার পরিবর্ত্তনশীল গুণ; সেই পরিবর্ত্তনশীল গুণের অপরিবর্ত্তনীয় আধার-বস্তু থাকা চাই; সে আধার-বস্তু কে? না, আছি। কেন না, গোড়ায় আছি না থাকিলে, ব্যবহারক্ষেত্রে দেখিতেছি থাকিতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা এই যে, "আমি তোমাকে দেখিতেছি" বলিলেই বুঝায় যে, তুমি আমার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের উপরে কার্য্য করিতেছ, তাই আমি তোমাকে দেখিতেছি। সে কার্য্যের কারণ আমি নহি—সে কার্য্যের কারণ তুমি। ফলে, দেখিতেছি-ব্যাপারটি এপারের আছি'র একপ্রকার গুণপরিবর্ত্তন;—"পূর্ব্বে দেখিতেছিলাম না—এক্ষণে দেখিতেছি" এইরূপ একটা গুণপরিবর্ত্তন; এই গুণপরিবর্ত্তনের উপরে ওপারের আছি'র কার্য্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে স্পষ্ট।

এই দুইটি কথা পরস্পরের সহিত মিলাইয়া দেখিয়া আমরা পাইতেছি এই যে, "আমি তোমাকে দেখিতেছি" এই কথাটির সঙ্গে দুই পারের দুই আছি'র সম্বন্ধ রহিয়াছে। এপারের আছি'র সম্বন্ধ যাহা রহিয়াছে, তাহা বস্তুগুণের সম্বন্ধ; ওপারের আছি'র সম্বন্ধ যাহা রহিয়াছে, তাহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ। বস্তু-গুণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে এপারের আছিতে অবতরণ করি; কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের সোপান দিয়া আমি দেখিতেছি-হইতে ওপারের আছিতে আরোহণ করি। দুই পারের দুই

আছি'র ঐক্যের নামই আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য।

প্রকৃত কথা এই যে, সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য অবশ্যম্ভাবী। আমি যদি বলি যে, "তোমার সহিত আমার কোনো সম্বন্ধ নাই", তবে তাহার অর্থই এই যে, তোমাতে আমাতে ঐক্য নাই। পুত্র একসময়ে মাতার শরীরেরই অঙ্গের সামিল ছিল—তাই মাতার সহিত পুত্রের এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মনুষ্যমাত্রই জগতের শ্রেষ্ঠ উপাদান হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এইজন্য মনুষ্যে মনুষ্যে এরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সম্বন্ধের মূলে ঐক্যই যদি নাই—তবে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া থাকিবে কিসের উপরে? শূন্যের উপরে? না, বালির বাঁধের উপরে? অতএব এটা স্থির যে, সম্বন্ধমাত্রেরই মূলে ঐক্য রহিয়াছে। এমন কি, তেলে-জলের সম্বন্ধের মধ্যেও ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একটা কাচ-পাত্রে যদি তেল আর জল একাধারে বিন্যস্ত হয়, তাহা হইলে দুয়ের সন্ধিস্থানে উভয়ের ঐক্য এরূপ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে যে, সে স্থানের চক্রাকৃতি রেখাটিকে তৈল-রেখা বলিব কি জল-রেখা বলিব, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই যে, আছি'র সহিত দেখিতেছি'রও ঐক্য রহিয়াছে; আছি'র সহিত আছি'রও ঐক্য রহিয়াছে। আছি'র সহিত দেখিতেছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় বস্তুগুণের সম্বন্ধ-সূত্রে; আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য প্রকাশ পায় কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ-সূত্রে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, দুই পারের দুই আছি'র ঐক্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই পূর্ব্বপ্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে সাঁটে-সোঁটে বলা হইয়াছিল—"আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যই স্বাধীনতা'র ভিত্তিমূল।"

অতঃপর, আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের সঙ্গে স্বাধীনতার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

মনে কর, দেবদত্ত-নামক একজন বলবান্ যুবা পুরুষ কয়েক-ভরি সোণার গহনা বোঁচ্‌কায় বাঁধিয়া লইয়া একাকী পদব্রজে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতেছেন। দুই গ্রামের মধ্যে ১৫ক্রোশের ব্যবধান। প্রত্যূষে যখন তিনি রওনা হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল যে, তিনি গন্তব্যপথ এক-নিশ্বাসে গ্রাস করিয়া ফেলিবেন। তিনি ভাবিলেন "একঘণ্টার মধ্যেই আমি ১৫ক্রোশ পথ হাঁটিয়া পার হইব—কাহার সাধ্য আমার গতিরোধ করে—আমি স্বাধীন!" এরূপ যে তাঁহার মনে হইল, তাহা হইবারই কথা; কেন না, একটি-আধটি নহে—তিন-চারিটি—মাথালো-গোচের কারণ একযোট্ হইয়া তাঁহার মনোমধ্যে ঐরূপ একটা মহোত্তম-শালি-স্বাধীনতা-বোধের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়াছে।

প্রথম কারণ হ'চ্চে সুস্থ শরীরের বল-স্ফূর্ত্তি।

দ্বিতীয় কারণ হ'চ্চে নিঃশঙ্ক মনের আনন্দ-স্ফূর্ত্তি।

তৃতীয় কারণ হ'চ্চে গম্যস্থানে যাইবার জন্য আগ্রহের আতিশয্য।

চতুর্থ কারণ হ'চ্চে—কর্ত্তব্য-কার্য্যে প্রবৃত্ত-হওয়া-গতিকে অন্তরাত্মার (conscienceএর) প্রসন্নতা।

দেবদত্ত স্বাধীনতায় ভর করিয়া দশ-ক্রোশ পথ অকাতরে অতিবাহন করিলেন। তাহার পরে ক্রমে তাঁহার স্বাধীনতা মন্দা পড়িয়া আসিতে লাগিল। কায়-ক্লেশে তিনি আর দুই-ক্রোশ পথ কথঞ্চিৎ প্রকারে অতি-বাহন করিলেন; কিন্তু এখনো তিন-ক্রোশ গন্তব্যপথ তাঁহার সম্মুখে দিগন্তর-হইতে দিগন্তরে প্রসারিত রহিয়াছে। তাঁহার পদদ্বয় বেবোরে পড়িয়া—নিতান্ত না চলিলে নয় তাই চলিতেছে। যে স্বাধীনতা বোধের নূতন স্ফূর্ত্তির সময় ১৫ক্রোশ পথ দেবদত্তের চক্ষে এক-ক্রোশের বেশ ধারণ করিয়াছিল, সেই স্বাধী-নতা-বোধের এখন অস্ত-গমনের কাল উপ-স্থিত; এখন তাই এক-ক্রোশ পথ তাঁহার চক্ষে শত-ক্রোশ বা ততোধিক। দেবদত্ত এখন মনে করিতেছেন যে, "আমার স্বাধী-নতায় কাজ নাই—মাঠের মধ্যে কোথাও যদি একটা বটগাছের আড়াল পাই, তবে তাহার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় মুহূর্ত্তেকের জন্য হাত-পা ছড়াইয়া বাঁচি।" পূর্ব্বে দেবদত্তকে দেব-দত্তের মন তিন-সত্য করিয়া বলিয়াছিল "তুমি স্বাধীন"; এখন অম্লান-বদনে বলি-তেছে "তুমি পরাধীন।" মনের দুই কথাই কিছু আর সত্য হইতে পারে না; হয় এটা সত্য—নয় ওটা সত্য। তবেই হইতেছে যে, দেবদত্তের তখনকার সেই যে স্বাধীনতা-বোধ এবং এখনকার এই যে পরাধীনতা-বোধ—দুইই তাঁহার দুই বিভিন্ন অবস্থার উপযোগী দুইপ্রকার মনের ভাব, তা বই আর-কিছুই নহে। তাহার পরে মনে কর, অস্ত-দিবাকরের সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহার স্বাধীনতাবোধ অস্তমিত হইল, তখন তিনি সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিয়া তাহার তলে বোঁচ্‌কা হেলান্ দিয়া বসিলেন—বসিয়া শ্রমাপনোদন করিতেছেন, ইতিমধ্যে জনৈক অপরিচিত পথিক তাঁহার দুই-হাত অন্তরে সেই বটবৃক্ষের আর-এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল।

দেবদত্তের মনোমধ্যে দুইটি কথা কাঁধ ধরাধরি করিয়া উপস্থিত হইল। একটি কথা এই যে, বোঁচ্‌কার ভিতরে চারি-পাঁচ-ভরি স্বর্ণালঙ্কার রহিয়াছে; আর-একটি কথা এই যে, পার্শ্বের লোক্‌টির মুখের আকার-প্রকার ভাল নহে; তা ছাড়া, তাহার হাতের লাঠির আয়তনের পরিমাণ কিছু যেন মাত্রাতীত। দেবদত্ত যে, স্থানান্তরে উঠিয়া যাইবেন—সে শক্তি তাঁহার নাই; তাহাতে আবার, নিদ্রার আকর্ষণে তাঁহার চক্ষু বুজিয়া আসিতেছে। কিন্তু "নিদ্রাকে কোনোমতেই আসিতে দেওয়া হইবে না" এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা। তাঁহার মনের ভাব এই যে, "কি জানি! হাতের যষ্টির সহিত মুখের চেহারার অমন যখন মিল, তখন "বিশ্বাসো নৈব কর্ত্তব্যঃ!" কিন্তু নিদ্রাকুহকিনীকে তিনি কত ঠেকাইয়া রাখিবেন! যেই একটু ফাঁক পাইতেছে—অমনি নিদ্রা চুপিচুপি আসিয়া চক্ষুর কপাটে কুলুপ আঁটিয়া মস্তকের ভার বোঁচ্‌কার দিকে ঢুলাইয়া দিতেছে; মস্তক বটবৃক্ষের গায়ে ঠোকর খাইয়া সচকিতভাবে স্বস্থানে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে; আর তৎ-ক্ষণাৎ দেবদত্তের তন্দ্রা ভাঙিয়া যাওয়াতে দেবদত্ত বোঁচ্‌কাটিকে আপনার আয়ত্তের মধ্যে সরাইয়া আনিয়া সাবধান করিয়া রাখিতেছেন। নিদ্রা কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহে—নিদ্রা অপ্রতিহত উদ্যমের সহিত

আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিতেছে। এমন-সময় দেবদত্তের একজন পুরাতন বন্ধু সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন—তিনি দেবদত্তকে দেখিয়া মহা-আনন্দ প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে আপন আলয়ে লইয়া গেলেন। দেবদত্ত সেখানে গিয়া চির-পরিচিত বন্ধুবর্গের মাঝখানে স্বাধীনতার স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলেন—মনের সুখে ঘুমাইয়া বাঁচিলেন। দেবদত্তের যাত্রারম্ভ হইতে বন্ধুভবনে উপনীত হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহার স্বাধীনতা-বোধের পথের সমাচার যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহা এই :—

যাত্রাকালে দেবদত্ত আপন শরীরে বলের স্ফূর্ত্তি এবং মনে আনন্দের স্ফূর্ত্তি প্রচুর-পরিমাণে অনুভব করিয়াছিলেন। স্ফূর্ত্তিই অনুভব করিয়াছিলেন—স্ফূর্ত্তির বাধা অনুভব করেন নাই। তিনি তখন মনে করিয়াছিলেন যে, আমার এ স্ফূর্ত্তি বাহিরের কোনো-কিছুর বশতাপন্ন নহে—ইহারই নাম স্বাধীনতা-বোধ। দেবদত্তের এই প্রথম উদ্যমের স্বাধীনতা-বোধের প্রধান কারণ—শরীরের স্বাস্থ্য। শরীর যদি কোনো অংশে অসুস্থ হয়, তবে যে অংশে তাহা অসুস্থ, সেই অংশে তাহা দেহী ব্যক্তির পর। পক্ষান্তরে, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির আপনার তো বটেই—তা ছাড়া তাহা একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ হইলে, শরীর আছে এবং আমি আছি, এ দুয়ের ভিন্নতা-বোধ থাকে না। সুস্থ শরীর দেহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি বলিয়া—সুস্থ শরীরের পরিধির মধ্যে দেহী ব্যক্তি একপ্রকার সহজ স্বাধীনতা অনুভব করে। এই যে সহজ স্বাধীনতা, ইহার মধ্যে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য কোন্‌খানটায়, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে তাহার ঠিকানা পাওয়া যাইতে পারে এইরূপে :—

দেহী ব্যক্তি দেহ-বোধের এপারে থাকিয়া বলিতেছে যে, আমি আছি এবং আমার দেহ আছে। দেহী ব্যক্তি যে বলিতেছে "আমি আছি", এইটিই দেহী ব্যক্তির হওয়া-কথা ; পক্ষান্তরে—"দেহ আছে", এটা দেহী ব্যক্তির দেখা-কথা ; দেহী ব্যক্তির এই দেখা-কথা ব্যতীত—দেহের নিজের একটি হওয়া-কথা আছে। কেন না, দেহ একপ্রকার অশাব্দিক ভাষায় বলিতেছে যে, আমি আছি ; আর দেহী শাব্দিক ভাষায় তাহার অনুবাদ করিয়া বলিতেছে যে, দেহ আছে। এখন বক্তব্য এই যে, একদিকে অশাব্দিক ভাষায় দেহ বলিতেছে আমি আছি, এবং আর-একদিকে শাব্দিক ভাষায় দেহী বলিতেছে আমি আছি ; এই যে দুই দিকের দুই আছি—সুস্থ-শরীরে এই দুই আছি এক আছি'রই সামিল হইয়া দাঁড়ায় ; কাজেই—এ-আছি ও-আছি-কর্ত্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয় না ; আর, বাধাপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া দেহী ব্যক্তি স্বাধীনতা অনুভব করে। এইরূপে দেহ-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম ভূতাত্মা) এবং দেহি-আত্মা (যাহার শাস্ত্রীয় নাম বিজ্ঞানাত্মা) এই দুই আত্মা যখন একাত্মা হইয়া যায়, তখন সেই একাত্মভাব হইতে একপ্রকার অবাধিত স্ফূর্ত্তি জন্মগ্রহণ করে ; আর, দেহ-দেহীর সেই যে একাত্ম-ভাব, তাহাই এখানে দেহের এ-পিটের আছি'র

সহিত ও-পিটের আছি'র ঐক্য বলিয়া নির্দ্দেশিত হইতেছে।

প্রথম উদ্যমে দেবদত্ত শরীরকে যতটা আপনার মনে করিয়াছিলেন, ক্রমে দেখিলেন—শরীর ততটা আপনার নহে। পরিশেষে যখন দেখিলেন যে, তাঁহার পদ-দ্বয় তাঁহার কথার অবাধ্য হইয়া—তিনি যত বলিতেছেন "চলো", সে দুই ভ্রাতা ততই বলিতেছে "চলিতে পারি না", তখন তাঁহার স্বাধীনতাবোধের বক্ষ একেবারেই দমিয়া গেল। তাহার পরে যখন তিনি বটবৃক্ষ-তলে নিষণ্ণ হইয়া বাহিরের লাঠিয়াল এবং অন্তরের নিদ্রা দুয়ের কাহাকে সাম্‌লাইবেন, তাহা ভাবিয়া পাইতেছেন না, তখন কত যে তিনি পরাধীন, সে বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ শিক্ষালাভ হইল। তাহার পরে তিনি যখন বন্ধু-ভবনে সুবিশ্বস্ত-চিত্তে মনের কপাট খুলিয়া সুখে শয়ন করিলেন, তখন দেখিলেন যে, তাঁহার চারিদিকের লোকেরা সকলেই তাঁহার আপনার লোক—কেহই তাঁহার পর নহে। তা ছাড়া—ধনঞ্জয়-নামক গৃহকর্ত্তা তাঁহার পরম বন্ধু—একপ্রকার দ্বিতীয় আপনি। এই সকল কারণে—পথের মাঝখানে তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন সেই যে তাঁহার আদরের ধন স্বাধীনতা, এক্ষণে তাহা তিনি শুধসুদ্ধ ফিরিয়া পাইলেন। এক্ষণে আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য অতীব সুস্পষ্ট আকার ধারণ করিল। বন্ধুপ্রাপ্তির এ-পারে দেবদত্তের আমি আছি এবং ওপারে ধনঞ্জয়ের আমি আছি, এই দুই আছি একীভূত হইয়া দেবদত্তের অন্তঃকরণে স্বাধীনতার কপাট উন্মুক্ত করিয়া দিল। দেবদত্ত যাত্রাকালে যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিয়াছিলেন, তাহার গোড়া'র কথা দেহের আছি'র সহিত দেহীর আছি'র ঐক্য; এক্ষণে বন্ধু-ভবনে তিনি যেরূপ স্বাধীনতা অনুভব করিতেছেন, তাহার গোড়া'র কথা বন্ধুবর্গের আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য। কিন্তু এ দুইপ্রকার প্রাচীরের ঘের-দেওয়া স্বাধীনতা ব্যতীত আর-একপ্রকার স্বাধীনতা আছে—যাহার পদবী অতীব উচ্চ; এত উচ্চ যে, বর্ত্তমান কালের সভ্যতার অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে তাহাকে নাগাল পাওয়া সুদুষ্কর। সেটি হ'চ্চে পারমার্থিক স্বাধীনতা—যাহার আর-এক নাম মুক্তি। দেহ যেমন দেহীর আপনার, গেহ যেমন গেহী'র আপনার, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তেমনি ভগবদ্‌ভক্ত সাধু পুরুষের আপনার। পরিবারস্থ আত্মীয়স্বজনেরা যেমন গৃহী ব্যক্তির দ্বিতীয় আপনি, পরমাত্মা তেমনি ভক্ত জীবাত্মার দ্বিতীয় আপনি। জীবাত্মা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আছি, পরমাত্মা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আছি—এই দুই আছি'র ঐক্যের ভিতরে সমস্ত আছি'র সহিত আছি'র ঐক্য সন্নিভুক্ত রহিয়াছে; আর, প্রত্যেক মনুষ্যের স্বাধীনতা-বোধ সেই ঐক্যের অস্ফুট আভাস। এই অস্ফুট স্বাধীনতার ভাব, যাহা প্রত্যেক মনুষ্যের ভিতরে-ভিতরে কার্য্য করিতেছে, তাহাই লৌকিক ধর্ম্মের ভিত্তিমূল; আর, তাহা যখন ভগবদ্‌ভক্ত সাধু ব্যক্তির মনোমধ্যে সুপরিস্ফুট আকার ধারণ করে, তখন তাহাই পারমার্থিক ধর্ম্মের ভিত্তিমূল এবং মুক্তির সোপান। লৌকিক ধর্ম্ম বলিতেছি

কাহাকে ? যে-ধর্ম্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহার ঊর্দ্ধে ওঠে না, তাহারই নাম লৌকিক ধর্ম্ম। পারমার্থিক ধর্ম্ম বলিতেছি কাহাকে ? যে-ধর্ম্মের দৃষ্টি ফলাফলের রাজ্য ছাড়াইয়া উঠিয়া নিষ্কাম-ভক্তিসহকারে পরমেশ্বরের প্রতি নিবদ্ধ হয়, তাহারই নাম পারমার্থিক ধর্ম্ম। লৌকিক ধর্ম্মের গোড়া'র কথা হ'চ্চে মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস ; এক কথায়—ঈশ্বর-বিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান। পারমার্থিক ধর্ম্মের গোড়া'র কথা হ'চ্চে—ঈশ্বরকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া জানা ; এক কথায় —পরম-প্রীতিভক্তি-সহকৃত অপরোক্ষ জ্ঞান।

পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রায়শই ঈশ্বরতত্ত্ব হইতে স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়া থাকে, আর, সেই গতিকে ধর্ম্মতত্ত্ব এরূপ একটা গোড়া-নাই-আগা-রকমের ধরিতে-ছুঁতে-পাওয়া-না-যাইবার কথা হইয়া দাঁড়ায় যে, তাহা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়' অর্থাৎ কাহারো কোনো উপকারে আসে না। আমাদের দেশে ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। আমাদের দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবদ্‌ভক্তি এবং ধর্ম্মনীতির (piety এবং moralityর) হর-গৌরীর ন্যায় যুগলাঙ্গভাবে অনুশীলিত হওনের প্রথা চির-প্রচলিত। বারান্তরে আমি দেখাইব যে, আমাদের দেশে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—

(১) সকাম ধর্ম্মতত্ত্ব এবং (২) নিষ্কাম ধর্ম্মতত্ত্ব ; আর সেই সঙ্গে দেখাইব যে, সকাম ধর্ম্মের মূল স্বভাবসিদ্ধ ঈশ্বরেতে বিশ্বাস বা পরোক্ষ জ্ঞান ; নিষ্কাম ধর্ম্মের মূল বিশিষ্ট-রূপ ঈশ্বর-ভক্তি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজকন্যা।

এক ছিল রাজকন্যা। কই, তাহাকে ত আর দেখিতে পাই না। একখানি গল্পের বই লই—একি !—কেবলি যত সুরবালা, কমলমণি, ললিতা, নলিনী, নগেন্দ্র, বীরেন্দ্র, মনোমোহনের গল্প ! কলিকালে কাংস্যপাত্রে ভোজন শাস্ত্রে লিখিত আছে—কলির শেষে কি অবশেষে এই সব সুরবালা-পুরবালা রাজকন্যার সিংহাসনও অধিকার করিয়া নিবে ? সে রাজকন্যা কি পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া রাজপুত্রের সঙ্গে সাতসমুদ্র পার হইয়া চিরদিনের জন্য পলায়ন করিয়াছে ? না, এই রেলগাড়ি-ষ্টীমার প্রভৃতির আক্রমণে সাতসমুদ্র সাতটি কুপমাত্রে পরিণত হইয়া গিয়াছে—রাজকন্যাগণের গোপনভবনগুলির পাশ দিয়া ইলেক্‌ট্রিক্ ট্রাম চলিয়াছে এবং এই যে ললিতা-গলিতা প্রভৃতি নায়িকাগণ, ইহাদিগকেই এখন রাজকন্যা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে ? রাজকন্যাগণের ইতিহাস হঠাৎ কেন বন্ধ হইয়া গেল ? আমি ত ঐজন্যে ইতিহাসের এক পৃষ্ঠাও পড়িতে পারি না— এবং নিশ্চয়

বলিতে পারি, তারাখচিত কৃষ্ণসন্ধ্যার মত সুন্দরী কাফ্রীরাজকুমারী ক্লিয়োপেট্রার কাহিনীসংবলিত রোমের ইতিহাস পাঠ্য না থাকিলে আমি কিছুতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাবিশেষে উত্তীর্ণ হইতে পারিতাম না।

এক ছিল রাজকন্যা। কবে ছিল কেউ জানে না, কিন্তু তাহার ইতিহাস ত লিপিতে এবং শ্রুতিতে এতকাল চলিয়া আসিতেছিল! "সাল-সরল-ব্যালোল-বল্লীলতাচ্ছন্ন" তপোবনে রক্তাশোকতরুর মূলে বসিয়া বৃদ্ধ ঋষি শ্রুতি শুনাইতেন—শিষ্যমণ্ডলীর বুক থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিত—বৃদ্ধা দিদিমাও কোমলতম বর্ণমিশ্রণের মধ্যে সন্ধ্যাকালে ছাদে বসিয়া রাজকন্যার শ্রুতি কীর্ত্তন করিতেন, নাতি-মণ্ডলীর বুক কি করিয়া উঠিত, এই প্রবন্ধই তাহার পরিচয়রূপে গণ্য হোক্।

বাস্তবিক পুরাতন ইতিহাসবেত্তাদের পরে বুড়া দিদিমাই রাজকন্যার শ্রুতি ধারণ করিয়া আসিতেছিলেন। তখন সমস্ত পায়রা-গুলি বাসায় ফিরিয়া আসিয়াছে—তাহাদের পাখার ঘোর ঝট্‌পটি এবং তুমুল বক্‌বকম্ শেষ করিয়া অন্ধকারের মধ্যে যে যার আপন খোপে বসিয়া গিয়াছে;—দূরে সন্ধ্যার অন্ধকার হইতেও ঘনতর শীতলরসে চক্ষুকে সিক্ত করিয়া দেবদারুগাছগুলি দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের পশ্চাতে পীতপাণ্ডুরবর্ণের বর্ষা ছাড়িয়া দিয়া দ্রুতবেগে চাঁদ উঠিতেছে; পশ্চিমাকাশের সিন্দুরাভা ক্রমেই বৃদ্ধের চক্ষুর মত অন্ধকারের মধ্যে ঘোলা হইয়া যাইতেছে; উপরে একটিমাত্র তারা; আমার মাথার মধ্যে দিদিমার একটি আঙুল শিথিলভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে—তখন দিদিমা আরম্ভ করিলেন, এক ছিল রাজকন্যা।

দিদিমার সেই শ্রুতি মনে লইয়া ক্রমে আমাদের রাজকবিগণের সঙ্গে পরিচয় হইয়াছিল। দিদিমার এবং রাজকবিদের বর্ণনা-গুলি মিলাইয়া দেখি, রাজকন্যার কি মহিমা! কত বিচিত্র নদনদী, কত রহস্যময় প্রাসাদ-কক্ষ, কত অদ্ভুত মন্ত্রতন্ত্র, কত করুণা, কত অনুনয়, কত দীর্ঘভ্রমণান্তে মিলন, কত পলায়ন!—কত পুরাতন প্রাসাদের পশ্চাৎস্থিত গুপ্ত অলিন্দে সহচরীসহিত রাজকন্যা এই সান্ধ্যপান্থের নেত্র হরণ করিয়াছিল,—হায়, প্রতীক্ষাপরা ধৈর্য্যশীলা রাজবালিকা,—তোমার প্রাসাদবলভিকার কুলায়-প্রত্যাগত শুভ্র পারাবতের মত, আমার হৃদয়ের সকরুণ আশীর্ব্বাদ-গুলি সেই অনতিধূসর সন্ধ্যার মধ্য দিয়া, পত্র-পুষ্পতরুর আড়াল দিয়া, শুভ্র পাখা উড়াইয়া তোমার দেহবল্লরীর চারিদিকে গিয়া ভিড় করিয়াছিল!

কত মরুভূমির প্রান্ত ধরিয়া রাত্রির অবসানসময়ে ধূস্রবর্ণে তারাস্রগদামের নিম্ন দিয়া অসিলতার মত কৃশা সুন্দরী অসিচর্ম্মধারী তাতারকুমারের ঘোড়ার পাশাপাশি ঘোড়া ছুটাইয়া, দীর্ঘ গ্রীবা দীর্ঘতর করিয়া কালো পর্ব্বতের উপত্যকাভিমুখে ধাইয়া চলিয়াছিল —হায়, পলায়নপরা উদ্দাম সম্রাট্‌সুতা, আমার হৃদয়ের উৎসাহ বিদ্যুদ্দীপ্তি ধারণ করিয়া তোমার নেত্রবিদ্যুতের থরঋজু পথে নিঃসৃত হইয়া গিয়াছিল! বর্ষার মেঘ কাঁদিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল, উচ্চ প্রাসাদকক্ষে রাজ-বালিকার অশ্রু শরৎ-হেমন্ত শীত-বসন্তের অবসানেও সমান ঝরিতেছে! সহস্র ভক্ত পূজা

সাঙ্গ করিয়া, বর লইয়া, ফল লইয়া ঘরে ফিরিয়া গেল—তবু এই বিজন শরৎরাত্রির অশ্রুস্নাত অনন্ত জ্যোৎস্নার মধ্যে দাঁড়াইয়া সরোবর-তটে একাকিনী রাজকন্যা ফুল তুলিতেছে! তরলাক্ষি, তুমি যখন সৈরিন্ধ্রীবেশে এক রাজভবন হইতে আর এক রাজভবনে ফিরিয়া তোমার হারান ধনের অন্বেষণ করিতেছিলে—মধ্যাহ্নে বিশ্রামতন্দ্রায় রাজপুরী নীরব—তখন বাগানের বৃক্ষশাখার ভিতর হইতে আমিই শুকের মত রক্তচঞ্চুটি বাহির করিয়া, বিশ্রব্ধভাবে ঘাড় বাঁকাইয়া তোমার অনিমেষ অশ্রুকলুষিত চক্ষুদুটি নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। চপলাক্ষি, তুমি যখন প্রগল্ভ বণিক্‌কুমারের বেশে সিডনের বন্দরে আপণ হইতে আপণান্তরে ফিরিয়া, মণিতরল করনখে মণিমুক্তার প্রতিবিম্ব ধরিয়া জহরৎ-কেনার ছলনা করিতেছিলে—তখন আমিই আপন দ্বারস্থিত উচ্ছ্রায়াঙ্কিত রঞ্জিত গ্রীকমৃৎপাত্রোপরি—পার্শ্বে ভল্ল রাখিয়া অ্যাপোলো-প্রতিম গ্রীকযুবার দৃঢ়সুন্দর মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া তোমার বেণী-গোপন উষ্ণীষটিকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিলাম। আমি দেশে-বিদেশে রাজকন্যাগণের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছি, আমি তাহাদের রহস্য জানি। বাল্যকালে, যখন মুখের গঠন ভাল করিয়া ফুটে নাই—ভাব তরল জলের মত সর্ব্বাঙ্গে ছলছল করিয়া বেড়াইত, তখন হইতে রাজকন্যার প্রতিবিম্ব আমাদের হৃদয়ের মধ্যে পড়িয়াছে। আমাদের ভাবোদ্বোধিত যাহা-কিছু সৌন্দর্য্য, তাহা অমর—তাহা কোনদিন যাইবে না। রাজকন্যা সেইরূপ আমাদের একটি চিরদিনের জিনিষ। ব্যবধানই ইহার সৌন্দর্য্যের চারিদিকে ইন্দ্রজালের ঘের টানিয়া দিয়াছে। রাজকন্যাগণ কোন্-একটি দূর বাগানের মধ্যে প্রাসাদের কক্ষে চিরকাল বাস করিতেছে! জ্যোৎস্না এবং রৌদ্রে সুখ-স্পর্শ ছায়া ফেলিয়া সে বাগানের চারিদিক্ যেমন বৃক্ষমালা, স্তব্ধতা এবং মর্ম্মরে ঘিরিয়া রহিয়াছে, তেমনি তাহাদের চতুর্দ্দিকে আরও কত বেড়া! রাজকন্যাকে ঘিরিয়া তাহার নিজ হৃদয়ের প্রণয়লজ্জার বেষ্টন, সখীমণ্ডলীর বেষ্টন, খোজা পাহারার বেষ্টন, পিতার আদেশের বেষ্টন, কুলমর্য্যাদার বেষ্টন! পৃথিবীর বলবান্ রাজপুত্রগণের হৃদয়গুলির পক্ষে এই সব মধুর এবং কঠোর বেষ্টন ভেদ করিবার প্রলোভন কি দুঃসাহসোদ্দীপক! অদৃষ্ট রাজকন্যার মোহে শতশত নদীপর্ব্বত পিছে ফেলিয়া রাজপুত্র চলিয়া যায়।—আবার একএকদিন সন্ধ্যাকালে নদীতীরে ঘোড়া বাঁধিতেই, তারাবিম্বখচিত নদীজল দেখিয়া রাজকন্যার চক্ষুদুটির কারুণ্য রাজপুত্রের হৃদয়ের মধ্যে গলিয়া আসে। তখনি আমরা হঠাৎ রাজকন্যাকে আর এক ভাবে দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, রাজকন্যা একাকিনী। নানা বেষ্টনের মধ্যে উপগূঢ় রাজকন্যা ব্যবধানের জন্য বাহিরের সকলের কাছে যেমন চিরবিস্ময়কর এবং বলবান্ রাজপুত্রের কাছে যেমন দুঃসাহসোদ্দীপক, তেমনি আপনার কাছে সেই ব্যবধানের জন্যই কি নিতান্ত করুণ নহে? জানি, তাহার অলঙ্কার শিঞ্জিতভাষে তাহার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবের স্তুতি গাইয়া থাকে; জানি, সখীগণ তাহার কানে সর্ব্বদাই মধুরালাপ বর্ষণ করিয়া থাকে; বুঝি, তাহার নিভৃত মর্য্যাদাময় অবস্থানে তাহার সম্ভোগ-সুখকে অবারিত করিয়া দেয়—তবু কি হঠাৎ

একদিন আরতির সন্ধ্যায় রাজকন্যার বুকের মধ্যে সন্ধ্যাতারা ফুটিয়া উঠে না? মনে হয় না, এই ঐশ্বর্য্য এবং সৌন্দর্য্য তাহাকে চির-কাল এক কাম্যলোকের মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিবে? হঠাৎ রাত্রির অন্ধকারে রাজার হর্ম্ম্য এবং দরিদ্রের কুটীর এক সমান অস্পষ্টতায় মিলিয়া গেলে, মনে হয় না, ঐ ধরণীর পথ সুন্দর, উহারি মধ্যে বাহির হইয়া পড়ি, ঐ পথে সহজেই হৃদয়বানের সন্ধান পাইব? কিন্তু থাক্—তাহাতে কাজ নাই। রাজবালিকার চিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইয়া স্বপ্নেই পর্য্য-বসিত হোক্। তুমি তোমার দুর্ভেদ্য বেষ্টনা-বলীর মধ্যে অবরুদ্ধ থাকিয়া বলদর্পিত রাজ-কুমারগণকে অদ্ভুত দুঃসাহসিকতায় প্রবৃত্ত কর, এবং আমরা রাজপুত্র না হইয়াও তোমা-দের কাহিনী পড়িয়া দুঃসাহসিকতা এবং প্রেমের জটিল ব্যূহমধ্যে আপনাদিগকে এক-বার ছুটাইয়া দি। রাজকন্যা চিরকাল পরে পরে তাহার সুখ এবং বেদনা লইয়া বাস করুক—প্রাসাদশিখর হইতে নামিয়া পৃথিবীর উপরে বাহির হইয়া না পড়ুক—সুরবালা এবং পুরবালাতে কাব্যজগৎটি পরিপূর্ণ হইয়া না যাউক। আমি সুরবালা-পুরবালাদের অধিকার সঙ্কুচিত করিতে চাই না, তাহাদের আমি অভক্তও নহি—কিন্তু সেই পুরাতন রাজ-কবিগণ এবং বৃদ্ধা দিদিমাদের আশ্চর্য্য বর্ণনায় আমাদের হৃদয়ের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী রাজকন্যা তৈয়ার হইয়া গিয়াছে—হঠাৎ বাল্যসন্ধ্যার বর্ণপ্রবাহের অন্তরাললক্ষ্য তাহার ঐ সৌধচূড়া হইতে দৃষ্টি নামাইয়া, আধুনিক কাব্যজগতের দিকে চাহিলেই অনিবার্য্যে প্রশ্ন উঠে—এক যে ছিল রাজকন্যা? সে কোথায় গেল? কোথায় গেল সেই চতুরা সখীবর্গ! কোথায় গেল তাহাদের পিঞ্জরস্থ স্ফুটবাক্ পাখী, কোথায় গেল সেই দুঃসাহসী অশ্বারোহী রাজকুমার!—

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সমাজ-তত্ত্ব।—শ্রীপূর্ণচন্দ্র বসু প্রণীত। মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র।

সমাজ-তত্ত্বের আলোচনাস্থলে সচরাচর আমরা ইউরোপীয়দিগের সঙ্কলিত তথ্য ও তর্কযুক্তির প্রণালী অবলম্বন করিয়া—এমন কি, ইউরোপীয় সমাজপদ্ধতিকে উচ্চতম-আদর্শরূপে মানসনেত্রের সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া—বিচার করি। ইহার ফল এই হয় যে, আমরা সুবিচার করিতে পারি না। এক ত, একটা আদর্শ স্থির করিয়া লইলেই স্বাধীন বিচারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায়—সেই আদ-র্শের সহিত যাহা মিলে, তাহারই আমরা প্রশংসা করি; যাহা মিলে না, তাহারই নিন্দা করি—বিচার করিয়া করি না; গড্ডলিকা-বৃত্তির প্ররোচনাতেই করি। তদ্ব্যতীত ইউ-রোপীয় সমাজপদ্ধতি আদৌ আদর্শস্থানীয় নহে।

বাল্যকাল হইতে ইংরেজিভাষার অনুশীলন করিয়া এবং ইউরোপীয়ভাবে শিক্ষিত হইয়া আমরা সেই ভাবে অভিভূত হইয়া পড়ি। সামাজিক রীতি, পদ্ধতি, ব্যবস্থা, অনুষ্ঠান, যাহা কিছু ইউরোপীয় তাহাই ভাল, আর যাহা কিছু স্বদেশীয় তাহাই মন্দ— ইংরেজদিগের সবই বিজ্ঞানানুমোদিত এবং আমাদের সবই কুসংস্কারাচ্ছন্ন—এইরূপ মনের ভাব লইয়া আমরা প্রায় সকলেই কলেজ হইতে বাহির হই। ইহা যে নিতান্ত দুঃখের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু যেরূপ অবস্থা, তাহাতে অনিবার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। যাঁহারা সৌভাগ্যশালী, তাঁহারা সংসারে প্রবেশ করিয়া ভূয়োদর্শন, অধ্যয়ন ও চিন্তার দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া এই নেশার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করেন। যাঁহারা বিধাতার বিধানে বিড়ম্বিত, তাঁহাদের নেশাটা চিরদিন থাকিয়া যায়। পরম আহ্লাদের বিষয় যে, শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু মহাশয় এই নেশার ঘোরটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন—তিনি ইংরেজি-সাহিত্যে কৃতবিদ্য, অথচ তিন-দিনের বিলাতী সভ্যতার মোহে অভিভূত নহেন— তাই এমন একখানি সুচিন্তিত, সুলিখিত, উপাদেয় পুস্তক আমাদের সাহিত্যের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে।

সকল বিষয়ে সকলের সহিত মতের ঐক্য হইবে, এমন প্রত্যাশা কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই করেন না, করিতে পারেন না। কোন বিষয়ে ব্যক্তিবিশেষের মতামত নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে। এই সংসারে সেই নানাবিষয় সকলের পক্ষে একরূপ হয় না—সুতরাং মতের পার্থক্য ঘটিবেই। পূর্ণবাবুর মতের সহিত যদি আমাদের মতের দুইএকস্থলে না মিলে, তাহাতে তাঁহার পুস্তকের উপাদেয়তার কিছুমাত্র লাঘব ঘটে না।

এই পুস্তকের প্রথমেই "সৃষ্টি-তত্ত্বের" আলোচনা। পূর্ণবাবু বলিতেছেন, শাস্ত্রানুসারেই বলিতেছেন—"সৃষ্টি ও প্রলয় ধারাবাহিকক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের নিত্য নিয়ম। একবার সৃষ্টির প্রবাহ, আবার প্রলয়-প্রবাহ, আবার তা-ই। অনাদিকালই সংসারের এই সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিয়ম প্রবাহরূপে নিত্য। অতএব জগৎসংসারের ধ্বংস কখনই নাই। তাহার অবস্থান্তর ঘটে মাত্র। কখন তাহার বিলীনাবস্থা, কখন বিকাশাবস্থা। বিকাশাবস্থাই সৃষ্টি ও স্থিতি, এবং বিলীনাবস্থাই প্রলয়।"

ইহর সহজ অর্থ এই যে, সচরাচর লোকে সৃষ্টি বলিতে যাহা বুঝে—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি—তাহা কখন হয় নাই। মূলপ্রকৃতি অনাদি এবং অনন্ত—সৃষ্ট নহে। এ বিষয়ে অধিক কিছু বলিতে আমরা বিরত হইলাম, কেন না, তাহা করিতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-প্রণালী ও ধর্ম্ম-মতের কথা আসিয়া পড়ে। তাহা প্রীতিকরও নহে, বর্ত্তমান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয়ও নহে।

ইহার পর মনুষ্যোৎপত্তি ও সমাজসৃষ্টি, বর্ণভেদ ও যুগান্তর-পরিণাম, বর্ণভেদ ও জাত্যন্তর-পরিণাম, ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ, কৌলীন্য, বালিকা-বিবাহ, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি নানা গুরুতর সামাজিক বিষয়ের আলোচনা আছে। এই আলোচনায় পূর্ণবাবু যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সুপ্রথিত যুক্তি দ্বারা সমর্থিত এবং স্বাধীন ও গভীর

চিন্তার পরিচারক। কিন্তু এই আলোচনায় একটা গুরুতর অভাবও আছে। যে সকল যুক্তি তাঁহার মতের অনুকূল, পূর্ণবাবু কেবল তাহারই অবতারণা করিয়াছেন; প্রতিকূল যে সকল যুক্তি আছে, তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান নাই। সুতরাং এমন কথা যদি কেহ বলে যে, এই পুস্তকে বিচারকের লেখনী অপেক্ষা উকীলের জিহ্বা সমধিক জাজ্বল্যমান, তাহা হইলে সে কথা আমাদিগকে ঘাড় পাতিয়া নীরবে শুনিতে হইবে।

পূর্ণবাবু এই গ্রন্থের প্রারম্ভে তাঁহার "নিবেদনে" লিখিয়াছেন—"প্রাচীন হিন্দুসমাজ যে উচ্চাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই আদর্শের প্রতি লোকলোচনের দৃষ্টি ফিরান এই গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য।" আমরা অম্লানবদনে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, পূর্ণবাবুর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইয়াছে। যে কেহ কুসংস্কারাচ্ছন্ন নহে, যে কেহ অন্ধ নহে, যে কেহ অমানুষ নহে; সে-ই পূর্ণবাবুর এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া হিন্দুর সমাজপ্রতিষ্ঠার আদর্শের উচ্চতা উপলব্ধি করিবে। কিন্তু "সমাজ-তত্ত্ব"-বিষয়ক গ্রন্থের পক্ষে ইহাই মাত্র প্রমাণ করিলে যথেষ্ট হয় না। যে সমাজ এমন উচ্চ আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার এমন অধঃপতন ঘটিল কেন, এ বিষয়েরও বিচার হওয়া আবশ্যক। আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি সদ্‌গুণের ভিত্তির উপরই ত আমাদের কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তবে আমাদের কুলীনেরা শেষে নর-প্রেত হইয়া উঠিয়াছিলেন কেন? অবশ্যই আমাদের কৌলীন্য-পদ্ধতিতে, পারিপার্শ্বিক অবস্থায় বা আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু ছিল, যাহার জন্য আমাদের এইরূপ দুর্গতি ঘটিয়াছিল। এই সকল কথা না বুঝিলে, কেবল আদর্শের উচ্চতা বুঝিয়া আমাদের বিশেষ কোন লাভ নাই; কেন না, যদিই কোন দেবতা প্রসন্ন হইয়া সেই উচ্চাদর্শে আবার আমাদিগকে পৌছাইয়া দেন, তাহা হইলেও আবার যে আমাদের সেইরূপ অধঃপতন ঘটিবে না, তাহা কেমন করিয়া জানিব।

মাসিকপত্রের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কোন সদ্‌গ্রন্থেরই যথাযথ পরিচয় হইতে পারে না; এই গ্রন্থেরও হইল না। ভাল গ্রন্থের যথার্থ ও সম্যক্ পরিচয়, কেবল সেই গ্রন্থ। যাঁহাদের সাধ্য আছে, তাঁহারা এক এক খণ্ড পুস্তক ক্রয় করিয়া ইহার পরিচয় লয়েন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। তাহাতে সময় ও অর্থ, উভয়েরই সদ্ব্যবহার হইবে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৫

সকালবেলায় জেলেডিঙির শাদা-শাদা পালে নদী খচিত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহারই একটিকে ডাকাডাকি করিয়া লইয়া জেলেদের সাহায্যে একখানি বড় পান্সি ভাড়া করিল এবং নিরুদ্দেশ আত্মীয়দের সন্ধানের জন্য পুলিস নিযুক্ত করিয়া বধূকে লইয়া গৃহে রওনা হইল।

গ্রামের ঘাটের কাছে নৌকা পৌঁছিতেই রমেশ খবর পাইল যে, তাহার পিতার, শাশুড়ির ও আর কয়েকটি আত্মীয় বন্ধুর মৃতদেহ নদী হইতে পুলিস উদ্ধার করিয়াছে। জনকয়েক মাল্লা ছাড়া আর যে কেহ বাঁচিয়াছে, এমন আশা আর কাহারো রহিল না।

বাড়ীতে রমেশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা ছিলেন, তিনি বধূসহ রমেশকে ফিরিতে দেখিয়া উচ্চকলরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পাড়ার যে সকল বরযাত্র গিয়াছিল, তাহাদেরও ঘরে ঘরে কান্না পড়িয়া গেল। এইরূপ প্রবল শোকের ঝড়তুফানের মধ্যে বধূটি যেন একখানি নূতন-তৈরি ছোট নৌকার মত ভয়ে, দুঃখে, সঙ্কোচে আপনার প্রথম অপরিচিত সংসারযাত্রা আরম্ভ করিল। শাঁখ বাজিল না, হুলুধ্বনি হইল না, কেহ তাহাকে বরণ করিয়া লইল না, কেহ তাহার দিকে তাকাইল না মাত্র।

রমেশ মৃত আত্মীয়দের সৎকার করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। দেখিল, তাহাদের বাড়ীতে যে দুইচারিজন প্রাচীন আত্মীয়া অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা বধূকে সকল অকল্যাণের কারণ স্থির করিয়া তাহার প্রতি একেবারে বিমুখ হইয়াছেন। তাঁহাদের তারস্বরে বিলাপোক্তির মধ্যে দুর্লক্ষণা বধূর প্রতি আক্রোশ যথেষ্ট ছিল। ইহাতে আত্মীয়-শোকের মধ্যেও রমেশ তাহার এই হতভাগিনী স্ত্রীর জন্য বিশেষ করিয়া বেদনা বোধ করিল। এই স্বজনপরিত্যক্ত বালিকাটির সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিও কাহারো দৃষ্টি ছিল না। সে যে কি খাইবে, কোথায় দাঁড়াইবে, কোথায় বসিবে, বধূ তাহাও জানে না। মৃত্যুমুখ হইতে সে যে মরুতীরে উঠিয়াছিল, এ গৃহ তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ মরুময়। চিরকালের জন্য এই গৃহকেই তাহার গৃহরূপে বরণ করিয়া লইতে হইবে, এ কথা মনে করিয়া তাহার হৃৎকম্প হইতে লাগিল।

তখন রমেশ তাহার সমস্ত ভার লইল। যাহাতে যথাসময়ে তাহার স্নানাহার হয়, বসন-ভূষণের কোন অভাব না ঘটে, রমেশ তাহার বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া দিল। প্রতিবেশীদের মধ্যে এমন ঘর ছিল না, যে ঘরে রমেশের বিবাহ উপলক্ষ্যে শোকের কারণ না ঘটিয়াছে। সেইজন্য পাড়া হইতে বধূর সঙ্গিনী কেহ জুটিল না। রমেশের বিশেষ অনুনয়ে বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি বালিকার কাজকর্ম্ম করিয়া দিত, কিন্তু নববধূই যে এই পরিবারটিকে ধ্বংস করিয়া দিল, এই বিশ্বাস সে সর্ব্বদাই তাহার সম্মুখে এবং পশ্চাতে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত করিয়া হৃদয়ভার লঘু করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, তাহার সান্ত্বনালাভের এই উপায়টি নববধূর পক্ষে শান্তিজনক হয় নাই। এ বাড়ীতে তাহার খাওয়া, শোওয়া, বসা অভিশাপের কণ্টকে আকীর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ যেখানে যত ইংরাজি ছবির বই ও বাংলা গল্পের বই সংগ্রহ করিতে পারিল, সমস্ত তাহাকে আনিয়া দিল। বালিকার এ বয়সে সমবয়স্ক-মানুষ-সঙ্গের অভাব বইয়ে মিটাইতে পারে না। কিন্তু অগত্যা শোকাচ্ছন্ন সুদীর্ঘ দিন তাহাকে বইয়ের পাতা উল্টাইয়া কাটাইতে হইত।

শ্রাদ্ধশান্তি শেষ হইবার পরেই রমেশ বধূকে লইয়া অন্যত্র যাইবে স্থির করিয়াছিল—কিন্তু পৈতৃক বিষয়সম্পত্তির ব্যবস্থা না করিয়া তাহার শীঘ্র নড়িবার জো ছিল না। পরিবারের শোকাতুর স্ত্রীলোকগণ তীর্থবাসের জন্য তাহাকে ধরিয়া পড়িয়াছে, তাহারও বিধান করিতে হইবে।

এই সকল কাজকর্ম্মের অবকাশকালে রমেশ প্রণয়চর্চ্চায় অমনোযোগী ছিল না। বালিকার সহিত কেমন করিয়া যে প্রণয় হইতে পারে, এই বি.-এ.-পাস্‌করা ছেলেটি তাহার কোন পুঁথির মধ্যে সে উপদেশ প্রাপ্ত হয় নাই। সে চিরকাল ইহা অসম্ভব এবং অসঙ্গত বলিয়াই জানিত। কিন্তু তবু কোন বই-পড়া অভিজ্ঞতার সঙ্গে কিছুমাত্র না মিলিলেও, আশ্চর্য্য এই যে, তাহার উচ্চশিক্ষিত মন ভিতরে-ভিতরে একটি অপরূপ রসে পরিপূর্ণ হইয়া এই ছোট মেয়েটির দিকে অবনত হইয়া পড়িয়াছিল। বিলাতি নভেলে যাহাকে প্রেম বলিয়া বর্ণনা করে, এই ভাবটি ঠিক তাই কি না, সে কথা বলা শক্ত। কিন্তু ইহাকে যে নামই দেওয়া যাক্, ইহাও মনকে অপূর্ব্ব মাধুর্য্যে অভিষিক্ত করিতে পারে। রমেশ ইহাকে ধিক্কার দিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

এই সুকুমারী তরুণ-মেয়েটি যে তাহারি বধূ, এ যে তাহারি ঘরের লক্ষ্মীপদ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে, ইহার এই সরল নবীন জীবনটি ধীরে ধীরে প্রতিদিন বর্দ্ধিত হইয়া তাহার সমস্ত পরিবারকে, তাহার সমস্ত সুখ-দুঃখকে পল্লবে-পুষ্পে কল্যাণে-মাধুর্য্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিবে, এই ক্ষুদ্রটির মধ্যে সেই বিস্তৃত ভবিষ্যতের প্রীতিরসসিক্ত মঙ্গল-ইতিহাস অনুধাবন করিয়া রমেশের হৃদয় সহসা আষাঢ়ের নবাম্বুমেদুর প্রথম মেঘাগমের মত আপনার সমস্ত সরসতা লইয়া ইহার উপরে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। রমেশ আজকাল আপনার পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞাগুলি সহজে স্মরণ করিতে চায় না। স্মরণে পড়িলেও সে এখন

আপনাকে আর দুষ্কৃতিকারী বলিয়া স্বীকার করে না। এখন রমেশ মনকে এই কথা বলে যে, কি অপরাধে বাল্যবিবাহকে একেবারে নির্ব্বাসনদণ্ড দিতে চাহিয়াছিলাম, তাহা এখন বুঝিতে পারি না। মিলনের, বাৎসল্য হইতে সখ্যে, সখ্য হইতে শ্রদ্ধায়, লীলা হইতে প্রণয়ে, প্রণয় হইতে মঙ্গলে পরিণত হইবার প্রত্যেক সোপানটি মধুর, এবং প্রত্যেকটিই অত্যাবশ্যক। পরস্পরের জীবন এইরূপ ক্রমে ক্রমে স্তরে স্তরে নানারসের মধ্য দিয়া মিশিয়া গেলে তবেই সে মিলন সম্পূর্ণ হয়। স্ত্রীকে যে আপনার সহিত ও আপনার পরিবারের সহিত একাত্ম করিতে চায়, সে দাম্পত্যসম্মিলনের গঙ্গোত্রী হইতে সাগরসঙ্গম পর্য্যন্ত অভিব্যক্তির কোন পর্য্যায়কেই উপেক্ষা করিতে পারে না।

এমনি করিয়া রমেশ নিজেকে বেশ করিয়া বুঝাইল। না বুঝাইলেও বধূর প্রতি আকর্ষণ কিছুমাত্র কম হইত, তাহা নহে। সে এই বালিকার মধ্যে কল্পনার দ্বারা তাহার ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছে। সেই উপায়ে তাহার স্ত্রী একই কালে বালিকা বধূ, তরুণী প্রেয়সী, এবং সন্তানদিগের অপ্রগল্‌ভা মাতা রূপে তাহার ধ্যাননেত্রের সম্মুখে বিচিত্রভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রকর তাহার ভাবী চিত্রকে, কবি তাহার ভাবী কাব্যকে যেরূপ সম্পূর্ণ সুন্দররূপে কল্পনা করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একান্ত আদরে লালন করিতে থাকে, রমেশ সেইরূপ এই ক্ষুদ্র বালিকাকে উপলক্ষ্যমাত্র করিয়া ভাবী প্রেয়সীকে—কল্যাণীকে পূর্ণমহীয়সী মূর্ত্তিতে হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল। নিজের জীবনের একটি সুদূরব্যাপী ছবি তাহার মনের সম্মুখে জাগিয়া উঠিল। দেখিল, ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বাংলাদেশের বাহিরে খণ্ডপ্রস্তরে আকীর্ণ একটি ছোট নদীর ধারে গিরিবন্ধুর প্রান্তরের প্রান্তে শালবনের ছায়ায় তাহাদের নূতনবাঁধা গৃহ ;—সহরে কাছারির কাজ সারিয়া এইখানে যখন সে ফিরিয়া আসে, তখন অপরাহ্ণ বনশ্রেণীর মধ্যে সন্ধ্যার রক্তিমায় মিলাইয়া যায়, নীড়প্রত্যাগত নীরব পাখীদের বিশ্রামের মধ্য দিয়া ছায়াপথে তাহার গাড়িটি বাড়ীর দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায়। তাহাদের বাড়ীর অদূরে শৈলমূলে দুটিএকটি গ্রাম আছে—সেখানকার সরল গ্রাম্যনারীরা ডালায় করিয়া ক্ষেতের ফলমূল-শাক্‌সব্‌জি বিক্রয় করিতে আসিয়াছে ; তরুণী গৃহকর্ত্রী পিঠের উপরে শাড়ীর আঁচলটি তুলিয়া বারান্দায় টবের গাছগুলির মধ্যে একখানি ছোট মোড়া লইয়া বসিয়া গেছেন ; যাহার একপয়সা দাম, তাহা দুপয়সা দিয়া কিনিতেছেন, এবং এই ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে গ্রাম্য হিন্দিতে আলাপের খুব ধুম পড়িয়া গেছে। রমেশ আসিয়া পৌছিতেই পিঠের আঁচলটি কবরীর প্রান্তভাগে টানিয়া দিয়া গৃহিণী ঈষৎ হাসিমুখে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমেশ একটু পরিহাস করিয়া বলিল, “ঠাকরুণ, তুমি যে সওদাগরী আরম্ভ করিয়াছ, আমাকে ফেল্ করিবে দেখিতেছি।” ঠাকরুণ তাহার উত্তর না দিয়া রমেশের আহারের ব্যবস্থা করিতে চলিলেন। এই কেনা উপলক্ষ্য করিয়া রমেশানী পল্লীর মেয়েদের আপনার করিয়া লইয়াছেন—তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক

তাহাদের কাছে দুচার পয়সা করিয়া ঠকিয়া থাকেন। এইরূপ দয়ার বাণিজ্যদ্বারা তিনি, কেবল শাক্‌সব্‌জি নহে, চারিদিকের গ্রামগুলির হৃদয় কিনিয়া লন। রমেশ এই-রূপে তাহার জীবনচিত্র নানারঙে রাঙাইয়া তাহার মাঝখানটিতে একটি মধুর মূর্ত্তি নানা অবস্থায় নানা ভাবে দাঁড় করাইয়া দিত। দূরব্যাপী ভবিষ্যতের রঙ্গভূমিতে এই বধূটি রমেশের নব নব কল্পনালীলার নায়িকারূপে বিচিত্র সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া বিহার করিতে লাগিল।

হায় মায়াবিনী কল্পনা! বেশিদিনের কথা নহে, এই মূঢ় যুবকটি গোলদীঘির ধারে পায়-চারি করিতে করিতে ঊর্দ্ধমুখে আর এক রঙের মরীচিকা সৃজন করিতেছিল। তখন সে দেখিতেছিল, কলিকাতার রাজপথপার্শ্বে তাহার ঘরের একতলায় চায়ের টেবিল্ পড়িয়াছে; চিন্তাশীল ভাবুক বন্ধুরা চারিদিক্ হইতে আকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছে; সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতির চর্চ্চায় বাহিরের ট্রামের শব্দ আর শুনা যাইতেছে না। দেবী সরস্বতী তরুণী বধূর রূপে তাঁহার স্বর্ণবীণা ছাড়িয়া ভক্তগণকে চা পরিবেষণের ভার লইয়াছেন; মাঝে মাঝে সময় বুঝিয়া তিনি দুটি-একটি যা কথা বলিতেছেন, তাহাতে মন্দবেগ আলোচনা তরঙ্গিত হইয়া উঠিতেছে এবং উন্মত্ত তর্ক মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় শান্ত হইয়া যাইতেছে। ইত্যাদি আরো কত কি! সে সমস্ত ছবির রেখা ম্লান হইয়া গেছে, আজ আর তাহাদের কোন মূল্য নাই!

কিন্তু কল্পনালোকে রমেশের যেরূপ বিপুল আয়োজন-উদ্যোগ, বাস্তবক্ষেত্রে তাহার তদনুরূপ তৎপরতা দেখা যায় না। বালিকার সঙ্গে কেমন করিয়া হাসিখেলা-বাক্যালাপ করিতে হয়, তাহা সে কিছুই জানে না। তাহার কথাবার্ত্তা গম্ভীর—দুর্ব্বোধ হইয়া পড়ে। বধূর কাছ হইতে উত্তর না পাইলে তাহার কথার স্রোত বন্ধ হইয়া আসে। বালিকা সঙ্গ-অভাবে কাতর বলিয়া রমেশ বিশেষ করিয়া, বেশি করিয়া সঙ্গদান করিতে চায়, কিন্তু সেই সঙ্গবাহুল্যে বধূকে ক্লিষ্ট করিয়াই তোলে। রমেশ বুঝিতে পারে ঠিকটি হইতেছে না, তাহাতে তাহার মনের আবেগ বাড়িয়া ওঠে, অথচ কোন উপায়ও খুঁজিয়া পায় না। বালিকার সহিত এই যুবকের সম্পূর্ণ-মিলনের দরজাটা বন্ধ আছে, রমেশ কোথাও তাহার চাবি হাতড়াইয়া পায় না।

পরিবার যেখানে পরিপূর্ণ, বালিকা বধূ সেখানে আপনার চিত্তের উপযোগী খোরাক পায়। সখীদের সহিত স্নেহে, সখ্যে, খেলা-ধূলায় দেখিতে দেখিতে সে সরস হইয়া বাড়িয়া উঠে, পরিবারের মধ্যে তাহার ডাল মেলিয়া যায়, তাহার শিকড় ছড়াইয়া পড়ে। একান্নবর্ত্তী ঘরে নারীর যখনকার যাহা, তখন সে তাহা পায়, এইজন্য তাহার পরিপূর্ণ বিকাশ হইয়া একদিন সে যথার্থ গৃহিণী হইতে পারে ও হৃদয়ের নানা সম্বন্ধ দ্বারা নানা লোককে আপনার করিয়া লইবার শক্তি-লাভ করে।

কিন্তু একলা স্বামী বধূকে গৃহিণী করিতে পারে না—সে তাহাকে প্রশ্রয়ের দ্বারা নষ্ট অথবা দৌরাত্ম্য দ্বারা দলিত করিতে পারে। স্তন্যদানের সময় অন্ন দিয়া শিশুকে মানুষ করা যায় না, রমেশ সেইরূপ বালিকাকে যে

সঙ্গ দিতে পারে, তাহা তাহার পক্ষে পুষ্টিকর নহে। শিক্ষিত যুবক বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহাকে তাড়াতাড়ি প্রেয়সীর মত আপনার করিয়া লইতে চেষ্টা করিলে, তাহাতে বিলাতি ফেশানের স্ত্রীও গঠিত হয় না, হিন্দু-ঘরের গৃহিণীও বিকাশ পায় না।

এইরূপে ছোট এই একটুখানি হৃদয় বশ করিবার চেষ্টায় রমেশের সমস্ত মন খাটিতে লাগিল। যদিও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বরপুত্র বাল্যকাল হইতে কেবল পঁড়া-তৈরি করিয়াই আসিয়াছে, চিত্তবৃত্তির স্বাধীনচর্চ্চার কোন অবকাশই পায় নাই, তবু তাহার কাণ্ডজ্ঞান একেবারেই নষ্ট হয় নাই। কিছুদিনের মধ্যেই রমেশ বেশ বুঝিতে পারিল যে, সে এই বালিকার স্বামী বটে, কিন্তু সে খেলেনা নহে। স্বামীর চেয়ে খেলেনার অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে; তাহাকে দুষ্ট মনে করিয়া শাসন করা যায়, শিষ্ট মনে করিয়া প্রশ্রয় দেওয়া চলে, তাহাকে বালকের সাজ করাইয়া পাঠশালা বসানো যায়, আবার আবশ্যকমত বালিকার বেশ পরাইয়া উপযুক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের আয়োজন করিলে তাহার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটে না। স্বামীর ব্যবহার ঠিক তাহার উল্টা। কোন কথা না কহিলেও সে কথা কহে, তাহার সঙ্গে খেলার সম্পর্ক পাতাইবার পূর্ব্বেই সে বালিকাকে খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করে—তাহাকে বাক্সর মধ্যে চাপা দিয়া রাখাই শক্ত। অতএব এই স্বামি-পদার্থকে লইয়া অধিক সময় কাটানো চলে না, পুতুলকে লইয়া সমস্ত দিন কাটিতে পারে।

লোকে শুনিয়া হাসিবে, কিন্তু রমেশ সাহেববাড়ী হইতে একটি বাক্সভরা বিচিত্র খেল্‌না আনাইয়া দিল। সহধর্ম্মিণীকে খেল্‌না কিনিয়া দিতে হইবে, আর কিছুদিন আগে এ কথা রমেশকে বলিলে, সে বোধ হয় বক্তার প্রতি ধৈর্য্যরক্ষা করিতে পারিত না। আজ খেল্‌নালাভে বালিকার আনন্দ দেখিয়া রমেশের মুখে স্নেহকোমল কৌতুকের হাস্য দেখা দেয়। সময়ে সময়ে সে নিঃশব্দপদে পশ্চাতে আসিয়া অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া বধূর খেলা দেখে; যদি এ বিদ্যায় তাহার কিছুমাত্র দখল থাকিত, তবে সে খেলায় যোগ দিতেও পারিত।

কিছুদিন পরে লোকমারফৎ কলিকাতা হইতে একখাঁচা নানাজাতীয় ছোট ছোট পাখী উপস্থিত হইল। বধূ তখন তাহার পুত্রিকাকে পালঙ্কে শোয়াইয়া রোদন করিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিতেছিল, মাঝে মাঝে ভূতের ভয় দেখাইয়া তাহাকে ভর্ৎসনা করিতেও ছাড়িতেছিল না, অবশেষে বাহুপাশে তাহাকে দোলাইতে দোলাইতে যখন তাহাকে স্তনদানে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এমন-সময় রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকা তাড়াতাড়ি তাহার পুতুল ফেলিয়া দিয়া মাথায় ঘোম্‌টা টানিয়া বসিল। রমেশ কাছে আসিয়া কহিল, "আজ তোমার জন্য কি আনিয়াছি বল দেখি!" লুব্ধা বালিকা নূতন পুতুলের আশ্বাসে ঘোম্‌টার ভিতর হইতে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ তখন ঘরের বাহির হইতে খাঁচাটি আনিয়া বধূর সাম্‌নে রাখিল এবং তাহার কাপড়ের আবরণটি তুলিয়া দিল। ছোট ছোট

পাখিগুলিকে দেখিয়া বউ খুসি আর চাপিয়া রাখিতে পারে না! এমন উপহার সে কখনো কাহারো কাছ হইতে পায় নাই। স্বামী যে অনাবশ্যক নহে, তাহা এইরূপ উপায়ে ক্রমে ক্রমে বুঝিতে পারা যায়।

এই পাখিগুলি লইয়া রমেশের সঙ্গে তাহার বধূর পরিচয় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। বিদেশী পাখীদের খাইবার উপযুক্ত বীজশস্য রমেশ কলিকাতা হইতে আনাইয়া থলিতে করিয়া নিজের কাছেই রাখিয়াছিল। প্রত্যহ দুইবেলা যথাপরিমাণ আনিয়া সে পাখীদিগকে পরিবেষণ করিত। কি করিয়া স্নানের আয়োজন করিতে হয়, বধূকে সে-সম্বন্ধে রমেশ উপদেশ ও সাহায্য করিত। রমেশ এম্‌নি কৌশল অবলম্বন করিল, যাহাতে পক্ষি-পালনকার্য্যে সর্ব্বদা তাহার সাহায্য ব্যতীত চলা অসম্ভব হইয়া উঠিল। এই উপায়ে কথাবার্ত্তা সুরু হইল। উভয়ে মিলিয়া অনেক আলোচনা করিয়া প্রত্যেক পাখীর নামকরণ করিল। কোন্ পাখীটা পুরুষ, কোন্‌টা স্ত্রী, তাহা লইয়া তর্ক এতদূর যাইত যে, রমেশ এবং তাহার প্রাণিতত্ত্ববিদ্যা যদি হার না মানিত, তবে ঝগড়া হইতে পারিত! যে পাখীর ডানায় রংচং বেশি ও সুন্দর দেখিতে, তাহাকে বালিকা কোনমতেই পুরুষ বলিয়া স্বাকার করিতে চাহিত না—দুর্ব্বল স্বামী বিজ্ঞানের সাহায্যে সত্যপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করিয়া পাখিগুলির শাস্ত্রবিরুদ্ধ নাম-করণই শিরোধার্য্য করিয়া লইত।

বধূ একএকদিন অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে চোখ ছল্‌ছল্ করিয়া রমেশকে আসিয়া বলিত, "পুণ্ডরীক আজ কিছুই খাইতেছে না, ও বোধ হয় মরিয়া যাইবে!" কোনদিন বা তাহার মহাশ্বেতা বিকাল হইতে ডানার মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ঘুমাইত, সেটা তাহার পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার কারণ হইয়া উঠিত। রমেশ এইরূপে তাহার অনেক সুখদুঃখের ভাগী হইয়া উঠিল!

তাহাদের বৃহৎ দ্বিজপরিবারে ইতিমধ্যে দুইএকটা শোকাবহ ঘটনাও ঘটিয়াছে। দুইএকটা পাখী মারাও গিয়াছে। বালিকা আহার ত্যাগ করিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাই-য়াছে। তখন সান্ত্বনাকার্য্যে রমেশকে অনেক সময় দিতে হইয়াছে।

৬

এইরূপে প্রায় তিনমাস অতীত হইয়া গেল। বৈষয়িক ব্যবস্থা সমস্ত সমাধা হইয়া আসিল। প্রাচীনারা তীর্থবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রতিবেশিমহল হইতে দুইএকটি সঙ্গিনী নববধূর সহিত পরিচয়স্থাপনের জন্য একটু একটু অগ্রসর হইতে লাগিল। রমেশের সঙ্গে বালিকার প্রণয়ের প্রথম গ্রন্থি অল্পে অল্পে আঁট হইয়া আসিল।

এখন সন্ধ্যাবেলায় নির্জ্জন ছাদে খোলা আকাশের তলে দুজনে মাদুর পাতিয়া বসিতে আরম্ভ করিয়াছে। রমেশ পিছন হইতে হঠাৎ বালিকার চোখ টিপিয়া ধরে, তাহার মাথাটা বুকের কাছে টানিয়া আনে, বধূ যখন রাত্রি অধিক না হইতেই না খাইয়া ঘুমাইয়া পড়ে, রমেশ তখন তাহাকে ললাটে চুম্বন করিয়া জাগাইতে চেষ্টা করে, বালিকা এই মৃদু উপায়ে না জাগিলে নানাবিধ উপদ্রবে তাহাকে সচেতন করিয়া তাহার বিরক্তি-তিরস্কার লাভ করে। ক্রমে তাহাকে অল্পে

অল্পে সাহিত্যরসের নেশা ধরাইয়া দিবে, এরূপ উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় দুর্গ্রহ হঠাৎ আর একবার জাগিয়া উঠিল।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় রমেশ বালিকার খোঁপা ধরিয়া নাড়া দিয়া কহিল, "সুশীলা, আজ তোমার চুলবাঁধা ভাল হয় নাই।"

বালিকা বলিয়া বসিল, "আচ্ছা, তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলিয়া ডাক কেন?"

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বধূ কহিল, "আমার নাম বদল হইলেই কি আমার পয় ফিরিবে? আমি ত শিশুকাল হইতেই অপয়মন্ত—না মরিলে আমার অলক্ষণ ঘুচিবে না!"

হঠাৎ রমেশের বুক ধক্ করিয়া উঠিল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল—কোথায় কি একটা প্রমাদ ঘটিয়াছে, এ সংশয় হঠাৎ তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "শিশুকাল হইতেই তুমি অপয়মন্ত কিসে হইলে?"

বধূ কহিল, "আমার জন্মের পূর্ব্বেই আমার বাবা মরিয়াছেন, আমাকে জন্মদান করিয়া তাহার ছয়মাসের মধ্যে আমার মা মারা গেছেন। মামার বাড়ীতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনিলাম, কোথা হইতে আসিয়া তুমি আমাকে পছন্দ করিলে—দুইদিনের মধ্যেই বিবাহ হইয়া গেল, তার পরে দেখ, কি সব বিপদ্‌ই ঘটিল! এই দেখ, আমি তিন-মাস এখানে থাকিতে থাকিতে তিনটি পাখী আমার মরিয়াছে! আমি জানি, ওর একটাও বাঁচিবে না!"

রমেশ নিশ্চল হইয়া তাকিয়ার উপরে শুইয়া পড়িল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, তাহার জ্যোৎস্না কালী হইয়া গেল। রমেশের দ্বিতীয় প্রশ্ন করিতে ভয় হইতে লাগিল। যতটুকু জানিয়া ফেলিয়াছে, সেটুকুকে সে প্রলাপ বলিয়া, স্বপ্ন বলিয়া সুদূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। পাছে নিদারুণ কোন সত্যকে আর চাপিয়া রাখা না যায়, পাছে সুকঠিন সত্য এখনি কুহেলিকামুক্ত-সুবিপুল-পর্ব্বত-সমান অভ্রভেদী হইয়া উঠে, এই ভয়ে রমেশ চুপ করিয়া আড়ষ্ট হইয়া রহিল। সংজ্ঞা-প্রাপ্ত মূর্চ্ছিতের দীর্ঘশ্বাসের মত গ্রীষ্মের দক্ষিণ হাওয়া বহিতে লাগিল। জ্যোৎস্নালোকে নিদ্রাহীন কোকিল ডাকিতেছে—অদূরে নদীর ঘাটে বাঁধা নৌকার ছাদ হইতে মাঝিদের গান আকাশে জ্যোৎস্নার মধ্যে ব্যাপ্ত হইতেছে। অনেকক্ষণ কোন সাড়া না পাইয়া বধূ অতি ধীরে ধীরে রমেশকে স্পর্শ করিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ?"

রমেশ কহিল, "না।"

তাহার পরেও অনেকক্ষণ রমেশের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বধূ কখন্ আস্তে আস্তে ঘুমাইয়া পড়িল। রমেশ উঠিয়া-বসিয়া তাহার নিদ্রিত মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর মুখখানি! ফুলের মত অম্লান-কোমল! তরুণ হৃদয়ের মৃদু সুগন্ধটুকু যেন ঐ সরল সুকুমার মুখ হইতে নিশ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। বিধাতা ইহার ললাটে যে গুপ্তলিখন লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা আজো এই মুখে একটি আঁক কাটে নাই। এমন সৌন্দর্য্যের ভিতরে সেই ভীষণ পরিণাম কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন হইয়া বাস করিতেছে!

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া যায়—আজ আর রমেশ তাহার ললাট চুম্বন করিল না, তাহাকে স্পর্শ করিল না। জোয়ারের টানে সমুদ্রের সমস্ত তরঙ্গ যেমন একবার পূর্ণচন্দ্রের দিকে উঠে, আবার নামিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, তেম্‌নি রমেশের সমস্ত ক্ষুব্ধ হৃদয় একবার ঐ সুপ্ত মুখখানির দিকে অগ্রসর হইয়া আবার আপনার অতলের দিকে হতাশ হইয়া নামিয়া পড়িতে লাগিল।

ক্রমশ।

সন্ধ্যা।

আমার খোলা জানালাতে
শব্দবিহীন চরণপাতে
কে এলে গো, কে গো তুমি এলে!
একলা আমি বসে আছি
অস্তলোকের কাছাকাছি
পশ্চিমেতে দুটি নয়ন মেলে'।
অতি সুদূর দীর্ঘপথে
আকুল তব আঁচল হ'তে
আঁধারতলে গন্ধরেখা রাখি'
জোনাক-জ্বালা বনের শেষে
কখন্ এলে দুয়ারদেশে
শিথিল কেশে ললাটখানি ঢাকি'!

তোমার সাথে আমার পাশে
কত গ্রামের নিদ্রা আসে,
পান্থবিহীন পথের বিজনতা,
ধূসর আলো কত মাঠের,
বধূশূন্য কত ঘাটের
আঁধার কোণে স্তব্ধ কলকথা
শৈলতটের পায়ের 'পরে
তরঙ্গদল ঘুমিয়ে পড়ে
স্বপ্ন তারি আন্‌লে বহন করি',

কত বনের শাখে শাখে
পাখীর যে গান সুপ্ত থাকে
এনেছ তাই মৌন নূপুর ভরি' !

ভালে তোমার কোমল হস্ত
এনে দেয় গো সূর্য্য-অস্ত,
এনে দেয় গো কাজের অবসান,
সত্যমিথ্যা ভালমন্দ
সকল সমাপনের ছন্দ,
সন্ধ্যানদীর নিঃশেষিত তান !
আঁচল তব উড়ে এসে
লাগে আমার বক্ষে কেশে,
দেহ যেন মিলায় শূন্য'পরি,
চক্ষু তব মৃত্যুসম
স্তব্ধ আছে মুখে মম
কালো আলোয় সর্ব্বহৃদয় ভরি' !

যেম্‌নি তব দখিনপাণি
তুলে ল'য়ে প্রদীপখানি
রেখে দিল আমার গৃহকোণে
গৃহ আমার একনিমেষে
ব্যাপ্ত হ'ল তারার দেশে
তিমিরতটে আলোর উপবনে।
আজি আমার ঘরের পাশে
গগনপারের কা'রা আসে
অঙ্গ তাদের নীলাম্বরে ঢাকি' !
আজি আমার দ্বারের কাছে
আদিম নিশা স্তব্ধ আছে
তোমার পানে মেলি তাহার আঁখি !

এই মুহূর্ত্তে আধেক ধরা
ল'য়ে তাহার আঁধার-ভরা
কত বিরাম, কত গভীর প্রীতি

আমার বাতায়নে এসে
দাঁড়িয়েছে আজ দিনের শেষে,
শোনায় তোমায় গুঞ্জরিত গীতি !
চক্ষে তব পলক নাহি,
ধ্রুবতারার দিকে চাহি
তাকিয়ে আছ অনাদিকালপানে !
নীরব দুটি চরণ ফেলে
আঁধার হ'তে কে গো এলে
আমার ঘরে আমার গীতে গানে !

কত মাঠের শূন্যপথে,
কত পুরীর প্রান্ত হ'তে,
কত সিন্ধুবালুর তীরে তীরে,
কত শান্ত নদীর পারে,
কত স্তব্ধ গ্রামের ধারে,
কত সুপ্ত গৃহদুয়ার ফিরে'
কত বনের বায়ুর 'পরে
এলোচুলের আঘাত করে'
আসিলে আজ হঠাৎ অকারণে !
বহু দেশের বহু দূরের
বহু দিনের বহু সুরের
আনিলে গান আমার বাতায়নে !

বিষ্ণুমাহাত্ম্য।

সংসার অনিত্য ; দেবতাদিগের সৌভাগ্যও ক্ষণস্থায়ী। বৈদিক যুগে যে সকল দেবতা মহিমময় ছিলেন, পৌরাণিক যুগে তাঁহাদের তেমন আদর-অভ্যর্থনা দেখিতে পাওয়া যায় না। অবস্থা মন্দ হইলে, কেবল বনিয়াদি বলিয়া যে সম্মানটুকু পাওয়া যায়, বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে কেবল জনকতকের ভাগ্যে তৎটুকুই অবশিষ্ট রহিয়া গেল। নব দেবতাদিগের পূজার পূর্ব্বাহ্নে, কোনরূপে ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পালগণ এজমালিতে একটি

ফুল পাইতে লাগিলেন। বিষ্ণু প্রাচীনকালেও নামজাদা ছিলেন; কিন্তু তখন তিনি ইন্দ্রের তুলনায় ক্ষুদ্র দেবতামাত্র। বৈদিক এবং পৌরাণিক যুগের সন্ধিকালেও বিষ্ণু দ্বাদশ আদিত্যের একটি; মহাভারতেরও স্থানে স্থানে সে কথা পাই। কিন্তু ঐ মহাভারতেই উঁহাকে আবার বড় ক্ষমতাশালী দেখিতে পাওয়া যায়;—একেবারে স্বয়ং নারায়ণ। বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশে দেবগণের জন্মপরিগ্রহের সময়ে দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র এবং বিষ্ণু অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যের এক একটি আদিত্যরূপে উৎপন্ন হইলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ, ১৫শ অধ্যায়, ১৩০—১৩৩ পর্য্যন্ত) ঐ বিষ্ণুপুরাণেই আবার বিষ্ণু ইন্দ্রানুজ বলিয়া আখ্যাত। তৎপরেই আবার দেখিতে পাই যে, ইন্দ্রের নন্দনবনের পারিজাতগ্রহণ উপলক্ষ্যে কৃষ্ণরূপী বিষ্ণু ইন্দ্রকে পরাস্ত করিলে, ইন্দ্র তাঁহাকে স্তবস্তুতি করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৫ম অংশ, ৩০তম অধ্যায়) কৃষ্ণের নবোদিত প্রভাবমহিমায় হউক, অথবা বিষ্ণুর স্বীয় প্রভাবেই হউক, কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন। ইন্দ্রের ক্ষমতালোপ করিয়া, তাঁহার রাজচিহ্ন (ধ্বজ), অস্ত্র (বজ্র) এবং ঐরাবতের জন্য ব্যবহৃত অঙ্কুশ, নবদেবতা স্বীয় শরীরে আত্মচিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে যে, কেশীনামক একটা দৈত্য প্রজাপতির একটি কন্যা হরণ করিবার উদ্যোগ করিয়াছিল বলিয়া, ইন্দ্র ঐ দৈত্যকে পরাভূত করেন। বিষ্ণুরূপী কৃষ্ণ কেশীনিধন করিয়াছিলেন, পুরাণে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রের মহিমা লুপ্ত করিয়া বিষ্ণুর ক্ষমতা বাড়াইবার জন্যই পুরাতনের উপর এই সকল নূতন সংস্করণ।

বহুদিন হইতে বৈদিক পূষা, হয় ত বিষ্ণুর তাড়নায়, অজাশ্বের গাড়িখানি হাঁকাইয়া দেশত্যাগী হইয়াছিলেন; এবং বিষ্ণু হয় ত তাঁহারই গদাটি কাড়িয়া রাখিয়াছিলেন। পূষার যে একটি গদা ছিল এবং বিষ্ণুর যে তাহা ছিল না, বেদ তাহার সাক্ষী। বিষ্ণু ও পূষা, দুইজনেই দ্বাদশ আদিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন; এবং পরে বিষ্ণু বড় হইয়া উঠেন। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া বড়ই সন্দেহ হয় যে, গদাধরের হস্তে পূষার গদা। পূষার গদার প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লই। পূষা বৈদিককালে 'কপর্দ্দী' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। কপর্দ্দ অর্থে কড়ি এবং কড়ির মত বিন্যস্ত কেশজটা। উত্তরকালে রুদ্র কপর্দ্দী হইয়াছিলেন, তাহা জানা আছে; ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর পৌরাণিক যুগের প্রধান দেবতা, তাহাও জানি। পূষা যখন তাড়িত হন, রুদ্র এবং বিষ্ণু উভয়েই তখন তাঁহার প্রতিপক্ষ। জ্ঞাতিবিবাদের সময় বিষ্ণু যখন গদাটি কাড়িয়া লইয়াছিলেন, মহেশ্বরও যে তখন বেচারার কেশাকর্ষণ করেন নাই, তাহা বলা যায় না।

পৌরাণিক বিষ্ণু শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, ধ্বজবজ্রাঙ্কুশচিহ্নিত এবং তাঁহার বক্ষে শ্রীবৎসলাঞ্ছন। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ এবং গদার ইতিহাস বোধ হয় পাওয়া গিয়াছে; বাকি রহিল শঙ্খ, পদ্ম এবং বক্ষের চিহ্ন। গৌরবের আভরণগুলির সম্পূর্ণ ইতিহাস না পাইলে উঁহার মাহাত্ম্য বুঝিবার পক্ষে সুবিধা

হইবে না। একে একে সেই কথা বলিতেছি।

(১) চক্রটি বিষ্ণুর পৈতৃক সম্পত্তি; ওটি নিশ্চয়ই আদিত্যের চক্র। তবে এ চক্রটি বড় সুন্দরদর্শন এবং ইন্দ্রের দম্ভোলি অপেক্ষাও ক্ষমতাসম্পন্ন।

(২) পদ্মটি জ্ঞাতিকুলের বা পূর্ব্বপুরুষের সম্পত্তি নহে। শিবপূজাপ্রবন্ধে বলিয়াছি যে, পৌরাণিক যুগের সূত্রপাত বৈদিক বৌদ্ধ এবং অনার্য্যধর্ম্মের মিশ্রণে। বৌদ্ধেরা যে বুদ্ধদেবকে ত্রিমূর্ত্তিবিশিষ্ট করিয়াছিল, সে কথাও কিঞ্চিৎ বলিয়াছিলাম; বজ্রপাণি বুদ্ধ, অমিতাভ বুদ্ধ এবং পদ্মপাণি বুদ্ধ লইয়া এই ত্রিমূর্ত্তি। শিব বা মহেশ্বর যে বজ্রপাণি বুদ্ধের স্থলাভিষিক্ত, সে কথা পূর্ব্বে লিখিয়াছি। পৌরাণিক ত্রিমূর্ত্তিকল্পনা যখন বৈদিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তখন ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর যে ঐ ত্রিমূর্ত্তির অনুরূপ নব দেবতা, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। বিষ্ণু যে পদ্মপাণি বুদ্ধের পদ্মটি হাতে করিয়া উপস্থিত, তাহা তাঁহার শান্তিময়-স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। ব্রহ্মার সম্বন্ধেও ঐ কথা। শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম্মের ঘাতপ্রতিঘাত প্রবন্ধে এ বিষয়ের বিশেষ বিবৃতি আছে। তিনি লিখিয়াছেন যে, "অমিতাভ বুদ্ধ, কিনা অপরিমিত জ্যোতি —ইঁহাকে স্বর্ণজ্যোতি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা বলিলেও চলে।" এ সকল কথার পর পদ্মের অন্য উৎপত্তি স্বীকার করা সুসাধ্য নহে।

(৩) শঙ্খের ইতিহাস একটু জটিল। ইন্দ্র বেচারার একটা শঙ্খ ছিল; অর্জ্জুন সেই দেবদত্ত শঙ্খ লইয়া দৈত্যবধ করিতে গিয়াছিলেন। বিষ্ণু কি ইন্দ্রের শঙ্খটাও লইয়া আসিয়াছিলেন? পুরাণে দেখিতে পাই যে, একবার আর্য্যবিদ্বেষী একটা দৈত্য আর্য্যদিগের অনেক স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি চুরি করিয়া সমুদ্রগর্ভে চলিয়া গিয়াছিল। অস্থাবর সম্পত্তি কুবেরের শঙ্খনিধি এবং স্থাবর সম্পত্তি বেদ। বিষ্ণু তখন মৎস্য হইয়া বেদ উদ্ধার করিলেন এবং শঙ্খটিও লইয়া আসিলেন। শঙ্খটি কি পুরস্কারের হিসাবে হাতেই রহিয়া গিয়াছিল? এখানে বলিয়া রাখি যে, বিষ্ণুর অবতারকল্পনার জন্য জলপ্লাবনের মৎস্যের কথাটা এখানে নূতনভাবে রচিত। আবার অন্যত্র দেখিতে পাই যে, এক একটি জাতি বা বংশে এক একটি বিশেষ রণবাদ্যের যন্ত্র ছিল। শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চজন অসুরকে বধ করিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ লাভ করিয়াছিলেন। এখন কথা এই যে, বিষ্ণুর হস্তে একটা শঙ্খ ছিল বলিয়া কৃষ্ণকে একটি শঙ্খ দেওয়া হইয়াছে, অথবা যদুকুলে শঙ্খ ছিল বলিয়া বিষ্ণুর হস্তে ইন্দ্রের শঙ্খ দিয়া বিষ্ণু এবং কৃষ্ণের অভেদ কল্পিত হইয়াছে?

(৪) শ্রীবৎসলাঞ্ছন বড় সহজ রকমের জিনিষ নহে। যাত্রার দলের কৃষ্ণ যে কূলকিনারা না পাইয়া "খড়িমাটিরে বলদেব" বলিয়াছিল, তাহাতে আর বিস্ময় হয় না। পুরাণকর্ত্তারা বলেন যে, একটা বিশেষ আকৃতিতে কুঞ্চিত শুক্লবর্ণের বক্ষোরোমের নাম শ্রীবৎস। জৈনদিগের দশম জিনের বক্ষেও ঐ চিহ্ন ছিল। জিনের চিহ্ন বিষ্ণু লইয়াছেন কিংবা বিষ্ণুর চিহ্ন জিন লইয়াছেন, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে; কারণ,

পৌরাণিক যুগের সময়ে জৈনেরা অনেক হিন্দুপুরাণকে জৈন করিয়া লইয়াছিল।

শ্রীবৎসের আর একটি অর্থের কথা বলিতেছি। শ্রী অর্থে লক্ষ্মী এবং বৎস অর্থে প্রিয়; এই সূত্র ধরিয়াও বিষ্ণুকে শ্রীবৎস বলা হইয়াছে। এ অর্থটা যে শব্দের নানা অর্থের সাহায্যে নূতন কল্পনা, তাহা লক্ষ্মী-দেবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। শ্রী বা লক্ষ্মী প্রথমত অশরীরী সৌন্দর্য্য এবং সৌভাগ্যমাত্রই ছিলেন; কেবল-মাত্র কথার রূপকে দেবরাজ ইন্দ্র ত্রৈলোক্য-শ্রী সম্ভোগ করিতেছিলেন। শ্রী কোন আস্ত দেবীর নাম ছিল না। পুরাণে দেখিতে পাই যে, ইন্দ্র দুর্ব্বাসার অভিশাপে ত্রৈলোক্য-শ্রী হারাইয়াছিলেন; এবং পরে সমুদ্র-মন্থনের সময় যখন পুনরুত্থিতা হইলেন, তখন একেবারে গিয়া বিষ্ণুর বক্ষশোভা হইয়া বসিলেন। এখানেও যেন রূপক চলিয়াছিল; এবং সেইজন্যই প্রথমত লক্ষ্মী-দেবীর প্রতিষ্ঠা বা পূজা দেখিতে পাই না। অগ্নিপুত্র স্কন্দদেবের ইতিহাসে মহাভারতের বনপর্ব্বে উল্লিখিত আছে যে, স্কন্দপত্নী দেব-সেনাই শ্রী। পঞ্চমী তিথিতে ইঁহার বিবাহ হইয়াছিল বলিয়া শুক্লপঞ্চমী শ্রীপঞ্চমী নামে আখ্যাত হইয়া ঐ সময়ে শ্রীর পূজা হইত। এখন কিন্তু শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা হয়। শ্রীঠাকুরাণীকে লইয়া বড়ই গোলে পড়া গেল। কতকগুলি ভীমরূপিণী মাতৃকা স্কন্দের অনুচরী ছিলেন। স্কন্দকে যখন মহাদেবের পুত্র বলিয়া নূতন পুরাণ হইল, তখন 'মাতৃকা'কথাটার অন্যরকম অর্থের সুবিধায়, নূতন সম্পর্ক সৃষ্টি করিয়া, কতকগুলি মাতৃকাকে পার্ব্বতীর নামান্তর বা রূপান্তর বলিয়া মহেশ্বরের পত্নী করা হইয়াছিল। এটা তান্ত্রিকধর্ম্মপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে হয় নাই। শিশু স্কন্দকে মাতৃকাগণ রক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া, ষষ্ঠীনাম্নী মাতৃকা নবজাত সন্তানের কল্যাণ-কামনায় পূজিতা হইতেছিলেন। কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থেও ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ দেখিতে পাই। এই সকল দেবীগণ এত পূজ্যা এবং যথার্থ দেবী বলিয়া স্বীকৃতা যে, কোন শাস্ত্রে বা সাহিত্যে শাপভ্রষ্টা করিয়াও ইঁহাদিগের নরসহবাস কল্পিত হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্মীকে কথায় কথায় বীরপুরুষ এবং রাজাদিগের পত্নীরূপে বর্ণিতা হইতে দেখা যায়। অন্য দেবী লইয়া এপ্রকার কল্পনা বা রূপক-যোজনাও মহাপাপ। শাপভ্রষ্টা সরস্বতী নরসহবাসে বাণভট্টের পূর্ব্বপুরুষের সৃজন-কারিণী। কমলার সহিত ঋষিসহবাসের কথা কাদম্বরীতে কল্পিত আছে। এইজন্য মনে হয় যে, রূপকের দেবীটি কোনরূপে বিষ্ণু-ঠাকুরের বক্ষে বসিয়া ঠাকুরের গৃহশূন্যতার অপবাদ মোচন করিয়াছেন। শ্রীবৎস প্রথমত বক্ষের চিহ্নবিশেষই ছিল, পরে শ্রীর প্রণয় হইতে ঐ কথাটার ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে।

নূতন বিষ্ণু নূতন মহেশ্বরের মত নানা দেবতা ভাঙিয়া গঠিত। শিবের মত বিষ্ণুও অনেক অনার্য্য দেবতাদিগকে অঙ্গীভূত করিয়াছিলেন। বিষ্ণুমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, মহারাষ্ট্রদেশীয় বিঠল, তৈলঙ্গ-দেশীয় ভেঙ্কট প্রভৃতি অনার্য্যদেবতা বিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছিলেন।

চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর বক্ষে অচলা করা হইয়াছে; তবুও বিষ্ণুর সৌভাগ্য চিরস্থায়ী

হয় নাই। পঞ্চম শতাব্দীর পর হইতেই খাঁটি বিষ্ণুপূজার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণরূপ বিষ্ণুর পূজা প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। পুরাণের বিষ্ণু কৃষ্ণমাত্র। কৃষ্ণের দেহে আপনার অবতার সংক্রমণ করিয়া দিয়া, বিষ্ণু একেবারে সাগরবক্ষে গিয়া নিদ্রিত হইলেন। একএকবার পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়া উত্তরায়ণ-দক্ষিণায়ন করেন, এইমাত্র। এই পার্শ্বপরিবর্ত্তনের কথায়ও বিষ্ণুর আদিত্যস্বরূপ, অর্থাৎ জন্মতত্ত্বের যথার্থ ইতিহাস, সূচিত হয়। যাহাই হউক, ঠাকুর একেবারে কৃষ্ণের হাতে রাজ্যসমর্পণ করিয়া দিয়া কোন-প্রকারে অনন্তশয্যার উপর নড়াচড়া করিতেছেন, কিন্তু পূজার ভোগ খাইতেছেন শ্রীকৃষ্ণ।

পৌরাণিক বিষ্ণুর বিশেষত্ব অবতারবাদে; অথচ ঐ অবতারবাদই তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছে। মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ জলে-জঙ্গলেই আছেন; পূজা আছে কেবল শ্রীকৃষ্ণের। এইজন্য অনেকে অনুমান করেন যে, অবতারবাদটা সর্ব্বপ্রথমে কৃষ্ণকে বিষ্ণু সাজাইবার জন্যই হইয়াছিল। মৎস্যকথার সহিত বিষ্ণুর কোন সম্পর্ক নাই, পূর্ব্বে তাহার আভাস দিয়াছি। ব্রহ্মা বরাহ হইয়া মাটি তুলিয়াছিলেন, ইহাই প্রাচীন পুরাণ। বৌদ্ধদিগের অবতারবাদের সহিত টক্কর দিতে গিয়া যখন নূতন অবতারবাদ সৃষ্ট হয়, তখন প্রাচীন দুচারিটি কথা জুড়িয়া না দিতে পারিলে সুবিধা হয় না বলিয়াই যেন মৎস্যাদি অবতারের কল্পনা হইয়াছিল।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

দুয়ো-রাণী।

ঘুঁটে কুড়াইয়া, পথে ঝাড়ু দিয়া,
সারাদিন ধরি' ব্যথাভরা-হিয়া,
বারবার আঁখি মুছিয়া মুছিয়া,—

দুয়োরাণী আসি' সাঁঝের বেলায়
বসেছে বাগানে তরুর তলায়—
জীর্ণকুটীর কাছে দেখা যায়!

ওই-ই তার ঘর—হোথা নিতি রাতে
ঘুম যায় দুয়ো তৃণশয্যাতে,—
ঘুঁটে কুড়াইতে জাগে রোজ প্রাতে।

আজি সায়াহ্নে একটি তারকা
নভোজানালার খুলিয়া ঝরকা
উঁকি দিল যবে—(বুঝি বা পারথা

সাধ হল তার সাঁঝ এল কি না)—
তখন একেলা দুয়ো বিমলিনা
তরুর তলায় হইলা আসীনা।

চুপে চুপে, মনে নিলা মৃদুনাম
একটি ফুলের, করিলা প্রণাম
দীপশিখা-আঁকা দূর দেবধাম—

শঙ্খঘণ্টা বাজিছে যেথায়—
নটীগণে মিলি' নাচিছে যেথায়—
সখীগণে ল'য়ে রাজিছে যেথায়

ঠাকুরদুয়ারে সুখী সুয়োরাণী
পরিয়া তাহার চেলবাসখানি!—
দাঁড়ায়েছে রাজা জুড়ি' দুই পাণি

করি' পরিধান কৌষেয়বাস—
ললাটে তাহার চন্দনাভাস।
উঠিছে সুরভি ধূমের রাশ

চারিদিক্ ঘিরি',—প্রদীপার্চ্চনা
হেরিতেছে পুরবাসী সবজনা।
এদিকে বাগানে, আঁধার-মগনা

জোনাকী মালিকা লতিকার পাশে
একাকিনী দুয়ো চুপ্ বসি' আছে—
কোমল আঁধার সকল আকাশে!

কি ভাবিছে দুয়ো?—ভাবিয়া না পায়—
ব্যথিত পরাণ তার কি যে চায়!—
স্বপনের মত মনোমাঝে ভায়

সকল অতীত জীবন তাহার!
এই মনে পড়ে এক বালিকার
মূঢ় খেলাধূলা,—হাসিরাশি, আর

দুখরাশি যত,—এই মনে পড়ে
ব্রতমঙ্গল কোন্ সে বছরে।
দূর্ব্বা ও ফুল রাখি' থরে থরে

কত দেবতার পূজা-আরাধনা—
হায় কত মূঢ় মনের কামনা!
—পতিবর মাগা, পুত্র-যাচনা!

"হায় না বুঝিয়া কত-কি যে বলি
বালিকা-বয়সে!—ছলনা কেবলি!
—সেই সব দিন কোথা গেছে চলি'!

* * * * * *

"অবশেষে এল বিবাহের রাতি।
—এরি মাঝে মোর কত খেলাসাথী
পতিবতী হ'য়ে, সুখ-ঘর পাতি'

"বসেছিল,—তারা জানাত আমায়
আঁখি নীচু করি' চোখের আভায়—
—পতিবতী নারী কত সুখ পায়!—

"সুখ? হায় সুখ!—সুখ-ই বটে! সুখ!
খালি করি' ফেলি' বাপমার বুক,—
ভাইভগিনীর বিসরিয়া মুখ,

"পিছু ফেলি আসি খেলার কানন,
একখানি কোন অচেনা আনন
বুকে ভরি' ল'য়ে ভাবা অনুখন—

"সুখ বটে তাই?—সুখই বটে হায়!
ঐ ত, রমণী ঐ ত রে চায়!—
—যাহা আছে তার তাহা ফেলে যায়!

"—তার তরে শুধু ব্যাপিয়া হৃদয়
সুগভীর ম্লান ছায়া লেগে রয়—
যাহা নাই তারি অভিমুখে বয়

"নদীর মতন বনছায়া দিয়া
আপনার মাঝে আপনি কাঁদিয়া!
নিজে সে কি ধায়? হায়, মূঢ় হিয়া!

"বিধাতাই তারে গড়েছে এমন—
কালে কালে তার নূতন বেদন
জাগায় পরাণে নূতন চেতন,

"নূতন করিয়া করয়ে অধীর।
—স্থির নাহি রয় সুখ ধরণীর—
যাতনা কেবল অবলা নারীর।

"মনে পড়ে সেই নূতন বেদন—
মনে পড়ে সেই নূতন চেতন—
মনে পড়ে রাজরথের কেতন

"বেলাশেষকালে দেখা দিল দূরে—
ততখন আমি হর্ম্ম্যের চূড়ে
সখীগণে ল'য়ে, নূপুর কেয়ূরে

"মালাকুণ্ডল চেলবাসে সাজি'
বসেছিনু—হায়! স্বপন সে আজি!
দেখিতেছিলাম রাঙা মেঘরাজি

"আমারি মতন হরষে ও লাজে
কারে অপেক্ষি' চুপ্ করে' আছে—
কত বরণের ঢেউ তার মাঝে

"উঠিছে পড়িছে, আমারি হিয়ায়
ভাবগুলি যথা আসে আর যায়।
সহসা অমনি কাঁপাইয়া কায়

"বাজিয়া উঠিল মধুর বাজনা—
রাজ-আগমের জাগে ঝঞ্চনা—
কে ও রথ'পরে?……বিধি বঞ্চনা

"করিলা আমায়!—স্মরিয়া কি ফল?
ওরে নারি, তোর নয়নের জল
যেথা হ'তে আসে—সে নদী অতল!

* * * * *

"শুধু যদি সুখ দুখ হ'য়ে যেত—
নারী যদি শুধু এই দুখ পেত,—
তবে ভাল, সেই এক গান গেত

"জীবন ভরিয়া,—অমার মতন
রহিত সুচির আঁধারে মগন।
কিন্তু আবার একি এ লিখন

"হায়, হতবিধি, কেন নব চাঁদ
আন্দোলি' তার হরষ অগাধ,
নব নব দিনে বিতরে প্রসাদ—

"বাড়ায় দ্বিগুণ বেদনার ব্যথা?
অজানা নূতন আবেগ, মমতা
কেনগো নোয়ায় তা'র হৃদিলতা?

"রাজগৃহসুখ, সোয়ামিপ্রসঙ্গ
হয়েছে, আমার হয়েছে ভঙ্গ।
অথবা রাণীর সোণার অঙ্গ—

"কে চায়, বিধাতা!—নাহি চাই চাই—
প্রিয় প্রেমসুখ—যা গিয়াছে তাই—
তার লাগি' মোর কোন খেদ নাই!

"উদ্দেশে নমি' প্রাণেশের পায়
বলেছি—'হে নাথ দিলাম তোমায়
'যাহা দিয়েছিলে হেলায় খেলায়—

"'সকল আদর, সুখচুম্বন,
'কতই সোহাগ, প্রেমালিঙ্গন—
'সকলেরি মাঝে যে প্রেমরতন

"'দিয়েছ, তা' পায়ে নিবেদিনু, বসি'
'স্মৃতিঘরে, প্রেম-চন্দনে রসি'!
'যে কটি অশ্রু পড়িতেছে খসি'

"'তাও মুছিলাম—তুমি সুখে রহ—
'নব সুখ আনি' কোলে তুলি' লহ।
'পালিব আজ্ঞা—যাহা তুমি কহ,

"'ঘুঁটে কুড়াইয়া কাটাব জীবন'—
—জান বিধি, আমি হেন নিবেদন
করিয়াছি কি না!—তবে, এ, এখন—

"এখনো আবার কেন এ বেদনা?
কেন জননীর এ নব চেতনা?
কেন নিশিদিন রয়েছি বিমনা—

"কারে পাব যেন বুক ভরি' মোর—
কারে পাব যেন ভরি' এই ক্রোড়!—
এ কণ্ঠে যেন কার বাহুডোর

"কোমল-পরশে ফুটাইবে ফুল!
কেন নিশিদিন চিত্ত আকুল
ব্যথায় লালসে—এ কেমন ভুল!

"যাদের লাগিয়া এই দীন দশা—
তাদেরি লাগিয়া কেনরে বিবশা!
তাদেরি লাগিয়া—আঁখির বরষা!

"হায়!……না না, মোর বাছাধনগুলি—
তেমনি কি? হায়, চোখে দিয়া ঠুলি,
রেখেছিল মোরে! আঁধারে আগুলি'

"রেখেছিল তারা ত্রিভুবন মোর!
হায় লো সতীন মোর ধন-চোর,
কি করেছি আমি কি করেছি তোর!

"বাছারা আমার—সত্য কি তাই?
কেমনে জানিব? কিছু দেখি নাই!
না না, আমি মনে অনুভবে পাই

"সুন্দর তারা—রাজার কুমার!
কিংশুক-ঠোঁটে হাসি সুধাধার!
জ্যোতিমাখা দেহ—বরণ চাঁপার!

"গভীর আঁধার ওগো উপবন,
জোনাকী নিভায়ে জ্বালি' খনে-খন,
কি খেলিছ তুমি? আঁধার-গগন,

"তারা-মেয়েগুলি ছাদে দিয়া সারি
বসেছে যে—ওরা কাহার ঝিয়ারী,—
কোন্ রূপকথা বড় মনোহারী

"শুনিতেছে ওরা?—তোমাদেরি কাছে
হে বন গগন, চলি' কি গিয়াছে
বাছারা আমার অপরূপ সাজে

"খেলা খেলিবারে? তাহারা কেমন?
আমি ত দেখিনি।"—মুদিয়া নয়ন,
ভাবি' ভাবি' হেন দুয়ো নিমগন।

নিমগন দুয়ো দুখময় নিদে
তরুরি তলায়, কঠিন ভূমিতে—
স্তব্ধ আঁধার বসি' চারিভিতে!

হায় দুয়োরাণি একি হ'ল তোর?
কি নবীন স্নেহে হইলি বিভোর
না জেনে না শুনে? একি মোহঘোর!

মোহে ঘুমাইয়া প'ল দুয়োরাণী।
ছুটি' পড়ে তারা, রাগে রেখা টানি'—
মুছি' ফেলে রেখা ত্বরা কার পাণি!

কত তারা ম'ল—রে'খা নাই কোনো—
আঁধার আকাশ!—ওকি?—ওই শোনো
দ্বিতীয় প্রহর বাজিছে!—এখনো

ঘুমাইছে দুয়ো?—রজনী গভীর!
এই সে প্রহর কুহকী রাতির
যবে নামে আসি' তীরে ধরণীর

যত দেবদূত যত পরীদল—
ফুলমাঝে তুলে গড়াইয়া ফল;—
দিবসের কাজে শিথিল বিকল

ফুল-লতা-তরু-প্রাণের মাঝার
বরষিয়া যায় স্নেহসুধাধার;
মধুর স্বপন নিয়ে আসে আর

ক্লান্ত পুরুষ নারীর লাগিয়া।
তাই সবে ওঠে সকালে জাগিয়া
নূতন উষার বরণে রাঙিয়া!

দেখে দুয়ো দেখে হরষস্বপন!
দেখে দুয়ো দেখে মধুর স্বপন:—
জাগ-জাগ যেন রাজ-উপবন

ভোর গোধূলীতে—'মা-মা—' এ ডাক
কোথা হ'তে আসে? ডাকিছে কি কাক?
অই! 'মা—!' দুয়ো শুনিছে অবাক্!

তাড়াতাড়ি ছুটে পুকুরের তীর
এল দুয়ো—তার চোখে বহে নীর!
অই! 'মা—মা—' চাঁপা-বনানীর

আড়াল হইতে ডাকিছে মধুর!
'মা-মা—' উঠিছে সাতখানি সুর!
পারুল একটি দাঁড়ায়ে অদূর—

সেথায় হ'তেও 'মা—' কে ডাকিছে?
দুয়ো চারিদিকে চমকি চাহিছে—
চাহিছে—সঘনে হৃদয় কাঁপিছে!

একি অদ্ভুত! একি এ আবার!
বুক হ'তে তার ছুটি ক্ষীরধার
পড়িছে চম্পাকুঞ্জমাঝার,

কেন বা ছুটিছে পারুলের পানে?
—এবার পড়িল দুয়োর নয়ানে—
বাছাগুলি তার আছে কোন্‌খানে!

কিবা সুন্দর বালকবালিকা!
কোনো দেবতার যেন ছবিলিখা!
পারুলচম্পাফুলেরি কলিকা!

দাঁড়াইছে দুয়ো থামি' স্নেহভরে
বিমূঢ়সমান—চরণ না সরে!
সাত চাঁপা আর পারুল অধরে

বর্ষিছে ক্ষীর।—ক্রমে মুখ'পরে
দুয়োর, উষার নবারুণ ঝরে,
হাসি থেমে রয়! ক্রমে পাখিস্বরে

জাগে চারিধার—চলে লোকজন—
প্রভাত! প্রভাত!—চমকি তখন...
—হায় দুয়ো হায়, ভেঙেছে স্বপন!

কোথায়? কোথায়?—গভীর তিমির!
দ্বিগুণ আঁধার!—বুকে ঝরে ক্ষীর,
দুচোখে দুয়োর বাহি' পড়ে নীর!

কোথায়? কোথায়?—কেবল জোনাকী
বুজিতেছে আর মেলিতেছে আঁথি—
নিজমনে বন খেলিছে একাকী!

আকাশের 'পরে দীপ্ দীপ্ করি'
তারা-বালিকারা খেলে লুকোচুরি—
গভীর আঁধার আকাশ আবরি!

কোথায়? কোথায়?...হায় দুয়োরাণী!
ধৈরজ ধর সান্ত্বনা মানি'।
কালি প্রভাতের কিরণ-মেলানি

বন বন ভরি' ফুটাইবে ফুল!—
তোমারো এ নব স্নেহের মুকুল
বিকসিবে। নাহি, নাহি তাহে ভুল!

এ গভীর ব্যথা, আশা অস্ফুট
দীরি' বাহিরিবে পরিয়া মুকুট,
নবীন কুমার সুবর্ণকূট!

রাণীদলমাঝে হ'য়ে গরবিণী
শুনলো চম্পা-পারুল-জননি,—
উজলিবে তব বাছারা ধরণী।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

বাজে খরচ।

আমাদের বাজে খরচটা বড়ই বাড়িয়া উঠিতেছে। কোনপ্রকারে তাহাকে না কমাইলে আর আমাদের উপায় নাই। একে ত এই ভয়ানক প্রতিযোগিতার দিনে অর্থ উপার্জ্জন করাই কঠিন, তাহার উপর যদি এই কষ্টার্জ্জিত অর্থটা বাজে খরচে ব্যয়িত হইয়া যায়, তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা।

আজকাল অনেক স্বদেশহিতৈষী, যাহাতে আমাদের ধনবৃদ্ধি হয়, অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রসারিত হয়, সেজন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া

আমাদের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। পতিত জমীতে আবাদ করিয়া, জঙ্গলজাত দ্রব্যকে ব্যবহার্য্য করিয়া এবং সামান্য সামান্য শিল্পোন্নতি করিয়া তাঁহারা ধনাগমের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতেছেন, কিন্তু কেবল অর্থোপার্জ্জনের অভাবেই কি লোকে দরিদ্র হয়? সঞ্চিত বা অর্জ্জিত অর্থের বৃদ্ধি ও সৎপাত্রে দান (অথবা সদ্ব্যয়) করাও অবশ্য-কর্ত্তব্য।

বার্ত্তাশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

"অলব্ধঞ্চৈব লিপ্সেত লব্ধং রক্ষেদবেক্ষয়া।
রক্ষিতং বর্দ্ধয়েৎ সম্যক্ বৃদ্ধং তীর্থেষু নিক্ষিপেৎ॥"

অর্থাৎ অলব্ধ ধন লাভ করিতে ইচ্ছা করিবে, লব্ধধন যত্নে রক্ষা করিবে; রক্ষিত ধন সম্যক্-প্রকারে বৃদ্ধির চেষ্টা করিবে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ধন সৎপাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

আহার্য্য দুর্ম্মূল্য হওয়াতে আমাদের দেশের গৃহস্থগণের অর্থকষ্ট বাড়িয়া উঠিয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আহার্য্য আমরা যত দুর্ম্মূল্য মনে করি, তত দুর্ম্মূল্য হয় নাই।

রৌপ্যমুদ্রা পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট সুলভ হওয়াতে অন্যান্য দ্রব্যকে আমরা অতিশয় দুর্ম্মূল্য বলিয়া মনে করি। ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে যে রাজমিস্ত্রি চারআনা পয়সায় সমস্তদিন কাজ করিত, আজ সে আটআনা পয়সায় কাজ করিতে ইতস্ততঃ করে; কিন্তু যখন সে চার আনায় কাজ করিত, তখন একমন চাউলের দাম ছিল ২৲ টাকা অথবা ২৷৷০ টাকা, আর এখন সেই চাউলের দাম ৪৲ টাকা অথবা ৫৲ টাকা হইয়াছে। অর্থাৎ তখন সে সমস্তদিনের পরিশ্রমে ৪সের চাউলের মূল্য সংগ্রহ করিত, এখনও সে সেই সমস্তদিন পরিশ্রম করিয়া ৪সের চাউলের মূল্য সংগ্রহ করে; কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার আর্থিক কষ্ট অনেক অধিক, কারণ তাহার বাজে খরচটা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বাজে খরচটা যদি পিত্তলকাঁসার তৈজসপত্র অথবা সোনার নথ, রূপার পৈঁচাতে পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে বরং মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম যে, তাহার একটা অসময়ের সংস্থান হইল; কিন্তু বাজে খরচটা কি সেদিকে হয়? তাহার পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাহার সংসারে হাহাকার কেন ঘোচে না।

আমাদের পোষাকে আজকাল কত বাজে খরচ হয়, তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। লেখকের পরিচিত এক কায়স্থসন্তান মাসিক ৩৫৲ টাকা বেতনে কলিকাতার কোন আপিসে কর্ম্ম করেন। সে বৎসর তিনি পূজার সময় তাঁহার ৭বৎসরের কন্যার জন্য মল্লিক কোম্পানির দোকান হইতে ২২৲ টাকায় একটা জামা ক্রয় করিয়াছিলেন। এত টাকা কেন খরচ করিলেন জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "একটা মেয়ে, আর প্রতি বৎসর ত দিতে পারিব না, তাই একবার কষ্ট করিয়া দিলাম।" যেন ৩৫৲ টাকার কেরাণীর কন্যার ২২৲ টাকার জামা একটা অপরিহার্য্য পরিচ্ছদ, তাই কায়ক্লেশে কোনরকমে একবার একটা দিলেন। না দিলে তাঁহার ৭ বৎসরের কন্যা সমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না! যাহাকে সাজাইবার জন্য এই দরিদ্র অর্দ্ধভুক্ত কেরাণীর একমাসের অর্দ্ধেকেরও অধিক কষ্টার্জ্জিত

বেতন ব্যয় করিয়া লক্ষপতির কন্যার ব্যবহার্য্য পোষাক ক্রয় করা হইল, সে কি এই জামার মর্য্যাদা জানে, না, জানা সম্ভব?

আজকাল দুর্গোৎসবের সময় পুত্রকন্যাদির পোষাকের ব্যয় দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে একটা ভয়ানক আতঙ্কের কথা হইয়া উঠিয়াছে। না হইবে কেন? মিত্রজার কন্যার ২২৲ টাকার জামা দেখিয়া আমার পুত্রকন্যাও সেইপ্রকার পাইবার জন্য আমার কাছে আব্দার করিবে, তাহার উপর যদি আবার গৃহিণীর নথনাড়া থাকে, তাহা হইলে ত আর রক্ষা নাই। ছেলে অথবা ছেলের গর্ভধারিণীকে প্রবোধ দিবার জন্য ২২৲ টাকার সাঁচ্চা পোষাকের পরিবর্ত্তে অন্তত ৫৲ টাকা দিয়া সেইপ্রকার একটা ঝুঁটা জামাও আমাকে কিনিতে হইবে। কিন্তু এই পাঁচটাকা 'ন দেবায় ন ধর্ম্মায়'। আমরা যখন বালক ছিলাম, তখন আমাদের আর্থিক অবস্থা এখনকার অপেক্ষা হীন ছিল না। অথচ আমরা পূজার সময় কেম্ব্রিক ছিটের জামা পাইয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতাম, আর আমাদের ছেলেরা এখন রেশমী জামা গায়ে দিয়াও তত সন্তুষ্ট নহে; প্রতিবাসী সমবয়স্কের রেশমী জামায় কেমন জরীর কাজ করা, তাহার জামায় ত তেমন জরী নাই! আমাদের বাল্যাবস্থায় আমাদের সমবয়স্কগণের মধ্যে কাহাকেও বড় সাটিনের বা মখমলের পোষাক পরিতে দেখি নাই, কিন্তু এখন সাটিনের কোট্-জ্যাকেট্ ও বোম্বাই কাপড়ের জ্বালায় দেশ ছাড়িয়া পালাইতে ইচ্ছা করে। তখনকার অভিভাবকদিগের অপেক্ষা এখনকার অভিভাবকদিগের রুচি কত বিভিন্ন হইয়া গিয়াছে। তখনকার অভিভাবকেরা বুঝিতেন যে, দরিদ্র বা মধ্যবিত্তের জন্য সাটিন্-মখমল নহে। যাঁহারা সর্ব্বদা গাড়ি চড়িয়া যাতায়াত করিতে পারেন, ভৃত্যেরা যাঁহাদের পোষাকের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, তাঁহাদের জন্যই সাটিন্-মখমল; কিন্তু আমরা কি তাহা বুঝি? আমাদের আত্মমর্য্যাদার কি দুর্দ্দশা!

পূজার সময় কলিকাতার বাজারে কত টাকার জার্ম্মেনীজাত নকল রেশমী পোষাক বিক্রয় হয়, তাহার একটা তালিকা পাইলে বুঝিতে পারিতাম, বাঙালী কেমন বুদ্ধিমান্। বস্তুত বাঙালীর বুদ্ধির দৌড় যে "কতদূর, তাহা এই পোষাকের রুচিতেই বুঝিতে পারা যায়।

পূজার পর শীতবস্ত্র। আমাদের বাল্যাবস্থায় কম্ফর্টার কিনিতে পাওয়া যাইত না। যদি বা পাওয়া যাইত, তাহা বোধ হয় আমাদের পক্ষে দুষ্প্রাপ্য ছিল, কারণ আমরা তাহা কখন পাই নাই। তখন শিক্ষিতাভিমানী রমণীগণ নানাপ্রকার উলের মোজা-কম্ফর্টার বুনিয়া স্বামিপুত্রের আপাদমস্তক ঢাকিয়া দিতেন। কিন্তু এই পশমের কাজ সকলে জানিত না, তাই সকলের পক্ষে মোজা-কম্ফর্টার সুলভ ছিল না। অথচ বাল্যকালে মোজা-কম্ফর্টার বিহনে যে বিশেষ কোনরূপ পীড়ায় ভুগিতাম অথবা অকালে পঞ্চত্ব পাইবার সম্ভাবনা দাঁড়াইত, তাহা ত মনে হয় না। আমরা বাল্যকালে দোলাই গায়ে দিতাম। বার আনা বা চৌদ্দ আনায় একখানা দোলাই, তাহাতে বেশ শীত ভাঙিত; এখন কিন্তু এই বিলাতি "আলোয়ান," জার্ম্মেনী,—ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার পাটের চাদর ভিন্ন আর শীত ভাঙে

না। দোলাইগুলা মলিন হইলে সাধারণ কাপড়ের সহিত রজকালয়ে পাঠাইয়া ধোয়াইয়া লইলেই হইত, কিন্তু "আলোয়ান" কাচিবার জন্য আবার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

এখন জিজ্ঞাসা করি, শীতের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য প্রতি বৎসর এত টাকার বিলাতী পাট ক্রয় করা কি একান্তই আবশ্যক? সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত রুচির পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু সে পরিবর্ত্তনটা যদি অবনতির দিকে হয়, তাহা হইলে সেটা আমাদের বড় গৌরবের কথা নহে।

সেদিন লেখকের একজন বন্ধু মানভূম-অঞ্চল হইতে একখানা গরদ আনাইয়া জামা প্রস্তুত করিবেন বলিয়া তিনদিন কলিকাতায় যাতায়াত করিলেন। কলিকাতায় কে একজন নাকি ভাল দরজী আছে, তাহার দ্বারা জামার ছাঁট শুদ্ধ করাইয়া লইবার জন্য এই কর্ম্মভোগ করিয়া তিনতিনদিন কলিকাতায় গমনাগমন! জামাটি যদি আমাদের দেশী পিরাণ বা পাঞ্জাবী হইত, তাহা হইলে এত কর্ম্মভোগ হইত না; সে গরদে কোট্‌ হইবে। বাবুও কোট্‌ ধরিয়াছেন জামাটি ছাঁটশুদ্ধ হওয়া চাই, তা যতই কেন খরচ হউক না; অবশেষে সাহেববাড়ী পর্য্যন্ত দেখিবেন। বাবুটি শিক্ষিত,—একজন হাকিম।

কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী ভদ্রযুবকদিগের পোষাকের কতটা দেশী ও কতটা বিলাতী, তাহার পরিমাণ করিলে দেখিতে পাই যে, এক পরিধানের ধুতি ছাড়া আর সমস্তই বিলাতী। জুতা ও মোজা এখন বিলাতী হইয়াও দেশী হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু গেঞ্জি, শার্ট, ওয়েস্‌কাট্‌, কোট্‌, কলার্‌, নেক্‌টাই, আল্‌ষ্টার্‌, এমন কি ধুতির উপর একটা নাইট্‌ক্যাপ্‌, যে দিক্‌ দিয়া দেখি, সেই দিকেই অনাবশ্যক বিলাতী পোষাক। কেবল ধুতির জন্যই বাবুকে ফিরিঙ্গী হইতে বিভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের দারুণ গ্রীষ্মের সময়ও এই সকল পোষাক ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কেবল আল্‌ষ্টার্‌টা শীতকালেই (তাও মধ্যাহ্নেও বাদ যায় না) দেখিতে পাই। একদিন হাবড়াষ্টেশনে একজন প্রাচীন বাঙালী ভদ্রলোককে দেখিলাম, তাঁহার সুদীর্ঘ শ্বেতশ্মশ্রু দেখিয়া বোধ হয় তিনি ষাট ছাড়াইয়া সত্তরে পদার্পণ করিতে উদ্যত। তাঁহার সমস্ত পোষাক খাঁটি দেশী ধরণের;—ধুতি, পিরাণ, উড়ানী; কিন্তু মাঝে হ'তে মাথায় এক নাইট্‌ক্যাপ্‌! এমন অদ্ভুত বিসদৃশ!

এই ত গেল পোষাকবিভ্রাট। তাহার উপর আবার আচারব্যবহার লোকলৌকিকতা আছে। কলিকাতায় নাকি পৌষ-সংক্রান্তির সওগাদের পূর্ব্বে আবার বড়দিনের সওগাদ দেখা দিয়াছে। কন্যার বিবাহের ব্যয় একটা অপরিহার্য্য-প্রলয়স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচনা অনাবশ্যক। কিন্তু বিবাহের আনুষঙ্গিক ব্যয়গুলা, যেগুলা আমাদের বৈবাহিকেরা জেদ করিয়া খরচ করান না, সেগুলাও আমরা কত বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছি। বিবাহের পূর্ব্বে গাত্রহরিদ্রা বা অধিবাস এবং পরে ফুলশয্যা উপলক্ষ্যে আজকাল যে কিপ্রকার অদ্ভুত আদানপ্রদান হইয়া থাকে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রায় তিনচার বৎসর হইল, লেখকের পরিচিত কোন বি. এ.-ফেল্‌-করা যুবকের

বিবাহ হয়। যুবকের অবস্থা অত্যন্ত হীন। অতি জীর্ণ দুইটি ক্ষুদ্র শয়নকক্ষ ও একটি তৃণাচ্ছাদিত রন্ধনশালা তাঁহাদের স্থাবর সম্পত্তি। যুবার বিবাহের পূর্ব্বে তাঁহার ভাবী শ্বশুর পাত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়া ভাবী জামাতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই স্বচক্ষে দেখিয়া যান, অথচ ফুলশয্যাতে যুবার শ্বশুরালয় হইতে প্রায় ৪০।৪৫ জন লোকে সওগাদ লইয়া আসিল! শ্বশুরবাটীর দাসী, যে এই সওগাদ-বাহকদিগের সর্দ্দার হইয়া আসিয়াছিল, তাঁহার স্থূলকলেবরে যে অলঙ্কার ছিল, জামাতার মাতার শরীরে তাহার শতাংশের এক অংশও ছিল না। গৃহিণী তাহাদিগকে বসিবার স্থান দিতে না পারায় যার-পর-নাই লজ্জিতা হইয়াছেন, এমন-সময় সেই দাসীকুলশিরোমণি বলিল, "গাড়ির রাস্তা, তাতে পাড়াগাঁ (দাসী কলিকাতা হইতে সওগাদ লইয়া আসিলেও তাহার কথার স্বর মেদিনীপুরজেলার পরিচয় দিতেছিল), সেইজন্য মা অনেক জিনিষ পাঠাতে পার্‌লেন না", ইত্যাদি ইত্যাদি। ফুলশয্যার সওগাদ যাহা আসিয়াছিল, তাহার মধ্যে আহার্য্য, পরিধেয় ও ব্যবহার্য্য দ্রব্য ছাড়া এত অনাবশ্যক ও অব্যবহার্য্য দ্রব্য ছিল যে, তাহার ব্যবহার দূরে থাক্, জামাতা সে সকল দ্রব্যের নাম পর্য্যন্ত জানেন না। জামাতা কখন চা-পান কিংবা চুরুট-সেবন করিতেন না, কিন্তু তথাপি তাঁহার পিতৃতুল্য শ্বশুরমহাশয় পুত্রতুল্য জামাতার ব্যবহারের জন্য চার পেয়ালা, চামচ, রেকাব, চুরুটের বাক্স, চুরুটের ছাই ঝাড়িবার পাত্র ইত্যাদি দ্রব্য দিতে কিছুমাত্র লজ্জা অনুভব করেন নাই। ফুলশয্যার সওগাদ দেখিতে পাড়ার স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত জনতা করিয়াছিলেন বলিয়া ভাল করিয়া সমস্ত দেখিতে পাই নাই। ইচ্ছা আছে, ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলে দেখিব যে, সওগাদের মধ্যে শ্যাম্পেন্-গ্লাস ও ডিকাণ্টর্ থাকে কি না। ফলত মুরগী-হাটার দোকানে যাহা-কিছু কিনিতে পাওয়া যায়, তাহার সমস্তই সেই সওগাদের মধ্যে ছিল। সেগুলা রাখিবার স্থান জামাতার গৃহে না থাকায় এক প্রতিবাসীর গৃহে সে সমস্ত সাজাইয়া রাখা হইল। সে সকল দ্রব্য কেহ কন্যাকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করে নাই, বরং তিনি দেওয়াতে জামাতাকে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই-প্রকার শত শত টাকার অব্যবহার্য্য বিলাতী আস্‌বাব ও খেলনা বিবাহ উপলক্ষ্যে আদান-প্রদান হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, আজ-কাল কায়স্থসম্প্রদায়মধ্যে বিবাহ প্রভৃতিতে লৌকিকতা প্রদান ও গ্রহণ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু এইপ্রকার অনাবশ্যক আদানপ্রদান বন্ধ করিতে কোন্ জাতি অগ্রসর হইবেন?

আহার্য্যবিষয়ে ঠিক এইপ্রকার। ৫।৬ বৎসর পূর্ব্বে লেখকের প্রতিবাসী এক দরিদ্র গোপকন্যার বিবাহ হয়। কন্যার পিতা কোন ধনবানের গৃহে মাসিক দশটাকা বেতনে খানসামার কার্য্য করিত বলিয়া তাহার নজরটা মনিবের ন্যায় উদার হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যাটি সুশ্রী বলিয়া কলিকাতার এক ধনবান্ গোপ নিজের পুত্রের সহিত তাহার বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে। বিবাহের রাত্রে সেই কন্যাভারগ্রস্ত লোকটি আহারাদির যেপ্রকার আয়োজন

করিয়াছিল, তাহার প্রভুর কন্যার বিবাহে তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আয়োজন হয় নাই। কলিকাতার বরযাত্রীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সেদিন লুচি, কচুরি, পাঁপর, মাছের তিনচাররকম তরকারী এবং ক্ষীর-দধি ভিন্ন কলিকাতা বড়বাজার হইতে আনীত নানাবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন আহারার্থিগণের পত্রের শোভাবৃদ্ধি করিয়াছিল। সেই কন্যাকর্ত্তার নিজের বিবাহে বোধ হয় চিঁড়ে-মুড়কি ও দধির বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে রুচির কি পরিবর্ত্তন! এই ধনিজনোচিত ভোজের ফল এই হইল যে, মনে করিলেই আমি আমার প্রতিবাসীদিগকে লইয়া আমোদ করিয়া আহারাদি করিতে পারিব না। আদর্শ এত উন্নত হইয়া পড়িল যে, তাহা সাধারণের পক্ষে "প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাৎ" গোছ হইয়া উঠিল। কোন ক্রিয়াবর্মে সাদাসিধা লুচি, কুষ্মাণ্ডের তরকারী ও দধি-সন্দেশের আয়োজন করিলে কি প্রতিবাসীরা সন্তুষ্ট হইবেন? তাঁহারা আমার বাড়ী কুষ্মাণ্ডঘণ্ট খাইতে খাইতে সেই দরিদ্র গোয়ালার বাটীর কালিয়া স্মরণ করিয়া আমাকে ধিক্কৃত করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কি? পল্লীগ্রামে দুর্গোৎসব বা অন্যান্য পূজার সংখ্যা-হ্রাস হওয়ার প্রধান কারণ আদর্শের বিকৃতি বা রুচির বিকৃতি। এখনকার পূজায় ভক্তের ভক্তিপ্রদত্ত শাকান্ন খাইয়া দেবতা সন্তুষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু প্রতিবাসীরা সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। সেইজন্য পূজায় লোকের আর প্রবৃত্তি নাই। পূর্ব্বে লোকে ব্রাহ্মণ-বাটীতে মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণরক্ষা করিতে যাইত, কিন্তু আজকাল মধ্যাহ্নভোজনটা একপ্রকার উঠিয়াই গিয়াছে। মধ্যাহ্নটা প্রায় রাত্রি ৯টা-১০টায় উপনীত হইয়াছে, কারণ অধিকাংশ স্থলেই এখন অন্নের পরিবর্ত্তে পলান্নের প্রচলন দেখা যায়। প্রায় সকল বাটীতেই অজ্ঞাতচরিত্র, উপবীতী ও ব্রাহ্মণনামধারী পাচকগণই রন্ধন-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণবাটীর বর্ষীয়সী গৃহিণীরা এখন আর ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নানসমাপনান্তে পট্টবস্ত্রপরিহিত হইয়া পবিত্রচিত্তে প্রতি-বাসীর গৃহে রন্ধনে প্রবৃত্ত হইতে যান না। পূর্ব্বে প্রত্যেক ক্রিয়াশালী ব্রাহ্মণের বাটী একএকপ্রকার রন্ধনের জন্য প্রতিবাসি-মণ্ডলীর মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিত। গাঙ্গুলী-দের বাটীর নিরামিষ, মুখুয্যেদের বাটীর মাছের তরকারী এবং চক্রবর্ত্তিমহাশয়দের বাটীর পায়সের নামে নিকটবর্ত্তী ২।১খানা গ্রামের ভোক্তাদের রসনায় জলসঞ্চার হইত। কিন্তু আজকাল মুখুয্যে, গাঙ্গুলী, চক্রবর্ত্তী, ঘোষাল, সকলের বাটীতেই সেই এক বিহারি-ঠাকুর সদলবলে হাতা-খুন্তি-ঝাঁজরা-হস্তে অধিষ্ঠিত হইয়া একইপ্রকার রন্ধনে সকলের তৃপ্তিসাধন করে। আমাদের খাঁটি দেশী শিল্পের সকলপ্রকারই প্রায় গিয়াছে,—রন্ধনশিল্পও যাইতে বসিয়াছে। এই রন্ধনশিল্পের অন্তর্দ্ধানে কোন ব্যবসায়ী বা শিল্পী সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতি না হওয়াতে দেশহিতৈষী মহাত্মারা এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন না, কিন্তু তাহাতে আমাদের একটা অত্যাবশ্যক সুখপ্রদ শিল্প ধ্বংস হইতেছে। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা যদি নিমন্ত্রণকর্ত্তাকে বলেন যে, "আপনার বাটীতে আমরা বাজারে ব্রাহ্মণের

স্পৃষ্ট কোন দ্রব্য গ্রহণ করিব না, আপনার পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের হাতের শাকান্নও সমাদরে ভোজন করিব”, তাহা হইলে বোধ হয় রন্ধনশিল্প রক্ষা পাইলেও পাইতে পারে।

আজকাল কলিকাতা ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে অম্লরোগের বড়ই প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। এই রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভকল্পে চেষ্টার ত্রুটিও লক্ষিত হয় না। ইহার কল্যাণে অনেক পেটেণ্টঔষধওয়ালা বেশ দশটাকা কামাইয়া লইয়াছেন। রোগের নিদাননির্ণয় করিতে গিয়া সকলেই নিজ নিজ ধারণার অনুরূপ কারণ দেখাইয়া থাকেন। কারণ যাহাই হউক না, অম্লরোগের একটা সহজ প্রতিকার “মুড়ি”খাওয়া। বাজারের মিষ্টান্নে যে সকল ঘৃত ব্যবহৃত হয়, তাহা যতদূর অপকৃষ্ট হইতে পারে, সে পক্ষে দোকানদারদিগের শৈথিল্য নাই। অভিমানী বাঙালীবাবুরা জলযোগের জন্য এই জঘন্য ঘৃতের মিষ্টান্ন ব্যবহার করিয়া থাকেন। অম্লরোগের অন্যতম কারণ এই মিষ্টান্নসেবা। যাঁহারা নিত্য “মুড়ি” থাইয়া থাকেন, অম্ল তাঁহাদিগকে স্পর্শও করিতে পারে না। এক পয়সার মুড়ি খাইলে যেরূপ উদরপূর্ত্তি হয়, একপোয়া মিষ্টান্নে সেরূপ হয় কি না, সন্দেহ; অথচ মুড়ি খাইলে কোন পীড়ার সম্ভাবনা নাই। অনেকের ধারণা যে, মুড়ি খাইলে উদরাময় হইয়া থাকে। আমরা কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সুস্থশরীরে মুড়ি খাইয়া কখন উদরাময় হয় না। তবে উদরাময় থাকিতে মুড়ি খাওয়া না চলিতে পারে, কিন্তু মুড়ি যে সহজ শরীরে উদরাময় আনিয়া থাকে, এ কথা অলীক। মুড়ি খাইলে যাঁহাদের উদরাময় হয়, তাঁহারা যে বাজারের মিষ্টান্ন জীর্ণ করিতে পারেন, ইহা বিশ্বাস হয় না। অনেকে বালকগণের জন্য বিলাতী বিস্কুট ব্যবহার করিবার পরামর্শ দিয়া থাকেন। বিলাতী বিস্কুট যতদিন টিনের বাক্সবন্দী থাকে, ততদিন বোধ হয় মন্দ থাকে না; কিন্তু বাক্স খুলিবার পর বাহিরের বায়ু লাগিয়া ক্রমশ তাহা খারাপ হইতে থাকে। বাসী লুচি অথবা রুটি যদি অপকারী হয়, তাহা হইলে বাসী বিস্কুটও যে অপকারী কেন হইবে না, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। একটাকা-পাঁচসিকা দিয়া একবাক্স বিস্কুট কিনিয়া তাহা ১৫দিন ধরিয়া রোগীকে খাওয়াইবার ব্যবস্থা যে কতদূর বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক, তাহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম। সাধারণত যাঁহারা পীড়া হইবার ভয়ে বালকদিগকে বিস্কুট খাইতে দিয়া থাকেন, তাঁহারা যদি বিস্কুটের পরিবর্ত্তে তাহাদিগকে মুড়ি খাইতে দেন, তাহা হইলে দেখিবেন যে, বালকগণের স্বাস্থ্যের অবনতি না হইয়া বরং উন্নতিই হইতেছে। কিন্তু মুঁড়ি পল্লীগ্রামের লোকে এবং দরিদ্র লোকে ব্যবহার করে বলিয়া সহরবাসী বাবুদের তাহা বড়ই ঘৃণাস্পদ হইয়া পড়িয়াছে। একবার একজন কবিরাজ কোন ধনবানের অম্লরোগের চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নানাপ্রকার ব্যবস্থার পর বলিলেন, “আপনি জলযোগ করিবার সময় কোনপ্রকার মিষ্টান্ন ব্যবহার না করিয়া মুড়ি ও নারিকেল ব্যবহার করিবেন।” কবিরাজের ব্যবস্থা শুনিয়া বাবুর পারিষদবর্গ বলিয়া উঠিল, “বাবু মুড়ি খাইবেন? কি বলেন আপনি? বাবু মুড়ি

খাইবেন ?” চিকিৎসকমহাশয় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “বাবু মুড়ি খাইলে তোমরা বাবুর মাথা খাইবে কিপ্রকারে ? বাবু বিলাতী পনির খাইতে পারেন, ফিবার্-মিক্শ্চার ও কুইনাইন-মিক্শ্চার খাইতে পারেন, কিন্তু মুড়ি খাওয়া কি বাবুর সাজে ?” সেদিন কোন বাড়ীতে দেখিলাম, একটা রাজ-মিস্ত্রি বেলা ১টার সময় জলপান খাইবার ছুটি পাইয়া এক পয়সার গজা কিনিয়া খাইল। কারণ মুড়ি ছোটলোকে খায়! টাট্কা মুড়ি ঈষৎ-মিষ্ট-সহযোগে খাইলে উৎকৃষ্ট বিলাতী বিস্কুট অপেক্ষা সুস্বাদু হয়।

“চা”-পান করাও আজকাল বড় প্রচলিত হইয়াছে। এই “চা”জিনিষটা বাংলার ন্যায় উষ্ণপ্রধান দেশের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। হিমালয়-অঞ্চল অথবা শীত-প্রধান দেশে চা উপকারী হইতে পারে, কিন্তু বাংলায় এই শীতলদেশোচিত নেশা কেন প্রচারিত হয়, তাহা বলিতে পারি না। যাঁহারা নিয়মিতরূপে প্রত্যহ চা-পান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই অজীর্ণ বা শর্দ্দীর চির-আশ্রয় হইয়া থাকেন। অনেক চা-সেবী অজীর্ণরোগীকে চা ছাড়িয়া দিয়া সুস্থ হইতে দেখা গিয়াছে।

বালকদিগের খেলাতেও ক্রমে ক্রমে ব্যয়-বাহুল্য দেখিতে পাইতেছি। পূর্ব্বে “গুলি-দাণ্ডা” ছিল, এখন ক্রিকেট্ হইয়াছে ; পূর্ব্বে “কপাটি” ছিল, এখন “ফুট্‌বল্” হইয়াছে। আবার আমেরিকায় (Push ball) “পুশ্-বল্” নামে নূতন খেলা দেখা দিয়াছে, তাহার নাকি আইনকানুন সমস্তই ফুট্‌বলের ন্যায় ; কেবল বলটা নারিকেলের মত না হইয়া একটা সুবৃহৎ জালার মত, চার-হাত-বেধ-বিশিষ্ট। এক একটা বলের দাম ২।৩শত টাকা। দরিদ্র বাঙালীর ঘরেও এই খেলা শীঘ্রই দেখা দিবে, আমাদের এরূপ আশঙ্কা আছে।

যে দিক্ দিয়াই দেখা যাক্ না কেন, বাজে খরচ আমাদের বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। ত্রিশবৎসরের মধ্যে যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে আর ত্রিশবৎসর পরে যে কি দাঁড়াইবে, তাহা আমরা ধারণা করিতে পারি না। সমাজ-হিতৈষীদিগকে এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।

যাত্রিণী।

মন্ত্রে সে যে পূত
রাখীর রাঙা সূতো,
বাঁধন দিয়েছিনু হাতে,
আজ কি আছে সেটি সাথে ?

বিদায়-বেলা এল মেঘের মত ব্যেপে,
গ্রন্থি বেঁধে দিতে দু'হাত গেল কেঁপে,
সেদিন থেকে থেকে চক্ষুদুটি ছেপে
ভরে' যে এল জলধারা।
আজ্‌কে বসে আছি পথের এক পাশে,
আমের ঘন বোলে বিভোল মধুমাসে,
তুচ্ছ কথাটুকু কেবল মনে আসে
ভ্রমর যেন পথহারা ;—
সেই যে বাম হাতে একটি সরু রাখী
আধেক রাঙা, সোনা আধা,
আজো কি আছে সেটি বাঁধা ?

পথ যে কতখানি
কিছুই নাহি জানি,
মাঠের গেছে কোন্ শেষে,
চৈত্রফসলের দেশে !
যখন গেলে চলে তোমার গ্রীবামূলে
দীর্ঘ বেণী তব এলিয়ে ছিল খুলে',
মাল্যখানি গাঁথা সাঁঝের কোন্ ফুলে
লুটিয়ে পড়েছিল পায়ে।
একটুখানি তুমি দাঁড়িয়ে যদি যেতে !
নতুন ফুলে দেখ কানন ওঠে মেতে,
দিতেম ত্বরা করে' নবীন মালা গেঁথে
কনকচাঁপা-বনছায়ে।
মাঠের পথে যেতে তোমার মালাখানি
প'ল কি বেণী হ'তে খসে ?
আজকে ভাবি তাই বসে !

নূপুর ছিল ঘরে
গিয়েছ পায়ে পরে',
নিয়েছ হেথা হ'তে তাই,
অঙ্গে আর কিছু নাই।

আকুল কলতানে শতেক রসনায়
চরণ ঘেরি' তব কাঁদিছে করুণায়,
তাহারা হেথাকার বিরহবেদনায়
মুখর করে তব পথ।
জানি না কি এত যে তোমার ছিল ত্বরা,
কিছুতে হ'ল না যে মাথার ভূষা পরা,
দিতেম খুঁজে এনে সিঁথিটি মনোহরা
রহিল মনে মনোরথ!
হেলায় বাঁধা সেই নূপুর-ছুটি পায়ে
আছে কি পথে গেছে খুলে,
সে কথা ভাবি তরুমূলে!

অনেক গীত গান
করেছি অবসান
অনেক সকালে ও সাঁজে
অনেক অবসরে কাজে!
তাহারি শেষ গান আধেক ল'য়ে কানে
দীর্ঘপথ দিয়ে গেছ সুদূরপানে,
আধেক জানা সুরে আধেক ভোলা তানে
গেয়েছ গুন্‌গুন্ স্বরে।
কেন না গেলে শুনি একটি গান আরো,
সে গান শুধু তব, সে নহে আর কারো,
তুমিও গেলে চলে সময় হল তারো,
ফুটল তব পূজা-তরে!
মাঠের কোন্‌খানে হারাল শেষ সুর,
যে গান নিয়ে গেলে শেষে
ভাবি যে তাই অনিমেষে!

প্রাচীন গ্রীস, প্রাচীন রোম ও প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যকল্পনা।*

"কমলিনী মলিনী দিবসাত্যয়ে
* শশিকলা বিকলা ক্ষণদাক্ষয়ে।
ইতি বিধির্বিদধে রমণীমুখং
ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ॥"

দিবসাপগমে কমলিনী মলিনী হয়, আর নিশাশেষে শশিকলা বিকলা হইয়া পড়ে। এইজন্যই বিধাতা রমণীমুখের সৃষ্টি করিয়াছেন। লোকে ক্রমে ক্রমেই বিজ্ঞতম হয়।

কোন্ অজ্ঞাত লেখক এই উদ্ভট শ্লোকের রচনা করিয়াছিলেন, তাহা স্থির জানা যায় না; কাজেই সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে এই ধারণা কোন্ সময়ের, তাহাও নিশ্চয় জানিবার উপায় নাই। রমণীমুখ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম; ইহাতে স্রষ্টার ক্রমশ বিজ্ঞতালাভের পরিচয় পাওয়া কবিকল্পনা; কিন্তু য়ুরোপীয় হিসাবে ইহা সৌন্দর্য্যকল্পনার ক্রমবিকাশ; ধারণার অভিব্যক্তির হিসাবে অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

অনুসন্ধান ও অধ্যয়নের ফলে জানা গিয়াছে, রমণীর মুখ সৌন্দর্য্যসৃষ্টির চরম বা সৌন্দর্য্যের আধার, প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের এ ধারণা ছিল না। এখন ইংরাজীতে Beauty বলিলে সুন্দরী বুঝায়। গ্রীক্ সৌন্দর্য্যকল্পনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শারীরিক গুণের সমন্বয়েই গ্রীক্‌দিগের মতে প্রকৃত সৌন্দর্য্য। সুষ্ঠু স্বাস্থ্য ও সর্ব্বাঙ্গে মুক্তাফলের কান্তিতরঙ্গের মত স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য প্রাচীন গ্রীক্‌দিগের নিকট প্রকৃত সৌন্দর্য্য বলিয়া পরিগণিত হইত। গ্রীক্‌গণ ব্যায়ামচর্চ্চানিপুণ ছিল। তাহাদিগের নিকট বিকলাঙ্গ ঘৃণাস্পদ। খণ্ডরাজ্যে শতধা বিভক্ত গ্রীস আত্মরক্ষার্থ সর্ব্বদাই সশস্ত্র থাকিত। স্পার্টায় এই সৈনিকবৃত্তি সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল ও পরিস্ফুট ছিল। স্পার্টায় রাজনীতিবিদ্, দার্শনিক বা সাহিত্যিকের আদর ছিল না; বীরই সম্পূজিত হইতেন। শিশু বিকলাঙ্গ বা দুর্ব্বল বলিয়া বিবেচিত হইলে তাহাকে বিনষ্ট করাই দেশের প্রচলিত বিধি ছিল। সপ্তবর্ষবয়স্ক বালককে জননীর ক্রোড়চ্যুত করিয়া শিক্ষাগারে প্রেরণ করা হইত। সেখানে তাহাকে বলবান্ ও কষ্টসহিষ্ণু করিবার জন্য চেষ্টার অন্ত ছিল না। শীতগ্রীষ্মে একই বেশ; শিকার করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল করিবার অভিপ্রায়ে অপর্য্যাপ্ত আহার—এ সকল নিয়মের মধ্যে ছিল। বালকের কষ্টসহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে ডায়েনার বেদীতে বেত্রাঘাত করা হইত। তাহার উচ্ছ্বসিত শোণিতে বেদী সিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সে বেত্রাঘাতের নিবৃত্তি ছিল না। বালিকাদিগকেও ব্যায়ামচর্চ্চা করিতে হইত। বিংশতিবর্ষের পূর্ব্বে যুবতীরা প্রায় বিবাহ করিত না। যুবকগণও ত্রিংশৎবর্ষের পূর্ব্বে বিবাহ করিতে পারিত না। কিন্তু যুবককে তখনও সাধারণ আগারে আহার করিতে

* বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের অধিবেশনে পঠিত

ও নিদ্রা যাইতে হইত। ষষ্টিবর্ষবয়ঃক্রমকালে পুরুষ সৈনিককর্ত্তব্যাবসানে গার্হস্থ্যজীবনযাপনের অবকাশ পাইত। তখন বার্দ্ধক্যের হিমবাতে যৌবনবসন্তের মুকুল ম্লান। শারীরিক বিকাশের যজ্ঞানলে দাম্পত্যসুখ, গার্হস্থ্যজীবন ও হৃদয়ের কোমলবৃত্তি আহুতি প্রদত্ত হইত। গ্রীকের শরীরে স্বাস্থ্যলাবণ্য যেন ফাটিয়া পড়িত। শারীরিক শ্রমের ফলে তাহার অঙ্গসঞ্চালনে বা অঙ্গভঙ্গীতে অনায়াসলব্ধ সৌন্দর্য্য স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইত। গ্রীসের যে সকল রাজ্যে শারীরিক বিকাশ চরম লক্ষ্য বলিয়া পরিগণিত হইত না, সে সকল রাজ্যেও ব্যায়ামাগারের অভাব ছিল না। গ্রীক্‌গণ গৃহকোণে বদ্ধ থাকিতে ভালবাসিত না। সূর্য্যকিরণ, মুক্তবায়ু, অনন্তপ্রসারিত গগন, এ সকল যেন গ্রীকের জীবনের অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল। ভারতবর্ষের সংসারবিরাগী সন্ন্যাসীদিগের মত সক্রেটিস্ পথে পথে জ্ঞান বিলাইতেন। বৃক্ষবাটিকায় প্লেটোর শিক্ষাদানকার্য্য সম্পন্ন হইত। দিবসে সূর্য্যকরোজ্জ্বল নীলাম্বরতলে ও সন্ধ্যায় বিকশিতজ্যোতিষ্কজ্যোতি গগননিম্নে বসিয়া গ্রীক্‌গণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দর্শন করিত। গ্রীক্‌দিগের ভিন্ন ভিন্ন শাখার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান বন্ধন—ব্যায়ামপ্রদর্শনী। স্বাস্থ্য, বল, সৌষ্ঠবসুষমা ও লাবণ্যে প্রাচীন গ্রীকের সৌন্দর্য্যকল্পনা নিবদ্ধ ছিল। এই শারীরিক বিকাশেই তাহার বিবেচনায় মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি। রমণীর সৌন্দর্য্য অপেক্ষাকৃত স্বল্পকালস্থায়ী; প্রাকৃতিক নিয়মে তাহার অস্থায়িত্ব নিশ্চিত; জীবস্রোত প্রবাহিত রাখিবার জন্য রমণীকে স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতির বেদিমূলে অর্ঘ্যদান করিতে হয়, সেই আত্মদানেই রমণীর মহত্ত্ব ও দেবীত্ব। কাজেই গ্রীক্‌সৌন্দর্য্যের আদর্শ নারীতে মিলিত না। গ্রীক্‌গণের বিবেচনায় শারীরিক বিকাশেই মনুষ্যত্বের পূর্ণ অভিব্যক্তি বলিয়া অনিন্দ্যসুন্দর আল্‌সিবাইডিসের দোষ দোষ বলিয়া পরিগণিতই হইত না, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কিরণে তাঁহার দোষের অন্ধকাররাশিও যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিত। প্রাচীন গ্রীকের সৌন্দর্য্যকল্পনা সাগরসম্ভবার অনুপম সৌন্দর্য্যে তৃপ্ত হইত না; সে সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার তৃপ্তির জন্য আপোলোর আবশ্যক হইয়াছিল।

এই আপোলো-মূর্ত্তি-কল্পনায় যে কত শিল্পীর জীবনসাধনা ব্যয়িত হইয়াছে; কর্ম্মহীন দিবস ও নিদ্রাহীন নিশায় নিষ্ফল প্রয়াসে কত শিল্পীর জীবনগ্রন্থি শিথিল হইয়া গিয়াছে; তাহা জানিবার আর উপায় নাই। কিন্তু সেই সাধনার যে ফল—এই সুদীর্ঘকালের ব্যবধানেও বর্ত্তমানে তাহা অতুলনীয়।

আপোলো সূর্য্যদেবতা। গ্রীসে সূর্য্যের প্রভাব নানা বিষয়ে পরিস্ফুট। মহাদ্যুতির কনককিরণে জীবজগতে নিত্য জীবনসঞ্জীবিত হইয়া উঠিত, হরিৎ প্রান্তরে কষিতকাঞ্চন উৎপন্ন হইত, তরু-লতা-নির্ঝর শুষ্ক হইয়া যাইত, কখন বা চারিদিকে ব্যাধি বিকীর্ণ হইয়া পড়িত, আবার কখন বা বায়ুমণ্ডল দূরীকৃতদূষিতপদার্থ, নির্ম্মল হইত। সভ্যতার প্রথম অবস্থায় মানব যখন প্রাকৃতিক শক্তিতে বিস্মিত হইয়া পড়ে, তখন সেই শক্তির ক্রিয়া যে স্বতঃপ্রণোদিত, স্বতঃপরিচালিত ও স্বতঃসংশোধিত, ইহা তাহার

ধারণায় আইসে না। তাই সে প্রত্যেক প্রাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাতা কল্পনা করে। আবার যে দেশে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব প্রবল, সে দেশে সেই প্রাকৃতিক শক্তির কল্পিত অধিষ্ঠাতৃদেবতার পূজা সমধিক সমারোহে সম্পন্ন হয়। এই নিয়মে বিচার করিয়া কেহ কেহ বলেন, হিমত্রাতা অগ্নির পূজক আর্য্যগণ হিমপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষের প্রান্তরে অবতীর্ণ হইয়া বজ্রধর ইন্দ্রের উপাসক হইয়া পড়েন; তখন বর্ষণ ব্যতীত জীবনধারণ অসম্ভব—শস্যোৎপাদন, গোমেষাদির আহার্য্যসংগ্রহ, সবই বর্ষণের উপর নির্ভর করে। ঋগ্বেদের অগ্নির আহ্বান :—

"তুমিই আহ্বান কর যত দেবগণ,
সিদ্ধকর্ম্মা, কীর্ত্তিময়, সত্যপরায়ণ;
দেবগণসাথে কর যজ্ঞে আগমন।" (১।১।১।১)

ইন্দ্রের আহ্বান :—

"আমাদের এই স্তুতি করিতে গ্রহণ
হে ইন্দ্র, আপনি তুমি আইস হেথায়;
অভিষুত হইয়াছে এ যজ্ঞে সবন
কর পান তৃষ্ণাতুর-গৌরমৃগ-প্রায়।"(১।১।১।১৬)

কেহ কেহ এই দুই আহ্বানের মধ্যে আর্য্যগণের হিমপ্রধান স্থান হইতে প্রান্তরে আগমনের পরিচয় পাইয়াছেন বা কল্পনা করিয়াছেন। যাহা হউক, যে দেশে যে প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব যত প্রবল, সে দেশে সেই শক্তির পূজাও তত সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এইজন্যই প্রাচীন গ্রীসে আপোলোর পূজায় বিশেষ সমারোহ ছিল। আপোলো-নামের দুই অর্থ :—এক অমঙ্গলবিনাশক; অপর সংহর্ত্তা। সূর্য্য-দেবতা হইতে আপোলো ক্রমে নানাভাবে পূজিত হইতেন। সূর্য্যকিরণ অবাধগতি—সূর্য্য সর্ব্বজ্ঞ; সেইজন্য পাপশাস্তির নিমিত্ত তাঁহার পূজা হইত। সূর্য্যের সর্ব্বজ্ঞতা হইতে আপোলোর ভবিষ্যৎরক্তাখ্যাতি। আবার সূর্য্যের জীবনাশ ও জীবরক্ষার ক্ষমতা হইতে আপোলো ঔষধের দেবতাপদে উন্নীত এবং প্রভাতাগমে জীবজগতের আনন্দকলরব হইতে ক্রমে সঙ্গীতের দেবতা বলিয়া গণিত। গ্রীকপুরাণে আপোলোর জন্মকথা এইরূপ :—খণ্ডিতা হীরার (জুনোর) ক্রোধানলভীতা লীটো বহুস্থানপর্য্যটনের পর ডেলসে আশ্রয়-লাভ করেন। তখন জিউস্-(জুপিটার্)-পুত্র আপোলো তাঁহার গর্ভে। নয়দিন প্রসববেদনা ভোগ করিয়া লীটো আপোলোকে প্রসব করেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আন্টিয়ামের নিকটে প্রাপ্ত আপোলোমূর্ত্তি (Apollo Belvedere) বিশেষ প্রসিদ্ধ। দ্বিতীয় জুলিয়াস্ ইহা ক্রয় করিয়া পোপপদে উন্নীত হইবার পর পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিকানে সংস্থাপিত করেন। এই মূর্ত্তি ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীসগণকর্ত্তৃক গৃহীত ও ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে পুনঃপ্রদত্ত হয়। অভিজ্ঞগণের বিশ্বাস, এই মর্ম্মরমূর্ত্তি খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে নির্ম্মিত একটি গ্রীকমূর্ত্তির অনুকরণ।

গ্রীকশিল্পীর রচনায় সুন্দর মুখের সৃষ্টি-বিষয়ে মনোযোগ বা চেষ্টা দৃষ্ট হয় না। সুন্যস্ত মস্তক, দেহের সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য, সুগঠিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে স্বাস্থ্য ও বলের শ্রী—এই সকলের সমাবেশই গ্রীকশিল্পীর সৌন্দর্য্যকল্পনার আদর্শ। সামঞ্জস্য ও সম্পূর্ণতা—এতদুভয়েই গ্রীকশিল্পরচনার সৌন্দর্য্য। প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীকশিল্পীদিগের রচিত নারীমূর্ত্তিতেও এই

একই কল্পনা বিকশিত। নারীমূর্ত্তিতে পুরুষ-মূর্ত্তির দৃঢ়ভাব ও শক্তিচিহ্নের অভাব; কিন্তু আদর্শ একই—গঠন, সামঞ্জস্য ও মাধুরী (grace), ইহাতেই সৌন্দর্য্যকল্পনা নিবদ্ধ। —সুন্দর মুখে বা অঙ্গবিশেষের বিশেষ বিকাশে বা গঠনবিশেষত্বে সৌন্দর্য্যকল্পনা প্রাচীন গ্রীক্‌শিল্পরচনায় লক্ষিত হয় না। প্রাচীন গ্রীসে নিম্নস্তরের শিল্পে শেষোক্ত সৌন্দর্য্যকল্পনার আদর্শ দেখা যায়—উচ্চ-স্তরের শিল্পে তাহার প্রবেশাধিকার নাই। মৃৎপাত্রে এই নিম্নস্তরের শিল্প বিকশিত। কিন্তু প্রসিদ্ধ শিল্পীর রচনায় ও কল্পনায় উচ্চ-স্তরের শিল্পে সুন্দর মুখই সর্ব্বস্ব নহে—দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ—গঠনসামঞ্জস্য সৌন্দর্য্যের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত।

যে জাতি ব্যায়ামচর্চ্চার সর্ব্বোচ্চ পুরস্কারই চরম যশ বলিয়া বিবেচনা করিত, যে জাতি ব্যায়ামচর্চ্চাকে ধর্ম্মের অঙ্গ করিয়া তুলিয়াছিল, যে জাতির নারীরাও উলঙ্গ হইয়া ব্যায়ামচর্চ্চা করিত, সে জাতির পক্ষে সৌন্দর্য্যের এই আদর্শই স্বাভাবিক ও সঙ্গত।

কীট্‌স্ এই কল্পনাই কবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন—"যে সৌন্দর্য্যে শ্রেষ্ঠ, সে যে শক্তিতেও শ্রেষ্ঠ হইবে, ইহাই সনাতন নিয়ম।"

প্রাচীন গ্রীস হইতে প্রাচীন রোমের সৌন্দর্য্যকল্পনার আলোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে, প্রাচীন রোমের সৌন্দর্য্যের আদর্শ প্রাচীন গ্রীসের আদর্শ হইতে যে-পরিমাণ ভিন্ন, বর্ত্তমান আদর্শের দিকে সেই-পরিমাণ অগ্রসর। শারীরিক বিকাশের যে আদর্শ প্রাচীন গ্রীসে দেখা গিয়াছে, সে আদর্শ তখনও অক্ষুন্ন; প্রভেদ এই যে, গ্রীক্‌গণ নরদেহে ও নারীদেহে সেই আদর্শের বিকাশপ্রয়াসী হইত; প্রাচীন রোমান্‌দিগের নিকট তাহা নারীদেহেই নিবদ্ধ—পুরুষের শারীরিক বলই সর্ব্বস্ব, শারীরিক সৌন্দর্য্য অনাবশ্যক। প্রাচীন রোমান্‌গণের মতেও মুখই সৌন্দর্য্যভাণ্ডার নহে;—কোন বিশেষগঠনের আনন সমধিক আদৃত নহে। রোমান্ স্থাপত্যের পদে পদে ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে বলা যাইতে পারে, মৈশরী ক্লিওপেট্রার সুন্দরী-খ্যাতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। নবীনচন্দ্র ক্লিও-পেট্রার কথায় বলিয়াছেন—"কল্পনা-অতীত রূপ নহে চিত্রণীয়।" প্রতীচ্য সাহিত্যে পদে পদে ক্লিওপেট্রার সুন্দরী-খ্যাতি। "অসংখ্য প্রস্তরে, পটে, কাব্যে, ইতিহাসে" সে রূপ লিখিত। কিন্তু সমসাময়িক মুদ্রায় মৈশরীর যে প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়—তাহাতে তাহার সুন্দরী-খ্যাতি একান্তই ভিত্তিহীন—নিতান্তই কবি-কল্পনা। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, সিজারের মত নারীসৌন্দর্য্যাভিজ্ঞও তাহার প্রভাবমুক্ত হইতে পারেন নাই; আণ্টনীর মত বহু-ভোগরত, উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রহীনও তাহার মোহ-মুগ্ধ হইয়া তাহার আলিঙ্গনকে স্বর্গসুখ বোধ করিয়া বলিয়াছিলেন:—

"Let Rome in Tiber melt, and the wide arch
Of the rang'd empire fall! Here is my space.
Kingdoms are clay: our dungy earth alike
Feeds beast as man: the nobleness of life
Is, to do thus; when such a mutual pair

And such a twain can do't, in which, I bind,
On pain of punishment, the world to weet,
We stand up peerless."

স্লেটে অঙ্কিত চিত্রাদির মত যে সকল চিত্রে মৈশরীকে সুন্দর মুখের অধিকারিণী বলিয়া বোধ হয়, অভিজ্ঞদিগের মতে সে সকল চিত্রের প্রাচীনত্বগৌরব ভিত্তিহীন।

রোমান্ ভাস্কর্য্য সন্ধান করিয়া অভিজ্ঞগণ যে আননে সৌন্দর্য্যদীপ্তি দেখিয়াছেন, সে আনন নারীর নহে—বালক আন্টিনোয়াসের। এই মূর্ত্তিও পোপের প্রাসাদ ভ্যাটিকানে রক্ষিত।

প্রাচীন শিল্পে মুখে সৌন্দর্য্যের বিকাশ ইট্রান্কান শিল্পীর রচনা। অরভিটোর নিকটে ভূগর্ভে প্রাপ্ত মৃৎপাত্রে যে মুখের চিত্র দেখা গিয়াছে, তাহার সহিত ফরাসা শিল্পীর সৌন্দর্য্যকল্পনায় সাদৃশ্য বিস্ময়কর।

প্রাচীন রোমান্গণ সৌন্দর্য্যসম্বন্ধে গ্রীক্ আদর্শই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল; কেবল নারীতে সেই আদর্শের বিকাশদর্শনপ্রয়াসী হইত। তাহাদের মতে দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশেই সৌন্দর্য্যের বিকাশ। ক্রমে যখন রোম বিলাসপ্লাবনে প্লাবিত হইয়া গেল—নিত্য নব উপাদানে রোমানের বিকৃত বিলাসবাসনা তৃপ্ত হইতে লাগিল, তখন রুচিরও বিকার আরম্ভ হইল। তথাপি তখনও রোমে গ্রীসের সৌন্দর্য্যকল্পনার ভিত্তি অপসৃত হইয়া যায় নাই।

প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোম হইতে প্রাচীন ভারতে শিল্পে সৌন্দর্য্যের আদর্শ সন্ধান করিলে, বিক্ষিপ্ত উপাদান ও বিরোধী মতের মহারণ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হয়। মনীষী মেকলে আপনার অভ্যস্ত সুললিত ভাষায় হিন্দুশিল্পের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন, "হিন্দুর পৌরাণিককাহিনী (Mythology) এতই অসম্ভব যে, তাহাতে হৃদয়ের বিকার অবশ্যম্ভাবী। হিন্দু ধর্ম্মমত,—বিজ্ঞান বা শিল্প কিছুরই অনুকূল নহে। হিন্দুর দেবসমষ্টির (Pantheon) মধ্যে সন্ধান করিলে কুত্রাপি প্রাচীনগ্রাকমন্দিরবাসী সুন্দর ও মহত্বপূর্ণ মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে না। All is hideous, and grotesque and ignoble." অভ্রান্ত সমালোচনার অনুবীক্ষণতলে মেকলের আপাতরম্য রচনার বহু ত্রুটি স্পষ্ট লক্ষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ফ্রেডরিক্ হ্যারিসন্ বলিয়াছেন, "মেকলের মতে ইতিহাস,—কবিতা ও দর্শনের সংমিশ্রণ; কিন্তু কার্য্যত তিনি কবিতার পরিবর্ত্তে বাক্যবিন্যাস ও দর্শনের পরিবর্ত্তে কিংবদন্তীর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ইংলণ্ডের ইতিহাস "is a compound of historical romance and biographical memoir." হিন্দুর পুরাণসম্বন্ধে মেকলে যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া স্থান নষ্ট করা অনাবশ্যক। তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা সত্ত্বেও একটি অতি প্রাচীন বিশ্বাস সম্বন্ধে যে নিঃসঙ্কোচ ফয়তা দিয়াছেন, তাহা Missionary slanderকেও পরাভূত ও নিষ্প্রভ করিয়াছে। হিন্দুশিল্পের নিন্দাবাদ করিবার সময় মেকলে যে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও আলোচনা না করিয়াই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। ভারতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের স্বতন্ত্র বিকাশ বিশেষ প্রশংসনীয়

নহে; তদুভয়ের সংমিশ্রণনৈপুণ্যেই ভারতীয় শিল্পের কৃতিত্ব। প্রাচীন যুগে পার্থেনন ও মধ্যযুগে রিমস কেথিড্রাল যে শিল্পের আদর্শ, প্রাচীন ভারতে সেই শিল্পই সম্যক্ বিকশিত হইয়াছিল। যে শিল্পবিকাশ গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া বেলজিয়াম্ পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়, তাহার যথেষ্ট আলোচনা ব্যতীত য়ুরোপীয়ের পক্ষে প্রাচ্যশিল্পের রসগ্রহণচেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। কিন্তু মেকলে যে গুরুতর ভ্রম করিয়াছেন, উপস্থিত উপাদানের উপাগমাভাব ও অনাবিল অভিজ্ঞতার অনধিগম্যতা বিবেচনা করিয়া তাহা ওয়েষ্টমেকট্ ও ম্যাক্সমূলারে মার্জ্জনীয় হইলেও বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক Lubke-র মত ব্যক্তিতে নিতান্ত নিন্দনীয়। একান্ত দুঃখের বিষয়, অধ্যাপক ও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, হিন্দুধর্ম্ম যখন নিন্দনীয়, তখন ভারতীয় plastic শিল্পও নিন্দনীয়। ব্রাহ্মণগণ যখন জগৎকে মায়া বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তখন কোন্ উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া শিল্প দৈনিক-জীবনের বিচিত্র চিত্র চিত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইবে? প্রমাণের স্থানে অধ্যাপক দশমুণ্ড রাবণকে হিন্দুর দেবতা (!) বলিয়াছেন। যেখানে অভিজ্ঞতার অভাবে কল্পনার শরণ লইতে হয়, সেখানে এরূপ ভ্রম বোধ হয় অনিবার্য্য। য়ুরোপীয় লেখকদিগের এইরূপ অভিজ্ঞতার অভাব যে ভারতবর্ষসম্বন্ধে বহু ভ্রান্ত ধারণার বিস্তারে সাহায্য করিয়াছে ও করিতেছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আরও দুঃখের বিষয়, যথেষ্ট আলোচনার অভাবে এই সকল ভ্রান্ত মত য়ুরোপীয়প্রভাবপুষ্ট আমাদের নিকটও ধ্রুবসত্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

গ্রীক্‌শিল্প ও হিন্দুশিল্পের একটি প্রধান প্রভেদ এই যে, গ্রীক্ যেখানে অভ্রান্ত ও সুবিন্যস্তের প্রতি দৃষ্টিশীল, হিন্দু সেখানে বৈচিত্র্য ও বাহুল্য রচনায় সচেষ্ট।

ভারতীয় শিল্প হইতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। একদল শিল্পসমালোচক ভারতীয় শিল্পকে বিদেশীয়-প্রভাব-পূর্ণ পরাঙ্গপুষ্ট প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। তাঁহাদের মতের আলোচনার স্থান এ নহে। তবে এ কথা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে যে, বিদেশী শিল্পের প্রভাবলেশশূন্য ভারতীয় শিল্পের অভাব নাই। সে সকলে বিদেশী প্রভাব কল্পনা করিবার অবসরমাত্র নাই। অভিজ্ঞ ডাক্তার ফার্গুসনের মতে ভারতীয় স্থাপত্য স্বাধীন বলিয়া এবং ভিন্নদেশীয় স্থাপত্য হইতে স্বতন্ত্র প্রকারের বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রাচীন হিন্দুশিল্পকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়াছেন—(১) স্তম্ভ, (২) স্তূপ, (৩) বৃতি, (৪) চৈত্য, (৫) বিহার। এই পঞ্চ বিভাগের মধ্যে কোন্ ভাগ বিদেশীপ্রভাব-পুষ্ট? কোন্ ভাগে বিজাতীয় প্রভাব মুদ্রিত? ভিন্নভিন্নদেশীয় শিল্পের সহিত তুলনার পর সুধী রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, "Whatever the origin or the age of ancient Indian architecture, looking to it as a whole it appears perfectly self-evolved, self-contained and independent of all extraneous admixture. It has its peculiar rules, its proportions, its particular features,—all bearing impress of a style that has

grown from within,—a style which expresses in itself what the people, for whom and by whom, it was designed, thought, and felt, and meant, and not what was supplied to them by aliens in creed, colour and race.” হিন্দুশিল্পগ্রন্থের প্রাচুর্য্য ও বিবিধ গ্রন্থে তাহার শিল্পরচনার নিয়মের বিষয় জানিতে ইচ্ছুক পাঠককে রামরাজের Architecture of the Hindus’ এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Antiquities of Orissa গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিতে অনুরোধ করি। বুদ্ধগয়া ও বারহুতের বৃতিতে (২০০ খৃঃ পূঃ) বিকশিত ভাস্কর্য্য বিজাতীয় প্রভাবের লেশমাত্রবর্জ্জিত—হিন্দুশিল্পের স্বাতন্ত্র্যচিহ্নাঙ্কিত। সাঞ্চীর তোরণ বিচিত্রভাস্কর্য্যভারাক্রান্ত। বুদ্ধের জীবনের ইতিহাসের বহু চিত্র ব্যতীত, সেই সকল তোরণে আহার, পান বা প্রেমালাপে রত মানব ও মানবীরও অভাব নাই। গান্ধার ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শিল্পে যদিবা বিজাতীয়প্রভাবকল্পনার অবকাশ থাকে, বোম্বাই হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত বিস্তৃত অংশের শিল্প বিজাতীয় বা বিদেশীয় প্রভাবলেশ বর্জ্জিত। এই সকল শিল্পসৃষ্টিতে বিজাতীয় বা বিদেশীয় প্রভাব কল্পনার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এই সকল শিল্পরচনার আলোচনা করিয়া প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বুঝিবার চেষ্টা করাই সঙ্গত।

এই সকল শিল্পরচনা হইতে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ বুঝিতে বিলম্ব ঘটে না। রমণীই যে প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যের আদর্শ, তাহাতে আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। পুরুষমূর্ত্তিরচনায় শিল্পী কোথায়ও স্বভাবকে অতিক্রম করেন নাই, সর্ব্বত্রই স্বভাবের অনুগমন করিয়াছেন। কিন্তু নারীমূর্ত্তিরচনায় তাহা হয় নাই, সেখানে সৌন্দর্য্যরচনায় সচেষ্ট চেষ্টায় কল্পনা বাস্তবকে অতিক্রম করিয়াছে, কবিপ্রসিদ্ধির মায়াশিল্পীকে দেহের কোন কোন অংশের রচনাকালে প্রাকৃতিক সামঞ্জস্যের প্রতি অন্ধ করিয়াছে। হিন্দুশিল্পীর নারীমূর্ত্তিতে স্তন স্বাভাবিক হইতে পীনতর, নিতম্ব স্বাভাবিক হইতে পৃথুতর, কটি স্বাভাবিক হইতে ক্ষীণতর এবং নয়ন স্বাভাবিক হইতে দীর্ঘতর। এই সকল বিশেষত্ব কোথাও অপেক্ষাকৃত অল্প, কোথাও অত্যন্ত অধিক—কিন্তু প্রায় সর্ব্বত্রই বিদ্যমান।

রাজা রাজেন্দ্রলাল উড়িষ্যার শিল্পসম্বন্ধে এ কথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, যে সকল শিল্পরচনায় এই সকল আতিশয্য লক্ষিত হয়, সে সকল উড়িষ্যার শিল্পের উৎকৃষ্ট রচনা নহে। কিন্তু তিনি যাহাকে উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন, তাহার সংখ্যা একান্ত অল্প। এইরূপ আতিশয্য প্রায় সকল নারীমূর্ত্তিতেই বিদ্যমান; তবে কোথাও তাহাকে “Full swelling luxurious softness of forms” বলিয়া গ্রহণ করা যায়—অন্যত্র তাহাকে স্বভাবের ব্যতিক্রম ব্যতীত অন্য কিছু বলা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। বঙ্কিমচন্দ্র উড়িষ্যার এই সকল নারীমূর্ত্তিকে “পীবরযৌবনভারাবনতা” বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই পীবরত্ব স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

বক্ষের অতিপীনতাসম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল বলিয়াছেন, বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার জলবায়ুর প্রভাবে শিলামূর্ত্তিতে যাহা সহসা অস্বাভাবিক বোধ হয়, প্রকৃত জীবনে তাহা প্রকৃতই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজার মত স্বদেশের প্রাচীন কীর্ত্তিতে অসাধারণশ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিও নিতম্বের পৃথুতা, কটির ক্ষীণতা ও নয়নের অতিবিস্তৃতি সম্বন্ধে উড়িষ্যার শিল্পীর ত্রুটি অস্বীকার করিতে পারেন নাই।

আবার উড়িষ্যার জলবায়ুর প্রভাব ও মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বসীমার জলবায়ুর প্রভাব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অথচ উড়িষ্যার শিল্পসম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, সে সকল অজণ্টার গুহাচিত্রসম্বন্ধেও প্রযোজ্য। সেখানেও পুরুষচিত্রে অনায়াস স্বাভাবিকতা ও নারীচিত্রে সৌন্দর্য্যরচনার সচেষ্ট চেষ্টা পরিস্ফুট—সেখানেও নারীমূর্ত্তিতে উড়িষ্যার নারীমূর্ত্তিতে লক্ষিত বিশেষত্বসকল বর্ত্তমান। সে সকল চিত্রেও নারীমূর্ত্তিতে নয়ন অত্যন্ত বিস্তৃত। ভারত গভর্মেণ্টের আদেশে বোম্বাই শিল্পবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মিষ্টার গ্রিফিথ্‌স্ অজণ্টাগুহা-চিত্রাবলী-সম্বন্ধে যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন—"An exaggeration of the feminine hip and breasts has ever been a snare to the Hindu sculptor, who seems to think more of the conventional phrases of poetry than of the actual form." এই সকল চিত্রে শিল্পী কি সুন্দররূপে মানবহৃদয়ের শত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। শিল্পীর ক্ষমতায় অবিশ্বাস করিবার অবকাশমাত্র নাই। কিন্তু সৌন্দর্য্যরচনার পরিস্ফুট চেষ্টায় কল্পনা বাস্তবকে অবহেলে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

এই নারীমূর্ত্তিতে সৌন্দর্য্যবিকাশকল্পনার প্রভাব ভারতে শিল্পীকে এমনই অভিভূত করিয়াছিল যে, পুরুষের দেহে সৌন্দর্য্যরচনাকালে তিনি দেহের গঠন নারীসুকুমার করিয়াছেন। প্রমাণস্বরূপে ভুবনেশ্বরের মন্দিরে কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কার্ত্তিকেয়ের অলঙ্কার, মাল্য ও বসন বিষয়ে শিল্পী অসাধারণ মনোযোগ দান করিয়াছেন; কিন্তু দেবসেনাপতির দেহ নারীদেহেরই মত। বাহু, চরণ, বক্ষ ও স্কন্ধ সবই পরিপূর্ণ-কোমল, মাংসল। শিল্পীর পক্ষে নারীদেহে সৌন্দর্য্যবিকাশের চেষ্টা এতই অভ্যস্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, নরদেহে সৌন্দর্য্যবিকাশের চেষ্টা করিবার সময় তিনি নারীদেহে অভ্যস্ত আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন—দেবসেনাপতির দেহে শক্তির ও পৌরুষের বিকাশের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন।

সাঞ্চী ও অমরাবতী উভয়স্থানেই উলঙ্গ পুরুষমূর্ত্তির গঠন সযত্নে বর্জ্জিত, ভুবনেশ্বরেও নগ্ন পুরুষমূর্ত্তির সংখ্যা অধিক নহে। কিন্তু এই তিন স্থানেই প্রায়-সকল নারীমূর্ত্তি নগ্ন। শিল্পী যে স্থানে সৌন্দর্য্যসৃজনে ব্যস্ত, সে স্থানে আবরণ দিয়া তিনি সৌন্দর্য্যের সম্পূর্ণতা ক্ষুণ্ণ করিতে অসম্মত; শিল্পীর মানসকল্পিত সৌন্দর্য্যের আদর্শ কেবল "সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ" ধারণ করিয়া আপনার পূর্ণতা ও লাবণ্য নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিতেছে। এই সৌন্দর্য্যকল্পনার বিকাশ কেবল নারীমূর্ত্তিতে —নরদেহে নহে।

মূলের সহিত পরিচয়ের অভাবে আমরা প্রাচীন গ্রীস ও প্রাচীন রোমের সৌন্দর্য্য-কল্পনার আলোচনাকালে সাহিত্যের আলোচনা করি নাই। সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনা করিলে লক্ষিত হইবে, প্রাচীন ভারতের শিল্পে যে সৌন্দর্য্যকল্পনা লক্ষ্য করা যায়, সাহিত্যেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। শিলার অঙ্গে ও পুস্তকের পত্রে—শিল্পীর রচনায় ও কবির কল্পনায় একই আদর্শ পরিস্ফুট। বেদে উষার বক্ষ অবারিত করিবার দৃষ্টান্ত অনেকেরই স্মরণ হইবে। সংস্কৃতসাহিত্যে পুরুষের বর্ণনা যে নাই, এমন নহে—

"ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রো ধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ॥"

কিন্তু পুরুষের পক্ষে দেহের সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য নহে, সদ্‌গুণই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। একটি শ্লোকের একটি চরণে দিলীপের রূপ বর্ণনা করিয়া, কবি পরবর্ত্তী সপ্তদশ শ্লোকে তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছেন। পুরুষের রূপ-বর্ণনার অপেক্ষা নারীর রূপবর্ণনায় যে কবির আনন্দ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি পুরুষের গুণবর্ণনায় ও নারীর রূপ-বর্ণনায় বর্ণনা দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পুরুষের গুণ প্রশংসার যোগ্য, নারীর রূপ চিত্তবিমোহন।

রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভায় বহুদিগ্‌দেশাগত রাজা ও রাজপুত্রদিগের বর্ণনা আছে। সমাগত প্রার্থীদিগের বর্ণনায় "পুংবৎ প্রগল্‌ভা" সুনন্দা যে তাঁহাদের রূপের বর্ণনা করে নাই, এমন নহে। অঙ্গ-অধীশ্বর "সুরাঙ্গনাপ্রার্থিতযৌবনশ্রী"। তাহার পর—

বিশাল-উরস হের অবন্তি-ঈশ্বরে
সুগোল সুক্ষীণ কটি, দীর্ঘবাহুধর;
বিশ্বকর্ম্মা শানযন্ত্রে শানিলে ভাস্করে
হয়েছিল শোভা তাঁর এমনি সুন্দর।

অনূপরাজ "প্রিয়দর্শন;" নাগপুরপতি "রূপে দেবতাসমান"; অঙ্গ "সর্ব্বাবয়বানবদ্য"। কিন্তু ইঁহাদের বংশ, যশ ও শৌর্য্যবীর্য্যাদি গুণাবলীর বর্ণনার নিকট সৌন্দর্য্যবর্ণনা নিষ্প্রভ।

গম্ভীরস্বভাব এই মগধের পতি,
শরণাগতের ইনি আশ্রয়ের স্থান;
প্রজার রঞ্জনে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুমতি,
সার্থক ধরেন রাজা 'পরন্তপ' নাম

*　　*　　*　　*

অবিশ্রান্ত যজ্ঞ যত অনুষ্ঠান করি
আনেন নিয়ত রাজা ইন্দ্রে আহ্বানিয়া,
ইন্দ্রাণীর পাণ্ডুবর্ণ-কপোল-উপরি
মন্দারবিহীন কেশ রহে ছড়াইয়া।

অঙ্গ-অধীশ্বর-সম্বন্ধে:—

এই রাজা অরিকুলে করিলে সংহার
মুক্তাফল ফেলি' কাঁদে তাহাদের নারী,
বিনাসূত্রে গাঁথা যেন মুকুতার হার
শোভিল তাদের বক্ষে কিবা মনোহারী।

অবন্তি-ঈশ্বর:—

যুদ্ধার্থে যখন রাজা করেন গমন
অশ্বখুরে ধূলিরাশি উড়ি' ঘনাকারে
সামন্তনৃপতিশিরে মণি সুশোভন
লুপ্ত করে প্রভা তা'র ঘন অন্ধকারে।

অনূপরাজ—

বেদজ্ঞপণ্ডিতসেবী এই নরপতি;
লক্ষ্মীর 'চঞ্চলা'আখ্যা আধারকারণ—
সে কলঙ্ক দূর তাঁর করিলা সুমতি।

*　　*　　*

যুদ্ধকালে অগ্নিদেব সহায় ইঁহার।

যজ্ঞানুষ্ঠানতৎপর শূরসেন-অধিপতি—

হিমাংশুর সম কান্তি নয়নরঞ্জন
বিস্তার করেন রাজা শোভি নিজপুর ;
অসহ্যপ্রতাপে রিপু করে পলায়ন—
বিজন ভবনে তা'র জন্মে তৃণাঙ্কুর।

* * *

গরুড়ের ভয়ে মণি দিয়া উপহার—
কালিয় যমুনাবাসী লইল শরণ ;
শোভিতেছে সেই মণি বক্ষেতে ইঁহার
লাঞ্ছিয়া মাধববক্ষে কৌস্তুভরতন।

কলিঙ্গরাজের—

হেরি' মৌর্ব্বীচিহ্ন করে এই হয় মনে
রিপুরাজলক্ষ্মী যবে জিনিলা নৃপতি—
সকজ্জল অশ্রুধারা ফেলি সুলোচনে
কাঁদিয়াছে মনোদুঃখে বন্দীকৃতা সতী।

নাগপুরপতি—

হরকাছে দিব্য অস্ত্র লভিলা রাজন ;
জনস্থান-আক্রমণ শঙ্কিয়া অন্তরে
রাজা সনে সন্ধি অগ্রে স্থাপিয়া রাবণ
সুরেশ্বরে জিনিবারে গিয়াছিলা পরে।

যাঁহার জন্য এই রাজসমাগম, কালিদাস তাঁহার বর্ণনা করেন নাই—কেবল কোথাও সুনন্দার সম্বোধনে, কোথাও বা কোন রাজার নিকট হইতে গমনশীলার প্রতি একটি সুপ্রযুক্ত বিশেষণে—কয়টি রেখায়—মনোজ্ঞ-চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তিনি—তন্বী, রম্ভোরু, তামরসান্তরাভা, সুদতী, সুন্দরী, আবর্ত্তমনোজ্ঞনাভি, অবালেন্দুমুখী, চকোরাক্ষী, রোচনাগৌরশরীরযষ্টি, ইন্দুপ্রভা, অরালকেশী, করভোপমোরু। ইহার পর অষ্টম সর্গে নারদের বীণাপ্রচ্যুত মাল্য ইন্দুমতীর সুজাতোরুস্তনকোটিতে সুস্থিতিপ্রাপ্ত হইল। শোককাতর অজের বিলাপেও এই সকল কথা পুনরুক্ত হইয়াছে।

রাজশুদ্ধান্তের অকুণ্ঠিত আদরে পালিতা ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভা হইতে স্বচ্ছন্দবর্দ্ধিত-তরুলতাস্নিগ্ধ, হোমধূমগন্ধামোদিত তপোবনে প্রবেশ করিলেও এই আদর্শ দৃষ্ট হইবে। সেখানেও প্রিয়ংবদা অতিপিনদ্ধ বল্কল-বন্ধন-পীড়িতা শকুন্তলাকে সে পীড়ার জন্য যৌবনারম্ভের প্রতি তিরস্কার করিতে বলিতেছে। আর বৃক্ষান্তরালবর্ত্তী দুষ্মন্ত সেই বল্কলবসনাবৃতাকে পাণ্ডুপত্রোদরপিনদ্ধ কুসুমের সহিত তুলনা করিতেছেন।

মানবসমাজ ত্যাগ করিয়া কবিকল্পিত ভিন্ন জীবজগতে প্রবেশ করিলেও এই আদর্শ লক্ষিত হইবে। শাপান্তগমিতমহিমা বিরহ-তাপক্লিষ্ট যক্ষের বিরহকে অবলম্বন করিয়া কালিদাসের প্রতিভা যে সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে, জগতের সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। জগতে নিত্যসত্য বিরহবেদনার এই সঙ্গীত সর্ব্বত্র আদৃত। মেঘদূতের তিনখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে ; বঙ্গানুবাদ আটখানি দেখিয়াছি, সম্ভবত আরও আছে। এই অমর বিরহকাব্যের প্রাণস্বরূপিণী, পতিবিয়োগবিধুরা, শিশির-মথিতা পদ্মিনীর দশাগ্রস্তা, প্রবলরুদিতোচ্ছূন-নেত্রা, বিরহবিশীর্ণা যক্ষবনিতার বর্ণনা বিরহ-বিধুর পত্নীধ্যাননিরত যক্ষের কথায়—

পক্ব-বিম্বাধর-ওষ্ঠী, তন্বী, শ্যামা, শিখরদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি, চকিতহরিণীসুনয়না,
শ্রোণীভারমন্দা গতি, স্তোকনম্রা স্তনযুগভারে ;
প্রথম রচনা যেন যতনে সৃজিলা ধাতা তারে।

এখানে সেই একই কল্পনা পরিস্ফুট।

প্রাচীন ভারতের কবিকল্পনা দেবীকেও এই সৌন্দর্য্যসম্ভূষিতা করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছে। মানব দেবতার কল্পনাতেও বড় সহজে আপনাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক টেন বিখ্যাত Paradise Lost কাব্যের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা মানবের সীমাবদ্ধ কল্পনায় দেবতা ও দেবত্ব রচনার প্রয়াসের উপর তীব্র কশাঘাত—"The Hindoo sacred poems, the Biblical prophecies, the Edda, the Olympus of Hesiod and Homer, the visions of Dante, are glowing flowers from which a whole civilisation blooms, and every emotion vanishes before the lightning thought by which they have leapt from the bottom of our heart." কিন্তু মিণ্টনের জিহোভা যেন প্রথম জেম্‌স্‌! মিণ্টনের ঈশ্বর "a business man, a schoolmaster, a man for show!" দেবদূতগণ পর্য্যায়ক্রমে তাঁহার সিংহাসনসমীপে তাঁহার যশোগান করে। ঈশ্বর বেচারার কি দুর্ব্বহ জীবন! অনন্তকাল ধরিয়া আপনার যশোগান শ্রবণ করা কি কষ্টকর!

কালিদাস "কুমারসম্ভব"কাব্যে ভবেশ-ভাবিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। যৌবনাগমে পার্ব্বতীর দেহ সূর্য্যাংশুভিন্ন শতদলের শোভা ধারণ করিল। তাহার পর পার্ব্বতীর রূপবর্ণনায় হিন্দুশিল্পীর সকল রচনার বিশেষত্ব বর্ত্তমান। অঙ্গুষ্ঠনখপ্রভা রক্তিমোদ্গারিণী, তাহাতে চরণদ্বয় স্থলপদ্মের শ্রী আহরণ করিতেছে; গতি মরালগতির মত; উরুর উপমা নাই, কারণ করিকরচর্ম্ম কর্কশ—কদলীতরু বড়ই শীতলস্পর্শ; কাঞ্চীগুণস্থান—মহেশের অঙ্কলক্ষ্মীরই উপযুক্ত; মধ্যদেশ বেদির মত; উরোজযুগলের মধ্যে মৃণালসূত্র পর্য্যন্ত সঞ্চরিতে পারে না; বাহুযুগ শিরীষাধিকসুকুমার; নয়ন হরিণীর নয়নেরই মত; ইত্যাদি, ইত্যাদি। ইহার পর উপাসিকা পার্ব্বতী উপাসিতের সমীপবর্ত্তিনী হইতেছেন। উপাসিত সংসারবিরাগী শম্ভু—যাঁহার সামান্য চিত্তচাঞ্চল্য উৎপাদনের পাপে কাম ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই মহেশ্বর। কাজেই কালিদাস সঙ্কীর্ণবুদ্ধির মত এস্থলে পার্ব্বতীর রূপবর্ণনায় প্রবৃত্ত হন নাই। কিন্তু "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা"—এইজন্য কোথাও আভরণের বর্ণনায়, কোথাও বাসের বর্ণবর্ণনে, কোথাও সুগন্ধিনিশ্বাসলুব্ধ ভ্রমরের লীলার কথায়—সে রূপের যে আভাস দিয়াছেন, তাহাতেই সে রূপরাশি বর্ণিত হইয়াছে—

বাসন্তকুসুম দেহে শোভে সুকুমার—
পদ্মরাগ উপেক্ষিয়া অশোক উজল,
সুবর্ণের দ্যুতিসম শোভে কর্ণিকার,
সিন্ধুবার লভিয়াছে মুকুতার স্থল।

স্তনভারে দেহলতা ঈষৎ আনতা,
বালার্ক-বরণ বাস শোভে অঙ্গ'পরে
পর্য্যাপ্তকুসুমনম্রা পল্লবিতা লতা
সঞ্চরিছে মৃদু যেন পবনের ভরে।

কেশরে রচিত কাঞ্চী নিতম্বের 'পরে,
স্রস্ত হ'লে করে বালা করিছে ধারণ,
উপযুক্ত স্থান যেন বিচারি' অন্তরে
অস্ত্রতর গুণ কাম করিলা রক্ষণ।

সুগন্ধি নিশ্বাসবায়ে পিয়াসী প্রবল
বিম্বাধরসন্নিকটে সঞ্চরে চঞ্চরী
ক্ষণে ক্ষণে চমকিছে নয়ন চঞ্চল
নিবারে তাহারে বালা লীলাপদ্ম ধরি'।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ও সাহিত্য উভয়ের আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে—প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য্যকল্পনা নারীদেহকে অবলম্বন করিয়া শিল্পে ও সাহিত্যে—দেবালয়-প্রাচীরে ও রঙ্গমঞ্চে,—শিলা-অঙ্গে ও পুস্তক-পত্রে অজস্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে! প্রাচীন ভারতের সুন্দরের আদর্শ পুরুষে নহে—নারীতে।

ইহা ভারতীয় শিল্পের স্বাতন্ত্র্য—এবং ভারতীয় শিল্পের মৌলিকতা—তাহার দেশজত্বের প্রমাণ। অবান্তর হইলেও এইস্থানে আর একটি কথা কহিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেছি না; প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে সুন্দরমুখ সৌন্দর্য্যের আধার বলিয়া বিবেচিত হইত না; প্রাচীন ভারতে সুন্দরমুখ রচনার ও বর্ণনার যথেষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান।

ভিন্ন ভিন্ন দেশের শিল্পের আদর্শও ভিন্ন ভিন্ন। দেশকালপাত্রভেদে শিল্পের আদর্শও পরিবর্ত্তিত হয়। শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজের প্রভাবে শিল্পীর সৌন্দর্য্যকল্পনা নিয়ন্ত্রিত হয়। ফরাসীলেখক গীদ মোঁপাসা বলিয়াছেন, জনসাধারণ শিল্পীকে বলে—এ দাও, ও দাও; কেবল জনকয়েক chosen spirits বলেন, তোমার সুবিধা বুঝিয়া যে কোন আকারে সুন্দর কিছু দাও। বাস্তবিক শিল্পী আপনার সমাজ, সময়, শিক্ষা ও সংস্কার অনুসারে যে আকারে আপনার মানসবিকাশ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহার উৎকর্ষসাধনই তাঁহার জীবনসাধন হইয়া দাঁড়ায়; সেই উৎকর্ষেই তাঁহার বিচার যুক্তিযুক্ত—তাহাই প্রকৃত পন্থা। প্রকৃত শিল্পপ্রতিভা যে আকারেই আপনার কল্পনাকে বিকশিত ও সার্থক করিতে চেষ্টা করে, সফল হইলে তাহাকেই দিব্যদীপ্তিসমুজ্জ্বল—সুন্দর করিয়া তুলে। তাহার সাফল্য তাহাতেই। সৌন্দর্য্য-কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সার্থক সৌন্দর্য্য-মাত্রই উপভোগ্য—চিত্তবিমোহন—"A thing of beauty is a joy for ever."

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

ইচ্ছা।

কর্ম্ম মনুষ্যজীবনের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। মানুষ যতদিন জীবিত থাকে, ততদিন কোন-না-কোন-প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া যায়। আমরা যাহাকে বিশ্রাম বলি, তাহাতেও কর্ম্ম-শীলতা বর্ত্তমান আছে। শ্বাসপ্রশ্বাস, হৃদয়ের স্পন্দন, মস্তিষ্কের ক্রিয়া, হস্তপদসঞ্চালন প্রভৃতিও কর্ম্ম। সুতরাং জীবনে কর্ম্মস্রোত অবিরাম বহিয়া যাইতেছে। সেই কর্ম্ম-স্রোতের উন্মুক্ত ঢেউগুলি কেবল আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তাই সেগুলি

আমরা ‘কর্ম্ম’নামে অভিহিত করি। আর যে অন্তঃস্রোত আমাদের নিবিড় বিশ্রামের মধ্যেও অবিশ্রাম বহিয়া চলিয়াছে, তাহার দিকে সহসা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। মানুষ যখন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন, তখন সে সুপ্তমীন হ্রদের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকে। কিন্তু সে হ্রদের মৃদুকম্পন কখনও একেবারে তিরোহিত হয় না। চিন্তার সময়ে মস্তিষ্কের যন্ত্র অনবরত ক্রিয়া করিতে থাকে। নিদ্রার সময়েও সে ক্রিয়ার বিরাম নাই। স্বপ্নদর্শন ত নিদ্রার নিত্যসহচর। তদ্ভিন্ন হস্তপদাদিসঞ্চালন, পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং মশকনিবারণ প্রভৃতি হইতে জানা যায় যে, নিদ্রিতাবস্থায় চৈতন্যের একেবারে বিলোপ হয় না। চৈতন্য তখনও ক্রিয়া করিতে থাকে। ঘুমন্তশিশুর হাসি এবং অভিমানস্ফুরিতাধর দেখিলে মনে হয়, ঘুমের যেন একটি রাজ্য আছে। আত্মা সেখানে জাগ্রত জীবনের পুনরভিনয় করিয়া হাসি ও অশ্রুর সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কর্ম্ম এক জীবনব্যাপী সাধনা—জীবনে তাহার ইয়ত্তা নাই, শেষ নাই, বিনাশ নাই। কর্ম্ম জীবনের ধর্ম্ম। কর্ম্মময়ই জীবন অথবা জীবনই কর্ম্ম। কর্ম্মশৃঙ্খলপরম্পরায় জীবন গাঁথা ; কর্ম্মবন্ধনে জীবন বাধা ; এই কর্ম্মগ্রন্থি যেদিন টুটিয়া গেল, সেদিন জীবনের গ্রন্থও সমাপ্ত হইল। অনন্তজীবনের কথা বলিতেছি না। পার্থিব জীবন এবং পার্থিব কর্ম্ম একই সময়ে শেষ হয়। সুতরাং জীবন কর্ম্ম বই আর কি? জীবনে কর্ম্মের বিশ্রাম নাই ; পূর্ণবিশ্রাম,—চিরবিশ্রাম মরণে।

জীবন কি? জীবজগতের উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত যে অবিচ্ছেদ্য জীবসূত্র বিলম্বিত রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত স্বরূপ কি? এ প্রশ্ন চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই মনে উদিত হয়। কিন্তু এ তত্ত্বের মীমাংসা বড়ই কঠিন। হার্বার্ট স্পেন্সার ‘জীবনে’র সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—“বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অন্তঃপ্রকৃতির সামঞ্জস্যস্থাপনের নামই জীবন।” জীবজগতে এই সামঞ্জস্যস্থাপনের জন্য সেতের সমী কত সংগ্রাম। জীবন পারিসিত সংসারবিরাগার (Environments) মধ্যে বর্দ্ধিত ও নিয়মিত হয়। শিশু যে মানসিক, নৈতিক এবং আধিভৌতিক অবস্থার মধ্যে তাহার দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করিয়াছে, তাহার প্রভাব সে জীবনে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। ফলত পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা জীবন গঠিত। তাহার সহিত চিরবৈরিতা করিয়া জীবন বহে না। যে কোন উপায়ে হউক, জীব তাহার অবস্থাকে, হয় আপনার অনুকূল করিয়া লইবে, না হয়, আপনাকে সেই অবস্থার অনুরূপ করিয়া তুলিবে। রোমে বাস করিতে হইলে যেমন রোমীয়দিগের মত হইতে হয়, সংসারে থাকিতে হইলে,—বাঁচিতে হইলে, তেমনি সংসারের উপযোগী প্রকৃতি গঠন করিতে হইবে। নহিলে জীবন বহিবে কেন? সংসারের উপযোগী হইতে পারিল না বলিয়া যে অসংখ্য জীব বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে, পৃথিবী কেবল সযত্নে হৃদয়ের অন্তস্তলে তাহাদের স্মৃতি রক্ষা করিতেছেন। অতএব জীবনধারণ করিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত অনুকূল সম্বন্ধ স্থাপন করিতে হইবে। কোন কোন জীবাণু এমন অবস্থার মধ্যে বাস করে যে, সামান্য চেষ্টা-

তেই সে বাঁচিতে পারে ; কিন্তু একটু অবস্থান্তর ঘটিলেই তাহার বিনাশ। জীবজগতের স্তর দিয়া যতই উপরে উঠি, ততই দেখিতে পাই, অবস্থা পরিবর্ত্তনশীল, এবং জীবনধারণ ক্রমশই জ্ঞান ও পরিশ্রম সাপেক্ষ। মানুষ জীবজগতের রাজা, সংসারও তাহার পক্ষে অশেষ পরিবর্ত্তন ও জটিলতার আগার। আমাকে বাঁচিতে হইলে জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে, সংসারের সহিত বনাইয়া চলিতে হইবে। যদি তাহা না পারি, তবে এ সংসারে আমার স্থান হইবে না। মৎস্য জলের সহিত অনুকূল সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া লইয়াছে, তাহার অবয়ব, তাহার প্রকৃতি, সমস্তই জলজীবনের অনুকূল হইয়া গিয়াছে। তাহাকে জল হইতে বাহির করিলে সে কিছুক্ষণ চেষ্টা করিবে বায়ুজগতে থাকিবার জন্য —মরিতে কে চায় ? কিন্তু তাহার সে চেষ্টা সফল হইবে না। কারণ তাহার অন্তঃপ্রকৃতি বাহ্যপ্রকৃতির সহিত বনাইয়া উঠিতে পারিল না। যেখানে এই প্রকৃতিদ্বয়ের অসামঞ্জস্য, বিরোধ বা প্রতিকূলতা, সেখানেই ব্যাধি, সেখানেই বিপদ্, সেখানেই বিনাশ। কেহ ট্রামগাড়ি হইতে পা ফস্কাইয়া পড়িয়া আহত হইল, কেহ নৌকাডুবি হইয়া জলমগ্ন হইল, কেহ বা আপনার বন্দুকের গুলিতে আপনি হত হইল, এ সকলই বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির অসামঞ্জস্যের ফল। যেমন করিয়া ট্রামগাড়িতে উঠিতে হয়, তাহা উঠ নাই ; সন্তরণ অভ্যাস কর নাই ; যে সাবধানতার সহিত বন্দুক ধরিতে হয়, তাহা শিক্ষা কর নাই ; তুমি তাহার ফলভোগ করিবে। এইখানেই বাহ্যপ্রকৃতির সহিত অনুকূল সম্বন্ধের অভাব হইল।

স্পেন্সারকর্ত্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞাটি ঠিক সংজ্ঞানামের উপযুক্ত না হইলেও, তিনি প্রকৃত তত্ত্ববিদের ন্যায় জীবনের সমগ্র স্বরূপ প্রণিধান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বাহ্যপ্রকৃতির সহিত আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির সামঞ্জস্যস্থাপনের যে চেষ্টা, তাহাকেই আমরা কর্ম্ম বলিয়াছি। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিতে হইবে। আত্মশক্তির সহিত অপরা শক্তির (Non-Ego) সংগ্রামে যে কোন উপায়ে হউক, অপরা শক্তিকে অনুকূল করিয়া লইতে হইবে। ইহাই জীবন এবং কর্ম্ম। জীবন এবং কর্ম্ম উভয়েরই সংজ্ঞানির্দ্দেশ করা আয়াসসাধ্য। বাঁচিয়া থাকিলে যেমন জীবন কি তাহা বুঝা যায়, তেমনই কর্ম্ম করিতেই কর্ম্ম কি তাহা বুঝা যায়। সংজ্ঞার দ্বারা এ উভয়ের বোধসাধন হওয়া কঠিন। আমরা স্পেন্সার মহোদয়ের পদবী অনুসরণ করিয়া বলিয়াছি যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার সমবায়সাধনের নামই কর্ম্ম।

উপলব্ধি হইয়া থাকিবে যে, কর্ম্মশব্দ সাধারণত যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে তদপেক্ষা প্রশস্তভাবে ব্যবহার করিয়াছি। আশা করি, এ স্বাধীনতা মার্জ্জনীয় হইবে। কর্ত্তার দিক্ ছাড়িয়া থাকিলে, বাহ্যজগতের যে-কোন পরিবর্ত্তনের নামই কর্ম্ম। আমরা বাহ্যজগতে যে কোন পরিবর্ত্তন সাধিত করি, তাহা আমাদের কর্ম্ম। আমাদের নিশ্বাসে বায়ুমণ্ডলে যে সামান্য কম্পন হয়, তাহাও আমাদের কর্ম্ম। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মূলে

শক্তির বিকাশ। সমস্ত বিশ্বসংসার কর্ম্ম-স্রোতে প্লাবিত, সুতরাং সমস্ত বিরাট্ বিশ্ব শক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত। সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপিনী প্রাণস্বরূপা মহাশক্তি জগতের আদিকারণ বলিয়া আদ্যা শক্তি নামে পূজিতা হইয়া থাকেন। সে বিশ্বশক্তি এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহেন। সেই অনন্তশক্তি-মহাসমুদ্রের একটি বিন্দু—মানবশক্তি—বর্ত্তমান প্রবন্ধে আলোচ্য। মানবশক্তি মহাশক্তি-সমুদ্রের তুলনায় জলবিন্দুসদৃশ। কিন্তু তাই বলিয়া মানবশক্তি তুচ্ছ নহে। ইহা জল-বিন্দুর ন্যায় ক্ষুদ্র, আবার সূর্য্যকিরণসম্পর্কে ইন্দ্রধনুর বর্ণবৈচিত্র্যময়ী। চৈতন্যরূপ-আলোকসংস্পর্শে মানবের কর্ম্মে যেমন বিচিত্রতা, আমার বোধ হয় এত বিচিত্রতা আর কোথাও নাই। কর্ম্মে চৈতন্যের যে আলোকপাত হয়, তাহাকে ইচ্ছা বলা যাইতে পারে। মনুষ্যের সকল কর্ম্মে চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায় না। সুতরাং কর্ম্মকে প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। ইষ্ট কর্ম্ম এবং নেষ্ট কর্ম্ম (voluntary and non-voluntary actions)।* যে সকল কর্ম্ম ইচ্ছাপ্রণোদিত, তাহাদিগকে ইষ্টকর্ম্ম এবং যে সকল কর্ম্ম ইচ্ছাপ্রণোদিত নহে, তাহাদিগকে নেষ্ট কর্ম্ম বলা যায়। শেষোক্তের উদাহরণস্বরূপে—অক্ষিপত্রের উন্মেষ এবং নিমেষ, হৃদয়ের স্পন্দন, এবং শিশুর অর্থশূন্য অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঘড়িতে চাবি দিতে হইবে মনে পড়িল। অমনি পকেট হইতে বাক্সের চাবি বাহির করিয়া বাক্স খুলিলাম, তাহার পর ঘড়িটি বাহির করিয়া তাহাতে চাবি দিয়া পুনরায় যথাস্থানে রক্ষা করিলাম। এতগুলি কার্য্য একমাত্র মননের দ্বারা—ঘড়িতে চাবি দিব, কেবলমাত্র এই ইচ্ছার দ্বারা—সম্পাদিত হইল। এইপ্রকার জটিল, পরম্পরাযুক্ত এবং চেতনাপ্রসূত কর্ম্মই ইষ্ট কর্ম্ম। নেষ্ট কর্ম্ম অতি সরল, তাহাতে জটিলতা এবং চৈতন্যের লেশমাত্র নাই। শিশুর হস্তপদসঞ্চালন দেখিলেই তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। একই ভাবে কলের মত যেন শারীরিক ক্রিয়াগুলি নিষ্পন্ন হইতেছে। ইষ্টকর্ম্মে ফলের স্পৃহা বর্ত্তমান। এই ফলের স্পৃহাকে আমরা মনন বলিব। মানুষ ফলের স্পৃহা হইতেই কর্ম্ম করিবার জন্য ধাবিত হয়। জ্ঞান বা চৈতন্য না থাকিলে ফলের আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা অভীপ্সিত ফলের অভিজ্ঞতা জন্মে। এবং ফলের আকাঙ্ক্ষা মনোমধ্যে উদিত হইলে, সে ফলের প্রাপ্তিবিষয়ে উপায়ভূত (means) যে সকল শারীরিক ক্রিয়া আবশ্যক, সে সকলের আকাঙ্ক্ষাও উদিত হয়। সুতরাং এক একটি আকাঙ্ক্ষা বহু আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করিয়া দেয়। ফললিপ্সা ঈপ্সিত কর্ম্মের জননী। নেষ্টকর্ম্মে ফললিপ্সার অভাব। কিন্তু এই পার্থক্যসত্ত্বেও উভয়বিধ কর্ম্মের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ। নেষ্টকর্ম্ম—অর্থশূন্য অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতি—ব্যতীত ইষ্টকর্ম্মের উৎপত্তি সম্ভব নহে। ইচ্ছা মনের শক্তি। ইচ্ছাশক্তির দ্বারা প্রথমত শরীরযন্ত্রকে এবং পরোক্ষভাবে

* ইষ্ট এবং অনিষ্ট বলিলেই অধিকতর ভাষানুযায়ী হইত, কিন্তু ইষ্ট এবং অনিষ্ট সচরাচর অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয় বলিয়া ইষ্ট এবং নেষ্ট পদ ব্যবহার করিয়াছি

বাহ্যজগৎকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারা যায়। কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তির বিকাশ সময়সাপেক্ষ। জীবনের প্রথম কতিপয় সপ্তাহে কেবল উদ্দেশ্যহীন অঙ্গসঞ্চালন প্রত্যক্ষ হয়। সে চঞ্চলতা জীবনী শক্তির কার্য্যমাত্র। তাহাতে ইচ্ছার লেশ নাই। ক্রমে সেই অর্থশূন্য অঙ্গভঙ্গির সহিত বালকের সুখদুঃখ সংস্পৃষ্ট হয়। হাতখানি নাড়িতে নাড়িতে হঠাৎ তাহার বুকের উপর ঠেকিল, বালকের তাহাতে আরামবোধ হইল। এইরূপ অনেকবার করিয়া বালকের মনে এ দুয়ের মধ্যে অতি নিকট সম্বন্ধ স্থাপিত হইল। বালক সেই আরাম আবার পাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার হস্ত যেমন নড়িতেছিল, তেমনি নড়িতেছে, কিন্তু এবার সে একটু অবহিত। হস্তখানি কেমন করিয়া ইতস্তত সঞ্চালিত হইতেছে, সে তাহা একটু মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল—তাহার মনে সেই আরামের স্মৃতি। সুখদুঃখ কে না বুঝে? সুখদুঃখবোধ সহজাতসংস্কারাধীন। সুতরাং সুখকে পাইবার জন্য এবং দুঃখ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার জন্য জন্মাবধি মানুষের এক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই সহজাত সংস্কার, সুখের উপলব্ধি ও স্মৃতি ও তাহার অভাববোধ যখন মনোমধ্যে একত্র হইল, তখনই ইচ্ছার উন্মেষ। সময়ে তাহার পূর্ণবিকাশ হয়। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, নিরর্থক, উদ্দেশ্যবিহীন, জীবনশক্তিজনিত সহজাত নেষ্ট কর্ম্ম হইতেই ইচ্ছার উৎপত্তি। যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গসঞ্চালন ইচ্ছার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয়, তাহা ইচ্ছার সৃষ্টি নহে, পরন্তু তাহা ইচ্ছার অগ্রজাত ও উপাদানভূত।

আমরা কর্ম্মকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছি; ঈপ্সিত ও অনীপ্সিত। কিন্তু এ দুয়ের মাঝামাঝি আর একপ্রকার কর্ম্ম আছে, তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। মধুমক্ষিকা মধুচক্রনির্ম্মাণে অদ্ভুত শিল্পকৌশলের পরিচয় দেয়, কোন কোন পক্ষিশাবক ডিম্ব হইতে বহির্গত হইবামাত্র খাদ্যান্বেষণ ও সন্তরণ করিয়া থাকে, এবং পক্ষিগণের কুলায়নির্ম্মাণচাতুর্য্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই স্তন্যপান করিতে আরম্ভ করে, শিশু ইহার জন্য শিক্ষার অপেক্ষা করে না। সহজদৃষ্টিতে স্তন্যপান অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু ইহাই বৈজ্ঞানিক বিস্ময়ের সহিত এবং দার্শনিক ভক্তির সহিত নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন। তত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল কর্ম্মকে প্রাক্তনসংস্কার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অর্থাৎ কুলায়নির্ম্মাণকৌশল এবং পক্ষিশাবকগণের আহার্য্যগ্রহণ পক্ষিগণের বহুযুগ এবং বহুজন্ম ব্যাপী কর্ম্মপরম্পরার ফল। মানব সহস্র চেষ্টায়ও পক্ষীর ন্যায় সুন্দর কুলায় নির্ম্মাণ করিতে পারে না। মানব এইখানে পক্ষীর নিকট পরাজিত। কিন্তু এইজাতীয় ক্রিয়াকে যদি ইষ্টকর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে তাহা হইলে তদুপযোগী জ্ঞানও এই [illegible] প্রাণীর আছে, স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহাদের অন্যান্য কার্য্যকলাপ হইতে, সেরূপ কেন, তাহার শতাংশের একাংশ বুদ্ধিরও অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না। পরন্তু সংস্কারজ কর্ম্ম এবং ইষ্টকর্ম্মের মধ্যে আর একটি বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। সংস্কারজ কর্ম্ম ইষ্টক[illegible] ন্যায় চৈতন্যসমন্বিত, জটিলতাপূর্ণ, বহুক্ষণব্যাপী এবং উদ্দেশ্যপূর্ব্ব বলিয়া প্রতীয়মান

হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইষ্টকর্ম্মের বিশেষত্ব উদ্দেশ্যপূর্ব্বতা। সংস্কারজ কর্ম্মে যদি সেই উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা দেখিতে পাওয়া যায়, তবে সেই সকল কর্ম্ম ইচ্ছাপ্রণোদিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই স্থানে এক সমস্যা উপস্থিত হয়। ইতর প্রাণিগণ যে ভাবে জীবনের লক্ষ্য অনুসরণ করে, তাহা একই ভাবে সম্পাদিত এবং অব্যর্থ। তাহাদের প্রতি কার্য্যে আত্মরক্ষা ও জাতিরক্ষার প্রবৃত্তি বর্ত্তমান। আত্মরক্ষা অবশ্য জীবমাত্রেই বুঝে, কিন্তু এই আত্মরক্ষার জন্য তাহারা যেপ্রকার উপায় অবলম্বন করে—বিপদ্ আগত দেখিলে তাহারা যেমন শীঘ্র তাহা বুঝিতে পারে এবং যেমন চতুরতা ও সত্বরতার সহিত তাহার প্রতীকার করিতে সচেষ্ট হয়, তাহা বহুশিক্ষার ফল বলিয়া বোধ হয়। এক জন্মে কেন, বহুজন্মেও সে শিক্ষা, সে সত্বরতা লাভ হয় কি না, সন্দেহ। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক যে সকল কর্ম্ম করি, তাহাতে যে বিতর্ক, যে সতর্কতা এবং যেরূপ আয়াস, প্রাণিগণ আত্মরক্ষাবিষয়ে যদি সেরূপ বিচার করিয়া প্রবৃত্ত হইত, তবে আত্মরক্ষা যে নিতান্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আত্মরক্ষাপ্রণোদিত এই সকল কর্ম্মে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সে উদ্দেশ্য জ্ঞানস্বরূপ না হইয়া একলক্ষ্য অন্ধপ্রবৃত্তির মত জীবগণকে পরিচালিত করে। আমাকে মারিবার জন্য একজন যষ্টি উত্তোলন করিয়াছে, দেখিবামাত্র নিমেষমধ্যে আমার হস্ত উত্তোলিত হইল—সেই আঘাত ঠেকাইবার জন্য। পতনোন্মুখ যষ্টির দর্শন এবং আমার হস্ত উত্তোলনের মধ্যে মুহূর্ত্তমাত্র পর্য্যবসিত হইল কি না, সন্দেহ। অবলম্বনীয় কর্ম্মের সকল দিক্ বিচার করা ইচ্ছার ধর্ম্ম। কিন্তু এখানে সকল দিক্ বিচার করিয়া যদি আমার হস্ত উত্তোলন করিতে হইত, তাহা হইলে তাহার বহুপূর্ব্বে আমার বিচারপূর্ণ মস্তক চূর্ণ হইয়া যাইত। যেন কোন অদৃশ্য দেবতা প্রাণিগণের অন্তরে বিরাজ করিয়া তাহাদিগকে আত্মরক্ষার দিকে অজ্ঞাতসারে পরিচালিত করিতেছেন। এইজন্য ডাঃ মার্টিনো বলেন যে, অসহায় অজ্ঞান প্রাণীদিগের সহায় ভগবান্। আত্মরক্ষাকার্য্যে মানুষও কিয়ৎপরিমাণে অসহায় এবং অজ্ঞান। পক্ষান্তরে মানুষ ভাবিয়া কাজ করে, মানুষের স্বাধীনতা আছে। সুতরাং মানুষের পদে পদে সংশয় এবং পদে পদে তাহাকে আপনার জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতে হয়। ইতর প্রাণিগণ জ্ঞান এবং স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত। কাজেই তাহাদের ভাবনা ভগবান্ ভাবিয়া দেন।

সংস্কারজ কর্ম্ম ইষ্টকর্ম্মের ভিত্তিস্বরূপ। পূর্ব্বে বলিয়াছি, নেষ্ট কর্ম্ম ইচ্ছার উপাদানভূত এবং ইষ্টকর্ম্মের সহিত সংস্কারজ কর্ম্মের বহু সাদৃশ্য থাকিলেও, শেষোক্ত কর্ম্ম নেষ্টকর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এক শ্রেণীর ক্রিয়া আছে, যাহা অনেক বিষয়ে সংস্কারজ কর্ম্মের অনুরূপ। সেগুলির নাম অভ্যাস। পুনঃপুন এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে করিতে শরীরযন্ত্র ক্রমান্বয়ে সেই ক্রিয়ার দিকে এত প্রবণতা লাভ করে যে, সেই ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত আর আমাদের মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। এই প্রবণতার নাম অভ্যাস। অভ্যাস

ইচ্ছার পরিণতিমাত্র। পুনঃপুন আবৃত্তি-বশত সমস্ত কর্ম্ম অভ্যস্ত হইয়া যায়। মনোযোগ আর সে সকল কর্ম্মে আবশ্যক হয় না। সেইজন্য নূতন নূতন কর্ম্ম করিবার এবং নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা করিবার সুবিধা হয়। স্পেন্সার এই অভ্যাসজনিত কর্ম্মকে সংস্কারজ কর্ম্মের দলে ফেলিয়াছেন, অবশ্য ইহাদের সৌসাদৃশ্য অস্বীকার করিতে পারা যায় না। কিন্তু আমার বোধ হয় অভ্যস্ত ক্রিয়াকে ইষ্ট-কর্ম্মের মধ্যে গণ্য করা উচিত। কারণ কোন কর্ম্ম নিতান্ত অভ্যস্ত হইলেও কর্ত্তার ইচ্ছা তাহা হইতে একেবারে তিরোহিত হয় না। আমি যখন প্রথম ক, খ, লিখিতে শিখি, তখন প্রতি অক্ষরের প্রত্যেক ভঙ্গীটি আমাকে মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে হইত। এখন লিখনব্যাপার আমার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাতে আমার মনোযোগের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু এখনও একটি অক্ষর লিখিতে যদি অন্য একটি অক্ষর লিখিয়া বসি, অথবা একটি অক্ষরের মাত্রা যদি অন্যরূপ হইয়া যায়, তবে তখনই আমার মনোযোগ তাহাতে আকৃষ্ট হইবে। তাহা হইলে কেমন করিয়া বলিব যে, অভ্যস্ত কার্য্যে একেবারেই ইচ্ছার সাহচর্য্য নাই।

মানবের মনোরাজ্যে ইচ্ছা কতটা স্থান ব্যাপিয়া আছে, তাহা বিচার করিতে গেলে আর একটি বিষয়ের বিবেচনা করা আবশ্যক। আমরা এতক্ষণ কর্ম্মরাজ্যে ইচ্ছার প্রভাবের কথা বলিয়া আসিয়াছি। অর্থাৎ ইচ্ছার দ্বারা শরীরযন্ত্র কিরূপে নিয়ন্ত্রিত হয়, অন্যথা লক্ষ্যহীন জড়পিণ্ডের মত শরীর ইচ্ছার স্পর্শে কেমন সজীব হইয়া উঠে, তাহাই আমরা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। জ্ঞানের রাজ্যে ইচ্ছার প্রভাবসম্বন্ধে দুএকটি কথা বলিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ।" দ্রব্যাদির গুণসকল—রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ—যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া মস্তিষ্কে নানাপ্রকার ক্রিয়ার উৎপাদন করে, তখন মনে তত্তৎ দ্রব্যের জ্ঞান উদ্ভূত হয়। কিন্তু দ্রব্য ইন্দ্রিয়সমীপবর্ত্তী হইলেই যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহা নহে। যেমন; আমরা কোন গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মুক্ত আকাশের দিকে যখন চাহিয়া থাকি, তখন তাহার নীলিমা বা অভ্রসমূহ আমরা দেখিয়াও দেখি না। মন তখন বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এ সকল দেখিবে কে? চক্ষু দর্শনের উপায়ভূত, দর্শনের কর্ত্তা মন। তোমার চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, সকলই উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু মনোযোগের অভাবে তুমি কিছুই দেখিতে, শুনিতে বা ঘ্রাণ করিতে পাইবে না। অতএব দেখা যাইতেছে, মনোযোগ ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। মনোযোগ ইচ্ছার অধীন, ইচ্ছার শাসনে পরিচালিত। ইচ্ছা ব্যতি-রেকে মনোযোগ এবং মনোযোগ ব্যতিরেকে জ্ঞান হইতে পারে না। তোমার দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া একটি পাখী উড়িয়া গেল, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারা সে অনুভূতি মস্তিষ্কে সঞ্চারিত হইল। কৌতূহল উদ্দীপ্ত হইল। তখনই তুমি চক্ষুর দ্বারা সেই পক্ষীর গতি লক্ষ্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে। অতএব দেখা গেল, আমাদের দর্শনে ও শ্রবণে, কল্পনে ও মননে, সুখে ও দুঃখে, চিন্তায় ও কার্য্যে, সর্ব্বত্র এই সর্ব্বব্যাপিনী ইচ্ছার প্রভাব বর্ত্তমান।

এই প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে মনোবিজ্ঞানে ইচ্ছার স্থান নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। চরিত্রনীতি এবং তত্ত্ববিস্থার হিসাবে ইচ্ছার মূল্য কত, তাহা বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র।

চীন-কাহিনী।

লামা টেম্পল্ ও পঞ্চামুনি।

২০শে জানুয়ারি। অদ্য শীত কিছু কম। তিনমাসকাল অসহ্য শীত ভোগ করিয়া আজ শীতলাঘবে বিদেশীয় সৈন্যদল কিছু সুস্থ বোধ করিয়াছে। শীতভয়ে নীরবকাকলি বিহঙ্গম বহুদিন পরে আজ আবার সুমধুর সঙ্গীতলহরীতে প্রভাতাকাশ বিকম্পিত করিয়া তুলিয়াছে।

পিকিন আবার লোকে ভরিয়া উঠিয়াছে। যে সকল দোকানদার রণারম্ভে সহর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা আবার আসিয়া দোকান সাজাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বিদেশীয় সৈন্যদলের পদভরে ধরণী কম্পিত হইতেছে। পিকিনে আসিয়া শুনিয়াছিলাম যে, সেখানকার জাপানী বাজারের অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে লামা টেম্পল্। এই লামা টেম্পলে হিন্দুর দশমহাবিদ্যামূর্ত্তি বিরাজিত এবং পঞ্চামুনির প্রকাণ্ড বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

সুতরাং বিদেশে হিন্দুর পরমারাধ্যা দেবীমূর্ত্তি দর্শনে যে হিন্দুসন্তানের স্বভাবত প্রবল কৌতূহল জন্মিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু এতদিন সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। আজ সুযোগ বুঝিয়া আমি দুইজন পঞ্জাবী হস্‌পিট্যাল্ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ও একজন ভবানীপুরনিবাসী বাঙালীবাবুর সমভিব্যাহারে লামা টেম্পল্ অভিমুখে বাহির হইয়া পড়িলাম।

যখন আমরা মন্দিরদ্বারে উপস্থিত হইলাম, তখন বেলা প্রায় ১০॥০টা। সাতটি মন্দির সমভাবে সারিবন্দি সন্নিবেশিত—শেষেরটি সর্ব্বোচ্চ। বড় বড় বাড়ী মন্দির-সাতটিকে ঘেরিয়া তাহাদের প্রাচীরের কার্য্য করিতেছিল। মন্দিরগুলি কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং আকারে কতকটা আমাদের রথ ও মুসলমানদের গোঁয়ারার তাজিয়ার মত। মন্দিরের বাহিরে মিশ্রিত সংস্কৃতভাষায় কি লিখিত। শুনিলাম, উহা বেদভাষা। মন্দিরের অভ্যন্তরে বহু প্রাচীন তৈলচিত্র। মন্দিরদ্বারে একজন চীনবাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইনি একজন পাণ্ডা। পাণ্ডা আমাদের সম্ভাষণ করিয়া মন্দিরে লইয়া গেলেন। এইটি প্রথম মন্দির। মন্দিরের অভ্যন্তরে চারিজন লামা বসিয়াছিলেন, আমাদের দেখিয়া বিশেষ অভ্যর্থনা করিলেন। লামাগণ তিব্বতবাসী। ইঁহাদের আচারব্যবহার হিন্দুর মত। মস্তক

মুণ্ডিত এবং শরীর গৈরিক আলখাল্লায় আবৃত। শীতাধিক্যবশত আলখাল্লার নীচে একটি করিয়া বনাতের পায়জামা। কণ্ঠদেশে কাষ্ঠমালা বিলম্বিত—কাহারও হস্তে পিত্তলের বলয় এবং কাহারও বা মস্তকে রেশমী বস্ত্রের উষ্ণীষ পরিশোভিত।

লামাগণ সংস্কৃতভাষার সহিত মিশ্রিত একপ্রকার ভাষার সাহায্যে আমাদিগকে মন্দিরসম্বন্ধে কিছু কিছু বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। বহুকষ্টে আমরা বুঝিলাম যে, আমরা যে মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছি, হিন্দুস্থানের "তারা"দেবী তাহার অধিষ্ঠাত্রী। পর পর মন্দিরগুলিতে "কমলা", "বগলা", "ভুবনেশ্বরী", "ছিন্নমস্তা", "ষোড়শী" ইত্যাদি হিন্দুস্থানের দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা।

প্রথমেই তারামূর্ত্তি। চীনশিল্পী ইঁহার অমর্য্যাদা করে নাই। ইঁহার সমস্ত বস্ত্রাভরণ সুদক্ষ শিল্পী অসাধারণ নৈপুণ্যে কাষ্ঠ হইতে খুঁদিয়া খুঁদিয়া বাহির করিয়াছে। দেবীর হস্তস্থিত পদ্মফুল সদ্যঃপ্রস্ফুটিত প্রকৃত পদ্ম বলিয়া প্রথমে আমাদের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল—পরে দেখিলাম, ইহাও শিল্পীর অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

বহুদিন পরে সুদূর বিদেশে স্বদেশীয় দেবীমূর্ত্তি সন্দর্শনে যে মাতৃভূমিচ্যুত সন্তানের চক্ষে তাহার জন্মভূমির বিশাল মহিমা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতভূমি বৌদ্ধদিগকে ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার সময়েও বুঝি জননীর প্রসাদ কিছু তাহাদের সঙ্গে দিয়াছিলেন।

প্রথম মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমরা দ্বিতীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এই মন্দিরে "বগলা"মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবী কিছু রূপান্তরিতা। দেবী একাকিনী রুদ্রমূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান। আকৃষ্যমানজিহ্ব গদাপ্রহারভীত অসুর দেবীর সঙ্গে আসিতে সাহস করে নাই। ইঁহারও অলঙ্কারাদি সমস্তই খোদিত। মূর্ত্তির সম্মুখে ধূপধুনার ধূম সমুত্থিত—মন্দিরটি তাহার গন্ধে আমোদিত। মন্দিরবাসী লামা ধ্যানমগ্ন। লামাকে ধ্যানমগ্ন দেখিয়া আমরা তৃতীয় মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী "কমলা"দেবী। শান্তিময়ী কমলাসনা কমলার মূর্ত্তি যেন কিছু উদ্ধতা বলিয়া বোধ হইল। চতুর্ভুজা দেবীকে প্রণাম করিয়া আমরা চতুর্থ মন্দিরে গেলাম।

মন্দিরের দ্বারদেশে কতকটা সংস্কৃতের মত অক্ষরে দেবীর নাম লিখিত। তিনটি অক্ষর "ভুব……রী" পড়া গেল। অনুমানে বুঝিলাম, দেবীর নাম ভুবনেশ্বরী। একজন সংস্কৃতজ্ঞ চীনবাসীও আমাদের কথা সমর্থন করিলেন। ভুবনমোহিনী ভুবনেশ্বরীমূর্ত্তিও চীনকারিকরের হস্তে কিছু রুক্ষতাপ্রাপ্ত। মূর্ত্তির সম্মুখে ৩জন লামা উপবিষ্ট ও একজন পূজার আয়োজনে নিয়োজিত। মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবীকে ৫ সেণ্ট (৪ পয়সা) প্রণামী দিয়া প্রণাম করিলাম। তদ্দর্শনে প্রধান লামা দেবীর শিরঃস্থিত মুকুট স্পর্শ করিয়া আমার মস্তক স্পর্শ করিলেন।

আমরা পঞ্চম মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। এখানেও দ্বারের উপরে তিনটি অক্ষরে দেবীর নাম লিখিত। অক্ষরগুলি পড়িতে পারিলাম না। জনৈক পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ইনি হিন্দুস্থানের "ষোড়শী"দেবী।

মন্দিরের মধ্যস্থলে দেবীমূর্ত্তি। মূর্ত্তির মস্তকস্থিত অত্যুজ্জ্বল গিল্টি-করা মুকুট হইতে সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর আভা উদ্ভাসিত হইয়া মন্দিরটিকে মনোরম করিয়া তুলিয়াছে।

মন্দিরের সর্ব্বত্র পুরাতন চিত্রপট। দেবীর অলঙ্কারগুলি ধাতুনির্ম্মিত—কণ্ঠে কাষ্ঠগুচ্ছের মালা, কপালে সিন্দূরতিলক। মন্দিরাভ্যন্তরে দুইজন লামা উপবিষ্ট। পূজার আয়োজন সমস্তই প্রস্তুত—ধূপধুনার গন্ধে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত। দেবীকে প্রণাম করিয়া আমরা সে মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ষষ্ঠ মন্দিরে প্রবেশ করিলাম।

ইহার সম্মুখে তিনজন লামা ঘণ্টা, কাঁসর ও শঙ্খ বাজাইতেছেন—পূজা আরম্ভ হইয়াছে। সম্মুখেই দেবীমূর্ত্তি। মুক্তকেশী ছিন্নকণ্ঠা রক্তধারাভিষিক্তা ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়া ইঁহাকে ছিন্নমস্তা বলিয়া চিনিয়া লইতে কোনই কষ্ট হইল না।

এখানকার ছিন্নমস্তামূর্ত্তিও ভারতের ছিন্নমস্তামূর্ত্তি হইতে কিছু পৃথক্। ভারতবর্ষের মত দেবীর মস্তক স্কন্ধবিচ্যুত ও হস্তস্থিত নহে। অর্দ্ধবিচ্ছিন্ন কণ্ঠদেশ হইতে রুধিরধারা নির্গত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তনে চীনকারিকরের রুচির নিন্দা করিতে পারিলাম না। এই মূর্ত্তি কতকটা স্বাভাবিক বলিয়া ইহার ভীষণতা আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দেবীর সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল রজতবর্ণে চিত্রিত। পদতলে চীনে ফুল ও আমাদের বিল্বপত্র অপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি একপ্রকার বিল্বপত্রের রাশি স্তূপীকৃত। সম্মুখে দুইটি ছিন্নকণ্ঠ মেষশিশু নিপতিত।

পূজা শেষ হইল। প্রধান লামা প্রসাদ বণ্টন করিলেন। পূর্ব্বে আমার প্রসাদসম্বন্ধে যেরূপ বিভীষিকা জন্মিয়াছিল, এখানকার প্রসাদ দেখিয়া সে ভাব আর রহিল না।

এখানকার প্রসাদ আমাদের দেশেরই মত—পুষ্পসংযুক্ত চিনির ডেলা—তেলাপোকা বা শূকরের তরকারি নহে। ভক্তিভরে প্রসাদ ভোজন করিলাম। কিন্তু প্রসাদপূত হস্ত মস্তকে মুছিলাম না বলিয়া লামারা কিছু বিরক্ত হইলেন, মনে হইল। এমন-সময় গভীর নিক্বণে চড়চড়া বাজিয়া উঠিল। সানাই আনন্দের সুর ধরিল—মুহুর্মুহু শঙ্খ ধ্বনিত হইতে লাগিল অবিশ্রান্ত ঘণ্টারব শুনা যাইতে লাগিল। আমরা চম্‌কিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, একএকজন লামা ত্বরিতপদে সপ্তম মন্দিরের দিকে ধাবিত হইতেছেন, আমরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া সপ্তম মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। ষষ্ঠ মন্দিরের পশ্চাতেই সপ্তম মন্দির। মন্দিরের সম্মুখেই বাদ্যধ্বনি হইতেছে। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত হইলাম। এমন প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আমি আর কখনও দেখি নাই। শুনিলাম, ইহা পদ্মামুনিনামক বিখ্যাত মুনিবরের মূর্ত্তি। মূর্ত্তিটি লম্বায় প্রায় ৫০হাত এবং বিস্তারে প্রায় ৭হাত। শুনিলাম, এই মুনিমূর্ত্তি একটি অখণ্ড শালবৃক্ষ খোদাই করিয়া গঠিত। *

অত্যন্ত দূরতাবশত নীচে দাঁড়াইয়া মূর্ত্তির নাক, মুখ, চোখ, কাণ, কিছুই ভাল দেখা যায় না।

বৃক্ষটির দৈর্ঘ্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়া অনুরূপ হস্তপদাদির সংযোজনে চীনশিল্পী যথেষ্ট

ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছে। মূর্ত্তি চতুর্ভুজ। প্রত্যেক হস্ত হইতেই ২৫।৩০হাত করিয়া কাষ্ঠগুচ্ছের মালা লম্বমান। গলদেশেও মুণ্ডমালার ন্যায় গুচ্ছগুচ্ছ কাষ্ঠনির্ম্মিত মাল্যদাম।

সুন্দর কাষ্ঠনির্ম্মিত রং-করা একটি বেদীর উপর মুনি দাঁড়াইয়া আছেন—মস্তক প্রায় গগন স্পর্শ করিতেছে। যেন মহাপুরুষ মস্তক উন্নত করিয়া বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন। মুনির অঙ্গে একটি গেরুয়া বর্ণের আলখাল্লা। আমি প্রথমে উহা বস্ত্র-নির্ম্মিত ভাবিয়াছিলাম, পরে দেখিলাম, উহাও কাষ্ঠনির্ম্মিত—এবং উহার উপরিভাগ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত মনোরম পুষ্পসমূহে শোভিত। মুনির চরণতলে একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত পদ্মফুল রহিয়াছে, ফুলটি সদাসর্ব্বদা মুনিবরের চরণামৃতে অভিষিক্ত। অগণিত ভক্তবৃন্দ আসিয়া আনন্দের সহিত প্রভুর চরণামৃত লইতেছে—কেহ লইয়া চলিয়া যাইতেছে, কেহ বা তথায় পান করিতেছে।

একজন লামা কৃপাপরবশ হইয়া আমাকেও একটু চরণামৃত দান করিলেন—আমিও উহা ভক্তিভরে পান করিলাম। মনে হইল, এই চরণোদক তণ্ডুলচূর্ণ ও চিনি মিশ্রিত। চরণামৃত পান করার পর লামা দর্শনী চাহিলেন, আমি তাঁহাকে ৫ সেণ্ট দিতে গেলাম। তিনি প্রধান লামাকে দেখাইয়া দিলেন। এক এক মন্দিরে একএকজন ভারপ্রাপ্ত লামা থাকেন। সেই সেই মন্দিরের প্রণামীতে কেবল তাঁহারই অধিকার।

পঞ্চামুনির এই অপরূপ মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার অলৌকিক বিবরণ শুনিতে আমাদের সকলেরই কৌতূহল জন্মিয়াছিল। একজন সংস্কৃত ও ইংরাজী জানা লামা অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিলেন। তিনি বলিলেন—"পুরাকালে এক চীনদেশীয় নরপতি পিকিনের দক্ষিণে বহুদূরব্যাপী এক অরণ্যের মধ্যে মৃগয়া করিতে গিয়াছিলেন। সমস্ত দিবসের পর অপরাহ্ণে এক মৃগের অনুসরণ করিয়া মহারাজ ঐ অরণ্যের পথহীন নিবিড়তার মধ্যে উপস্থিত হন। ক্রমে চতুর্দ্দিক্ অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আসিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে নরপতি অবসন্ন হইয়াছিলেন। তিনি নিরুপায় হইয়া এক বিশাল-শালবৃক্ষ-তলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অচিরে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন।

"নিদ্রাঘোরে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, যেন এক দীর্ঘশ্মশ্রু জটাজূটধারী ভীমকায় তাপস আসিয়া বলিতেছেন, 'রাজন্, তুমি যে বৃক্ষের তলদেশে আশ্রয় লইয়াছ, সেই বৃক্ষই আমি। আমার নাম "পঞ্চামুনি।" মহীরুহ-রূপে বহুদিন তপস্যা করিয়া আমি নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি। অন্য-দেহ-পরিগ্রহেরও কাল উপস্থিত হয় নাই। সুতরাং, তুমি আমায় জনসমাজে লইয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত কর। আমি আপনা হইতেই আমার শাখাপ্রশাখারূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ত্যাগ করিতেছি! ত্যাগান্তে যে দেহ থাকিবে, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তাহার কিছুমাত্র হ্রাস না করিয়া আমায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।'

"মহারাজ স্বপ্নযোগে এই আদেশ পাইয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, সত্যসত্যই বৃক্ষের মোটা মোটা সরস শাখা-গুলি বৃক্ষচ্যুত হইয়া ভূতলে পতিত রহিয়াছে।

দেখিয়া রাজা স্বপ্নের সত্যতাসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন।

"পরদিন প্রভাতে তিনি রাজধানীতে যাইয়া লোকজন ও সৈন্যসামন্ত লইয়া আসিয়া বৃক্ষটিকে সমূলে তুলিয়া লইয়া গেলেন এবং মুনিবরের অনুজ্ঞামত যথাযথ তাঁহার দৈর্ঘ্য-বিস্তার রক্ষা করিয়া তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই শালবৃক্ষই বর্ত্তমান পঞ্চামুনি।"

লামার মুখে পঞ্চামুনির এই ইতিহাস শ্রবণ করিয়া আমরা বিস্মিত হইলাম। শেষে বেলা প্রায় ৪টার সময় চীনে হিন্দুদেবতা ও মহাকায় পঞ্চামুনি সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করিতে করিতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীঃ—

গ্রন্থ-সমালোচনা।

সোনার কমল।—উপন্যাস। শ্রীদামোদর মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২৲ দুই টাকা

দামোদরবাবু উপন্যাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন, এবং আমাদের ধারণা এই। যে, তিনি যশোলাভের যথার্থ অধিকারী। বর্ত্তমান ঘটনা-প্রধান উপন্যাস-লেখকদিগের মধ্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। তাঁহার ভাষা সরল, প্রাঞ্জল, চিত্তাকর্ষক, অথচ গ্রাম্যতা-দোষের সংস্পর্শশূন্য। তাঁহার ভাব মার্জ্জিত, সংস্কৃত, গাম্ভীর্য্যসম্পন্ন, অথচ কোথাও একটা ভাণ নাই। বর্ত্তমান উপন্যাসখানি পড়িয়া প্রীত হইলাম। ইহা ডিটেক্‌টিভের গল্পের ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক। বলিতে কি, ইহাও একখানি ডিটেক্‌টিভেরই গল্প। তবে ডিটেক্‌টিভের গল্পে কেবল ঘটনারই বৈচিত্র্য থাকে; ইহাতে ঘটনাবৈচিত্র্যও আছে, অথচ ভাবসন্নিবেশও আছে।

বড় দুঃখের বিষয় এই যে, একটু নিন্দা করিতেও হইতেছে! বাড়ীর বধূরা ঠাকুরঝিকে যে সম্পর্কবিরুদ্ধ ও কদর্য্য তামাসা করিয়া থাকেন, তাহা আমরাও অবগত আছি। কিন্তু গ্রন্থকারের হাতে পড়িয়াও যদি ঠাকুরঝিরা সংস্কৃত এবং মার্জ্জিত হইতে না পারেন, সে অপরাধ ঠাকুরঝিদের নহে, গ্রন্থকারের নিজের। গড্ডলিকাপ্রবাহের জন্য ত গড্ডলিকাই আছে, মানুষ কেন? বড়বধূর কুৎসিত তামাসার আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। এতদ্ব্যতীত দামোদর-বাবুর এই পুস্তক যে ভালই হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আমিত্বের প্রসার।—প্রথম খণ্ড। কস্যচিৎ পরিব্রাজকস্য। শ্রীযদুনাথ মজুমদার এম্. এ. বি. এল্. কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ বার আনা মাত্র।

পুস্তকখানির নাম 'আমিত্বের প্রসার'; কিন্তু ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়, আমিত্বের ধ্বংস। বাস্তবিকই আমি ও তুমি এই যে ভেদজ্ঞান, ইহাই ত সংসারবন্ধন। এই

ভেদজ্ঞান লোপের অর্থই মুক্তি। মানুষ যেদিন সর্ব্বভূতে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে পারে, সেইদিনই তাহার কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন ও মুক্তিলাভ হয়। সমাজপদ্ধতিই সে পথ মুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সকলেই শৈশবে ও বাল্যে বড় স্বার্থপর, বড় আত্ম-সর্ব্বস্ব থাকি। বিবাহ হইলেই পরের ভাবনা আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ আমিত্বের সঙ্কোচ হয়। সন্তানাদি হইলে আমিত্বটা আরও কমিয়া যায়। এইরূপে মানুষ উন্নত হইতে উন্নত-তর হয়। সুকৃতি থাকিলে, শেষে আত্মানু-সন্ধান ও আত্মনিষ্ঠা বিলুপ্ত হইতেও পারে। তাহাই মুক্তি।

এই পুস্তকে সেই বিষয় আলোচিত হই-য়াছে। পুস্তকখানির জন্য যদুবাবুকে শত ধন্যবাদ দিতেছি। সরল ভাষায় লিখিত সদ্‌-যুক্তিপূর্ণ এমন গ্রন্থের আদর হওয়া সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়।

পাক-প্রণালী।—সম্পূর্ণ। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ২॥০ আড়াই টাকা।

মিষ্টান্ন-পাক।—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

আমরা ব্রাহ্মণজাতি—উদরের সহিত সম্পর্কটা যে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ, ইহা চির-প্রসিদ্ধ এবং সর্ব্বজনবিদিত। অতএব এই পুস্তক-দুইখানির আমরা শতমুখে প্রশংসা করিতেছি। পুস্তকের সঙ্গে বিপ্রদাসবাবু যদি কিছু-কিছু নমুনা পাঠাইতেন, তাহা হইলে সহস্রমুখে প্রশংসা করিতাম।

মহাদেবকে দিয়া মহাকবি বলাইয়াছেন— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীররক্ষা করিতে হইলেই জীবধর্ম্মানুসারে আহারের প্রয়োজন হয়। আর এমন-সকল উপাদেয় আহার্য্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি যে পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে, তাহাকে যদি আমরা ধর্ম্ম-পুস্তক বলি, তাহা হইলে, ভরসা করি, উৎ-কট ধর্ম্মব্যবসায়ীরা আমাদের জাতি স্মরণ করিয়া আমাদিগকে মার্জ্জনা করিবেন।

রহস্য যাউক্। বাস্তবিকই পুস্তক-দুইখানি দেখিয়া আমরা বড়ই প্রীত হইয়াছি। ইহাতে নানাবিধ আহার্য্য প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি এমন সরলভাবে বিবৃত হইয়াছে যে, রন্ধনবিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান যাহার আছে, সে-ই ইচ্ছানুসারে নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করিয়া নিজের ও বন্ধুবান্ধবের তৃপ্তি-সাধন করিতে পারিবে। দ্রব্যাদির গুণা-গুণ, উৎকৃষ্ট দ্রব্য নির্ব্বাচনের উপায়, পাক-শালা, পাকপাত্র, উনান ও জ্বাল সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি সন্নিবেশিত হওয়ায় পুস্তক-দুই-খানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছে। পুস্তকের আয়তন বিবেচনা করিলে মূল্যও কিছু অধিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। ভরসা করি, পুস্তক-দুইখানির আদর হইবে—অন্তত হওয়া উচিত।

রামদাস-গ্রন্থাবলী।—প্রথম ভাগ। ঐতিহাসিক রহস্য। ৺রামদাস সেন প্রণীত। মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

ইতিপূর্ব্বে রামদাসবাবুর প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া বহরমপুর তাহার গুণ-গ্রাহিতা ও কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছে। এক্ষণে রামদাসবাবুর পুত্রগণ স্বর্গীয় পিতার গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃষ্ট পিতৃভক্তির পরিচয় দিতেছেন, এবং তৎসঙ্গে

দেশের ও দেশীয় সাহিত্যের মহদুপকার সাধন করিতেছেন।

রামদাসবাবুর গ্রন্থাবলীর এই উপাদেয় সংস্করণ তিন খণ্ডে শেষ হইবে। এই প্রথম খণ্ডে তিন ভাগ 'ঐতিহাসিক রহস্য' সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল প্রবন্ধের রচনা বঙ্কিমবাবুর অনুরোধক্রমেই আরব্ধ হয়, এবং অনেকগুলি প্রবন্ধ 'বঙ্গদর্শনেই' প্রকাশিত হয়। এই সকল প্রবন্ধে কত যে শ্রম, যত্ন, অধ্যবসায়, বিদ্যানুরাগ, গবেষণা ও আন্তরিকতার প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা যিনি এই গ্রন্থ পাঠ না করিবেন, তাঁহাকে বুঝান যাইতে পারে না——মাসিকপত্রের পাঁচছত্র সমালোচনায় তাহা বুঝান যায় না। তবে, এ কথা বলিয়া দিতে পারা যায় যে, এই সকল প্রবন্ধ প্রকাশের পর যে-কেহ ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিবেন, তাঁহাকেই এ সকল পড়িতে—শুধু পড়িতে নহে, অধ্যয়ন করিতে—হইবে। নতুবা তাঁহার আলোচনা অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ইহা বড় কম প্রশংসার কথা নহে। গ্রন্থ বৃহৎ; আকারের হিসাবে ইহার মূল্যও অল্প—বাঙ্গালীর যদি বিদ্যানুরাগ থাকে, তাহা হইলে এই উপাদেয় পুস্তক যে বহুলপরিমাণে বিক্রীত হইবে, এরূপ ভরসা করা যায়। তবে দুঃখ এই যে, বাঙ্গালীর বিদ্যানুরাগ—প্রায় অশ্বডিম্বের মতনই জিনিষ। তথাপি রামদাসবাবু যে নিজগুণেই চিরস্মরণীয় হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মজার কথা।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

বালকদিগের চিত্তবিনোদনোদ্দিষ্ট 'Fairy Tales' নামধেয় অনেকগুলি পুস্তক ইংরেজিতে আছে—ইউরোপীয় সকল ভাষাতেই আছে। এই পুস্তকের গল্পগুলি প্রধানত এই সকল পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। কেবল দুইটি গল্প —'মূর্খ পণ্ডিত' ও 'ভূতের বোঝা'— কোন বৈদেশিক সাহিত্য হইতে গৃহীত নহে। এই দুইটি আমাদের দেশেরই প্রচলিত গল্প এবং এই পুস্তকের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা আমোদজনক। দেশীয় এবং বিদেশীয় জিনিষে প্রভেদ এইখানেই। যাহা দেশীয়, তাহা আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে আগে হইতেই মিলিয়া বসিয়া থাকে; যাহা বিদেশীয়, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া মিলাইতে হয়।

পুস্তকখানির সম্বন্ধে বলিতেছি, ভাল হইয়াছে, বেশ হইয়াছে। ইহা মুখ্যত বালকদিগের জন্য লিখিত; কিন্তু শুধু বালক কেন, বালকদিগের পিতামহ-মাতামহেরা পর্য্যন্ত ইহা পড়িয়া আমোদিত হইবেন—অন্তত আমরা হইয়াছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

গ্রাম।

আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে,
বাঁকা পথের ডাহিন পাশে, ভাঙা ঘাটের বাঁয়ে।
কে জানে এই গ্রাম,
কে জানে এর নাম,
ক্ষেতের ধারে মাঠের পারে বনের ঘন ছায়ে!
শুধু আমার হৃদয় জানে সে ছিল এই গাঁয়ে!

বেণুশাখার আড়াল দিয়ে চেয়ে আকাশপানে
কত সাঁঝের চাঁদ-ওঠা সে দেখেছে এইখানে!
কত আষাঢ়মাসে
ভিজে মাটির বাসে
বাদ্‌লা হাওয়া বয়ে গেছে তাদের কাঁচা ধানে।
সে সব ঘনঘটার দিনে সে ছিল এইখানে।

এই দীঘি, ঐ আমের বাগান, ঐ যে শিবালয়,
এই আঙিনা ডাক্‌-নামে তার জানে পরিচয়।
এই পুকুরে তারি
সাঁতার-কাটা বারি;
ঘাটের পথ-রেখা তারি চরণ-লেখাময়!
এই গাঁয়ে সে ছিল কে সেই জানে পরিচয়!

এই যাহারা কলস নিয়ে দাঁড়ায় ঘাটে আসি'
এরা সবাই দেখেছিল তারি মুখের হাসি।
কুশল পুছি তারে
দাঁড়াত তার দ্বারে
লাঙল কাঁধে চল্‌চে মাঠে ঐ যে প্রাচীন চাষী।
সে ছিল এই গাঁয়ে আমি যারে ভালবাসি।

পালের তরী কত যে যায় বহি' দখিন বায়ে,
দূরপ্রবাসের পথিক এসে বসে বকুলছায়ে,
পারের যাত্রিদলে
খেয়ার ঘাটে চলে,
কেউ গো চেয়ে দেখে না ঐ ভাঙাঘাটের বাঁয়ে!
আমি যারে ভালবাসি সে ছিল এই গাঁয়ে!

ভরত।

ভরতের উল্লেখ করিয়া রাজা দশরথ কৈকয়ীকে বলিয়াছিলেন—"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।" ভরতের চরিত্র তিনি বিলক্ষণরূপ অবগত ছিলেন, তথাপি রাম বনগমন করিলে তাঁহাকে ত্যাজ্য পুত্র ও স্বীয় ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্যের অযোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এমন নির্দ্দোষ—শুধু নির্দ্দোষ বলিলে ঠিক হয় না, রামায়ণ-কাব্যের একমাত্র আদর্শচরিত্র ভরতের ভাগ্যে যে কি বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল, তাহা আলোচনা করিলে আমরা দুঃখিত হই। পিতা তাঁহাকে অন্যায়ভাবে ত্যাগ করিলেন, এমন কি তাঁহাকে আনিবার জন্য যে সকল দুত কেকয়রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাও অযোধ্যার কুশলসম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরে যেন ঈষৎ ক্রূর ব্যঙ্গসহকারে বলিয়াছিল—"কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি"—আপনি যাহাদের কুশল ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কুশলে আছেন। অর্থাৎ ভরত যেন দশরথ-রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতির কুশল বাস্তবিক চান না—তিনি কৈকয়ী ও মন্থরার কুশলই শুধু প্রার্থনা করেন। রামবন-বাসোপলক্ষে অযোধ্যার রাজগৃহে যে ভয়ানক বাগ্‌বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যেও দুইএকবার এই নির্দ্দোষ রাজকুমারের প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাত হইয়াছে। এই সাধু ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয়গণের নিকট হইতেও অতি অন্যায় লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইয়া-

ছেন। রামচন্দ্র ভরতকে এত ভালবাসিতেন যে, "মম প্রাণৈঃ প্রিয়তরঃ" বলিয়া তিনি বারংবার ভরতের উল্লেখ করিয়াছেন। কৌশল্যাকে রাম বলিয়াছিলেন—"ধর্ম্মপ্রাণ ভরতের কথা মনে করিয়া তোমাকে অযোধ্যায় রাখিয়া যাইতে আমার কোন চিন্তার কারণ নাই।" অথচ সেই রামচন্দ্রও ভরতের প্রতি দুই একটি সন্দেহের বাণ নিক্ষেপ না করিয়াছেন, এমন নহে। তিনি সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না—ঋদ্ধিযুক্ত পুরুষেরা পরের প্রশংসা শুনিতে ভালবাসেন না।" এই সন্দেহের মার্জ্জনা নাই। পিতা দশরথ রামাভিষেকের উদ্যোগের সময় ভরতকে সন্দেহের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, রামকে তিনি আহ্বান করিয়া আনিয়া বলিয়াছিলেন, "ভরত মাতুলালয়ে থাকিতে থাকিতেই তোমার অভিষেক সম্পন্ন হইয়া যায়, ইহাই আমার ইচ্ছা; কারণ যদিও ভরত ধার্ম্মিক ও তোমার অনুগত, তথাপি মনুষ্যের মন বিচলিত হইতে কতক্ষণ!" ইক্ষ্বাকুবংশের চিরাগতপ্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠভ্রাতারই প্রাপ্য, এমত অবস্থায় ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ভরতের প্রতি এই সন্দেহের মার্জ্জনা নাই। রাম ভরতের চরিত্রমাহাত্ম্য এত বুঝিলেন, তথাপি বনবাসান্তে ভরদ্বাজাশ্রম হইতে হনুমান্‌কে ভরতের নিকটে পাঠাইয়া বলিয়া দিলেন—"আমার প্রত্যাগমনসংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, তাহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" এই সন্দেহও একান্ত অমার্জ্জনীয়। জগতে অনপরাধীর দণ্ড অনেকবার হইয়াছে, কিন্তু ভরতের মত আদর্শধার্ম্মিকের প্রতি এইরূপ দণ্ডের দৃষ্টান্ত বিরল। লক্ষ্মণ বারংবার "ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি রাঘব" বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন, অথচ সেই ভরত অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে লক্ষ্মণের কথা বলিয়াছেন—"সিদ্ধার্থঃ খলু সৌমিত্রির্যশ্চন্দ্রবিমলোপমম্। মুখং পশ্যতি রামস্য রাজীবাক্ষং মহাদ্যুতিম্।" প্রকৃতিপুঞ্জের ভরতের প্রতি বিদ্বিষ্ট হওয়ার কিছু কারণ অবশ্যই বিদ্যমান ছিল। এত বড় ষড়্‌যন্ত্রটা হইয়া গেল, ভরতের ইহাতে কি পরোক্ষে কোনরূপই অনুমোদন ছিল না? মাতুল যুধাজিতের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ভরত যে দূর হইতে সূত্রচালনা করিয়া কৈকয়ীকে নাচাইয়া তোলেন নাই, তাহার প্রমাণ কি? এই সন্দেহের আশঙ্কা করিয়া ভরত বিসংজ্ঞ অবস্থায় কৈকয়ীকে বলিয়াছিলেন—"যখন অযোধ্যার প্রকৃতিপুঞ্জ রুদ্ধকণ্ঠে সজলনেত্রে আমার দিকে তাকাইবে, আমি তাহা সহ্য করিতে পারিব না।" কৌশল্যা ভরতকে ডাকিয়া আনিয়া কটুবাক্য বলিতে লাগিলেন, সেই সকল বাক্যে ব্রণে সূচিকা বিদ্ধ করিলে যেরূপ কষ্ট হয়, ভরতকে সেইরূপ বেদনা দিয়াছিল। দৈবচক্রে পড়িয়া এই দেবতুল্যচরিত্র বিশ্বের সকলের সন্দেহের ভাজন হইয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। তিনি রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য বিপুল বাহিনী সঙ্গে যখন অগ্রসর হইতেছিলেন, নিষাদাধিপতি গুহক তখন তাঁহাকে রামের অনিষ্টকামনায় ধাবিত মনে করিয়া পথে লগুড় ধারণপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া ছিলেন, এমন কি ভরদ্বাজ ঋষি পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয়ের চক্ষে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আপনি সেই নিষ্পাপ রাজপুত্রের প্রতি কোন পাপ

অভিপ্রায় বহন করিয়া ত যাইতেছেন না?” প্রত্যেকের নিকট কৈফিয়ৎ দিতে দিতে ভরতের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইতেছিল। ভরত কৈকয়ীকে “মাতৃরূপে মমামিত্রে” বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন—বাস্তবিকই কৈকয়ী মাতারূপে তাঁহার মহাশক্রস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—বিশ্বময় এই যে সন্দেহ-চক্ষুর বিষবাণ ভরতের উপর পতিত হইতেছিল, তাহার মূল কৈকয়ী।

কিন্তু ঘটনাবলী যতই জটিলভাব ধারণ করুক না কেন, ভরতের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃস্নেহ সমস্ত জটিলতাকে সহজ করিয়া তুলিয়াছিল। রামকে আমরা নানা অবস্থায় সুখী হইতে দেখিয়াছি। যখন চিত্রকূটের পুষ্পোদ্যান-নিভ এবং কচিৎ ক্ষয়িতপ্রস্তরপ্রান্ত অধিত্যকায় বিলম্বিত শৈলশৃঙ্গ এবং বিচিত্র পুষ্প-সম্ভারের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রাম সীতাকে বলিয়াছিলেন, “এই স্থানে তোমার সঙ্গে বিচরণ করিয়া আমি অযোধ্যার রাজপদ অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেছি,” তখন দম্পতির নির্ম্মল আনন্দময় চিত্র আমাদের চক্ষে বড়ই সুন্দর ও তৃপ্তিপ্রদ মনে হইয়াছে। রামচন্দ্রের আকাশ কখন মেঘাচ্ছন্ন, কখন প্রসন্ন। কিন্তু ভরতের চিরবিষণ্ণ চিত্রটি মর্ম্মান্তিক করুণার যোগ্য। রামকে যখন ভরত ফিরাইয়া লইতে আসেন, তখন তাঁহার জটিল, কৃশ ও বিবর্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া রামচন্দ্র চমকিয়া উঠিয়াছিলেন, কষ্টে তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

ভরতের চিত্র প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কবিগুরু যখন সর্ব্বপ্রথম যবনিকা উত্তোলন করেন, তখনই তাঁহার মূর্ত্তি বিষণ্ণতাপূর্ণ। এইমাত্র দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তিনি প্রাতঃকালে উঠিয়াছেন, নর্ত্তকীগণ তাঁহার প্রমোদের জন্য সম্মুখে নৃত্য করিতেছে, সখাগণ ব্যগ্রভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভরতের চিত্ত ভারাক্রান্ত, মুখখানি শ্রীহীন। অযোধ্যার বিষম বিপদের পূর্ব্বাভাস যেন তাঁহার মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে, তিনি কোনরূপেই সুস্থ হইতে পারিতেছেন না। এই সময়ে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য অযোধ্যা হইতে দূত আসিল। ব্যগ্রকণ্ঠে ভরত দূতগণকে অযোধ্যার প্রত্যেকের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, দূতগণ দ্ব্যর্থব্যঞ্জক উত্তরে বলিল—“কুশলাস্তে মহাবাহো যেষাং কুশলমিচ্ছসি।” কিন্তু গতরাত্রের দুঃস্বপ্ন ও দূতগণের ব্যগ্রতা তাঁহার নিকট একটা সমস্যার মত মনে হইল। এই দুই ঘটনা তিনি একটি দুশ্চিন্তার সূত্রে গাঁথিয়া একান্ত বিমর্ষ হইলেন—“বভূব হৃস্য হৃদয়ে চিন্তা সুমহতী তদা। ত্বরয়া চাপি দূতানাং স্বপ্নস্যাপি চ দর্শনাৎ।”

বহু দেশ, নদনদী ও কান্তার অতিক্রম করিয়া ভরত দূর হইতে অযোধ্যার চিরশ্যামল তরুরাজি দেখিতে পাইলেন এবং আতঙ্কিতকণ্ঠে সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন —“এ যে অযোধ্যার মত বোধ হয় না, নগরীর সেই চিরশ্রুত তুমুল শব্দ শুনিতেছি না কেন? বেদপাঠনিরত ব্রাহ্মণগণের কণ্ঠধ্বনি ও কার্য্যস্রোতে প্রবাহিত নরনারীর বিপুল হলহলাশব্দ একান্তরূপে নিস্তব্ধ। যে প্রমোদোদ্যানসমূহে রমণী ও পুরুষগণ একত্র বিচরণ করিত, তাহা আজ পরিত্যক্ত। রাজপথা চন্দন ও জলনিষেকে পবিত্র হয়

নাই। রথ, অশ্ব, হস্তী, রাজপথে কিছুই নাই। অসংযত কবাট ও শ্রীহীন রাজপুরী যেন ব্যঙ্গ করিতেছে, এ ত অযোধ্যা নহে, এ যেন অযোধ্যার অরণ্য।"

প্রকৃতই অযোধ্যার শ্রী অন্তর্হিত হইয়াছে। চাঁদের হাট ভাঙিয়া গিয়াছে। ত্রিলোকবিশ্রুতকীর্ত্তি মহারাজ দশরথ পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; অভিষেকমঞ্চে পাদোত্তোলনোদ্যত জ্যেষ্ঠ রাজকুমার বিধিশাপে অভিশপ্ত হইয়া পাগলের বেশে বনে গিয়াছেন; বলয়কঙ্কণকেয়ূর সখীগণকে বিলাইয়া দিয়া অযোধ্যার রাজবধূ পাগলিনীবেশে স্বামিসঙ্গিনী হইয়াছেন; যাঁহার আয়ত এবং সুবৃত্ত বাহুদ্বয় অঙ্গদ প্রভৃতি সর্ব্ব ভূষণ ধারণের যোগ্য—"সেই সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণ ভ্রাতা ও বধূর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। অযোধ্যার গৃহে গৃহে এই তিন দেবতার জন্য করুণ ক্রন্দনের উৎসব চলিতেছে। বিপণী বন্ধ, রাজপথ পরিত্যক্ত। সুমন্ত্র সত্যই বলিয়াছিলেন, সমস্ত অযোধ্যানগরী যেন পুত্রহীনা কৌশল্যার দশা প্রাপ্ত হইয়াছে।

অথচ ভরত এ সকল কিছুই জানেন না। তিনি মৌন প্রতিহারীদিগের প্রণাম গ্রহণ করিয়া উৎকণ্ঠিতচিত্তে পিতার প্রকোষ্ঠে গেলেন, সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। "রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে।" কৈকয়ীর গৃহে রাজা অনেকসময় থাকেন,—পিতাকে খুঁজিতে ভরত মাতার গৃহে প্রবেশ করিলেন।

সদ্যোবিধবা কৈকয়ী আনন্দে ফুল্লা, পতিঘাতিনী পুত্রের ভাবী অভিষেকব্যাপারের আনন্দের চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করিয়া সুখী হইতেছিলেন। ভরতকে পাইয়া তিনি নিতান্ত হৃষ্টা হইলেন। ভরত পিতার কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন—"যা গতিঃ সর্ব্বভূতানাং তাং গতিং তে পিতা গতঃ।" এই সংবাদে পরশুচ্ছিন্ন বন্যবৃক্ষের ন্যায় ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। "ক স পাণিঃ সুখস্পর্শস্তাতস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ"—অক্লিষ্টকর্ম্মা পিতার হস্তের সুখের স্পর্শ কোথায় পাইব?"—বলিয়া ভরত কাঁদিতে লাগিলেন। রাজহীন রাজশয্যা তাঁহার নিকট চন্দ্রহীন আকাশের মত, বোধ হইল। তিনি কৈকয়ীকে বলিলেন, "রাম কোথায় আছেন? এখন পিতার অভাবে যিনি আমার পিতা, যিনি আমার বন্ধু, আমি যাঁহার দাস,—সেই রামচন্দ্রকে দেখিবার জন্য আমার প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে।" রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা নির্ব্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়া ভরত ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, ভ্রাতার চরিত্রসম্বন্ধে আশঙ্কা করিয়া তিনি বলিলেন,—"রাম কি কোন ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি কি দরিদ্রদিগকে পীড়ন করিয়াছেন, কিংবা পরদারে আসক্ত হইয়াছেন —এই নির্ব্বাসনদণ্ড কেন হইল?" কৈকয়ী বলিলেন—"রাম এ সকল কিছুই করেন নাই।" শেষোক্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিলেন—"ন রামঃ পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি।" শেষে ভরতের উন্নতি ও রাজশ্রী কামনায় কৈকয়ী যে সকল কাণ্ড করিয়াছেন, তাহা বলিয়া পুত্রের প্রীতি উৎপাদনের প্রতীক্ষায় তাঁহার মুখের দিকে চাহিলেন।

নিবিড় মেঘমণ্ডল যেন আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বস্ত ভ্রাতা

এই দুঃসহ সংবাদের মর্ম্ম ক্ষণকাল গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি মাতাকে যে ভর্ৎসনা করিলেন, তাহা তাঁহার মহা-দুর্গতি স্মরণ করিয়া আমরা সম্পূর্ণরূপে সময়োপযোগী মনে করি। "তুমি ধার্ম্মিকবর অশ্বপতির কন্যা নহ, তাঁহার বংশে রাক্ষসী। তুমি আমার ধর্ম্মবৎসল পিতাকে বিনাশ করিয়াছ, ভ্রাতাদিগকে পথের ভিখারী করিয়াছ, তুমি নরকে গমন কর।" যখন কাতরকণ্ঠে ভরত এই সকল কথা বলিতে-ছিলেন, তখন অপর গৃহ হইতে কৌশল্যা সুমিত্রাকে বলিলেন—"ভরতের কণ্ঠস্বর শুনা যাইতেছে, সে আসিয়াছে, তাহাকে আমার নিকট ডাকিয়া আন।" কৃশাঙ্গী সুমিত্রা ভরতকে ডাকিয়া আনিলে কৌশল্যা বলিলেন, "তোমার মাতা তোমাকে লইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্যভোগ করুন, তুমি আমাকে রামের নিকট পাঠাইয়া দেও।" এই কটূক্তিতে মর্ম্মবিদ্ধ ভরত কৌশল্যার নিকট অনেক শপথ করিলেন; তিনি এই ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানিতেন না,—বহুপ্রকারে এই কথা জানাইতে চেষ্টা করিয়া নিদারুণ শোক ও লজ্জায় অভিভূত ভরত নিজের প্রতি অজস্র অভিসম্পাতবৃষ্টি করিতে লাগি-লেন। বলিতে বলিতে শোকে মুহ্যমান হইয়া তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। করুণাময়ী অম্বা কৌশল্যা ধর্ম্মভীরু কুমারের মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন,—তাঁহাকে অঙ্কে লইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরতের শোক এবং ঔদাসীন্য ক্রমেই যেন বাড়িয়া চলিল। শ্মশানঘাটে মৃত পিতার কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "পিত, আপনি প্রিয় পুত্রদ্বয়কে বনে পাঠাইয়া নিজে কোথায় যাইতেছেন?" অশ্রুপূর্ণকাতরদৃষ্টি রাজকুমারকে বশিষ্ঠ তাড়না করিতে করিতে পিতার ঔর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত করাইলেন, শোক-বিহ্বলতায় ভরত নিজে একেবারে চেষ্টাশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন।

প্রাতে বন্দিগণ ভরতের স্তবগান আরম্ভ করিল, ভরত পাগলের ন্যায় ছুটিয়া তাহা-দিগকে নিষেধ করিয়া দিলেন। "ইক্ষ্বাকু-বংশের প্রথানুসারে সিংহাসন জ্যেষ্ঠ রাজ-কুমারের প্রাপ্য, তোমরা কাহার বন্দনা-গীতি গাহিতেছ?" রাজমৃত্যুর চতুর্দ্দশ দিবসে বশিষ্ঠপ্রমুখ সচিববৃন্দ ভরতকে রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। ভরত বলিলেন—"রামচন্দ্র রাজা হইবেন, অযোধ্যার সমস্ত প্রজামণ্ডলী লইয়া আমি তাঁহার পা ধরিয়া সাধিয়া আনিব, নতুবা চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য আমিও বনবাসী হইব।"

শত্রুঘ্ন মন্থরাকে মারিতে গেলেন এবং কৈকয়ীকে তর্জ্জন করিয়া অনুসরণ করিলে, ক্ষমার অবতার ভরত তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

সমস্ত অযোধ্যাবাসী রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে ছুটিল। শৃঙ্গবেরপুরীতে গুহকের সঙ্গে ভরতের সাক্ষাৎকার হইল। ভরতকে গুহক প্রথমে সন্দেহ করিয়াছিল, কিন্তু ভরতের মুখ দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে বিলম্ব হইল না। ইঙ্গুদীমূলে তৃণশয্যায় রাম শুধু একটু জল পান করিয়া রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন, সেই তৃণশয্যা রামের বিশালবাহুপীড়নে নিষ্পেষিত হইয়াছিল,

সীতার উত্তরীয়প্রক্ষিপ্ত স্বর্ণবিন্দু তৃণের উপর দৃষ্ট হইতেছিল, এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভরত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, গুহক কথা বলিতেছিলেন, ভরত শুনিতে পান নাই। ভরতকে সংজ্ঞাশূন্য দেখিয়া শত্রুঘ্ন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন,—রাণীগণ এবং সচিববৃন্দের শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বহুযত্নে ভরত জ্ঞানলাভ করিয়া সাশ্রুনেত্রে বলিলেন, "এই নাকি তাঁহার শয্যা,—যিনি আকাশস্পর্শী রাজপ্রাসাদে চিরদিন বাস করিতে অভ্যস্ত, যাঁহার গৃহ পুষ্পমাল্য, চিত্র ও চন্দনে চিরানুরঞ্জিত, যে গৃহশেখর নৃত্যশীল শুক ও ময়ূরের বিহারভূমি, ও গীতবাদিত্রশব্দে নিত্যমুখরিত ও যাহার কাঞ্চনভিত্তিসমূহ কারুকার্য্যের আদর্শ,—সেই গৃহপতি ধূলিলুণ্ঠিত হইয়া ইঙ্গুদীমূলে পড়িয়া ছিলেন, এ কথা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়, ইহা অবিশ্বাস্য। আমি কোন্ মুখে রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিব, ভোগবিলাসের দ্রব্যে আমার কাজ নাই, আমি আজ হইতে জটাবল্কল পরিয়া ভূতলে শয়ন করিব ও ফলমূলাহার করিয়া জীবনযাপন করিব।"

এবার জটাবল্কলপরিহিত শোকবিমূঢ় রাজকুমার ভরদ্বাজমুনির আশ্রমে যাইয়া রামচন্দ্রের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। এই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিও প্রথমত সন্দেহ করিয়া ভরতের মনঃপীড়া দিয়াছিলেন। একরাত্রি ভরদ্বাজের আশ্রমে আতিথ্যগ্রহণ করিয়া মুনির নির্দ্দেশানুসারে রাজকুমার চিত্রকূটাভিমুখে রওনা হইলেন। ভরদ্বাজ ভরতের শিবিরে আগমন করিয়া রাণীদিগকে চিনিতে চাহিলেন—ভরত এইভাবে মাতাদিগের পরিচয় দিলেন, "ভগবন্, ঐ যে শোক এবং অনশনে ক্ষীণদেহা সৌম্যমূর্ত্তি দেবতার ন্যায় দেখিতেছেন, ইনিই আমার অগ্রজ রামচন্দ্রের মাতা, উঁহার বামবাহু আশ্রয় করিয়া বিমনা অবস্থায় যিনি দাঁড়াইয়া আছেন, বনান্তরে শুষ্কপুষ্প কর্ণিকারতরুর ন্যায় শীর্ণাঙ্গী—ইনি লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্নের জননী সুমিত্রা। আর তাঁহার পার্শ্বে যিনি, তিনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করিয়া আসিয়াছেন, তিনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথা প্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এই দুর্ভাগ্যের মাতা।" বলিতে বলিতে ভরতের দুইটি চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল এবং ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জলভরা চক্ষে মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।

চিত্রকূটের সন্নিহিত হইয়া ভরত জননীবৃন্দ ও সচিবসমূহে পরিবৃত হইয়া রথ ত্যাগ করিয়া পদব্রজে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তখন রমণীয় চিত্রকূটে অর্ক ও কেতকী পুষ্প ফুটিয়া উঠিয়াছিল, আম্র ও লোধ্র দল পক্ক হইয়া শাখাগ্রে দুলিতেছিল। চিত্রকূটের কোন অংশ ক্ষতবিক্ষত প্রস্তররাজিতে ধূসর, নিম্ন অধিত্যকাভূমি পুষ্পসম্ভারে প্রমোদউদ্যানের ন্যায় সুন্দর, কোথাও পর্ব্বতগাত্র হইতে একটিমাত্র শৈলশৃঙ্গ ঊর্দ্ধে উঠিয়া আকাশ চুম্বন করিয়া আছে—অদূরে মন্দাকিনী,—কোথাও পুলিনশালিনী, কোথাও জলরাশির ক্ষীণরেখা নীল তরুরেখার প্রান্তে বিলীয়মান। তরঙ্গরাজি সুন্দরীর পরিত্যক্ত বস্ত্রের ন্যায় বায়ুকর্ত্তৃক ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, কোথায় পার্ব্বত্য ফুলরাশি স্রোতো-

বেগে ভাসিয়া যাইতেছিল। এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে রামচন্দ্র সীতাকে বলিলেন—"রাজ্য-নাশ ও সুহৃদ্বিরহ আমার দৃষ্টির কোন বাধা জন্মাইতেছে না, আমি এই পার্ব্বত্য দৃশ্যাবলীর নির্ম্মল আনন্দ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিতেছি।"

এই কথা শেষ না হইতে হইতে সহসা বিপুল শব্দে নভঃপ্রদেশ আকুলিত হইয়া উঠিল, সৈন্যরেণুতে দিঙ্মণ্ডল আচ্ছন্ন হইল, তুমুল শব্দে পশুপক্ষী চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। রামচন্দ্র সন্ত্রস্ত হইয়া লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেখ, কোন রাজা বা রাজপুত্র মৃগয়ার জন্য এই বনে আসিয়াছেন কি? কিংবা কোন ভীষণ জন্তুর আগমনে এই সৌম্যনিকেতনের শান্তি এভাবে বিঘ্নিত হইতেছে?" লক্ষ্মণ দীর্ঘপুষ্পিত সালবৃক্ষের অগ্রে উঠিয়া ইতস্তত দৃষ্টিপাত করিয়া পূর্ব্বদিকে সৈন্যশ্রেণী দেখিতে পাইলেন এবং বলিলেন, "অগ্নি নির্ব্বাণ করুন, সীতাকে গুহার মধ্যে লুকাইয়া রাখুন এবং অস্ত্রশস্ত্রাদি লইয়া প্রস্তুত হউন।" "কাহার সৈন্য আসিতেছে, কিছু বুঝিতে পারিলে কি?" এই প্রশ্নের উত্তরে লক্ষ্মণ বলিলেন, "অদূরে ঐ যে বিশাল বিটপী দেখা যাইতেছে, উহার পত্রান্তরে ভরতের কোবিদারচিহ্নিত রথধ্বজ দেখা যাইতেছে,—অভিষেক প্রাপ্ত হইয়া পূর্ণমনোরথ হয় নাই, নিষ্কণ্টকে রাজ্যশ্রী লাভ করিবার জন্য ভরত আমাদিগের বধসঙ্কল্পে অগ্রসর হইতেছে, আজ এই সমস্ত অনর্থের মূল ভরতকে আমি বধ করিব।"

রামচন্দ্র বলিলেন—"ভরত আমাদিগকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছে। সকল অবস্থা অবগত হইয়া আমার প্রতি চিরস্নেহ-পরায়ণ, আমার প্রাণ হইতে প্রিয় ভরত স্নেহাক্রান্তহৃদয়ে পিতাকে প্রসন্ন করিয়া আমাদিগের উদ্দেশে আসিয়াছে, তুমি তাহার প্রতি অন্যায় সন্দেহ করিতেছ কেন? ভরত কখন ত আমাদিগের কোন অপ্রিয় কার্য্য করে নাই, তুমি তাহার প্রতি কেন ক্রূরবাক্য প্রয়োগ করিতেছ? যদি রাজ্যলোভে এরূপ করিয়া থাক, তবে ভরতকে কহিয়া আমি নিশ্চয়ই রাজ্য তোমাকে দেওয়াইব।" ধর্ম্মশীল ভ্রাতার এই কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

কিছু পরেই ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন; অনশনকৃশ ও শোকের জীবন্ত-মূর্ত্তি দেবোপম ভরত রামকে তৃণের উপর উপবিষ্ট দেখিয়া বালকের ন্যায় উচ্চকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন—"হেমছত্র যাঁহার মস্তকের উপর শোভা পাইত, সেই রাজশ্রী-উজ্জ্বল শিরোদেশে আজ জটাভার কেন? আমার অগ্রজের দেহ চন্দন ও অগুরু দ্বারা মার্জ্জিত হইত, আজ সেই অঙ্গরাগবিরহিত কান্তি ধূলিধূসর। যিনি সমস্ত বিশ্বের প্রকৃতিপুঞ্জের আরাধনার বস্তু, তিনি বনে বনে ভিখারীর বেশে বেড়াইতেছেন,—আমার জন্যই তুমি এই সকল কষ্ট বহন করিতেছ, এই লোক-গর্হিত নৃশংস জীবনে ধিক্!" বলিতে বলিতে উচ্চস্বরে কাঁদিয়া ভরত রামচন্দ্রের পাদমূলে নিপতিত হইলেন। এই দুই ত্যাগী মহাপুরুষের মিলনদৃশ্য বড় করুণ। ভরতের মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তাঁহারও মাথায় জটাজূট, দেহে চীরবাস, তিনি কৃতাঞ্জলি

হইয়া অগ্রজের পাদমূলে লুণ্ঠিত। রামচন্দ্র বিবর্ণ ও কৃশ ভরতকে কষ্টে চিনিতে পারিলেন, অতি আদরে হাত ধরিয়া উঠাইয়া মস্তকাঘ্রাণপূর্ব্বক অঙ্কে টানিয়া লইলেন, বলিলেন—"বৎস, তোমার এ বেশ কেন, তোমার এ বেশে বনে আসা যোগ্য নহে।"

ভরত জ্যেষ্ঠের পাদতলে লুটাইয়া বলিলেন—"আমার জননী মহাঘোর নরকে পতিত হইতেছেন, আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন, আমি আপনার ভাই,—আপনার শিষ্য,—দাসানুদাস, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আপনি রাজ্যে আসিয়া অভিষিক্ত হউন।" বহু কথা, বহু বিতণ্ডা চলিল—ভরত বলিলেন, "আমি চতুর্দ্দশবৎসর বনবাসী হইব, এ প্রতিশ্রুতিপালন আমার কর্ত্তব্য।" কোনরূপে রামকে আনিতে না পারিয়া ভরত অনশনব্রত ধারণ করিয়া কুটীরদ্বারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। রামচন্দ্র এই অবস্থায় সাদরে উঠাইয়া নিজের পাদুকা তাঁহাকে প্রদান করিলেন। জটাভার শোভান্বিত করিয়া ভ্রাতৃপাদরজে বিভূষিত পাদুকা তাঁহার মুকুটের স্থানীয় হইল। সহস্র ভূষণে যে শোভা দিতে অসমর্থ, এই পাদুকা সেই অপূর্ব্ব রাজশ্রী ভরতকে প্রদান করিল। ভরত বিদায়কালে বলিলেন, "রাজ্যভার এই পাদুকায় নিবেদন করিয়া চতুর্দ্দশবৎসর তোমার প্রতীক্ষায় থাকিব, সেই সময়ান্তে তুমি না আসিলে অগ্নিতে জীবন বিসর্জ্জন করিব।" অযোধ্যার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া ভরত বলিলেন, "অযোধ্যা আর অযোধ্যা নাই, আমি এই সিংহহীন গুহায় প্রবেশ করিতে পারিব না।" নন্দিগ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইল, উহা রাজধানী নহে—ঋষির আশ্রম। সচিববৃন্দ জটাবল্কলপরিহিত ফলমূলাহারী—রাজার পার্শ্বে কি বলিয়া মহার্ঘ পরিচ্ছদ পরিয়া বসিবেন, তাঁহারা সকলে কাষায়বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেন। সেই কাষায়বস্ত্রপরিহিত সচিববৃন্দে পরিবৃত, ব্রত ও অনশনে কৃশাঙ্গ, ত্যাগী রাজকুমার পাদুকার উপর ছত্র ধরিয়া চতুর্দ্দশবৎসর রাজ্যপালন করিয়াছিলেন।

ভরতের এই বিষণ্ণ মূর্ত্তিখানি রামের চিত্তে শেলের মত বিদ্ধ হইয়া ছিল। যখন সীতাকে হারাইয়া তিনি উন্মত্তবেশে পম্পাতীরে ঘুরিতেছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন—"এই পম্পাতীরের রমণীয় দৃশ্যাবলি সীতার বিরহে ও ভরতের দুঃখ স্মরণ করিয়া আমার রমণীয় বোধ হইতেছে না।" আর একদিন লঙ্কায় রামচন্দ্র সুগ্রীবকে বলিয়াছিলেন, "বন্ধু, ভরতের মত ভ্রাতা জগতে কোথায় পাইবে?"

রামচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগত হইলে ভরত স্বয়ং তাঁহার পদে সেই পাদুকাদ্বয় পরাইয়া কৃতার্থ হইলেন এবং রামের পদে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "দেব, তুমি যে অযোগ্য করে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়াছিলে, তাহা গ্রহণ কর। আমি তোমার রাজ্য যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছি, রাজকোষে যে অর্থ সঞ্চিত ছিল, এই চতুর্দ্দশবৎসরে তাহা দশগুণ বেশী হইয়াছে।"

রামায়ণে যদি কোন চরিত্র ঠিক আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা একমাত্র ভরতের চরিত্র। সীতা লক্ষ্মণকে যে কটূক্তি করিয়াছিলেন, তাহা ক্ষমার্হ নহে। রামচন্দ্রের বালিবধ ইত্যাদি অনেক কার্য্যই সমর্থন করা যায় না। লক্ষ্মণের কথা অনেকসময় অতি

রুক্ষ ও দুর্বিনীত হইয়াছে। কৌশল্যা দশরথকে বলিয়াছিলেন, "কোন কোন জল-জন্তু যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ভক্ষণ করে, তুমিও সেইরূপ করিয়াছ।" কিন্তু ভরতের চরিত্রে কোন খুঁত নাই। পাদুকার উপর হেমছত্রধর জটাবল্কলধারী এই রাজর্ষির চিত্র রামায়ণে এক অদ্বিতীয় সৌন্দর্য্যপাত করিতেছে। দশরথ সত্যই বলিয়াছিলেন—"রামাদপি হি তং মন্যে ধর্ম্মতো বলবত্তরম্।" কৈকয়ীর সহস্রদোষ আমরা ক্ষমার্হ মনে করি, যখন মনে হয়, তিনি এরূপ সুপুত্রের গর্ভধারিণী। আমরা নিষাদাধিপতি গুহকের সঙ্গে একবাক্যে বলিতে পারি—

"ধন্যস্ত্বং ন ত্বয়া তুল্যং পশ্যামি জগতীতলে।
অযত্নাদাগতং রাজ্যং যস্ত্বং ত্যক্তুমিহেচ্ছসি।"

অযত্নাগত রাজ্য তুমি প্রত্যাখ্যান করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তুমি ধন্য, জগতে তোমার তুল্য কাহাকেও দেখা যায় না।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিকের রচনাকালসম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন যে, এই নাটকখানি অতি প্রাচীন, অর্থাৎ কালিদাসের সময়ের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী; আবার অন্যপক্ষীয়েরা বলেন যে, এই নাটকখানি শকুন্তলারচনার বহুপরবর্ত্তী সময়ে রচিত। যথাসাধ্য এ বিষয়ের একটা মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিব।

রাজশেখর প্রভৃতি আধুনিক নাটককার-দিগের পূর্ব্বসময়ের যে সকল নাটক পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কালিদাস, ভবভূতি, শ্রীহর্ষ, বিশাখদত্ত এবং ভট্টনারায়ণের গ্রন্থই প্রাচীন এবং প্রধান। বাণভট্ট সুকবি হইলেও, তাঁহার পার্ব্বতীপরিণয় নাটক (সম্ভবত কবির বাল্যরচনা বলিয়া) কাব্য এবং নাট্যকৌশলের হিসাবে এত অকিঞ্চিৎকর যে, সংস্কৃতসাহিত্যের আলোচনায় উহার উল্লেখ না করিলেও চলে। কালিদাস ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি বলিয়াই অনুমিত হইতেছেন। এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছি; তথাপি প্রাসঙ্গিকভাবে আরও দুইচারিটি কথা বলিব। হূনেরা যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করে নাই, ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কালিদাসের কাব্যে এই হূনদিগের কথা আছে, সুতরাং ইনি যে পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বসময়ের কবি নহেন, সে বিষয়ে কেহ সন্দেহ করেন না। ৪০১ হইতে ৪১৫ পর্য্যন্ত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল; কিন্তু ইঁহার সময়ে যে হূনেরা আগমন করে নাই এবং হূনদিগের সহিত যুদ্ধ যে ইঁহার সময়ের পরে, তাহাও জানিতে পারা যায়। ইঁহার পৌত্র স্কন্দগুপ্ত হূনদিগের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন; এবং হয়ত কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্যের সময়েও হূনদিগের সহিত যুদ্ধ হইয়াছিল। ৪১৫ হইতে ৪৫৪ পর্য্যন্ত

কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল; এবং স্কন্দগুপ্তের রাজত্ব ৪৫৫ হইতে ৪৬৮ পর্য্যন্ত। যাঁহারা কালিদাসকে খুব প্রাচীন করিতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহাকে এই যুগে, অর্থাৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে আবির্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই অনুমানের সপক্ষে যাহা বলা হয়, তাহা এই যে, স্কন্দগুপ্ত যখন কবি এবং কাব্যপ্রিয় ছিলেন, তখন হূনযুদ্ধের সমসাময়িক কবি কালিদাসের তাঁহারই সভায় থাকিবার কথা। চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন না; এবং মালবদেশ তখন তাঁহাদের শাসনকর্ত্তাদিগের দ্বারা শাসিত হইত। কিন্তু কালিদাস উজ্জয়িনীতে বসিয়া কবিতা লিখিতেন এবং তত্রত্য মহাকালের উৎসবে স্বরচিত নাটক অভিনয়ের জন্য উপস্থাপিত করিতেন; অতএব তাঁহাকে কবিপ্রিয় স্কন্দগুপ্তের সভাপণ্ডিত বলিতে পারি না। চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত অথবা স্কন্দগুপ্তের সময়ে গুপ্তরাজপ্রতিনিধিশাসিত মালবদেশে একজন স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন অবন্তিনাথ কদাপি বর্ণিত হইতে পারিতেন না। পৌরাণিক আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ হইতে এ বিষয়ে একটি প্রমাণ দিতেছি। মহাভারতে মদনভস্মের গল্প নাই; রামায়ণে ঐ গল্প আছে বটে, কিন্তু সংক্ষিপ্ত উল্লেখ হইতে সমুদায় বিবরণ পাওয়া যায় না। পুরাণের গল্পে মদনের একটিমাত্র স্ত্রী, তিনি রতি। কালিদাসের কাব্যেও এই কথা পাওয়া যায়। কিন্তু কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্তের সময়ে ঐ পৌরাণিক গল্পটি যে ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহাতে মদনের দুইটি পত্নীর নাম পাই;—রতি এবং প্রীতি। কুমারগুপ্তের মালবদেশের শাসনকর্ত্তা বন্ধুবর্ম্মা পশ্চিমমালবের দশপুরের মন্দিরের প্রতিষ্ঠা এবং সংস্কার উপলক্ষে ৪৭২ খৃষ্টাব্দে যে প্রস্তরলিপি খোদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে দুইটি নদী দ্বারা বেষ্টিত দশপুরনগরের বর্ণনায় লিখিত হইয়াছে:—

যদ্ভাত্যভিরম্যসরিদ্দ্বয়েন চপলোর্ম্মিণা সমুপগূঢ়ম্।
রহসি কুচশালিনীভ্যাং প্রীতিরতিভ্যাং স্মরাঙ্গমিব॥

অর্থ:—এই (দশপুর) নগর চঞ্চলতরঙ্গশালী অতিরমণীয় নদীদ্বয়ে আলিঙ্গিত হইয়া, কুচশালিনী প্রীতি এবং রতি কর্ত্তৃক নির্জ্জনে আলিঙ্গিত স্মরের মত শোভা পাইতেছে।

কালিদাসের সময়ের পুরাণ যে ইহার পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্যান্য কারণ অন্যত্র প্রদর্শিত হইয়াছে; এবং তদ্দ্বারা কালিদাস যে ষষ্ঠ শতাব্দীর কবি, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্ট যে সপ্তম শতাব্দীর কবি, তাহা রাজা হর্ষবর্দ্ধনের প্রস্তরলিপি এবং বাণভট্টের হর্ষচরিত হইতেই প্রমাণিত। ঠিক সময়টি যখনই হউক, ভবভূতিও এই যুগের কবি; এবং ইঁহাদের পরবর্ত্তী হইলেও বিশাখদত্তও এই যুগের কবি। বেণীসংহারকর্ত্তা ভট্টনারায়ণের একখানি দানলিপি পাওয়া যায়, সেখানি ৮৪০ খৃষ্টাব্দের। যে যুগ কালিদাস হইতে ভট্টনারায়ণ পর্য্যন্ত প্রসারিত, তাহারই মধ্যে ভারবি, সুবন্ধু, ধাবক, ভর্ত্তৃহরি প্রভৃতি কবিগণের অভ্যুদয়। মৃচ্ছকটিক যে এই আলঙ্কারিক সাহিত্যযুগের মধ্যে রচিত না হইয়া বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে দৃঢ় প্রমাণের প্রয়োজন হয়। গুপ্তরাজগণের রাজত্বকালে যে

আলঙ্কারিক সাহিত্যের যথেষ্ট স্ফূর্ত্তিলাভ হইয়াছিল, তাহা তাৎকালিক প্রস্তরলিপি পড়িয়াও বুঝিতে পারা যায়। হইতে পারে যে, মৃচ্ছকটিক অতি প্রাচীন না হইলেও, কালিদাসাদির পূর্ব্বে ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। এ অনুমানস্থাপনার অনুকূলেও কোন প্রমাণ পাই নাই; বরং যত ভাবিয়া দেখি, ততই মনে হয় যে, মৃচ্ছকটিক অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কারণগুলি এই :—

১। নাটকব্যবহৃত-প্রাকৃতভাষা-সংবলিত যে সকল গ্রন্থের সময় একপ্রকার নির্ণীত হইয়া গিয়াছে, তাহার কোনখানিই ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। যে সাহিত্য ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তাহার কোনখানিতেই এই শ্রেণীর প্রাকৃতভাষা দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাকৃতভাষা যে ঐ সময়ের পূর্ব্বে গ্রন্থে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী হয় নাই, তাহা ১৩০৯ সালের পৌষমাসের প্রবাসীতে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধে লিখিয়াছি। এরূপ স্থলে যদি প্রমাণ করিতে পারা না যায় যে, চতুর্থ শতাব্দীতে অথবা তৎপূর্ব্বে এই ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাকৃতভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা হইলে মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব প্রমাণ করা যায় না।

২। পালির সহিত প্রথমত সংস্কৃতের যত নৈকট্য ছিল, প্রাকৃতের সহিত ততটা ছিল না। যে প্রাকৃত যত একালের, তত তাহার সহিত সংস্কৃতভাষার দূরত্ব। মৃচ্ছকটিক যদি কালিদাসের সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তাহা হইলে মৃচ্ছকটিক-ব্যবহৃত প্রাকৃতের, সংস্কৃতের অধিক অনুরূপ হইবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে পাই যে, কালিদাসের সময়ের প্রত্যেক প্রাকৃত-শব্দেরই একটি অনুরূপ ব্যুৎপাদক সংস্কৃত-শব্দ আছে; কিন্তু মৃচ্ছকটিকে এমন অনেক প্রাকৃতশব্দ পাওয়া যায় যে, যাহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ দিতে হইলে, স্বতন্ত্র একটি শব্দ ব্যবহার করিতে হয়। ছিনালিয়াপুত্ত (পুংশ্চলীপুত্র), গোড় (পদ), মগ্‌গিছুং (প্রার্থয়িতুম্), ক্ষেলদু (ক্ষিপতু), পোট (উদর), হড়ক্ক (হৃদয়), পিটদু (বাংলা পেটো বা মারো) প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন শব্দ—কালিদাস, ভবভূতি বা শ্রীহর্ষে পাওয়া যায় না। যে সকল সংস্কৃতভাঙা শব্দ প্রাকৃতে ব্যবহৃত, তাহাতে এই একটা লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, শব্দগুলি যত প্রাচীন সময়ের, তত সেগুলি সংস্কৃতশব্দের কাছাকাছি। কালিদাসের সময়ে আত্মা, আত্মনঃ প্রভৃতির স্থলে অত্তা, অত্তন প্রভৃতি দেখিতে পাই; কিন্তু সপ্তম শতাব্দীর রত্নাবলীতে অপ্পা, অপ্পন প্রভৃতি একালের 'আপন'-শব্দের কাছাকাছি শব্দ পাই। মৃচ্ছকটিকেও তাহাই; বরং সংস্কৃতের 'ত'এর স্থলে 'প' খুব বেশীপরিমাণে ব্যবহৃত। 'কর্ত্তন করিব' কথার প্রাকৃতে 'কপ্পেম' দেখিতে পাই। তাহার পর বুড্‌ঢা (বৃদ্ধ), হলয়ং (হৃদয়ং), বইল্ল (বলীবর্দ্দ) প্রভৃতি শব্দ দেখিলে এই প্রাকৃত যে রত্নাবলীর প্রাকৃতেরও পরবর্ত্তী, এইরূপই মনে করা সঙ্গত। পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, মৃচ্ছকটিকের যে সকল প্রাকৃতশব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার সকল-গুলিই একালের বাংলা, উড়িয়া, মারাঠা প্রভৃতি ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের সম্পূর্ণ নিকট-

বর্ত্তী। 'দস্নিস্সং' কথাটা বাদ দিয়া 'তুণ্ডমুণ্ডে গোড়ং দস্নিস্সং' বলিলে, খাঁটি উড়িয়া বলিয়া মনে হয়। 'তুহ বপ্প কেলকে পবহণং'—তোর বাপের কেলে গাড়ি—কথাটার গায়েও একালের গন্ধ আছে।

৩। মহাভারতের কোন্ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত বা পরবর্ত্তী সময়ের, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। কিন্তু ঐ গ্রন্থের যে অংশ সন্দেহবর্জ্জিত, তাহাতে এমন শব্দের ব্যবহার নাই, যাহা স্বভাবজশব্দের অনুকৃতিমূলক। খট্‌খট্, ঠংঠং, ঝন্‌ঝন্ প্রভৃতি শব্দ আদৌ নাই। প্রক্ষিপ্ত অংশেও বড় জোর কোলাহল প্রভৃতি দুইচারিটি শব্দ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী সময়ের রামায়ণেও তিনচারিটি ব্যতীত এই প্রকারের শব্দ নাই, যথা—হলহলা, গদ্‌গদ এবং হুম্ভা (গাভীর শব্দ)। রামায়ণের সময়ে অনুকৃতিমূলক শব্দ প্রায় নূতনব্যবহৃত বলিয়া মনে হয়। কারন পাখী প্রভৃতির সঠিক ডাক অন্য কোন গ্রন্থে স্থান পায় নাই। অরণ্যকাণ্ডের ২৩শ সর্গে আছে :—

চীচীকূচীতি বাশন্ত্যো বভূবুস্তত্র সারিকাঃ।

পঞ্চম শতাব্দীর পঞ্চতন্ত্রেও তৎপূর্ব্ব সময়ের অনুরূপে অনুকৃতিমূলক শব্দগুলি কেবল বিশেষ্য-(সংজ্ঞা)-রূপে ব্যবহৃত দেখিতে পাই। মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া কালিদাসের সময় পর্য্যন্ত কোন সাহিত্যে ঐ শব্দগুলি ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় নাই। ভারবি এবং কালিদাসে ঐ শব্দগুলির আদৌ ব্যবহার দৃষ্ট হয় না। কেহ হয় ত মনে করিতে পারেন যে, বড় বড় কাব্যে ভাল শুনায় না বলিয়া, ওগুলি কেবল নাটকাদিতেই ব্যবহৃত হইয়াছে। ঘর্ঘর, ঝঙ্কার, হুঙ্কার প্রভৃতি লিখিলে যে ভাষার গৌরব কমিয়া যাইত, তাহা মনে হয় না। পরবর্ত্তী সময়ে যখন ঐগুলি ব্যবহৃত হইয়াছে, তখন আলঙ্কারিকেরা ভাষায় গ্রাম্যতাদোষ নির্দ্দেশ করেন নাই। বরং ঐ কথাগুলিতে যে যথেষ্ট তেজ আছে, তাহা স্বীকার করিতে হয়। কালিদাস যেন রঘুবংশ বা কুমারসম্ভবে ঐ সকল শব্দ কাব্যগৌরবের জন্য ব্যবহার করিলেন না, কিন্তু শকুন্তলাদিতেও উহার ব্যবহার নাই কেন? কথা এই যে, প্রথমে বিশুদ্ধ সংস্কৃত চলিয়াছিল, তাহার পর প্রাকৃত-ভাষা দিন দিন প্রবলতা লাভ করিলে নিত্য-ব্যবহৃত শব্দগুলি ধীরে ধীরে সংস্কৃতভাষায় স্থানলাভ করিয়াছে।

সুবন্ধুর সময়েও এই শ্রেণীর শব্দগুলি ক্রিয়ারূপে ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে ভবভূতি, বাণভট্ট ও শ্রীহর্ষের রচনায় যথেষ্টরূপে উহারা ক্রিয়াপদে ব্যবহৃত। প্রাচীন যে সকল শিলালিপি এবং তাম্র-শাসনাদি পাওয়া যায়, তাহাতেও সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী লিপিতে ঐপ্রকার ক্রিয়া-পদের ব্যবহার দেখা যায় না। এটা খুব বিশেষ রকমের কথা নহে কি? কাজেই যখন মৃচ্ছকটিকে খট্‌খটায়তে, ফুর্ফুরায়তি, মড়মড়ায়িস্ম প্রভৃতির প্রচুর প্রয়োগ দেখিতে পাই, তখন ঐ গ্রন্থখানি সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয় না। পাণিনির সহিত আমার পরিচয় নাই; পরিচয়লাভ করিবার অধিকারও নাই। শুনিয়াছি, ঐ ব্যাকরণের কোন সূত্র দ্বারা ঐপ্রকার ক্রিয়া-পদ সাধিবার উপায় আছে। ঐ সূত্র কোন্ সময়ে রচিত, তাহাও জানি না; কিন্তু কোন

শ্রেণীর একটি শব্দ প্রচলিত থাকিলেও, ব্যাকরণে তাহার জন্য সূত্র রচিত হইত। অন্যদিকে যখন ধারাবাহিকভাবে একটা শব্দব্যবহারের পদ্ধতি পাওয়া গেল, তখন বিপরীত মত সমর্থন করা সহজ নহে।

৪। মূর্খ শকার যেখানে পাণ্ডিত্য দেখাইতেছে, সেখানে বলিতেছে—

কিংশে শক্কে বালিপুত্তে মহিন্দে
লম্ভাপুত্তে কালণেমী সুবন্ধু।
লুদ্দে লাআ দোণপুত্তে জডাউ
চাণক্কো বা ধুন্ধুমালে তিশঙ্কু॥

এখানে চাণক্য, ধুন্ধুমার প্রভৃতি সকল নামই মূর্খ শকারের নিকট পৌরাণিক। সে যত বড় বড় নাম শুনিয়াছিল, সবগুলিই একনিশ্বাসে উচ্চারণ করিয়াছে। ঐ নামগুলির মধ্যে চাণক্য এবং সুবন্ধু ব্যতীত সকলগুলিই রামায়ণ এবং মহাভারতে পাওয়া যায়। "চাণক্যেন যথা সীতা" হইতে চাণক্যকেও যে মূর্খ শকার পৌরাণিক বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা জানা যায়। সুবন্ধু নামটি কবি সুবন্ধু ব্যতীত অন্য কাহারও নামে পাওয়া যায় না। সকল নামগুলিই যখন প্রকৃত নাম, তখন একটা বৃথা নাম উচ্চারিত হইয়াছে, বলা যায় না। কবি কৌশল করিয়াই নানাশ্রেণীর নাম একসঙ্গে গাঁথিয়া হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়াছেন। কবি সুবন্ধুর খ্যাতি প্রচারিত হইয়াছিল এবং মূর্খ শকার ঐ নামটি পৌরাণিক করিয়া লইয়াছিল, এইরূপ মনে করাই সঙ্গত। এ স্থানে এ কথাও বলিয়া রাখি যে, রাজশ্যালকের শকার নাম যখন অলঙ্কারগ্রন্থের আদর্শানুরূপ নাম হইতে গৃহীত, তখন নিশ্চয়ই মৃচ্ছকটিক পুরাতন গ্রন্থ নহে।

৫। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোথাও কামদেবের জন্য মন্দিরসৃষ্টি হয় নাই। এপর্য্যন্ত অনেক মন্দিরের লিপি পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কামদেবের মন্দিরের কথা ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না। সপ্তম শতাব্দীর অন্য নাটকে যাহা পাই, মৃচ্ছকটিকেও তাহাই পাইতেছি; ইহাতে কামদেবের আয়তনের কথা আছে। গৃহে দেবতারা বলি পাইতেছেন এবং দেউলে দেবী প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন, এ সকলগুলি হইতেও প্রমাণিত হয় যে, কদাপি মৃচ্ছকটিক দ্বিতীয় শতাব্দীর গ্রন্থ হইতে পারে না।

৬। মৃচ্ছকটিকে গর্ভাঙ্ক বা বিষ্কম্ভকাদি নাই দেখিয়া উহাকে প্রাচীন বলা যায় না। মুদ্রারাক্ষসেও দীর্ঘ দীর্ঘ অঙ্ক ব্যতীত গর্ভাঙ্ক-বিষ্কম্ভকাদি নাই। মৃচ্ছকটিকের প্রতি অঙ্কের শেষে যেমন শ্রব্য কাব্যের মত 'ইতি অমুক নাম, অমুক অঙ্ক' আছে, ভবভূতির তিনখানি নাটকেও সেইরূপ দেখিতে পাই। তখন ঐ প্রথাও প্রাচীনতার পক্ষে বলিয়া কেহ নির্দ্দেশ করিতে পারেন না।

মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদির অনুশাসনে যাহাই থাকুক, ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীতে লোকব্যবহারে যে প্রকৃত প্রস্তাবে অনার্য্য রমণীকে বিবাহ করিয়া আর্য্যেরা তাহাকে আর্য্যসমাজভুক্ত করিতেন, দশকুমারচরিতে অসুরোত্তমনন্দিনীর কথা তাহার প্রমাণ। ব্রাহ্মণ যে ক্ষত্রিয়রমণীর পাণিগ্রহণ করিতেন, ষষ্ঠ শতাব্দীর ভগবদ্দোষের পিতা রবিকীর্ত্তি তাহার দৃষ্টান্ত। ফ্লীট্‌সাহেবের প্রাচীন লিপিসংগ্রহে এ বিষয়ে আরও দৃষ্টান্ত আছে। এরূপ স্থলে অন্য কোন সমাজচিত্রসংবলিত

নাটকের অভাবে, মৃচ্ছকটিকে বসন্তসেনার বিবাহের কথা দ্বারা, ঐ গ্রন্থের সময়নির্ণয় হয় না। যখন অন্য প্রমাণের বলে মৃচ্ছকটিকের কাল নিরূপিত হয়, তখন ঐ-প্রকার লোকব্যবহার তৎসময়ে প্রচলিত ছিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার সুবিধা হয় মাত্র।

সত্য নির্দ্ধারিত হউক। যে সকল কারণে মৃচ্ছকটিক ৭ম শতাব্দীর গ্রন্থ বলিয়া মনে হইয়াছে, তাহা লিখিলাম। আমার সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া প্রমাণিত হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইব না; বরং যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হইলে প্রভূত আনন্দ লাভ করিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

নৌকাডুবি।

৭

বালিকা যে রমেশের পরিণীতা স্ত্রী নহে, এ কথা রমেশ বুঝিল, কিন্তু সে যে কাহার স্ত্রী, তাহা বাহির করা সহজ হইল না। রমেশ তাহাকে কৌশল করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিবাহের সময় তুমি আমাকে যখন প্রথম দেখিলে, তখন তোমার কি মনে হইল?"

বালিকা কহিল, "আমি ত তোমাকে দেখি নাই, আমি চোখ নীচু করিয়া ছিলাম।"

রমেশ। তুমি আমার নামও শুন নাই?

বালিকা। যেদিন শুনিলাম বিবাহ হইবে, তাহার পরের দিনই বিবাহ হইয়া গেল তোমার নাম আমি শুনিই নাই। মামী আমাকে তাড়াতাড়ি বিদায় করিয়া বাঁচিয়াছেন। আমি খুব দুষ্টু ছিলাম, আমি তাঁহাকে কেবল জ্বালাতন করিয়াছি।

রমেশ। আচ্ছা, তুমি যে লিখিতে-পড়িতে শিখিয়াছ, তোমার নিজের নাম বানান করিয়া লেখ দেখি!—

রমেশ তাহাকে একটু কাগজ, একটা পেন্সিল্ দিল। সে বলিল, "তা বুঝি আমি আর পারি না! আমার নাম বানান করা খুব সহজ।"—বলিয়া বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম লিখিল শ্রীমতী কমলা দেবী।

রমেশ। আচ্ছা, মামার নাম লেখ।

কমলা লিখিল, শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসা করিল—"কোথাও ভুল হইয়াছে?"

রমেশ কহিল—"না। আচ্ছা, তোমাদের গ্রামের নাম লেখ দেখি!

সে লিখিল, ধোবাপুকুর।

এইরূপে নানা উপায়ে অত্যন্ত সাবধানে রমেশ এই বালিকার যেটুকু জীবনবৃত্তান্ত

আবিষ্কার করিল, তাহাতে বড়-একটা সুবিধা হইল না।

তাহার পরে রমেশ কর্ত্তব্যসম্বন্ধে ভাবিতে বসিয়া গেল। খুব সম্ভব, ইহার স্বামী ডুবিয়া মরিয়াছে। যদি-বা শ্বশুরবাড়ীর সন্ধান পাওয়া যায়, সেখানে পাঠাইলে তাহারা ইহাকে গ্রহণ করিবে কি না, সন্দেহ। মামার বাড়ী পাঠাইতে গেলেও ইহার প্রতি ন্যায়াচরণ করা হইবে না। এতকাল বধূভাবে অন্যের বাড়ীতে বাস করার পর আজ যদি প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করা যায়, তবে সমাজে ইহার কি গতি হইবে, কোথায় ইহার স্থান হইবে? স্বামী যদি বাঁচিয়াই থাকে, তবে সে কি ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা বা সাহস করিবে? এখন এই মেয়েটিকে যেখানেই ফেলা হইবে, সেখানেই সে অতল সমুদ্রের মধ্যে পড়িবে।

আর একটি কথা। রমেশকে এই বালিকা স্বামী বলিয়া জানিয়াছে। সমস্ত সংসারের প্রতিকূলতার মধ্যে রমেশের আদরযত্ন পাইয়া তাহার প্রতি সে ভালবাসার সঙ্গে নির্ভর করিতেও শিখিয়াছে, এখন ইহাকে কেমন করিয়া রমেশ বলিবে যে, 'আমি তোমার স্বামী নহি, তুমি বিধবা!' তা ছাড়া, ইহাকে স্ত্রী ব্যতীত অন্যকোনরূপেই রমেশ নিজের কাছে রাখিতে পারে না, অন্যত্রও কোথাও ইহাকে রাখিবার স্থান নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহাকে নিজের স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করাও চলে না। রমেশ এই বালিকাটিকে ভবিষ্যতের পটে নানাবর্ণের স্নেহসিক্ত তুলি দ্বারা ফলাইয়া যে গৃহলক্ষ্মীর মূর্ত্তি আঁকিয়া তুলিতেছিল, তাহা আবার তাড়াতাড়ি মুছিতে হইল। মন্ত্রের দ্বারা যে সম্বন্ধ পবিত্র হয় নাই, তাহা দিয়া গৃহদেবতার প্রতিষ্ঠা চলে না। পরের স্ত্রী, এ কথা মনে করিবামাত্র রমেশের সেই কল্পনাচ্ছবির হস্ত হইতে তাহার ঘরের প্রদীপটি খসিয়া পড়িল—তাহার চিরজীবনের ঘরটি অন্ধকার হইয়া গেল।

রমেশ আর তাহার গ্রামে থাকিতে পারিল না। কলিকাতায় লোকের ভিড়ের মধ্যে আচ্ছন্ন থাকিয়া একটা কিছু উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে, এই কথা মনে করিয়া রমেশ কমলাকে লইয়া কলিকাতায় আসিল এবং পূর্ব্বে যেখানে ছিল, সেখান হইতে দূরে নূতন এক বাসা ভাড়া করিল।

কলিকাতা দেখিবার জন্য কমলার আগ্রহের সীমা ছিল না। প্রথমদিন বাসার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জানলায় গিয়া বসিল—সেখান হইতে জনস্রোতের অবিশ্রাম প্রবাহে তাহার মনকে নূতন নূতন কৌতূহলে ব্যাপৃত করিয়া রাখিল। ঘরে একজন ঝি ছিল, কলিকাতা তাহার পক্ষে অত্যন্ত পুরাতন। সে বালিকার বিস্ময়কে নিরর্থক মূঢ়তা জ্ঞান করিয়া বিরক্ত হইয়া বলিতে লাগিল—"হাঁগা, হাঁ করিয়া কি দেখিতেছ? বেলা যে অনেক হইল, 'চান' করিবে না?"

ঝি দিনের বেলায় কাজ করিয়া রাত্রে বাড়ী চলিয়া যাইবে। রাত্রে থাকিবে, এমন লোক পাওয়া গেল না। রমেশ ভাবিতে লাগিল—"কমলাকে এখন ত এক শয্যায় আর রাখিতে পারি না—অপরিচিত জায়গায় সে বালিকা একলাই বা কি করিয়া রাত কাটাইবে?" কমলা তাহার নিজের ধন নয়, এইজন্য কমলা রমেশের পক্ষে এক বিষম

কমলার এই বয়োমর্য্যাদার অভিমানে রমেশ ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "তোমার চেয়েও অনেক বড় মেয়ে ইস্কুলে যায়।"

কমলা তাহার পরে আর কিছু বলিল না, গাড়ি করিয়া একদিন রমেশের সঙ্গে ইস্কুলে গেল। প্রকাণ্ডবাড়ী—তাহার চেয়ে অনেক বড় এবং ছোট কত যে মেয়ে, তাহার ঠিকানা নাই। বিদ্যালয়ের কর্ত্রীর হাতে কমলাকে সমর্পণ করিয়া রমেশ যখন চলিয়া আসিতেছে, কমলাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কোথায় আসিতেছ? তোমাকে যে এইখানে থাকিতে হইবে।"

কমলা ভীতকণ্ঠে কহিল, "তুমি এখানে থাকিবে না?"

রমেশ। আমি ত এখানে থাকিতে পারি না।

কমলা রমেশের হাত চাপিয়া-ধরিয়া কহিল, "তবে আমি এখানে থাকিতে পারিব না, আমাকে লইয়া চল।"

রমেশ হাত ছাড়াইয়া কহিল—"ছি কমলা।"

এই ধিক্কারে কমলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল, তাহার মুখখানি একেবারে ছোট হইয়া গেল। রমেশ ব্যথিতচিত্তে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল, কিন্তু বালিকার সেই স্তম্ভিত অসহায় ভীতমুখশ্রী তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া রহিল।

৮

এইবার আলিপুরে ওকালতীর কাজ সুরু করিয়া দিবে, রমেশের এইরূপ সঙ্কল্প ছিল। কিন্তু তাহার মন ভাঙিয়া গেছে। চিত্ত স্থির করিয়া কাজে হাত দিবার এবং প্রথম কার্য্যারম্ভের নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার মত স্ফূর্ত্তি তাহার ছিল না। সে এখন কিছুদিন গঙ্গার পোলের উপর এবং গোলদীঘিতে অনাবশ্যক ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একবার মনে করিল কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিয়া আসি, এমন-সময় অন্নদাবাবুর কাছ হইতে একখানি চিঠি পাইল।

অন্নদাবাবু লিখিতেছেন, "গেজেটে দেখিলাম তুমি পাস্ হইয়াছ—কিন্তু সে খবর তোমার নিকট হইতে না পাইয়া দুঃখিত হইলাম। বহুকাল তোমার কোন সংবাদই পাই নাই। তুমি কেমন আছ এবং কবে কলিকাতায় আসিবে, জানাইয়া আমাকে নিশ্চিন্ত ও সুখী করিবে।"

এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, অন্নদাবাবু যে বিলাতগত ছেলেটির 'পরে তাঁহার এক চক্ষু রাখিয়াছিলেন, সে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে এবং এক ধনি-কন্যার সহিত তাহার বিবাহের আয়োজন চলিতেছে। সুতরাং হঠাৎ রমেশের উপরেই অন্নদাবাবুর দুই চক্ষুর দ্বিধাবিহীন প্রসন্নদৃষ্টি নিপতিত হইল।

ইতিপূর্ব্বে হেমনলিনীর স্মৃতি বিদ্যুতের মত রমেশের মনে মাঝে মাঝে খেলিয়া গেছে। কিন্তু রেখাপাত করিয়া দিবার সময় পায় নাই। কমলা যখন বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল, তখন হঠাৎ অন্নদাবাবুর এই চিঠি পাইয়া তাহার শূন্যমনে পূর্ব্বেকার কথা সমস্ত জাগিয়া উঠিল। তখন অধ্যয়নপরা তাহার সেই পূর্ব্বপ্রতিবেশিনীর মুখচ্ছবি তাহার মনের মধ্যে জোয়ারের টান ধরাইয়া দিল।

কিন্তু পাঠকগণ রমেশের যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন, তাহাতে এটুকু বুঝিয়া থাকিবেন, কর্ত্তব্যসম্বন্ধে রমেশের বোধশক্তি অত্যন্ত সচেতন। যেখানে কোনপ্রকার দ্বিধার কারণ আছে, সেখানে সে অতিশয় সূক্ষ্ম করিয়া চিন্তা করে। প্রবৃত্তি যখন তাহার প্রবল হয়, তখন তাহার চিন্তার প্রবলতাও বাড়িয়া উঠে। এইজন্য যেটা সে অত্যন্ত বেশি চায়, সেইটেতে প্রবৃত্ত হইতেই তাহার সব চেয়ে বিলম্ব ঘটে।

ইতিমধ্যে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার পরে হেমনলিনীর সহিত পূর্ব্বের ন্যায় সাক্ষাৎ করা তাহার কর্ত্তব্য হইবে কি না, তাহা সে কোনমতেই স্থির করিতে পারিল না। মনে মনে তাহাদের উভয়ের মধ্যে যে সম্বন্ধ বাঁধিয়াছিল, সে বন্ধন সে কি পিতার আদেশে ছিন্ন করে নাই? সে যে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে, এ সংবাদটুকুও সে হেমনলিনীর কর্ণগোচর হইতে দেয় নাই। যদিচ দৈবক্রমে তাহার সে বিবাহ হইয়াও না হইবারই মত হইল, তথাপি তাহার অদৃষ্টজাল যথেষ্ট জটিল হইয়া পড়িয়াছে। সম্প্রতি কমলার সহিত তাহার যে সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, সে কথা কাহাকেও বলা সে কর্ত্তব্য বোধ করে না। নিরপরাধা কমলাকে সে সংসারের কাছে অপদস্থ করিতে পারে না। অথচ সকল কথা স্পষ্ট না বলিয়া হেমনলিনীর নিকট সে তাহার পূর্ব্বের অধিকার লাভ করিবে কি করিয়া?

কিন্তু অন্নদাবাবুর পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করা আর ত উচিত হয় না। সে লিখিল, "গুরুতরকারণবশত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অক্ষম হইয়াছি, আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।" নিজের নূতন ঠিকানা পত্রে দিল না।

এই চিঠিখানি ডাকে ফেলিয়া তাহার পরদিনেই রমেশ শাম্‌লা মাথায় দিয়া আলিপুরের আদালতে হাজিরা দিতে বাহির হইল।

একদিন সে আদালত হইতে ফিরিবার সময় কতক পথ হাঁটিয়া একটি ঠিকাগাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে ভাড়ার বন্দোবস্ত করিতেছে, এমন-সময় একটি পরিচিত ব্যগ্রকণ্ঠের স্বরে শুনিতে পাইল—"বাবা, ঐ যে রমেশবাবু!"

"গাড়োয়ান্, রোখো, রোখো!"

গাড়ি রমেশের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সেদিন আলিপুরের পশুশালায় একটি চড়িভাতির নিমন্ত্রণ সারিয়া অন্নদাবাবু ও তাঁহার কন্যা বাড়ী ফিরিতেছিলেন—এমন সময়ে হঠাৎ এই সাক্ষাৎ।

গাড়িতে হেমনলিনীর সেই স্নিগ্ধগম্ভীর মুখ, তাহার বিশেষ ধরণের সেই শাড়ীপরা, তাহার চুল বাঁধিবার পরিচিত ভঙ্গী, তাহার হাতের সেই প্লেন্ বালা এবং তারাকাটা দুইগাছি করিয়া সোনার চুড়ি দেখিবামাত্র রমেশের সেই ছাত্রাবস্থার পূর্ব্বজীবন তাহার মনোরাজ্যের রসাতল হইতে কারামুক্ত হইয়া একমুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়মঞ্চের উপর চড়িয়া বসিল—তাহার বুকের মধ্যে একটা ঢেউ যেন একেবারে কণ্ঠ পর্য্যন্ত উচ্ছ্বসিত হইল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"এই যে রমেশ, ভাগ্যে পথে দেখা হইল! আজকাল চিঠিলেখাই বন্ধ করিয়াছ, যদি-বা লেখ, তবু

ঠিকানা দাও না। এখন যাইতেছ কোথায়? বিশেষ কোন কাজ আছে?"

রমেশ কহিল—"না, আদালত হইতে ফিরিতেছি।"

অন্নদাবাবু। তবে চল, আমাদের ওখানে চা খাইবে চল!

রমেশের হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছিল—সেখানে আর দ্বিধা করিবার স্থান ছিল না। সে গাড়িতে চড়িয়া বসিল। একান্ত চেষ্টায় সঙ্কোচ কাটাইয়া হেমনলিনীকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি ভাল আছেন?"

হেমনলিনী কুশলপ্রশ্নের উত্তর না দিয়াই কহিল, "আপনি পাস্ হইয়া আমাদের যে একবার খবর দিলেন না বড়?"

রমেশ এই প্রশ্নের কোন জবাব খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল—"আপনিও পাস্ হইয়াছেন দেখিলাম।"

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "তবু ভাল, আমাদের খবর রাখেন!"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"তুমি এখন বাসা কোথায় করিয়াছ?"

রমেশ কহিল—"দর্জ্জিপাড়ায়।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"কেন, কলুটোলায় তোমার সাবেক বাসা ত মন্দ ছিল না!"

উত্তরের অপেক্ষায় হেমনলিনী বিশেষ কৌতূহলের সহিত রমেশের দিকে চাহিল। সেই দৃষ্টি রমেশকে আঘাত করিল—সে তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, সেই বাসাতেই ফিরিব স্থির করিয়াছি।"

তাহার এই বাসা বদল করার অপরাধ যে হেমনলিনী গ্রহণ করিয়াছে, তাহা রমেশ বেশ বুঝিল—সাফাই করিবার কোন উপায় নাই জানিয়া সে মনে মনে পীড়িত হইতে লাগিল। অন্য পক্ষ হইতে আর কোন প্রশ্ন উঠিল না। হেমনলিনী গাড়ির বাহিরে পথের দিকে চাহিয়া রহিল। রমেশ আর থাকিতে না পারিয়া অকারণে আপনি কহিয়া উঠিল—"আমার একটি আত্মীয় হেদুয়ার কাছে থাকেন, তাঁহার খবর লইবার জন্য দর্জ্জিপাড়ায় বাসা করিয়াছি।"

রমেশ নিতান্ত মিথ্যা বলিল না, কিন্তু কথাটা কেমন অসঙ্গত শুনাইল। মাঝে মাঝে আত্মীয়ের খবর লইবার পক্ষে কলুটোলা হেদুয়া হইতে এতই কি দূর? এ প্রশ্ন কি উপস্থিত কাহারো মাথায় উঠিতে পারে না যে, আত্মীয় ছাড়া এ সহরে আর কি কাহারো খবর লইবার নাই? অতএব রমেশ যাহা বলিল, সেটা জবাবদিহীস্বরূপে কোন কাজেই লাগিল না, বরঞ্চ উল্টাই হইল। হেমনলিনীর দুই চক্ষু গাড়ির বাহিরে পথের দিকেই নিবিষ্ট হইয়া রহিল। হতভাগ্য রমেশ ইহার পরে কি বলিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। একবার কেবল জিজ্ঞাসা করিল, "যোগেনের খবর কি?" অন্নদাবাবু কহিলেন, "সে আইনপরীক্ষায় ফেল্ করিয়া পশ্চিমে হাওয়া খাইতে গেছে।"

গাড়ি যথাস্থানে পৌছিলে পর পরিচিত ঘর ও গৃহসজ্জাগুলি রমেশের উপর মন্ত্রজাল বিস্তার করিয়া দিল। সুখের দিন ছিল! তখনকার প্রত্যেক দিনই সোনার আভায় মণ্ডিত, সুরের ঝঙ্কারে স্পন্দিত হইয়া রজনীর সুখস্বপ্নের মধ্যে বিলীন হইয়া গেছে। রমেশের বুকের মধ্য হইতে গভীর দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হইল।

চায়ের আয়োজন প্রস্তুত হইলে হেমনলিনী একটু যেন দ্বিধার ভাবে রমেশকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনাকে চা দিব কি ?"

রমেশ এই অকারণ প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিল। তখন যে ধারা চলিয়া আসিতেছিল, তাহা যদি সমস্ত বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে, তবে আর কি চা দিতে হইবে? সবই যদি গিয়া থাকে, তবে এটুকু কি আর আছে?

রমেশ কহিল, "চা দিবেন বৈ কি !"

হেমনলিনী কহিল, "এ অভ্যাস বুঝি আপনার যায় নাই ?"

বড় বড় ব্যাপার বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়, কিন্তু এটুকু থাকে! বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়, কিন্তু চায়ের নেশা বরাবর টিঁকে; চোখে চোখে যে ছিল, সে চিরদিনের মত অন্তরালে পড়িয়া যায়, কিন্তু ধূমপানের হুঁকাটি কোনদিন কাছছাড়া হয় না—মানবজীবনের মধ্যে এই যে একটি বেদনাময় কৌতুক আছে, হেমনলিনীর ঐ তুচ্ছ প্রশ্নের মধ্যে গূঢ়ভাবে হয় ত তাহারই প্রতি লক্ষ্য ছিল।

রমেশ কিছু না বলিয়া চা খাইতে লাগিল। অন্নদাবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবার ত তুমি অনেকদিন বাড়ীতে ছিলে, কাজ ছিল বুঝি ?"

রমেশ কহিল, "বাবার মৃত্যু হইয়াছে—"

অন্নদাবাবু। অ্যাঁ, বল কি! সে কি কথা! কেমন করিয়া হইল?

রমেশ। তিনি পদ্মা বাহিয়া নৌকা করিয়া বাড়ী আসিতেছিলেন, হঠাৎ ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়।

একটা প্রবল হাওয়া উঠিলে যেমন অকস্মাৎ ঘন মেঘ কাটিয়া আকাশ পরিষ্কার হইয়া যায়, তেম্‌নি এই শোকের সংবাদে রমেশ ও হেমনলিনীর মাঝখানকার গ্লানি মুহূর্ত্তের মধ্যে কাটিয়া গেল। হেমনলিনী এতক্ষণ যে ঔদাসীন্য দেখাইবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহা আর টিঁকিল না, তৎক্ষণাৎ তাহার মুখে করুণা জাগিয়া উঠিল। সে অনুতাপসহকারে মনে মনে কহিল, "রমেশবাবুকে ভুল বুঝিয়াছিলাম,—তিনি পিতৃবিয়োগের শোকে এবং গোলমালে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলেন। এখনো হয় ত তাহাই লইয়া উন্মনা হইয়া আছেন। উঁহার সাংসারিক কি সঙ্কট ঘটিয়াছে, উঁহার মনের মধ্যে কি ভার চাপিয়াছে, তাহা কিছুই না জানিয়াই আমরা উঁহাকে দোষী করিতেছিলাম।"

হেমনলিনী এই পিতৃহীনকে বেশি করিয়া যত্ন করিতে লাগিল। রমেশের আহারে অভিরুচি ছিল না, হেমনলিনী তাহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া খাওয়াইল। কহিল, "আপনি বড় রোগা হইয়া গেছেন, শরীরে অযত্ন করিবেন না!" অন্নদাবাবুকে কহিল—"বাবা, রমেশবাবু আজ রাত্রেও এইখানেই খাইয়া যান না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "বেশ ত।"

এমন-সময় অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত। অন্নদাবাবুর চায়ের টেবিলে কিছুকাল অক্ষয় একাধিপত্য করিয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বকথিত ব্যারিষ্টারটি যখন এ পরিবারের আকর্ষণ হইতে স্খলিত হইয়া গেল এবং হঠাৎ দীর্ঘকাল ধরিয়া যখন রমেশের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না, তখন হইতে অক্ষয় অন্নদাবাবুর চায়ের

টেবিলে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত নিজেকে অভিব্যক্ত করিয়া তুলিতেছিল। আজ সহসা রমেশকে দেখিয়া সে থম্‌কিয়া গেল। আত্মসংবরণ করিয়া হাসিয়া কহিল—"একি! এ যে রমেশবাবু! আমি বলি, আমাদের বুঝি একেবারেই ভুলিয়া গেলেন।"

রমেশ কোন উত্তর না দিয়া একটুখানি হাসিল। অক্ষয় কহিল, "আপনার বাবা আপনাকে যেরকম তাড়াতাড়ি গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া গেলেন, আমি ভাবিলাম, তিনি এবার আপনার বিবাহ না দিয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না—ফাঁড়া কাটাইয়া আসিয়াছেন ত?"

হেমনলিনী অক্ষয়কে বিরক্তিদৃষ্টিদ্বারা বিদ্ধ করিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, রমেশের পিতৃবিয়োগ হইয়াছে!"

রমেশ বিবর্ণমুখ নত করিয়া বসিয়া রহিল। তাহাকে বেদনার উপরে ব্যথা দিল বলিয়া হেমনলিনী অক্ষয়ের উপর মনে মনে ভারি রাগ করিল। রমেশকে তাড়াতাড়ি কহিল, "রমেশবাবু, আপনাকে আমাদের নূতন অ্যাল্‌বম্‌খানা দেখান হয় নাই।" বলিয়া অ্যাল্‌বম্‌ আনিয়া রমেশকে টেবিলের একপ্রান্তে লইয়া গিয়া ছবি লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল এবং একসময়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশবাবু, আপনি বোধ হয় নূতন বাসায় একলা থাকেন!"

রমেশ কহিল, "হাঁ!"

হেমনলিনী। আমাদের পাশের বাড়ীতে আসিতে আপনি দেরি করিবেন না।

রমেশ কহিল, "না, আমি এই সোমবারেই নিশ্চয় আসিব।"

হেমনলিনী। মনে করিতেছি, আমাদের বি.-এ.র ফিলজফি আপনার কাছে মাঝে মাঝে বুঝাইয়া লইব।

রমেশ তাহাতে অত্যন্ত উৎসাহ প্রকাশ করিল। ওদিকে অন্নদাবাবু অন্যমনস্ক অক্ষয়কে ধরিয়া তাঁহার অজীর্ণরোগের নানাপ্রকার লক্ষণ বিস্তারিত করিয়া বিবৃত করিতে লাগিলেন। এই ক্ষুদ্র পরিবারের মধ্যে অক্ষয় অন্নদাবাবুকে এম্‌নি করিয়াই বশ করিয়াছিল। প্রায়ই দেখা হইবামাত্র সে উৎকণ্ঠিতভাবে অন্নদাবাবুকে জিজ্ঞাসা করিত—"আপনাকে অত্যন্ত কাহিল দেখিতেছি যে!"

তৎক্ষণাৎ অন্নদাবাবুরও স্বর ক্ষীণ হইয়া আসিত। তিনি রাত্রের অনিদ্রা, সকালের স্বল্পাহার, তিনচারিদিনের স্নানবন্ধ উল্লেখ করিয়া নিজের বর্ত্তমান অবস্থাকে অত্যন্ত শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান করিয়া তুলিতেন। অক্ষয় মাথা নাড়িয়া বলিত, "কিছুদিন আপনার বায়ুপরিবর্ত্তন করা একান্ত দরকার হইয়াছে—এখানে আপনার শরীর কিছুতেই সারিবে না।"

তাঁহার স্বাস্থ্যসম্বন্ধে এইরূপ নৈরাশ্যজনক কথা শুনিয়া অক্ষয়ের উপরে তিনি খুব খুসি হইতেন—হেমনলিনীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিতেন—"বায়ুপরিবর্ত্তনেই বা যাই কেমন করিয়া!"

অক্ষয় বিমর্ষ হইয়া কহিত, "তাও ত দেখিতে পাইতেছি—আপনি গেলে এদিক্‌কার চলে কি করিয়া!"

এইরূপে নিজের শরীরসম্বন্ধে সমস্ত আশা এবং উপায়ের পথ অবরুদ্ধ সপ্রমাণ

করিয়া অন্নদাবাবু অক্ষয়কে খাইয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতেন। অধিক পীড়াপীড়ি করিতে হইত না।

৯

রমেশ পূর্ব্বের বাসায় আসিতে বিলম্ব করিল না।

ইহার আগে হেমনলিনীর সঙ্গে রমেশের যতটুকু দূরভাব ছিল, এবারে তাহা আর রহিল না। দেখিতে দেখিতে উভয়ের মধ্যে স্বজনসুলভ অসঙ্কোচসম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গেল। রমেশ যেন একেবারে ঘরের লোক। হাসিকৌতুক নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ খুব জমিয়া উঠিল।

অনেককাল অনেক পড়া মুখস্থ করিয়া ইতিপূর্ব্বে হেমনলিনীর চেহারা একপ্রকার ক্ষণভঙ্গুর গোছের ছিল। মনে হইত, যেন একটু জোরে হাওয়া লাগিলেই শরীরটা কোমর হইতে হেলিয়া ভাঙিয়া পড়িতে পারে। তখন তাহার কথা অল্প ছিল, এবং তাহার সঙ্গে কথা কহিতেই ভয় হইত পাছে সামান্য কিছুতেই সে অপরাধ লয়।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তাহার তনু দেহলতা যেন কোন্ গূঢ় বসন্তের-বাতাসে পল্লবিত মুকুলিত হইয়া উঠিল। তাহার পাংশুবর্ণ কপোলে লাবণ্যের মসৃণতা দেখা দিল। তাহার দুটি চক্ষু এখন কথায় কথায় হাস্যচ্ছটায় নাচিয়া উঠে। আগে সে বেশভূষায় মনোযোগ দেওয়াকে চাপল্য, এমন কি, অন্যায় মনে করিত। এখনকার বেশবাহুল্যবিলাসিতা-সম্বন্ধে সে অনেকসময়ে তীব্রভাষায় আপনার প্রতিকূল মন্তব্য প্রকাশ করিয়া অন্নদাবাবুর প্রশংসাভাজন হইয়াছে। এখন কারো সঙ্গে কোন তর্ক না করিয়া কেমন করিয়া যে তাহার মত ফিরিয়া আসিতেছে, তাহা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ বলিতে পারে না। এখন তাহার জামায়কাপড়ে রেশমের আভা ও রঙের বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাহার চুলবাঁধায় নূতন নূতন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, এমন কি, কোন কোন বিশেষ দিনে তাহার বস্ত্রাঞ্চলসঞ্চলিত বায়ুহিল্লোলে বিলাতী কুঞ্জকাননের পুষ্পসৌরভস্মৃতি ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারে আঘাত করিয়া যায়। নদী যেমন নববর্ষায় ভরিয়া উঠিতে থাকে এবং তাহার তটভূমি শ্যামল তৃণে-গুল্মে বিচিত্র হইয়া উঠে— হেমনলিনী হঠাৎ আজকাল ভাবের আবেগে, স্বাস্থ্যের বিকাশে ও সাজসজ্জার পারিপাট্যে তেম্‌নি পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উপযুক্ত ব্যক্তির কাছে কলেজপাঠ্য ফিলজফিগ্রন্থের অর্থ বুঝাইয়া লইতে গিয়া যে মানুষের এমনতর অভূতপূর্ব্ব রূপান্তর-ভাবান্তর ঘটিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিলে নিঃসম্পর্ক ব্যক্তিরা বোধ করি কৌতুক অনুভব করিবেন।

কর্ত্তব্যবোধের দ্বারা ভারাক্রান্ত রমেশও বড় কম গম্ভীর ছিল না। বিচারশক্তির প্রাবল্যে তাহার শরীরমন যেন মন্থর হইয়া গিয়াছিল। আকাশের জ্যোতির্ম্ময় গ্রহতারা চলিয়া-ফিরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, কিন্তু মানমন্দির আপনার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে—রমেশ সেইরূপ এই চলমান জগৎসংসারের মাঝখানে আপনার পুঁথিপত্র যুক্তিতর্কের আয়োজনভারে স্তম্ভিত হইয়া ছিল, তাহাকেও আজ এতটা

হাল্কা করিয়া দিল কিসে? সেও আজকাল সব সময়ে পরিহাসের সদুত্তর দিতে না পারিলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠে। তাহার চুলে এখনো চিরুণি উঠে নাই বটে, কিন্তু তাহার চাদর আর পূর্ব্বের মত ময়লা নাই। তাহার দেহে-মনে এখন যেন একটা চলৎশক্তির আবির্ভাব হইয়াছে।

এত-বড় শক্তির লীলা যেখানে চলিতেছে, তাহার পাশেই চাহিয়া দেখ, সেখানে সমস্ত যেমন, তেম্‌নিই আছে। অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র পর্য্যাপ্তপরিমাণ জারকরসের অভাবে পূর্ব্বের মতই দুশ্চিন্তা ও দুঃস্বপ্ন রচনা করিতেছে। তাঁহার অতি নিকটেই যে মাধুর্য্য উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে, তাহা তাঁহাকে স্পর্শও করে নাই। পিতার অবর্ত্তমানে রমেশের বিষয়-সম্পত্তির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ও হওয়া উচিত, তিনি তাহারই আলোচনা করিতেছেন। রমেশকে অনুরোধ করিয়া কাগজপত্র আনাইয়া লইয়াছেন—একটি খাতা করিয়া তাহাতে সমস্ত নোট্ করিয়া লইতেছেন এবং যেখানে খট্‌কা ঠেকিতেছে, উকীল বন্ধুর কাছে তাহার মীমাংসার জন্য ছুটিতেছেন।

আর অক্ষয়! একই হাওয়ায় একদিকে ফুল ধরিতেছে, আর অক্ষয়ের দিকে কেবল কণ্টক উদ্গত হইতেছে। তাহার চক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল, তবু সে রমেশ ও হেমনলিনীর দিক্ হইতে তাহার চোখ ফিরাইতে পারিতেছে না।

আগে অক্ষয়ের প্রতি হেমনলিনীর একটা সুস্পষ্ট বিতৃষ্ণা ছিল, এখন আনন্দের ঔদার্য্যে হেমনলিনী তাহার সঙ্গেও হাসিয়া কথা কয়, কিন্তু এইটুকু অনুগ্রহের উত্তেজনায় যে ক্ষুধা বাড়াইয়া তোলে, তাহা পরিতৃপ্ত করিতে পারে না।

ক্রমশ।

স্বপ্নতত্ত্ব।

স্বপ্ন নিদ্রার চিরসহচর। নিদ্রার আবেশে শরীর যখন বিবশ ও অবসন্ন হইতে আরম্ভ করে, তখন বাহ্যজগতের জ্ঞান অস্পষ্ট হইতে অস্পষ্টতর হইয়া ক্রমশ বিলীন হইয়া যায়, অবসাদভরে ইন্দ্রিয়সকল অবশ ও স্তব্ধ হইয়া আইসে, সুতরাং বাহ্যবস্তুর সম্বন্ধে আমাদের ধারণাও বিলুপ্ত হইতে থাকে। কারণ ইন্দ্রিয়ের সহিত পদার্থের যোজনা না হইলে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান জন্মে না। নিদ্রার কোমলস্পর্শে যখন বাহিরের চঞ্চলতা শান্ত হইয়া যায় এবং শারীরিক ও মানসিক রাজ্যের নিয়ন্ত্রী ইচ্ছাশক্তি সাময়িক অবসাদে অভিভূত হইয়া পড়ে, সেই অবসরে স্বপ্ন মনোমঞ্চে বাস্তবের এক বিকৃত অভিনয় করিয়া লয়। কিন্তু এই দীন অভিনয়ের জন্যও চৈতন্য আবশ্যক। শরীরযন্ত্র নিদ্রার প্রভাবে নিষ্ক্রিয় হয়, কিন্তু মন নিষ্ক্রিয় হয় না। নিদ্রা—শরীরের জন্য, মনের জন্য নহে। তবে প্রভেদ এই যে, জাগ্রদবস্থায় মন ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়মিত, নিদ্রিতাবস্থায় এই

নিয়ামিকা শক্তির অভাবে মন শ্লথরশ্মি অশ্বের ন্যায় ইতস্তত সঞ্চালিত হইতে থাকে। এইজন্যই স্বপ্নে নানাবিধ অদ্ভুত চিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নসকল কিরূপে নিয়মিত হয়, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা সংক্ষেপে তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিব।

স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে প্রসিদ্ধ দার্শনিক সালির (Sully) স্থান অতি উচ্চে। যে সকল কারণে স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে, সালি তাহাদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন:— প্রান্তজ (Peripheral) ও কেন্দ্রজ (central)। অর্থাৎ অনেক স্বপ্ন বহিরিন্দ্রিয়ের উত্তেজনার দ্বারা (প্রান্তজ) এবং অনেক স্বপ্ন স্নায়বিক যন্ত্র ও মস্তিষ্কের কম্পন ও গতির (movements) দ্বারা (কেন্দ্রজ) উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় শরীরের বহিঃপ্রদেশে উত্তেজনা হইলে নানাবিধ স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। ডাঃ মরে এ সম্বন্ধে অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন। কোন ব্যক্তিকে নিদ্রিত করাইয়া তিনি তাহার শরীরে বিভিন্ন প্রকারের উত্তেজনা প্রয়োগ করিতেন; প্রতি উত্তেজনার পরেই নিদ্রিতকে জাগ্রত করিয়া তাহার স্বপ্ন অবগত হইতেন। ডাঃ গ্রেগরি, পায়ের নিকট উষ্ণজল থাকায়, স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যেন তিনি ভীষণ এত্‌নার মুখোদ্‌গীর্ণ অগ্নিময় পদার্থের উপর ভ্রমণ করিতেছেন। অন্য এক ব্যক্তি নিদ্রাকালে জানু অনাবৃত থাকায় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, তিনি গাড়িতে ভ্রমণ করিতেছেন (গাড়িতে বেড়াইবার সময় জানুদেশে ঠাণ্ডা লাগে)। যে সকল উত্তেজনার কথা এস্থলে বলা হইল, তাহা বাহ্যপদার্থকর্ত্তৃক উৎপন্ন। কিন্তু প্রান্তজ উত্তেজনা বাহ্যপদার্থকর্ত্তৃক উৎপন্ন না হইতেও পারে। মনোবিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে বাহ্য উত্তেজনা ব্যতিরেকেও অনেকসময় স্নায়বিক যন্ত্র উত্তেজিত হয়। নিদ্রাগমের অব্যবহিত পূর্ব্বে শরীর যখন তন্দ্রাভরে অবশ হইয়া পড়িতে থাকে, তখন, অনেকে স্মরণ করিতে পারিবেন, নানাপ্রকার দৃশ্য যেন চক্ষুর সমক্ষে উপনীত হয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা চক্ষুরিন্দ্রিয়ই তখন অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠে। কারণ জাগ্রদবস্থায় চক্ষুই সকল ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা অধিক ব্যবহৃত হয় এবং অল্পেই তাহার উত্তেজনা ঘটে। এইজন্যই নিদ্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং সুপ্তাবস্থায় নানাবিধ "দৃশ্য"-দর্শন ঘটিয়া থাকে। অতএব বাহ্য উত্তেজনার অভাবেও স্নায়বিক যন্ত্রের প্রান্তদেশ (চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি) উত্তেজিত হইতে পারে। নিদ্রাকালে শরীরস্থ পেশীসমূহের বিশেষ বিশেষ অবস্থাবশত অনেক প্রান্তজ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় এবং তৎকর্ত্তৃক অনেক স্বপ্ন নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। নিদ্রিতাবস্থায় অঙ্গসঞ্চালন এবং শরীরের সুখকর অথবা অসুখকর সংস্থানহেতু শারীরিক শ্রমের স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তি অনেক শ্রমসাপেক্ষ কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, এইরূপ স্বপ্ন দেখেন। শরীরযন্ত্রের বিশেষ বিশেষ অবস্থা অনেক প্রান্তজ উত্তেজনার সৃষ্টি করে এবং এই সকল উত্তেজনা হইতে বিভিন্ন স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি তৃপ্তিকর ভোজের স্বপ্ন দেখে। পাকস্থলীর অবস্থাবিশেষে এই স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। স্বপ্নের সহিত শরীরযন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

থাকায়, রোগীর স্বপ্ন অনেক সময়ে রোগ-নির্ণয়ে সহায়তা করে।

কেন্দ্রজ উত্তেজনা দুইপ্রকার :—নিরপেক্ষ (direct) এবং সাপেক্ষ (indirect)। নিরপেক্ষ কেন্দ্রজ উত্তেজনার দ্বারা যে সকল স্বপ্ন উৎপাদিত হয়, তাহা বহিরিন্দ্রিয়ের উত্তেজনার অপেক্ষা করে না। এই সকল স্বপ্ন মস্তিষ্কের স্বপ্রবর্ত্তিত (automatic) ক্রিয়ার ফল। কখন কখন বহুকালবিস্মৃত লোক বা ঘটনা স্বপ্নযোগে দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহাই নিরপেক্ষ উত্তেজনার দৃষ্টান্ত। স্নায়বিক যন্ত্র মস্তিষ্ক ও বাহ্যপদার্থের মধ্যে সংযোগ-সাধন করে,—বাহ্যবস্তু স্নায়বিক যন্ত্রকে উত্তেজিত করে, স্নায়বিক যন্ত্র উত্তেজিত হইয়া মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করে—তার পর উক্ত বাহ্যপদার্থের জ্ঞান হয়। স্নায়বিক যন্ত্রের স্বভাব এই, একবার উত্তেজিত হইলে সে উত্তেজনাশান্তির পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত সময়বিশেষে বাহ্যবস্তু ব্যতিরেকেও একই ভাবে পুনরায় উত্তেজিত হইতে চাহে। দিনের বেলায় একটি জিনিস দেখিলাম। উক্ত জিনিসটি আমার নয়নস্থ স্নায়ু ও তন্মধ্যস্থ কোষসমূহকে উত্তেজিত করিল। কিছুক্ষণ পরে উক্ত উত্তেজনার শান্তি হইল। কিন্তু স্নায়বিকযন্ত্রস্থ যে সকল কোষ (cells) উত্তেজিত হইল, কিছুদিন পর্য্যন্ত তাহাদিগের আপনিই উত্তেজিত হইবার দিকে ঝোঁক (tendency) থাকে। রাত্রিতে যখন কোন প্রতিবন্ধক থাকে না, তখন তাহারা উত্তেজিত হইয়া উক্ত পদার্থটির স্বপ্ন উৎপন্ন করে।

দুইটি পদার্থ একই সময়ে অথবা উপর্য্যুপরি আমাদের গোচর হইলে, উভয়ের ভিতর এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। একটি পদার্থ ইন্দ্রিয়গোচর হইবামাত্র দ্বিতীয়টির স্মরণ হইতে থাকে। মেঘ এবং বৃষ্টি, একটি অপরটিকে স্মরণ করাইয়া দেয়। ফুলের রূপ ও গন্ধ এই-ভাবে সম্বদ্ধ। এতদুভয়ের মধ্যে এরূপ সাহচর্য্য যে, দূরে একটি পরিচিত পুষ্প দেখিলে, তাহার গন্ধ আমাদের নাসিকায় না পঁহুছিলেও, সেই গন্ধের কথা আমাদের মনে পড়ে। আবার পুষ্পটি আমাদের নয়ন-পথে পতিত না হইলেও, গন্ধ পাইবামাত্র তাহার আকৃতি আমাদের মনশ্চক্ষুর সমীপে উপস্থিত হয়। এই একত্রানুভবজনিত সম্বন্ধকে ভাবানুবন্ধিতা (association of ideas) বলে। মনে যেমন ভাবসমূহের ভিতর পরম্পরানুবন্ধিতা স্থাপিত হয়, ভিন্ন ভিন্ন স্নায়বিক প্রদেশের ভিতরও ঐরূপ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এক প্রদেশের উত্তেজনা হইলে অমনি অন্যপ্রদেশের উত্তেজনাও তৎসঙ্গেই হইয়া থাকে। পদার্থের বিভিন্ন-গুণকর্ত্তৃক বিভিন্ন স্নায়ুর উত্তেজনা হয়। পদার্থের রূপের দ্বারা যে স্নায়ুসমূহ উত্তেজিত হয়, গন্ধের দ্বারা সে স্নায়ু উত্তেজিত হয় না, তজ্জন্য স্বতন্ত্র স্নায়ু নিযুক্ত আছে। আলোক-রশ্মি চক্ষুর স্নায়ুসমুদয়কে উত্তেজিত করে, শব্দতরঙ্গ কর্ণস্থ স্নায়ুসমূহে আঘাত করে। গন্ধানুভূতির উৎপাদক অণুসমূহ নাসিকাস্থিত স্নায়ুরাজির উত্তেজনা করে। যখন বিভিন্ন গুণ সর্ব্বদা একত্রাবস্থান করে এবং একত্র বা উপর্য্যুপরি অনুভূত হয়, তখন সেই অনুভূতিবহ স্নায়ুসমুদয়ের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে একটি স্নায়ুর উত্তেজনা হইলে অপর স্নায়ুসমূহ

একেবারে উত্তেজিত হয়। যেমন পাচক-বাহিত সুখাদ্য দূর হইতে দর্শন করিলে, কেবল যে চক্ষুর স্নায়ু উত্তেজিত হয় এমন নহে, তৎসঙ্গে নাসিকার স্নায়ু, রসনার স্নায়ু এবং হস্তসংলগ্ন স্নায়ু উত্তেজিত হইয়া উঠে। কেন না, এই সমস্ত স্নায়ু ভোজনের সময় একত্র ক্রিয়া করিয়া থাকে। ভোজনের সময় দর্শন, ঘ্রাণ, আস্বাদন এবং খাদ্যগ্রহণ-ব্যাপার যুগপৎ নিষ্পন্ন হয়। ভাবসমূহের ভিতর এইরূপ অনুবন্ধিতা এবং স্নায়বিক প্রদেশের এই একত্র উত্তেজনার প্রবৃত্তি হইতে "সাপেক্ষ" উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়া অনেক স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। বাহ্য উত্তেজনা অথবা নিরপেক্ষ কেন্দ্রজ উত্তেজনার দ্বারা স্বপ্ন প্রবর্ত্তিত হয়। অতঃপর, স্বপ্নযোগে মনোমধ্যে যে সকল ভাবের আবির্ভাব হয়, ঐ সকল ভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ভাবপরম্পরা স্বত মনকে অধিকার করে। এই কারণেই জাগ্রদবস্থায় যে বিষয় স্মরণ করা যায় না, অনেকসময় স্বপ্নকালে তাহার স্মরণ হয়।

অনেক স্বপ্নে পূর্ব্বাপরের সহিত সম্বন্ধাভাব লক্ষিত হয়। এইরূপ অসম্বদ্ধ অর্থশূন্য স্বপ্নের কারণ এই যে, জাগ্রদবস্থায় ইচ্ছাশক্তি ক্রিয়া করে, বিভিন্নপদার্থজাত বিভিন্ন অনুভূতির ভিতর মন ইচ্ছাশক্তির সাহায্যে সম্বন্ধস্থাপন করিয়া লয়। জাগ্রদবস্থায় মনোযোগ ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইয়া বাহ্যবস্তুজ্ঞানের মধ্যে একটা অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা স্থাপন করে। স্বপ্নে ইচ্ছাশক্তির অভাব, সুতরাং মন স্বপ্নের বিষয়সমূহের মধ্যে শৃঙ্খলাসঞ্চার করিতে পারে না, পরন্তু নিজেই তদ্দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইচ্ছা-শক্তির অভাবে মন উচ্ছৃঙ্খলভাবে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এইরূপ নানা বিষয় হইতে সঙ্কলিত এক অদ্ভুত, অসম্বদ্ধ ও অর্থশূন্য স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। এই সকল অসম্বদ্ধ স্বপ্নের দর্শন-কালে যে আমাদের দেশকালের জ্ঞান থাকে না, তাহা নহে। স্বপ্নে বাহ্য-পদার্থকে আমরা স্থানব্যাপী বলিয়াই মনে করি এবং ঘটনাবলীও সময়ে ঘটিতেছে বলিয়াই জ্ঞান হয়। কিন্তু দেশ ও কালের মধ্যে কোন একটি পদার্থের নির্দ্দিষ্ট স্থান বা সময় সম্বন্ধেই আমরা ভুল করি। পদার্থটি অসীম দেশের (space) কতটুকু ব্যাপিয়া রহিয়াছে, এবং ঘটনাটি অনন্তকালের (time) কতটুকু অধিকার করিয়া আছে—তাহাই আমাদের ঠিক ধারণা হয় না। অসম্বদ্ধ স্বপ্নে প্রধানত কার্য্যকারণসম্বন্ধের অভাব লক্ষিত হয়। কার্য্যকারণসম্বন্ধজ্ঞানে বিচারশক্তির (reasoning) প্রয়োজন। স্বপ্নে বিচারশক্তি সুপ্ত, কাজেই কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের ধারণাও অন্তর্হিত।

অনেক স্বপ্নে পূর্ব্বাপরের ভিতর বেশ সম্বন্ধ থাকে। কাডওয়ার্থ প্রভৃতি অনেকে বলেন যে, মানবাত্মার গুপ্তশক্তি (occult power) আছে, তদ্দ্বারাই এইরূপ সম্বন্ধযুক্ত স্বপ্নের উৎপত্তি হয়। জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নেও আমাদের চিন্তার ভিতর অনেকসময় শৃঙ্খলা দৃষ্ট হয়। স্বপ্নের বিষয়সমূহ অনেক সময়ে আপনা হইতেই শৃঙ্খলাবিন্যস্ত ও সম্বন্ধযুক্ত হইয়া যায়। কাণ্ট বলেন, স্বপ্নের উপাদানা-বলীর উপর মনের ছাপ (forms) পড়ে—তাই শৃঙ্খলার উৎপত্তি। কিন্তু নিদ্রাকালে

ইচ্ছাশক্তি যখন বিলুপ্ত, তখন এই ছাপ দেয় কে? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না হওয়ায়, কেহ কেহ ভাবানুবন্ধিতার দ্বারা তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যে সকল ভাব নিত্যসংশ্লিষ্ট, স্বপ্নকালে মনে তাহার কোন একটি ভাবের আবির্ভাব হইলে, সেই সকল ভাবপরম্পরা আপনা হইতেই আবির্ভূত হয়। স্বপ্নে চিরপরিচিত কোন বন্ধুর মুখখানি মনশ্চক্ষুর সমীপে উপস্থিত হইল, অমনি তাহার কণ্ঠস্বর, তাহার ব্যবহার, তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় যুগপৎ মনে পড়ে।

উপরে স্বপ্নাবস্থায় মন নিশ্চেষ্ট থাকে, ধরা হইয়াছে। কিন্তু অনেক সময়ে মন ক্রিয়াশীল থাকে। ক্রিয়াশীল থাকে বটে, কিন্তু ইচ্ছাশক্তির অধীনে নহে—প্রবল ভাবের (সুখদুঃখ, ভয়-ক্রোধ ইত্যাদির) কর্তৃত্বাধীনে। স্বভাবতই শৃঙ্খলা ও নিয়মের দিকে মনের ঝোঁক আছে। ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হইলেও শৃঙ্খলাহীনের ভিতর শৃঙ্খলা এবং নিয়ম-বিহীনের ভিতর নিয়মের প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। ইংরেজিতে ইহাকে বলে—Feeling for unity বা একত্বের আকাঙ্ক্ষা। এই একত্বের আকাঙ্ক্ষা হইতে অনেক সুসম্বদ্ধ স্বপ্নের সৃষ্টি হয়। অনেক স্বপ্ন স্মরণ করিবার সময় আমাদের মনে পড়ে,—শৃঙ্খলাবিহীন ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা শৃঙ্খলার অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। একত্বাকাঙ্ক্ষার প্রবৃত্তি ব্যতিরেকে আরও একটি প্রবৃত্তি স্বভাবত স্বপ্নসমূহকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে। তাহাকে বলে Emotional harmony—প্রবলভাবের সামঞ্জস্য-বিধান। স্বপ্ন কখন সুখের, কখন দুঃখের, কখন ভয়ের, কখন অভিমানের। এইরূপ এক একটি প্রবল ভাবকে আশ্রয় করিয়া অনেক সময়ে স্বপ্নসকল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। যে প্রবল ভাবটি যখন মনে জাগে, মন তাহার বিপরীত ভাবকে প্রতিরুদ্ধ করিয়া, কেবল সেই প্রবল ভাবের সহিত সমঞ্জসীভূত ঘটনাই দর্শন করিতে থাকিবে। কেহ যদি সুখের স্বপ্ন দেখিতে থাকে, তবে কেবল সুখের স্বপ্নই তাহার মনে আসিবে। এই যে মনোমধ্যে একই ভাব সংরক্ষণের প্রবৃত্তি, ইহার দ্বারাও অনেক সুসম্বদ্ধ স্বপ্নের উৎপত্তি হয়।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থাপেক্ষা স্পষ্টতররূপে পদার্থসমূহের অনুভূতি হয়। হার্টলি ইহার দুই কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—(১) দর্শনীয় বিষয়ের স্বাভাবিক অধিক স্পষ্টতা। চক্ষুর দ্বারা যেরূপ স্পষ্টভাবে পদার্থের অনুভূতি হয়, অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেরূপ হয় না। স্বপ্নে সাধারণত দর্শনীয় বিষয়ই অধিক থাকে। আমরা 'স্বপ্ন দেখাই' বলি—'স্বপ্ন শোনা' বলি না। এই দর্শনীয় বিষয়ের আধিক্যবশতই আমাদিগের নিকট স্বপ্ন খুব স্পষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হয়। (২) জাগ্রদবস্থায় মানসিক ভাবকে আমরা বাহ্যপদার্থ হইতে পৃথক্ করিতে পারি। কেন না, তখন উভয়ই বর্ত্তমান। সুপ্তাবস্থায় বাহ্যপদার্থের অভাববশত আমরা মানসিক ভাবকেই প্রকৃত বলিয়া মনে করি। মানসিক ভাব স্বভাবত স্পষ্ট নহে। কিন্তু বাহ্যপদার্থের অনুপস্থিতিবশত যখন মানসিক ভাব খুব স্পষ্ট হইয়া উঠে, তখন মানসিক ভাবকেই আমরা প্রকৃত

বহিঃস্থ পদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি। নিদ্রাকালে স্নায়ুমণ্ডলী অল্পেই উত্তেজিত হয়। স্বপ্নের স্বাভাবিক স্পষ্টতার ইহাও কারণ। এই কারণেই স্বপ্নে ছোট জিনিসকে বড়, অল্প স্থানকে প্রশস্ত স্থান এবং অল্প কালকে দীর্ঘকাল বলিয়া বোধ হয়। জাগ্রদবস্থায় ওষ্ঠদেশে আস্তে হস্তস্পর্শ করিলে স্নায়ুযন্ত্র সামান্য উত্তেজিত হয় মাত্র, কিন্তু নিদ্রাকালে ওষ্ঠস্পর্শ করিয়া ডাঃ মরে ভয়ানক দৈহিক কষ্টের স্বপ্ন উৎপাদন করিয়াছিলেন।

পরিশেষে এক অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। অধ্যাত্মবাদী দার্শনিকগণের মতে, স্বপ্ন জাগ্রদবস্থারই বিস্মৃতিমাত্র। মানবাত্মার স্বরূপ চৈতন্য উভয়ত্রই বর্ত্তমান। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক কাণ্ট বলেন, জীবনের অবসানেই স্বপ্নের বিরতি সম্ভব। দেকার্ত্ত (Descartes) হইতে আরম্ভ করিয়া হ্যামিল্টন (Sir W. Hamilton) পর্য্যন্ত অধিকাংশ দার্শনিকই বলেন, মানবমন কখনই নিদ্রিত হয় না, নিদ্রা কেবল বাহ্যেন্দ্রিয়ের জন্য। মানবাত্মার স্বরূপ চৈতন্য ; নিদ্রাবস্থায়ও মন ক্রিয়াশীল। যদিও সকল সময়ে আমরা স্বপ্ন স্মরণ করিতে না পারি, তথাপি নিদ্রিত হইলেই মানবমন স্বপ্ন দেখিতে থাকে। পরন্তু লক্ (Locke) প্রভৃতি সন্দেহবাদিগণ বলেন, যদি স্বপ্ন স্মরণ করিতেই না পারি, তবে স্বপ্ন দেখি কিরূপে বলিব ? কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, স্বপ্নদর্শনের সমস্ত বাহ্যলক্ষণ প্রকাশ করিয়াও অনেকে জাগিয়া স্বপ্নের বিষয় আদৌ স্মরণ করিতে পারে না। নিদ্রিত ব্যক্তিকে হাস্য করিতে দেখিলে অথবা কথা কহিতে শুনিলে, সে যে স্বপ্ন দেখিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না। কিন্তু অনেক সময়ে সে জাগ্রত হইয়া তাহার স্বপ্ন স্মরণ করিতে পারে না। এখন প্রশ্ন এই, সকল নিদ্রাই কি স্বপ্নময়ী ?—অথবা স্বপ্নশূন্য নিদ্রা কি অসম্ভব ? হ্যামিল্টন বলেন যে, নিদ্রাগমের অব্যবহিত পূর্ব্বে এবং নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরে যখন মন কোন-না-কোন বিষয়ের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে দেখা যায়, তখন ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, নিদ্রাবস্থায়ও চৈতন্যের বিলোপ হয় না। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে অনেকে এই আপত্তি করেন যে, নিদ্রাভঙ্গের সময় অর্থাৎ জাগরণের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে স্বপ্নের মত চৈতন্যের আভাস পাওয়া যায়; তাহা জাগরণ ও নিদ্রার মধ্যবর্ত্তী অবস্থা—অর্থাৎ নিদ্রার অচৈতন্য হইতে স্বপ্নের অর্দ্ধচৈতন্যের, এবং সেই অর্দ্ধচৈতন্য হইতে জাগরণের পূর্ণচৈতন্যের উদ্ভব হয়।

বর্ত্তমান সময়ে শারীরতত্ত্বের যথেষ্ট উন্নতি এবং মনোবিজ্ঞানের সহিত শারীরতত্ত্বের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মনোবিজ্ঞানের কোন তত্ত্ব শারীরবিদ্যার প্রতিকূল হইলে এখন আর তাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হয় না। এখন প্রত্যেক মানসিক অবস্থার অনুরূপ স্নায়বিক অবস্থা পরীক্ষাদ্বারা আবিষ্কৃত হইতেছে। মস্তিষ্কের সহিত চৈতন্যের যে অতি নিকট সম্বন্ধ, তাহা বহুশ্রমসাধ্য পরীক্ষার দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। আমরা যখন কোন বিষয়ে চিন্তা করি, তখন মস্তিষ্কে এবং স্নায়ুমণ্ডলীতে নানারূপ ক্রিয়া চলিতে থাকে। সুতরাং

যখন স্বপ্নদর্শন হয়, তখন মস্তিষ্কের কোনরূপ ক্রিয়া অবশ্য লক্ষিত হইবে। ট্রিপন-(Trepan)-নামক অস্ত্রের দ্বারা মস্তিষ্কের অবস্থাবিশেষ প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ হইয়াছে। উক্ত উপায়ে দেখা গিয়াছে, যখন স্বপ্নদর্শনের কোন বাহ্যলক্ষণ থাকে না, তখন মস্তিষ্কের পদার্থ পাণ্ডুর (pale), সঙ্কুচিত এবং রক্তশূন্য থাকে। কিন্তু যখন স্বপ্নের বাহ্যলক্ষণ বিদ্যমান, তখন মস্তিষ্ক বর্দ্ধিতায়তন হইয়া আধার হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং রক্তপূর্ণ হয়। নিদ্রাবস্থায় সকল সময়ে মস্তিষ্কের এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। স্বপ্ন নিদ্রার নিত্যসহচর হইলে, মস্তিষ্কের শেষোক্ত-রূপ অবস্থা সকল সময়েই দৃষ্ট হইত। অতএব মস্তিষ্কের রক্তহীন অবস্থা যদি স্বপ্নহীন নিদ্রার লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে স্বপ্নহীন নিদ্রা সম্ভব মনে করিতে হইবে।

শারীরতত্ত্বের যুক্তির দ্বারা আমরা জানিতে পারিলাম যে, স্বপ্নদর্শনসময়ে মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চালন হইয়া থাকে। অতএব মস্তিষ্কে শোণিতসঞ্চালন ও স্বপ্নদর্শনের ভিতর যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন এই, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টি কারণ এবং কোন্‌টি কার্য্য? জড়বাদিগণ বলেন, স্বপ্ন মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালনের ফল। অধ্যাত্মবাদী বলিবেন, স্বপ্নদর্শনের ফলেই মস্তিষ্কে শোণিত সঞ্চালিত হইতে থাকে। জড়বাদিগণের মতে চৈতন্য কেবল স্নায়বিক ক্রিয়ার ফল। জড়বাদি এবং অধ্যাত্মবাদি গণের মতসমালোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যে জড়ের উপর ভিত্তিস্থাপন করিয়া জড়বাদিগণ আত্মার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে চাহেন, সে জড়ের কোন অস্তিত্বই নাই।

বারান্তরে জড়বাদিগণের মত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

মেঘোদয়ে।

দেখ চেয়ে গিরির শিরে
মেঘ করেছে গগন ঘিরে,
আর কোরো না দেরি!
ওগো আমার মনোহরণ,
ওগো স্নিগ্ধ ঘনবরণ
দাঁড়াও তোমায় হেরি!
দাঁড়াও গো ঐ আকাশকোলে,
দাঁড়াও আমার হৃদয়দোলে,
দাঁড়াও গো ঐ শ্যামলতৃণ'পরে!

আকুল চোখের বারি বেয়ে
দাঁড়াও আমার নয়ন ছেয়ে,
দাঁড়াও আমার জন্মজন্মান্তরে !
অম্‌নি করে ঘনিয়ে তুমি এস,
অম্‌নি করে তড়িৎহাসি হেস,
অম্‌নি করে উড়িয়ে দিয়ো কেশ !
অম্‌নি করে নিবিড় ধারাজলে
অম্‌নি করে ঘন তিমিরতলে
আমায় তুমি কর নিরুদ্দেশ !

ওগো তোমার দরশ লাগি',
ওগো তোমার পরশ মাগি',
গুমরে মোর হিয়া !
রহি রহি পরাণ ব্যেপে
আগুনরেখা কেঁপে কেঁপে
যায় গো ঝলকিয়া !
আমার চিত্ত-আকাশ জুড়ে
বলাকাদল যাচ্চে উড়ে
জানিনে কোন্ দূর সমুদ্রপারে !
সজলবায়ু উদাস ছুটে,
কোথায় গিয়ে কেঁদে উঠে
পথবিহীন গহন অন্ধকারে !
ওগো তোমার আন খেয়ার তরী,
তোমার সাথে যাব অকূল'পরি,
যাব সকল বাঁধন-বাধা-খোলা।
ঝড়ের বেলা তোমার স্মিতহাসি
লাগ্‌বে আমার সর্ব্বদেহে আসি,
তরাস-সাথে হরষ দিবে দোলা !

ঐ যেখানে ঈশানকোণে
তড়িৎ হানে ক্ষণে ক্ষণে
বিজন উপকূলে,

তটের পায়ে মাথা কুটে'
তরঙ্গদল ফেনিয়ে উঠে
গিরির পদমূলে,
ঐ যেখানে মেঘের বেণী
জড়িয়ে আছে বনের শ্রেণী
মর্ম্মরিছে নারিকেলের শাখা,
গরুড়সম ঐ যেখানে
ঊর্দ্ধশিরে গগনপানে
শৈলমালা তুলেছে নীলপাখা,
কেন আজি আসে আমার মনে
ঐখানেতে মিলে' তোমার সনে
বেঁধেছিলেম বহুকালের ঘর,
হোথায় ঝড়ের নৃত্যমাঝে
ঢেউয়ের সুরে আজো বাজে
যুগান্তরের মিলনগীতিস্বর।

কেগো চিরজনম ভরে'
নিয়েছ মোর হৃদয় হরে'
উঠ্‌ছে মনে জেগে!
নিত্যকালের চেনাশোনা
কর্‌চে আজি আনাগোনা
নবীন ঘনমেঘে!
কত প্রিয়মুখের ছায়া
কোন্ দেহে আজ নিল কায়া,
ছড়িয়ে দিল সুখদুখের রাশি,
আজ্‌কে যেন দিশে দিশে
ঝড়ের সাথে যাচ্চে মিশে
কত জন্মের ভালবাসাবাসি!
তোমায় আমায় যতদিনের মেলা,
লোকলোকান্তে যত কালের খেলা
একমুহূর্ত্তে আজ কর সার্থক।

এই নিমেষে কেবল তুমি একা
জগৎ জুড়ে দাও আমারে দেখা,
জীবন জুড়ে মিলন আজি হোক্!

পাগল হ'য়ে বাতাস এল,
ছিন্ন মেঘে এলোমেলো
হচ্চে বরিষণ,
জানি না দিগ্‌দিগন্তরে
আকাশ ছেয়ে কিসের তরে
চল্‌ছে আয়োজন!
পথিক গেছে ঘরে ফিরে,
পাখীরা সব গেছে নীড়ে
তরণী সব বাধা ঘাটের কোলে,
আজি পথের দুই কিনারে
জাগিছে গ্রাম রুদ্ধ দ্বারে
দিবস আজি নয়ন নাহি খোলে!
শান্ত হ'রে শান্ত হ'রে প্রাণ,
ক্ষান্ত করিস্ প্রগল্‌ভ এই গান,
স্তব্ধ করিস্ বুকের দোলাদুলি!
হঠাৎ যদি দুয়ার খুলে যায়,
হঠাৎ যদি হরষ লাগে গায়
তখন চেয়ে দেখিস্ আঁখি তুলি!

প্রাচীন-জব্বলপুর-প্রসঙ্গ।

মধ্যভারতের প্রাচীন ইতিহাস তিমিরে আচ্ছন্ন। যে প্রকাণ্ড জনপদ রামায়ণে দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত, তাহা কোন্ সময়ে প্রথমে লোকালয়ে পরিণত হইতে আরম্ভ হয়, ইহা নির্ণয় করা অতীব দুঃসাধ্য। রামায়ণে জ্ঞাত হওয়া যায়, এই ভয়াবহ হিংস্রজন্তুসঙ্কুল বনস্থলীতে অনেক মহর্ষির আশ্রম ছিল। তন্মধ্যে জাবালি অন্যতম। তাঁহার তপোবন হইতেই 'জাবালিপট্টন' নামকরণ হয়। আধুনিক জব্বলপুর সেই জাবালিপট্টনেরই অপভ্রংশমাত্র। মহর্ষি ও তাঁহার শিষ্যগণের অন্তর্ধানের বহুকাল পরে

এ প্রদেশে বল্লভী ও প্রমার বংশীয় রাজপুতগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। প্রাচীন প্রস্তর-ফলকাদি হইতে যতদুর জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে, এই ভূখণ্ড একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে হৈহয়বংশীয় রাজপুতগণের করতলগত ছিল এবং ষোড়শ শতাব্দীতে গোন্দওয়ানারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে মধ্যভারতে গোন্দরাজপুত সংগ্রামসাহের ন্যায় প্রবলপ্রতাপশালী নরপতি কেহ ছিলেন না। তিনি বাহুবলে জব্বলপুরের ন্যায় অর্দ্ধশত গড় বা প্রদেশে রাজ্যবিস্তার করেন। সেই সময় হইতে জব্বলপুরের ইতিহাস গোন্দরাজপুতগণের অভ্যুত্থান ও পতনের সহিত লিপ্ত।

ইতিহাসপাঠক অনেকেই অবগত আছেন যে, গড়মণ্ডল (যাহা এক্ষণে মণ্ডলা নামে খ্যাত) পূর্ব্বে অসভ্য গোঁড় বা গোন্দজাতির রাজধানী ছিল। বিখ্যাত ঠগীদমনকারী সার উইলিয়াম্ শ্লিমান্ বহু যত্নে ও পরিশ্রমে এ রাজ্যের কথঞ্চিৎ ইতিহাস সংগ্রহ করেন।* কিরূপে এই প্রদেশ পার্ব্বতীয় গোন্দজাতির নিকট হইতে রাজ-পুতদিগের হস্তগত হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার বর্ণিত একটি সুন্দর কিংবদন্তী আছে। যাদব রায় নামে এক সামান্য রাজপুত হৈহয়বংশীয় নরপতিদিগের অধীনে কর্ম্মচারী ছিল। একদা সর্ভি পাঠক নামক জনৈক জ্যোতির্বিদ ব্রাহ্মণ তাহার ভবিষ্যৎ গণনা করিয়া বলেন যে, সে কোনকালে নিশ্চয়ই রাজা হইবে। উক্ত ব্রাহ্মণের উপদেশক্রমেই যাদব রায় পুরাতন প্রভুদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গোন্দ-রাজ নাগদেবের অধীনে নিযুক্ত হয় এবং ক্রমে তাঁহার বিলক্ষণ প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করে। নাগদেবের পুত্রসন্তান হইল না; পুত্রকামনায় যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করায় দৈববাণী হইল যে, যাদব রায়ই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইবে। তদনু-সারে, ৩৫৮ খৃঃ অব্দে (সংবৎ ৪১৫) নাগদেব গতাসু হইলে যাদব রায় নির্ব্বিবাদে গোন্দ-ওয়ানার সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন, এবং সমগ্র গোন্দজাতি তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিল। সর্ভি পাঠক তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর পুরস্কারস্বরূপ মন্ত্রীর পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই যাদব রায়ের বংশধরগণই গোন্দরাজপুত নামে বিখ্যাত। তাঁহারা প্রায় চতুর্দ্দশ শতাব্দী গড়মণ্ডলের সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন; এবং এতাবৎকাল উক্ত সর্ভি-পাঠকেরও উত্তরাধিকারিগণ মন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাত্মা শ্লিমানের চেষ্টায় রামনগরের কোন দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে প্রস্তরফলকে খোদিত যাদররায়প্রমুখ প্রায় অর্দ্ধশত নরপতির নাম ও নির্দ্দিষ্ট রাজত্বকাল পাওয়া গিয়াছিল।

এই বংশের মদনসিংহ সুপ্রসিদ্ধ মদন-মহলের নির্ম্মাতা। আধুনিক জব্বলপুরের

* *Vide* Journal of the Asiatic Society of Bengal. Vol. VI. pp. 621—646; also the Gazetteer of the Central Provinces of India edited by Charles Grant, 1870 A. D.

অনতিদূরে গিরিশৃঙ্গের উপর অত্যাপি এই রমণীয় ভবন বিত্যমান রহিয়াছে। জব্বলপুরযাত্রী প্রায় সকলেই এই স্থান দেখিতে যান; কিন্তু কাহার দ্বারা বা কোন্ সময়ে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, অনেকেই তাহার অনুসন্ধান করেন না। প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডের স্তূপরাশি ভেদ করিয়া সর্পের ন্যায় বক্রগতি পথ অবলম্বনে এস্থানে আরোহণ করিতে হয়। অনেকদূর এই গিরিপথ অতিক্রম করিলে প্রস্তররাশিবেষ্টিত এক রমণীয় ক্ষুদ্র সরোবর ও তাহার সমীপে একটি সামান্য গৃহের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব্বে বোধ হয় দ্বাররক্ষকের আবাসস্থান ছিল। আরও কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধে মদনমহলের সোপান। এই ত্রিতল প্রাসাদ অষ্ট শতাব্দীর ঝঞ্চাবাত ও ভূমিকম্প মস্তকে বহন করিয়া এখনও অভগ্ন অবস্থায় কেবলমাত্র একখানি শিলাখণ্ডের উপর সমভাবে দণ্ডায়মান আছে। প্রস্তরখণ্ডও সমতল নহে, গোলাকার বর্ত্তুলের ন্যায়; তাহার উপরে অপূর্ব্ব কৌশলে মূলভিত্তিশূন্য এই অট্টালিকা স্থাপিত। এরূপ নির্ম্মাণপ্রণালী বোধ হয় আধুনিক স্থাপত্যবিদের বুদ্ধির অগম্য। গৃহের ছাদ ও দেওয়াল ইষ্টক ও প্রস্তরে মিশ্রিত। যে শিলাখণ্ডের উপর অট্টালিকা গ্রথিত, তাহার সংলগ্ন আর একটি সুবৃহৎ শিলার উপরেও বাটীর কিয়দংশ বিস্তৃত। এই দুই শিলার সন্ধিস্থলে কয়েকপংক্তি সোপান এখনও পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। ইহা অবলম্বনে এক সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ করিয়া কয়েক পদ অতিক্রম করিলে একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দৃষ্ট হয়। সোপানসাহায্যে আবার দ্বিতলে আরোহণ করিলে সম্মুখে সুপ্রশস্ত ছাদ, তাহার পর বারাণ্ডা ও একটি বৃহৎ ঘর। স্নানাগার ইহারই সংলগ্ন ও তাহার পশ্চাতে আর একটি ক্ষুদ্র ঘর। ছাদ হইতে ত্রিতলে উঠিবার সোপান। ত্রিতলের কক্ষটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; দৈর্ঘ্যে বিংশতি ফুটের অধিক এবং প্রস্থে প্রায় দশফুট হইবে। তাহার সম্মুখে আবার একটি দালান। ঊর্দ্ধে নীল অনন্ত আকাশ—সম্মুখে যতদূর দৃষ্টিগোচর হয়, বিন্ধ্যাচলের শৈলশ্রেণী বিস্তৃত—নিম্নে সুদূরে ক্ষুদ্র নগরী ও সংসারের কোলাহল!

প্রবাদ এইরূপ যে, গড়মণ্ডলের নৃপতিগণ দারুণ গ্রীষ্মের সময় মদনমহলে আসিয়া বাস করিতেন। এখনও এই অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে ভগ্নাবশেষ নিরীক্ষণ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইহা পূর্ব্বে গিরিদুর্গের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে রক্ষিত ছিল। কোন কোন স্থলে ভগ্ন পাষাণময় প্রাচীর ও সিংহদ্বার এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। চারিদিকে প্রাচীরসংলগ্ন রক্ষীদিগের আবাসগৃহ এখনও কিয়দংশ দৃষ্ট হয়। প্রাচীরের নিকটে একটি ভূগর্ভস্থ প্রকোষ্ঠ ও উহাতে অবতরণ করিবার সোপান এখনও ভগ্নাবস্থায় পতিত আছে। ইহা বোধ হয় উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 'তয়্খানা'র ন্যায় রাজাদিগের মধ্যাহ্নকালীন বিশ্রামাগার ছিল। পাষাণময় প্রদেশে এরূপ হর্ম্ম্যরাজি নির্ম্মাণ করা কিরূপ ব্যয় ও আয়াস সাধ্য, তাহা এস্থান দেখিলেই উপলব্ধি হইবে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইহা এক্ষণে জনশূন্য—বন্যজন্তুর বাসস্থান।

যে পর্ব্বতশৃঙ্গোপরি মদনমহল নির্ম্মিত,

তাহার পদতলে প্রায় দুইমাইল বিস্তৃত এক প্রাচীন নগরীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহা এককালে গড়মণ্ডলরাজ্যের রাজধানী ছিল। যে গ্রাম এক্ষণে সেই ভগ্নাবশেষের উপর গঠিত হইয়াছে, তাহা অদ্যাপি 'গড়' বলিয়া খ্যাত। এখনও এস্থানে সহস্রাধিক বাস-গৃহ আছে ও পঞ্চসহস্র লোক বসতি করে। কোন্ সময়ে এই পুরাতন নগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; তবে প্রবাদ এইরূপ যে, ইহা দুইসহস্র বৎসরের অধিক বর্ত্তমান আছে। রাজা দলপতিসাহ এস্থান হইতে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়া সিঙ্গৌরগড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই সময় হইতেই এই নগরীর অবনতির সূত্রপাত হয়। এখানে পর্ব্বতের পাদদেশে এখনও গঙ্গাসাগর ও বাইসাগর নামে রাজগণের খনিত দুইটি সুন্দর সরোবর রহিয়াছে। ডানিয়েল লর্কি সাহেব যখন ১৭৯০ খৃঃ অব্দে এই পথে পর্য্যটন করেন, তখনও এই নগরী সমৃদ্ধিশালী ছিল। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, এই নগরে প্রস্তুত বালাসাহী মুদ্রা সমস্ত বুন্দেলখণ্ডে ব্যবহৃত হইত।

মদনসিংহের বংশধরগণের মধ্যে সংগ্রাম-সাহের রাজত্বকালেই এখানকার রাজপুত-বংশের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ইঁহারই বাহুবলে জব্বলপুর, দামো, সাগর, নরসিং-পুর, সিউনি, হোসেঙ্গাবাদ, ভূপাল প্রভৃতি দ্বিপঞ্চাশৎ গড় বা প্রদেশ গড়মণ্ডল-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ইহার পর দলপতিসাহ। ইনি ১৫৪০ খৃঃ অব্দে জব্বলপুর হইতে প্রায় ২৩মাইল উত্তরপশ্চিমে সিঙ্গৌরগড়নামক গিরিদুর্গে রাজধানী স্থাপিত করেন। প্রাতঃস্মরণীয়া দুর্গাবতী ইঁহারই রাণী।

দলপতিসাহের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র বীরনারায়ণ নিতান্ত নাবালক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার পঞ্চদশবর্ষব্যাপী রাজত্বকালে রাণী দুর্গাবতীর হস্তেই শাসনভার ন্যস্ত ছিল। এই সময়েই গড়মণ্ডলের উন্নতির চরম সীমা। রাণী দুর্গাবতী কঠোর অধ্যবসায় সহকারে ও বহুল অর্থব্যয়ে রাজ্যের সুখসমৃদ্ধি সম্যক্-প্রকারে পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অপত্য-নির্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া তিনি যে অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা কালের করাল স্রোতে ধ্বংস হইবার নহে। অদ্যাপি চরণদিগের গীতিকবিতায় তাঁহার গুণগ্রাম কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এতদ্দেশ-বাসিগণ এ বংশের অন্যান্য নরপতিগণের নাম পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু রাণী দুর্গাবতীর যশঃকাহিনী এপর্য্যন্ত বিস্মৃত হয় নাই। প্রজাদিগের জলকষ্টনিরাকরণের জন্য এই পার্ব্বতীয় প্রদেশে তিনি যে বিশাল দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি রাণী-তলাও নামে প্রসিদ্ধ।

রাণী দুর্গাবতীর অমূল্য জীবন ভারতের ইতিহাসে উজ্জ্বল রত্ন। অহল্যাবাইএর ন্যায় রাজ্যশাসনে তিনি যেরূপ দূরদর্শিতা ও কার্য্যপটুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রেও সেইরূপ চাঁদবিবি ও লক্ষ্মীবাইএর ন্যায় অমানুষিক সাহস ও বীরত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন। এখনও আদর্শ বীররমণীর দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে।

১৫৬৪ খৃঃ অব্দে কারা মাণিকপুরের মুসলমান শাসনকর্ত্তা আসফ খাঁ দিল্লীর

বাদশাহের আজ্ঞানুসারে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া গড়মণ্ডল আক্রমণ করে। রাণী দুর্গাবতী তৎকালে সিঙ্গৌরগড়ে বাস করিতে-ছিলেন। তাঁহার সৈন্যসংখ্যা যবনবাহিনীর অপেক্ষা অনেক অল্প ছিল। তথাপি তিনি অসমসাহসে মুসলমানসেনাপতির সম্মুখীন হইলেন; কিন্তু তাঁহার রাজধানী আত্ম-রক্ষার্থে তাদৃশ সুবিধাজনক হইবে না বিবেচনা করিয়া মণ্ডলার নিকট একটি সুদৃঢ় গিরিবর্ম্মে আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। প্রথমদিনের যুদ্ধে আসফ খাঁ পরাজিত হইল; কিন্তু পরদিন আবার দ্বিগুণ উৎসাহে বহু-সংখ্যক কামান লইয়া রাণীকে আক্রমণ করিল। রাজপুতসেনা অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিল বটে, কিন্তু অসংখ্য যবনের গতিরোধ করিতে সমর্থ হইল না। রাজ্ঞী স্বীয় যোদ্ধৃবর্গকে আত্মরক্ষার সময়প্রদানের জন্য হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গিরিসঙ্কটের দ্বার রক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সহচরগণ তাঁহাকে পলায়ন করিয়া আত্ম-প্রাণ রক্ষা করিতে বহুবিধ অনুনয় করিল; কিন্তু তিনি সে প্রস্তাবে কোনক্রমেই সম্মত হইলেন না। তাঁহার কমনীয় দেহ শত্রুর আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল; যবনের তীক্ষ্ণতীর তাঁহার চক্ষে বিদ্ধ হইল; তথাপি তিনি বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ হইলেন না। কিন্তু দুর্ঘটনা একাকী আইসে না; যে গিরিপথে তিনি সৈন্য স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটি শীর্ণা গিরিনদীর বালু-সৈকত পড়িয়াছিল। কয়েকদণ্ড পূর্ব্বে তথায় বিন্দুমাত্র জল ছিল না। কিন্তু যখন রাজপুত বীরগণ আত্মরক্ষার্থ সেই নদীমুখে ধাবিত হইল, তখন মুহূর্ত্তমধ্যে কোথা হইতে বন্যার ন্যায় সলিলরাশি আসিয়া পড়িয়া দুই কূল প্লাবিত করিয়া দিল;—সন্তরণেও নদী পার হওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। তখন স্বীয় সৈন্যগণের আসন্নমৃত্যু চিন্তা করিয়া দুর্গা-বতীর বীরহৃদয়ও বিচলিত হইল। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাজপুতরমণীর চিরপ্রচলিতপ্রথানুসারে সতীত্ব ও কুলগৌরব রক্ষার্থ হস্তিচালকের নিকট হইতে তীক্ষ্ণধার খড়্গ গ্রহণপূর্ব্বক সেই খড়্গ স্বহস্তে নিজ বক্ষস্থলে বিদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

রাণী দুর্গাবতীর অমূল্য জীবনের সহিত গড়মণ্ডলের স্বাধীনতা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইল। আসাফ খাঁ রাজ্যলুণ্ঠন করিয়া আশাতিরিক্ত ধনলাভ করিয়াছিল; কথিত আছে, সহস্রাধিক হস্তী এই সময়ে তাহার হস্তগত হয়। যবন এই সম্পত্তিরাশির স্পর্দ্ধায় এরূপ স্ফীত হইয়া উঠিল যে, সে গড়মণ্ডলের স্বাধীন রাজা হইয়া প্রজাশাসন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু দিল্লীর সিংহাসনে তখন মোগলগৌরবরবি আকবর-শাহ উপবিষ্ট। তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ক্ষুদ্র সেনাপতির প্রগল্‌ভতা অচিরে দমিত হইল। অগত্যা আসাফ খাঁ দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিয়া বাদশাহের নিকট আত্ম-সমর্পণ করিল। দিল্লীশ্বর সংগ্রামশাহের সুবিস্তৃত রাজ্যের দশটি বিভাগ করকবলিত করিয়া দলপতিসাহের ভ্রাতা চন্দ্রসাহকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই দশটি বিভাগই পরে ভূপালরাজ্যে পরিণত হয়। আইনি আকবরীতে গড়মণ্ডলরাজ্য মোগল-সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্ত্তী মালবপ্রদেশের অংশ-

বিশেষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ১৭৮১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাণী দুর্গাবতীর বংশধরগণ দিল্লী-শ্বরের অধীনতা নামমাত্র স্বীকার করিয়া প্রায় স্বাধীনভাবেই রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মথনাথ দে।

বৃদ্ধের স্বপ্নদর্শন।*

একরাতে দেখিনু স্বপন
বড় সাধ পাইতে যৌবন—
নিমেষের উদ্দাম আহ্লাদ
খুব ভাল হ'তে অবসাদ।
পক্ককেশে রাজ্যলাভ চেয়ে
সুখ আছে কৃষ্ণকেশে ধেয়ে।

যাক ঘুচে কালের সম্মান,
যাক খ্যাতি বলিয়া বিদ্বান্,
ছিঁড়ে ফেল জীবনের পাত
জ্ঞান, জয় যাহে অঙ্কপাত;
ভেঙে ফেল বিজয়পতাকা,
মুছে ফেল ললাটের টীকা।

হৃদয়ের উদ্দাম শোণিত
ক্ষণতরে হোক প্রবাহিত
যৌবনের জ্বালাময় স্রোতে
নাহি মানি বাধা কোনমতে।
স্বপ্নময় মাদক জীবন
নিমেষেরো, কর সমর্পণ।

—শুনিল তা দয়াল দেবতা,
মৃদু হাসি কহিলেন কথা—
"ছুঁই যদি তব শুভ্রকেশ
নিমেষে ফিরিয়া যাবে বেশ।
জীবনযাত্রায় পিছুপানে
ফিরে যাবে গোপনে গোপনে।

"কিন্তু দেখ দেখি পথ চেয়ে
কিছু যদি লও সাথে ব'য়ে;
জীবনের তীর্থযাত্রা হ'তে
কেহ কিগো বারিছে ফিরিতে?
যদি থাকে এই বেলা দেখ,
যতক্ষণ কাছাকাছি থাক।"

—আহা, রমণীর শিরোমণি
তোমা বিনা জীবন না গণি!
এক সাধ পারি না ছাড়িতে,
হে দেবতা, লব সাথে সাথে
সরবস্ব, অপর জীবন—
প্রিয়া, যার অভাব মরণ!

* After Holmes' *The Old Man Dreams.*

—অগ্নিময় লেখনী লইয়া
ইন্দ্রধনুবর্ণে ভিজাইয়া
লিখিলেন নীলিমার গায়
"এই জন ছোট হ'তে চায়,
এতখানি জীবনেতে নামি'
তবু তা'র হ'তে হ'বে স্বামী।"

—"বল দেখি খুঁজিয়া হৃদয়
হাতাড়িয়া নিভৃত নিলয়,
আরো যদি কিছু থাকে সাধ
তাড়াতাড়ি পড়ে' গেছে বাদ।
জীবনের ফিরে গেলে গতি
ফিরে দিতে রবে না শকতি।"

হাঁ হাঁ, আছে; পুত্রকন্যাগণ
ফেলে গেলে জনকের মন
শোকভরে হইবে চঞ্চল,
মুছি' সুখ দিবে অশ্রুজল।
আরো জীবনের উপার্জ্জন,
ল'ব সাথে তাদের কারণ।

—হাসিয়া দেবতা ফেলি' লেখা
বলিলেন—"কোথাকার বোকা,
ছেলে হ'তে সাধ গেছে মনে
'বাপ' হওয়া সাজিবে কেমনে,
সাথে লবে বার্দ্ধক্যের সাধ
জরাটুকু শুধু দিবে বাদ?

"অবিমিশ্র সুখ চাও তুমি
যাহা শুধু জানে স্বর্গভূমি!"
হাসিলাম অপ্রস্তুত-হাসি,
দিল মোর সুখনিদ্রা নাশি।
প্রাতে উঠে লিখিনু স্বপন
পক্ককেশ-বালক-কারণ!

শ্রীসুকুমারচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্যারীচরণ সরকার।

[জীবনবৃত্ত।] *

বাঙ্‌লাভাষায় দুইএকখানি করিয়া বাঙালীর জীবনচরিত লিখিত হইতেছে; এখন আশা করা অসঙ্গত নহে যে, অচিরাৎ বঙ্গশিশু বলণ্টাইন্ জামিরে ডুবালের জীবন-চরিত পাঠের বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা পাইবে। আমরা বালককালে বুঝিয়াছিলাম যে, ডেণ্ট

* শ্রীনবকৃষ্ণ ঘোষ বি. এ. বিরচিত। সাহিত্যসেবকসমিতি হইতে প্রকাশিত। বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের করকমলে সমর্পিত। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। মূল্য ১।০ পাঁচ সিকা।

নগরের সারসপাখীর আচরণ দেখিয়া সন্তানবৎসলতা শিখিতে হয়; আর পরিশ্রম, মিতাহার, অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণের দৃষ্টান্ত— বলণ্টাইন্ জামিরে ডুবাল প্রভৃতি কোন অজ্ঞাত সমাজের অজ্ঞাত-আচার ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোন কোন বিষয় সমগ্র মনুষ্যসমাজ হইতেও শিখিবার উপায় নাই; আর আমাদের বঙ্গসমাজ হইতে কোন সদ্‌গুণের শিক্ষাই হইতে পারে না। তাহাতেই বলিতেছিলাম, যদি দুইএকখানি করিয়া বাঙালীর জীবনচরিত লিখিত হয়, তাহা হইলে ঘোরতর আত্মাবমাননারূপ শিক্ষাবিড়ম্বনা হইতে ক্রমে বাঙালী বালকেরা রক্ষা পাইতে পারে। যাঁহারা এইরূপ রক্ষক, তাঁহারা ধন্য,— নবকৃষ্ণবাবু ধন্য।

আমি প্যারীবাবুকে বড়ই ভক্তি করি। ভক্তি করিতাম, লিখিতে পারিলাম না; ভক্তি করি। তাঁহার জীবনবৃত্তের এখনকার কালের মত সমালোচনা, আমার দ্বারা হইতেই পারে না। সিন্ধুক খুলিলেই মায়ের অলঙ্কারগুলি অতি সন্তর্পণে দেখিয়া আবার মুড়িয়া-সুড়িয়া রাখি, সেগুলির শিল্পচাতুর্য্যের সমালোচনা করিবার শক্তি আমার নাই। প্যারীবাবুর জীবনচরিতও আমি সমালোচনা করিতে পারিব না—এর সবটুকুই ভাল, পবিত্র, শ্রদ্ধেয়।

প্যারীবাবুর ফাষ্ট বুক প্রভৃতি আমরা পড়ি নাই। প্রবেশিকা-শ্রেণীতে ইংরাজিতে লিখিত তাঁহার ভারতবর্ষের ভূগোল পড়িয়াছিলাম। প্যারীবাবুর সহিত সেই আমাদের প্রথম সম্পর্ক। সেই অবধিই ভক্তির সৃষ্টি। বি. এ. পাস্ করিয়া কলিকাতায় গিয়া— তাঁহার স্থাপিত হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম, প্রতি সপ্তাহে তাঁহার দর্শন পাইতাম, তাঁহার সহাস্যবদনের অমিয়মধুর কথা শুনিতাম, তাঁহার সরল প্রকৃতিতে আকৃষ্ট হইতাম। কৈশোরের সেই ভক্তির অঙ্কুর যৌবনের প্রারম্ভেই শাখাপ্রশাখাসমন্বিত পাদপে পরিণত হইল।

আমরা কলেজ ছাড়িতে না ছাড়িতে, শ্যামনগরে রেলগাড়ির সঙ্ঘর্ষণব্যাপার লইয়া মহাগণ্ডগোল হইল। প্যারীবাবু নিজসম্পাদিত এডুকেশন গেজেট পত্রে এই দুর্ঘটনার যেরূপ ভাবে আলোচনা করিলেন, এবং পরে যেরূপ ভাবে ঐ পত্রের সম্পাদকতা ত্যাগ করিলেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের কঠোর অংশ দেখিয়া তাঁহার উপর ভক্তি আরও দৃঢ়ীভূত হইল। পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তিনি সরলে কোমল—এখন বুঝিলাম, তিনি আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য কঠোর দৃঢ়ব্রত এবং স্বপদে নির্ভর করিতে সক্ষম। (গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে জীবনবৃত্তের এই ভাগ পরিস্ফুট হইয়াছে।)

১২৮২ সালের ১৫ই আশ্বিন ৫০বর্ষ বয়সে প্যারীবাবু মানবলীলা সংবরণ করেন। কার্ত্তিকমাসে আমরা সাধারণীতে লিখিয়াছিলাম:—

"আজিকালি এমনই কাল পড়িয়াছে যে, যথার্থ ভদ্রলোকের উন্নতি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দেবাসুরের সেবা না করিয়া এই বিচিত্র ক্ষেত্রে কৃতিত্বলাভ করা অতীব সুকঠিন। এখন প্রকৃত ভদ্রলোককে প্রায়ই নিস্তেজ, নির্জীব ও নিষ্প্রভ

হইয়া কালাতিপাত করিতে হয়। এ হেন সংসারে, এ হেন সময়ে, প্যারীবাবু অতি ভদ্রলোক হইয়াও নামযশ লাভ করিয়াছিলেন। সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, কৃতিত্ব উপার্জ্জন করিয়াছেন। প্যারীবাবু ভদ্রলোকের ভরসা, দেশের যথার্থ মুখোজ্জলকারী। প্যারীবাবু আমাদের ভদ্রতার জয়পতাকা ছিলেন। আমরা এই বয়সে ভদ্রতায় ভর করিয়া সংসারের সহিত যে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহাতে বাবু প্যারীচরণকে সেই সমরক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে একজন শক্তিধর সেনানীরূপে বরণ করিয়াছিলাম। তাঁহাকে হারাইয়া আমরা আজি একজন নেতার অভাব উপলব্ধি করিতেছি। আমাদের এই শোকাবেগের কে শান্তিসাধন করিবে ?

"১৮২২ সালে বাবু প্যারীচরণ সরকার জন্মপরিগ্রহ করেন। ৫৩বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি হেয়ারসাহেবের স্কুলে সাহেবের অতি প্রিয়ছাত্র ছিলেন। ক্রমে হিন্দুকলেজে ৪০ টাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ মধ্যে বাষ্পবলে নৌচালনসম্বন্ধে প্যারীবাবু একটি প্রবন্ধ লেখেন, তৎকালে তাহা বিলাত পর্য্যন্ত সমাদৃত হইয়াছিল। কিছুদিন পরে প্যারীবাবু আমাদের হুগলী ব্রাঞ্চ বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক হইয়া আসেন; এখান হইতে বারাসতের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান; সেই অবধি বারাসতের প্রসিদ্ধ মিত্রগোষ্ঠীর সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ। বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র, বাবু নবীনকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতির সহিত একত্র হইয়া, এক যোগে এক পরামর্শে অনেক সদনুষ্ঠানে ব্রতী হয়েন। বারাসতের উন্নতির মূল এই সকল মহাত্মারা।

"বারাসত হইতে প্যারীবাবু কলিকাতা হেয়ার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হইয়া যান। সকলেই জানেন, তাঁহার সময়ে হেয়ারস্কুল (বা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল) বাঙ্গালার সকল বিদ্যালয়ের মধ্যে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে। ক্রমে গবর্ণমেণ্ট প্যারীবাবুর যোগ্যতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে শ্রেণীভুক্ত কর্ম্মচারী করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের সহকারিইংরাজি-অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করেন। প্যারীবাবু এই সম্মানের কর্ম্ম গৌরবে সাধন করিতে করিতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

"প্রথমপাঠোপযোগী ইংরাজী গ্রন্থসকল প্যারীবাবুকর্ত্তৃক সঙ্কলিত। বিনা অনুরোধে সেই সকল গ্রন্থ আমাদের বাঙ্গালার বিদ্যালয়সমস্তে প্রচলিত হইয়াছে। কলিকাতার হিন্দু হোষ্টেল প্যারীবাবুর স্থাপিত। এরূপ ছাত্রাবাস এখন গবর্ণমেণ্টের অনুমোদিত হইয়াছে। প্যারীবাবুর সদনুষ্ঠানের সুফল এখন সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হইবে।

"মদ্যপাননিবারিণী সভার প্রতিষ্ঠাতা প্যারীবাবু। তাঁহার উদ্যোগে কতশত অন্ধ যুবক অকাল নরকভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছে। অনন্তকাল অনন্তধামে প্যারীবাবুর এই সকল কীর্ত্তির কীর্ত্তন হইবে।"

প্যারীবাবুকে আমরা অন্তরের সহিত ভক্তি করি; তাঁহার প্রতিমূর্ত্তিচিত্র শয়নঘরে

রাখিয়াছি—প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে দেখিয়া থাকি।

প্যারীবাবুর কীর্ত্তি প্রচুর; কিন্তু তথাপি তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি তাঁহার চরিত্র। এখনকার দিনে কীর্ত্তিমন্তের চরিত্র প্রায়ই বিচিত্র। তাঁহারা ধন-জন-ঐশ্বর্য্য-সম্মুখে নতশিরে জানু পাতিয়া বসিয়া দক্ষিণ হস্তে সেই পরমপুরুষসকলের পদসেবা করিতেছেন, আর স্ব্যুজপৃষ্ঠোপরি বৃহৎ ঢক্কা লইয়া বামহস্তে নিয়ত তাহাই ঘোরতর শব্দিত করিয়া ইতরভদ্র সকলকে স্তম্ভিত বিক্ষুব্ধ করিতেছেন। কিন্তু প্যারীবাবুর চিত্র অন্যরূপ, তিনি সোজা দাঁড়াইয়া কর্ত্তব্যপথে ধীরে গম্ভীরে চলিয়াছিলেন। তাঁর না ছিল ঢাক, না ছিল জাঁক। তাহাতেই বলিয়াছিলাম, তিনি-ভদ্রলোকের শক্তিধর সেনানী। তাঁর সহজ সতেজ সরল চরিত্রই তাঁহার প্রধান বল; তাঁহার চরিত্রই তাঁহার প্রধান সহায়; আর তাঁর চরিত্রই তাঁর প্রধান কীর্ত্তি।

আবার বলি, নবকৃষ্ণবাবু এমন জীবনবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া নিজে ধন্য হইয়াছেন, এবং স্বদেশীয়ের সদ্দৃষ্টান্ত বঙ্গীয় ছাত্রবৃন্দের সম্মুখে ধরিয়া অন্যকে ধন্য হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন।

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার।

সার সত্যের আলোচনা।

শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

গতবারের আলোচনায় আছি'র সহিত আছি'র ঐক্যের কথা যাহা বলা হইয়াছিল, তাহা সত্তা-ঘটিত ঐক্য। এখন দেখিতে হইবে এই যে, সেই সত্তা-ঘটিত ঐক্যের ভিতরে আর-দুইপ্রকার ঐক্য সম্ভুক্ত রহিয়াছে;—একটি হ'চ্চে শক্তি-ঘটিত ঐক্য; আর-একটি হ'চ্চে জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য।

শক্তি-ঘটিত ঐক্য কি?—না, কর্ত্তা-কর্ম্মের ঐক্য। জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য কি?—না, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য। আমি এবং তুমি উভয়ে যখন সম্মুখাসম্মুখি দণ্ডায়মান থাকিয়া পরস্পরের চক্ষুর উপরে কার্য্য করিতেছি, তখন আমার কার্য্যের তুমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং তোমার কার্য্যের তুমি কর্ত্তা; তথৈব তোমার কার্য্যের আমি কর্ম্মক্ষেত্র, এবং আমার কার্য্যের আমি কর্ত্তা। এরূপ অবস্থায় তুমিও যেমন, আমিও তেমনি, উভয়েই কর্ত্তা এবং কর্ম্ম দুইই একাধারে। ইহারই নাম কর্ত্তাকর্ম্মের ঐক্য। তেমনি আবার, তোমার জ্ঞানের তুমি জ্ঞাতা, আমি জ্ঞেয়; আমার জ্ঞানের আমি জ্ঞাতা, তুমি জ্ঞেয়। উভয়েই আমরা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইই একাধারে। ইহারই নাম জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ঐক্য।

উভয়াত্মক ঐক্যের সুস্পষ্টরূপে ঠিকানা-নির্দ্দেশ করিবার জন্য দুই আমিকে দুই দিক্ হইতে যোটপাট করিয়া আনিয়া মুখামুখি দাঁড় করানো হইল। কিন্তু দুই আমিকে

দুই দিক্ হইতে ডাকিয়া আনা বাড়া'র ভাগ ;—এক আমি'র ভিতরেই আমি এবং তুমি, এই দুই আমি মুখামুখি দণ্ডায়মান, আর, সেই সঙ্গে দোঁহার মধ্যে শক্তি-ঘটিত এবং জ্ঞান-ঘটিত ঐক্য সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। তার সাক্ষী—রামপ্রসাদের এই একটি গীত :—

"মন তুমি কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-জমিন্ রৈল প'ড়ে,
আবাদ ক'রে ফ'লতো সোণা।"

এখানে এক আমি'র ভিতরে দুই আমি'র অর্থাৎ আমি এবং তুমি'র, দোঁহার সহিত দোঁহার বোঝাপড়া চলিতেছে।

কর্ত্তাকর্ম্মের ঐক্য।

মনে কর, একজন গায়ক গান করিতেছে। গাওনা হ'চ্চে একটি ক্রিয়া, তাহার মূল হ'চ্চে গায়ক স্বয়ং এবং তাহার ফল হ'চ্চে গীতধ্বনি। এইরূপ যে মূল এবং ফল, কর্ত্তা এবং কর্ম্ম, দুয়ের ঐক্য ব্যতিরেকে গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে না। গাওনা-ক্রিয়ার বীজ গায়কের কণ্ঠনলীর পথ দিয়া অঙ্কুরিত হয়, এবং গাওনা-ক্রিয়ার ফল গায়কের শ্রবণেন্দ্রিয়ের পথ দিয়া ফলিত হয়। দুই পথই উন্মুক্ত থাকা চাই, তবেই গাওনা-ক্রিয়া চলিতে পারে। যদি গায়কের শ্রবণদ্বারে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও যেমন ; আর যদি কণ্ঠনলীতে কপাট পড়িয়া যায়, তাহা হইলেও তেমনি ; দুয়ের একটিতে কপাট পড়িলেই গাওনা-ক্রিয়া তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া যায়। এখন জিজ্ঞাস্য এই—কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার বীজাধান হইয়াছে, আর, কোন্‌খানেই বা গাওনা-ক্রিয়ার ফলাধান হইতেছে ? স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ রোপিত হইয়াছে, গায়কের অন্তঃকরণ হইতেই গাওনা-ক্রিয়ার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে, গায়কের অন্তঃকরণেই গাওনা-ক্রিয়ার ফল ফলিত হইতেছে। একই অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল একযোগে অভিব্যক্ত হইয়া একীভূত হইয়া যাইতেছে ; আর, সেই কারণে গায়কের মনে দুইভাবের আনন্দ গঙ্গাযমুনার ন্যায় দুই দিক্ হইতে আসিয়া দুয়ে মিলিয়া এক আনন্দে পরিণত হইতেছে ; এক ভাবের আনন্দ হ'চ্চে কর্ম্মানন্দ, আর-এক ভাবের আনন্দ হ'চ্চে ভোগানন্দ। কর্ম্মানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্চে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বস্ফূর্ত্তি, ভোগানন্দের সাক্ষাৎ কারণ হ'চ্চে কর্ম্মের ফলাস্বাদন। গীতধ্বনির উৎসারণে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব স্ফূর্ত্তি পাইতেছে, গীতধ্বনির রসাস্বাদনে কর্ম্মের ফল ফলিত হইতেছে। গায়কের অন্তঃকরণে গাওনা-ক্রিয়ার বীজ এবং ফল (কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মের ফল) একীভূত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মানন্দ এবং ভোগানন্দ একীভূত হইয়া যোগানন্দে পরিণত হইতেছে। বলিলাম "যোগানন্দ" ! তাহার অর্থ আর-কিছু না—কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব-স্ফূর্ত্তি এবং কর্ম্মের ফলভোগ, এই দুয়ের যোগজনিত আনন্দ। ফলেও এইরূপ দেখা যায় যে, গায়ক যখন ভাবে মশ্‌গুল্ হইয়া গান করে, তখন গাওনা-ক্রিয়ার কর্ত্তা যিনি গায়ক, এবং গাওনা-ক্রিয়ার কর্ম্ম যে গীতধ্বনি,- দুয়ের মধ্যে ব্যবধান বিলুপ্ত হইয়া গিয়া দুয়ে মিলিয়া এক হইয়া যায়। এমন কি, তেমন একজন প্রতিভাশালী গায়ক যখন

চতুর্দ্দিকের শ্রোতৃমণ্ডলীর সহিত একাত্মা হইয়া গান করেন, তখন শ্রোতৃমণ্ডলী মনে মনে তাঁহার সহিত গানকার্য্যে যোগ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না; আর, তাহাতে রঙ্গশালা দেখিতে হাথায় এইরূপ—যেন সমস্ত মণ্ডলী একই গায়ক এবং একই শ্রোতা, এবং প্রত্যেক শ্রোতা যেন সমস্ত মণ্ডলী একাধারে। এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় এক গায়ক একশত শ্রোতার সঙ্গে মিলিয়া একা একশত হইয়া আপনার গানের আপনি রসাস্বাদন করে, এবং একশত শ্রোতা এক গায়কের সঙ্গে মনে মনে গানে যোগ দিয়া এক গায়ক হইয়া উঠে; কাচপোকার প্রভাবে আর্সুলা যেমন কাচপোকা হইয়া উঠে, একের প্রভাবে অনেকে তেমনি এক হইয়া উঠে। কর্ত্তা-কর্ম্মের মধ্যে এ যেমন দেখিতে পাওয়া গেল—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যেও উভয়াত্মক ঐক্যের স্ফূর্ত্তি ঠিক্ সেইরূপই দেখিতে পাওয়া যায়।

জ্ঞাতা-জ্ঞানের ঐক্য।

গায়ক যখন গান করিতেছে, তখন গায়ক জানিতেছে যে, আমিই গান করিতেছি। এরূপ স্থলে গায়ক কাহাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে? জ্ঞেয় কে? গায়ক আপনাকেই গায়ক বলিয়া জানিতেছে—গায়ক আপনিই জ্ঞেয়। কে আপনাকে গায়ক বলিয়া জানিতেছে—জ্ঞাতা কে? গায়ক আপনিই জ্ঞাতা। গায়ক আপনিই জ্ঞেয়, আপনিই জ্ঞাতা। তা ছাড়া, গায়ক যখন গীতরসের বিদ্যুৎপ্রবাহে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনকে গলাইয়া আপনার মনের সহিত একীভূত করিয়া ফ্যালে, তখন গায়কের জ্ঞানে আপনি এবং আপনার শ্রোতৃমণ্ডলী, এ দুয়ের মধ্যস্থিত প্রভেদের প্রাচীর ভগ্ন হইয়া গিয়া জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক ঐক্য সমস্ত ঘরময় ব্যাপিয়া স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এইরূপ যখন উভয়াত্মক ঐক্য স্ফূর্ত্তি পায়—কর্ত্তাকর্ম্মের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায় · জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের মধ্যে স্ফূর্ত্তি পায়, তখন সে ঐক্য কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা যাহা ইতিপূর্ব্বে প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হইয়া উঠে? বারান্তরে এ প্রশ্নের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।*

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* পাঠকবর্গের প্রতি নিবেদন।—গ্রীষ্মের প্রকোপবশত সার সত্যের আলোচনা গতমাসে ফাঁক দেওয়া হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান মাসে তাহার আয়তন হ্রস্বীকৃত হইল। খণ্ড খণ্ড প্রবন্ধপরম্পরার মধ্যে কিরূপ যোগসূত্র চলিতেছে, তাহার সন্ধান পাইবার জন্য পাঠক ব্যস্ত হইবেন না। গমাস্থানের যতই নিকটবর্ত্তী হওয়া যাইবে, ততই সমস্তের সহিত সমস্তের যোগ স্পষ্টাকারে অভিব্যক্ত হইতে থাকিবে—এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকুন্। লেখক।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

নিরদ-নীরজা।—শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আট আনা।

এখানি নাটক; কেন না, ইহা কথোপকথনের আকারে লিখিত। বোধ করি আমাদের ইহা একটা রোগ দাঁড়াইয়াছে যে, কথোপকথনের হিসাবে ছাইভস্ম লিখিয়া আমরা মনে করি যে, নাটক প্রণয়ন করিলাম। পুস্তকখানি শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উৎসৃষ্ট করা হইয়াছে। গ্রন্থকার বাঙ্গলা-ভাষা, কি রবীন্দ্রবাবু, কাহার উপর অধিক অত্যাচার করিয়াছেন, বলা যায় না।

নেপোলিয়ান বোনাপার্ট।—শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায় প্রণীত। মূল্য ৬৲ ছয় টাকা।

জগতে গৌরবলাভ করিতে যাঁহারা সমর্থ হন, তাঁহাদের শত্রুও থাকে, মিত্রও থাকে। নেপোলিয়ানের জীবনচরিত শত্রুতেও লিখিয়াছে, মিত্রতেও লিখিয়াছে। মিত্রের লেখা জীবনচরিতই ভাল হয়। তাহার কারণ এই যে, যেখানে সহানুভূতি নাই, সেখানে চিত্রসৌন্দর্য্য হইতে পারে না। পৃথিবীতে যত জীবনচরিত লিখিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বোধ হয় যে বস্‌ওয়েল্‌-লিখিত জন্‌সনের জীবনচরিতই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমাদের দেশেও তাহার পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত বাবু শিশিরকুমার ঘোষের অমিয় নিমাইচরিতের ঐতিহাসিক মূল্য কিছুমাত্রই নাই, কিন্তু পড়িতে অতি উপাদেয়। যেখানে ভক্তি নাই, সেখানে জীবনচরিত লিখিত হইতে পারে না। জীবনচরিত কেবল ভক্তেই লিখিতে পারে।

আবট্‌সাহেব শুধু ভক্ত নহেন, তিনি অন্ধ উপাসক। নেপোলিয়ানের যে কার্য্য কিছুতেই সমর্থন করা যায় না, তাহাও তিনি সমর্থন করিয়াছেন। এতটুকু বুঝিবার ক্ষমতাও তাঁহার হয় নাই যে, জোশেফিনের পরিত্যাগ তাঁহার রাজ্যনাশের একটা কারণ। এমন কি, জোশেফিন্‌কে পরিত্যাগ করা যতটুকু সমর্থিত হইতে পারে, তাহা তিনি করিয়াছেন। তথাপি তাঁহার লিখিত পুস্তক উপাদেয় হইয়াছে।

নেপোলিয়ান যে অসাধারণধীশক্তিসম্পন্ন ও প্রতিভাশালী ছিলেন, এ কথা আমরা স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহাকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। যে দিন ফ্রান্স তাঁহার হাতে আসিয়াছিল, ফ্রান্সকে তিনি সে অবস্থায়ও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। আসিয়া যাহা পাইয়াছিলেন, যাইবার সময় ফ্রান্স তদপেক্ষা ক্ষীণতর, দুর্ব্বলতর, নিঃস্বতর। ইঁহাকে মহাপুরুষ বলিতে পারি না। আবট্‌সাহেব ইঁহাকে মহাপুরুষরূপে পরিচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে পাই যে, নেপোলিয়ানের জীবনচরিতের মধ্যে

এই পুস্তকখানিরই আদর আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভক্তের লেখা বলিয়াই ইহা আদৃত হইবার উপযুক্ত।

দীনেন্দ্রকুমারবাবু অনুবাদ করিয়াছেন মাত্র। পুস্তকের যাহা কিছু দোষ, তাহা আবট্‌সাহেবের, দীনেন্দ্রবাবুর নহে। এ কথা আমরা স্বীকার করিতেছি, অনুবাদ ভালই হইয়াছে। তবে দুইএকস্থলে এমন ভুল আছে, যাহা থাকা উচিত ছিল না। তাঁহার পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, "তিনি ইউজিন্ ও হরতেন্স নামক পুত্রদ্বয় লইয়া।" দীনেন্দ্রবাবুর মত উপযুক্ত লোকের জানা উচিত ছিল যে, হরতেন্স কন্যা, পুত্র নহে। এমন ভুল আরও দুই-একটা থাকিলেও এ পুস্তকের মোটের উপর প্রশংসা করিতেছি এবং বলিতেছি যে, ইহা সমাদৃত হইবার উপযুক্ত।

রঞ্জিনা।—শ্রীসুরমাসুন্দরী ঘোষ প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই গ্রন্থকর্ত্রীর আর একখানি কবিতা-পুস্তকের সমালোচনাস্থলে এই 'বঙ্গদর্শনেই' তাঁহার ভাষা ও ভাব, উভয়েরই প্রশংসা করিয়াছিলাম। এই পুস্তকের সমালোচনায় সেই প্রশংসা গাঢ়তর করিয়া করিতে পারি। ভাষা প্রাঞ্জলতর, স্ফুটতর হইয়াছে; ভাব গভীর-তর, উদারতর হইয়াছে; উচ্ছ্বাস চিন্তিততর, সংযততর হইয়াছে; সুতরাং বলিতে হয় যে, 'সঙ্গিনীতে' যে ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়, এই পুস্তকে তাহা অধিকতর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে—অধিকতর পরিণত ও বিকশিত হইয়াছে। দুইএকটি কবিতার কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া আমরা বুঝাইতেছি।

জ্ঞানবৃদ্ধ ধর্ম্মরত ব্রাহ্মণ ব্রতহোমাদি পুণ্যানুষ্ঠানে নিরত থাকিয়া জীবনযাপন করেন। একদিন প্রভাতে এক ম্লেচ্ছ ভিখারিণী তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত। প্রভাতে অপবিত্র মূর্ত্তি দেখিয়া ক্রোধান্ধ ব্রাহ্মণ কমণ্ডলু লইয়া ভীতিবিহ্বলা ভিখা-রিণীকে তাড়না করিলেন। কল্যাণী ব্রাহ্মণী কিন্তু সেই অনাথাকে আদর করিয়া, তাহার হাত ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, তাহার ভিক্ষা-পাত্র পূর্ণ করিয়া দিয়া তাহাকে বিদায় করি-লেন। তখন—

"বিপ্র উঠে গরজিয়া—
ছুঁইলি যবনী?—ত্যাজ্যা তুই আজ হ'তে,
যাবৎ না হ'স শুদ্ধ ফিরি পথে পথে
পুণ্য কাশীবাসে?—ব্রাহ্মণী কহিলা হাসি—
পতিপূজা দীনসেবা, তাই মোর কাশী!"

কি সুন্দর, উদার, মনোহর ভাব! কোন পুরুষকবি লিখিলেও ইহা প্রশংসার্হ হইত; উচ্চজাতীয় হিন্দুমহিলা যে চিরপোষিত সংস্কারের কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিয়া এমন উদারতায় উপনীত হইতে পারিয়াছেন, তাহাতে ভাবের উপাদেয়তা শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। যেখানে যাহা প্রত্যাশা করা যায় না, সেখানে তাহা পাইলে বড়ই আহ্লাদ হয়।

'নির্ব্বাসিতা সীতা' শীর্ষক কবিতাটি বড়ই সুন্দর হইয়াছে। লক্ষ্মণ যখন রাম-চন্দ্রের কঠোর আজ্ঞা নিবেদন করিলেন, তখন সীতা মূর্চ্ছাও গেলেন না, ভাঙিয়াও পড়িলেন না। মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সতী-গর্ব্ব, নিরপরাধে দণ্ডিতার অভিমান, জ্বলিয়া উঠিল। তিনি লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

আপনার মন্দভাগ্য, জেনো, নাহি গণে
নির্ব্বাসিতা সীতা। ভাবিতেছি শুধু মনে—
ধর্ম্ম কি সহিবে, হায়, আজি অকারণে
রাজহস্তে অপমান ?"

বড় ভয়ঙ্কর কথা; কিন্তু ইহাই স্বাভাবিক। বিনা মেঘে বজ্রপাতের ন্যায় অকস্মাৎ এই নিদারুণ নির্ব্বাসনাজ্ঞা শুনিয়া সীতা যদি কিছুমাত্র বিচলিতা না হইতেন, তাহা হইলেই অসঙ্গত ও অস্বাভাবিক হইত। এই স্থলে ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উপরের কয় ছত্রে রামচন্দ্রের উদ্দেশে সীতা কেবল 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন —'স্বামী' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। কিন্তু ক্ষণমধ্যেই সীতা আত্ম-সংবরণ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন 'রাজা' প্রায় ডুবিয়া গেল; 'স্বামীই' প্রবল হইল। সীতা বলিলেন—

"ব'লো আর্য্যপুত্রপদে দীনা জানকীর
এই নিবেদন,—রাজা তিনি, তিনি স্বামী;
তাঁর কিছু নাহি দোষ; অভাগিনী আমি!
শুনেছি অনলে স্বর্ণ ধরে উজ্জ্বলতা;
স্বর্ণ নহি—ঘুচিল না নিন্দা-মলিনতা;
কিন্তু না হইনু ছাই! তাঁহার সন্তান
ধরেছি যে গর্ভে আমি, যদি থাকে প্রাণ,
পিতৃগুণে বিমণ্ডিয়া তুলিব বাছারে।
আর এক কথা আছে, বলিও তাঁহারে—
সাধিব দুশ্চর তপ ল'য়ে মনস্কাম,
জন্মে জন্মে পতি যেন হ'ন মোর রাম!"

ইহার সৌন্দর্য্য ধ্যানগম্য, বচনীয় নহে। আমাদের বর্ত্তমান বাজারে কবিদিগের হাতে পড়িলে সীতা যে এই স্থলে কত 'হা হতাস্মি, হা দগ্ধাস্মি' করিতেন; কত যে বক্ষে করাঘাত, কেশোৎপাটন, ভূপতন, মূর্চ্ছা প্রভৃতির অবতারণা হইত, তাহা মনে করিলে বিভীষিকার সঞ্চার হয়—কিন্তু একবিন্দু করুণরসের সঞ্চার হইত না। আর উপরকার এই কয় ছত্রে কত যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা, কত যে সতীত্বের গৌরব, কত যে স্বামিভক্তি, কত যে আত্ম-বিসর্জ্জনের সঙ্গে আত্মপ্রতিষ্ঠা ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া বুঝিতে হইবে, আমরা বলিয়া বুঝাইতে অসমর্থ।

'বঙ্গজননী' শীর্ষক কবিতা হইতে আরও একটু উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই সমালোচনা শেষ করিব।

"তাই ত ধিক্কার উঠে
হৃদয়মাঝারে,
মা যাহারে ছেড়ে আছে,
মিছে গর্ব্ব তার!
তাই ছিন্ন হীনবল, তোমার সন্তানদল!
নাই শক্তি ভক্তি, নাই মান-অপমান;
আছে শুধু সভ্যতার লক্ষকোটি ভাণ!"

পুরুষের হাতে এমন লাঞ্ছনা আমরা অনেক পাইয়াছি, এবং ভাল ছেলের মতন অম্লানবদনে হজম করিয়া ফেলিয়াছি—চৈতন্য হয় নাই, ধিক্কার হয় নাই। আজ স্ত্রীলোকের নিকটও লাঞ্ছিত হইয়া ধিক্কার হইবে কি ?

ভাষাগত প্রাদেশিকতা দুইএক স্থানে লক্ষ্য করিয়াছি। দুইএকটা কবিতা আবেগশূন্য; দুইএকটা কবিতা পূর্ব্বপ্রকাশিত কবিতার প্রতিধ্বনিমাত্র। কিন্তু যে পুস্তক পড়িয়া আনন্দলাভ করিয়াছি, তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষ ধরিব না!

হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র।—শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায়, ওরফে বি, এন্, রায় প্রণীত। মূল্য কাগজে ১৷৷০ দেড় টাকা, ঐ বাঁধাই ২৲ দুই টাকা।

পুস্তকখানি খুব বৃহৎ না হইলেও, ক্ষুদ্র নহে। সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় তিনশত পাতা।

কাগজ ভাল, অক্ষর ভাল, ছাপা ভাল—অর্থব্যয়ের যে ত্রুটি হয় নাই, ইহা সহজেই অনুমেয়। টাকাটা যে জলে ফেলা হইয়াছে, দিল্লীর দরবারের পর এমন কথা বলিতে আমরা অসমর্থ। যাহার নাই, সে-ও যখন ধার করিয়া জলে ফেলিতে পারে, তখন, যাহার আছে, বা আছে বলিয়াই আমরা ধরিয়া লইতে পারি, সে কেন পারিবে না? শ্রীযুক্ত বিশ্বনিন্দুক রায় মহাশয় অর্থশালী বটেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। হউন, বা, না হউন, তিনি মহাজনের—আমাদের দেশের মহাজন—পদানুসরণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অবলম্বিত পথকে কুপথ বলা চলে না।

গ্রন্থের নাম দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, ইহাতে বিজ্ঞানের কোন কথা আছে, তাহা হইলে তিনি নিজে ত ভুল করিবেনই, তদ্ব্যতীত গ্রন্থকারের উপর অবিচার ও অত্যাচার করা হইবে। তবে, এই পুস্তকে ষাট্ বা ততোধিক পাতা ব্যাপিয়া গ্রন্থকারের বংশের যে যেখানে আছেন, তাঁহাদের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থকারের নিজের কথার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত যে—ইহা অবিসংবাদিত সত্য। এই তথ্যের জন্য যদি পুস্তকখানিকে বিজ্ঞান বলিতে হয়, তাহাতে আপত্তি করিবার কোন কারণ ত দেখা যায় না।

গ্রন্থকার শেষে লিখিয়াছেন—"পাঠকবৃন্দকে প্রণাম, নমস্কার, আশীর্ব্বাদ ইত্যাদি। হিন্দু বিজ্ঞানসূত্র সমাধা হইল।" আমাদেরও ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল।

এই গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে একটা কথা আমাদের বারবার মনে হইয়াছে, গ্রন্থকারের মস্তিষ্কের কোন বিকৃতি নাই ত? আমাদের অনুমানটা সত্য কি না, গ্রন্থকারের বন্ধুবান্ধব ও পরিচিতেরা তাহা নির্ণয় করিবেন। গ্রন্থকার যদি বর্ত্তমান বঙ্গের গ্রন্থকারদিগের অধিকাংশের নজির দেখাইয়া প্রমাণ করাইতে চান যে, মস্তিষ্কবিকৃতিই গ্রন্থকারের প্রধান লক্ষণ, তাহা হইলে আমরা যে নিরুত্তর হইব, তাহার আর সন্দেহ নাই। কারণ—

এক ভস্ম, আর ছার
দোষগুণ কব কার!"

নৈবেদ্য।—শ্রীজলধর সেন প্রণীত। মূল্য ৷৷০ আট আনা।

এই পুস্তকখানি কয়েকটি ক্ষুদ্র গল্পের সমষ্টি। গল্পগুলিতে বৈচিত্র্য নাই বটে; কিন্তু সরসতা বিলক্ষণ আছে। ঘটনাবৈচিত্র্য না থাকিলেও, গল্পগুলি পড়িতে কোথাও একটুমাত্র ইতস্তত করিতে হয় না—সহজে পড়িয়া যাইতে হয়, এবং আন্তরিকতার সহিতই পড়িয়া যাইতে হয়। "অন্ধের কাহিনী"টি আমাদের বড়ই সুন্দর লাগিয়াছে। যিনি এমন মিষ্ট করিয়া ছোট গল্প লিখিতে পারেন, তিনি বড় গল্প লেখেন না কেন?

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

১৬

প্রণয়ীদের জন্য কাব্যে যে সকল আয়োজনের ব্যবস্থা আছে, কলিকাতাসহরে তাহা মেলে না। কোথায় প্রফুল্ল অশোক-বকুলের বীথিকা, কোথায় বিকশিত মাধবীর প্রচ্ছন্ন লতাবিতান, কোথায় চূতকষায়কণ্ঠ কোকিলের কুহুকাকলী? তবু এই শুষ্ককঠিন সৌন্দর্য্যহীন আধুনিক নগরে ভালবাসার জাদুবিদ্যা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যায় না। এখানকার কঙ্করকঠোর পথে কর্ম্মচক্রের অবিশ্রাম ঘর্ঘরশব্দের মধ্যেও তাহার অপরূপ রাগিণী কেমন করিয়া বাজিয়া উঠে। এই গাড়িঘোড়ার বিষম ভিড়ে, এই লৌহ-নিগড়বদ্ধ ট্রামের রাস্তায় একটি চিরকিশোর প্রাচীন দেবতা তাঁহার ধনুকটি গোপন করিয়া লালপাগড়ি প্রহরীদের চক্ষের সম্মুখ দিয়া কতরাত্রে কতদিনে কতবার কত ঠিকানায় যে আনাগোনা করিতেছেন, তাহা কে জানিতে পারে!

রমেশ ও হেমনলিনী চামড়ার দোকানের সাম্‌নে মুদির দোকানের পাশে কলুটোলায় ভাড়াটে বাড়ীতে বাস করিতেছিল বলিয়া প্রণয়বিকাশসম্বন্ধে কুঞ্জকুটীরচারীদের চেয়ে তাহারা যে কিছুমাত্র পিছাইয়া ছিল, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। অন্নদাবাবুদের চা-রস-চিহ্নিত মলিন ক্ষুদ্র টেবিল্‌টি পদ্মসরোবর নহে বলিয়া রমেশ কিছুমাত্র অভাব অনুভব করে নাই। হেমনলিনীর পোষা বিড়ালটি কৃষ্ণসার মৃগশাবক না হইলেও রমেশ পরিপূর্ণ স্নেহে তাহার গলা চুল্‌কাইয়া দিত—এবং সে যখন ধনুকের মত পিঠ ফুলাইয়া আলস্যত্যাগপূর্ব্বক গাত্রলেহনদ্বারা প্রসাধনে রত হইত, তখন রমেশের মুগ্ধদৃষ্টিতে এই প্রাণীটি গৌরবে অন্য কোন চতুষ্পদের চেয়ে ন্যূন বলিয়া প্রতিভাত হইত না। দোতলার বসিবার ঘরে বেতের এবং কাঠের জীর্ণ এবং নূতন প্রত্যেক চৌকি-কেদারা সহকারমাধবীকুঞ্জেরই মত রমেশের মনে মোহাবেশ সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিল।

সূর্য্যাস্তের পর হেমনলিনী ছাদে উঠিয়া পদচারণা করিত। রমেশের পক্ষে গোলদীঘি, ইডেন্‌গার্ড্‌ন্‌, গঙ্গাতীর, সমস্তই সুগম ও অবারিত ছিল, তবু নিজের বাসাবাড়ীর সঙ্কীর্ণ ছাদের হাওয়াই তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। দুই ছাদের

মধ্যে কিছু ব্যবধান ছিল, কিন্তু সায়াহ্নের আকাশ এই দুই ছাদের দুটি নরনারীর মাথার উপরে শুভদৃষ্টির একটিমাত্র নীলাঞ্চল প্রসারিত করিয়া ধরিত। দুই ছাদে দুইটি হৃদয় জ্যোতিষ্কসভাতলে অনন্তকালের মূক-সাক্ষী গ্রহতারকাদের অনিমেষনেত্রের সম্মুখে নীরবে মিলনের আসন গ্রহণ করিত।

হেমনলিনী পরীক্ষা পাস্ করিবার ব্যগ্রতায় সেলাইশিক্ষায় বিশেষ পটুত্ব লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন হইতে তাহার এক সীবনপটু সখীর কাছে একাগ্রমনে সে সেলাই শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেলাইব্যাপারটাকে রমেশ অত্যন্ত অনাবশ্যক ও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করে। হেমনলিনীকে সে বরাবর সাহিত্যদর্শনের চর্চ্চা করিতেই দেখিয়া আসিয়াছে, সেই ছবিটাই তাহার মনে অঙ্কিত হইয়া গেছে,—সাহিত্যে-দর্শনে হেমনলিনীর সঙ্গে তাহার দেনা-পাওনা চলে—কিন্তু সেলাইব্যাপারে রমেশকে দূরে পড়িয়া থাকিতে হয়। এইজন্য সে প্রায়ই কিছু অধীর হইয়া বলিত, "আজ-কাল সেলাইয়ের কাজ কেন আপনার এত ভাল লাগে! ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তির কোন চর্চ্চা হয় না, কেবল একঘেয়ে কাজে যন্ত্রের মত আঙুল চালাইয়া যাইতে হয়। যাহাদের সময় কাটাইবার আর কোন সদুপায় নাই, তাহাদের পক্ষেই ইহা ভাল।" হেমনলিনী কোন উত্তর না দিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে ছুঁচে রেশম পরাইতে থাকে। অক্ষয় তীব্রস্বরে বলে, "মেয়েরা কেবল মার্টিনোর এথিক্‌স্ এবং টেনিসনের কবিতা পড়িবে, যে সকল কাজ সংসারের কোন প্রয়োজনে লাগে, রমেশবাবুর বিধানমতে সে সমস্ত তুচ্ছ। মশায় যত বড়ই তত্ত্বজ্ঞানী এবং কবি হোন্ না কেন, তুচ্ছকে বাদ দিয়া একদিনও চলে না!" রমেশ উত্তেজিত হইয়া ইহার বিরুদ্ধে তর্ক করিবার জন্য কোমর বাঁধিয়া বসে; হেমনলিনী বাধা দিয়া বলে, "রমেশবাবু, আপনি সকল কথারই উত্তর দিবার জন্য এত ব্যস্ত হন্ কেন? ইহাতে সংসারে অনাবশ্যক কথা যে কত বাড়িয়া যায়, তাহার ঠিক নাই।"—এই বলিয়া সে মাথা নীচু করিয়া ঘর গণিয়া সাবধানে রেশমসূত্র চালাইতে প্রবৃত্ত হয়।

একদিন সকালে রমেশ তাহার পড়িবার ঘরে আসিয়া দেখে, টেবিলের উপর রেশমের ফুলকাটা মখমলে বাঁধানো একটি ব্লটিংবহি সাজানো রহিয়াছে। তাহার একটি কোণে "র" অক্ষর লেখা আছে, আর এক কোণে সোনালি জরি দিয়া একটি পদ্ম আঁকা। বইখানির ইতিহাস ও তাৎপর্য্য বুঝিতে রমেশের ক্ষণমাত্রও বিলম্ব হইল না। তাহার বুক নাচিয়া উঠিল। সেলাই-জিনিষটা যে বিশেষ অবস্থায় তেমন তুচ্ছ নহে, তাহা তাহার অন্তরাত্মা বিনা তর্কে, বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইল। ব্লটিংবইটা বুকে চাপিয়া-ধরিয়া সে অক্ষয়ের কাছেও হার মানিতে রাজি হইল। সেই ব্লটিংবই খুলিয়া তখনি তাহার উপরে এক-খানি চিঠির কাগজ রাখিয়া সে লিখিল—"আমি যদি কবি হইতাম, তবে কবিতা লিখিয়া প্রতিদান দিতাম, কিন্তু প্রতিভা হইতে আমি বঞ্চিত। ঈশ্বর আমাকে দিবার ক্ষমতা দেন নাই, কিন্তু লইবার ক্ষমতাও

একটা ক্ষমতা। আশাতীত উপহার আমি যে কেমন করিয়া গ্রহণ করিলাম, অন্তর্যামী ছাড়া তাহা আর কেহ জানিতে পারিবে না। দান চোখে দেখা যায়, কিন্তু আদান হৃদয়ের ভিতরে লুকানো! ইতি। চিরঋণী।"

এই লিখনটুকু হেমনলিনীর হাতে পড়িল। তাহার পরে এ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে আর কোন কথাই হইল না।

বর্ষাকাল ঘনাইয়া আসিল। বর্ষাঋতুটা মোটের উপরে সহুরে মনুষ্যসমাজের পক্ষে তেমন সুখকর নহে—ওটা আরণ্যপ্রকৃতিরই বিশেষ উপযোগী। সহরের বাড়ীগুলা তাহার রুদ্ধ বাতায়ন ও ছাদ লইয়া, পথিক তাহার ছাতা লইয়া, ট্রামগাড়ি তাহার পর্দ্দা লইয়া বর্ষাকে কেবলি নিষেধ করিবার ব্যর্থ চেষ্টায় ক্লেদাক্ত পঙ্কিল হইয়া উঠিতেছে। নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, প্রান্তর বর্ষাকে সাদর কলরবে বন্ধু বলিয়া আহ্বান করে। সেইখানেই বর্ষার যথার্থ সমারোহ—সেখানে শ্রাবণে দ্যুলোকভূলোকের আনন্দ-সম্মিলনের মাঝখানে কোন বিরোধ নাই।

কিন্তু নূতন ভালবাসায় মানুষকে অরণ্য-পর্ব্বতের সঙ্গেই একশ্রেণীভুক্ত করিয়া দেয়। অবিশ্রাম বর্ষায় অন্নদাবাবুর পাকযন্ত্র দ্বিগুণ বিকল হইয়া গেল, কিন্তু রমেশ-হেমনলিনীর চিত্তস্ফূর্ত্তির কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না। মেঘের ছায়া, বজ্রের গর্জ্জন, বর্ষণের কলশব্দ তাহাদের দুইজনের মনকে যেন ঘনিষ্ঠতর করিয়া তুলিল। মার্টিনো আর কোনমতেই চলিল না। সাহিত্যও আর অবাধে অগ্রসর হয় না, মাঝে মাঝে নানা বাজে কথা আসিয়া পড়ে। বৃষ্টির উপলক্ষ্যে রমেশের আদালতযাত্রায় প্রায়ই বিঘ্ন ঘটিতে লাগিল। একএকদিন সকালে এম্‌নি চাপিয়া বৃষ্টি আসে যে, হেমনলিনী উদ্বিগ্ন হইয়া বলে, "রমেশবাবু, এ বৃষ্টিতে আপনি বাড়ী যাইবেন কি করিয়া?" রমেশ নিতান্ত লজ্জার খাতিরে বলে, "এইটুকু বই ত নয়, কোনরকম করিয়া যাইতে পারিব।" হেমনলিনী বলে, "কেন ভিজিয়া সর্দ্দি করিবেন? এইখানেই খাইয়া যান না।" সর্দ্দির জন্য উৎকণ্ঠা রমেশের কিছুমাত্র ছিল না; অল্পেই যে তাহার সর্দ্দি হয়, এমন কোন লক্ষণও তাহার আত্মীয়-বন্ধুরা দেখে নাই, কিন্তু বর্ষণের দিনে হেম-নলিনীর শুশ্রূষাধীনেই তাহাকে কাটাইতে হইত,—দুইপামাত্র চলিয়াও বাসায় যাওয়া অন্যায় দুঃসাহসিকতা বলিয়া গণ্য হইত। কোনদিন বাদ্‌লার একটু বিশেষ লক্ষণ দেখা দিলেই হেমনলিনীদের ঘরে প্রাতঃকালে রমেশের খিচুড়ি এবং অপরাহ্নে ভাজাভুজি খাইবার নিমন্ত্রণ জুটিত। বেশ দেখা গেল, হঠাৎ সর্দ্দি লাগিবার সম্বন্ধে ইহাদের আশঙ্কা যত অতিরিক্ত প্রবল ছিল, পরিপাকের বিভ্রাট-সম্বন্ধে ততটা ছিল না।

এম্‌নি করিয়া দিন কাটিতে লাগিল। এই আত্মবিস্মৃত হৃদয়াবেগের পরিণাম কোথায়, সে কথা রমেশ স্পষ্ট করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু অন্নদাবাবু ভাবিতেছিলেন এবং তাঁহাদের সমাজের আরো পাঁচজন আলোচনা করিতেছিল। অন্নদাবাবু মনে মনে তাঁহার কন্যার উপর একটু বিরক্ত হইতেছিলেন; ভাবিতেছিলেন, হেমনলিনীর উচিত, এই চা-পান ও খিচুড়িসেবনকে সুকৌশলে বিবাহের নিমন্ত্রণযজ্ঞের মধ্যে

আকর্ষণ করিয়া আনে। কিন্তু অবোধ বালিকার সে সম্বন্ধে কোন তৎপরতা দেখা যাইতেছে না। একে রমেশের পাণ্ডিত্য যতটা, কাণ্ডজ্ঞান ততটা নাই, তাহাতে তাহার বর্ত্তমান মুগ্ধ অবস্থায় তাহার সাংসারিক বুদ্ধি আরো অস্পষ্ট হইয়া গেছে। অন্নদাবাবু প্রত্যহই বিশেষ প্রত্যাশার সহিত তাহার মুখের দিকে চান, কিন্তু কোন জবাবই পান না।

১১

বিবাহের দিনে বরকনে যেমন রাজমর্য্যাদা লাভ করে—যে দুটি নরনারী পরস্পরকে ভালবাসিতেছে, প্রকৃতির কাছে তাহাদের আদর তেম্‌নি। তাহারা রাজা,— সূর্য্যচন্দ্রতারা বিশেষ করিয়া তাহাদের জন্য আলো জ্বালে, এবং বিশ্বের সমস্ত সঙ্গীত বিশেষরূপে তাহাদেরই কর্ণ লক্ষ্য করিয়া নহবৎ জমাইয়া তোলে। ইচ্ছুক অনিচ্ছুক সকলেরই কাছ হইতে ইহারা আপনাদের রাজকরটুকু আদায় করিয়া নেয়। হতভাগ্য অক্ষয়কেও এই নব প্রেমের রসদ জোগাইতে হইয়াছে।

অক্ষয়ের গলা বিশেষ ভাল ছিল না, কিন্তু সে যখন নিজে বেহালা বাজাইয়া গান গাহিত, তখন অত্যন্ত কড়া সমজ্‌দার ছাড়া সাধারণ শ্রোতার দল আপত্তি করিত না, এমন কি, আরো গাহিতে অনুরোধ করিত। অন্নদাবাবুর সঙ্গীতে বিশেষ অনুরক্তি ছিল না, কিন্তু সে কথা তিনি কবুল করিতে পারিতেন না—তবু তিনি আত্মরক্ষার কথঞ্চিৎ চেষ্টা করিতেন। কেহ অক্ষয়কে গান গাহিতে অনুরোধ করিলে তিনি বলিতেন—"ঐ তোমাদের দোষ! বেচারা গাহিতে পারে বলিয়াই কি উহার 'পরে অত্যাচার করিতে হইবে?"

অক্ষয় বিনয় করিয়া বলিত—"না না অন্নদাবাবু, সেজন্য ভাবিবেন না—অত্যাচারটা কাহার 'পরে হইবে, সেইটেই বিচার্য্য!"

অনুরোধের তরফ হইতে জবাব আসিত, "তবে পরীক্ষা হউক্!"

সেদিন অপরাহ্ণে খুব ঘনঘোর করিয়া মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। অক্ষয় আবদ্ধ হইয়া পড়িল। হেমনলিনী কহিল, "অক্ষয়বাবু, একটা গান করুন।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"এমন বাদ্‌লার দিনে কি গলা কাহারো ভাল থাকিতে পারে? দেখ না, সর্দ্দিতে আমার গলা দিয়া কথা বাহির হইতেছে না। আজ এই যে একহপ্তা ধরিয়া সর্দ্দি হইয়াছে, কিছুতেই ছাড়িতেছে না। প্রথম আরম্ভ হয়, যেদিন প্রবোধের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলাম। যখন গেলাম, তখন বেশ রৌদ্র উঠিয়াছিল, তার পরে—"

হেমনলিনী। বাবা, তুমি মিথ্যা ভয় করিতেছ, অক্ষয়বাবুর ত সর্দ্দির কোন লক্ষণ নাই, গলা বেশ আছে। অক্ষয়বাবু, এই বেহালাটা মিলাইয়া নিন্।

এই বলিয়া হেমনলিনী হার্ম্মোনিয়মে সুর দিল। অন্নদাবাবুর রোগোৎপত্তির ইতিহাস ভাবী সুযোগের অপেক্ষায় অসমাপ্ত হইয়া রহিল।

অক্ষয় বেহালা মিলাইয়া লইয়া হিন্দুস্থানী গান ধরিল—

"বায়ু বহী পুরবৈঞা, নীদ নহী বিন সৈঞা।"

গানের সকল কথা স্পষ্ট বুঝা যায় না—কিন্তু একেবারে প্রত্যেক কথায় কথায় বুঝিবার কোন প্রয়োজন নাই। মনের মধ্যে যখন বিরহমিলনের বেদনা সঞ্চিত হইয়া আছে, তখন একটু আভাসই যথেষ্ট। এটুকু বোঝা গেল যে, বাদল ঝরিতেছে, ময়ূর ডাকিতেছে এবং একজনের জন্য আর একজনের ব্যাকুলতার অন্ত নাই।

অক্ষয় নিজের দরদেই সমস্ত মন দিয়া গান গাহিতেছিল। সুরের ভাষায় সে নিজের অব্যক্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিতেছিল—কিন্তু সে ভাষা কাজে লাগিতেছিল আর দুইজনের। দুইজনের হৃদয়তরঙ্গ সেই স্বরলহরীকে আশ্রয় করিয়া পরস্পরকে আঘাত-অভিঘাত করিতে ছল। জগতে কিছু আর অকিঞ্চিৎকর রহিল না। সব যেন মনোময় হইয়া গেল। পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত যত মানুষ যত ভালবাসিয়াছে, সমস্ত যেন দুটিমাত্র হৃদয়ে বিভক্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় সুখে-দুঃখে আকাঙ্ক্ষায়-আকুলতায় কম্পিত হইতে লাগিল।

অন্নদাবাবু কহিলেন, "অক্ষয়, একটা বাংলা গান গাও না, তোমার ঐ হিন্দিগান আমি বুঝি না।"

হেমনলিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কেন বাবা, হিন্দিগানই ত বেশ—আমার বেশ লাগে।"

বাংলা গান বড় বেশি স্পষ্ট—তাহার সমস্তই বোঝা যায়। তাহাতে আব্রু থাকে না। প্রেম অন্তঃপুরচারী, বেশি প্রকাশ্যতা তাহার পক্ষে পীড়াদায়ক। সে কতকটা প্রকাশ না হইলেও বাঁচে না, আবার কতকটা আড়াল না হইলেও মরিয়া যায়। তাহার পক্ষে কথার চেয়ে সুরই ভাল, এবং লোকজনের মধ্যে বাংলার চেয়ে হিন্দিই ভাল। 'প্রাণনাথ' যখন কানে বড় বেশি ঠেকে, তখন 'সৈঁয়া' বেশ অনায়াসে চলিয়া যায়, এবং 'প্রিয়া' বলিতে যখন বাধে, তখন 'পিয়া'কথাটা কাজে লাগিতে পারে। বৈষ্ণবপদাবলী এইজন্যই আজ পর্য্যন্ত সাদা বাংলা ব্যবহার করিতে পারিল না।

সেদিন মেঘের মধ্যে যেমন ফাঁক ছিল না, গানের মধ্যেও তেম্‌নি হইয়া উঠিল। হেমনলিনী কেবলি অনুনয় করিয়া বলিতে লাগিল—"অক্ষয়বাবু, থামিবেন না, আর একটা গান্, আর একটা গান্!"

উৎসাহে এবং আবেগে অক্ষয়ের গান অবাধে উৎসারিত হইতে লাগিল। গানের সুর স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হইল, যেন তাহা সূচিভেদ্য হইয়া উঠিল, যেন তাহার মধ্যে রহিয়া রহিয়া বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল—বেদনাতুর হৃদয় তাহার মধ্যে আচ্ছন্ন-আবৃত হইয়া রহিল।

সেদিন অনেক রাত্রে অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ বিদায় লইবার সময় যেন গানের সুরের ভিতর দিয়া নীরবে হেমনলিনীর মুখের দিকে একবার চাহিল। হেমনলিনীও চকিতের মত একবার চাহিল, তাহার দৃষ্টির উপরেও গানের ছায়া।

রমেশ বাড়ী গেল। বৃষ্টি ক্ষণকালমাত্র থামিয়াছিল, আবার ঝুপ্‌ঝুপ্‌শব্দে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। রমেশ সে রাত্রে ঘুমাইতে পারিল না। হেমনলিনীও অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া গভীর অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টি-

পতনের অবিরাম শব্দ শুনিতেছিল। তাহার কানে বাজিতেছিল—

বায়ু বহী পুরবৈঞা, নীদ নহী বিন সৈঞা।

পরদিন প্রাতে রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, "আমি যদি কেবল গান গাহিতে পারিতাম, তবে তাহার বদলে আমার অন্য অনেক বিদ্যা দান করিতে কুণ্ঠিত হইতাম না। গানের যেটুকু সফলতা, সেটুকু ত অন্যের মারফৎ আদায় করিয়া লইয়াছিল, তবু গান গাহিবার যেটুকু পরিতৃপ্তি, সেটুকুর লোভও ছাড়া যায় না। মনে মনে সে বলিতেছিল, "অক্ষয়, তুমি ধন্য, তুমি গান গাহিতে পার!"

অক্ষয় যদি বিবেচনা করিয়া দেখিত, তবে বলিত, "রমেশ, তুমিই ধন্য! গান শুনিবার সুখ তোমারই!"

কিন্তু কোন উপায়ে এবং কোন কালেই সে যে গান গাহিতে পারিবে, এ ভরসা রমেশের ছিল না! সে স্থির করিল, "আমি বাজাইতে শিখিব।" ইতিপূর্ব্বে একদিন নির্জ্জন অবকাশে সে অন্নদাবাবুর ঘরে বেহালাখানা লইয়া ছড়ির টান দিয়াছিল—সেই ছড়ির একটিমাত্র আঘাতে সঙ্গীতের সরস্বতী এম্‌নি আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিলেন যে, তাহার পক্ষে বেহালার চর্চ্চা নিতান্ত নিষ্ঠুরতা হইবে বলিয়া সে আশা সে পরিত্যাগ করে। আজ সে ছোট দেখিয়া একটা হার্ম্মোনিয়ম কিনিয়া আনিল। ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করিয়া অতি সাবধানে অঙ্গুলিচালনা করিয়া এটুকু বুঝিল যে, আর যাই হোক্, এ যন্ত্রের সহিষ্ণুতা বেহালার চেয়ে বেশি।

পরদিনে অন্নদাবাবুর বাড়ী যাইতেই হেমনলিনী রমেশকে কহিল, "আপনার ঘর হইতে কাল যে হার্ম্মোনিয়মের শব্দ পাওয়া যাইতেছিল!"

রমেশ ভাবিয়াছিল, দরজা বন্ধ থাকিলেই ধরা পড়িবার আশঙ্কা নাই। কিন্তু এমন কান আছে, যেখানে রমেশের অবরুদ্ধ ঘরের শব্দও সংবাদ লইয়া আসে। রমেশকে একটুকু লজ্জিত হইয়া কবুল করিতে হইল যে, সে একটা হার্ম্মোনিয়ম কিনিয়া আনিয়াছে এবং বাজাইতে শেখে, ইহাই তাহার ইচ্ছা।

হৃদয়ের কোন্ বেদনার মধ্যে এই ইচ্ছার মূল কারণটি, হেমনলিনীর তাহা অগোচর ছিল না। হেমনলিনী কহিল—"ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া নিজে নিজে কেন মিথ্যা চেষ্টা করিবেন! তাহার চেয়ে আপনি আমাদের এখানে অভ্যাস করুন্—আমি যতটুকু জানি, সাহায্য করিতে পারিব।"

রমেশ কহিল, "আমি কিন্তু নিতান্ত আনাড়ি, আমাকে লইয়া আপনার অনেক দুঃখভোগ করিতে হইবে।"

হেমনলিনী কহিল, "আমার যেটুকু বিদ্যা, তাহাতে আনাড়িকে শেখানই কোনমতে চলে।"

ক্রমশই প্রমাণ হইতে লাগিল, রমেশ যে নিজেকে আনাড়ি বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল, তাহা নিতান্ত বিনয় নহে। এমন শিক্ষকের এত অযাচিত সহায়তাসত্ত্বে সুরের জ্ঞান রমেশের মগজের মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন সন্ধি খুঁজিয়া পাইল না। সন্তরণমূঢ় জলের মধ্যে পড়িয়া যেমন উন্মত্তের মত হাতপা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশ সঙ্গীতের হাঁটুজলে তেম্‌নিতর ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার কোন্

আঙুল কখন্ কোথায় গিয়া পড়ে, তাহার ঠিকানা নাই,—পদে পদে ভুল সুর বাজে, কিন্তু রমেশের কানে তাহা বাজে না, সুর-বেসুরের মধ্যে সে কোনপ্রকার পক্ষপাত না করিয়া দিব্য নিশ্চিন্তমনে রাগরাগিণীকে সর্ব্বত্র লঙ্ঘন করিয়া যায়। হেমনলিনী যেই বলে, "ও কি করিতেছেন, ভুল হইল যে,"—অমনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় ভুলের দ্বারা প্রথম ভুলটা নিরাকৃত করিয়া দেয়। গম্ভীর-প্রকৃতি অধ্যবসায়ী রমেশ হাল ছাড়িয়া দিবার লোক নহে। রাস্তাতৈরির ষ্টীম্‌রোলার যেমন মন্থরগমনে চলিতে থাকে, তাহার তলায় কি যে দলিতপিষ্ট হইতেছে, তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র করে না, হতভাগ্য স্বরলিপি এবং হার্ম্মোনিয়মের চাবিগুলার উপর দিয়া রমেশ সেইরূপ অনিবার্য্য অন্ধতার সহিত বারবার যাওয়া-আসা করিতে লাগিল।

রমেশের এই মূঢ়তায় হেমনলিনী হাসে, রমেশও হাসে। রমেশের ভুল করিবার অসাধারণ শক্তিতে হেমনলিনীর অত্যন্ত আমোদ বোধ হয়। ভুল হইতে, বেসুর হইতে, অক্ষমতা হইতে আনন্দ পাইবার শক্তি ভালবাসারই আছে। শিশু চলিতে আরম্ভ করিয়া বারবার ভুল পা ফেলিতে থাকে, তাহাতেই মাতার স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠে। বাজনাসম্বন্ধে রমেশ যে অদ্ভুত-রকমের অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করে, হেমনলিনীর এই এক বড় কৌতুক।

রমেশ একএকবার বলে, "আচ্ছা, আপনি যে এত হাসিতেছেন, আপনি যখন প্রথম বাজাইতে শিখিতেছিলেন, তখন ভুল করেন নাই?"

হেমনলিনী বলে—"ভুল নিশ্চয়ই করিতাম, কিন্তু সত্য বলিতেছি রমেশবাবু, আপনার সঙ্গে তুলনাই হয় না।"

রমেশ ইহাতে দমিত না, হাসিয়া আবার গোড়া হইতে সুরু করিত। অন্নদাবাবু সঙ্গীতের ভালমন্দ কিছুই বুঝিতেন না, তিনি একএকবার গম্ভীর হইয়া কান খাড়া করিয়া দাঁড়াইয়া কহিতেন—"তাই ত, রমেশের ক্রমেই হাত বেশ পাকিয়া আসিতেছে।"

হেমনলিনী বলিত, "হাত বেসুরায় পাকিতেছে।"

অন্নদা। না না, প্রথমে যেমন শুনিয়াছিলাম, এখন তার চেয়ে অনেকটা অভ্যাস হইয়া আসিয়াছে। আমার ত বোধ হয়, রমেশ যদি লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে উহার হাত নিতান্ত মন্দ হইবে না। গানবাজনায় আর কিছু নয়, খুব অভ্যাস করা চাই। একবার সারেগামার বোধটা জন্মিয়া গেলেই তাহার পরে সমস্ত সহজ হইয়া আসে।

এ সকল কথার উপরে প্রতিবাদ চলে না। সকলকে নিরুত্তর হইয়া শুনিতে হয়।

১২

প্রায় প্রতিবৎসর শরৎকালে পূজার টিকিট বাহির হইলে হেমনলিনীকে লইয়া অন্নদাবাবু জব্বলপুরে তাঁহার ভগিনীপতির কর্ম্মস্থানে বেড়াইতে যাইতেন। পরিপাকশক্তির উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহার এই সাংবৎসরিক চেষ্টা।

ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি হইয়া আসিল, এবারে পূজার ছুটির আর বড় বেশি বিলম্ব নাই। অন্নদাবাবু এখন হইতেই তাঁহার যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত হইয়াছেন।

আসন্ন বিচ্ছেদের সম্ভাবনায় রমেশ আজকাল খুব বেশি করিয়া হার্ম্মোনিয়ম শিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। একদিন কথায় কথায় হেমনলিনী কহিল, "রমেশবাবু, আমার বোধ হয়, আপনার অন্তত কিছুদিন বায়ুপরিবর্ত্তন দরকার। না বাবা?"

অন্নদাবাবু ভাবিলেন কথাটা সঙ্গত বটে, কারণ ইতিমধ্যে রমেশের উপর দিয়া শোকদুঃখের দুর্যোগ গিয়াছে। কহিলেন, "অন্তত কিছুদিনের জন্য কোথাও বেড়াইয়া আসা ভাল। বুঝিয়াছ রমেশ, পশ্চিমই বল আর যে দেশই বল, আমি দেখিয়াছি, কেবল কিছুদিনের জন্য একটু ফল পাওয়া যায়। প্রথম দিনকতক বেশ ক্ষুধা বাড়ে, বেশ খাওয়া যায়, তাহার পরে যে কে সেই! সেই পেটভার হইয়া আসে, বুকজ্বালা করিতে থাকে, যা খাওয়া যায়, তা-ই—"

হেমনলিনী। রমেশবাবু, আপনি নর্ম্মদাঝরণা দেখিয়াছেন?

রমেশ। না, দেখি নাই।

হেমনলিনী। এ আপনার দেখা উচিত, না বাবা?

অন্নদা। তা বেশ ত, রমেশ আমাদের সঙ্গেই আসুন না কেন? হাওয়া-বদলও হইবে, মার্ব্বল-পাহাড়ও দেখিবে।

হাওয়া-বদল করা এবং মার্ব্বল-পাহাড় দেখা, এই দুটিই যেন রমেশের পক্ষে সম্প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়—সুতরাং রমেশকেও রাজি হইতে হইল।

সেদিন রমেশের শরীরমন যেন হাওয়ার উপরে ভাসিতে লাগিল। অশান্ত হৃদয়ের আবেগকে কোন-একটা রাস্তায় ছাড়া দিবার জন্য সে আপনার বাসার ঘরের মধ্যে দ্বার রুদ্ধ করিয়া হার্ম্মোনিয়মটা লইয়া পড়িল। আজ আর তাহার যন্ত্রণত্বজ্ঞান রহিল না—যন্ত্রটার উপরে তাহার উন্মত্ত আঙুলগুলা তালবেতালের নৃত্য বাধাইয়া দিল। হেমনলিনীর দূরে যাইবার সম্ভাবনায় কয়দিন তাহার হৃদয়টা ভারাক্রান্ত হইয়া ছিল—আজ উল্লাসের বেগে সঙ্গীতবিদ্যাসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার ন্যায়-অন্যায়-বোধ একেবারে বিসর্জ্জন দিল।

এমন-সময় দরজায় ঘা পড়িল—"আ সর্ব্বনাশ, থামুন, থামুন রমেশবাবু, করিতেছেন কি?"

রমেশ অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আরক্তমুখে দরজা খুলিয়া দিল। অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, গোপনে বসিয়া এই যে কাণ্ডটি করিতেছেন, আপনাদের ক্রিমিনাল্ কোডের কোন দণ্ডবিধির মধ্যে কি ইহা পড়ে না?"

রমেশ হাসিতে লাগিল, কহিল, "অপরাধ কবুল করিতেছি।"

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আপনি যদি কিছু না মনে করেন, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা আলোচনা করিবার আছে।"

রমেশ উৎকণ্ঠিত হইয়া নীরবে আলোচ্যবিষয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।

অক্ষয়। আপনি এতদিনে এটুকু বুঝিয়াছেন, হেমনলিনীর ভালমন্দের প্রতি আমি উদাসীন নহি।

রমেশ হাঁ-না কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া শুনিতে লাগিল।

অক্ষয়। তাঁহার সম্বন্ধে আপনার অভিপ্রায় কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিবার

অধিকার আমার আছে—আমি অন্নদাবাবুর বন্ধু।

কথাটা এবং কথার ধরণটা রমেশের অত্যন্ত খারাপ লাগিল। কিন্তু কড়া জবাব দিবার অভ্যাস ও ক্ষমতা রমেশের নাই। সে মৃদুস্বরে কহিল—"তাঁহার সম্বন্ধে আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে, এ আশঙ্কা আপনার মনে আসিবার কি কোন কারণ ঘটিয়াছে?"

অক্ষয়। দেখুন, আপনি হিন্দুপরিবারে আছেন, আপনার পিতা হিন্দু ছিলেন। আমি জানি, পাছে আপনি ব্রাহ্মঘরে বিবাহ করেন, এই আশঙ্কায় তিনি আপনাকে অন্যত্র বিবাহ দিবার জন্য দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

এই সংবাদটি অক্ষয়ের জানিবার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ অক্ষয়ই রমেশের পিতার মনে এই আশঙ্কা জন্মাইয়া দিয়াছিল। রমেশ ক্ষণকালের জন্য অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

অক্ষয় কহিল, "হঠাৎ আপনার পিতার মৃত্যু ঘটিল বলিয়াই কি আপনি নিজেকে স্বাধীন মনে করিতেছেন? তাঁহার ইচ্ছা কি—"

রমেশ আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিল—"দেখুন অক্ষয়বাবু, অন্যের সম্বন্ধে আমাকে উপদেশ দিবার অধিকার যদি আপনার থাকে, তবে দিন, আমি শুনিয়া যাইব—কিন্তু আমার পিতার সহিত আমার যে সম্বন্ধ, তাহাতে আপনার কোন কথা বলিবার নাই।"

অক্ষয় কহিল, "আচ্ছা বেশ, সে কথা তবে থাক্। কিন্তু হেমনলিনীকে বিবাহ করিবার অভিপ্রায় এবং অবস্থা আপনার আছে কি না, সে কথা আপনাকে বলিতে হইবে।"

রমেশ আঘাতের পর আঘাত খাইয়া ক্রমশই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছিল,—কহিল, "দেখুন অক্ষয়বাবু, আপনি অন্নদাবাবুর বন্ধু হইতে পারেন, কিন্তু আমার সহিত আপনার তেমন বেশি ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। যাঁহাদিগকে আমি একান্তমনে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, তাঁহাদিগকে লইয়া আপনার সহিত আমার এইরূপ সওয়ালজবাব চালানো আমার পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কোচজনক। দয়া করিয়া আপনি এ সব প্রসঙ্গ বন্ধ করুন।"

অক্ষয়। আমি বন্ধ করিলেই যদি সব কথা বন্ধ থাকে এবং আপনি এখন যেমন ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া বেশ আরামে দিন কাটাইতেছেন, এম্‌নি বরাবর কাটাইতে পারিতেন, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না। কিন্তু সমাজ আপনাদের মত নিশ্চিন্তপ্রকৃতি লোকের পক্ষে সুখের স্থান নহে। যদিও আপনারা অত্যন্ত উঁচুদরের লোক, পৃথিবীর কথা বড় বেশি ভাবেন না, তবু চেষ্টা করিলে হয় ত এটুকুও বুঝিতে পারিবেন যে, ভদ্রলোকের কন্যার সহিত আপনি যেরূপ ব্যবহার করিতেছেন, এরূপ করিয়া আপনি বাহিরের লোকের জবাবদিহী হইতে নিজেকে বাঁচাইতে পারেন না—এবং যাঁহাদিগকে আপনি একাগ্রমনে শ্রদ্ধা করেন বলিতেছেন, তাঁহাদিগকে লোকসমাজে অশ্রদ্ধাভাজন করিবার ইহাই উপায়।

রমেশ। আপনার উপদেশ আমি কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি শীঘ্রই স্থির করিব

এবং পালন করিব, এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত হইবেন—এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই।

অক্ষয়। আমাকে বাঁচাইলেন রমেশ-বাবু! এত দীর্ঘকাল পরে আপনি যে কর্ত্তব্য স্থির করিবেন এবং পালন করিবেন বলিতেছেন, ইহাতেই আমি নিশ্চিন্ত হইলাম—আপনার সঙ্গে আলোচনা করিবার সখ আমার নাই। আপনার সঙ্গীতচর্চ্চায় বাধা দিয়া অপরাধী হইয়াছি—মাপ করিবেন। আপনি পুনর্ব্বার সুরু করুন, আমি বিদায় হইলাম।

এই বলিয়া অক্ষয় দ্রুতবেগে বাহির হইয়া গেল।

ইহার পরে অত্যন্ত বেসুরো সঙ্গীতচর্চ্চাও আর চলে না। রমেশ মাথার নীচে দুই হাত রাখিয়া বিছানার উপরে চিৎ হইয়া শুইয়া পড়িল। অনেকক্ষণ এইভাবে গেল। হঠাৎ ঘড়িতে টংটং করিয়া পাঁচটা বাজিল শুনিয়াই সে দ্রুত উঠিয়া পড়িল। কি কর্ত্তব্য স্থির করিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন —কিন্তু আশু প্রতিবেশীর ঘরে গিয়া যে পেয়ালা-দুয়েক চা খাওয়া কর্ত্তব্য, সে সম্বন্ধে তাহার মনে দ্বিধামাত্র রহিল না।

হেমনলিনী চকিত হইয়া কহিল, "রমেশ-বাবু; আপনার কি অসুখ করিয়াছে?"

রমেশ কহিল—"বিশেষ কিছু না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"আর কিছুই নয়, হজমের গোল হইয়াছে—পিত্তাধিক্য। আমি যে পিল্ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহার একটা খাইয়া দেখ দেখি—"

রমেশ কহিল—"না, পিল্ খাইবার মত কিছুই না—"

অন্নদা। না না, একবার পরীক্ষা করিয়াই দেখ না, ইহাতে অনিষ্ট ত কিছু হইবে না, ভালই হইতে পারে।

অগত্যা রমেশকে পিল্ খাইতে হইল।

হেমনলিনী হাসিয়া কহিল, "বাবা, তোমার ঐ পিল্ খাওয়াও নাই, তোমার এমন আলাপী কেহ দেখি না—কিন্তু তাহাদের এমন কি উপকার হইয়াছে?"

অন্নদা। অনিষ্ট ত হয় নাই। আমি যে নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি—এপর্য্যন্ত যতরকম পিল্ খাইয়াছি, এইটেই সব চেয়ে উপকারী।

হেমনলিনী। বাবা, যখনি তুমি একটা নূতন পিল্ খাইতে আরম্ভ কর, তখনি কিছুদিন তাহার অশেষ গুণ দেখিতে পাও—এমন কত রকমের পিল্ তুমি তোমার কত নিরোগী বন্ধুকে খাওয়াইয়াছ বল দেখি।

অন্নদা। তোমরা কিছুই বিশ্বাস কর না—আচ্ছা, অক্ষয়কে জিজ্ঞাসা করিয়ো দেখি, আমার চিকিৎসায় সে উপকার পাইয়াছে কি না।

সেই প্রামাণ্য-সাক্ষীকে তলবের ভয়ে হেমনলিনীকে নিরুত্তর হইতে হইল। কিন্তু সাক্ষী আপনি আসিয়া হাজির হইল। আসিয়াই অন্নদাবাবুকে কহিল—"অন্নদাবাবু, আপনার সেই পিল্ আমাকে আর একটি দিতে হইবে। বড় উপকার হইয়াছে। আজ শরীর এম্নি হাল্কা বোধ হইতেছে!"

অন্নদাবাবু সগর্ব্বে তাঁহার কন্যার মুখের দিকে তাকাইলেন।

ক্রমশ।

সীতা।

রাম কৈকয়ীর নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়াছিলেন, "বিদ্ধি মামৃষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্।" তিনি বনবাসাজ্ঞা অবিকৃতমুখে অবনতশিরে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার মুখে শান্তির শ্রী বিলীন হয় নাই। কিন্তু "ইন্দ্রিয়নিগ্রহ" করিয়া যে দুঃখ হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন, কৌশল্যার নিকট আসিবার সময় তাহা প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি পরিশ্রান্ত হস্তীর ন্যায় গভীর নিশ্বাসপাত করিতে লাগিলেন,—"নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ"। মাতার নিকট এই মর্ম্মচ্ছেদী সংবাদ বলিবার সময় তাঁহার কণ্ঠ শঙ্কান্বিত ও কম্পিত হইয়া উঠিতেছিল, তাঁহার কথার সূচনা পরিতাপব্যঞ্জক—"দেবি নূনং ন জানীষে মহদ্ভয়মুপস্থিতম্।" মাতার অশ্রু ও শোকের উচ্ছ্বাস তিনি নীরবে দাঁড়াইয়া সহ্য করিয়াছিলেন; অপ্রতিহত অঙ্গীকারের শ্রী তাঁহার কথাগুলিতে এক মহতী নৈতিকসম্পদ্ প্রদান করিয়াছিল। কিন্তু সীতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার হৃদয়বেগ প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি তাহা রোধ করিতে পারিলেন না। চিরানুরক্তা স্ত্রীকে সদ্যোযৌবনের অতৃপ্তকামনায় দারুণ দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়া যাইবেন, এ কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার কণ্ঠ যেন রুদ্ধ হইয়া আসিল। সীতা অভিষেকসম্ভারের প্রতীক্ষায় ফুল্লমনে রহিয়াছেন, অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের ন্যায় নিদারুণ সংবাদে কুসুমকোমলা রমণীর প্রাণকে কিরূপে চকিত ও ব্যথিত করিয়া তুলিবেন, ভাবিয়া তিনি যেন দিশাহারা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার মুখশ্রী মলিন হইয়া গেল। সীতা তাঁহাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিলেন, কি যেন দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। "অদ্য শতশলাকাযুক্ত জলফেনশুভ্র রাজচ্ছত্র তোমার মাথার উপর শোভা পাইতেছে না। কুঞ্জর, অশ্বারোহী ও বন্দিগণ তোমার অগ্রে অগ্রে আইসে নাই, তোমার মুখ বিষণ্ণ, কি ভাবনায় তুমি ক্লিন্ন ও আকুল হইয়া পড়িয়াছ, তোমার বর্ণ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।" কোথায় রামচন্দ্রের সেই স্বভাবসৌম্য প্রশান্ত ভাব! রমণীর অঞ্চলপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া তিনি এরূপ বিহ্বল হইয়া পড়িলেন কেন? তিনি সীতার মহৎ পিতৃকুলের সংযম ও তাঁহার সর্ব্বজনপ্রশংসিত চরিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে আসন্ন পরীক্ষার উপযোগিনী করিতে চেষ্টা পাইলেন; তিনি বনে গেলে সীতা কি ভাবে রাজগৃহে জীবনযাপন করিবেন, তৎসম্বন্ধে নানা-নৈতিক-উপদেশ-সংবলিত একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আশঙ্কা বৃথা—সীতা সে সকল কথা উপহাস করিয়া বলিলেন, "তুমি বনে গেলে তোমার অগ্রে কুশাঙ্কুর ও কণ্টকাকীর্ণ পথে পাদচারণ করিয়া আমি বনে যাইব।" যাঁহারা রামের বনগমনের কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই কত আক্ষেপ করিয়াছেন। রাম সীতার মুখে সেইরূপ কত আক্ষেপ শুনিবার প্রত্যাশা করিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাহার

প্রশমনার্থ কত উপদেশ মনে মনে সঙ্কল্প করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু সীতা একটি আক্ষেপের কথা বলিলেন না, একবার দশ-রথকে স্ত্রৈণ বলিলেন না, কৈকয়ীর প্রতি কটাক্ষনিক্ষেপ করিলেন না, এমন কি, রামচন্দ্র যে জটাবল্কল পরিবেন, ইহা শুনিয়াও শোকে বিদীর্ণ হইয়া পড়িলেন না। পরন্তু তিনি স্বীয় যৌবনকল্পনার মাধুরী দিয়া বনবাসকে এক সুরম্যচিত্রে আঁকিয়া ফেলি-লেন, রাজত্বের সুখ অতি তুচ্ছ মনে করিলেন। সাধুপুষ্পিত পদ্মিনীসঙ্কুল সরোবর, ফেন-নির্ম্মলহাসিনী নদীর প্রবাহ, বনান্তলীন শৈল-খণ্ড, এই সকল দেখিয়া স্বামীর পার্শ্বে সোহাগিনী ভ্রমণ করিবেন, এই সুখের আশায় যেন আকুল হইয়া উঠিলেন। বয়ঃ-সন্ধির সময়ে একটি হাসির মূল্যে সাম্রাজ্য বিলাইয়া দিতে পারা যায়, স্বর্ণ ও হীরকখণ্ড অপেক্ষা একটু সঙ্গসুখ বেশী স্পৃহণীয় মনে হয়, তাহা আমাদের বৈষ্ণবকবিগণ গাহিয়া গাহিয়া আমাদিগকে অভিজ্ঞ করিয়া তুলিয়া-ছেন। সীতা স্বামীর সঙ্গে গিরিনির্ঝর দেখিয়া ও বনের মুক্তবায়ু সেবন করিয়া বেড়াইবেন, এই আনন্দের উৎসাহে রামের বনগমনের ক্লেশ ভাসিয়া গেল, রামচন্দ্র প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এই সুরম্য অযোধ্যার সমৃদ্ধ সৌধমালার ছায়া হইতে স্বামীর পাদচ্ছায়াই সীতার নিকট বেশী প্রশংসনীয় বোধ হইতে লাগিল। এই আনন্দ শুধু অনভিজ্ঞতার ফল, পুরনারীগণ তীর্থগমনের জন্য সময়ে সময়ে যেরূপ উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন,—এই ইচ্ছা সেই প্রকারের; রামচন্দ্র ভাবিলেন, সীতার নিকট বনবাসের কষ্ট বুঝাইয়া বলিলে তিনি নিবৃত্ত হইবেন। কিন্তু ইহা সামান্য পুরনারীর আব্দার নহে, ইহা আব্দারই নহে—স্থির প্রতিজ্ঞা। যাহা তিনি অনভিজ্ঞ আনন্দের সুর মনে করিয়াছিলেন—তাহা সাধ্বীর অটল পণ। রামচন্দ্র বনের কষ্ট তাঁহাকে সহস্রপ্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। কিন্তু সীতা কি কষ্টকে ভয় করেন? ইহা তীর্থো-ন্মুখী রমণীর বৃথা ঔৎসুক্য নহে, স্বামীর সঙ্গ ছাড়িয়া সাধ্বী থাকিতে পারিবেন না—এই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। রাম তখন বনের ভীষণতার একটি চিত্র সীতার সম্মুখে উপস্থিত করিলেন; কৃষ্ণ সর্প, বনতরুর কণ্টকপূর্ণ ব্যাকুল শাখাগ্র, ফলমূলজীবিকা এবং অনশন, পঙ্কিল সরোবর, ব্যাঘ্র, সিংহ ও রাক্ষসগণের উৎপাত প্রভৃতি শত শত বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া সীতার ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা পাইলেন। সীতা ঘৃণার সহিত সে সকল উপেক্ষা করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি আমাকে তুচ্ছ শয্যাসঙ্গিনী মনে করিয়াছ, আমি কুলপাংশনী নহি।—"দ্যুমৎসেনসুতং বীরং সত্যব্রতমনুব্রতাম্। সাবিত্রীমিব মাং বিদ্ধি।" পরে বলিলেন, "আমি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া তোমার সঙ্গে বনে পর্য্যটন করিব। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহারাই প্রবাসে কষ্ট পায়, আমরা কেন কষ্ট পাইতে যাইব?" রাম তথাপি নানারূপ ভয়ের আশঙ্কা করিয়া তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করি-বার প্রয়াসী হইলেন; সীতা ক্রোধাবিষ্টা হইয়া বলিলেন—"নিজের স্ত্রীকে পার্শ্বে রাখিতে ভয় পায়, এরূপ নারীপ্রকৃতি পুরুষের হস্তে কেন আমাকে পিতা সমর্পণ করিয়া-

ছেন?" ইহা হইতেও তিনি অধিকতর কুকথা রামকে বলিয়াছিলেন ঃ—"শৈলুষ ইব মাং রাম পরেভ্যো দাতুমিচ্ছসি।"—স্ত্রীজনসুলভ অনেক কমনীয় কথার সংঘটনও এস্থানে দৃষ্ট হয়—"তোমার সঙ্গে থাকিলে, তোমার শ্রীমুখ দেখিলে, আমার সকল জ্বালা দূর হইবে, পথের কুশকণ্টক রাজগৃহের তুলাজিন অপেক্ষাও আমি কোমলতর মনে করিব।" এইরূপ নানা বিনয় ও প্রেমসূচক কথা বলিয়া সীতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার পদ্মদলের ন্যায় দুটি চক্ষু জলভারে আচ্ছন্ন হইল; তিনি স্বামীর সঙ্গে যাইতে না পারিলে প্রাণত্যাগ করিবেন, এই সঙ্কল্প জানাইয়া ব্রততীর ন্যায় রামের অঙ্গে হেলিয়া পড়িয়া বিমনা হইয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সাধ্বীর এই অশ্রুত-পূর্ব্ব দৃঢ়তা দর্শনে রাম বাহুদ্বারা তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ন দেবি তব দুঃখেন স্বর্গমপ্যভিরোচয়ে।" এবং তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিয়া বলিলেন, "তোমার ধনরত্ন যাহা কিছু আছে, তাহা বিতরণ করিয়া প্রস্তুত হও।" রমণীর অলঙ্কারপেটিকা শত শত অদৃশ্য ও মৌন যক্ষে রক্ষা করিয়া থাকে, কিন্তু সীতা কেমন হৃষ্টমনে হারকেয়ূর সখীগণকে বিলাইয়া দিতেছেন, তাহা দেখিবার যোগ্য। বশিষ্ঠপুত্র সুযজ্ঞের পত্নীকে তিনি হেমসূত্র, কাঞ্চী ও নানা মহার্ঘ দ্রব্য প্রদান করিলেন। সখীগণকে স্বীয় পর্য্যঙ্ক, হেমখচিত আস্তরণ এবং নানা অলঙ্কার প্রদান করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে নিরাভরণা সুন্দরী বনবাসের জন্য প্রস্তুত হইলেন। যখন রাম পিতামাতা ও সুহৃদ্‌গণের সমক্ষে জটাবল্কল পরিধান করিলেন, তখন সীতার পরিধানের জন্য কৈকয়ী তাঁহার হস্তে চীরবাস প্রদান করিলে, সীতা সজলনেত্রে ভীতকণ্ঠে রামের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "চীরবাস কেমন করিয়া পরিতে হয়, আমি জানি না, আমাকে শিখা-ইয়া দাও।" সুমন্ত্র যেদিন রথ লইয়া গঙ্গাতীর হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন, সেদিন তিনি সীতাকে বলিয়াছিলেন—"অযোধ্যায় কোন সংবাদ কি আপনার দিবার আছে?" সীতা তখন কিছু বলিতে পারেন নাই, দুটি চক্ষু হইতে তাঁহার অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইয়াছিল। এই সকল অবস্থায় সীতার মূর্ত্তি লজ্জাবতী লতাটির ন্যায়, কিন্তু এই বিনয়নম্রা মধুরভাষিণীর চরিত্রে যে প্রখরতেজ ও দৃঢ়-সঙ্কল্প বিদ্যমান, তাহার পূর্ব্বাভাস ইতিপূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি।

তার পর রাজকুমারদ্বয় ও রাজবধূ বনে যাইতেছেন। যিনি রাজান্তঃপুরীর অব-রোধে সযত্নে রক্ষিতা, যাঁহার গৃহশিখরে শুক ও ময়ুর নৃত্য করিত ও হেমপর্য্যঙ্কে সুকোমল-চর্ম্মাচ্ছাদনশোভী আস্তরণ বিরাজিত থাকিত, নিদ্রিত হইলে যাঁহার রূপমাধুরী শুধু স্বর্ণদীপ-রাশি নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া দেখিত, আজ তিনি সকলের দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী, পদব্রজে কণ্টকা-কীর্ণ পথে চলিতেছেন, পদ্মপ্রসূনের মত পাদ-যুগ্ম,—তাহাতে অলক্তকরাগ মলিন হয় নাই, সেই পাদযুগ্ম লীলানূপুরশব্দে এখনও বন-প্রদেশ মুখরিত করিয়া চলিতেছে, চিত্রকূটের প্রান্তবর্ত্তিনী হইয়া সীতা শ্বাপদসঙ্কুল গহনে কৃষ্ণা রজনীতে ভীতা হইলেন, রামের বাহু-আশ্রিতা সীতার ভীত ও চকিত পাদক্ষেপ

ক্রমশ মন্থর হইয়া আসিল। পরিশ্রান্ত হইয়া যখন ইঙ্গুদীমূলে তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন, তখন তৃণশয্যাশায়িনীর সুন্দর বর্ণ আতপক্লিষ্ট ও অনশনজনিত মুখশ্রীর বিষণ্ণতা দেখিয়া রামচন্দ্র অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কিন্তু কষ্ট স্থায়ী হয় না,—প্রভাতে চিত্রকূটের শৃঙ্গে বনতরুর পুষ্পসমৃদ্ধি দেখাইয়া রামচন্দ্র সীতাকে আদর করিতে লাগিলেন,—সীতা সেই আদরে ও সোহাগে পুনরায় ফুল্লা হইয়া উঠিলেন, পদ্ম উত্তোলন করিয়া সীতা মন্দাকিনীসলিলে স্নান করিলেন, তটিনীর মন্দমারুত-চালিত-তরঙ্গধ্বনি তাঁহার নিকট সখীর আহ্বানের ন্যায় মৃদু-মনোরম বোধ হইতে লাগিল,—তিনি স্বামীর পার্শ্বে স্বভাবের রম্যশোভা দর্শন করিয়া অযোধ্যার সুখ অকিঞ্চিৎকর মনে করিলেন।

বনবাসের ত্রয়োদশ বৎসর অতিবাহিত হইল, রাজবধূ বনদেবতার মত বন্যফুল পরিয়া রামের মনে হর্ষ উৎপাদন করিতেন; কেবল একদিন রামের জ্যানিনাদকম্পিত শান্ত বনভূমির চাঞ্চল্য দেখিয়া সাধ্বী রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "তুমি অহেতুবৈর ত্যাগ কর; তুমি পারিব্রাজ্য অবলম্বন করিয়া বনে আসিয়াছ, এখানে রাক্ষসদিগের সঙ্গে শত্রুতা করা সময়োচিত নহে; তোমার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে পাছে নিষ্ঠুরতা বর্ত্তে, আমার এই আশঙ্কা।—"কদর্য্যকলুষা বুদ্ধির্জায়তে শস্ত্রসেবনাৎ। পুনর্গত্বা ত্বযোধ্যায়াং ক্ষত্রধর্ম্মং চরিষ্যসি।"

কখন ঋষিকন্যা অনসূয়ার নিকট বসিয়া সীতা কথাবার্ত্তায় নিযুক্তা থাকিতেন, কখন গদগদনাদী গোদাবরীতীরে স্বীয় অঙ্কে ন্যস্ত-মস্তক মৃগয়াশ্রান্ত শ্রীরামচন্দ্রের মুখে ব্যজন করিতেন, কখন সুকেশী তাঁহার কর্ণান্তলম্বিত চূর্ণকুন্তল কর্ণিকারপুষ্পদামে সাজাইয়া দিতেন,—অযোধ্যার রাজলক্ষ্মী বনলক্ষ্মীর বেশে এইভাবে স্বামীর সঙ্গে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

সুতীক্ষ্ণঋষির সঙ্গে দেখা করিয়া রাম অগস্ত্যাশ্রমে গমন করিলেন। তখন শীতকাল আসিয়া পড়িয়াছে—তুষারমিশ্র জ্যোৎস্না ও মৃদুসূর্য্য, নিষ্পত্র তরু ও যবগোধূমাকীর্ণ প্রান্তর বনের বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে, বিরাধরাক্ষসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া সীতা স্বামীর সঙ্গে ক্রমশ দাক্ষিণাত্যের নিম্নপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। তীব্র বন্যপিপ্পলীর গন্ধে বন্যবায়ু আকুলিত হইতেছিল; শালিধান্যসকল খর্জ্জূরপুষ্পাকৃতি পূর্ণতণ্ডুল শীর্ষসমূহে আনম্র ও কনকপ্রভ হইয়া শোভা পাইতেছিল। বনোন্মত্তা মৈথিলী নদীপুলিনের হিমাচ্ছন্ন প্রান্তরে, কাশকুসুমশোভিত বনান্তে মুক্তবেণী পৃষ্ঠে দোলাইয়া ফলপুষ্পের সন্ধানে বেড়াইতে থাকিতেন, কখন বা তাপসকুমারীগণের নিকট স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতেন, "আমার স্বামী পরস্ত্রীমাত্রকেই মাতৃবৎ গণ্য করেন।" ধর্ম্মপ্রাণ স্বামীর গুণকীর্ত্তন করিতে তাঁহার কণ্ঠ আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত। পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া সীতা একেবারে সঙ্গিনীশূন্যা হইয়া পড়িলেন, সেখানে নিকটে কোন ঋষির আশ্রম ছিল না। এই স্থানে সূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদ ও রামের শরে খরদূষণাদি চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষস নিহত হইল। দণ্ডকারণ্যের রাক্ষসগণের মধ্যে অভূতপূর্ব্ব মনুষ্যভয়ের

সঞ্চার হইল। অকম্পন রাবণের নিকট বলিয়াছিল,—"ভয়প্রাপ্ত রাক্ষসগণ যে স্থানেই পলাইয়া যায়, সেই স্থানেই তাহারা সম্মুখে ধনুষ্পাণি রামের করাল মূর্ত্তি দেখিতে পায়।" মারীচ রাবণকে বলিয়াছিল—"বৃক্ষের পত্রে পত্রে আমি পাশহস্তযমসদৃশ রামমূর্ত্তি দেখিতে পাই।" স্বীয় অধিকারস্থ জনস্থানের এই অবস্থা শুনিয়া রাবণ সেই মুহূর্ত্তে সীতাহরণোদ্দেশ্যে দণ্ডকারণ্যাভিমুখে প্রস্থান করিল।

সীতা লক্ষ্মণকে তীব্র গঞ্জনা করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। মায়াবী মারীচ মৃত্যুকালে রামের কণ্ঠধ্বনির অবিকল অনুকরণ করিয়াছিল; সেই আর্ত্ত কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া সীতা পাগলিনী হইলেন। লক্ষ্মণ রাক্ষসদিগের ছলনার বৃত্তান্ত বিলক্ষণ অবগত ছিলেন, সুতরাং সীতার কথায় আশ্রম ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। স্বামীর বিপদাশঙ্কাতুরা সীতা লক্ষ্মণের মৌন এবং দৃঢ়সঙ্কল্প কোন গূঢ় ও কুৎসিত অভিপ্রায়ের ছদ্মবেশ বলিয়া মনে করিলেন; তখনও সীতার কর্ণে "কোথায় সীতা, কোথায় লক্ষ্মণ" এই আর্ত্ত কণ্ঠের স্বর ধ্বনিত হইতেছিল; উন্মত্তা মৈথিলী লক্ষ্মণকে "প্রচ্ছন্নচারী ভরতের দূত, কুঅভিপ্রায়ে ভ্রাতৃজায়ার পশ্চাৎ অনুবর্ত্তী" প্রভৃতি কঠোর বাক্য বলিতে লাগিলেন। "আমি রাম ভিন্ন অন্য কোন পুরুষকে স্পর্শ করিব না, অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।" এই সকল দুর্ব্বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেবতাদিগের উপর সীতার রক্ষার ভার অর্পণ করিলেন এবং রোষস্ফুরিত অধরে আশ্রম ত্যাগ করিয়া রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন। তখন কাষায়বস্ত্রপরিহিত, শিখী, ছত্রী ও উপানহী পরিব্রাজক "ব্রহ্ম"নাম কীর্ত্তন করিয়া সীতার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবণ সীতাকে সম্বোধন করিয়া যে সকল কথা কহিল, তাহা ঠিক ঋষিজনোচিত নহে। কিন্তু সরলপ্রকৃতি সীতা অতর্কিত ছিলেন। তিনি ব্রহ্মশাপের ভয়ে রাবণের নিকট আত্মপরিচয় দিলেন এবং অতিথিবোধে তাঁহাকে আশ্রমে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন— "একশ্চ দণ্ডকারণ্যে কিমর্থং চরসি দ্বিজ।" রাবণ বাক্যের আড়ম্বর না করিয়া একেবারেই স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল—"আমি রাক্ষসরাজ রাবণ, ত্রিকূটশীর্ষে লঙ্কা আমার রাজধানী, তথায় নানা স্থান হইতে আমি ষোড়শ শত সুন্দরী সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, তোমাকে তাহাদের 'অগ্রমহিষী'রূপে বরণ করিয়া লইব। দশরথ রাজা মন্দবীর্য্য জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন হইতে তাড়িত করিয়া প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র ভরতকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, তাহাকে ভজনা করায় কোন লাভ নাই। ত্রিকূটশীর্ষস্থিতা বনমালিনী লঙ্কার সুপুষ্পিত তরুচ্ছায়ায় আমার সঙ্গে বাস করিয়া তুমি রামকে আর মনেও স্থান দিবে না।" সীতাকে আমরা তাপসপত্নীগণের নিকট একটি সুকুমারী ব্রততীর ন্যায় দেখিয়াছি। তাঁহার সলজ্জ সুন্দর মুখখানি আতপতাপে ঈষৎ ম্লান হইয়াছিল, কিন্তু সেই লজ্জিত ও মৃদু ভঙ্গীর মধ্যে যে প্রখর তেজ লুক্কায়িত ছিল, তাহার পূর্ব্বাভাস আমরা সীতার বনবাসসঙ্কল্পে দেখিয়াছি। কিন্তু এবার সেই তেজের পূর্ণবিকাশ দৃষ্ট হইল। রাবণ

অমিততেজা মহাবীর—তাহার ভয়ে পঞ্চবটীর তরুপত্র নিষ্কম্প হইয়া গিয়াছে, পার্শ্বে গোদাবরীর স্রোত মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, অস্তচূড়াবলম্বী সূর্য্যও যেন রাবণের ভয়ে দিগ্বলয়ের প্রান্তে লুকাইয়া পড়িয়াছেন, এই ভয়ানক অসুর যখন পরিব্রাজকবেশ ত্যাগ করিয়া সহসা রক্তমাল্য পরিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ও শক্তির গর্ব্ব করিতে লাগিল,—তখন সীতা লুক্রেশিয়ার ন্যায় কিংবা ছিন্নলতার ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন না। যিনি লতিকার ন্যায় কোমল, চীরবাস পরিতে যাইয়া যিনি সাশ্রুনেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যিনি মৃদুভাষায় নিজের মনের কথা ব্যক্ত করিয়া রামের কর্ণে অমৃতনিষেক করিতেন, সেই তন্বঙ্গী পুষ্পালঙ্কারশোভিনী সীতা সহসা বিদ্যুল্লতার ন্যায় তেজস্বিনী হইয়া উঠিলেন। যাহার ভয়ে জগৎ ভীত, সতী তাহার ভীতিদায়ক হইয়া উঠিলেন। কে তাঁহার ফুল্লকুসুমকোমল রূপে এই বিজয়শ্রী, এই তেজ প্রদান করিল? কে তাঁহার ভাষায় এই ক্রুদ্ধ অগ্নির ন্যায় জ্বালাময় কথা বিচ্ছুরিত করিয়া দিল?—"আমার স্বামী মহাগিরির ন্যায় অটল, ইন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত, আমার স্বামী জগৎপূজ্যচরিত্রশালী, জগদ্ভীতিদায়ক-তেজোদৃপ্ত, আমার স্বামী সত্যপ্রতিজ্ঞ, পৃথুকীর্ত্তি; রাক্ষস, তুমি বস্ত্রদ্বারা অগ্নি আহরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ, জিহ্বা দ্বারা ক্ষুর লেহন করিতে চাহিতেছ, কৈলাসপর্ব্বত হস্তদ্বারা উত্তোলন করিতে চেষ্টা পাইতেছ। রামের স্ত্রীকে স্পর্শ কর, এমন শক্তি তোমার নাই। সিংহে ও শৃগালে, স্বর্ণে ও সীসকে যে প্রভেদ, রামের সঙ্গে তোমার তদপেক্ষা অধিক প্রভেদ। ইন্দ্রের শচীকে হরণ করিয়াও তোমার রক্ষা পাইবার সুযোগ থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে স্পর্শ করিলে নিশ্চয় তোমার মৃত্যু।" বক্র কেশকলাপ সীতার তেজোদৃপ্ত মুখের চতুর্দ্দিকে তরঙ্গিত হইয়া পড়িয়াছে, ঈষৎ গ্রীবা হেলাইয়া,—ফুল্লকমল-প্রভ রক্তিম বদনমণ্ডল উন্নমিত করিয়া সীতা যখন রাবণকে তীব্রভাষায় ভর্ৎসনা করিলেন, তখন আমরা সতীর মূর্ত্তি দেখিলাম। ভারতের শ্মশানের প্রধূমিত অগ্নিচ্ছায়ায় স্বামীর পার্শ্বে বনফুলসুন্দরীর স্থিরপ্রতিজ্ঞ বদনে বিচ্ছুরিত যে সতীত্বের শ্রী আমাদের চক্ষে রহিয়াছে, শ্মশানের অগ্নি যে শ্রী ভস্মীভূত করিতে পারে নাই, ভারতের প্রত্যেক গ্রাম—প্রত্যেক নদীপুলিনকে এক অশরীরী পুণ্যপ্রবাহে চিরতীর্থ করিয়া রাখিয়াছে, মরণে যে গরিমা সীমন্ত উদ্ভাসিত করিয়া হিন্দু-রমণীর সিন্দূরবিন্দুকে অক্ষয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে—আজি জীবনে সীতার সেই চির-নমস্য সতীমূর্ত্তি আমরা দেখিয়া কৃতার্থ হইলাম।

রাবণ এই মূর্ত্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না;—সে যতগুলি রমণীর কেশাকর্ষণ করিয়া সর্ব্ব-নাশিনী লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেই কত কাতরোক্তি ও বিনয় করিয়া তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি ভিক্ষা করিয়াছে,—স্ত্রীলোকের করুণ কণ্ঠ-ধ্বনি শুনিতে রাবণ অভ্যস্ত। কিন্তু এই অলৌকিক রূপলতায় তাদৃশ মৃদুতা কিছু-মাত্র নাই,—পলাশদলসুন্দর চক্ষে একটি অশ্রু নাই। রাবণের ভীতিকর প্রভাব জীবনে

এই প্রথমবার প্রতিহত হইল। যে জীবনকে ভয় করে, সে জীবননাশককে ভয় করিবে, কিন্তু সীতা স্বীয় নিঃসহায় অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বন্ধনই কর বা বধই কর, আমার এ দেহ এখন অসাড়;— রাক্ষস, এ দেহ বা এ জীবন রক্ষা করা আমার আর উচিত নয়।"

বিস্মিত হইয়া "ললাটে ভ্রুকুটিং কৃত্বা রাবণঃ প্রত্যুবাচ হ।"—সে কুবেরকে জয় করিয়া পুষ্পকরথ আনিয়াছে,—জগতের প্রকৃতিপুঞ্জ তাহাকে মৃত্যুর তুল্য ভয় করে, "অঙ্গুল্যা ন সমো রামো মম যুদ্ধে স মানুষঃ" প্রভৃতি অনেক কথা বলিল, কিন্তু বাগ্বিতণ্ডায় বৃথা সময় নষ্ট করা যুক্তিযুক্ত মনে না করিয়া সে বামহস্তে সীতার কেশমুষ্টি ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার উরুদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে রথের উপর লইয়া গেল। সহসা সেই পঞ্চবটীর বনশ্রী যেন মলিন হইয়া গেল, তরুগুলি যেন নীরবে কাঁদিতে লাগিল, পক্ষিগুলি অবসন্ন হইয়া উড়িতে পারিল না,—বনলক্ষ্মীকে রাবণ লইয়া গেল, সেই বিপুল অনুগোদপ্রদেশের বনরাজি হতশ্রী হইয়া পড়িল। সীতার আর্ত্ত চীৎকার-ধ্বনি শুনিয়া সেই নির্জ্জনে শুধু এক মহাজন লগুড় লইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার কেশকলাপ হংসপক্ষের ন্যায় শুভ্র হইয়া গিয়াছে, দণ্ডকারণ্যে বহুবৎসর বাস করিয়া বার্দ্ধক্যে তিনি শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছেন,—তিনি পরের কলহ মাথায় লইয়া রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। ধন্য জটায়ু, আজ এই হিন্দুস্থানে এমন্ কে আছেন—যিনি অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তোমার মত প্রাণ দিতে পারেন?

সীতা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিলেন— "রাম, তুমি দেখিলে না, বনের মৃগপক্ষীও আমাকে রক্ষা করিতে ছুটিতেছে।" যে কর্ণিকারপুষ্প সংগ্রহের জন্য তিনি বনে বনে ছুটিতেন, সেই কর্ণিকারবন লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।" হংসসারসময়ী আবর্ত্ত-শোভিনী গোদাবরীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ক্ষিপ্রং রামায় শংস ত্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।" দিগঙ্গনাদিগকে স্তুতি করিয়া বলিলেন, "ক্ষিপ্রং রামায় শংসধ্বং সীতাং হরতি রাবণঃ।"

রথ ক্রমশ লঙ্কার সন্নিহিত হইল, সীতা স্বীয় অলঙ্কারগুলি দেহ হইতে ছুড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন—তাঁহার চরণের নূপুর বিদ্যুতের মত, বক্ষোলম্বিত শুভ্র মুক্তাহার ক্ষীণ গঙ্গারেখার ন্যায়, আকাশ হইতে পতিত হইল, রাবণের পার্শ্বে তাঁহার মুখখানি দিবসে উদিত চন্দ্রের ন্যায় মলিন দেখাইতে লাগিল, সীতার রক্তকৌষেয় বস্ত্রের একার্দ্ধ রাবণের রথের পার্শ্বে উড়িতেছিল। সেই শোক-বিমূঢ়া সতীর দুরবস্থা দেখিয়া সমস্ত জগৎ যেন ক্রুদ্ধ হইয়া মৌনভাবে প্রকাশ করিল —"যে সংসারে রাবণ সীতাকে হরণ করিতে পারে, সেখানে ধর্ম্মের জয় নাই,—সেখানে পুণ্য নাই।"

রাবণ সীতাকে লঙ্কাপুরীতে লইয়া আসিল। লঙ্কায় জগতের বিলাসসম্ভার সমস্ত সংগৃহীত, চক্ষুকর্ণের পরিতৃপ্তির জন্য যাহা কিছু কল্পনায় উপস্থিত হইতে পারে, লঙ্কায় তাহার সমস্ত সম্মিলিত; এই ঐশ্বর্য্য-ময়ী পুরী সীতাকে দেখাইয়া রাবণ বলিল— "তুমি আমার প্রতি প্রীত হও, এই সমস্ত

ঐশ্বর্য্য তোমার পদপ্রান্তে,—তোমার অশ্রুক্লিন্ন মুখপঙ্কজ আমাকে পীড়াদান করিতেছে। তোমার সুন্দর মুখ কেন শোকার্ত্ত হইয়া থাকিবে? তোমার স্নিগ্ধ পল্লবকোমল পাদযুগ্মের তলে আমার মস্তক রাখিতেছি, রাবণ এমনভাবে এপর্য্যন্ত কোন রমণীর প্রেমভিক্ষা করে নাই। তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।" সীতা এ সকল কথায় কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন, রাবণের প্রতি বারংবার রোষদীপ্ত বিরক্ত চক্ষে চাহিয়া সীতা আরক্তগণ্ডে ও স্ফুরিত অধরে তাহাকে বলিলেন—"যজ্ঞমধ্যস্থিত ব্রাহ্মণের মন্ত্রপূত স্রুগ্‌ভাণ্ডমণ্ডিত বেদী স্পর্শ করিবে, চণ্ডালের কি সাধ্য? রাক্ষস, তুমি নিজের মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিতেছ।" রাবণের দিকে ঘৃণায় পৃষ্ঠ ফিরাইয়া সীতা মৌনী হইয়া রহিলেন, অনবদ্যাঙ্গীর সমস্ত শরীর হইতে ঘৃণা ও অলৌকিক দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। রাবণ অনন্যোপায় হইয়া রাক্ষসীদিগকে বলিল—"ইহাকে অশোকবনে লইয়া যাও, বলে হউক, ছলে হউক, মিষ্টবাক্যে হউক, ভয়প্রদর্শনে হউক, ইহাকে আমার বশীভূত করিয়া দাও।

সেই অশোকবনের পুষ্পস্তবকনম্র শাখা যেন ভূমিচুম্বন করিতে চাহিতেছে—অদূরে বিশাল চৈত্যপ্রাসাদ; তাহার সহস্র স্ফটিকস্তম্ভের প্রত্যেকটির উপরে এক একটি ব্যাঘ্রের প্রতিমূর্ত্তি। নানা-বিচিত্র-প্রতিমূর্ত্তিশোভিত উপবন। চম্পক, উদ্দালক, সিন্ধুবার ও কোবিদার বৃক্ষ অজস্র পুষ্পসঞ্চয়ে সেই বনটি সমৃদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। সুন্দর সুন্দর মণিখচিত সোপানপংক্তিতে সংবদ্ধ কৃত্রিম সরোবর তটান্তশোভী বন্যতরুর পুষ্পপাতে ঈষৎ কম্পিত। এই রমণীয় উদ্যানে সীতার আবাসস্থান স্থির হইল। এই আরণ্যদৃশ্যের পার্শ্বে বিষণ্ণমলিনশ্রী সীতাদেবীর যে মূর্ত্তি বাল্মীকি আঁকিয়াছেন, তাহা একান্ত মৌনতায়, উৎকট রাক্ষসীগণের সাহচর্য্যে, অটল সতীত্বগর্ব্বে এবং করুণ সৌন্দর্য্যে আমাদিগের চিত্ত একান্তরূপে আকৃষ্ট করে।

তাঁহার সহচারিণীগণ কোন দুঃস্বপ্নদৃষ্ট যমালয়ের চরের ন্যায়,—তাহারা বিভীষিকার জীবন্ত মূর্ত্তি—কেহ একাক্ষী, কেহ লম্বিতোষ্ঠী, কেহ শঙ্কুকর্ণা, কেহ স্ফীতনাসা, কেহ বা "ললাটোচ্ছ্বাসনাসিকা"—নাসার মুখ ললাটের দিকে—তাহাদের পিঙ্গলচক্ষু অবিরত সীতাকে ভীতিপ্রদান করিতেছে। বিনতানাম্নী রাক্ষসী বলিতেছে—"সীতে, তোমার স্বামিস্নেহের পরা কাষ্ঠা দেখাইয়াছ, আর প্রয়োজন নাই, এখন 'রাবণং ভজ ভর্ত্তারম্,' সম্মত না হইলে 'সর্ব্বাস্ত্বাং ভক্ষয়িষ্যামহে বয়ম্।'" লম্বিতস্তনী বিকটা রাক্ষসী মুষ্টি দেখাইয়া সীতাকে তর্জ্জন করিতেছে, আর বলিতেছে—"ইন্দ্রের সাধ্য নাই, এ পুরী হইতে তোমাকে রক্ষা করে,—স্ত্রীলোকের যৌবন অস্থায়ী—যতদিন যৌবন আছে, মদিরেক্ষণে, ততদিন সুখভোগ করিয়া লও,—রাবণের সঙ্গে সুরম্য উদ্যান, উপবন ও পর্ব্বতে বিচরণ কর। অস্বীকৃতা হইলে 'উৎপাট্য বা তে হৃদয়ং ভক্ষয়িষ্যামি মৈথিলি।'" ক্রূরদর্শনা চণ্ডোদরী এ সময়ে বিপুল শূল সীতার সম্মুখে ঘুরাইয়া বলিল—"এই ত্রাসোৎকম্পপয়োধরা হরিণশাবাক্ষীকে দেখিয়া আমার বড় লোভ হইতেছে—ইহার যকৃৎ, প্লীহা ও ক্রোড়দেশ

আমি উৎপাটন করিয়া ভক্ষণ করি।” প্রঘসা রাক্ষসীও এই কথার অনুমোদন করিল এবং অজামুখী বলিল, “মদ্য লইয়া আইস, আমরা সকলে ইহাকে ভাগ করিয়া খাই।” তৎপরে শূর্পণখা তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বলিল—“ঠিক কথা,—‘সুরা চানীয়তাং ক্ষিপ্রম্।’”

এই বিভীষিকাপূর্ণ রাজ্যে উপবাসকৃশা মৈথিলী এই সকল তর্জ্জন শুনিয়া “ধৈর্য্যমুৎসৃজ্য রোদিতি।”—নেত্রদুটি জলভারে আকুল হইল, সুন্দরী ধৈর্য্যহীনা হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

সীতার সুন্দর মুখ অশ্রুকলঙ্কিত, যিনি ভূষণ পরিলে শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়, তিনি ভূষণহীনা, যিনি চিরসুখাভ্যস্তা, তিনি চিরদুঃখিনী—“সুখার্হা দুঃখসন্তপ্তা, মণ্ডনার্হা অমণ্ডিতা।” একখানি ক্লিন্ন কৌষেয়বাস তাঁহার উপবাসকৃশ শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। পৌর্ণমাসী জ্যোৎস্নার ন্যায় তিনি সমস্ত জগতের অভীপ্সিতা। শোকজালে তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে,—ধূমজালসংসক্ত অগ্নিশিখার ন্যায় তাঁহার রূপ প্রকাশ পাইয়াও প্রকাশ পাইতেছে না, সন্দিগ্ধ স্মৃতির ন্যায় সে রূপ অস্পষ্ট। অশোকবৃক্ষে রক্ষিত নিঃসংজ্ঞদেহে ধ্যানময়ী কি চিন্তা করিতেছেন? লঙ্কার এই বিষম তেজোবিক্রম, এই অসামান্য ঐশ্বর্য্য,—শত যোজন দূরে জুটাবল্কলধারী ভ্রাতৃমাত্রসহায় রামচন্দ্র এই দুর্গম স্থানে আসিবেন কিরূপে? রাক্ষসীরা একবাক্যে বলিতেছে, তাহা অসম্ভব হইতেও অসম্ভব। রাবণ তাঁহাকে দ্বাদশমাস সময় দিয়াছিল, তাহার দশমাস অতীত হইয়া গিয়াছে, আর দুইমাস পরে পাচকগণ রাবণের প্রাতরাশের (breakfast) জন্য তাঁহার দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলিবে। সীতা এই নিঃসহায় রাক্ষসপুরীতে স্বগণের মুখ দেখিতে পান না, কেবল রাক্ষসীরা তাঁহাকে নানাবিধ অশ্রাব্য বিদ্রূপ ও তাড়না করিতেছে। এদিকে রাবণ প্রায়ই সেস্থানে আসিয়া কখন ভয় দেখাইতেছে, কখন মধুরভাষায় বলিতেছে—“তোমার সুন্দর অঙ্গের যেখানেই আমার চক্ষু পতিত হয়, সেখানেই উহা আবদ্ধ হইয়া থাকে,—তোমার মত সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী আমি দেখি নাই; তোমার চারু দন্ত এবং মনোহারী নয়নদ্বয় আমাকে উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছে। তোমার ক্লিন্ন কৌষেয়বাসখানি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক, লঙ্কার সমস্ত ঐশ্বর্য্য তোমার পদতলে, বিলাসিনি, তুমি প্রসন্ন হও।” কিন্তু এই অনশনকৃশা, শোকাশ্রুপূরিতনেত্রা, ক্লিন্নকৌষেয়বসনা তাপসী ক্রোধরক্তিমমুখে বলিলেন, “আমার প্রতি যে দুষ্টচক্ষে চাহিতেছ, তাহা এখনও কেন উৎপাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল না! দশরথ রাজার পুত্রবধূ পুণ্যশ্লোক রামচন্দ্রের ধর্ম্মপত্নীর প্রতি যে জিহ্বায় এই সকল পাপ কথা বলিলে,—তাহা এখনও বিদীর্ণ হইল না কেন? তোমার কালরূপী রামচন্দ্র আসিতেছেন, এই অপ্রমেয়-ঐশ্বর্য্যশালিনী লঙ্কা অচিরে চিরঅন্ধকারে লীন হইবে।” এই বলিয়া স্ফুরিতাধরা সীতা সঘৃণ উপেক্ষার সহিত রাবণের দিকে পৃষ্ঠ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার পৃষ্ঠলম্বিত একবেণী রাক্ষসকুলসংহারক মহাসর্পের ন্যায় অকুণ্ঠিত হইয়া রহিল।

রাবণ ক্রোধান্ধ হইয়া সীতাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল, তখন স্খলিতহেমসূত্রা, মদবিহ্বলিতাঙ্গী, ধান্যমালিনীনাম্নী রাবণের স্ত্রী তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া গৃহে লইয়া গেল।

ইহার পরে সীতার উপর রাক্ষসীগণের যেরূপ তীব্র শাসন চলিল, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু সকল অত্যাচার-উৎপীড়ন সহিতে হইবে বলিয়া কে এই ক্লিন্ন-দেহা কোমল ব্রততীকে এই অসাধারণ ব্রত-তেজো মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছিল? কে এই ফুলসম রমণীকে শূলসম কাঠিন্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল? কে এই অনশন, এই ছিন্নবাস, এই ভূশয্যাক্লিষ্ট নবনীতকোমল দেহের ভিতর এই অপূর্ব্ব অলৌকিক বিদ্যুতের শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছিল? কোন্ স্বর্গীয় আশা অসম্ভব রামাগমন ও রাক্ষস-ধ্বংসের পূর্ব্বাভাস তাঁহার কর্ণে গুঞ্জিত করিয়া অশান্তির মধ্যে তাঁহাকে কথঞ্চিৎ শান্তিকণা প্রদান করিয়াছিল? কে এই বিলাস-ঐশ্বর্য্যকে ঘৃণা ও উপেক্ষা করিতে শিখাইয়া সীতাকে পবিত্র যজ্ঞাগ্নির ন্যায় সমুদ্দীপ্ত করিয়া আমাদের অন্তঃপুরের আদর্শ করিয়া রাখিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের এক কথায় উত্তর দেওয়া যাইতে পারে, তাহাতে আমাদের ভ্রমের আশঙ্কা নাই। এই দৈন্যের মধ্যে এই আশ্চর্য্য ঐশ্বর্য্য, এই কোমলতার মধ্যে এই অসম্ভব দৃঢ়তা যদ্দ্বারা সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহার নাম বিশ্বাস। বিশ্বাস-ব্রতের ফল অবশ্যম্ভাবী, সীতা সেই বলে যেন দূর ভবিষ্যতের গর্ভ বিদারণ করিয়া পুণ্যের জয় প্রত্যক্ষ করিয়া এত তেজস্বিনী হইয়াছিলেন।

কিন্তু অসামান্যবিপৎসঙ্কুল অবস্থার নিপীড়ন সহ্য করিয়া ধৈর্য্যরক্ষা করা সকল-সময় সম্ভবপর হয় না। কখন কখন সীতা ভূতলে পড়িয়া অজস্র কাঁদিতে থাকিতেন; তিনি দুঃখের সীমা দেখিতে না পাইয়া কতকি ভাবিতেন। কখন মনে হইত, রাবণ-কথিত দুইমাস চলিয়া গিয়াছে, সূপকারগণ তাঁহার দেহ খণ্ডখণ্ড করিয়া রাবণের ভোজনের উপযোগী করিতেছে। কখন মনে হইত, চতুর্দ্দশ বৎসর ত পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাম হয় ত অযোধ্যায় ফিরিয়া গিয়াছেন; বিশালনেত্রা রমণীগণের সঙ্গে তিনি আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন। এই কথা ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ে দারুণ আঘাত লাগিত। তিনি বিশুষ্কমুখী হইয়া নিরাশ্রয়ভাবে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকিতেন, তখন তাঁহার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াও যেন প্রকাশ পাইত না—"পদ্মিনী পঙ্কদিগ্ধেব বিভাতি ন বিভাতি চ।" কখন মনে হইত, রামচন্দ্র হয় ত তাঁহার জন্য শোকাকুল হন নাই—তাঁহার হৃদয় যোগীর ন্যায়—সংসারের সুখদুঃখের ঊর্দ্ধে, তিনি পূজা ও ভালবাসা আকর্ষণ করেন, তিনি নিজে কাহারও জন্য কখন ব্যাকুল হন নাই—এই ভাবিতে তাঁহার হৃদয় দুরুদুরু করিয়া উঠিত, তিনি আপনাকে একান্ত নিরাশ্রয় মনে করিতেন। কখন বা রাক্ষসীগণের তাড়না অসহ্য হইলে তিনি ক্রুদ্ধস্বরে বলিতেন—"রাক্ষসীগণ, তোমরা অধিক কেন বল, আমাকে ছিন্নভিন্ন বা বিদীর্ণ করিয়া ফেল, অথবা অগ্নিতে দগ্ধ কর, আমি কিছুতেই রাবণের বশীভূতা হইব না।" এই ভাবে তিনি একদিন দুঃখের প্রান্তসীমায়

উপস্থিত হইয়াছিলেন, অশোকের একটি শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া তিনি ভাবিতেছিলেন,—তাঁহার প্রাণ বড় ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সময় কে তাঁহাকে শিংশপাবৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে চিরমধুর রামনাম শুনাইল, সেই নাম শুনিয়া অকস্মাৎ তাঁহার চিত্ত মথিত হইয়া চক্ষের প্রান্তে অশ্রুকণা দেখা দিল। তিনি সজলচক্ষে বক্র কেশরাশির ভার এক হস্তে অপসৃত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে চিরেপ্সিত-দয়িতনাম-কীর্ত্তনকারীকে দেখিতে লাগিলেন। অনাবৃষ্টিসন্তপ্ত পৃথিবী যেরূপ জলবিন্দুর জন্য উৎকণ্ঠিতভাবে প্রত্যাশা করে, মধুর রামকথা শুনিবার জন্য তিনি সেইরূপ ব্যগ্র হইয়া অপেক্ষা করিলেন।

হনুমান্ কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন, "হে ক্লিন্নকৌষেয়বাসিনি, আপনি কে, অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন? আপনার পদ্মপলাশচক্ষু জলভারে আকুলিত হইয়াছে কেন? আপনি কি বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী,—স্বামীর সঙ্গে কলহ করিয়া এখানে আসিয়াছেন, কিংবা চন্দ্রহীনা হইয়া চন্দ্রের রমণী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন? আপনি যক্ষ, রক্ষ, বসু, ইহাদের কাহার রমণী? আপনি ভূমিস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার অশ্রুজল দেখা যাইতেছে, এজন্য আমার আপনাকে দেবতা বলিয়াও বোধ হইতেছে না। যদি আপনি রামের পত্নী সীতা হন, দুরাত্মা রাবণ যদি জনস্থান হইতে আনিয়া আপনার এ দুর্দ্দশা করিয়া থাকে, তবে সে কথা বলিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।" সীতা সংক্ষেপে নিজের পরিচয় দিয়া হনুমানকে সমীপবর্ত্তী হইতে আজ্ঞা করিলে দূত নিম্নে অবতরণ করিলেন। তখন হনুমানকে দেখিয়া তিনি শঙ্কিত হইলেন,—সহসা মনে হইল, এ ত ছদ্মবেশধারী রাবণ নহে? যিনি দয়িতের সংবাদপ্রাপ্তির আশায় ক্ষণপূর্ব্বে উৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি সহসা ভয়বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন, ভয়ে অশোকের শাখা হইতে বাহুলতা স্খলিত হইয়া পড়িল, তিনি মৃত্তিকার উপর বসিয়া পড়িলেন—"যথা যথা সমীপং স হনুমানুপসর্পতি। তথা তথা রাবণং সা তং সীতা পরিশঙ্কতে॥"

কিন্তু এই সন্দেহ দূর করা হনুমানের পক্ষে সহজ হইল। রামের সংবাদ পাইয়া সীতার মুখ প্রফুল্লিত হইয়া উঠিল, কৃশাঙ্গীর চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল, তিনি একটি কথা নানা ইঙ্গিতে হনুমানের নিকট বারংবার জানিতে চাহিলেন—রাম তাঁহার জন্য শোকাতুর হইয়াছেন কি না? হনুমান্ তাঁহাকে জানাইলেন, "যিনি গিরির ন্যায় অটল, তিনি শোকে উন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার গাম্ভীর্য্য চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দিবারাত্রি তাঁহার শান্তি নাই,—কুসুমতরু দেখিলে উন্মত্তভাবে তিনি আপনার জন্য কুসুম তুলিতে যান,—পদ্মপ্রসূনগন্ধি মন্দমারুতের স্পর্শে মনে করেন, ইহা আপনার মৃদু নিশ্বাস, স্ত্রীলোকের প্রিয় কোন সামগ্রী দেখিলে তিনি উন্মত্ত হইয়া আপনার কথা বলিতে থাকেন, জাগরণে আপনার কথা ভিন্ন আর কিছু বলেন না, আবার সুপ্ত হইলেও 'সীতেতি মধুরাং বাণীং ব্যাহরন্ প্রতিবুধ্যতে।' তিনি প্রায়ই উপবাসে দিনযাপন করেন,—'ন মাংসং রাঘবো ভুঙ্‌ক্তে ন চৈব মধু সেবতে।'" এই কথা শুনিতে শুনিতে

সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, সাশ্রু-চক্ষে বলিয়া উঠিলেন, "অমৃতং বিষসংপৃক্তং ত্বয়া বানর ভাষিতম্।"

তৎপরে হনুমান্ রামের করভূষণ অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানস্বরূপে সীতাকে প্রদান করিলেন—"গৃহীত্বা প্রেক্ষমাণা সা ভর্ত্তুঃ করবিভূষিতম্। ভর্ত্তারমিব সম্প্রাপ্তা সা সীতা মুদিতাভবৎ।" তখন সেই চারুমুখীর বহুদিনের দুঃখ ঘুচিয়া যে আনন্দরেখায় গণ্ডদ্বয় উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা আমরা চিত্রিত করিতে পারিব না, সেই অঙ্গুরীর সুখস্পর্শে বহুদিনের স্মৃতি, বহু সুখদুঃখ, সেই গদগদনাদি গোদাবরীপুলিনের রামসঙ্গ, কত আদর ও স্নেহের কথা মনে পড়িল, তাঁহার কৃষ্ণপক্ষ্মান্ত চক্ষুর কোণ হইতে অজস্র অশ্রুবিন্দু পতিত হইতে লাগিল। হনুমান্ সীতাকে পৃষ্ঠে করিয়া রামের নিকট লইয়া যাইতে চাহিলে সীতা স্বীকৃতা হইলেন না। "রাক্ষসেরা পশ্চাৎ অনুসরণ করিলে আমি সমুদ্রের মধ্যে পড়িয়া যাইব, আর স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিব না।"

আর একদিনের চিত্র মনে পড়ে,—রাক্ষসগণ নিহত হইয়াছে, সীতাকে বিভীষণ রামের নিকট লইয়া যাইতে আসিলেন। নানা রত্ন ও বিচিত্র বস্ত্র দেখিয়া পাংশুগুণ্ঠিত-সর্ব্বাঙ্গী সীতা বলিলেন—"অস্নাতা দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভর্ত্তারং রাক্ষসেশ্বর।" হনুমান্ সীতার সঙ্গিনী রাক্ষসীদিগকে তাড়না করিতে গেলে ক্ষমাশীলা সীতা বারণ করিয়া বলিলেন, "প্রভুর নিয়োগে ইহারা যাহা করিয়াছে, তজ্জন্য ইহারা দণ্ডার্হা নহে।"

তাহার পর বিশাল সৈন্যসংঘের সম্মুখে রাম সীতাকে অতি কঠোর কথা বলিলেন, লজ্জায় লজ্জাবতী যেন মরিয়া গেলেন, কিন্তু তেজস্বিনীর মহিমা স্ফুরিত হইয়া উঠিল;—রামের কঠোর উক্তি প্রাকৃতজনোচিত, ইহা বলিতে সাধ্বীর কণ্ঠ দ্বিধাকম্পিত হইল না—তিনি পতির পদে অশেষ প্রণতি জানাইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং উদ্যত অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া অধোমুখে স্থিত স্বামীকে প্রদক্ষিণপূর্ব্বক জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করিলেন।

তৎপরে কষিতসুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় এই দেবীকে উঠাইয়া অগ্নি রামের হস্তে অর্পণ করিয়া বলিলেন,—"যিনি আজন্মশুদ্ধা, তাঁহাকে আর আমি কি শুদ্ধ করিব!"

এই সতীচিত্র বাল্মীকি চিরজীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন, ইঁহার বিশাল আলেখ্য হিন্দুস্থানের গৃহে গৃহে এখনও সুশোভিত রহিয়াছে, অলক্ষিতভাবে সীতার পত্নীত্ব হিন্দুস্থানের পত্নীকুলের মধ্যে অপূর্ব্ব সতীত্ববুদ্ধির সঞ্চার করিয়া আমাদের দেশকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সাগরমন্থন।

হে জনসমুদ্র, আমি ভাবিতেছি মনে
কে তোমারে আন্দোলিছে বিরাট্ মন্থনে
অনন্ত বরষ ধরি'! দেবদৈত্যদলে
কি রত্নসন্ধান লাগি' তোমার অতলে
অশান্ত আবর্ত্ত নিত্য রেখেছে জাগায়ে
পাপে পুণ্যে সুখে দুঃখে ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
ফেনিল কল্লোলভঙ্গে? ওগো দাও দাও
কি আছে তোমার গর্ভে—এ ক্ষোভ থামাও!
তোমার অন্তরলক্ষ্মী যে শুভপ্রভাতে
উঠিবেন অমৃতের পাত্র বহি' হাতে
বিস্মিত ভুবনমাঝে,—লয়ে বরমালা
ত্রিলোকনাথের কণ্ঠে পরাবেন বালা
সেদিন হইবে ক্ষান্ত এ মহামন্থন,
থেমে যাবে সমুদ্রের রুদ্র এ ক্রন্দন।

শ্মশানতলা।

কাটোয়া-অঞ্চলে শ্মশানতলা-নামক স্থান আছে। যোগেশ্বরমন্দির তথায় প্রসিদ্ধ এবং তাহার সমুন্নত ত্রিশূলাঙ্কিত চূড়া জাহ্নবীবক্ষ হইতে আজিও নৌকাযাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেবস্থানের চারিদিকে চক্রাকারে প্রাচীন বটবৃক্ষের সারি, দেখিলে মনে হয় মূলের বিপুল তরু অনেকদিন অন্তর্হিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান পাদপশ্রেণী তাহারই জটাজালোৎপন্ন সন্ততিধারা।

এই শ্মশানতলার সঙ্গে ভূতপ্রেতের অনেক কাহিনী জড়িত আছে। অতএব সচরাচর এখানে লোকসমাগম বড় বিরল। বৎসরের মধ্যে দুইবার এখানে মেলা বসিয়া থাকে, ফাল্গুনে শিবচতুর্দ্দশীতে, আর চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে। শিবরাত্রির ধুমধাম দুই দিনের বেশী থাকে না, কিন্তু গাজন উপলক্ষে দশদিন সমান ভিড়। তাহাতে বীরভূম-প্রদেশের সাঁওতালেরা পর্য্যন্ত যোগ দিয়া থাকে।

চল্লিশবৎসর পূর্ব্বে অরবিন্দ গঙ্গোপাধ্যায়

এই মন্দিরের পূজারী ছিলেন। গাঙুলি-মহাশয় বলিলে চারিদিকে দশক্রোশের ভিতর তাঁহাকেই বুঝাইত, কেন না, লোকে বিশ্বাস করিত যে, তিনি সিদ্ধতান্ত্রিক। বাস্তবিক তাঁহার সুদীর্ঘ সুগৌর তনুতে, সুপ্রশস্ত ললাটতলে প্রৌঢ়বয়সেও যে যুবজনোচিত আনন্দজ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইত, সচরাচর বিষয়াসক্ত লোকে তাহা নিতান্ত দুর্ল্লভ। তাহার উপর অনন্যসাধারণ কতক্‌গুলি শক্তি তাঁহাতে বিকশিত হইয়াছিল। ফলিত জ্যোতিষে এবং করকোষ্ঠীতে তিনি পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার টোট্‌কা ঔষধ কখন ব্যর্থ হইত না। সকলের উপর সর্পচিকিৎসায় তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি দেখা যাইত না। সর্পদষ্ট বিস্তর লোককে মন্ত্রৌষধিবলে বাঁচান ছাড়া সর্পভয়নিবারণের নানা উপায় গাঙুলি-মহাশয়ের জানাশুনা ছিল। তন্মধ্যে সসর্প গৃহ স্বচক্ষে না দেখিয়াও কেবলমাত্র লোক-মুখে তাহার বর্ণনা শুনিয়া খড়িগণনাপূর্ব্বক বিষধরের অবস্থানস্থান নির্দ্দেশ করার ক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান এবং প্রধানত এই গুণে তিনি সকল শ্রেণীর পূজনীয় ছিলেন।

দয়াদাক্ষিণ্যের জন্যও গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয় লোকপ্রিয় ছিলেন। ধনীর দ্বারে স্বেচ্ছায় বড় যাইতেন না এবং তাঁহার নিয়োগ-কর্ত্তা মন্দিরের সেবাইত জমিদারের গৃহেও গতিবিধি তেমন ছিল না। কিন্তু শ্মশান-তলার চতুঃসীমায় চারিপাঁচক্রোশের মধ্যে এমন দীনদুঃখী কেহ ছিল না, যাহার খবর তিনি না রাখিতেন। ইহাতে তাঁর কোন ভেদজ্ঞান ছিল না। পাপপুণ্যের গৃহে সমভাবে তিনি করুণা বিতরণ করিয়া আসিতেন। পল্লীর ভদ্রসমাজে ইহাতে কথা না উঠিত, এমত নহে, কিন্তু তিনি বলিতেন যে, দেবতার বৃষ্টি উর্ব্বর অনুর্ব্বর ভূমি বিচার করে না। পাপী তাপী সকলকে সমভাবে প্রেমবিতরণের মত ধর্ম্ম আর নাই। সিদ্ধতান্ত্রিক নামে পরিচিত লোকের মুখে প্রকারান্তরে বৈষ্ণবের সাধুবাদ শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইত। তাহাতে গাঙুলিমহাশয় কেবল হাসিতেন।

নিবিড়বটচ্ছায়াতলে বসিয়া বসিয়া বৈশাখজ্যৈষ্ঠের দিনে তাঁহার প্রাণ প্রখর-রৌদ্রক্লিষ্ট জীবমাত্রের জন্য পুড়িত। এবং প্রকৃতপক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির পর হইতেই পরের জন্য তাঁর ছুটাছুটি সুরু হইত। নিজের অভাব নিতান্ত সামান্য, কাজেই মন্দিরের আয়ের যে অংশ তিনি পাইতেন, তাহাতে তাঁহার কিছু কিছু সঞ্চয় হইত। এই অর্থ গাঙুলিমহাশয় নববর্ষের প্রথমদিন হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত জলছত্রের ব্যবস্থায় ব্যয় করিতেন। লোকে দেখিত, শ্মশানতলার অদূরে কাটোয়ার রাজপথে গাঙুলিমহাশয় গঙ্গাজলপূর্ণ অনেকগুলি কলস, গুড় ও ভিজা ছোলার রাশি লইয়া বসিয়া আছেন এবং সহাস্যমুখে প্রায় সমস্ত-দিন তৃষ্ণার্ত্ত পথিকদের ধরিয়া ধরিয়া সেবা করিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থায় গব্বাদির জন্য বড় বড় ডাবায় পৃথক্ ভাবে জল রক্ষিত হইত, পক্ষীদের জন্য প্রত্যেক বৃক্ষমূলে নিজে তিনি তণ্ডুলকণা ছড়াইয়া দিতেন। তাহা ছাড়া প্রত্যূষে স্নানান্তে যাতায়াতের পথে স্বহস্তে ছোটবড় সকল গাছের গোড়ায় অল্পবিস্তর জলসেচন, এই সময়ে তাঁহার প্রাতঃকৃত্যের প্রধান অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইত। যখন-তখন

বলিতেন, "যোগেশ্বর আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, বৎসরের মধ্যে অন্তত দুইটি মাস আছে, যখন জড় জীব সকলের দুঃখ একই রকমের। শীতল বটের ছায়ায় বসিয়া বসিয়া প্রাণ আমার সর্ব্বভূতের জন্য হুহু করে, তাই যথাসাধ্য এ তৃষ্ণানিবারণের ব্রত লইয়াছি।" প্রাত্যহিক জলদানব্রত নিষ্ঠার সহিত সমাধান করিয়া সূর্য্যাস্তের পর গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় এই সময়ে পুনরায় গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন এবং তার পর স্বপাক হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন।

নিজের জন্য তাঁহাকে কেহ কখন অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিতে দেখে নাই, কিন্তু কোন গ্রামে জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে শুনিলে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াও তিনি তাহার ব্যবস্থা করিতেন। কাটোয়া-অঞ্চলে ছোটবড় অনেকগুলি দীর্ঘিকা গাঙুলিমহাশয়ের ভিক্ষা এবং যত্নের ফল, তাঁহার স্বর্গারোহণের পর গাঙুলিদীঘি নামে তাহাদের নামকরণ হইয়াছে। তাঁহার জীবিতমানে কেহ তদীয় নামের সহিত তাহাদিগকে সংযুক্ত করিলে তিনি ক্ষুব্ধ হইতেন। বিনীতভাবে বলিতেন, "বাপুসকল, মানুষের নাম কয়দিন টিকিবে? তোমরা যোগেশ্বরের নাম কর।"

প্রৌঢ়বয়স্ক গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয়কে কখন-কখন পল্লীগ্রামের পাঠশালায় এবং যুবকদের খেলার আড্ডায় দেখা যাইত। তাহাদিগকে শ্যামাবিষয়ক এবং সঙ্কীর্ত্তনের গানে উৎসাহিত করা তাঁর একটি প্রিয় কার্য্য ছিল। তিনি বলিতেন, "পরচর্চ্চায় যে আমোদ পায়, কাজে না হইলেও মনে সে পাপী,—একটুতে পঙ্কে ডুবিতে পারে।" বিশেষত স্ত্রীপুরুষের নীতিচরিত্রঘটিত অপবাদ রটাইয়া যাহারা আমোদ পায়, তাঁহার কাছে সহজে তাহাদের নিস্তার ছিল না। তাঁহার মতে এই শ্রেণীর জীবেরা সংসারের যত অনিষ্টকারী, আর কেহ তত নহে। বলিতেন, "নিন্দা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকতে নয়। সন্দেহমাত্র সম্বল করিয়া যাহারা অন্যের চরিত্রে দোষারোপ করে, এই তিনকেই লঘু করিয়া তাহারা নিন্দিতের ভিতর সম্ভ্রমের ভাব কমাইয়া আনে। তখন পাপে পড়া কিছু বিচিত্র নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপবাদপ্রচার আগে, কার্য্যত পাপ পরে।" সচরাচর খেলা ও গানের আড্ডায়—বিশেষত এই বাঙ্‌লাদেশে—এই শ্রেণীর কল্পনা-জল্পনা যত মুখরোচক, আর কিছুই তেমন নয়। কাজেই গাঙুলিমহাশয়ের এই প্রকারের উপদেশ অধিকাংশ স্থলে হাস্যরস উদ্রিক্ত করিত মাত্র এবং ইহা লইয়া তাঁহার অসাক্ষাতে তদীয় যৌবনকালের অজ্ঞাত ইতিহাসের যেরূপ সমালোচনা হইত, একালের গবেষণাপূর্ণ অনেক পুরাতত্ত্ব তাহাতে লজ্জা পাইতে পারে।

১২৭০ সালের শারদীয়া মহাষষ্ঠীর রাত্রি বাঙ্‌লাদেশে চিরস্মরণীয়। অভূতপূর্ব্ব প্রবল ঝটিকার সে ভয়ানক রাত্রি গঙ্গোপাধ্যায়-মহাশয়ের পক্ষে অনেকের মত কাল হইয়া আসিয়াছিল। দিবাবসানে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, মা দুর্গা সেবার প্রলয় ঘটাইতে আসিতেছিলেন। যোগেশ্বরমন্দির যথাসাধ্য সুরক্ষিত করিয়া ঝড়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঙ্গাতীরে আসিয়া বসিয়াছিলেন এবং অস্পষ্টালোকে নৌকা বা মনুষ্যদেহ ভাসিয়া যাইতে দেখিলেই নিজের প্রাণের

মায়া ত্যাগ করিয়া উত্তাল ভাগীরথীতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিলেন। তাহাতে স্ত্রীপুরুষের অনেকগুলি দেহ তীরে উঠিল বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনটিতেই প্রাণ ছিল না। মধ্যাহ্নরাত্রি পর্য্যন্ত ঝড়বৃষ্টিতে এইরূপ পরিশ্রান্ত হওয়ার পর অকস্মাৎ তাঁহার মনে হইল, যোগেশ্বরমন্দিরচূড়া ভূমিসাৎ হইয়াছে। গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয় দ্রুতগতি ফিরিয়া চলিলেন। দূর হইতে দেখিলেন, তাঁহার অনুমান কতকটা সত্য। মন্দিরশীর্ষ ভাঙিয়া পড়ে নাই বটে, কিন্তু ভগ্ন বটের ডালে প্রাঙ্গণ ছাইয়া গিয়াছে। তখন দেবমূর্ত্তির অনিষ্ট-আশঙ্কায় তিনি মন্দিরদ্বারাভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন।

পরদিন প্রভাতে দেখা গেল, গঙ্গোপাধ্যায়মহাশয়ের জীবনশূন্য দেহ মন্দিরদ্বার রোধ করিয়া পড়িয়া আছে—এবং এক প্রকাণ্ড ভগ্ন বটশাখা অপ্রতিহত বেগে আসিয়া দেউলের কিয়দংশসহিত তাঁহার উত্তমাঙ্গ চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

আজিকার ভারতবর্ষ।

১

কোন অপ্রকাশিতনামা দাতার অর্থে, পৃথিবী-প্রদক্ষিণ-উদ্দেশে, প্যারিস্‌-বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি বৃত্তিভাণ্ড স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে, কোন-বিদেশ-সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান আরম্ভ করিয়া, যদি কোন অধ্যাপক সেই দেশে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া স্বীয় আরব্ধ গবেষণার চূড়ান্ত করিতে চাহেন, তাহা হইলেই তিনি এই বৃত্তির অধিকারী হইবেন। এই বৃত্তিভাণ্ডের সাহায্যে, অধ্যাপক "অ্যাল্‌বের মেতঁ্যা" ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়া, ভারতবর্ষীয় সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে, "আজিকার ভারতবর্ষ" এই নামে একটি অতীব উপাদেয় গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থের যে অংশগুলি আমাদের কৌতূহলজনক অথবা শিক্ষাপ্রদ, তাহার সারমর্ম্ম এই প্রবন্ধে উদ্ধৃত করা যাইবে। আর-একটি কথা এখানে বলা আবশ্যক। সর্ব্বপ্রকার পূর্ব্বসংস্কার মন হইতে বিদূরিত করিয়া, প্রত্যক্ষ দেখিয়া-শুনিয়া গ্রন্থকারের যেরূপ ধারণা হইবে, ঠিক্‌ তাহাই তিনি নিরপেক্ষভাবে লিখিবেন, বৃত্তি-সংস্থাপক মহোদয়ের এইরূপ সুস্পষ্ট অভিপ্রায় ছিল। অধ্যাপক মেতঁ্যার লিখিবার ধরণ-ধারণ দেখিয়া মনে হয়, তিনি সেই-অভিপ্রায়-অনুযায়ী লিখিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তবে, কোন বিদেশীয় পর্য্যটক, কোন দেশে স্বল্পকাল অবস্থিতি করিয়া, সেই-দেশ-সম্বন্ধে সব কথা ঠিক্‌-মতো বলিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না।

গ্রন্থকার,—হিন্দু, মুসলমান ও পার্সী

* L'Inde d'aujourd'hui—Albert Metin.

প্রভৃতির সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন :—

ভারতবর্ষে হিন্দুর সংখ্যা ২০,৭৭,৩১,৭২৭; শিখদিগের সংখ্যা ১৯,০৭,৪৩৩; মুসলমানের সংখ্যা ৫,৭৩,২১,১৬৪; আদিমবাসীদিগের সংখ্যা ৯২,৪০,৪৬৭; খৃষ্টানদের সংখ্যা ২২,৮৪,৩৪০; পার্সিদের সংখ্যা ৮৯,৯০৪; এবং ইহুদির সংখ্যা ১৭,০০০।

হিন্দু ও মুসলমান, এই দুইটিই ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতিবিভাগ; এই দুই জাতিই সমস্ত ভারতবর্ষে পরিব্যাপ্ত; এবং এই উভয়ের মধ্যে ভীষণ বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত রহিয়াছে। হিন্দু কিংবা মুসলমানেরা—এমন কি, তাহাদের মধ্যে যাহারা সুশিক্ষিত, তাহারাও য়ুরোপীয়দিগের সহিত যে কখন মিশিয়া যাইবে, তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সে-পক্ষে তাহাদের ধর্ম্মই বিষম প্রতিবন্ধক। কেবল পার্সীদের মধ্যে যাহারা শিক্ষিত, তাহারাই ইংরাজ হইয়া যাইতেছে। তবে কি না, পার্সীদের সংখ্যা নিতান্তই অল্প; কিন্তু সংখ্যায় অল্প হইলেও, উহারা উদ্যমশীল, উদ্যোগী ও ধনাঢ্য।

বোম্বাইনগরে তুলার যে-সকল কলকারখানা আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ স্বত্বাধিকারী পার্সী। আবার, উহাদের মধ্যে অনেকেই উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক; বোম্বায়ের সাহিত্যসভায়, রাষ্ট্রীয় সভায়, পৌরকার্য্যনির্ব্বাহক সভায় উহাদের দেখিতে পাওয়া যায়; এমন কি, ভারতবর্ষের যে প্রতিবাদীর দল ইংরাজের নিকট সমান অধিকারলাভের জন্য ও উচ্চপদে নিযুক্ত হইবার জন্য দাবী করে, কখন-কখন উহাদিগকে ঐ দলেরও অগ্রণীরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এ-দেশীয় যে দুইজন পার্লমেণ্টের সভ্য, তাহারা উভয়েই পার্সী;—একজন রক্ষণশীল ও আর-একজন উদার দলের অন্তর্ভুক্ত। কি রাষ্ট্রনীতি, কি বিদ্যাবুদ্ধি, কি বাণিজ্যব্যবসায়—সকল বিষয়েই পার্সীরা হিন্দুদিগকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। হিন্দুরাও বুদ্ধিমান্, কার্য্যক্ষম ও সুশিক্ষিত বটে, কিন্তু বর্ণভেদের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকায়, তাহারা য়ুরোপীয়দিগের সহিত মিশিতে পারে না। ইহার বিপরীতে, পার্সীরা পাশ্চাত্য আচারব্যবহার গ্রহণে উন্মুখ। উহাদের ধুচুনি-টুপি ক্রমশ উঠিয়া যাইতেছে, তাহার স্থলে একপ্রকার গোলাকার শিরোবেষ্টন প্রচলিত হইতেছে। শুনা যায়, একজন ধনাঢ্য পার্সী সিপাহি-বিদ্রোহের সময়, য়ুরোপীয় পরিচ্ছদ পরিধানের দৃষ্টান্ত সর্ব্বপ্রথমে প্রদর্শন করেন। কেন তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিলেন, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি নাকি বলিয়াছিলেন :—"হিন্দুদের জানা আবশ্যক, আমরা চিরকাল ইংরাজের পক্ষেই থাকিব, কখনই তাহাদের প্রতিকূলে যাইব না।" অনেকদিন হইতেই সঙ্গতিসম্পন্ন পার্সীরা ইংরাজের পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছে; ইংরাজের আস্‌বাবে গৃহ সজ্জিত করিতেছে; ও ইংরাজি ধরণে অভ্যর্থনাদি করিতেছে। কতিপয় ধনাঢ্য পার্সীর গৃহ দর্শন করিতে গিয়া, চারিদিকে সতৃষ্ণনয়নে অনুসন্ধান করিয়াও, মিনার কাজ, কাঠের খোদাই কাজ, তাঁবার জিনিস, গালিচা প্রভৃতি চমৎকার দেশীয় শিল্পসামগ্রী দেখিতে পাইলাম না। গৃহের সর্ব্বত্রই ইংরাজি আস্‌বাব, ইংরাজি কাগজ, ইংরাজি কাপড়।

একজন পার্সী যুবক স্বীয় খুল্লতাতের গৃহ আমাদিগকে দেখাইতেছিলেন; তিনি খুব তারিফ্ করিয়া একটি "ক্রোমোলিথোগ্রাফ্" আমাকে দেখাইয়া বলিলেন:—"এই ছবিটি কি সুন্দর!"—ছবিটি হ'চ্চে হাইড্পার্কে "চৌঘুড়ি-ক্লবের" সম্মিলনের একটি প্রতিকৃতি। এই "জেণ্টল্ম্যান্‌টি" বিলক্ষণ ধনী ও যথেষ্ট শিক্ষিত; ঐ ক্লবের সভ্য হইবেন বলিয়া তিনি অনায়াসেই আশা করিতে পারেন; তবে কি না, শ্যামবর্ণের প্রতিকূলে ইংরাজের যেরূপ কুসংস্কার, তাহাতে সে আশা পূর্ণ না হইতেও পারে। ভদ্রবংশীয় পার্সীযুবকেরা ইংরাজসমাজে মিশিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকে; শিক্ষা শেষ করিবার জন্য তাহারা প্রায় সকলেই ইংলণ্ডে যাত্রা করে। তাহাদের মধ্যে অনেকেই খুব দেশপর্য্যটন করিয়াছে, এবং অনেক ভাষায় কথা কহিতে পারে। তাহাদের মধ্যে কেহ-কেহ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী; আবার অনেকেই পাশ্চাত্যদেশের সংশয়বাদ গ্রহণ করিয়াছে ও স্বীয় প্রাচীন আচারব্যবহারের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া থাকে। পার্সীদের প্রাচীনশাস্ত্রানুসারে ধূমপান নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়। জোরোয়াষ্টার এ কথা স্বীকার করেন যে, শুধু রন্ধনের জন্য অগ্নি ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু বলেন, বিনা-প্রয়োজনে, পঞ্চভূতের মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, সেই অগ্নিকে নিশ্বাসের স্পর্শে দূষিত ও অপবিত্র করা—ইহা অপেক্ষা দেবাবমাননা আর কি হইতে পারে? পার্সী-ধূমপায়ীর নিকট এইরূপ আপত্তি উত্থাপিত হইলে তিনি তাহার উত্তরে এইরূপ কূটতর্ক করেন যে, *জোরোয়াষ্টারের সময় তামাক্-সামগ্রীটা* অজ্ঞাত ছিল; অতএব পার্সী-ধর্ম্মের নিষিদ্ধ সামগ্রীর তালিকার মধ্যে উহাকে ধরা যাইতে পারে না। ভারতবর্ষের মধ্যে প্রায় শুধু পার্সীরাই স্বীয় পত্নীদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকে এবং তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া প্রকাশ্যস্থানে লইয়া যায়। সঙ্গতিসম্পন্ন পার্সী-মহিলারা দ্বিচক্র-রথারোহণে ও টেনিস্-ক্রীড়ায় ইংরাজ-ললনাদিগের সহিত টক্কর দেয়। উহাদের মধ্যে অনেকে বালিকাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত। এই সকল পার্সী-মহিলারা খর্ব্বাকৃতি, কৃশ, চোখে-চস্‌মা; উহাদের মুখে জাগ্রৎ-জীবন্ত ভাব স্ফূর্ত্তি পায়; হিন্দুমহিলাদিগের ঔৎসুক্যহীন নিতান্ত সরল মুখের ভাব ইহার ঠিক্ বিপরীত। যাহা হউক, পার্সী-মহিলারা এখনও দেশীয় ধরণে শাড়ী পরিধান করে। পার্সীদের স্থাপিত বালিকাবিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যপ্রভাব সর্ব্বাংশে প্রবেশ করিয়াছে। ছাত্রীরা ইংরাজিতে গান গাহে, "God save the King"—এই সুর পিয়ানোয় বাজায়। পার্সীরা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প না হইলে, উহারা যেরূপ সর্ব্বপ্রকার পাশ্চাত্যপ্রভাব গ্রহণে উন্মুখ, তাহাতে উহারা ভারতবর্ষকে দ্বিতীয় জাপান—কিংবা, অন্তত স্বতন্ত্রশাসনাত্মক একটি উপনিবেশ করিয়া তুলিতে পারিত।

ভারতবর্ষীয়-ধর্ম্ম-সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন:—

বহু পুরাকাল হইতে, ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানাবিধ দেবালয়ে সমাচ্ছন্ন। কোন প্রতিমূর্ত্তি তরুতলে, কোন স্থূলধরণে গঠিত প্রস্তরমূর্ত্তি কোন উৎসের নিকট কিংবা

কোন শৈলপার্শ্বে স্থাপিত। ঐ মূর্ত্তিগুলি পদে-পদে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, দেবতারা সর্ব্বত্রই অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান, এবং কোন পদার্থ যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, তাহাদের মধ্যেও তাঁহাদের আত্মা বিরাজমান। হিরোডোটাস্ প্রাচীন মিসরবাসীদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ভারতবাসী-দিগের সম্বন্ধে বিলক্ষণ খাটে। অর্থাৎ,"মানব-মণ্ডলীর মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপরায়ণ।" এদিকে আবার শাক্যমুনি প্রচার করেন :— "জীবন যন্ত্রণাময়, আত্ম-অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া অনন্তে বিলীন হওয়াই মনুষ্যের পরম সুখ।" যদিও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাঁহার সমকালীন হিন্দুসন্ন্যাসীদিগেরও এই মত ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত এইমাত্র প্রভেদ যে, শাক্য-মুনি দেবতার অস্তিত্ব ও বর্ণভেদ মানিতেন না। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে খৃষ্টোত্তর পঞ্চ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রবল ছিল। তাহার পর, ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে আবার ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়। আধুনিক হিন্দুধর্ম্ম প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মেরই রূপান্তরবিশেষ ; উহার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবচিহ্ন এখনও-পর্য্যন্ত কিছু-কিছু লক্ষিত হয়। পৌরাণিক হিন্দু-ধর্ম্মের মধ্যে এক্ষণে বুদ্ধদেব স্থান পাইয়াছেন ; তিনি এক্ষণে বিষ্ণুর একটি অবতার বলিয়া পরিগণিত।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্ত্তিই পৌরাণিক হিন্দুধর্ম্মের কেন্দ্রস্থল। ইহার মধ্যে ব্রহ্মা তেমন লোকপ্রিয় হইতে পারেন নাই। সমস্ত ভারতের মধ্যে তাঁহার একটি-মাত্র মন্দির বিদ্যমান। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অর্থে ব্রহ্মার ধর্ম্ম বুঝায় না ; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অর্থ— ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম। শিব ও বিষ্ণুই ভারত-বর্ষের লোকপ্রিয় দেবতা। উত্তর-ভারতে বিষ্ণুর ও দক্ষিণ-ভারতে শিবের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাব। ব্যবহারক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম্ম অতীব বিস্তৃত—একপ্রকার সর্ব্বধর্ম্মের সার-সংগ্রহ বলিলেও হয়। হিন্দুধর্ম্ম যে-কোন-দেবতাকে আত্মসাৎ করিয়া লইতে পারে— কোন দেবতাকেই বর্জ্জন করে না। যেমন একদিকে, "ক্যাথলিক্"খৃষ্টসম্প্রদায়ের ধর্ম্মপ্রচারকেরা খৃষ্টানধর্ম্মে নবদীক্ষিত হিন্দু-দিগকে দেবালয়ে যাইতে কিংবা তৎসংক্রান্ত কোন কাজ করিতে নিষেধ করেন, তেমনি তাহার বিপরীতে, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুরা খৃষ্টধর্ম্মের কোন উৎসব-যাত্রায় কিংবা কোন খৃষ্টগির্জ্জার সম্মুখে আরাধনায় যোগ দিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না। অষ্টাদশ শতাব্দীর কতিপয় খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক, যাহাতে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সহজে খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারে, এই উদ্দেশে আপনাদিগকে যে-সময়ে শ্বেত-ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, বাইবেল-গ্রন্থকে পঞ্চম বেদ বলিয়া প্রতিপাদন করেন, ব্রহ্মা আব্রাহামের অপভ্রংশ, কৃষ্ণ খৃষ্টের অপভ্রংশ, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন ইহার প্রতিবাদ ব্রাহ্মণেরা করে নাই,—ইহার প্রতিবাদ খৃষ্টানেরাই করিয়াছিল ; সাধারণ খৃষ্টানদিগের নিকট এই সব কথা অখৃষ্টানো-চিত বলিয়া মনে হইয়াছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধর্ম্মমতসম্বন্ধে যে তেমন বাঁধাবাঁধি নাই, তাহার কারণ, তাহাদের মধ্যে সেরূপ কোন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় শাসনতন্ত্র নাই—পোপ্ নাই, বিশপ্ নাই, বিচারসভা নাই, সকলে

সমবেত হইয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য কোন কার্য্যের মীমাংসা ও শেষনিষ্পত্তি করিবার কোন উপায় নাই।

মুসলমানদিগের সম্বন্ধে গ্রন্থকার এইরূপ বলেন :—

যতই বঙ্গদেশ ও দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই কাটা-ছাঁটা পরিচ্ছদের পরিবর্ত্তে সেলাই-হীন ধুতি-কাপড়ের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। দর্জির শিল্প; বুটাদার কাজ, এদেশে মুসলমানকর্ত্তৃকই প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। শীতদেশের উপযোগী লম্বা জামা বা চাপ্‌কান এবং রেশ্‌মি কিংবা মখ্‌মলের জরির-কাজ-করা আঁটা-সাঁটা ফতুয়া এখন ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়াছে। মুসলমানেরা প্রথম এদেশে পাগ্‌ড়ি প্রবর্ত্তিত করে। এক্ষণে হিন্দুরাও বর্ণ ও শ্রেণী ভেদে বিবিধ-আকারের পাগ্‌ড়ি গ্রহণ করিয়াছে। দাড়িরাখা অভ্যাসটি মুসলমানেরাই এদেশে আনিয়াছে। এই অভ্যাসটি এখন আর মুসলমানজাতির মধ্যে বদ্ধ নাই।

যদিও দুই বৃহৎ মুসলমান-সম্প্রদায় মুসলমান-ধর্ম্মের সারাংশ ভারতবর্ষে অবিকৃতভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে এবং যদিও তাহারা মুখে পৌত্তলিকতার প্রতি ঘোরতর ঘৃণা প্রকাশ করিয়া থাকে, তথাপি তাহাদের ধর্ম্মের বাহ্য অনুষ্ঠানে—বিশেষত শিয়াসম্প্রদায়ের মধ্যে—হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব কিছু-কিছু প্রবেশ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান ধর্ম্ম আসলে যার-পর-নাই সাদা-সিধা এবং পৃথিবীর তাবৎ ধর্ম্মের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অতীন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মধারণা-সাপেক্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া উহা মৃতাবশেষ-চিহ্ন-পূজা ও মূর্ত্তিপূজার সহিত যেন একটু জড়িত হইয়া পড়িয়াছে। মুসলমান ফকির ভারতে আসিয়া কতকটা হিন্দুসন্ন্যাসীর ধরণধারণ অবলম্বন করিয়াছে। শিয়ারা মোহরম্‌-উৎসবের সময় "তাজিয়া" বাহির করে এবং পরিশেষে উহা পুড়াইয়া হিন্দুদিগের ন্যায় নদীজলে বিসর্জ্জন করে। আহমদাবাদের সন্নিকটে প্রাচীর-বেষ্টিত একটি পুণ্যবৃক্ষ আছে, মুসলমানেরা তাহার অত্যন্ত ভক্ত; তাহারা সেই বৃক্ষের তলায় বলয়াদি স্থাপন করে; এবং তাহাদের বিশ্বাস, রাত্রিযোগে বৃক্ষটি শাখাহস্ত বাড়াইয়া ঐ বলয়গুলি গ্রহণ করে। কোন কোন মুসলমান-পীরের সমাধিমন্দিরে হিন্দুরা তীর্থযাত্রা করে। আজমীরে এইরূপ একটি সমাধি-মন্দির আছে; সেখানে দুইটি উৎসব-মেলা হইয়া থাকে;—একটি হিন্দুদিগের, আর-একটি মুসলমানদিগের। অন্যান্য নৈবেদ্য-সামগ্রীর মধ্যে পুষ্পমুকুটসকল সেখানে অর্পিত হয়। হিন্দুমন্দিরের প্রবেশদ্বারে যেরূপ দীপাবলী দৃষ্ট হয়, তাহারি অনুকরণে ঐ মসজিদের বহিঃস্থিত "মিনার"স্তম্ভের ধূমমলিন কুলুঙ্গিসমূহে দীপ জ্বালানো হইয়া থাকে; ধনী তীর্থযাত্রীদিগের ব্যয়ে প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড কড়ায় চাউল, দুগ্ধ, ফল ও গরম-মশলাদি মিশ্রিত একপ্রকার পায়স প্রস্তুত করিয়া মসজিদের রক্ষিবর্গকে বিতরণ করা হয়। ইহাতে লক্ষটাকা ব্যয় হইয়া থাকে।

কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে কোন-কোন অংশে যে এইরূপ সংস্পর্শ ও সংস্রব দৃষ্ট হয়, উহা আসলে আভ্যন্তরিক নহে—উহা বাহ্যিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, মুসলমানদিগের ভারতাক্রমণের আরম্ভ হইতে

এখন-পর্য্যন্ত উভয় ধর্ম্মের মধ্যে শত্রুতাই চিরজাগরূক রহিয়াছে।

কি ভারতবর্ষে, কি অন্যত্র, মুসলমান-দিগের মধ্যে যে অভিন্নভাব দেখা যায়, উহাই উহাদের মহাশক্তি। হিন্দুদিগের মধ্যে ইহার ঠিক্ বিপরীত ;—উহারা বিবিধ বর্ণে বিভক্ত। ভারতবর্ষে, মুসলমানদিগের মধ্যে যে শ্রেণী-বিভাগ একেবারে নাই,তাহা নহে; তাহাদের মধ্যেও মহম্মদের বংশধর, ভারতবিজেতার বংশধর ও মুসলমানীকৃত হিন্দু—এই তিন শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ইজিপ্ট কিংবা তুর্কিস্থানের মুসলমানদিগের ন্যায়, ভারতবর্ষীয় মুসলমানসমাজে যদিও ব্যবহারে ততটা অভিন্নভাব দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তথাপি, "সকল মুসলমানই সমান"—এই মূলতত্ত্বটির সম্বন্ধে উহাদের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। শুধু ভারতবর্ষে কেন—সমস্ত মুসলমানরাজ্যেই বংশ, জাতি, উৎপত্তি ইত্যাদিবিষয়ক ভেদাভেদ ততটা গুরুতর বলিয়া পরিগণিত হয় না ; বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীর মধ্যে যে প্রভেদ,উহাই মুসলমানদিগের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। মুসলমানসমাজে সকল মনুষ্যই ভ্রাতৃস্থানীয়, অন্তত ভ্রাতৃরূপে গৃহীতব্য। মুসলমান-ধর্ম্মাধিষ্ঠিত সর্ব্বদেশীয় রাজ্যমণ্ডলীই তাহাদের স্বদেশ—ইহা-ছাড়া তাহাদের আর-কোন স্বদেশ নাই। ধর্ম্মাধিষ্ঠিত সীমা ভিন্ন তাহাদের দেশের আর-কোন সীমাচিহ্ন নাই।

ভারতবর্ষে মুসলমানেরা রাষ্ট্রসম্বন্ধে য়ুরোপীয়দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন অধিকার তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেয় নাই। এ বিষয়ে তাহাদের কতটা সঙ্কোচ, একটা দৃষ্টান্ত দিলে বুঝা যাইবে। ট্রিচিনাপলি-নগরে, জেসুইট্-সম্প্রদায়ের খৃষ্টানেরা, শিবমন্দিরাধিষ্ঠিত একটি শৈলের পাদমূলে, জমকালো একটি "কালেজ" নির্ম্মাণ করিয়াছে। সেটি হিন্দুদিগের একটি পুণ্যস্থান ;—তাহার চারি-পার্শ্বেই বহু দেবালয়। হিন্দুধর্ম্মের এই প্রধান দুর্গটিকে অবরোধ করিবার উদ্দেশে, জেসুইটেরা ধৈর্য্যসহকারে অনেক কৌশলে ঐ স্থানে আড্ডা গাড়িয়াছে। তাহারা গির্জার জন্য একটি দেবালয় হিন্দুদিগের নিকট হইতে ক্রয় করে। তাহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া বিক্রেতারা তাহাদের নামে আদালতে মোকদ্দমা আনে ; কিন্তু জেসুইটেরা যখন বলিল যে, উচ্চবর্ণের হিন্দু-খৃষ্টানদিগের জন্য সেখানে ভজনাগার স্থাপন করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, তখন হিন্দুরা সন্তুষ্ট হইল, আর আপত্তি করিল না। কিন্তু কালেজ-সংলগ্ন বিস্তৃত ভূমির মধ্যে মুসলমান-পীরের একটা সামান্য লক্ষ্মীছাড়া সমাধিমন্দির ছিল ; তাহা উঠাইয়া অন্য স্থানে লইবার জন্য, ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ জেসুইট্‌রা মুসলমানদিগের নিকট অনেক টাকা কবুল করে, কিন্তু তাহারা কিছুতেই সম্মত হয় নাই।

বাঙালী মুসলমান-চাকর এদিকে স্বভাবত এত চাপা, কিন্তু ভারতের সীমান্তপ্রদেশে কোন ধর্ম্মান্ধ কাবুলী কোন ইংরাজকে গুপ্ত-হত্যা করিয়াছে, কোন য়ুরোপীয়ের মুখে সে যদি শুনিতে পায়, অমনি সে বিচলিত হইয়া উঠে ; সেই বর্ণিত বৃত্তান্তের মধ্যে যদি কোন ভুলচুক থাকে, অমনি সে শুধরাইয়া দেয় ; হত্যাকারীদের 'ছোরার গঠন কিরূপ ছিল, তা-পর্য্যন্ত তাহারা বলিয়া দেয়। ইহাতেই

বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর কথা-চালাচালি হইয়া থাকে। ভারতের সীমান্তপ্রদেশের পরপারে যে-সকল ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, অতীব নিরক্ষর মুসলমানও তাহার খবর রাখে; কাবুলের আমীর যে তাহাদেরি সহধর্ম্মী;—এমন কি, আরো দূরে—রুশসৈন্যমধ্যে মুসলমানেরা যে, সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়াছে—এই সকল বিষয়ে তাহারও কতকটা অস্পষ্ট ধারণা আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতে মুসলমানরাজত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার স্মৃতি মুসলমানদিগের মধ্যে জাগরূক রহিয়াছে। একজন সামান্য মুসলমান-ভৃত্য, সে-ও জানে, একসময়ে মুসলমানেরা ভারতবর্ষের রাজা ছিল এবং তাহাদের বাদ্‌শারা দিল্লি, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে জম্‌কালো স্মৃতিচিহ্নসকল রাখিয়া গিয়াছেন।

তবে কি মুসলমানদিগের প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা আছে?—পূর্ব্বরাজত্ব আবার তাহাদের হস্তগত হইবে, এরূপ আশা কি তাহারা এখনও করিয়া থাকে?—ইহা ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায় না। কেন না, দেখা যায়, মুসলমানেরা সর্ব্বত্রই স্বল্পভাষী; খৃষ্টানদিগের নিকট কোনো কথা উহারা বিশ্বাস করিয়া বলে না। তবে, যতক্ষণ তাহাদের চাকৃরি করে, ততক্ষণ তাহাদের প্রতি একপ্রকার মূকসম্মান প্রদর্শন করে মাত্র। মুসলমানেরা স্বীয় অবিচলিত গাম্ভীর্য্য-আবরণের মধ্যে নিজ মনোভাব গোপন করিয়া রাখে। এই বিষয়ে হিন্দুদিগের সহিত *তাহাদের প্রভেদ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়।* মুসলমানদের নিকট হইতে এইটুকুমাত্র জানা যায় যে, তাহাদের বিশ্বাস—তাহারা হিন্দু কাফেরদের অপেক্ষা অনন্তগুণে শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষের সমস্ত জাতির প্রতিনিধিগণ যে "ন্যাশনাল কংগ্রেসে" প্রতিবৎসর সমবেত হইয়া থাকেন, সেই কংগ্রেস্‌-সভায় একজন পয়গম্বরের বংশধর বলিয়াছিলেন যে, "অনতিকাল পূর্ব্বে, হিন্দুদিগের অপেক্ষা মুসলমানদিগের স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা, কার্য্যোদ্যম, উৎসাহ-বীর্য্য অধিক ছিল।" আরো তিনি এই কথা বলিয়াছিলেন যে, "পূর্ব্বতন জেতৃবংশের যাঁহারা প্রতিনিধি, সেই প্রকৃত মুসলমানদিগের আন্তরিক সাহায্য না পাইলে, কংগ্রেস্ কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবে না। আমাদের পূর্ব্বতন যোদ্ধাদিগের বংশধরেরা যদি কংগ্রেসের কাজে অন্তরের সহিত যোগ দেন, তবেই কংগ্রেস্ সফলতা লাভ করিতে পারিবে।"

যাহারা এইরূপ ধরণের কথাবার্ত্তা কহে, তাহাদের কথা শুনিয়া হঠাৎ যাহা মনে হয়, আসলে তাহা নহে—ইংরাজরাজত্বের বিদ্রোহী হইতে তাহারা আদৌ প্রস্তুত নহে। মনে হয়, আকবর-রাজত্বের পুনরুদ্ধার করিবার আশা আপাতত তাহারা একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের আশা-ভরসা ভারতের সীমা ছাড়াইয়া সমস্ত মুসলমানরাজ্যের উপর ন্যস্ত। তাহাদের দৃঢ়বিশ্বাস, এক সময়ে মহম্মদের ধর্ম্ম সমস্ত পৃথিবী জয় করিবে। যদিও আপাতত ক্ষণকালের জন্য উহার গতি স্তম্ভিত হইয়াছে, কিন্তু কোন-এক-সময়ে ভূমণ্ডলের অপর-

কোন অংশে মহম্মদীয় ধর্ম্মের জয়পতাকা লইয়া একজন মহাবীর নিশ্চয়ই সমুত্থিত হইবেন। এই সর্ব্বদেশীয় মুসলমানের একতা-মূলক আন্দোলন, যাহা আপাতত দেখা দিয়াছে, এবং যাহা মৌলবীগণ ও সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ তুর্ক-সুলতানের অনুকূলে সর্ব্বত্র উত্তেজিত করিয়া দিতেছে, ভারতবর্ষে সুন্নি-সম্প্রদায়ের কোন কোন মুসলমান ঐ আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিতেছে। কি তাড়িত-বার্ত্তাবহ, কি লৌহবর্ত্ম, কি মুদ্রাযন্ত্র—এই সমস্ত য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক কার্য্যোপায়-সকলের বিস্তারে, মহম্মদীয় ধর্ম্মের ধ্বংস হওয়া দূরে থাক্‌, বরং উহার প্রচারের আরো সুবিধাই হইয়াছে। ইহার দ্বারা প্রমাণ হয়, য়ুরোপের নবোদ্ভাবিত কলকৌশল ও পদ্ধতি-সমূহ দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত প্রাচ্যসমাজে সমানীত হইলে, পাশ্চাত্যভাব জাগরিত হওয়া দূরের কথা, আপাতত তো তৎসম্বন্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের নূতন উপায়সকল উহাদের হস্তে অর্পিত হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

হিমালয়।

হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
প্রভাতের দ্বার হ'তে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তব শেষপ্রান্তে উঠি আপনার
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার,
ভুলিয়া গিয়াছে সব সুর,—সামগীত শব্দহারা
নিয়ত চাহিয়া শূন্যে বরষিছে নির্ঝরিণীধারা!

হে গিরি, যৌবন তব যে দুর্দ্দম অগ্নিতাপবেগে
আপনারে উৎসারিয়া মরিতে চাহিয়াছিল মেঘে—
সে তাপ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান,
নিরুদ্দেশ চেষ্টা তব হয়ে গেছে প্রাচীন পাষাণ!
পেয়েছ আপন সীমা, তাই আজি মৌন শান্ত হিয়া
সীমাবিহীনের মাঝে আপনারে দিয়েছ সঁপিয়া!

ক্ষান্তি।

—:•:—

ক্ষান্ত করিয়াছ তুমি আপনারে, তাই হের আজি
তোমার সর্ব্বাঙ্গ ঘেরি পুলকিছে শ্যাম শষ্পরাজি
প্রস্ফুটিত পুষ্পজালে; বনস্পতি শত বরষার
আনন্দবর্ষণকাব্য লিখিতেছে পত্রপুঞ্জে তার
বল্কলে শৈবালে জটে; সুদুর্গম তোমার শিখর
নির্ভয় বিহঙ্গ যত গীতোল্লাসে করিছে মুখর।
আসি নরনারীদল তোমার বিপুল বক্ষপটে
নিঃশঙ্ক কুটীরগুলি বাঁধিয়াছে নির্ঝরিণীতটে।
যেদিন উঠিয়াছিলে অগ্নিতেজে স্পর্দ্ধিতে আকাশ,
কম্পমান ভূমণ্ডলে, চন্দ্রসূর্য্য করিবারে গ্রাস,—
সে দিন, হে গিরি, তব এক সঙ্গী আছিল প্রলয়;
যখনি থেমেছ তুমি বলিয়াছ, "আর নয়, নয়,"
চারিদিক্ হ'তে এল তোমা'পরে আনন্দ-নিশ্বাস,
তোমার সমাপ্তি ঘেরি বিস্তারিল বিশ্বের বিশ্বাস!

শিলালিপি।

—:•:—

আজি হেরিতেছি আমি, হে হিমাদ্রি, গভীর নির্জ্জনে
পাঠকের মত তুমি বসে আছ অচল আসনে,
সনাতন পুঁথিখানি তুলিয়া লয়েছ অঙ্ক'পরে।
পাষাণের পত্রগুলি খুলিয়া গিয়াছে থরে থরে,
পড়িতেছ একমনে। ভাঙিল গড়িল কত দেশ,
গেল এল কত যুগ—পড়া তব হইল না শেষ!
আলোকের দৃষ্টিপথে এই যে সহস্র খোলা পাতা
ইহাতে কি লেখা আছে ভব-ভবানীর প্রেমগাথা?
নিরাসক্ত নিরাকাঙ্ক্ষ ধ্যানাতীত মহাযোগীশ্বর
কেমনে দিলেন ধরা সুকোমল দুর্ব্বল সুন্দর
বাহুর করুণ আকর্ষণে? কিছু নাহি চাহি যাঁর,
তিনি কেন চাহিলেন—ভাল বাসিলেন নির্ব্বিকার,—
পরিলেন পরিণয়পাশ? এই যে প্রেমের লীলা
ইহারি কাহিনী বহে, হে শৈল, তোমার যত শিলা?

হরগৌরী।

—:•:—

হে হিমাদ্রি, দেবতাত্মা, শৈলে শৈলে আজিও তোমার
অভেদাঙ্গ হরগৌরী আপনারে যেন বারম্বার
শৃঙ্গে শৃঙ্গে বিস্তারিয়া ধরিছেন বিচিত্র মূরতি!
ওই হেরি ধ্যানাসনে নিত্যকাল স্তব্ধ পশুপতি,
দুর্গম দুঃসহ মৌন;—জটাপুঞ্জ তুষারসংঘাত
নিঃশব্দে গ্রহণ করে উদয়াস্ত রবিরশ্মিপাত
পূজাস্বর্ণপদ্মদল! কঠিন প্রস্তরকলেবর
মহান্-দরিদ্র, রিক্ত, আভরণহীন দিগম্বর!
হের তাঁরে অঙ্গে অঙ্গে একি লীলা করেছে বেষ্টন—
মৌনেরে ঘিরেছে গান, স্তব্ধেরে করেছে আলিঙ্গন
সফেনচঞ্চল নৃত্য, রিক্ত কঠিনেরে ওই চুমে
কোমল শ্যামলশোভা নিত্যনব পল্লবে কুসুমে
ছায়ারৌদ্রে মেঘের খেলায়! গিরিশেরে রয়েছেন ঘিরি
পার্ব্বতী মাধুরীচ্ছবি তব শৈলগৃহে হিমগিরি!

তপোমূর্ত্তি।

—:•:—

তুমি আছ হিমাচল ভারতের অনন্তসঞ্চিত
তপস্যার মত! স্তব্ধ ভূমানন্দ যেন রোমাঞ্চিত
নিবিড় নিগূঢ় ভাবে পথশূন্য তোমার নির্জ্জনে,
নিষ্কলঙ্ক নীহারের অভ্রভেদী আত্মবিসর্জ্জনে!
তোমার সহস্রশৃঙ্গ বাহু তুলি কহিছে নীরবে
ঋষির আশ্বাসবাণী—"শুন শুন বিশ্বজন সবে
জেনেছি, জেনেছি আমি!" যে ওঙ্কার আনন্দ-আলোতে
উঠেছিল ভারতের বিরাট্ গভীর বক্ষ হ'তে
আদিঅন্তবিহীনের অখণ্ডঅমৃতলোকপানে,
সে আজি উঠিছে বাজি, গিরি, তব বিপুল পাষাণে!
একদিন এ ভারতে বনে বনে হোমাগ্নি-আহুতি
ভাষাহারা মহাবার্ত্তা প্রকাশিতে করেছে আকুতি,
সেই বহ্নিবাণী আজি অচলপ্রস্তরশিখারূপে
শৃঙ্গে শৃঙ্গে কোন্ মন্ত্রে উচ্ছ্বাসিছে মেঘধূম্র স্তূপে!

সঞ্চিতবাণী।

ভারতসমুদ্র তার বাষ্পোচ্ছ্বাস নিশ্বসে গগনে
আলোক করিয়া পান, উদাস দক্ষিণ সমীরণে,
অনির্ব্বচনীয় যেন আনন্দের অব্যক্ত আবেগ!
উর্দ্ধবাহু হিমাচল, তুমি সেই উদ্বাহিত মেঘ
শিখরে শিখরে তব ছায়াচ্ছন্ন গুহায় গুহায়
রাখিছ নিরুদ্ধ করি,—পুনর্ব্বার উন্মুক্ত ধারায়
নূতন আনন্দস্রোতে নব প্রাণে ফিরাইয়া দিতে
অসীমজিজ্ঞাসারত সেই মহাসমুদ্রের চিতে!
সেইমত ভারতের হৃদয়সমুদ্র এতকাল
করিয়াছে উচ্চারণ উর্দ্ধপানে যে বাণী বিশাল,—
অনন্তের জ্যোতিস্পর্শে অনন্তেরে যা দিয়েছে ফিরে-
রেখেছ সঞ্চয় করি হে হিমাদ্রি তুমি স্তব্ধশিরে!
তব মৌন শৃঙ্গমাঝে তাই আমি ফিরি অন্বেষণে
ভারতের পরিচয় শান্ত শিব অদ্বৈতের সনে!

প্রাচীন আর্ম্মেনীয়ায় হিন্দু-উপনিবেশ।

পুরাকালে সিরিয়াদেশের ইন্নাকিনান্-(Innakinan)-মঠের প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাত্মা "জিনোবিয়াস্" (Zenobius) তাঁহার সিরিয়াভাষায় লিখিত ইতিহাসে "প্রাচীন আর্ম্মেনীয়ায় হিন্দু-উপনিবেশ" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল, মিঃ আবদাল নামে জনৈক লেখক "জর্ণাল অব্ দি এসিয়াটিক্ সোসাইটী" নামক পত্রে ইংরাজিতে এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন। উক্ত প্রবন্ধই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের ভিত্তি।

পাদরী "জেনোবিয়াস্" বলেন, এখানকার (আর্ম্মেনীয়ার) অধিবাসীরা দেখিতে অসাধারণ কৃষ্ণবর্ণ, তাহাদের শ্মশ্রু আবক্ষ লম্বিত, আকৃতি অতি কুৎসিত। তাহারা আপনাদিগকে হিন্দুবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়। "দেমিতর্" (Demeter) ও "কেশিনী" (Keisaney) তাহাদের উপাস্য দেবতা। ভারতবর্ষেরই কোন রাজার বংশধর দুই ভ্রাতা সম্ভবত অতি প্রাচীনকালে আর্ম্মেনীয়ায় উপস্থিত হয়। ঐ রাজার নাম "দিনাস্কী" (Dinaskey)। ভ্রাতৃ-

দ্বয় রাজার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করে বলিয়া রাজা তাহাদের দমনার্থ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত কতকগুলি সৈন্য প্রেরণ করেন। উহারা পলাইয়া আর্ম্মেনীয়াদেশে ভালারসেসেস্ (Valarsaces) রাজার রাজ্যে যাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। উক্ত রাজা তাহাদের আশ্রয়দান করিয়া "তারণ"-(Taron)-নামক দেশের শাসনভার অর্পণ করেন। এই স্থানে তাহাদের চেষ্টায় বিশাপ্ (Bishap), বর্ত্তমান ড্রাগন (Dragon), নামে নগর স্থাপিত হয়। তাহার পর তাহারা "অস্থিশত"-(Ashtishat)-নামক স্থানে যাইয়া ভারতবর্ষীয় কতকগুলি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করে। পঞ্চাশৎ বর্ষ পরে কোন অপরিজ্ঞাত কারণে তথাকার রাজা তাহাদিগকে নিহত করিলে কুয়র (Kaur), মেঘ্‌তী (Meghti) এবং হোরেন (Horain) নামে তাহাদের তিনটি বংশধর বিষয়ের উত্তরাধিকারী হয়। কুয়র তাহার স্বনামে একটি নগর স্থাপন করে। ঐ নগর এখনও কুয়রনামে বর্ত্তমান। মেঘ্‌তীও নিজ নামে একটি গ্রাম স্থাপন করে। হোরেন পালুনীস্-(Paluniss)-প্রদেশে স্বনামে "হোরেন"গ্রামের নামকরণ করিয়াছিল। যাহা হউক, কিছুকাল পরে স্থানান্তরে বাস করিতে তাহাদের ইচ্ছা হয়। তথাকার পার্ব্বত্যপ্রদেশের "কার্কী"-(Karki)-নামক স্থানই উহাদের বাসস্থান নির্দ্ধারিত হইল। ঐ স্থান অতি রমণীয়,—প্রকৃতির চিরসৌন্দর্য্যসম্ভারে পরিপূর্ণ। উহার মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়াই তাহারা ঐস্থানে বাস করে। "কেশিনী" ও "দেমিতর" দেবতার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইলে দেবদ্বয়ের পূজার বন্দোবস্তের জন্য জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োজিত হইয়াছিলেন।

এইরূপ বিবরণ দিয়া লেখক বলিতেছেন যে, উপরি-উক্ত রাজপুত্রদ্বয় ঠিক্ কোন্ সময়ে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইয়া আর্ম্মেনীয়ায় আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া অনেকে খৃষ্টজন্মগ্রহণের প্রায় দেড়শত কি দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে তাহারা আর্ম্মেনীয়ায় আগমন করে, এইরূপ বলিয়া থাকেন। খৃষ্টজগতের সুপ্রসিদ্ধ পাদরীপুঙ্গব "সেণ্ট গ্রিগরী" (St. Gregcry) এই সময়ের লোক। তিনি আর্ম্মেনীয়াপ্রদেশে হিন্দু পৌত্তলিকের বসবাসের কথা শুনিয়াছিলেন। শান্তিসেবক যিশুখৃষ্টের হিন্দুদ্বেষী বীরশিষ্য "সেণ্ট গ্রিগরী" মহম্মদীয় নীতির চিরন্তনপ্রথানুসারে পালুনীস্‌প্রদেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ সোমনাথের মন্দির-লুণ্ঠনকারী সুলতান মামুদের ন্যায় খৃষ্টশিষ্য পাদরী সেণ্ট গ্রিগরী পালুনীস্‌প্রদেশের হিন্দুদেবদেবীধ্বংস মনস্থ করেন। হিন্দুরা পূর্ব্বেই হস্তিআশ-(Hasteus)-রাজপুত্রের প্রমুখাৎ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেইদিবস গভীর নিশীথে তাহারা অতি সতর্কভাবে দেবমূর্ত্তিসকল স্থানান্তরিত করে এবং দেবসেবায় নিয়োজিত অস্থাবর সম্পত্তি—টাকাকড়ি প্রভৃতি সমস্তই নিরাপদে ভূমধ্যে প্রোথিত করিয়া ফেলে।

এই সমস্ত কার্য্য সেই রাত্রির মধ্যেই বিশেষ সাবধানে সমাধান করিয়া তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহারা প্রতিজ্ঞা করিল, হয় এই যুদ্ধে জয়ী হইয়া আপনাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখিবে, না হয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া চিরশান্তি-নিকেতনে গমন করিবে! এই যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় হইল বটে—কিন্তু তাহারা স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়া আপনাদের দেহবিসর্জ্জন করিল—বস্তুত তাহা সর্ব্বদেশেই সর্ব্বথা প্রশংসনীয় ও বিস্ময়কর। পালুনীস্‌বাসী পরাজিত হিন্দুরা নিরাশ্রয় হইয়া একে একে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। ইহাদের সংখ্যা নাকি প্রায় ১০৩৮। অবশিষ্ট অধিবাসী হৃতসর্ব্বস্ব ও বিতাড়িত হইল। অবশেষে সেন্নিসের (Sennises) রাজপুত্র সন্ধিস্থাপন করিলেন। প্রধান পুরোহিতবংশধর আর্ম্মেনীরাজের নিকট মৃত হিন্দুগণের দেহ সমাহিত করিবার অনুমতি চাহিলেন। রাজপুত্র অনুমতি দিলে, তিনি ঐ সমস্ত মৃতদেহ পুঞ্জীকৃত করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে সমাহিত করিলেন। অবশেষে সেই সকল সমাধিস্তম্ভে জেতৃপক্ষ হইতে সিরিয়া, হেলেনীয়া ও ইস্মাইল ভাষায় নিম্নলিখিত কয়েকছত্র লিপিবদ্ধ হইল:—

"প্রথম যুদ্ধ অতি ভীষণভাবে হইয়াছিল। এই যুদ্ধের প্রধান পাণ্ডা (সেনাপতি) অর্জ্জম্-(Arzam)-নামক জনৈক হিন্দু-পুরোহিত।

"ইহার সহিত এক হাজার আটত্রিশ জন এইস্থানে সমাহিত হয়।

"আমরা প্রভু যিশুখৃষ্টের পক্ষ হইয়া 'কেশিনী' দেবতার বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ ঘোষণা করি।"

লেখক "জেনোবিয়স্" স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন করিয়া নাকি এই বিষয় যথাযথ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সন্ধি স্থাপিত হইলে পাদরী "সেণ্ট গ্রিগরী" পরাজিত হিন্দুদিগকে (প্রায় ৫০৫০ জনকে) বলপূর্ব্বক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। এই সকল হিন্দুদের ভিতর অধিকাংশই পুরুষ; তাহার পরে তাহাদের স্ত্রী-কন্যাগণও দুর্বৃত্ত খৃষ্টানের অত্যাচার হইতে আপনাদের মানসম্ভ্রমরক্ষার্থ পতিপুত্রের অনুসরণ করে। যাহারা খৃষ্টান হইতে অস্বীকার করিয়াছিল, মস্তকমুণ্ডন করিয়া তাহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। মস্তকমুণ্ডনটা "কেশিনী"-উপাসক হিন্দুগণ অত্যন্ত অপমানজনক বলিয়া মনে করিতেন। কারাগারে নিক্ষিপ্ত এই সকল স্বধর্ম্ম-নিরত হিন্দুর সংখ্যা প্রায় চারিশত।

শ্রীরমেশচন্দ্র বসু।

অনুবাদ।*

এক শ্রেণীর কাব্যানুরাগী লোক আছেন, কাব্যের অনুবাদের উপর তাঁহারা নিতান্ত বিরূপ। অনুবাদমাত্রকেই তাঁহারা অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন; তাঁহারা বলেন যে, উৎকৃষ্ট কাব্যের রস ও সৌন্দর্য্য অনুবাদে রক্ষিত হইতে পারে না—রস বিস্বাদ হইয়া যায়, সৌন্দর্য্য ম্লান ও বিকৃত হইয়া পড়ে। সেইজন্য তাঁহারা উপদেশ দিয়া থাকেন যে, যদি উৎকৃষ্ট কোন কাব্যের রস, সৌন্দর্য্য ও গৌরব যথাযথরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তবে তাহা মূলে অধ্যয়ন কর—অনুবাদপাঠ পণ্ডশ্রম মাত্র।

স্বীকার করি, এইরূপ উপদেশ একদিন সমীচীন ছিল। যখন সাহিত্যের সংখ্যা অল্প ছিল; তাহার অনুশীলন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষে নিবদ্ধ ছিল এবং সেই সম্প্রদায় বা শ্রেণী অনন্যকর্ম্মা ছিল, তখন এইপ্রকার উপদেশের সার্থকতা ছিল। ইউরোপে একদিন গ্রীক্ ও ল্যাটিন্ ব্যতীত অন্য সাহিত্য ছিল না। তাহার অনুশীলন কেবলমাত্র ধর্ম্মযাজকদিগের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। জ্ঞানার্জ্জন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত তাঁহাদের অন্য কার্য্য ছিল না, অন্য চিন্তা ছিল না। আমাদের দেশেরও ব্রাহ্মণদিগের সম্বন্ধে ঠিক এই কথা বলিতে পারা যায়। এই সকল জ্ঞানার্থীদিগকে উদরের চিন্তা করিতে হইত না; সে ভার সমাজ লইয়াছিল। অস্তিকে সরস্বতী এবং সর্ব্বত্র ভগবান্, ইহাই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব ছিল। ইঁহাদিগকে দুইটার স্থলে পাঁচটা ভাষা শিখিতে বলিলেও অসঙ্গত হইত না। এক দিন ছিল, যখন এই উপদেশের সমীচীনতা ছিল।

কিন্তু আজ? এই কঠোর ও নিদারুণ জীবনসংগ্রামের দিনে, এই সাধারণ্যে সাহিত্যপ্রসারের দিনে, এই উপদেশ কি চলে? ইউরোপে গ্রীক্ ও ল্যাটিনের স্থলে এখন কত সাহিত্য হইয়াছে, এবং তাহার প্রত্যেকটিতে উপাদেয় গ্রন্থের সংখ্যাই বা কত। আমাদের দেশে পূর্ব্বে সংস্কৃত ও পালি ছিল; এখন বাঙ্গালা, উর্দ্দু, মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটি, হিন্দী, উড়িয়া—কত ভাষায় কত সদ্‌গ্রন্থের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার উপর পার্‌সী আছে, আরবী আছে; আরও যে নাই, এমন নহে। সকল বা কতকগুলি সদ্‌গ্রন্থও মূলে পড়িতে হইলে কত ভাষা শিখিতে হয়, ভাব দেখি। তার পর, জীবনসংগ্রাম—আমরা সকলেই উদরান্নের জন্য, স্ত্রীপুত্রের, আত্মীয়স্বজনের জন্য, দিবারাত্র ক্ষিপ্ত সারমেয়ের ন্যায় ইতস্তত ছুটাছুটি করিতেছি। এত করার পর নানা ভাষা শিক্ষার সময় হয় কখন্?—হয় কয়-

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক অনুবাদিত নাটকনিচয় উপলক্ষে লিখিত। লেখক।

জনের? যাঁহাদের হইতে পারে, তাঁহাদের মধ্যে ক্ষমতা আছে কয়জনের? লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর একত্রাবস্থান দেখিতে পাওয়া যায় কত স্থলে? এমন অবস্থায় এমন আদেশ যিনি করেন, তাঁহাকে—পাগল না হয় না-ই বলিলাম।

অতএব বুঝা গেল যে, এই কঠোর জীবন-সংগ্রামের দিনে পাঁচটা ভাষা শিক্ষা করা পৌনে ষোলআনা লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু তাই বলিয়া কি তাহাদিগকে উৎকৃষ্ট-কাব্যরসাস্বাদে বঞ্চিত থাকিতে হইবে? তাহা যদি না হয়, তাহা হইলে ত অনুবাদের আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত আর উপায় নাই।

তার পর, অনুবাদ হইলেই যে তাহাতে মূলের রস, সৌন্দর্য্য ও গরিমার অপচয় ও বিকৃতি ঘটে, ইহা কি সত্য? অবশ্যই, সকল বিষয়ের ন্যায়, অনুবাদ ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। যেখানে অনুবাদ উপহারের উদ্দেশ্যে বা পুস্তকবিক্রেতার আদেশে কৃত হয়, সেখানে তাহা মন্দ হওয়াই সম্ভব। আজকাল আমাদের দেশে তাহার পরিচয়েরও অভাব নাই। কিন্তু যেখানে ক্ষমতা আছে, ভাষার উপর আধিপত্য আছে, কাব্যরসগ্রাহিণী শক্তি আছে, আন্তরিকতা আছে, সেখানে অনুবাদে মূলের মাহাত্ম্য অনেকটাই রক্ষিত হয়। হয় যে, আলোচ্য গ্রন্থনিচয়ই তাহার প্রমাণ—অন্য প্রমাণ নির্দ্দেশ করা নিষ্প্রয়োজন।

অনেকে বলেন, কাব্যের যাহা উৎকৃষ্টাংশ, তাহার অনুবাদ হইতে পারে না। আমরা বলি, কাব্যের যাহা উৎকৃষ্টাংশ, তাহাই অনুবাদসহনশীল। যেখানে মূলে স্থানকালের সীমাবদ্ধতা আছে, ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণতা আছে, সেখানে অনুবাদ সার্থক না-ও হইতে পারে, না হইবারই কথা। কিন্তু যেখানে ব্যক্তিত্ব লুপ্তপ্রায় এবং প্রকাণ্ড মানবত্বের বিশালতা সপ্রকাশ—যেখানে আমি নাই, আমরা আছে; ব্যক্তিত্ব নাই, মানবত্ব আছে; তোমার আমার দুঃখের কথা নাই, মনুষ্য-জাতির অন্তর্ব্বেদনার কথা আছে; খণ্ড সত্য নহে, বিরাট্ সত্যের অভিব্যক্তি আছে—তাহার সুন্দর অনুবাদ হইতে পারে; হইয়াও থাকে। রামায়ণ ও মহাভারতের বঙ্গানুবাদ আমি দেখিয়াছি;—দেখিয়াছি যে, মূলের গরিমা সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বথা রক্ষিত হইয়াছে। বাইবেলের অনুবাদসম্বন্ধে এমার্সন্ লিখিয়াছেন যে—কোথাও মূলভাবের ব্যত্যয় হয় নাই। অতএব বুঝা গেল যে, যাহা ভাল, তাহাকে লোকের কাছে উপস্থাপিত করা যায়; যাহা ভাল নহে, তাহাকে—ব্যক্ত না করিলেই ভাল হয়।

যে সকল পুস্তকের উপলক্ষে এত কথা বলিলাম, তাহার খানিকটা বিস্তৃত পরিচয়ের প্রয়োজন হয়। তাহা দিতেছি। ভবভূতি লিখিয়াছেন—

"ইয়ং গেহে লক্ষ্মীরিয়মমৃতবর্ত্তির্নয়নয়ো-
রসাবস্যাঃ স্পর্শো বপুষি বহলশ্চন্দনরসঃ।
অয়ং কণ্ঠে বাহুঃ শিশিরমসৃণো মৌক্তিকসরঃ
কিমস্যা ন প্রেয়ো যদি পুনরসহ্যো ন বিরহঃ॥"

জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু অনুবাদ করিয়াছেন—

"ইনি লক্ষ্মী গৃহে মোর
নয়নের অমৃত-অঞ্জন
ও-অঙ্গ-পরশে গাত্রে
মাখা হয় স্নিগধ চন্দন।

ওই বাহু কণ্ঠে মোর
মুক্তাহার, মসৃণ-শীতল
প্রিয়ার যা সবই প্রিয়
অসহ্য সে বিরহ কেবল।"

ইহা অতি সুন্দর অনুবাদ। মূলে 'অঞ্জনের' কথা নাই; কিন্তু অনুবাদে 'বর্ত্তি'র স্থানে 'অঞ্জন' ব্যবহার করায় সৌন্দর্য্যের বিকাশ অধিকতর হইয়াছে।

কোন কোন স্থানে অনুবাদ ঠিক হয় নাই। কালিদাস লিখিয়াছেন—

"সরসিজমনুবিদ্ধং শৈবলেনাপি রম্যম্"—ইত্যাদি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু অনুবাদ করিয়াছেন—

"সুচারু শৈবালে ঢাকা যথা সরোজিনী"—ইত্যাদি।

'অনুবিদ্ধের' অর্থ কি 'ঢাকা'?

আরও একটু উদ্ধৃত করি। রাজা দুষ্মন্ত দক্ষিণবাহুস্পন্দন উপলক্ষে বলিতেছেন—

"শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ফুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্য"
ইত্যাদি।

ইহা আশার কথা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু লিখিতেছেন—

"প্রশান্ত আশ্রমদেশ—বাহু কেন তবে
স্পন্দন করিছে হেন?—না জানি কি হবে।"
ইত্যাদি।

ইহা যে নিরাশার কথা। ভরসা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথবাবু এ সব সামান্য ভুল সংশোধন করিবেন।

কাব্য বা নাটকের যথাযথ অনুবাদ যতটা সহজসাধ্য বলিয়া সাধারণের ধারণা আছে, বাস্তবিক তাহা তত সহজ নহে। মূলভাষার রস ও সৌন্দর্য্য ষোলআনা সর্ব্বত্র অনুবাদে রক্ষা করা একপ্রকার অসম্ভব—তবু যতটা সম্ভব, জ্যোতিরিন্দ্রবাবু তাহা করিয়াছেন, অনুবাদে তিনি সিদ্ধহস্ত। বঙ্গসাহিত্যে জ্যোতিবাবু ছাড়া এই দুরূহ ব্যাপারে এরূপ কৃতকার্য্য বোধ হয় আর কেহই হইতে পারিতেন না। তিনি বঙ্গভাষার অপূর্ণ ভাণ্ডারে এইপ্রকার "রত্নরাজি" উপহার দিয়া বঙ্গীয় পাঠক-সমাজকে চিরঋণী করিয়াছেন—সেজন্য তিনি সাধারণের নিকট হইতে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ পাইতেছেন ও পাইবেন। এক্ষণে প্রবন্ধ-শেষে আমার ব্যক্তিগত কথা এই যে, আমি তাঁহার উপহার এই অনুবাদ-গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি ও সেজন্য তাঁহাকে শতমুখে ধন্যবাদ দিতেছি,—তিনি ইহা গ্রহণ করিলে সুখী হইব।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

সার সত্যের আলোচনা।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড। গত মাসের প্রবন্ধে কর্ত্তা-কর্ম্মের এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের উভয়াত্মক ঐক্য কিরূপ, তাহা প্রদর্শন করিয়া শেষে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল এই যে, সে যে উভয়াত্মক ঐক্য, তাহা কি অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয়, অথবা, পূর্ব্বে যাহা প্রসুপ্ত ছিল, তাহাই জাগ্রত হয়। এ প্রশ্নের রীতিমত মীমাংসা

করিতে হইলে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ঐক্য কিরূপ, এবং সে ঐক্য বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে কিরূপেই বা সংক্রামিত হয়, তাহার প্রতি বিধিমতে অনুসন্ধান প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

আমরা প্রত্যেকে এক-একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড; এবং সমস্ত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ক্রোড়ে করিয়া যে এক নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ব্যাপিয়া বিরাজমান, তাহাই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। কাজেই দাঁড়াইতেছে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথা-সর্ব্বস্ব যাহা কিছু আছে, সমস্তই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে ধার করিয়া পাওয়া। তার সাক্ষী মনুষ্যের উদরভাণ্ডে যে তণ্ডুলান্ন রহিয়াছে, তাহা ধান্যক্ষেত্রেরই তণ্ডুল; মনুষ্যের রক্তে যে জল রহিয়াছে, তাহা সমুদ্রেরই জল; মনুষ্যের শরীরে যে তেজ রহিয়াছে, তাহা অগ্নিরই তেজ; মনুষ্যের নাসিকাপথ দিয়া যে বায়ু যাতায়াত করিতেছে, তাহা বহি-রাকাশেরই বায়ু। এ তো সকলেরই এক-প্রকার দেখা কথা; তা ছাড়া, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বলেন এই যে, প্রথমে পৃথিবী উচ্ছৃঙ্খল ভৌতিক শক্তিসকলের ক্রীড়াক্ষেত্র ছিল। ক্রমে পৃথিবীতে ভৌতিক শক্তির উন্মত্ত নৃত্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া জীবনী শক্তির উন্মেষ হইতে লাগিল। উদ্ভিদ্ জন্মিবার পূর্ব্বে পৃথিবীতে শুদ্ধকেবল ভৌতিক শক্তির দল, সংক্ষেপে—ভূতের দল, দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতেছিল, তাহার পরে যখন উদ্ভিদের আদিম স্তর পঙ্কশয্যা হইতে অল্পে অল্পে গাত্রোত্থান করিয়া জলস্থলের অন্ধিসন্ধি প্রদেশসকল শ্যামলচ্ছদে আবরণ করিতে লাগিল এবং তাহার পরে সেই নূতন ব্যাপারটি যখন জলের কিনারা হইতে ক্রমে ক্রমে ডাঙা বাহিয়া উঠিয়া দেশবিদেশ ব্যাপিয়া দলে দলে সাজিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন পৃথিবী একবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে দ্বিবিধ শক্তির লীলা-ক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি, এই দুইপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। তাহার পরে যখন উদ্ভিদশ্রেণী নানা বর্ণের ফলফুলপল্লবের বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল এবং জলচর, ভূচর, খেচর প্রভৃতি নানা জন্তু পঙ্ক হইতে, অণ্ড হইতে, জরায়ু হইতে, কালে-কালে বাহির হইয়া পালে-পালে বিচরণ করিতে লাগিল, আর, সেই সঙ্গে গিরি-গুহা-অরণ্য গর্জ্জনরবে এবং বৃংহিত-রবে, গহন বন ঝিল্লী-রবে, পুষ্পমঞ্জরী গুঞ্জরিত রবে, লতাকুঞ্জ কূজিত রবে, তৃণ-ভূমি হম্বারবে, বিস্তীর্ণ প্রান্তর হ্রেষারবে শব্দায়মান হইতে লাগিল, তখন পৃথিবী দ্বিবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে ত্রিবিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি, এই তিনপ্রকার শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল। সর্ব্বশেষে যখন মনুষ্য বাহির হইয়া প্রথমে হামাগুড়ি দিতে লাগিল, এবং ক্রমে উন্নতমস্তকে দণ্ডায়-মান হইয়া চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া গন্তব্য-পথে চলিতে লাগিল এবং তাহার পরে যখন বিচারবিবেচনা এবং যুক্তি খাটাইয়া সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করিতে আরম্ভ করিল, তখন পৃথিবী ত্রিবিধ শক্তির পরিবর্ত্তে চতুর্ব্বিধ শক্তির লীলাক্ষেত্র হইল—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তির ক্রীড়াক্ষেত্র হইল। এই যে চারিপ্রকার শক্তি—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এ

চারিপ্রকার শক্তির প্রথমে প্রথমটি একাকী, তাহার পরে প্রথম এবং দ্বিতীয় যুগ বাঁধিয়া, তাহার পরে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় যোট বাঁধিয়া, পৃথিবীতে যথাক্রমে পরে পরে আবির্ভূত হইল, এবং পরিশেষে যখন প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয়ের উপরে চতুর্থ আবির্ভূত হইল, তখন সর্ব্বপ্রকার শক্তি একত্র সমবেত হইয়া মনুষ্যশরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিল। অর্থাৎ বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যতপ্রকার শক্তি আছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—সমস্তেরই কিছু-না-কিছু নিদর্শন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে পুঞ্জীভূত হইল; কোনো প্রকারেরই সংগ্রহকার্য্য অবশিষ্ট রহিল না। শেষরাত্রে প্রত্যূষের হ'ব হ'ব সময়ে পক্ষিকুলের নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়, ইহা সকলেরই দেখা কথা। সেই দিবা এবং রাত্রির সন্ধিস্থানে সূর্য্যের উদ্বোধনী শক্তি (অর্থাৎ ঘুমভাঙানি শক্তি) একাকী অভিব্যক্ত হয়; দ্যোতনাশক্তি, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার কিছুকাল পরে যখন প্রত্যূষ ফুটিয়া বাহির হয়, তখন সূর্য্যের উদ্বোধনী শক্তির উপরে আর-একটি শক্তি অভিব্যক্ত হয়—সেটি হ'চ্চে দ্যোতনাশক্তি। এই সময়টিতে অর্থাৎ প্রত্যূষের দিবালোকে সূর্য্যের দুইপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয় এবং দুইপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে;—উদ্বোধনী শক্তি এবং দ্যোতনাশক্তি অভিব্যক্ত হয়, তাপনী শক্তি এবং দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। মধ্যাহ্নদিবালোকে সূর্য্যের তিনপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হয়—একপ্রকার শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে; উদ্বোধনী শক্তি, দ্যোতনাশক্তি এবং তাপনী শক্তি অভিব্যক্ত হয়—দাহিকা শক্তি অনভিব্যক্ত থাকে। তাহার পরে যদি প্রদাহক কাচের (Burning glassএর) মধ্য দিয়া সূর্য্যরশ্মিকে বস্ত্রাদির উপরে পুঞ্জীভূত করা যায়, তাহা হইলে সেই পুঞ্জীভূত সূর্য্যরশ্মিতে সূর্য্যের সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হয়—উদ্বোধনী শক্তি, দ্যোতনাশক্তি, তাপনীশক্তি এবং দাহিকা শক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি এক-যোগে অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে তেমনি (অর্থাৎ মনুষ্যরাজ্যে তেমনি) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বাঙ্গীণ শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে—ভৌতিক শক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি, এবং ধীশক্তি, এই চারিপ্রকার শক্তি অভিব্যক্ত হইয়াছে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'চ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার—ভূতকোষ; (২) ভৌতিক শক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—উদ্ভিদকোষ; (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—পশ্বাদিকোষ; (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি, এই চতুর্ব্বিধ শক্তির একাধার—মানবকোষ। তেমনি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের চারি কোষ হ'চ্চে (১) ভৌতিক শক্তির আধার অস্থিমাংস প্রভৃতি অন্নময় কোষ; (২) ভৌতিকশক্তি এবং জীবনী শক্তি দুয়ের একাধার—প্রাণময় কোষ (বলা যাইতে পারে Vegitative system); (৩) ভৌতিকশক্তি, জীবনীশক্তি এবং চেতনাশক্তি তিনের একাধার—মনোময় কোষ (Animal system বা Nervous system); (৪) ভৌতিকশক্তি, জীবনী শক্তি, চেতনাশক্তি এবং ধীশক্তি—এই চতুর্ব্বিধ শক্তির একাধার—বিজ্ঞানময় কোষ (Brain)। ইহাই হিরণ্ময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ

হ'চ্চে জগতের আদিম-প্রকাশ বা আদি-সূর্য্য।* তা ছাড়া, চতুর্ব্বিধ শক্তির সামঞ্জস্যের এবং ঐক্যের একটি কেন্দ্রস্থান বা সন্ধিস্থান বা লয়স্থান বা সমাধিস্থান আছে—সেটা হ'চ্চে আনন্দময় কোষ। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সহিত ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের এইরূপ খাপে-খাপে মিল রহিয়াছে—মিল যখন রহিয়াছে, আর, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের যথাসর্ব্বস্ব যাহা কিছু আছে সমস্তই যখন বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড হইতে আসিয়াছে, তখন, পঞ্চকোষের একত্র সমাবেশজনিত যে এক জ্ঞাতৃজ্ঞেয়ের এবং কর্ত্তাকর্ম্মের উভয়াত্মক ঐক্য অনুভূত হয় ও সেই ঐক্যে ভর দিয়া যে এক "আমি আছি" দণ্ডায়মান হয়, সেই যে উভয়াত্মক ঐক্য এবং সেই যে "আমি আছি", দুইই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য এবং সর্ব্বব্যাপী আমি আছি হইতে আসিয়াছে—তা বই, তাহা অকস্মাৎ আকাশ হইতে নিপতিত হয় নাই—ইহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। এবারে যাহা অতীব সংক্ষেপে বলা হইল, আগামী বারে তাহা বিস্তারপূর্ব্বক ভাঙিয়া বলিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

নারীধর্ম্ম—মর্ম্মগাথা, প্রেমগাথা প্রভৃতির কবি শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত। এ গ্রন্থখানি যে কি উদ্দেশ্যে রচিত, তাহা গ্রন্থকর্ত্রীর ভূমিকা হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

"সংসারে রমণীগণ প্রেম-প্রীতির আকর-স্বরূপ। তাঁহাদেরই স্নেহ-মমতা-পবিত্রতায় সংসার শান্তিময়। এইজন্যই হিন্দুসংসারে রমণীগণ দেবীবৎ পূজনীয়া। কিরূপে রমণীগণ নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনপূর্ব্বক নারীধর্ম্ম রক্ষা করিয়া—সংসারে অমৃতস্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, কিরূপ নারীচরিত্রে প্রকৃত দেবীচরিত্র প্রতিভাত হইতে পারে, এই নারীধর্ম্মে তাহারই আলোচনা করিয়াছি।"

উপযুক্ত হস্তে উপযুক্ত আলোচনাই হইয়াছে—গ্রন্থকর্ত্রী নিজে একজন শিক্ষিতা

---

* এরূপ ধারণার কারণ কি, তাহা ভাঙিয়া বলিতে হইলে অনেক কথা বলিতে হয়; বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহার স্থানসঙ্কুলান হওয়া দুর্ঘট। উপনিষদে আছে—"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌যদাত্মবিদো বিদুঃ॥" হিরণ্ময় পরম কোষে বিরজ অখণ্ড ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন—সেই শুভ্র জ্যোতির জ্যোতি—যাঁহাকে আত্মবিদেরা জানেন। ইহাতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড দুয়েরই হিরণ্ময় কোষে ব্রহ্ম অবস্থিতি করেন, যেহেতু তিনি অখণ্ড। এটাও ভাবে বলা হইয়াছে যে, হিরণ্ময় কোষ এক হিসাবে যেমন সর্ব্বজগতের কেন্দ্রস্থান, আর-এক হিসাবে তেমনি সর্ব্বজগতে পরিব্যাপ্ত। ফলে, উহা সেইরূপ-এক অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল, যাহার উপলক্ষে পাশ্চাত্যপ্রদেশীয় Augustine ঋষি বলিয়াছেন—"whose centre is everywhere but circumfer-n-e nowhere" কেন্দ্র যাহার সকল স্থানেই—পরিধি যাহার কোনো স্থানেই নাই।

নবীনা—নব্যবঙ্গের রমণীর প্রতি তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, তাহা বেশ সময়োপযোগীই হইয়াছে। অন্তঃপুরের উপদেশে পুরুষের মন যে সহজে বিচলিত হয়, ইহার অনেক প্রমাণ ইতিহাস ও সংসারে দেখা গিয়াছে; কিন্তু পুরুষের চেষ্টায় শুদ্ধান্তের শোধন সচরাচর বড়-একটা দৃষ্টিপথে পড়ে না—সেখানে গৃহিণী-কুলেরই প্রাধান্য, সুতরাং অন্তঃপুরের সংস্কার অন্তঃপুর হইতেই সহজে সম্ভব। আমাদের রমণীকুলের চরম ও স্বাভাবিক বিকাশ মাতৃত্বে, যে কারণেই হোক, নব্যবঙ্গের মহিলাকুলের সে মাতৃভাব ক্রমে হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে, কবে বা একেবারে লয় পায়, সন্তপ্ত বঙ্গসন্তানের জুড়াইবার স্থান অল্পে অল্পে উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে, বাঙালীর পোড়া অদৃষ্টের গুণে না জানি কবে বা তাহা একেবারে পুড়িয়া যায়। এই দুঃসময়ে সময় বুঝিয়া সরস্বতী মহাশয়া নবীনাদিগকে প্রকৃত গৃহলক্ষ্মী হইবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত, ইহা বড় সুখের কথা—আশার কথাও বটে। তবে এখানে একটি কথা বলিবার আছে, এ গ্রন্থে নবীনা গ্রন্থকর্ত্রীর বক্তব্যে তাঁহার মাতৃভাবটা মাঝে মাঝে অতিমাত্রায় ফুটিয়াছে, যেন কিছু উপরে উঠিয়াছে, স্থানে স্থানে এই দোষে একটুআধটু অশোভনও হইয়াছে, এ সকল দোষ কিন্তু অতি সামান্য। মোটের উপর এ গ্রন্থ পাঠে আমরা বড় প্রীত হইয়াছি—প্রীত হইবার আর একটি বিশেষ কারণ এই যে, শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা এতদিন কবিতার আলোচনা করিয়া যশঃসঞ্চয়ে ব্রতিনী ছিলেন—এখন তিনি সংসারধর্ম্মের সংস্কারে মন দিয়াছেন; নিরবচ্ছিন্ন কবিতারচনাই যে রমণীজীবনের চরম লক্ষ্য নহে, এবং তাহাতে যে রমণীর তৃপ্তি হয় না, ইহা তিনি বুঝিয়াছেন—বুঝিয়া অন্যকে তাহা বুঝিবার অবসর দিয়াছেন। আজকাল কবিতাসংক্রমণের দিনে কোন স্ত্রীকবির নিকট হইতে এ শিক্ষার মূল্য অনেক অধিক বলিয়া মনে করিতে আমরা বাধ্য হইতেছি। অলমতিবিস্তরেণ।

হেমচন্দ্র।

বঙ্গের কবি হেমচন্দ্র ইহধাম হইতে চলিয়া গিয়াছেন। সকলকেই সে পথে যাইতে হয়, তিনিও সেই পথে গিয়াছেন। শেষাবস্থায় তিনি যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে মৃত্যুর অর্থ নিষ্কৃতি। শোক করিবার কথাই নহে, অথচ এই কলিকাতা-সহরে আমরা ত তাঁহার জন্য অনেক শোক-সভার ব্যবস্থা করিয়াছি। ইহার অর্থ এই যে, মানুষ মায়ার বড়ই অধীন, সেইজন্য আমরা তাঁহার জন্য শোক করিতেছি, নতুবা যিনি বৈকুণ্ঠে গিয়াছেন, তাঁহার জন্য শোক করিতে হয় কেন?

আমি আজ তাঁহার গ্রন্থাদির সমালোচনা করিতে বসি নাই; কখন যে করিব, সে

সম্ভাবনাও নাই। কেবল তাঁহাকে মনে করিয়া স্বতই যাহা আমার মনে উদয় হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি।

হেমবাবু যে বঙ্গভাষাকে অমূল্য সম্পদ্ দান করিয়াছেন, ইহা বুদ্ধিমান্ মাত্রেই স্বীকার করেন। তাঁহার "বৃত্রসংহার" ও "দশমহাবিদ্যা"র ন্যায় কাব্য বঙ্গভাষায় পূর্ব্বে আর লিখিত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর এই কয় দিনে এই কলিকাতাসহরে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। কেবল একটি কথা কেহ আলোচনা করেন নাই। সেই কথা আমি বলিব মনে করিয়াছি।

হেমবাবুর কবিতায় আমরা তাঁহার মানসিক বিকাশের যে একটি পদ্ধতি দেখিতে পাই, আজ শুধু আমরা তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমেই ধর, তাঁহার "কবিতাবলী"। ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার দৃষ্টি নিজের ভিতরেই নিবদ্ধ—কোথায় প্রতিভার পরিচয়, কোথাও বিদ্যার পরিচয়। তাঁহার "মদনপারিজাত" য়্যালেক্জাণ্ডার পোপের Eloisa to Abelardএর নকল; তাঁহার "কমলবিলাসী" টেনিসনের Lotos-Eaters এর নকল; তাঁহার "ইন্দ্রের সুধাপান" ড্রাইডেনের Alexander's Feastএর অনুকরণ; তাঁহার "হতাশের আক্ষেপ" এবং "কোন একটি পাখীর প্রতি" কেবল ব্যক্তিবিশেষের অন্তরের হাহাকার। ইহাতে এই বুঝিলাম যে, যে সময়ে তিনি "কবিতাবলী" প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তখনও তাঁহার প্রতিভা আপনাতেই সম্বদ্ধ।

তাহার পর দেখিতে পাইবে, তাঁহার প্রতিভা ইহসংসারের ব্যাখ্যায় নিযুক্ত। জগতে যে, শক্তিরই জয়, তাহা ত আমরা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করিতেছি। "বৃত্রসংহারে" সেই চিত্রই চিত্রিত হইয়াছে।

শক্তির জয়ের, ঐতিহাসিক কালেও পরিচয় পাইয়াছি নেপোলিয়নের জীবনে, কিন্তু শক্তি কি সর্ব্বজয়ী? বৃত্রাসুরে এবং নেপোলিয়নে কোথাও ত সেরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অধর্ম্ম আসিয়া জুটিলেই শক্তির ধ্বংস হয়। বৃত্রাসুর এবং নেপোলিয়ন, উভয়েই জগতে শক্তিতে অজেয়। অধর্ম্মাচরণে উভয়েরই ধ্বংস হইল। শেষে উভয়কেই কাঁদিতে হইয়াছে। একজনকে কাঁদিয়া বলিতে হইল—

"হা শম্ভু, তুমিও বাম!"

আর জনকেও কাঁদিয়া বলিতে হইয়াছিল—St. Helena was written in destiny.

চিরদিনই অধর্ম্মে এইরূপ বিলাপ করিতে হয়। সংসারে শক্তির জয় হইবে, ইহা যেমন সত্য; অধার্ম্মিক শক্তির ক্ষয়ও তেমনি সত্য। হেমবাবু তাঁহার "বৃত্রসংহারে" এই প্রগাঢ় নীতির অবতারণা করিয়াছেন।

তাহার পর দেখিতে পাই যে, হেমবাবুর প্রতিভা সংসারকেও ছাড়াইয়া বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়াছে—তাহার পরিচয় "দশমহাবিদ্যায়"। প্রতিভার এইরূপ পরিণতি সচরাচর দেখা যায় না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি আজ তাঁহার সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত নহি; তাঁহাকে যে হারাইয়াছি, আজ সেই দুঃখের কথাই বলিতেছি। যেমন যায়, তেমনটি আর পাওয়া যায় না, ইহা আমাদের দেশের চিরপ্রচলিত কথা। হেমচন্দ্র ত চলিয়া গেলেন; আবার কি আমরা তেমন পাইব? জগদীশ্বর জানেন।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

অন্নদাবাবু কথাটাকে গম্ভীরভাবে লইয়া বিস্তারিতরূপে প্রমাণ করিতে বসিলেন যে, ভাবুক হইলেও হজম করাটা চাইই।

রমেশ নীরবে বসিয়া মনে মনে দগ্ধ হইতে লাগিল।

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আমার পরামর্শ শুনুন্—অন্নদাবাবুর পিল্ খাইয়া একটু সকাল-সকাল শুইতে যান্!"

রমেশ কহিল, "অন্নদাবাবুর সঙ্গে আজ আমার একটু বিশেষ কথা আছে, সেইজন্য আমি অপেক্ষা করিয়া আছি।"

অক্ষয় চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—"এই দেখুন্, এ কথা পূর্ব্বে বলিলেই হইত। রমেশবাবু সকল কথা পেটে রাখিয়া দেন, শেষকালে সময় যখন প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তখন ব্যস্ত হইয়া উঠেন।"

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ নিজের জুতা-জোড়াটার প্রতি দুই নতচক্ষু বদ্ধ রাখিয়া বলিতে লাগিল—"অন্নদাবাবু, আপনি আমাকে আত্মীয়ের মত আপনার ঘরের মধ্যে যাতায়াত করিবার অধিকার দিয়াছেন, ইহা আমি যে কত সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি, তাহা আপনাকে মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারিব না।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"বিলক্ষণ! তুমি আমাদের যোগেনের বন্ধু, তোমাকে ঘরের ছেলে বলিয়া মনে করিব না ত কি করিব?"

ভূমিকা ত হইল, তাহার পরে কি বলিতে হইবে, রমেশ কিছুতেই ভাবিয়া পায় না। রমেশের আরক্তবর্ণ মুখ দেখিয়া অন্নদাবাবু ব্যাপারখানা বুঝিতে পারিলেন। তিনি রমেশের পথ সুগম করিয়া দিবার জন্য কহিলেন —"রমেশ, তোমার মত ছেলেকে ঘরের ছেলে করিতে পারা আমারই কি কম সৌভাগ্য!"

ইহার পরেও রমেশের কথা জোগাইল না।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"দেখ না, তোমাদের সম্বন্ধে বাহিরের লোক অনেক কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা বলে, হেমনলিনীর বিবাহের বয়স হইয়াছে, এখন তাহার সঙ্গিনির্ব্বাচনসম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আমি তাহাদিগকে বলি, রমেশকে আমি খুব বিশ্বাস করি—সে আমাদের উপরে কখনই অন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না! এই সেদিন তারক আমাকে বলিতেছিল, 'রমেশবাবু তোমাদের সঙ্গে যেরূপ মেশামেশি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া জানা উচিত—লোকে এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' আমি কহিলাম, 'রমেশ স্পষ্ট করিয়া কোন কথা বলুক্ বা না বলুক, তাহার দ্বারা হেমনলিনীর যে লেশমাত্র অনিষ্ট হইবে না, সে আমি নিশ্চয়ই জানি।'"

রমেশ। অন্নদাবাবু, আমার সম্বন্ধে আপনি সমস্তই ত জানেন, আপনি যদি আমাকে যোগ্যপাত্র বলিয়া মনে করেন, তবে—

অন্নদা। সে কথা বলাই বাহুল্য। আমরা ত একপ্রকার ঠিক করিয়াই রাখিয়াছি—কেবল তোমার সাংসারিক দুর্ঘটনার ব্যাপারে দিন স্থির করিতে পারি নাই। কিন্তু বাপু, আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। সমাজে এ লইয়া ক্রমেই নানা কথার সৃষ্টি হইতেছে—

সেটা যত শীঘ্র হয়, বন্ধ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। কি বল?

রমেশ। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, তাহাই হইবে। অবশ্য সর্ব্বপ্রথমে আপনার কন্যার মত জানা আবশ্যক।

অন্নদা। সে ত ঠিক কথা। কিন্তু সে একপ্রকার জানাই আছে। তবু কাল সকালেই সে কথাটা পাকা করিয়া লইব।

রমেশ। আপনার শুইতে যাইবার বিলম্ব হইতেছে, আজ তবে আসি।

অন্নদা। একটু দাঁড়াও। আমি বলি কি, আমরা জব্বলপুরে যাইবার আগেই তোমাদের বিবাহটা হইয়া গেলে ভাল হয়।

রমেশ। সে ত আর বেশি দেরি নাই।

অন্নদা। না, এখনো দিনদশেক আছে। আগামী রবিবারে যদি তোমাদের বিবাহ হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পরেও যাত্রার আয়োজনের জন্য দুতিনদিন সময় পাওয়া যাইবে। বুঝিয়াছ রমেশ, এত তাড়া করিতাম না,—কিন্তু আমার শরীরের জন্যই ভাবনা। আজকাল পিল্‌টা খাইয়া কিছু ভাল আছি, কিন্তু বলা ত যায় না। আমি যদি পড়ি, তাহা হইলে বন্দোবস্ত সমস্তই গোল হইয়া যাইবে—কেবল এক অক্ষয় ছাড়া আমাকে সাহায্য করিবার লোক আর কেহ নাই।

রমেশ সম্মত হইল এবং আর-একটা পিল্ গিলিয়া বাড়ী চলিয়া গেল।

১৪

বিবাহপরিণামটা এতদিন অস্ফুট আকারে ছিল। অবশ্য হেমনলিনীকে বিবাহ করিতে তাহার ধর্ম্মসঙ্গত কোন বাধা নাই, এ কথা মনের মধ্যে নিশ্চয় করিয়াই রমেশ এমন নিশ্চিন্তভাবে ভালবাসার টানে হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। বিবাহের প্রস্তাবটা যখনি স্পষ্ট হইল, তখনি নানা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। আর একবার কমলাসম্বন্ধে ভাল করিয়া মনোযোগ করিবার সময় আসিল। কিন্তু সময় অত্যন্ত অল্প।

বিদ্যালয়ের ছুটি নিকটবর্ত্তী। ছুটির সময়ে কমলাকে বিদ্যালয়েই রাখিবার জন্য রমেশ কর্ত্রীর সহিত পূর্ব্বেই ঠিক করিয়াছিল।

রমেশ প্রত্যুষে উঠিয়া ময়দানের নির্জ্জন রাস্তায় পদচারণা করিতে করিতে স্থির করিল, বিবাহের পর সে কমলাসম্বন্ধে হেমনলিনীকে সমস্ত ঘটনা আগাগোড়া বিস্তারিত করিয়া বলিবে। তাহার পরে কমলাকেও সমস্ত কথা বলিবার অবকাশ হইবে। এইরূপ সকল পক্ষে বোঝাপড়া হইয়া গেলে কমলা স্বচ্ছন্দে বন্ধুভাবে হেমনলিনীর সঙ্গেই বাস করিতে পারিবে। দেশে ইহা লইয়া নানা কথা উঠিতে পারে, ইহাই মনে করিয়া সে হাজারিবাগে গিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিবে স্থির করিয়াছে।

ময়দান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাড়ী গেল। সিঁড়িতে হঠাৎ হেমনলিনীর সঙ্গে দেখা হইল। অন্যদিন হইলে এরূপ সাক্ষাতে একটু-কিছু আলাপ হইত। আজ হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল,—সেই রক্তিমার মধ্য দিয়া একটা হাসির আভা উষার আলোকের মত দীপ্তি পাইল—হেমনলিনী মুখ ফিরাইয়া চোখ নীচু করিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। হেমনলিনীর এই লজ্জিত আনন্দের নীরব রশ্মি-অভিঘাতে রমেশের সমস্ত হৃদয় পুলকে কাঁপিতে লাগিল।

তাহার সকল দুশ্চিন্তা কুয়াশার মত কাটিয়া গেল। পৃথিবীতে কিছুর জন্যই যে কোন-প্রকার ভয়ভাবনা হইতে পারে, তাহা তাহার মনেই হইল না। যাহাকে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হিমালয় মনে হইয়াছিল, সে তাহার পায়ের কাছে দেখিতে দেখিতে মেঘের মত হাল্কা হইয়া গেল—তাহার জীবনপথের সম্মুখে সমস্তই সহজ, সুন্দর, সুমঙ্গল বলিয়া বোধ হইল। সে চারিদিকে চাহিয়া মনে মনে কহিল, "হে মহাসুন্দর নিখিল বিশ্ব, আমি আপনাকে নিঃশেষে তোমার কাছে উৎসর্গ করিলাম।" আর সেই লজ্জিত পুলকিত মুখচ্ছবি বারবার স্মরণ করিয়া বলিতে লাগিল —"পৃথিবীর মাটির উপর দিয়া তোমাকে কেন চলিতে হয়—তোমার চলিবার পথে আমি আমার হৃদয় বিছাইয়া দিতে চাই! তোমার প্রত্যেক পদক্ষেপ আমার ভালবাসার মধ্যে অনুভব করিলে তবে আমি কৃতার্থ হইতে পারি!"

রমেশ যে গৎটা হেমনলিনীর কাছ হইতে হার্ম্মোনিয়মে শিখিয়াছিল, বাসায় গিয়া সেইটে খুব করিয়া বাজাইতে লাগিল। কিন্তু একটি-মাত্র গৎ সমস্তদিন বাজানো চলে না। কবিতার বই পড়িতে চেষ্টা করিল—মনে হইল, তাহার ভালবাসার সুর যে সুদূর উচ্চে উঠিতেছে, কোনো কবিতা সে পর্য্যন্ত নাগাল পাইতেছে না।

আর হেমনলিনী অশ্রান্ত আনন্দের সহিত তাহার গৃহকর্ম্ম সমস্ত সারিয়া নিভৃত দ্বিপ্রহরে শয়নঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া তাহার সেলাইটি লইয়া বসিয়াছে। মুখের উপরে একটি পরিপূর্ণ প্রসন্নতার শান্তি। একটি সর্ব্বাঙ্গীণ সার্থকতা তাহাকে জননীর মত স্নিগ্ধবাহুপাশে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে—আজ তাহার অন্তরে-বাহিরে কোথাও কিছুমাত্র শূন্যতা নাই, তাহার আনন্দের মধ্যে কোথাও অবকাশ নাই। ইতিপূর্ব্বে, কখন্ রমেশ আসিবে, কখন্ চায়ের সময় হইবে, কখন্ ছাদে যাইবে, ইহা লইয়া হেমনলিনীর চিত্ত সমস্তদিন উৎসুক হইয়া থাকিত, আজ তাহার আর সে চঞ্চলতা নাই। আজ তাহার আর ভিক্ষুক-ভাব নহে—তাহার হৃদয়ের শেষসীমা পর্য্যন্ত ভরিয়া আজ সুধা সঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে—প্রেমের যজ্ঞে প্রিয়জনের হস্তে তাহা সম্পূর্ণ সমর্পণ করিবার জন্য সে আজ একান্তমনে অর্ঘ্যধারিণী পূজার্থিনীর মত নীরবে অপেক্ষা করিয়া আছে।

চায়ের সময়ের পূর্ব্বেই কবিতার বই এবং হার্ম্মোনিয়ম ফেলিয়া রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্যদিন হেমনলিনীর সহিত দেখা হইতে বড় বিলম্ব হইত না। কিন্তু আজ চায়ের ঘরে দেখিল সে ঘর শূন্য, দোতলায় বসিবার ঘরে দেখিল সে ঘরও শূন্য, হেমনলিনী এখনো তাহার শয়নগৃহ ছাড়িয়া নামে নাই।

অন্নদাবাবু যথাসময়ে আসিয়া টেবিল্ অধিকার করিয়া বসিলেন, এবং নানা বিষয়ে, বিশেষত স্বাস্থ্যতত্ত্বসম্বন্ধে উপদেশপূর্ণ সুদীর্ঘ আলোচনা করিতে লাগিলেন। রমেশ নিরীহের মত কদাচিৎ তাহার দুটা-একটা উত্তর দিল এবং ক্ষণে ক্ষণে চকিতভাবে দরজার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

পদশব্দ হইল, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিল অক্ষয়। যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখাইয়া কহিল—

"এই যে রমেশবাবু, আমি আপনার বাসাতেই গিয়াছিলাম।"

শুনিয়াই রমেশের মুখে উদ্বেগের ছায়া পড়িল।

অক্ষয় হাসিয়া কহিল—"ভয় কিসের রমেশবাবু? আপনাকে আক্রমণ করিতে যাই নাই। শুভসংবাদে অভিনন্দন প্রকাশ করা বন্ধুবান্ধবের কর্ত্তব্য—তাহাই পালন করিতে গিয়াছিলাম।"

এই কথায় অন্নদাবাবুর মনে পড়িল, হেমনলিনী উপস্থিত নাই। হেমনলিনীকে ডাক্ দিলেন—উত্তর না পাইয়া তিনি নিজে উপরে গিয়া কহিলেন, "হেম, একি, এখনো সেলাই লইয়া বসিয়া আছ? চা তৈরি যে! রমেশ-অক্ষয় আসিয়াছে।"

হেমনলিনী মুখ ঈষৎ লাল করিয়া কহিল, "বাবা, আমার চা উপরে পাঠাইয়া দাও—আজ আমি সেলাইটা শেষ করিতে চাই।"

অন্নদা। ঐ তোমার দোষ হেম! যখন যেটা লইয়া পড়, তখন আর-কিছুই খেয়াল কর না। যখন পড়া লইয়া ছিলে, তখন বই কোল হইতে নামিত না—এখন শেলাই লইয়া পড়িয়াছ, এখন আর-সমস্তই বন্ধ! না না, সে হইবে না—চল, নীচে গিয়া চা খাইবে চল!

এই বলিয়া অন্নদাবাবু জোর করিয়াই হেমনলিনীকে নীচে লইয়া আসিলেন। সে আসিয়াই কাহারো দিকে দৃষ্টি না করিয়া তাড়াতাড়ি চা ঢালিবার ব্যাপারে ভারি ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

অন্নদাবাবু অধীর হইয়া কহিলেন, "হেম, ওকি করিতেছ? আমার পেয়ালায় চিনি দিতেছ কেন? আমি ত কোনোকালেই চিনি দিয়া চা খাই না।"

অক্ষয় টিপিটিপি হাসিয়া কহিল—"আজ উনি ঔদার্য্য [illegible]রণ করিতে পারিতেছেন না—আজ সকলকেই মিষ্ট বিতরণ করিবেন।"

হেমনলিনীর প্রতি এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ রমেশের মনে মনে অসহ্য হইল। সে তৎক্ষণাৎ স্থির করিল—'আর যাই হউক্, বিবাহের পরে অক্ষয়ের সহিত কোন সম্পর্ক রাখা হইবে না।'

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, আপনার নামটা বদ্‌লাইয়া ফেলুন্।"

রমেশ এই রসিকতার চেষ্টায় অধিকতর বিরক্ত হইয়া কহিল—"কেন বলুন দেখি?"

অক্ষয় খবরের কাগজ খুলিয়া কহিল—"এই দেখুন্, আপনার নামের একজন ছাত্র অন্যলোককে নিজের নামে চালাইয়া পরীক্ষা দেওয়াইয়া পাস্ হইয়াছিল—হঠাৎ ধরা পড়িয়াছে।"

হেমনলিনী জানে, রমেশ মুখের উপর উত্তর দিতে পারে না—সেইজন্য এতকাল অক্ষয় রমেশকে যত আঘাত করিয়াছে, সে-ই তাহার প্রতিঘাত দিয়া আসিয়াছে। আজও থাকিতে পারিল না। গূঢ় ক্রোধের লক্ষণ চাপিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল—"অক্ষয় বলিয়া ঢের লোক বোধ হয় জেলখানায় আছে।"

অক্ষয় কহিল, "ঐ দেখুন্, বন্ধুভাবে সৎপরামর্শ দিতে গেলে আপনারা রাগ করেন। তবে সমস্ত ইতিহাসটা বলি। আপনি ত জানেন, আমার ছোট বোন শরৎ বালিকা-বিদ্যালয়ে পড়িতে যায়। সে কাল সন্ধ্যার

সময় আসিয়া কহিল—'দাদা, তোমাদের রমেশবাবুর স্ত্রী আমাদের ইস্কুলে পড়েন।'

"আমি বলিলাম, 'দূর পাগ্‌লি! আমাদের রমেশবাবু ছাড়া কি আর [illegible]ীয় রমেশবাবু জগতে নাই!' শরৎ কহিল, 'তা যেই হোন্, তিনি তাঁর স্ত্রীর উপরে ভারি অন্যায় করিতেছেন। ছুটিতে প্রায় সব মেয়েই বাড়ী যাইতেছে,—তিনি তাঁর স্ত্রীকে বোর্ডিঙে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। সে বেচারা কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থপাত করিতেছে।' আমি তখনি মনে মনে কহিলাম, 'এ ত ভাল কথা নহে, শরৎ যেমন ভুল করিয়াছিল, এমন ভুল আরো ত কেহ কেহ করিতে পারে!'"

অন্নদাবাবু হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন—"অক্ষয়, তুমি কী পাগলের মত কথা কহিতেছ! কোন্ রমেশের স্ত্রী ইস্কুলে পড়িয়া কাঁদিতেছে বলিয়া আমাদের রমেশ নাম বদ্‌লাইবে নাকি?"

এমন সময়ে হঠাৎ বিবর্ণমুখে রমেশ ঘর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় বলিয়া উঠিল, "ওকি রমেশবাবু, আপনি রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন নাকি? দেখুন্ দেখি, আপনি কি মনে করেন আপনাকে আমি সন্দেহ করিতেছি?"—বলিয়া রমেশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"একি কাণ্ড!"

হেমনলিনী কাঁদিয়া ফেলিল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "ওকি হেম, কাঁদিস্ কেন?"

সে উচ্ছ্বসিত রোদনের মধ্যে রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "বাবা, অক্ষয়বাবুর ভারি অন্যায়! কেন উনি আমাদের বাড়ীতে ভদ্রলোককে এমন করিয়া অপমান করেন?"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"অক্ষয় ঠাট্টা করিয়া একটা কি বলিয়াছে, ইহাতে এত অস্থির হইবার কি দরকার ছিল?"

"এরকম ঠাট্টা অসহ্য!"—বলিয়া দ্রুতপদে হেমনলিনী উপরে চলিয়া গেল।

এইবার কলিকাতায় আসার পর রমেশ বিশেষ যত্নের সহিত কমলার স্বামীর সন্ধান করিতেছিল। বহুকষ্টে, ধোবাপুকুরটা কোন্ জায়গায়, তাহা বাহির করিয়া কমলার মামা তারিণীচরণকে এক পত্র লিখিয়াছিল।

রমেশ আজ প্রাতঃকালে সেই পত্রের জবাব পাইয়াছে। তারিণীচরণ লিখিতেছেন—'দুর্ঘটনার পরে তাঁহার জামাতা শ্রীমান্ নলিনাক্ষের কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই। রংপুরে তিনি ডাক্তারি করিতেন—সেখানে চিঠি লিখিয়া তারিণীচরণ জানিয়াছেন, সেখানেও কেহ আজ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খবর পায় নাই। তাঁহার জন্মস্থান কোথায়, তাহা তারিণীচরণের জানা নাই।'

কমলার স্বামী নলিনাক্ষ যে বাঁচিয়া আছেন, এ আশা আজ রমেশের মন হইতে একেবারে দূর হইল। কারণ বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই তারিণীচরণকে সংবাদ দিতেন এবং সেখানে তাঁহার স্ত্রীর সম্বন্ধে সংবাদ লইবার চেষ্টা করিতেন।

সকালে রমেশের হাতে আরো অনেকগুলা চিঠি আসিয়া পড়িল। বিবাহের সংবাদ পাইয়া তাহার আলাপী পরিচিত অনেকে তাহাকে অভিনন্দনপত্র লিখিয়াছে। কেহ বা আহারের দাবী জানাইয়াছে, কেহ বা, এতদিন সমস্ত ব্যাপারটা সে গোপন রাখি-

য়াছে বলিয়া রমেশকে সকৌতুক তিরস্কার করিয়াছে।

কিন্তু রমেশের ভারাক্রান্ত মনে এই চিঠিগুলা আরো ভার বাড়াইতে লাগিল। যে ফাঁস তাহার গলায় জড়াইয়াছে, অল্পেতেই তাহাতে টান পড়িতেছে এবং বেদনায় রমেশ চকিত হইয়া উঠিতেছে।

এমন সময়ে অন্নদাবাবুর বাড়ী হইতে চাকর একখানি চিঠি লইয়া রমেশের হাতে দিল। হাতের অক্ষর দেখিয়া রমেশের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল।

হেমনলিনীর চিঠি। রমেশ মনে করিল, 'অক্ষয়ের কথা শুনিয়া হেমনলিনীর মনে সন্দেহ জন্মিয়াছে এবং তাহাই দূর করিবার জন্য সে রমেশকে পত্র লিখিয়াছে।'

চিঠি খুলিয়া দেখিল, তাহাতে কেবল এই ক'টি কথা লেখা আছে—

"অক্ষয়বাবু কাল আপনার উপর ভারি অন্যায় করিয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম, আজ সকালেই আপনি আসিবেন, কেন আসিলেন না? অক্ষয়বাবুর কথা কেন আপনি এত করিয়া মনে লইতেছেন? আপনি ত জানেন, আমি তাঁর কথা গ্রাহ্যই করি না। আপনি আজ সকাল-সকাল আসিবেন—আমি আজ সেলাই ফেলিয়া রাখিব।"

এই ক'টি কথার মধ্যে হেমনলিনীর সান্ত্বনাসুধাপূর্ণ কোমল হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করিয়া রমেশের চোখে জল আসিল। রমেশ বুঝিল, কাল হইতেই হেমনলিনী রমেশের বেদনা শান্ত করিবার জন্য তাহার সমস্ত অশ্রুসিক্ত ভালবাসা লইয়া ব্যগ্রহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া আছে। এম্‌নি করিয়া রাত গিয়াছে, এম্‌নি করিয়া সকালটা কাটিয়াছে, অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া এই চিঠিখানি লিখিয়াছে।

রমেশ কাল হইতে ভাবিতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া এইবার হেমনলিনীকে সকল কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু কল্যকার ব্যাপারের পর বলা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এখন ঠিক শুনাইবে, যেন অপরাধ ধরা পড়িয়া জবাবদিহির চেষ্টা হইতেছে। শুধু তাহাই নহে, অক্ষয়ের যে কতকটা জয় হইবে, সে-ও অসহ্য। সকলে যে বলিবে, তাই ত, অক্ষয়কে ত নিতান্ত দোষ দেওয়া যায় না—রমেশের পক্ষে সেটা বড় কঠিন।

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলার স্বামী যে আর-কোন রমেশ, নিশ্চয়ই অক্ষয়ের মনে সেই ধারণাই আছে—নহিলে সে এতক্ষণে কেবল ইঙ্গিত করিয়া থামিয়া থাকিত না, পাড়াসুদ্ধ গোল করিয়া বেড়াইত। অতএব এই বেলা যাহা-হয়-একটা উপায় অবলম্বন করা দরকার।"

উপায় কি করা যায়, ভাবিতে লাগিল। ইতিমধ্যে অন্নদাবাবুর বাড়ীতে একটি পরিচিত ভৈরবীসুর হার্ম্মোনিয়মে বাজিতে আরম্ভ করিল। হেমনলিনী জানে যে, এই ভৈরবী রমেশের প্রিয় রাগিণী। এই রাগিণীর পাখা মেলিয়া দিয়া বিরহিণী আপনার হৃদয়টিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া কোথায় কাহার কাছে কি সংবাদ লইতে একলা পাঠাইয়া দিল? কোথায় তাহার নীড়, কোথায় তাহার সাথী, কাহার অভাবে সমস্ত বিশ্বের

জনতার মধ্যে সে একাকী! হায় রমেশ, এমন সুরে পৃথিবীতে যাহাকে কেহ ডাকিতে পারে, তাহার কিসের চিন্তা, কিসের বাধা!

রমেশ এই সুর শুনিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, জগৎটি যেন অত্যন্ত নিভৃত—ইহার মধ্যে কেবল একটি ভালবাসা আছে; রাজার রাজ্য নাই, জীবিকার সংগ্রাম নাই, দুঃখীর দুরাশা নাই। সুন্দর শরতের দিন, সুধাময় নির্ম্মল নীলাকাশ, পরিপূর্ণ জীবন, ভালবাসা সুমধুর! অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে আর-কিছু থাকিবার আর কোন দরকার নাই! থাক্ কেবল একটিমাত্র অবাধ অবকাশ,—তাহা অনন্ত, তাহা অখণ্ড,—তাহা কেবল ভালবাসিবার। তাহার কপালে সোনার রৌদ্রালোক, গলায় শেফালীর মালা, কানে দূরাগত ভৈরবীর তান।

এমন-সময় আর-একটা ডাকের চিঠি আসিল। রমেশ খুলিয়া দেখিল, সে চিঠি স্ত্রীবিদ্যালয়ের কর্ত্রীর নিকট হইতে আসিয়াছে। তিনি লিখিয়াছেন, কমলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছে, তাহাকে এ অবস্থায় ছুটির সময় বিদ্যালয়ের বোর্ডিঙে রাখা তিনি সঙ্গত বোধ করেন না। আগামী শনিবারে ইস্কুল হইয়া ছুটি হইবে, সেই সময়ে তাহাকে বিদ্যালয় হইতে বাড়ী লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করা নিতান্ত আবশ্যক।

আগামী শনিবারে কমলাকে বিদ্যালয় হইতে লইয়া আসিতে হইবে! আগামী রবিবারে রমেশের বিবাহ!

যে ভৈরবী জগতের সমস্ত বিপুল চেষ্টা-চিন্তা-কর্ম্ম আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই ভৈরবী এক মুহূর্ত্তে ঢাকা পড়িয়া গেল। তাহার সুর আর কানে পৌঁছিল না।

"রমেশবাবু, আমাকে মাপ করিতে হইবে" এই বলিয়া অক্ষয় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কহিল, "এমন একটা সামান্য ঠাট্টায় আপনি যে এত রাগ করিবেন, তাহা আগে জানিলে আমি ও কথা তুলিতাম না! ঠাট্টার মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেই লোকে চটিয়া ওঠে, কিন্তু যাহা একেবারে অমূলক, তাহা লইয়া আপনি সকলের সাক্ষাতে এত রাগারাগি করিলেন কেন? অন্নদাবাবু ত কাল হইতে আমাকে ভর্ৎসনা করিতেছেন—হেমনলিনী আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়াছেন। আজ সকালে তাঁহাদের ওখানে গিয়াছিলাম, তিনি ঘর ছাড়িয়া চলিয়াই গেলেন। আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছিলাম বলুন্ দেখি?"

রমেশ কহিল—"এ সমস্ত বিচার যথাসময়ে হইবে। এখন আমাকে মাপ করিবেন—আমার বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে।"

অক্ষয়। রসুনচৌকির বায়না দিতে চলিয়াছেন বুঝি। এদিকে সময় সংক্ষেপ। আমি আপনার শুভকর্ম্মে বাধা দিব না, চলিলাম।

অক্ষয় চলিয়া গেলে রমেশ অন্নদাবাবুর বাসায় গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। আজ রমেশ সকাল-সকাল আসিবে, ইহা হেমনলিনী নিশ্চয় ঠিক করিয়া প্রস্তুত হইয়া বসিয়া ছিল। তাহার সেলাইয়ের ব্যাপারটি ভাঁজ করিয়া রুমালে বাঁধিয়া টেবিলের উপরে রাখিয়া দিয়াছিল। পাশে হার্ম্মোনিয়ম-যন্ত্রটি ছিল। আজ খানিকটা সঙ্গীত-আলোচনা

হইতে পারিবে, এইরূপ তাহার আশা ছিল, তা ছাড়া অব্যক্ত সঙ্গীত ত আছেই!

রমেশ ঘরে ঢুকিতেই হেমনলিনীর মুখে একটি উজ্জল-কোমল আভা পড়িল। কিন্তু সে আভা মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া গেল যখন রমেশ আর-কোন কথা না বলিয়া প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিল—"অন্নদাবাবু কোথায়?"

হেমনলিনী উত্তর করিল—"বাবা তাঁহার বসিবার ঘরে আছেন। কেন? তাঁহাকে কি এখনি প্রয়োজন আছে? তিনি ত সেই চা খাইবার সময় নামিয়া আসিবেন।"

রমেশ। না, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না।

হেমনলিনী। তবে যান্, তিনি ঘরেই আছেন।

রমেশ চলিয়া গেল। প্রয়োজন আছে! প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছুই নাই! সংসারে প্রয়োজনেরই কেবল সবুর সয় না। আর ভালবাসাকেই দ্বারের বাহিরে অবকাশ প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়।

শরতের এই অম্লান দিন যেন নিশ্বাস ফেলিয়া আপন আনন্দভাণ্ডারের সোনার সিংহদ্বারটি বন্ধ করিয়া দিল। হেমনলিনী হার্ম্মোনিয়মের নিকট হইতে চৌকি সরাইয়া লইয়া টেবিলের কাছে বসিয়া একমনে সেলাই করিতে প্রবৃত্ত হইল। ছুঁচ ফুটিতে লাগিল কেবল বাহিরে নহে, ভিতরেও। রমেশের প্রয়োজনও শীঘ্র শেষ হইল না। প্রয়োজন রাজার মত আপনার পুরা সময় লয়—আর ভালবাসা কাঙাল!

ক্রমশ।

চিঠি।

না জানি কারে দেখিয়াছি,
দেখেছি কার মুখ!
প্রভাতে আজ পেয়েছি তার চিঠি!
পেয়েছি এই সুখে আছি,
পেয়েছি এই সুখ!
কারেও আমি দেখাবনাক সেটি!
লিখন আমি নাহি জানি,
বুঝি না কি যে আছে বাণী,
যা আছে থাক্ আমারি থাক্ তাহা!
পেয়েছি এই সুখে আজি
পবনে উঠে বেণু বাজি',
পেয়েছি সুখে পরাণ গাহে আহা!

পণ্ডিত সে কোথা আছে,
শুনেছি নাকি তিনি
পড়িয়া দেন লিখন নানামত!
যাব না আমি তাঁর কাছে,
তাঁহারে নাহি চিনি,
থাকুন্ ল'য়ে পুরাণো পুঁথি যত!
শুনিয়া কথা পাব না দিশে,
বুঝেন কি না বুঝিব কিসে!
ধন্দ ল'য়ে পড়িব মহাগোলে!
তাহার চেয়ে এ লিপিখানি
মাথায় কভু রাখিব আনি
যতনে কভু তুলিব ধরি কোলে!

রজনী যবে আঁধারিয়া
আসিবে চারিধারে
গগনে যবে উঠিবে গ্রহতারা,
ধরিব লিপি প্রসারিয়া
বসিয়া গৃহদ্বারে
পুলকে র'ব হ'য়ে পলকহারা!
তখন নদী চলিবে বাহি'
যা আছে লেখা তাহাই গাহি',
লিপির গান গাবে বনের পাতা!
আকাশ হ'তে সপ্তঋষি
গাহিবে ভেদি' গহন নিশি
গভীর তানে গোপন এই গাথা!

বুঝি না বুঝি খেদ কিবা,
র'ব অবোধসম!
পেয়েছি যাহা কে ল'বে তাহা কাড়ি'!
রয়েছে যাহা নিশিদিবা
রহিবে তাহা মম,
বুকের ধন যাবে না বুক ছাড়ি'!

খুঁজিতে গিয়া বৃথা খুঁজি,
বুঝিতে গিয়া ভুল বুঝি,
ঘুরিতে গিয়া কাছেরে করি দূর!
না-বোঝা মোর লিপিখানি
প্রাণের বোঝা দিল টানি,'
সকল গানে লাগায়ে দিল সুর!

লক্ষ্মণ।

বালকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের "প্রাণ ইবাপরঃ"—অপর প্রাণের ন্যায়। ভরত ছাড়া আমরা রামকে কল্পনা করিতে পারি, এমন কি, সীতা ছাড়া রামচিত্র কল্পনা করিবার সুবিধাও কবিগুরু দিয়াছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ ছাড়া রামচিত্র একান্ত অসম্পূর্ণ।

লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি কতকটা মৌন এবং ছায়ার ন্যায় অনুগামী। লক্ষ্মণ রামের প্রতি ভালবাসা কথায় জানাইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন না, নিতান্ত কোনরূপ অবস্থার সঙ্কটে না পড়িলে তিনি তাঁহার হৃদয়ের সুগভীর স্নেহের আভাস দিতে ইচ্ছুক হইতেন না; বাধ্য হইয়া দুই-এক স্থলে তিনি ইঙ্গিতমাত্রে তাঁহার হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অপরিসীম রামপ্রেম মৌনভাবেই আমাদিগের নিকট সর্ব্বত্র ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

ভরত এবং সীতা মনের আবেগ সংবরণ করিতে জানিতেন না; কিন্তু লক্ষ্মণ স্নেহসম্বন্ধে সংযমী—সে স্নেহ পরিপূর্ণ, অথচ তাহা আবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই; এই মৌন স্নেহচিত্র আমাদিগকে সর্ব্বত্যাগী কষ্টসহিষ্ণু ভ্রাতৃভক্তির অশেষ কথা জানাইতেছে।

লক্ষ্মণ আজন্ম রামচন্দ্রের ছায়ার ন্যায় অনুগামী। "ন চ তেন বিনা নিদ্রাং লভতে পুরুষোত্তমঃ। মৃষ্টমন্নমুপানীতমশ্নাতি ন হি তং বিনা॥" রামের কাছে না শুইলে তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না, রামের প্রসাদ ভিন্ন কোন উপাদেয় খাদ্যে তাঁহার তৃপ্তি হয় না। "যদা হি হয়মারূঢ়ো মৃগয়াং যাতি রাঘবঃ। অথৈনং পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি সধনুঃ পরিপালয়ন্॥" রাম যখন অশ্বারোহণে মৃগয়ায় যাত্রা করেন, অমনি ধনুহস্তে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়া বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতে থাকেন। যেদিন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম রাক্ষসবধকল্পে নিবিড় বনপথে যাইতেছেন, সেদিনও কাকপক্ষধর লক্ষ্মণ সঙ্গে সঙ্গে। শৈশবদৃশ্যাবলীর এই সকল চিত্রের মধ্যে আত্মহারা লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তির ছবি মৌনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

রামের অভিষেকসংবাদে সকলেই কত সন্তোষপ্রকাশের জন্য ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণের মুখে আহ্লাদসূচক কথা নাই, নীরবে

রামের ছায়ার ন্যায় লক্ষ্মণ পশ্চাদ্বর্ত্তী। কিন্তু রাম স্বল্পভাষী ভ্রাতার হৃদয় জানিতেন, অভিষেকসংবাদে সুখী হইয়া সর্ব্বপ্রথমেই লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া বলিলেন, "জীবিতঞ্চাপি রাজ্যঞ্চ ত্বদর্থমভিকাময়ে"—আমি জীবন ও রাজ্য তোমার জন্যই কামনা করি। ভ্রাতার এইরূপ দুইএকটি কথাই লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব স্নেহের একমাত্র পুরস্কার ও পরম পরিতৃপ্তি। আমরা কল্পনানয়নে দেখিতে পাই, রামের এই স্নিগ্ধ আদরে "সুবর্ণচ্ছবি" লক্ষ্মণের গণ্ডদ্বয় নীরব প্রফুল্লতায় রক্তিমাভ হইয়া উঠিয়াছে!

কিন্তু এই মৌন স্বল্পভাষী যুবক, রামের প্রতি কেহ অন্যায় করিলে, তাহা ক্ষমা করিতে জানিতেন না। যেদিন কৈকয়ী অভিষেকব্রতোজ্জ্বল প্রফুল্ল রামচন্দ্রকে মৃত্যু-তুল্য বনবাসাজ্ঞা শুনাইলেন, রামের মূর্ত্তি সহসা বৈরাগ্যের শ্রীতে ভূষিত হইয়া উঠিল, তিনি ঋষিবৎ নির্লিপ্তভাবে গুরুতর বন-বাসাজ্ঞা মাথায় তুলিয়া লইলেন, অভিষেক-সম্ভারের সমস্ত আয়োজন যেন তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল, সেইদিন সেই উৎকট মুহূর্ত্তেও তাঁহার আর-কোন সঙ্গী ছিল না, তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে চিরসুহৃৎ ভক্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, বাল্মীকি দুইটি ছত্রে সেই মৌনচিত্রটি আঁকিয়াছেন—

"তং বাষ্পপরিপূর্ণাক্ষঃ পৃষ্ঠতোঽনুজগাম হ।
লক্ষ্মণঃ পরমক্রুদ্ধঃ সুমিত্রানন্দবর্দ্ধনঃ॥"

লক্ষ্মণ—অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বাষ্পপূর্ণচক্ষে ভ্রাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগি-লেন।

এই অন্যায় আদেশ তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। রামচন্দ্র যাঁহাদিগকে অকুণ্ঠিত-চিত্তে ক্ষমা করিয়াছেন, লক্ষ্মণ তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। রামের বনবাস লইয়া তিনি কৌশল্যার সম্মুখে অনেক বাগ্বিতণ্ডা করিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি সমস্ত অযোধ্যাপুরী নষ্ট করিতে চাহিয়া-ছিলেন। তিনি রামের কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করেন নাই—এই গর্হিত আদেশ-পালন ধর্ম্মসঙ্গত নহে, ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই অগ্নিমূর্ত্তি যুবক যখন দেখিতে পাইলেন, রামচন্দ্র একান্তই বনবাসে যাইবেন, তখন কোথা হইতে এক অপূর্ব্ব কোমলতা তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিল; তিনি বালকের ন্যায় রামের পদযুগ্মে লুণ্ঠিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন—"ঐশ্বর্য্যঞ্চাপি লোকানাং কাময়ে ন ত্বয়া বিনা।" অমরত্ব কিংবা ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও আমি তোমা ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা করি না। রামের পাদপীড়নপূর্ব্বক উহা অশ্রুসিক্ত করিয়া নববধূটির ন্যায় সেই ক্ষাত্রতেজোদীপিত মূর্ত্তি ফুলসম সুকোমল হইয়া সঙ্গে যাইবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। এই ভিক্ষা স্নেহসূচক দীর্ঘ বক্তৃতায় অভিব্যক্ত হয় নাই, অতি অল্প কথায় তিনি রামের সঙ্গী হইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, কিন্তু সেই অল্প কথায় স্নেহগভীর আত্মত্যাগী হৃদয়ের ছায়া পড়িয়াছে। রাম হাতে ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন, "প্রাণসম প্রিয়," "বন্ধু", "সখা" প্রভৃতি স্নেহমধুর সম্ভাষণে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বনযাত্রা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মণ দুই-একটি দৃঢ়কথায় তাঁহার অটল সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিলেন, "আপনি শৈশব হইতে আমার

নিকট প্রতিশ্রুত, আমি আপনার আজন্ম-সহচর, আজ তাহার ব্যতিক্রম করিতে চাহিতেছেন কেন?"

লক্ষ্মণ সঙ্গে চলিলেন। এই আত্মত্যাগী দেবতার জন্য কেহ বিলাপ করিল না। যেদিন বিশ্বামিত্র রামকে লইয়া যাইবার জন্য দশরথের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেদিন "উনষোড়শবর্ষো মে রামো রাজীবলোচনঃ" বলিয়া বৃদ্ধ রাজা ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তৎকনিষ্ঠ আর একটি রাজীবলোচন যে দুরন্তরাক্ষসবধকল্পে ভ্রাতার অনুবর্ত্তী হইয়া চলিলেন, তজ্জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই। আজ রাম-লক্ষ্মণ-সীতা বনে চলিয়াছেন, অযোধ্যার যত নয়নাশ্রু, তাহা রহিয়া রহিয়া রামসীতার জন্য বর্ষিত হইতেছে। সীতার পাদপদ্মের অলক্তকরাগ মুছিয়া যাইবে, তাহা কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত হইবে, মহার্ঘশয়নোচিত রামচন্দ্র বৃক্ষমূলে পাংশুশয্যায় শুইয়া মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় ধূলিলুণ্ঠিতদেহে প্রাতে গাত্রোত্থান করিবেন, যিনি বন্দিগণের সুশ্রাব্য-গীতিমুখর গগনস্পর্শী প্রাসাদে বাস করিতে অভ্যস্ত, তিনি কেমন করিয়া চীরবাস পরিয়া বনে বনে তরুতল খুঁজিয়া বেড়াইবেন—এই আক্ষেপোক্তি দশরথ-কৌশল্যা হইতে আরম্ভ করিয়া অযোধ্যাবাসী প্রত্যেকের কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছিল। প্রজাগণ রথের চক্র ধরিয়া সুমন্ত্রকে বলিয়াছিল—"সংযচ্ছ বাজিনাং রশ্মীন্ সূত যাহি শনৈঃ শনৈঃ। মুখং দ্রক্ষ্যামো রামস্য দুর্দর্শস্নো ভবিষ্যতি॥" 'সারথি, অশ্বের রশ্মি সংযত করিয়া ধীরে ধীরে চল, আমরা রামের মুখখানি ভাল করিয়া দেখিয়া লই, আর আমরা উহা সহজে দেখিতে পাইব না।' কিন্তু লক্ষ্মণের জন্য কেহ আক্ষেপ করেন নাই, এমন কি, সুমিত্রাও বিদায়কালে পুত্রের কণ্ঠলগ্ন হইয়া ক্রন্দন করেন নাই, তিনি দৃঢ় অথচ স্নেহার্দ্র-কণ্ঠে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—

> "রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম্।
> অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখম্॥"

'যাও বৎস, স্বচ্ছন্দমনে বনে যাও—রামকে দশরথের ন্যায় দেখিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং বনকে অযোধ্যা বলিয়া গণ্য করিও।' মাতার চক্ষুর অশ্রুবিন্দু লক্ষ্মণ পাইলেন না, বরং সুমিত্রা তাঁহাকে যেন কর্ত্তব্যপালনের জন্য আগ্রহসহকারে ত্বরান্বিত করিয়া দিলেন—"সুমিত্রা গচ্ছ গচ্ছেতি পুনঃপুনরুবাচ তম্।" সুমিত্রা তাঁহাকে পুনঃপুন "যাও যাও" এই কথা বলিতে লাগিলেন।

মৌন সন্ন্যাসী আত্মীয় সুহৃদ্‌বর্গের উপেক্ষা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহা তিনি মনেও করেন নাই, রামচন্দ্রের জন্য যে শোকোচ্ছ্বাস, তাহার মধ্যেই তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি কাহারও নিকটে বিলাপ প্রত্যাশা করেন নাই, রামপ্রেমে তাঁহার নিজের সত্তা লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

আরণ্যজীবনের যাহা কিছু কঠোরতা, তাহার সমধিক ভাগ লক্ষ্মণের উপর পড়িয়াছিল,—কিংবা তাহা তিনি আহ্লাদ সহকারে মাথায় তুলিয়া লইয়াছিলেন। গিরিসানুদেশের পুষ্পিত বন্যতরুরাজি হইতে কুসুম-চয়ন করিয়া রামচন্দ্র সীতার চূর্ণকুন্তলে পরাইতেন; গৈরিকরেণু দ্বারা সীতার সুন্দর ললাটে তিলক রচনা করিয়া দিতেন; পদ্ম তুলিয়া সীতার সহিত মন্দাকিনীনীরে

অবগাহন করিতেন, কিংবা গোদাবরী-তীরস্থ বেতসকুঞ্জে সীতার উৎসঙ্গে মস্তক রক্ষা করিয়া সুখে নিদ্রা যাইতেন; আর এদিকে মৌন সন্ন্যাসী খনিত্র দ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিতেন, কখনও পরশুহস্তে শালশাখা কর্ত্তন করিতেন, কখনও অস্ত্রশস্ত্র এবং সীতার পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদিতে পূর্ণ বিপুল বংশপেটিকা হস্তে লইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রা করিতেন, কখনও বা মহিষ ও বৃষের করীষ সংগ্রহ করিয়া অগ্নি জ্বালিবার বন্দোবস্ত করিতেন। একদিন দেখিতে পাই, শীতকালের তুষারমলিন জ্যোৎস্নায় শেষরাত্রিতে যবগোধূমাচ্ছন্ন বন-পন্থায় নালশেষ-নলিনী-শোভিত সরসীতে কলস লইয়া তিনি জল তুলিতেছেন। অন্য একদিন দেখিতে পাই, চিত্রকূটপর্ব্বতের পর্ণশালা হইতে সরসীতটে যাইবার পথটি চিহ্নিত করিবার জন্য তিনি পথে পথে উচ্চ তরুশাখায় চীরখণ্ড বদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। এই সংযমী স্নেহবীর ভ্রাতৃসেবায় তাঁহার নিজসত্তা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইয়া লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"এই সুন্দর তরুরাজিপূর্ণ প্রদেশে পর্ণশালারচনার জন্য একটি স্থান খুঁজিয়া বাহির করিয়া লও।" লক্ষ্মণ বলিলেন, "আপনি যে স্থানটি ভালবাসেন, তাহাই দেখাইয়া দিন, সেবকের উপর নির্ব্বাচনের ভার দিবেন না।" প্রভুসেবায় এরূপ আত্মহারা ভৃত্য,—এমন আর কোথায় দেখিয়াছেন। রামচন্দ্র স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলে লক্ষ্মণ ভূমির সমতা সম্পাদন করিয়া খনিত্রহস্তে মৃত্তিকাখননে প্রবৃত্ত হইলেন।

আর-এক দিনের দৃশ্য মনে পড়ে,—গভীর অরণ্যে চারিদিকে কৃষ্ণসর্প বিচরণ করিতেছে, পথহারা বিপন্ন পথিকত্রয় রাত্রিবাসের জন্য জঙ্গলের নিভৃতে বৃক্ষনিম্নে শুইয়া আছেন, সীতার বদনশ্রী অনশন ও পর্য্যটনে একটু হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছে। রামচন্দ্রের এই দুঃখময়ী রজনীর কষ্ট অসহ্য হইল, তিনি লক্ষ্মণকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য বারংবার পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, "এ কষ্ট আমার এবং সীতারই হউক, তুমি ফিরিয়া যাও, শোকের অবস্থায় সান্ত্বনাদান করিয়া আমার মাতাদিগকে পালন করিও।" লক্ষ্মণ স্বীয়-স্নেহ-সম্বন্ধে বেশী কথা কহিতে জানিতেন না, রামের এবংবিধ কাতরোক্তিতে দুঃখিত হইয়া বলিলেন—

> "ন হি তাতং ন শত্রুঘ্নং ন সুমিত্রাং পরন্তপ।
> দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মদ্যাহং স্বর্গঞ্চাপি ত্বয়া বিনা॥"

'আমি পিতা, সুমিত্রা, শত্রুঘ্ন, এমন কি স্বর্গও তোমাকে ছাড়িয়া দেখিতে ইচ্ছা করি না।'

কবন্ধ মরিল, জটায়ু মরিলেন; আমরা দেখিতে পাই, লক্ষ্মণ নিঃশব্দে সমাধিস্থল খনন করিয়া কাষ্ঠ আহরণপূর্ব্বক কবন্ধ ও জটায়ুর সৎকার করিতেছেন। দিবারাত্র তাঁহার বিশ্রাম ছিল না—এই ভ্রাতৃসেবাই তাঁহার জীবনের পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল। বনে আসিবার সময় তাহাই তিনি বলিয়া আসিয়াছিলেন—

> "ভবাংস্তু সহ বৈদেহ্যা গিরিসানুষু রংস্যসে।
> অহং সর্ব্বং করিষ্যামি জাগ্রতঃ স্বপতশ্চ তে।
> ধনুরাদায় সগুণং খনিত্রপিটকাধরঃ।"

'দেবী জানকীর সঙ্গে আপনি গিরিসানুদেশে বিহার করিবেন, জাগরিত বা নিদ্রিতই থাকুন, আপনার সকল কর্ম্ম আমিই

করিয়া দিব। খনিত্র, পেটক এবং ধনু হস্তে আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিব।'

বনবাসের শেষ বৎসর বিপদ্ আসিয়া উপস্থিত হইল; রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেল। সীতার শোকে রাম ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া পড়িলেন, ভ্রাতার এই দারুণ কষ্ট দেখিয়া লক্ষ্মণও পাগলের মত সীতাকে ইতস্তত খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রামের অনুজ্ঞায় তিনি বারংবার গোদাবরীর তীরভূমি খুঁজিয়া আসিলেন। এইমাত্র গোদাবরীতীর তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া আসিয়াছেন, রাম তখনই আবার বলিলেন—

"শীঘ্রং লক্ষ্মণ জানীহি গত্বা গোদাবরীং নদীম্।
অপি গোদাবরীং সীতা পদ্মান্যানয়িতুং গতা।"

পুনরায় গোদাবরীর তটদেশে যাইয়া লক্ষ্মণ সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্ধান না পাইয়া ভয়ে ভয়ে রামের নিকট উপস্থিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন—

"কং নু সা দেশমাপন্না বৈদেহী ক্লেশনাশিনী।"

'কোন্ দেশে ক্লেশনাশিনী বৈদেহী গিয়াছেন—তাহা বুঝিতে পারিলাম না'—

"নৈতাং পশ্যামি তীর্থেষু ক্রোশতো ন শৃণোতি মে।"

'গোদাবরীর অবতরণস্থানসমূহের কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না—ডাকিলাম, কোন উত্তর পাইলাম না।'

লক্ষ্মণস্য বচঃ শ্রুত্বা দীনঃ সন্তাপমোহিতঃ।
রামঃ সমভিচক্রাম স্বয়ং গোদাবরীং নদীম্॥"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ম্রিয়মাণচিত্তে রাম স্বয়ং সেই গোদাবরীর অভিমুখে ছুটিয়া গেলেন।

ভ্রাতার এই উদ্দাম শোক দেখিয়া লক্ষ্মণ যেরূপ কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহা অননুভবনীয়। কত করিয়া তিনি রামকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতেছেন, রাম কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। লক্ষ্মণের কণ্ঠলগ্ন হইয়া রাম বারংবার বলিতেছেন—

"হা লক্ষ্মণ মহাবাহো পশ্যসে ত্বং প্রিয়াং কচিৎ।"

'লক্ষ্মণ, তুমি কি সীতাকে কোথাও দেখিতে পাইতেছ?' এই শোকাকুল কণ্ঠের আর্ত্তিতে লক্ষ্মণের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যাইত।

দনুনামক শাপগ্রস্ত যক্ষের নির্দ্দেশানুসারে রাম লক্ষ্মণের সহিত পম্পাতীরে সুগ্রীবের সন্ধানে গেলেন। রাম কখনও বেগে পথপর্য্যটন করেন, কখনও মূর্চ্ছিত হইয়া বসিয়া পড়েন; কখনও "সীতা সীতা" বলিয়া আকুলকণ্ঠে ডাকিতে থাকেন, কখনও "হা দেবি, একবার এস, তোমার শূন্য পর্ণশালার অবস্থা দেখিয়া যাও" এই বলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়েন, কখনও পম্পানীরবর্ত্তি-পদ্মকোষ-নিষ্ক্রান্ত-পবনস্পর্শে উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠেন, "নিশ্বাস ইব সীতায়ার্বাতি বায়ুর্মনোহরঃ।" সজলনেত্রে চিরসুহৃৎ চিরসেবক লক্ষ্মণ রামকে এই অবস্থায় যখন পম্পাতীরে লইয়া আসিলেন, তখন হনুমান্ সুগ্রীবকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ সম্ভ্রম ও আদরের সহিত বলিলেন, "আপনারা পৃথিবীজয়ের শক্তিসম্পন্ন, আপনারা চীর ও বল্কল ধারণ করিয়াছেন কেন? আপনাদের বৃত্তান্বিত মহাবাহু সর্ব্বভূষণে ভূষিত হইবার যোগ্য, সে বাহু ভূষণহীন কেন?" এই আদরের কণ্ঠস্বর শুনিয়া লক্ষ্মণের চিররুদ্ধ দুঃখ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। যিনি চিরদিন মৌনভাবে

স্নেহার্দ্র হৃদয় বহন করিয়া আসিয়াছেন, আজ তিনি স্নেহের ছন্দ ও ভাষা রোধ করিতে পারিলেন না। পরিচয়প্রদানের পর তিনি বলিলেন—"দস্যুর নির্দ্দেশে আজ আমরা সুগ্রীবের শরণাপন্ন হইতে আসিয়াছি। যে রাম শরণাগতদিগকে অগণিত বিত্ত অকুণ্ঠিত-চিত্তে দান করিয়াছেন, সেই জগৎপূজ্য রাম আজ বানরাধিপতির শরণ পাইবার জন্য এখানে উপস্থিত। ত্রিলোকবিশ্রুত-কীর্ত্তি দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র আমার গুরু রাম-চন্দ্র স্বয়ং বানরাধিপতির শরণ লইবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। সর্ব্বলোক যাঁহার আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হইত, যিনি প্রজা-পুঞ্জের রক্ষক ও পালক ছিলেন, আজ তিনি আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া সুগ্রীবের নিকট উপ-স্থিত। তিনি শোকাভিভূত ও আর্ত্ত, সুগ্রীব অবশ্যই প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে শরণ দান করিবেন।"—বলিতে বলিতে লক্ষ্মণের চির-নিরুদ্ধ অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তিনি কাঁদিয়া মৌন হইলেন। রামের দুরবস্থা-দর্শনে লক্ষ্মণ একান্তরূপে অভিভূত হইয়া-ছিলেন, তাঁহার দৃঢ়চরিত্র আর্দ্র ও করুণ হইয়া পড়িয়াছিল।

এই নিত্য দুঃখসহায় ভৃত্য, সখা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামের প্রাণপ্রিয় ছিলেন, তাহা বলা বাহুল্য। অশোকবনে হনুমানের নিকট সীতা বলিয়াছিলেন, "ভ্রাতা লক্ষ্মণ আমা অপেক্ষা রামের নিয়ত প্রিয়তর।" রাবণের শেলে বিদ্ধ লক্ষ্মণ যেদিন যুদ্ধক্ষেত্রে মৃতকল্প হইয়া পড়িয়া ছিলেন, সেদিন আমরা দেখিতে পাই, আহত শাবককে ব্যাঘ্রী যেরূপ রক্ষা করে, রাম কনিষ্ঠকে সেইরূপ আগুলিয়া বসিয়া আছেন;—রাবণের অসংখ্য শর রামের পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রাম লক্ষ্মণের প্রতি সজল চক্ষু ন্যস্ত করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে-ছিলেন। বানরসৈন্য লক্ষ্মণের রক্ষাভার গ্রহণ করিলে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং রাবণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া চলিয়া গেলে মৃত-কল্প ভ্রাতাকে অতি সুকোমলভাবে আলিঙ্গন করিয়া রাম বলিলেন—"তুমি যেরূপ আমাকে বনে অনুগমন করিয়াছিলে, আজ আমিও তেমনি তোমাকে যমালয়ে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না। সীতার মত স্ত্রী অনেক খুঁজিলে পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাই, মন্ত্রী ও সহায় পাওয়া যাইবে না। দেশে দেশে স্ত্রী ও বন্ধু পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু এমন দেশ দেখিতে পাই না, যেখানে তোমার মত ভাই জুটিবে। এখন উঠ, নয়ন উন্মীলন করিয়া আমায় একবার দেখ; আমি পর্ব্বতে বা বন-মধ্যে শোকার্ত্ত, প্রমত্ত বা বিষণ্ণ হইলে, তুমিই প্রবোধবাক্যে আমায় সান্ত্বনা দিতে, এখন কেন এইরূপ নীরব হইয়া আছ?"

রামের আজ্ঞাপালনে লক্ষ্মণ কোনকালে দ্বিরুক্তি করেন নাই, ন্যায়সঙ্গত হউক বা না হউক, লক্ষ্মণ সর্ব্বদা মৌনভাবে তাহা পালন করিয়াছেন। রাম সীতাকে বিপুল সৈন্যসংঘের মধ্য দিয়া শিবিকা ত্যাগ করিয়া পদব্রজে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। শতশত দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া সীতা লজ্জায় যেন মরিয়া যাইতেছিলেন, ব্রীড়াময়ীর সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছিল। লক্ষ্মণ এই দৃশ্য দেখিয়া ব্যথিত হইলেন, কিন্তু রামের কার্য্যের

প্রতিবাদ করিলেন না। যখন সীতা অগ্নিতে প্রাণবিসর্জ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্পা হইয়া লক্ষ্মণকে চিতা প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন—তখন লক্ষ্মণ রামের অভিপ্রায় বুঝিয়া সজলচক্ষে চিতা প্রস্তুত করিলেন, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করিলেন না। ভ্রাতৃ-স্নেহে তিনি স্বীয়-অস্তিত্ব-শূন্য হইয়া গিয়াছিলেন। ভরতের, এমন কি সীতারও, মৃদু অথচ তেজোব্যঞ্জক ব্যক্তিত্ব তাঁহাদের সুগভীর ভালবাসার মধ্যেও আমরা উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু রামের প্রতি লক্ষ্মণের স্নেহ সম্পূর্ণরূপে আত্মহারা। ভরত রামচন্দ্রের জন্য যে সকল কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রাণে আঘাত দেয়, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ঐরূপ আত্মত্যাগ আমাদের নিকট অপূর্ব্বপদার্থ বলিয়া বোধ হয়; ভরত স্বর্গের দেবতার ন্যায়, তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ ঠিক যেন পৃথিবীবাসীর নহে, উহা সর্ব্বদাই ভাবের এক উচ্চগ্রামে আমাদিগের মনোযোগ সবলে আকর্ষণ করিয়া রাখে। কিন্তু লক্ষ্মণের আত্মত্যাগ এত সহজভাবে হইয়া আসিয়াছে, উহা বায়ু ও জলের মত এত সহজপ্রাপ্য যে, অনেক সময় ভরতের আত্মত্যাগের পার্শ্বে লক্ষ্মণের খনিত্রদ্বারা মৃত্তিকাখনন প্রভৃতি সেবাবৃত্তির মধ্যে আমরা তাঁহার সুগভীর প্রেমের গুরুত্ব অনুভব করিতে ভুলিয়া যাই। অত্যন্ত সহজে প্রাপ্ত বলিয়া যেন উহা উপেক্ষা পাইয়া থাকে। তথাপি ইহা স্থির যে, লক্ষ্মণ ভিন্ন রামকে আমরা একেবারেই কল্পনা করিতে পারি না। তিনি রামের প্রাণ ও দেহের সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। দীর্ঘ রজনীর পরে অকস্মাৎ তরুণ অরুণালোকে যেরূপ জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,—ধরাবাসিগণ সেই স্বর্গ-ভ্রষ্ট আলোকচ্ছটায় পুলকে উন্মত্ত হইয়া উঠে, ভরতের ভ্রাতৃপ্রীতি কতকটা সেইরূপ; কৈকয়ীর ষড়্যন্ত্র ও রামবনবাসাদির পরে ভরতের অচিন্তিতপূর্ব্ব প্রীতি বিচ্ছুরিত হইয়া আমাদিগকে সহসা সেইরূপ চমৎকৃত করিয়া তুলে, আমরা ঠিক যেন ততটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু লক্ষ্মণের প্রেম আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় বায়ুপ্রবাহ, এই বিশাল অপরিসীম স্নেহতরঙ্গ আমাদিগকে সঞ্জীবিত রাখিয়াছে, অথচ প্রতিক্ষণে আমরা ইহা ভুলিয়া যাইতেছি। লক্ষ্মণ রামকে বলিয়াছিলেন—"জল হইতে উদ্ধৃত মীনের ন্যায় আপনাকে ছাড়িয়া আমি এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতে পারিব না।" এই অসীম স্নেহের তিনি কোন মূল্য চান নাই, ইহা আপনিই আপনার পরম পরিতোষ, ইহা আপনাতেই আপনি সম্পূর্ণ, ইহা প্রত্যাশী নহে, ইহা দাতা। কখন বহুকৃচ্ছ্রসাধনে অবসন্ন লক্ষ্মণকে রাম একটি স্নেহের কথা বলিয়াছেন, কিংবা একবার আলিঙ্গন দিয়াছেন, লক্ষ্মণের নেত্রপ্রান্তে একটি পুলকাশ্রু ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তিনি রামের কাছে তাহা প্রত্যাশা করিয়া অপেক্ষা করেন নাই।

লক্ষ্মণের চরিত্রের একদিক্ মাত্র প্রদর্শিত হইল, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের আর একটা দিক্ আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, লক্ষ্মণ বিশেষ তীক্ষ্ণধীসম্পন্ন ছিলেন না। তিনি অনুগত ভ্রাতা ছিলেন সত্য, কিন্তু হয় ত রাম ভিন্ন তাঁহার পক্ষে নিজেকে হারাইয়া ফেলিবার

আশঙ্কা ছিল। চিরদিন রামের বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছেন, সহসা একাকী সংসারের পথ পর্য্যটন করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হইত, এইজন্যই তিনি রামগতপ্রাণ হইয়া বনগমন করিয়াছিলেন। এ কথা ত মানিবই না, বরং ভাল করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, লক্ষ্মণই রামায়ণে পুরুষকারের একমাত্র জীবন্ত চিত্র। তাঁহার বুদ্ধির সঙ্গে রামের বুদ্ধির যে সর্ব্বদাই ঐক্য হইয়াছে, তাহা নহে, পরন্তু যে স্থানে ঐক্য না হইত, সে স্থানে তিনি স্বীয় বুদ্ধিকে রামের প্রতিভার নিকট হতবল হইতে দেন নাই।

বনবাসাজ্ঞা তাঁহার নিকট অত্যন্ত অন্যায় বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং রামের পিতৃ-আদেশ-পালন তিনি ধর্ম্মবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। রাম লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন, "তুমি কি এই কার্য্য দৈব-শক্তির ফল বলিয়া স্বীকার করিবে না? আরব্ধ কার্য্য নষ্ট করিয়া যদি কোন অসঙ্কল্পিত পথে কার্য্যপ্রবাহ প্রবর্ত্তিত হয়, তবে তাহা দৈবের কর্ম্ম বলিয়া মনে করিবে। দেখ, কৈকয়ী চিরদিনই আমাকে ভরতের ন্যায় ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার ন্যায় গুণশালিনী মহৎকুলজাতা রাজপুত্রী আমাকে পীড়াদান করিবার জন্য ইতর ব্যক্তির ন্যায় এইরূপ প্রতিশ্রুতিতে রাজাকে কেনই বা আবদ্ধ করিবেন? ইহা স্পষ্ট দৈবের কর্ম্ম, ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।" লক্ষ্মণ উত্তরে বলিলেন, "অতি দীন ও অশক্ত ব্যক্তিরাই দৈবের দোহাই দিয়া থাকে, পুরুষকার দ্বারা যাঁহারা দৈবের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তাঁহারা আপনার ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। মৃদু ব্যক্তিরাই সর্ব্বদা নির্যাতন প্রাপ্ত হন—"মৃদুর্হি পরিভূয়তে"। ধর্ম্ম ও সত্যের ভাণ করিয়া পিতা যে ঘোরতর অন্যায় করিতেছেন, তাহা কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? আপনি দেবতুল্য, ঋজু ও দান্ত এবং রিপুরাও আপনার প্রশংসা করিয়া থাকে। এমন পুত্রকে তিনি কি অপরাধে বনে তাড়াইয়া দিতেছেন? আপনি যে ধর্ম্ম পালন করিতে ব্যাকুল, ঐ ধর্ম্ম আমার নিকট নিতান্ত অধর্ম্ম বলিয়া মনে হয়। স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিরপরাধ পুত্রকে বনবাস দেওয়া—ইহাই কি সত্য, ইহাই কি ধর্ম্ম? আমি আজই বাহুবলে আপনার অভিষেক সম্পাদন করিব। দেখি, কাহার সাধ্য আমার শক্তি প্রতিরোধ করে? আজ পুরুষকারের অঙ্কুশ দিয়া উদ্দাম দৈবহস্তীকে আমি স্ববশে আনিব। যাহা আপনি দৈবসংজ্ঞায় অভিহিত করিতেছেন, তাহা আপনি অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিত্ত তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর দৈবের প্রশংসা করিতেছেন?" সাশ্রুনেত্রে লক্ষ্মণ এই সকল উক্তির পর "হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং কৈকয্যাসক্তমানসম্" বলিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রাম তখন হস্তধারণ করিয়া তাঁহার ক্রোধপ্রশমনের চেষ্টা পাইয়াছিলেন। এই গর্হিত-আদেশ-পালন যে ধর্ম্মসঙ্গত, ইহা তিনি কোনক্রমেই লক্ষ্মণকে বুঝাইতে পারেন নাই। লঙ্কাকাণ্ডে মায়াসীতার মস্তক দর্শনে শোকাকুল রামচন্দ্রকে লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন—"হর্ষ, কাম, দর্প, ক্রোধ, শান্তি ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, এই সমস্তই অর্থের আয়ত্ত। আমার এই মত, ইহাই ধর্ম্ম; কিন্তু আপনি সেই অর্থমূলক ধর্ম্ম পরি-

ত্যাগ করিয়া সমূলে ধর্ম্মলোপ করিয়াছেন। আপনি পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বনবাসী হওয়াতেই আপনার প্রাণাধিকা পত্নীকে রাক্ষসেরা অপহরণ করিয়াছে।” এই প্রখর-ব্যক্তিত্বশালী যুবক শুধু স্নেহগুণেই একান্তরূপে ব্যক্তিত্বহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ভরতের চরিত্র রমণীজনোচিত কোমল মধুরতায় ভূষিত, উহা সাত্ত্বিক বৃত্তির উপর অধিষ্ঠিত। রামের মত বলশালী চরিত্র রামায়ণে আর নাই এবং রামের মত দুর্ব্বলও বোধ হয় রামায়ণে আর কেহ নহে। রামচরিত্র বড় জটিল। কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্রে আদ্যন্ত পুরুষকারের মহিমা দৃষ্ট হয়। উহাতে ভরতের মত করুণরসের স্নিগ্ধতা ও স্ত্রীলোকসুলভ খেদমুখর কোমলতা নাই। উহা সতত দৃঢ়, পুরুষোচিত ও বিপদে নির্ভীক। লক্ষ্মণ অবস্থার কোন বিপর্য্যয়েই নমিত হইয়া পড়েন নাই। বিরাধরাক্ষসের হস্তে সীতাকে নিঃসহায়ভাবে পতিত দেখিয়া রামচন্দ্র “হায়, আজ মাতা কৈকয়ীর আশা পূর্ণ হইল” বলিয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। লক্ষ্মণ ভ্রাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় নিশ্বাসত্যাগ করিয়া বলিলেন—“ইন্দ্রতুল্য-পরাক্রান্ত হইয়া আপনি কেন অনাথের ন্যায় পরিতাপ করিতেছেন? আসুন, আমরা রাক্ষসকে বধ করি।”

শেলবিদ্ধ লক্ষ্মণ পুনর্জীবন লাভ করিয়া যখন দেখিতে পাইলেন, রাম তাঁহার শোকে অধীর হইয়া সজলচক্ষে স্ত্রীলোকের মত বিলাপ করিতেছেন, তখন তিনি সেই কাতর অবস্থাতেই রামকে এরূপ পৌরুষহীন মোহপ্রাপ্তির জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন। বিরহের অবস্থায় রামের একান্ত বিহ্বলতা দেখিয়া তিনি ব্যথিতচিত্তে রামকে কত উপদেশ দিয়াছিলেন—তাহা একদিকে যেমন সুগভীর ভালবাসার ব্যঞ্জক, অপর দিকে সেইরূপ তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তাসূচক। “আপনি উৎসাহশূন্য হইবেন না”, “আপনার এরূপ দৌর্ব্বল্যপ্রদর্শন উচিত নহে”, পুরুষকার অবলম্বন করুন” ইত্যাদিরূপ নানাবিধ স্নেহের গঞ্জনা করিয়া তিনি একদিন বলিয়াছিলেন—“দেবগণের অমৃতলাভের ন্যায় বহু তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া মহারাজ দশরথ আপনাকে লাভ করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমি ভরতের মুখে শুনিয়াছি—আপনি তপস্যার ফলস্বরূপ। যদি বিপদে পড়িয়া আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মা সহ্য করিতে না পারেন, তবে অল্পসত্ত্ব ইতর ব্যক্তিরা কিরূপে সহ্য করিবে?”

রামের প্রতি জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক, যে কেহ অন্যায় করিয়াছে, লক্ষ্মণ তাহা ক্ষমা করেন নাই, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দশরথের গুণরাশি তাঁহার সমস্তই বিদিত ছিল, ক্রোধের উত্তেজনায় তিনি যাহাই বলুন না কেন, দশরথ যে পুত্রশোকে প্রাণত্যাগ করিবেন, এ কথাও তিনি পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি দশরথকে মনে মনে ক্ষমা করেন নাই। সুমন্ত্র বিদায়কালে যখন লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “কুমার, পিতৃসকাশে আপনার কিছু বক্তব্য আছে কি?” তখন লক্ষ্মণ বলিলেন, “রাজাকে বলিও, রামকে তিনি কেন বনে পাঠাইলেন, নিরপরাধ জ্যেষ্ঠপুত্রকে কেন পরিত্যাগ করিলেন, তাহা আমি চিন্তা

করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। আমি মহারাজের চরিত্রে পিতৃত্বের কোন নিদর্শন দেখিতে পাইতেছি না। আমার ভ্রাতা, বন্ধু, ভর্ত্তা ও পিতা, সকলই রামচন্দ্র।"—"অহং তাবন্মহারাজে পিতৃত্বং নোপলক্ষয়ে। ভ্রাতা ভর্ত্তা চ বন্ধুশ্চ পিতা চ মম রাঘবঃ।"

ভরতের প্রতি তাঁহার গভীর সন্দেহ ছিল। কৈকয়ীর পুত্র ভরত যে মাতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইবেন, এ সম্বন্ধে তাঁহার অটল ধারণা ছিল, কেবল রামের ভর্ৎসনার ভয়ে তিনি ভরতের প্রতি কঠোরবাক্যপ্রয়োগে নিবৃত্ত থাকিতেন। কিন্তু যখন জটাবদ্ধকেশকলাপ অনশনকৃশ ভরত রামের চরণপ্রান্তে পড়িয়া ধূলিলুণ্ঠিত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া সলজ্জ স্নেহপরিতাপে ম্রিয়মাণ হইলেন। একদিন শীতকালের রাত্রে বড় তুষার পড়িতেছিল, শীতাধিক্যে পক্ষিগণ কুলায়ে গুণ্ঠিত হইয়া ছিল, ভরতের জন্য সেই সময় লক্ষ্মণের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি রামকে বলিলেন—"এই তীব্রশীত সহ্য করিয়া ধর্ম্মাত্মা ভরত আপনার ভক্তির তপস্যা পালন করিতেছেন। রাজ্য, ভোগ, মান, বিলাস, সমস্ত ত্যাগ করিয়া নিয়তাহারী ভরত এই বিষম শীতকালের রাত্রিতে মৃত্রিকায় শয়ন করিতেছেন। পারিব্রজ্যের নিয়ম পালন করিয়া প্রত্যহ শেষরাত্রিতে ভরত সরযুতে অবগাহন করিয়া থাকেন। চিরসুখোচিত রাজকুমার শেষরাত্রের তীব্রশীতে কিরূপে সরযুতে স্নান করেন!" এই লক্ষ্মণই পূর্ব্বে "ভরতস্য বধে দোষং নাহং পশ্যামি কঞ্চন" বলিয়া ক্রোধপ্রকাশ করিয়াছিলেন। যেদিন বুঝিতে পারিলেন, তিনি বনে বনে ঘুরিয়া রামের যেরূপ সেবায় নিরত, অযোধ্যার মহাসমৃদ্ধির মধ্যে বাস করিয়াও ভরত রামভক্তিতে সেইরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করিতেছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার স্বর এইরূপ স্নেহার্দ্র ও বিনম্র হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি কৈকয়ীকে কখনই ক্ষমা করেন নাই, রামের নিকট একদিন বলিয়াছিলেন—"দশরথ যাঁহার স্বামী, সাধু ভরত যাঁহার পুত্র, সেই কৈকয়ী এরূপ নিষ্ঠুর হইলেন কেন?"

লক্ষ্মণের ক্ষত্রিয়বৃত্তিটা একটু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকাশ পাইত। তিনি রামের প্রতি অন্যায়কারীদিগের প্রসঙ্গে সহসা অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিতেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, কাহাকেও তিনি এই অপরাধে ক্ষমা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

শরৎকালে অসন ও সপ্তপর্ণের ফুলরাশি ফুটিয়া উঠিল, রক্তিমাভ কোবিদার বিকশিত হইল। মাল্যবান্ পর্ব্বতের উপকণ্ঠে তরঙ্গিণীরা মন্দগতি হইল, কুসুমশোভী সপ্তচ্ছদ-বৃক্ষকে গীতশীল ষট্‌পদগণ ঘিরিয়া ধরিল, গিরিসানুদেশে বন্ধুজীবের শ্যামাভ ফল দেখা দিতে লাগিল। বর্ষার চারিটি মাস বিরহী রামচন্দ্রের নিকট শতবৎসরের ন্যায় দীর্ঘ বোধ হইয়াছিল। শরৎকালে নদীগুলি শীর্ণ হইলে বানরবাহিনীর সীতাকে সন্ধান করা সহজ হইবে, সুতরাং—"সুগ্রীবস্য নদীনাঞ্চ প্রসাদমভিকাঙ্ক্ষয়ন্"—সুগ্রীব ও নদীকুলের প্রসাদ আকাঙ্ক্ষা করিয়া রামচন্দ্র শরৎকালের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই শরৎকাল উপস্থিত হইল, কিন্তু প্রতিশ্রুতির অনুযায়ী উদ্যোগের কোন চিহ্ন না পাইয়া

রাম সুগ্রীবের প্রতি ক্রুদ্ধ হইলেন,—গ্রাম্য-সুখে রত মূর্খ সুগ্রীব উপকার পাইয়া প্রত্যুপকারে অবহেলা করিতেছে। লক্ষ্মণকে তিনি সুগ্রীবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন—বন্ধুকে স্বীয় কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করাইয়া উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে সকল কথা কহিয়া দিলেন, তন্মধ্যে ক্রোধসূচক কয়েকটি কথা ছিল—"ন স সঙ্কুচিতঃ পন্থা যেন বালী হতো গতঃ। সময়ে তিষ্ঠ সুগ্রীব মা বালিপথমন্বগাঃ।"—'যে পথে বালী গিয়াছে, সে পথ সঙ্কুচিত হয় নাই; সুগ্রীব, যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহাতে সুপ্রতিষ্ঠ হও, বালীর পথ অনুসরণ করিও না।' কিন্তু লক্ষ্মণের চরিত্র জানিয়া রাম একটা "পুনশ্চ" জুড়িয়া লক্ষ্মণকে সাবধান করিয়া দিলেন—"তাং প্রীতিমনুবর্ত্তস্ব পূর্ব্ববৃত্তঞ্চ সঙ্গতম্। সামোপহিতয়া বাচা রুক্ষাণি পরিবর্জ্জয়ন্॥" 'প্রীতির অনুসরণ ও পূর্ব্বসখ্য স্মরণ করিয়া রুক্ষতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সান্ত্ববাক্যে সুগ্রীবের সঙ্গে কথা কহিও।' এই সাবধানতার কারণ ছিল। কারণ কিছু পূর্ব্বেই লক্ষ্মণ বলিয়াছিলেন, "আজ সেই মিথ্যাবাদীকে বিনাশ করিব, বালির পুত্র অঙ্গদ এখন বানরগণকে লইয়া জানকীর অন্বেষণ করুন।"

লক্ষ্মণের তীক্ষ্ণ অন্যায়বোধ রামের কথায় প্রশমিত হয় নাই। তিনি সুগ্রীবকে ক্রুদ্ধকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া রোষস্ফুরিতাধরে ধনু লইয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন। ভয়ে বানরাধিপতি তাঁহার কণ্ঠবিলম্বিত বিচিত্র ক্রীড়ামাল্য ছেদনপূর্ব্বক তখনই রামচন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। এতাদৃশ তেজস্বী ক্ষত্রিয়কে তেজস্বিনী সীতা, যে কঠোর বাক্য প্রয়োগ করেন, সে কঠোর বাক্য তিনি কিরূপে সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে কৌতুহল হইতে পারে। মারীচরাক্ষস রামের স্বর অনুকরণ করিয়া বিপন্নকণ্ঠে "কোথা রে লক্ষ্মণ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সীতা ব্যাকুল হইয়া তখনই লক্ষ্মণকে রামের নিকট যাইতে আদেশ করিলেন। লক্ষ্মণ রামের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যাইতে অসম্মত হইলেন এবং মারীচ যে ঐরূপ স্বর-বিকৃতি করিয়া কোন দুরভিসন্ধিসাধনের চেষ্টা পাইতেছে, তাহা সীতাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সীতা তখন স্বামীর বিপদাশঙ্কায় জ্ঞানশূন্যা, লক্ষ্মণকে সাশ্রুনেত্রে ও সক্রোধে বলিলেন, "তুমি ভরতের চর, প্রচ্ছন্ন জ্ঞাতিশত্রু, আমার লোভে রামের অনুবর্ত্তী হইয়াছ, রামের কোন অশুভ হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব।" এ কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ক্ষণকাল স্তম্ভিত ও বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, ক্রোধে ও লজ্জায় তাঁহার গণ্ড আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দেবি, তুমি আমার নিকট দেবতা-স্বরূপা, তোমাকে আমার কিছু বলা উচিত নহে। স্ত্রীলোকের বুদ্ধি স্বভাবতই ভেদকরী; তাহারা বিমুক্তধর্ম্মা, ক্রূর ও চপলা। তোমার কথা তপ্ত লৌহশেলের মত আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে, আমি কোনক্রমেই তাহা সহ্য করিতে পারিতেছি না। তোমার আজ নিশ্চয়ই মৃত্যু উপস্থিত, চারিদিকে অশুভলক্ষণ দেখিতে পাইতেছি—"এই বলিয়া প্রস্থান করিবার পূর্ব্বে সীতাকে বলিলেন, "বিশালাক্ষি, এখন সমগ্র বনদেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।" ক্রোধস্ফুরিতাধরে

এই বলিয়া লক্ষ্মণ রামের সন্ধানে চলিয়া গেলেন।

লক্ষ্মণের পুরুষোচিত চরিত্র সর্ব্বত্র সতেজ, তাঁহার পৌরুষদৃপ্ত মহিমা সর্ব্বত্র অনাবিল, —শুভ্র শেফালিকার ন্যায় সুনির্ম্মল ও সুপবিত্র। সীতাকর্ত্তৃক বিক্ষিপ্ত অলঙ্কার-গুলি সুগ্রীব সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন; সে সকল রাম এবং লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত করা হইলে লক্ষ্মণ বলিলেন, "আমি হার ও কেয়ূরের প্রতি লক্ষ্য করি নাই, সুতরাং তাহা চিনিতে পারিতেছি না। নিত্য পদ-বন্দনাকালে তাঁহার নূপুরযুগ্ম দর্শন করিয়াছি এবং তাহাই চিনিতে পারিতেছি। কিষ্কিন্ধ্যার গিরিগুহাস্থিত রাজধানীতে প্রবেশ করিয়া গিরিবাসিনী রমণীগণের নূপুর ও কাঞ্চীর বিলাসমুখর নিস্বন শুনিয়া "সৌমিত্রির্লজ্জিতো-ঽভবৎ।" এই লজ্জা প্রকৃত পৌরুষের লক্ষণ, চরিত্রবান্ সাধুপুরুষেরাই এইরূপ লজ্জা দেখাইতে পারেন। যখন মদ-বিহ্বলাক্ষী নমিতাঙ্গযষ্টি তারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল,—তাহার বিশালশ্রোণীস্খলিত কাঞ্চীর হেমসূত্র লক্ষ্মণের সম্মুখে মৃদুতরঙ্গিত হইয়া উঠিল, তখন "অবাঙ্মুখোঽভবৎ মনুজ-পুত্রঃ"—লক্ষ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইলেন। এইরূপ দুইএকটি ইঙ্গিতবাক্যে পরিব্যক্ত লক্ষ্মণের নৈতিক সাধুত্বের ছবি আমাদের চক্ষের নিকট উপস্থিত হয়। তখন প্রকৃতই তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজার্হ মনে হয়।

রামায়ণে লক্ষ্মণের মত পুরুষকারের উজ্জ্বল চিত্র আর দ্বিতীয় নাই। ইনি সতত নির্ভীক, বিপদে অকুণ্ঠিত, স্বীয় ক্ষুরধার তীক্ষ্ম-বুদ্ধি সত্বেও ভ্রাতৃস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। নিতান্ত বিপদেও তাঁহার কণ্ঠস্বর স্ত্রীলোকের ন্যায় কোমল হইয়া পড়ে নাই। যখন তিনি কবন্ধের বিশালহস্তের সম্পূর্ণরূপ আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখন রামের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এইমাত্র তিনি বলিয়াছিলেন—"দেখুন আমি রাক্ষসের অধীন হইয়া পড়িতেছি, আপনি আমাকেই বলিস্বরূপ রাক্ষসের হস্তে প্রদান করিয়া পলায়ন করুন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনি সীতাকে শীঘ্র ফিরিয়া পাই-বেন। তাঁহাকে লাভ করিয়া পৈতৃক রাজ্যে পুনরধিষ্ঠিত হইয়া আমাকে স্মরণ রাখিবেন।" এই কথায় বিলাপের ছন্দ নাই। ইহাতে রামের প্রতি অসীম প্রীতি ও স্বীয় আত্মোৎ-সর্গের অতুল্য ধৈর্য্য সূচিত হইয়াছে।

ক্ষাত্রতেজের এই জ্বলন্ত মূর্ত্তি, এই মৌন ভ্রাতৃভক্তির আদর্শ, হিন্দুস্থানে চিরদিন পূজা পাইয়া আসিয়াছেন। "রাম-সীতা" এই কথা অপেক্ষাও বোধ হয় "রাম-লক্ষ্মণ" এই কথা এতদ্দেশে বেশী পরিচিত। সৌভ্রাত্রের কথা মনে হইলে "লক্ষ্মণ" অপেক্ষা প্রশংসার্হ উপমান আমরা কল্পনা করিতে পারি না। ভরত ভ্রাতৃভক্তির পলান্ন,—সুকোমল ভাবের সমৃদ্ধ উদাহরণ। কিন্তু লক্ষ্মণ ভ্রাতৃভক্তির অন্নব্যঞ্জন, জীবিকার সংস্থান। আজ আমরা স্বেচ্ছায় আমাদের গৃহগুলিকে লক্ষ্মণ-শূন্য করিতেছি। আজ বহুস্থানে সহধর্ম্মিণীর স্থলে স্বার্থরূপিণী, অলঙ্কারপেটিকার যক্ষীগণ আমাদিগকে ঘিরিয়া গৃহে একাধিপত্য স্থাপন করিতেছে; যাঁহারা এক উদরে স্থান পাইয়াছিলেন, তাঁহারা আজ এক গৃহে স্থান পাইতেছেন না। হায়, কি দৈববিড়ম্বনা, যাঁহাদিগকে

বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে পরম সুহৃদ্‌রূপে গড়িয়া দিয়া আমাদিগকে প্রকৃত সৌহার্দ্দ শিখাইবেন, তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া পঞ্জাব ও পুণা হইতে আমরা সুহৃৎ সংগ্রহ করিব, এ কথা কি বিশ্বাস্য? আজ আমাদের রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ প্রাসাদশীর্ষ হইতে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন; আজ লক্ষ্মণের অন্ন জুটিতেছে না, রাম স্বর্ণথালে উপাদেয় আহার করিতেছেন। আজ আমাদের কষ্ট, দৈন্য, বনবাসের দুঃখ, সমস্তই দ্বিগুণতর পীড়াদায়ক। লক্ষ্মণগণকে আমাদের দুঃখের সহায় ও চিরসঙ্গী মনে ভাবিতে ভুলিয়া যাইতেছি। হে ভ্রাতৃবৎসল, মহর্ষি বাল্মীকি তোমাকে আঁকিয়া গিয়াছেন—চিত্রহিসাবে নহে; হিন্দুর গৃহদেবতাস্বরূপ তুমি এপর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিলে। আবার তুমি হিন্দুর ঘরে ফিরিয়া এস, আমাদের দক্ষিণবাহু অভিনববলদৃপ্ত হইয়া উঠিবে—আমরা এ দুর্দ্দিনের অন্ত দেখিতে পাইব।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আজিকার ভারতবর্ষ।

২

[ইংরাজের শাসনপদ্ধতি।]

ভারতপর্য্যটক অ্যাল্‌বের্ মেত্যাঁ, ফরাসী পদ্ধতির সহিত তুলনা করিয়া, ইংরাজের শাসনপদ্ধতির যেরূপ সমালোচনা করিয়াছেন, তাহার সার-মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

ভারতবর্ষে ইংরাজ-শাসনতন্ত্র-সম্বন্ধে কাহারো বা অনুকূল, কাহারো বা প্রতিকূল অভিমত থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, কার্য্যত অতীব দৃঢ় ও সুশৃঙ্খল ভাবে ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে এবং যাঁহারা ইহার প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের হস্তে প্রভূত কর্ত্তৃত্বও দেওয়া হইয়া থাকে।

এই রাজ্যতন্ত্রের তলদেশে "দেশীয়গণ" ও উপরিভাগে ইংরাজেরা অধিষ্ঠিত। ইংরাজ রাজপুরুষেরা সবিভব অনুচরবর্গে পরিবৃত; দেশীয় ভাষায় এতটা অভিজ্ঞ যে, তাঁহারা অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্য স্বয়ং তত্ত্বাবধান ও নিয়মিত করিতে পারেন। সেই সকল কর্ম্মচারীদিগকে রীতিমত নিয়মে আবদ্ধ করিয়া, স্থানীয় স্বার্থ, স্থানীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও স্থানীয় দলাদলির বাহিরে তাঁহাদিগকে স্থাপন করা হয়; সর্ব্বশেষে, তাঁহাদের পৃষ্ঠবলস্বরূপ সুসংহত সৈন্যমণ্ডলী অবস্থিত। এইপ্রকারে, তাঁহারা দেড়শত বৎসর যাবৎ, বিশ কোটিরও অধিক লোক শাসন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর অরাজকতার পর, ভারতে ব্রিটেনীয় শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। এই কালের মধ্যে, ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীবিদ্রোহ ছাড়া আর

কোন গুরুতর বিদ্রোহ উপস্থিত হয় নাই।

ইংরাজের ভারতরাজ্য দেখিয়া যেরূপ একটি অখণ্ডতার ভাব মনে আইসে, ফরাসী-অধিকৃত ভারত-ভূখণ্ডগুলি দেখিয়া—রাজ্য-হীন শুধু পাঁচটি নগর দেখিয়া, সে ভাব মনে আইসে না। ইংরাজদিগের ন্যায় ফরাসী-দিগের মধ্যেও, কৃষ্ণবর্ণ দেশীয় লোকের বিদ্বেষী, নিষ্ঠুর অবজ্ঞাপরায়ণ ব্যক্তি কখন-কখন দৃষ্ট হয়। কিন্তু সাধারণত ফরাসীরা ধনাঢ্য "দেশীয়" বণিক্‌দিগের নিকট ছোট-খাটো-বিষয়ে অনুগ্রহের প্রার্থী হইতে ইত-স্তত করে না, "দেশীয়" উপপত্নী গ্রহণ করে, দোভাষীর সাহায্য ব্যতীত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে না। এই সকল কারণে, অজ্ঞাতসারেও অনেকসময় স্থানীয় বিবাদে তাহাদিগকে লিপ্ত হইতে হয়। আবার ফরাসীদিগের মধ্যে একদল কর্ম্মচারী এমনও দেখা যায় (সংখ্যায় অল্প)—যাহারা উৎকৃষ্ট ইংরাজ-সিভিলিয়ানের সমকক্ষ, কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবের লোক। ইঁহারা আধুনিক ফ্রান্সের মর্ম্মগত বিশেষ-ভাব ও চিন্তা-প্রবাহ ভারতবর্ষে আনয়ন করিতে সচেষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কেহ-কেহ, কোন সরকারী কাজকর্ম্ম খালি হইলে, উচ্চজাতীয় হিন্দুদিগের প্রতিবাদ সত্ত্বেও, কোন সুযোগ্য নীচজাতীয় "পারিয়া"কে সেই কর্ম্মে মনোনীত করা শ্লাঘার বিষয় মনে করেন; কেহ বা, ভারতবর্ষের সমাজ ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত ইতিহাস অনুশীলনে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণ-দিগকে স্বগৃহে নিমন্ত্রণ করেন, য়ুরোপীয় পাদ্রি ও সুধীবর্গের প্রতি যেরূপ—ইঁহা-দিগেরও প্রতি সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এইরূপে, উচ্চদরের দেশীয়দিগের মধ্যে তাঁহারা লোকপ্রিয় হইয়া উঠেন। কেহ বা, ফরাসী খৃষ্টীয় মঠের মঠধারিণীর অতি-ধর্ম্মোৎসাহের বিরুদ্ধে, হাঁসপাতালের রোগীদিগের পক্ষসমর্থন করেন,—অপৌত্তলিক মুসলমানদিগকে যাহাতে "পেগ্যান" নামে অভিহিত না করা হয়, তদ্বিষয়ে মঠধারিণীকে অনুরোধ করেন।

ফরাসী-অধিকারস্থ এই পঞ্চ নগরে, ফরাসীবিধানানুসারেই, সার্ব্বজনিক শিক্ষা-প্রণালী স্থাপিত হইয়াছে; এবং তত্রস্থ বিদ্যা-লয়সকলকে, ইংরাজ-ভারতের উন্নততম প্রদে-শস্থ বিদ্যালয়ের সহিত অক্লেশে তুলনা করা যাইতে পারে।

ইংলণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সের সরকারী কাজ-কর্ম্ম তত উচ্চপদের নহে; সেইজন্য ফরাসী রাজধানীর উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে তৎপ্রতি বড়-একটা আকর্ষণ নাই। প্রায়ই অনুগ্রহবিতরণের হিসাবে কর্ম্মচারি নিযুক্ত হয়; মন্ত্রিগণ তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাক্, কখন-কখন তাঁহারাও অনাবশ্যক পদের সৃষ্টি করিবার দিকে উন্মুখ। এই-হেতু, ফরাসী-ভারতবর্ষে সর্ব্বজাতীয় ও সর্ব্ব-শ্রেণীয় সরকারী কর্ম্মচারী ও ভৃত্যের সংখ্যা চৌদ্দশত। সমস্ত ফরাসী-ভারতের লোক-সংখ্যা একটা সামান্য ইংরাজ "ডিস্‌ট্রিক্টের" সমান হইবে। অতএব, লোকসংখ্যার তুলনায়, কর্ম্মচারীর সংখ্যা বড় বেশী বলিয়া মনে হয়। ফরাসী-ভারতে বিচার-কার্য্যের একটি সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে; আপীল-আদালৎ পণ্ডিচরিতে অধি-

ষ্ঠিত। সমস্ত "দেশীয়" কর্ম্মপ্রার্থীদিগকে স্বদেশে কর্ম্ম দিয়া পরিতুষ্ট করা যায় না; সুতরাং কতকগুলি দেশীয়কে ম্যাজিস্‌ট্রেটের পদে নিযুক্ত করিয়া হিন্দ-চীনে পাঠান হইয়া থাকে। সব-সময়ে যে তাহাদের বিচার-কার্য্যে, ফরাসী-ন্যায়বিচার-সম্বন্ধে তত্রস্থ অধিবাসীদিগের মনে উচ্চ ধারণা হয়, এরূপ বলা যায় না। যে দিন হইতে ভারতবর্ষের জন্য এক-জন স্বতন্ত্র "সেনেটার" ও "ডেপুটি" নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই দিন হইতেই কর্ম্মচারীর সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হইতে ভারতের ফরাসী-উপনিবেশ এই-টুকুমাত্র ফল লাভ করিয়াছে।

হিন্দুদিগকে "হ্বোট্" দিবার অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে সাম্য স্থাপিত হয় নাই। ফরাসীদিগের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষ, হিন্দুদিগের চিরাগত সামাজিক বিভাগের কঠোরতা কখন-কখন লাঘব করিতে কতকটা সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু বর্ণভেদের বিরুদ্ধে এপর্য্যন্ত কোনপ্রকার সমবেত চেষ্টা হয় নাই। ধনাঢ্য হিন্দুদিগের হস্তেই "হ্বোট"-সংখ্যা-নির্ণয়কার্য্য অর্পিত হইয়া থাকে; সে সম্বন্ধে আর কেহ তত্ত্বাবধান করে না; সুতরাং, সেই প্রভাবশালী দেশীয়েরাই নিজ ইচ্ছামত "হ্বোটে"র ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন। কখন-কখন ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন, কিন্তু আইন-সঙ্গত কাজ হইতেছে কি না, সে বিষয়ে দৃষ্টি করা দূরে থাকুক, বরং তাঁহারা স্বয়ং কোন এক বিশেষ দলের পক্ষ অবলম্বন করেন। এইরূপ নির্ব্বাচক-ব্যতীত নির্ব্বাচনে কখন-কখন বিষম গণ্ডগোল বাধিয়া যায়, এবং ইহার দরুণ কোন-কোন ফরাসী রাজপুরুষের কতকটা প্রতিপত্তিরও হানি হয়।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডস্থ জনসাধারণের মতামত তুলনা না করিলে ফরাসী ও ইংরাজি শাসন-পদ্ধতির একটা সম্পূর্ণ চিত্র দেওয়া যাইতে পারে না। আমাদের ফরাসী দেশে, কোন কর্ম্মচারী স্বীয় শক্তির অপব্যবহার করিলে সংবাদপত্রাদিতে ও পার্লেমেণ্টসভায় নিন্দিত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকে; এবং দেশীয়দিগের পক্ষ (এমন কি, বিদ্রোহী হইলেও) অবলম্বন করিবার জন্যও ফরাসী জনসাধারণের মধ্যে একটি বৃহৎ দল আছে। ক্লাইব ও ওয়ারেন্ হেস্‌টিংসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া, ইংলণ্ডে অনেকবার লোক-মত "দেশীয়"-স্বার্থের অনুকূলে পরিব্যক্ত হইয়াছে; কিন্তু "সাম্রাজ্যিকতা"র বৃদ্ধিসহকারে, দুর্ভিক্ষসম্বন্ধে ও অন্যায়পূর্ব্বক কাহাকে ধৃত করা কিংবা দমন করা সম্বন্ধে, গবর্ণমেণ্টের নিকট কৈফিয়ৎ চাহে, এরূপ সংবাদপত্রপ্রকাশক ও রাষ্ট্রনৈতিক লোকের সংখ্যা দিন-দিন কমিয়া আসিতেছে। অধিকাংশ লোকে এক্ষণে প্রায় সকল স্থলেই ইংরাজ-কর্ম্মচারীর ও ভারতবাসি-ইংরাজের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকে। আমাদিগের অপেক্ষা ইংরাজদিগের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে, উহাদের দ্বারা যে শাসনতন্ত্র সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা একটা বিশেষ পদ্ধতি-অনুসারে যথাযথ পরিচালিত হইয়া থাকে। তা ছাড়া, শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা উহাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ; কেন না, ইংরাজেরা মনে করে, স্বাধীনতা-বস্তুটা রপ্তানীর সামগ্রী নহে; তাহাদের অধিকৃত

দেশসমূহে কি নিয়মে কাজ চলিতেছে, সে বিষয়ে তাহারা সহজে অনুসন্ধান করিতে চাহে না; তাহারা সর্ব্বত্রই গতানুগতিক এবং গ্রেট্-ব্রিটেনের বাহিরে অনিয়ন্ত্রিত প্রভু।*

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বীরকুঙর।

খাস বাঙ্‌লায় গোপজাতির বাহুবলসম্বন্ধে যে সুনাম ছিল, ইদানীং তাহা লোপ হইয়া আসিতেছে। গৌড় বা গোড়ো গোয়ালারা বঙ্গীয় জমিদারশ্রেণীর লাঠিয়াল সৈন্যদলের মেরুদণ্ডস্বরূপ ছিল এবং ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বেও বিস্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা প্রধানত তাহাদের সহকারিতায় ঘটিয়াছে। দণ্ডবিধির কঠোরতা অথবা ম্যালেরিয়ার বিষ, কাহার প্রতাপ বেশী, বলা যায় না; কিন্তু যে কারণেই হউক, বাঙ্‌লার এই শূরবীর জাতি অধুনা দলিতফণাভুজঙ্গবৎ কেমন নির্জ্জীব হইয়া গিয়াছে। এখন আর গোয়ালা শূরোচিত বাহুবলের ধার ধারে না, তবে সাধারণত পূর্ব্বের মতই কাণ্ডজ্ঞানবর্জ্জিত। কিন্তু গোয়ালিনীঠাকুরাণীর চিরদিনের যশটুকু আজিও অক্ষুন্ন আছে। তিনি কক্ষে দুগ্ধভাণ্ড অথবা শিরোদেশে দধিদুগ্ধের পসরা লইয়া পূর্ব্ববৎই ফিরি করিয়া বেড়াইতেছেন। কথায় ছল এবং দুগ্ধে জল কিন্তু আগেকার চেয়ে মাত্রায় বাড়িয়াছে।

বেহার এবং ছোটনাগপুরে গোপজাতির ইতিহাস পূর্ব্বাপর সমান। তাহাদের অনেকে সেই পুরাকালের মত কৌপীন বা নামমাত্র বস্ত্রখণ্ডে কটিদেশ আবৃত করিয়া গোমহিষ চরাইয়া 'বাথানে' বিনিদ্র রজনী যাপন করিতেছে। বালক, যুবা, বৃদ্ধ, ক্ষুদ্রবৃহৎ শৈলমালার সানুদেশে, নিবিড় বনজঙ্গলের নিভৃতে, নির্ভয়ে কণ্ঠে শব্দায়মান ধাতব অথবা দারুনির্ম্মিত ঘণ্টা পরিহিত 'ধুরজানোয়ারের' 'রাখোয়ারি' করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সময়-অসময় নাই। সচরাচর দেখা যায়, গোপসন্তান চারণরত-মহিষপৃষ্ঠে অবলীলাক্রমে উপবেশন বা শয়ন করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেছে। কদাচিৎ তাহার কণ্ঠনিঃসৃত 'লোরিক' মলের বীরগাথা বিচিত্রসুরে পাহাড়জঙ্গল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, সমাজসৃষ্টির প্রভাতে ইহাদের যে অবস্থা ছিল, কাল জয় করিয়া তাহা অব্যাহত আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র গোপজাতির বাস। ইহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। ঘোষী, কিষণৌৎ, মজরৌট, চৌঠাহা এবং গৌড়িয়া। ইহার ভিতর আচারে-ব্যবহারে ঘোষীদের প্রাধান্য, অন্যান্য শ্রেণীর মত ইহা-

*গত শ্রাবণের "আজিকার ভারতবর্ষ" প্রবন্ধের ১৮৫ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ১৫শ ছত্রে ভোজনাগার স্থলে ভ্রমক্রমে ভজনাগার হইয়াছে।

দের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু চালচলনের খুঁটিনাটি ধরিলে পাঁচ শ্রেণীকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু এক বিষয়ে ইহাদের মধ্যে চমৎকার ঐক্য বন্ধন আছে।—তাহা শৌর্য্যবীর্য্যের উপাসনা। যে কয়টি বাৎসরিক পর্ব্ব শ্রেণী-নির্ব্বিশেষে তাহাদের ভিতর অনুষ্ঠিত হয়, সকলই শূরবীরের কাহিনীর সঙ্গে জড়িত। 'লোরিকে'র গান যতই অদ্ভুত হউক, তাহার প্রতিপদে কেবল শক্তিসামর্থ্যের জয়োচ্চারণ। বীরকুঙর গোয়ালাদের আর একটি দেবতা এবং নির্ভীক সাহসিকতার জন্যই তাহার প্রসিদ্ধি।

তিলকোনাম্নী গোপকন্যার গর্ভে মুংরি বাথান গ্রামে বীরকুঙরের জন্ম হয়। যথা-সময়ে কুমদার গ্রামের বসান ক্ষীরহের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছিল। কিন্তু বার বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গেল, 'গওনা' বা দ্বিরা-গমন হইল না। ইহাতে শ্বশুর চিন্তিত হইয়া জামাতাকে চিঠি লিখিলেন। দুইতিনবার পত্র লিখিয়া উত্তর না পাওয়ায় বসান ক্ষীরহর একটা শক্ত দিব্য দিয়া জামাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইল।

বার বরিষ বিতলো গওনা ও বিয়া
কভু নহি আইলা কুমদার শ্বশুরার।

কিন্তু মাতা সহজে পুত্রকে শ্বশুরালয়ে যাইতে দিবেন না। এখন তাড়াতাড়ি কি, চৈত্রমাস আসুক, 'দুধিয়া গহম' পাকিয়া উঠুক, তখন মাল্লেপুর বাজারে দইদুধ বেচিয়া গহম কিনিব, তাহা দিয়া 'পুয়া' (পিঠা) প্রস্তুত করিয়া দিব, তখন শ্বশুরার যাস্ বাপ্ আমার!

মাইসে আইলো পুছে মন হামার
উলরল কুমদর শ্বশুরার
থৎপর থৎ ভেজাওল বসন ক্ষীরহর
লুংরি বাথান, হামরা বড়া বুঝা প্রান্।
মাই বোলা কি দিন বিতা সুদিন
আওয়াদে চৈৎ মাহিনা,
দুধিয়া গহম উপজেহে এ দেশমে বহুৎ,
মাল্লেপুর বাজারসে লাইব দুধদহি বেচকে
দুধিয়া গহম,
ওক্‌রে দেব পুয়া পাকায়
ওহো হোতো কুমদের কো সন্দেশ।

কিন্তু বীরকুঙর মাতার আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া যাওয়াই স্থির করিল এবং গৃহে বল-প্রকাশ করিয়া পাথেয় সংগ্রহ করিয়া লইল। গানের কয়টি ছত্রে কাণ্ডজ্ঞানহীন গোপযুবার চরিত্র কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে:—

জবরদস্তি হেলল বীরকুঙর
শিরাঘর ভাণ্ডার,
পয়সা কড়ি থা সে কাঢ় লেল
গেঁঠ লাগায়।

এইরূপে প্রস্তুত হইয়া বীরকুঙর শ্বশুর-গৃহে যাত্রা করিতেছে, এমন-সময় দ্বারপথে হাঁচি পড়িল। মা অকুশল আশঙ্কা করিয়া আবার ছেলেকে বারণ করিল এবং প্রতিশ্রুত হইল, তাহার পিতাকে পাঠাইয়া দ্বিরাগমন করাইবে।

নিকসল বীরকুঙর দরওয়াজেকে
নজীগ্ ছিক পড়লক।
মাই কহে লাগলই রে বেটা
মৎ যাও, কুমদার শ্বশুরার।
তোরা বাপ্‌কে ভেজায়েকে
রোক সোদি করায়কে লাদেঁহে।
ছিক পড়লক, তুমহারা জানসে
ওয়ারা নহি হ্যায়।

পথে প্রাণের ভয় আছে, মাতার মুখে শুনিয়া বীরকুঙর বলিল, পৃথিবীতে কে এমন মানুষ আছে, যে আমায় মারিবে!

বীরকুঙর কহলক, ধরিতামে
কে জনম লেল বরিয়ার মানুষ
সে হমারা মারত্।

তখন মাতার কাছে বিদায় হইয়া যাইতে পথে মহিষেরা তাহার পথ আগুলিয়া দাঁড়াইল—কুমদার শ্বশুরার যাওয়া হইবে না। কে আমাদের সেবা 'বরদাস্ত' করিবে? বীরকুঙর রাখালদের উপর তাহাদের সেবা-শুশ্রূষার ভার দিয়া দুইচারি প্রহরের জন্য রওনা হইয়া গেল!

এত্না কহেকে হুঁয়াসে চলল বীরকুঙর,
রাস্তাপর গেলত ভঁইস সব ছেঁকে
মৎ যাও তু কুমদার শ্বশুরার।
কে হামারা সেবা বরদাস্ত করেগা।
বীরকুঙর ভঁইসকে হাঁককে
লে আওল বাথান।
আকর, বাগয়েৎ সবকে কহা যে
দুইচার পহর হামারা ভাইয়া রামকো
রাখো বিলমাকে।
হাম্ কুমদার শ্বশুরার সে চল আও
দুচার পহরকে লোট্কে।

এখন মধুযক্ নামে ভুঁইয়া কুমদার অঞ্চলে শূরবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বারবৎসর পূর্ব্বে মরিয়া সে ভূত হইয়াছে। তাহার প্রেতাত্মা বীরকুঙরের সঙ্গ লইল। মানুষের রূপ ধরিয়া সে পথে বীরকুঙরের সহিত আলাপপরিচয় করিয়া লইল এবং একটু 'খইনি' তামাক ভিক্ষা করিল—"একখিলি খইনি খিলায় লেও ত যাও।" বীরকুঙর তাহার প্রার্থনা ত পূর্ণ করিলই না, তার উপর কুমদারের সীমানায় পৌঁছিয়া খুব এক-চোট কুস্তি খেলিল।

মারে তাল বীরকুঙর সম্‌সে কুমদার উঠে আল্পকাল।

ইহাতে মনুষ্যরূপী ভূতের বড় রাগ হইল।

মধুযক্ আকর কহে মারল গেল মাৎ
আওর হরল তোর গেয়ান।
বারবরিষ মধুযক্‌কে মরণা ভেলই
কভি নেহী কই হাঁত রোপাই, সরম খেলইল
মুস্তি তোর জীব জান্ মারল যাইতো।

এই অভিশাপ ও ভয়প্রদর্শন বীরকুঙর গ্রাহ্য করিল না দেখিয়া মধুযক্ বসান ক্ষীরহরের বাথানে গেল এবং তাহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহিষ চুরি করিয়া জঙ্গলে বাঁধিয়া রাখিল। ইহাতে শ্বশুরের মন খারাপ হওয়ায় সে জামাতাকে ভালরূপ আদর-অভ্যর্থনা করিল না। বীরকুঙর সকল শুনিয়া জঙ্গলে চলিয়া গেল এবং মহিষকে উদ্ধার করিয়া ফিরিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে মধুযকের প্রেতাত্মা সেই বনবাসী এক ব্যাঘ্রকে বলিয়া দিল যে, তাহার মুখের শীকার কে কাড়িয়া লইয়া যাইতেছে। তখন বাঘ আসিয়া বীরকুঙরের পথরোধ করিল এবং উভয়ে তর্ক আরম্ভ হইল।

তব বীরকুঙর বোলাকি জানকে ডর হায়
তো আলগ হো যাও। তব না বোলা বাঘ
কি হামহুঁ বাঘিনকে দুধ পিলেঁা,
আর তোঁহো আহীরীন্‌কো দুধ পিলে
তব্ হামারাসে লড়কে লে যাও।

যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ব্যাঘ্র বীরকুঙরের হস্তে প্রাণত্যাগ করিল। দেখিয়া ভূত ব্যাঘ্রপত্নীর—নাম তাহার লুলি—নিকট উপস্থিত হইল এবং কহিল—

সন্ধ্যা কি তোর শিরকে সিদুর
হরলে আহীরা চলল যাও,
তোঁ কি বৈঠল হৈঁ নিচিত্
বদলী আইল, মার দে।

বাঘিনীও বীরকুঙরের সঙ্গে লড়াইয়ে হারিয়া স্বামীর সহগামিনী হইল। তখন বীরকুঙর শ্বশুরের হস্তে মহিষ সমর্পণ করিল। আহারাদি করিয়া গৃহে শয়ন করিয়াছে, এমন-সময়

আদ্‌মীকে স্বরূপ হোকে মধুযক্ বোলে
বীরকুঙরকে বুঝায়,
মরদকে জনমল হোয় সে বীরকুঙর
বাথান যাকে শুতে।

আর কেহ হইলে মনুষ্যরূপী ভূতের এই গালি গায় মাখিত না, কিন্তু গোপবীর বীর-কুঙর ইহাতে অধীর হইয়া উঠিল এবং সেই রাত্রে গৃহ ছাড়িয়া বাথানে গিয়া শয়ন করিল। ভূত তখন বাঘেদের "বাচ্চা"কে উত্তেজিত করিয়া বাথানে আনিল। ব্যাঘ্রশিশু ভয়ে কাছে আসিতেছে না দেখিয়া মধুযক্ বীরকুঙরের নিদ্রাভঙ্গ করিল এবং তাহার চক্ষে ধূলিমুষ্টি ছড়াইয়া দিল। অতঃপর "বাঘকে বাচ্চা" অনায়াসে বীরকুঙরের বুকে উঠিয়া তাহার কণ্ঠনালী বিদীর্ণ করিয়া দিল। বীরকুঙর মনুষ্যদেহ ত্যাগ করিল।

তার পর সেও ভূতযোনি প্রাপ্ত হইল। সেই অবস্থায় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বীরকুঙর শ্বশুরকে নিজের হত্যাকারী বলিয়া অভিযোগ করিতে ছাড়িল না। কিন্তু স্ত্রীর কাছে সমুদয় বৃত্তান্ত শুনিয়া অনুরোধ করিল যে, কাত্যায়নী মাতার নিকট হইতে তাহার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যেন মৃতদেহ সমাধিস্থ না করা হয়।

এত্‌না শুন বীরকুঙর কহে তিরিয়াকে
কি হামার মাটীকে আভি মজলিস মৎ করেদে
হাম দেবী মাই কাতানেকা আস্থান যাই।

কাত্যায়নী মাতার 'আস্থানে' গিয়া ভূতরূপী বীরকুঙর কিছু-কিছু উপদ্রব আরম্ভ করিল। কাত্যায়নীর দাসী—তিরগ্‌-বেটী তিরায়েন—সে গৃহমার্জ্জনা করিতে যাইতেছিল, তাহার জলের কলস ভাঙিয়া দিল; মালিনী ফুল লইয়া আসিয়াছিল, তাহার ফুল ফেলিয়া দিল। কিন্তু কাত্যায়নী মাতা তখন পীতাম্বরমণ্ডিত অপরূপ ডুলিতে শূন্যমার্গে মোরঙ্গদেশ যাত্রা করিতেছিলেন, বীরকুঙরের কথা শুনিয়াও তাহাকে দর্শন দিলেন না।

এ সব শুনকে দেবী মাই কাতানে
মোরঙ্গ দেশ করে চড়াহেন।
লালি লালি ডোলিয়া আওর
পীতাম্বর পড়ে ওহার, বিসু ক্যহারকে
ডোলি লাগে আকাশ।

পাখীর রূপ ধরিয়া বীরকুঙরও আকাশে উঠিল এবং ডুলির লম্বা বাঁশ ধরিয়া ফেলিল। ইহাতে দেবী কাত্যায়নী বড় বিরক্ত হইলেন।

কোন্ ঐছন মরতা ভুবনমে জনম লেল
যে হামার ডোলি দেলক বিল্‌মাকে।

বীরকুঙর কাতর প্রার্থনা করিল—"মা কাত্যায়নি, তুমি মোরঙ্গদেশ চলিলে, আমার মৃতদেহ এখনও কুমদার বাথানে পচিতেছে। মাগো, আমায় যশ দিয়া যাও।" দেবী প্রতিশ্রুত হইলেন মোরঙ্গদেশে মোগল-পাঠানদের জয় ও নিজের পূজা প্রচার করিয়া আসিয়া তাহাকে বর দিবেন। বীরকুঙর তথাপি ছাড়িল না, দেবীর সঙ্গে সঙ্গে মোরঙ্গ-দেশ গেল। সেখানে যুদ্ধ করিয়া অনেক

বাছা বাছা মোগলপাঠানকে হারাইয়া দিল। মহামারীর সৃষ্টি করিয়া কাত্যায়নী মাতা মোরঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবেন শুনিয়া সহজেই তাহারা পরাজয় স্বীকার করিল। তখন বীরকুঙর দেবীমাইয়ের নিকট প্রার্থনা করিল যে, তাঁহার দাসী তিরগ্-বেটী তিরায়েনের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া দেন। ভূতে এবং মানুষে কি করিয়া সংসারধর্ম্ম চলিতে পারে, এই আপত্তি তুলিয়া কাত্যায়নী প্রথমত বর দিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কেন না,

তব্ বোলে বীরকুঙর, গে মাই
দে হামারা সঙ্গ লাগায়,
হম্ ভূত বানায় লেব।

তখন বিবাহ করিয়া বীরকুঙর পত্নীকে লাঠির নৌকায় গঙ্গাপার করিতে গেল। ইহাতে তিরগ্-বেটী তিরায়েন জলে ডুবিয়া মরিল। সুতরাং বীরকুঙরের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। কেন না, সে সহধর্ম্মিণীকে ভূত বানাইয়া লইতে পারিয়াছিল।

এই কাহিনীকে ভিত্তি করিয়া গোপজাতি প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী অমাবস্যার পরদিন যে পর্ব্বানুষ্ঠান করে, তাহার নাম সোহরাই। সেদিন বেহার এবং ছোটনাগপুরের প্রত্যেক পল্লী পর্ব্বোৎসবে মাতিয়া উঠে। প্রভাতে ঢাকঢোলের যে শব্দ গ্রামপ্রান্ত হইতে উত্থিত হয়, মধ্যাহ্নের পর তাহা সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠে। তখন সকলে একটি গৃহপালিত শূকরকে ভূত মধুযকের প্রতিনিধি করিয়া বাঁধিয়া পূজার স্থানে লইয়া আসে, এবং গোমহিষদের নিকট হইতে তাহাদের বৎসগুলি বিচ্ছিন্ন করিয়া তফাতে রাখিয়া দেয়। পূজা শেষ হইলে গাভীদের ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পরে রজ্জুবদ্ধ বরাহটিকে টানিয়া বৎসদের কাছে এরূপ ভাবে লইয়া যাওয়া হয়, যাহাতে মাতার দল সহজেই তাঁহাদের অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া উন্মত্তবৎ হইয়া উঠে। তখন সেই সমবেত গাভীর দল একযোগে শূকরের প্রতি ধাবিত হয় এবং মুহুর্মুহু তাহাকে শৃঙ্গাঘাত করিতে থাকে। শূকর যন্ত্রণায় যত চীৎকার করে, বাদ্যোদ্যমের ঘটা তত বাড়িয়া উঠে এবং সেই সঙ্গে গোপসন্তানগণের আনন্দধ্বনিতে চারিদিক্ কম্পিত হইতে থাকে। জন্তুমধ্যে বরাহের প্রাণ বোধ করি সকলের চেয়ে কঠিন, সহজে বাহির হয় না। অতএব এই বীভৎস দৃশ্য সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত চলিতে থাকে।

কয় বৎসর হইল, কোয়েলনদীর তীরে এই নিষ্ঠুর পর্ব্বোৎসব দেখিয়াছিলাম। ক্ষীণস্রোত কল্লোলিনীর উত্তর তীরে মহুয়াকুঞ্জের ঘনচ্ছায়ায় বসিয়া বসিয়া জলক্রীড়ারত পক্ষীদের প্রতি অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া ছিলাম।—দূরে পালামৌর ক্ষুদ্র সুনীল শৈলমালা; তাহার পশ্চাতে রোহিতাশ্ব-পর্ব্বতশ্রেণীর ঘনকৃষ্ণ ছায়াদৃশ্য। সহসা অপর পারে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়া উঠিল, এবং সৈকতভূমিতে অসহায় রজ্জুবদ্ধ শূকরের দিকে রোষপরায়ণ গাভীর দল বেগে ধাবিত হইল। আমার সেখানে অপেক্ষা করার সময় বা প্রবৃত্তি ছিল না। অপরাহ্নে পথে যাইতে যত গ্রাম অতিক্রম করিলাম, সর্ব্বত্র ঢাকঢোলের শব্দ এবং আর্ত্তপশুর চীৎকার কানে বাজিতেছিল।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

অপূর্ব্ব মিলন।

কাছে যতদিন থাক ততদিন
কতটুকু তোরে পাই ?
তোমার রূপের আড়ালে সখিরে
তোমারে হারায়ে যাই !
মুরতির মাঝে খুঁজিয়া তোমারে
মিলে না তোমার দেখা ;
তোমারে বেড়িয়া রূপটি তোমার
দাঁড়াইয়া থাকে একা।
ঘনাইয়া আসে মোহের আবেশ,
ভরে' আসে দুটি আঁখি ;—
মূঢ়ের মত বিস্ময়ে হত
বিহ্বল হয়ে থাকি।
বুঝিতে পারি না বুঝাতে পারি না,
কহিতে পারি না কথা ;
চোখে জাগে শুধু ছবিখানি তোর
হিয়ে জাগে শুধু ব্যথা।
ছবির আড়ালে রূপের আড়ালে
তোমারে হারায়ে যাই ;
কাছে যতদিন থাক ততদিন
তোমার দেখা না পাই।

দূরে, কতদূরে আছ তুমি আজি
হেথায় আমি যে একা,—
তবু তোর সাথে দিবসের মাঝে
শতবার করি দেখা।
পিরীতি তোমার মূরতি ধরিয়া
আরতি করিছে মোরে ;

রস-অনুরাগ-অগুরুগন্ধে
হৃদয় উঠিছে ভ'রে।
কাছে থাক যবে মিলে না মিলন
দূরে গেলে মিলে তবে ;—
অপরূপ এই মিলনের রীতি
কে শুনেছে বল কবে ?
চোখের দেখায় দেখা হয় না যে,
মরমের মাঝে দেখা ;—
হিয়ার পরতে তপ্ত শোণিতে
মরণ-অধিক লেখা।
পরাণের সাথে পরাণের দেখা
নাম সে যাহার প্রেম—
মূল্য যাহার পরশমাণিক
তুল্য নহে সে হেম।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়।

১

সচরাচর যে সকল গ্রন্থ বাঙ্‌লার ইতিহাস বলিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যাপিত হইয়া থাকে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়,—১২০৩ খৃষ্টাব্দে পাঠান-সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া বাঙ্‌লার রাজধানী নবদ্বীপনগরে উপনীত হইবামাত্র, নবদ্বীপাধিপতি বৃদ্ধ লাক্ষণ্য সেন রাজ্য ও রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, অন্তঃপুর হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করেন।

এই কাহিনী বাঙালীর পুরাতন সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু ইহা আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের পদ্যে-গদ্যে গল্পে-উপন্যাসে পাঠকসমাজে সুপরিচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশের পুরাতন জনশ্রুতি হইতে এই কাহিনী গৃহীত হইলে, পুরাতন সাহিত্যেও ইহার আভাস থাকিত। অন্য কোন প্রমাণ না থাকিলেও, এ দেশের পুরাতন জনশ্রুতি বলিয়া ইহাকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইত।

কোন্ সময়ে কি সূত্রে এই কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রথমে স্থান প্রাপ্ত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন নহে। যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিবেন,

তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন,—আধুনিক বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাহাতে ইতিহাস অধ্যাপিত হইবার পূর্ব্বে এই কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশলাভ করে নাই। প্রথমে বিদ্যালয়ে, পরে শিক্ষিত-সমাজে এবং ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে এই কাহিনী ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে।

যাঁহারা প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাস অধ্যয়ন করিয়া, বাঙালীর ইতিহাস না জানিয়া, বাঙালীকে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া গ্রন্থরচনা করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কাহিনীর উল্লেখ করিয়া স্বমত-সমর্থনের সুযোগ প্রাপ্ত হন। যাঁহারা তাহাতে মর্ম্মাহত, তাঁহারা নবদ্বীপাধিপতির নামোল্লেখ করিয়া নানা কটু-কাটব্যপ্রয়োগে মর্ম্মদাহ শান্ত করিবার চেষ্টা করেন। যাঁহারা এরূপ অসম্ভব কথা মানিয়া লইতে অসম্মত, অথচ প্রমাণপ্রয়োগে প্রতিবাদ করিবার জন্য চেষ্টাশূন্য, তাঁহারা একজন হিন্দুনরপতির এরূপ দুরপনেয় কলঙ্ক কিয়ৎপরিমাণে অপনোদন করিবার আশায় লিখিয়া যান,—বৃদ্ধ নরপতির বিশেষ অপরাধ ছিল না; কৃতঘ্ন মন্ত্রিদলের বিশ্বাসঘাতকতায় এবং ব্রাহ্মণগণের উপদেশে এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। এইরূপে বঙ্গসাহিত্যে বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ব্যাপার নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়া বাঙালীর পরাজয়কলঙ্ক দুরপনেয় করিয়া তুলিয়াছে।

যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অধিনায়ক, সেই সকল খ্যাতনামা লেখক এইরূপে বাঙ্লার শেষ স্বাধীন হিন্দুনরপতির কলঙ্কঘোষণা করায়, তাহা এক্ষণে প্রবাদবাক্যের ন্যায় সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া পড়িয়াছে। এ কলঙ্ক আদৌ সত্য কি না এবং সত্য হইলে ইহার কতটুকু সত্য, এখন আর সে কথার বিচার করিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইতিহাস যাহার ললাটে ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়া দুরপনেয় কলঙ্কচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে, সে সভ্যজগতের নিকট লজ্জায় মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার সাহস হারাইয়া, মুখ ফুটিয়া প্রতিবাদ করিতে না পারায়, এ বিষয়ের প্রকৃত তথ্য নির্ণীত হইবার অসুবিধা হইয়াছে। এই কাহিনী যখন বঙ্গসাহিত্যে প্রথমে প্রবেশলাভ করে, তখন ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের আগ্রহ সমুচিতভাবে বিকশিত হয় নাই। এখনও অনেকের নিকট হস্তলিখিত বা মুদ্রিত পুস্তকের কথা অকাট্য প্রমাণ বলিয়া পরিচিত। কোন পুরাতন পুস্তকে কিছু লিখিত থাকিলেই হইল, তাহার সত্যমিথ্যার আলোচনা অনাবশ্যক, মিথ্যা হইলে পুস্তকে লিখিত বা মুদ্রিত হইবে কেন,—অনেকে এখনও এরূপ তর্ক উত্থাপন করিয়া থাকেন। সুতরাং এই কাহিনী বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিবার সময়ে ইহার সত্যমিথ্যার বিচার হয় নাই বলিয়া বিস্মিত হইবার কারণ নাই।

বিচারে বিলম্ব ঘটিয়া তথ্যনির্ণয়ের অসুবিধা হইয়াছে। কিন্তু বিলম্ব ঘটিয়াছে বলিয়া তথ্যনির্ণয়ের আশা একেবারে তিরোহিত হয় নাই। বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা করা প্রয়োজন হইবে, তাহা এই :—

(১) এই কাহিনীর মূল কোথায়?
(২) বৃদ্ধ পলায়নপর নবদ্বীপাধিপতির নাম

কি? (৩) কোন্ সময়ে এই ঘটনা সংঘটিত হয়? (৪) তৎকালে নবদ্বীপে রাজধানী ছিল কি না? (৫) নবদ্বীপ কোন্ সময়ে কি সূত্রে মুসলমানের হস্তগত হয়?

এই সকল প্রশ্ন জটিল হইলেও, পুরাতত্ত্বানুসন্ধানপরায়ণ পণ্ডিতবর্গের অধ্যবসায়ে এপর্য্যন্ত যে সকল প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা এই কলঙ্কক্ষালনের পক্ষে যথেষ্ট।*

বক্তিয়ার খিলিজি সম্বন্ধে শিশুপাঠ্য ইতিহাসে বিশেষ কিছু জানিবার উপায় নাই। সুতরাং তাঁহার নামে কেহ কোন রচা-কথা প্রচার করিলেও, তাহার প্রতিবাদ করা কঠিন হইয়া পড়ে। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়সম্বন্ধে ঐতিহাসিক-তথ্য-নির্ণয়ের উপযোগী যে সকল প্রমাণ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তদ্দ্বারা যে সকল সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা এই :—

(ক) সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ-অধিকারের কাহিনী জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান সৈনিকের মুখে শ্রবণ করিয়া মিন্‌হাজ উদ্দীন স্বকৃত "তবকাৎ-ই-নাসেরী"নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করেন। তাহার অন্য কোন প্রমাণ নাই। সেই প্রথম, সেই শেষ। পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাহারই পুনরুক্তি করিয়া গিয়াছেন।

(খ) লাক্ষ্মণ্যনামক কোন নরপতির বঙ্গদেশের অধিপতি থাকার প্রমাণ নাই। সেনরাজবংশে এই নামের কেহ সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

(গ) ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ারের বঙ্গাগমন বিশ্বাস করা যায় না। কারণ, মুসলমান ইতিহাসলেখকের মতে বক্তিয়ার দ্বাদশবৎসর বঙ্গদেশ শাসন করিয়া ১২০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশেই পরলোকগমন করেন। সুতরাং ১২০৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই বক্তিয়ার বঙ্গদেশে উপনীত হন।

(ঘ) বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত নবদ্বীপ হিন্দুরাজ্যভুক্ত একটি বিভাগ বা "বিষয়" ছিল, তথায় কোন রাজা বা রাজধানী ছিল না। লক্ষ্মণাবতী, লক্ষ্ণৌর ও বিক্রমপুরে তিনটি রাজধানী ছিল।

(ঙ) বক্তিয়ার খিলিজি সম্রাট্ কুতবউদ্দীনের নিকট যে সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতেও তাঁহাকে লক্ষ্মণাবতী অধিকারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাহাতে নবদ্বীপের নামোল্লেখ নাই।

(চ) তৎকালে লক্ষ্মণাবতীর অধীন বরেন্দ্রভূমি, লক্ষ্ণৌর রাজধানীর অধীন রাঢ়ভূমি ও বিক্রমপুরের অধীন বঙ্গভূমি (পূর্ব্ববঙ্গ) অবস্থিত ছিল। বাগ্‌ড়ি অর্থাৎ মধ্য ও দক্ষিণ বঙ্গের কিয়দংশ রাঢ় ও কিয়দংশ বঙ্গের অন্তর্গত ছিল। সুতরাং সেকালের নবদ্বীপ রাঢ়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তাহা কোন সময়েই বরেন্দ্রভূমির বা লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল না।

* কলঙ্ককাহিনী বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইলেও, এই সকল প্রমাণ সুপরিচিত নহে। তজ্জন্য এখনও গল্পে-উপন্যাসে এবং মাসিকপত্রের প্রবন্ধে অনেক বাঙালী লেখক এই কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে বিবৃত করিয়া ভবিষ্যৎকালের ইতিহাসলেখকের সমালোচনা-শ্রম বর্দ্ধিত করিতেছেন। বিগত চৈত্রসংখ্যার "নবপ্রভা" পত্রে খ্যাতনামা লেখক শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় "বল্লাল সেন" শীর্ষক প্রবন্ধেও এই পুরাতন কাহিনীকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে মানিয়া লইয়াছেন।

(ছ) বক্তিয়ার খিলিজি জীবিত থাকিতে বরেন্দ্রের কিয়দংশমাত্রই মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর রাঢ় পরাজিত হয় এবং বক্তিয়ারের বঙ্গাগমনের ৬০ বৎসর পরেও মুসলমান ইতিহাসলেখক বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত থাকে, ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া স্বরচিত ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল সিদ্ধান্ত কোন্ কোন্ প্রমাণমূলে কিরূপে পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বক্তিয়ার খিলিজির সংক্ষিপ্ত জীবনকাহিনীর আলোচনা করা আবশ্যক। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি,—মুসলমানলিখিত ইতিহাসে বাঙালীর পুরাবৃত্ত নিতান্ত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইয়াছে; তাহাতে অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হয় না। সে যুগে যাঁহারা ইতিহাসরচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা বিচারবুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করেন নাই; যাহা শুনিয়াছেন, যাহা জানিয়াছেন, যাহা দেখিয়াছেন এবং যাহা অনুমান করিয়াছেন, তাহাই অবলীলাক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রসঙ্গক্রমে যিনি বঙ্গভূমির কথা যতটুকু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই বাঙ্লার ইতিহাসের অবলম্বন। বক্তিয়ার খিলিজির সমসময়ে কোন মুসলমান লেখক বাঙ্লার স্বতন্ত্র ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন নাই; করিয়া থাকিলেও সেরূপ গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। সুতরাং বক্তিয়ার খিলিজির দিগ্বিজয়সম্বন্ধে অধিক কিছু জানিবার উপায় নাই।

১২৬০ খৃষ্টাব্দের সমকালে আবু-উমর-মিন্হাজ উদ্দীন "তবকাৎ-ই-নাসেরী"নামক ইতিহাসের বিংশতিতম অধ্যায়ে বঙ্গভূমির যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই মুসলমানলিখিত বাঙ্লার ইতিহাসের আদিগ্রন্থ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মালদহপ্রবাসী গোলাম-হোসেন-সঙ্কলিত "রিয়াজ-উস্-সলাতিন্"নামক গ্রন্থ ভিন্ন বাঙ্লার আদ্যন্তের ধারাবাহিক আর কোন গ্রন্থ মুসলমানকর্ত্তৃক লিখিত হয় নাই। মিন্হাজের গ্রন্থের ইংরাজী ও গোলাম হোসেনের গ্রন্থের বাঙ্লা অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার কোন গ্রন্থেই গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অন্যান্য প্রমাণবলে সেকালের ইতিহাসের ছায়ামাত্র ঈষৎ প্রতিভাত হইতে পারে।

মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাঞ্চলে নানা রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। তাহাতে পুরাতন মগধ, কান্যকুব্জ ও গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের সীমা ও অধিকার বহুবার বিপর্য্যস্ত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কান্যকুব্জ প্রবল হইয়া মগধের পশ্চিমাঞ্চল অপহরণ করায়, পলায়নপর মগধেশ্বর গৌড়ের কিয়দংশ অধিকার করেন, পরে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যে পাল ও সেন বংশীয় নরপালবর্গের কলহবিবাদ নিরস্ত হইলে, গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। সেনরাজবংশের অধিকারসময়েই বক্তিয়ার খিলিজি গৌড়রাজ্য আক্রমণ করেন।

তৎকালে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গ নামক তিনটি প্রধান বিভাগে

বিভক্ত ছিল এবং লক্ষ্মণাবতী, লক্ষ্ণৌর ও শ্রীবিক্রমপুরে এই তিন বিভাগের রাজধানী ছিল। সমগ্র গৌড়ীয় সাম্রাজ্য নানা উপ-বিভাগে অর্থাৎ "বিষয়"নামক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিষয় বা উপ-বিভাগ বিষয়পতির দ্বারা শাসিত হইত। গৌড়েশ্বর সাধারণত রাজধানীতে বাস করিতেন। তিনটি রাজধানীর মধ্যে লক্ষ্মণাবতী গঙ্গাতীরে অবস্থিত থাকায় এবং পুরাতন গৌড়রাজ্যের রাজধানী বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করায়, লক্ষ্মণসেনদেব শেষজীবন তথায় বাস করিয়া নিজনামানুসারে তাহাকে "লক্ষ্মণাবতী" নাম প্রদান করেন। মুসলমানের আদি ইতিহাসে লক্ষ্মণাবতী "লক্ষ্ণৌতি" নামে পরিচিত; তাহাতে গৌড়নামের উল্লেখ নাই।

মিন্‌হাজের গ্রন্থ রচিত হইবার সময়ে এই তিনটি পুরাতন হিন্দুরাজধানীর মধ্যে শ্রীবিক্রমপুর হিন্দুরাজার অধিকারভুক্ত ছিল; অপর দুইটি মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল। মুসলমানলিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্ণৌতি অধিকার করেন, এবং তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতি মহম্মদ শেরান কর্তৃক লক্ষ্ণৌর অধিকৃত হয়। কিরূপে এই দিগ্বিজয় সাধিত হইয়াছিল, তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। মিন্‌হাজ ও তাঁহার পরবর্ত্তী মুসলমান ইতিহাসলেখকগণের গ্রন্থে বক্তিয়ার খিলিজি ও তাঁহার রাজ্যবিস্তারের যতদূর বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আমাদের প্রধান অবলম্বন।

মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস ও প্রধান সেনাপতি কুতবউদ্দীন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিবার সময়ে এদেশে কি অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই না সাধিত হইয়াছিল! তুর্কিস্থানের কোন এক অজ্ঞাতকুলশীল দরিদ্র পরিবারে কুতবের জন্ম হয়। তাঁহাকে শৈশবে দাসবিপণীতে বিক্রীত হইতে হইয়াছিল। ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান সম্রাট্ এইরূপে দাসবিপণী হইতে প্রভুগৃহে ও তথা হইতে ক্রীতদাসরূপে ক্রমে মহম্মদঘোরীর নিকট উপঢৌকনদ্রব্যের সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠাঙ্গুলি নষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সুলতান তাঁহাকে "আইবক্" বলিয়া ডাকিতেন। আইবক্ যে একদিন দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তাহা কে জানিত?

বক্তিয়ার খিলিজির বাল্যজীবনও কুতবউদ্দীনের ন্যায় অজ্ঞাত। তিনি ঘোর-প্রদেশের খিলিজিবংশে জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু কদাকার বলিয়া কোনস্থলেই তাঁহার প্রতিভার সমাদর হইত না। মহম্মদঘোরী এবং কুতবউদ্দীন উভয়েই কুলশীল অপেক্ষা প্রতিভার সমাদর করিতেন বলিয়া বক্তিয়ার বড় আশা করিয়া প্রথমে ঘোরীর নিকট, পরে কুতবের নিকট উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খর্ব্ব স্থূল কদাকার দেহ উভয় স্থলেই তাঁহার সকল আশা নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। তাঁহার সাহস ছিল, বাহুবল ছিল, রণকৌশল ছিল, কিন্তু কদাকার বলিয়া তিনি সুলতানের বা দিল্লীশ্বরের সেনাদলে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে দোয়াবপ্রদেশের অভিনব মুসলমানরাজ্যে তিনি জায়গীর প্রাপ্ত হইয়া প্রতিভার পরিচয়দানের অবসর লাভ করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে মুসলমান-শাসন বিস্তৃত হইবার সময়ে জায়গীর ও সনন্দ দানের প্রথাই রাজ্য-বিস্তারের প্রধান সহায় হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ইউরোপীয়গণ যেমন অসভ্যদেশগুলি আপনাদের রাজ্য মনে করিয়া আপনাদের মধ্যে তাহার অধিকার বণ্টন করিয়া লইতেছেন, সেকালে মুসলমান সুলতানও সেইরূপ করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মদঘোরী কুতবউদ্দীনকে সমগ্র ভারতবর্ষ দান করেন। বলা বাহুল্য, তখন পর্য্যন্ত ভারতের অত্যল্প ভাগই মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কুতবউদ্দীন আবার নিজ পাত্রমিত্র, সেনাপতি বা সাহসী মুসলমান-বীরকে ভারতের নানা অংশ দান করিতে আরম্ভ করেন। বক্তিয়ার খিলিজি একজন সমরকুশল সেনাপতিরূপে পরিচিত হইবামাত্র, সম্রাট্ তাঁহাকে লাহোরে আহ্বান করিয়া, তাঁহাকে বিহার ও মুঙ্গেরের শাসন-কর্ত্তৃত্বের সনন্দ দান করিলেন। বলা বাহুল্য, বিহার বা মুঙ্গেরে তখনও মুসলমানশাসন প্রবর্ত্তিত হয় নাই।

বক্তিয়ার এইরূপে প্রথমে জায়গীর এবং পরে বিহার ও মুঙ্গেরের শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়া যুদ্ধসজ্জায় নিযুক্ত হন। সম্রাট্ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া সনন্দ না দিলে, তিনি জায়গীরদার থাকিয়াই জীবনবিসর্জ্জন করিতেন। বক্তিয়ার সনন্দলাভ করিয়া কিরূপে কতদিনে বিহারজয় করেন, মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে তাহার দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার একটি মিন্হাজকর্ত্তৃক সঙ্কলিত জনশ্রুতি; অপরটি সমসাময়িক লেখকগণের সুবিজ্ঞাত ঐতিহাসিক তথ্য। মিন্হাজের সঙ্কলিত জনশ্রুতি এদেশের জনশ্রুতি নহে; তিনি বক্তিয়ারের বিহারবিজয়ের প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে (১২৪৩ খৃষ্টাব্দে) নিজামুদ্দীন ও সামসুদ্দীন নামক বক্তিয়ারের সেনাদলভুক্ত দুই ভ্রাতার নিকট গল্প শুনিয়াছিলেন,—"বক্তিয়ার দুইশত অশ্বারোহী লইয়া দুর্গদ্বারে উপনীত হইবামাত্র বিহারজয় সুসম্পন্ন হয়।" অন্যান্য ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বিহার-জয় এরূপ অবলীলাক্রমে সম্পন্ন হয় নাই; দুই বৎসরের অবিশ্রান্ত বধ, যুদ্ধ ও লুণ্ঠনের পর বিহার বক্তিয়ারের করতলগত হইয়াছিল, এবং তাহাকে সম্পূর্ণরূপে অধিকারভুক্ত করিয়া মুসলমান-শাসন প্রবর্ত্তিত করিতে আরও এক বৎসর অতীত হইয়াছিল। তিন-বৎসরব্যাপী অসংখ্য সংগ্রামকলহের বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই; কিন্তু মুসলমানলিখিত ইতিহাসেও দেখিতে পাওয়া যায়—বিহাররক্ষার্থ লক্ষ লক্ষ লোক জীবন-বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অবশেষে তোরণ, প্রাচীর, দুর্গ, প্রাসাদ, সমস্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইলে, বিহার বিজেতার করতলগত হয়। দুইশত অশ্বারোহীর এত কার্য্য সম্পন্ন করা আরব্যোপ-ন্যাসের গল্পে শোভা পায়; ইতিহাস তাহাকে সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হইবে না।

মিন্হাজের ইতিহাসের অনুবাদক মেজর রাভার্টি ও অধ্যাপক ব্লকম্যান উভয়েই সুল-তানের সনন্দবলে বক্তিয়ারের রাজ্যবিস্তারের কথায় আস্থাস্থাপন করেন নাই। তাঁহারা বলেন,—বক্তিয়ার স্বতন্ত্রভাবেই দেশজয় করিয়াছিলেন; কেবল সুলতানের প্রজা

বলিয়া তিনি উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিয়া মৌখিক অধীনতা স্বীকার করেন। যাহা হউক, বিহারবিজয়ের পর বক্তিয়ার খিলিজির সম্বন্ধে মিন্‌হাজের গ্রন্থে আর একটি গল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়; তাহা অনেক পরবর্ত্তী মুসলমানলেখকের গ্রন্থে এবং বাঙালীর উপন্যাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়া সুপরিচিত হইয়াছে। গোলাম হোসেন উক্ত কাহিনী এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"মহম্মদ বক্তিয়ার বিহার জয় করিয়া সুলতানের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রধান-অমাত্যশ্রেণীভুক্ত হইলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বীরকীর্ত্তি ও বর্দ্ধমান সৌভাগ্যশ্রী সাম্রাজ্যের স্তম্ভতুল্য প্রধান রাজপুরুষগণেরও বিষম ঈর্ষার বিষয় হইয়া পড়িল। তাঁহারা বক্তিয়ারের সর্ব্বনাশসাধনে একমত হইলেন। একদিন রাজসভায় বক্তিয়ারের শৌর্য্য ও কার্য্যপটুতার বিস্ময়কর বিবরণ কথিত হইতেছিল, এমন সময়ে বক্তিয়ারের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ অমাত্যগণ কৌশলে তাঁহার ধ্বংসসাধনের নিমিত্ত সুলতানের নিকট একবাক্যে কহিলেন, 'মহম্মদ বক্তিয়ার স্বীয় অসীম শক্তির পরিচয়প্রদানের জন্য মত্তহস্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করেন।' কুতবউদ্দীন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— 'সত্যই কি বক্তিয়ার মনুষ্যের অসাধ্য-সাধনে ইচ্ছুক হইয়াছেন?' গৌরবলোপভয়ে মূর্খতাবশত বক্তিয়ার তাহা অস্বীকার করিতে পারিলেন না। কিন্তু পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহারই বিনাশসাধনের জন্য অমাত্যগণ এই চক্রান্ত করিয়াছেন। যাহা হউক, অতঃপর নির্দ্দিষ্টদিবসে সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ জনগণ দরবারে উপস্থিত হইলেন। এক বলবান্ মত্তহস্তীকে সাদা কুঠীতে (কস্‌রে সফেদ) উপস্থিত করা হইল। বক্তিয়ার সসজ্জ হইয়া গদাহস্তে হস্তীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাহার শুণ্ডে বিষম প্রহার করিলেন। সে আঘাতে চীৎকার করিয়া হস্তী রণভূমি ত্যাগ করিল। দর্শকগণ উচ্চৈঃ ধ্বনিতে বক্তিয়ারের বিজয়শ্রীর সম্বর্দ্ধনা করিলেন। সুলতান কুতবউদ্দীন লোকাতীত পরাক্রম দর্শন করিয়া বিস্ময় ও আনন্দের সহিত বক্তিয়ারকে বহু মহার্ঘ উপহার ও প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। সম্ভ্রান্ত রাজপুরুষগণও সম্রাটের আদেশে বক্তিয়ারকে বহু অর্থ উপহার দিতে বাধ্য হইলেন। মহম্মদ বক্তিয়ার নিজ হইতে আরও কিছু অর্থ দিয়া ঐ সকল অর্থ ও দ্রব্যাদি সমাগত জনগণকে বিতরণ করিলেন। বক্তিয়ারের বীরত্ব ও মহত্ত্ব দর্শনে কুতবউদ্দীন বিহার ও লক্ষ্ণৌতির অধিকার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে দিল্লী-অভিমুখে গমন করিলেন।"

এই কাহিনীর মূল কোথায়, তাহা এতকাল পরে নির্ণয় করা অসম্ভব। ইহার মূলে কোন সত্য থাকিলে, তাহা অতিরঞ্জিত আকারে ইতিহাসে স্থানলাভ করায়, তদ্দ্বারা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সাহস হয় না। তথাপি তর্কস্থলে বলা যাইতে পারে, সুলতান কুতবউদ্দীন বিহার ও লক্ষ্মণাবতী জয়ের ভার প্রদানের জন্য অলৌকিক বীরত্বের অপেক্ষা করিতেছিলেন; বক্তিয়ার খিলিজি সেইরূপ বীর বলিয়া পরিচয় পাইবার পর তাঁহাকে সনন্দ দান করেন। এই অনুমান সত্য

হইলে, তাহা বাঙালীর বাহুবলের ও বঙ্গবিজয়ে মুসলমানের পক্ষে অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শনের প্রয়োজন থাকা প্রকাশিত করে।

প্রকৃতপ্রস্তাবে দুই বৎসরের রণশ্রমে বিহার অধিকৃত হইলেও, দুইজন সৈনিকের অতিরঞ্জিত গল্পগুজবে মিন্‌হাজ দুইশত অশ্বারোহীর দ্বারা বিহারবিজয় সুসম্পন্ন হওয়া লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিহাসে যে অলৌকিকত্বের স্থানদান করিয়াছেন, বঙ্গ-বিজয়ের বর্ণনা করিবার সময়েও সেইরূপ সৈনিকের গল্পগুজব অবলম্বন করিয়া সপ্তদশ অশ্বারোহীর নবদ্বীপ-অধিকারের এক অসম্ভব কাহিনী ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে কতদিনে কি উপায়ে বঙ্গভূমির কোন্ অংশ অধিকার করিতে বক্তিয়ার খিলিজি কৃতকার্য্য হন, তাহার আলোচনা করিলে সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক বীরত্ব নিতান্ত গল্পগুজব বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

যে কারণেই হউক, বিহারবিজয়ের পরেই যে বক্তিয়ার বাঙ্‌লার সনন্দলাভ করেন, সে কথা মুসলমানের ইতিহাসে সর্ব্ববাদিসম্মত ঐতিহাসিক সত্যরূপে স্বীকৃত। এই সনন্দ লাভ করিবার সময়ে বঙ্গভূমি স্বাধীন; লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় সে স্বাধীন-রাজ্যের ভারতবিখ্যাত রাজধানী; তজ্জন্য বক্তিয়ারের সনন্দে নবদ্বীপের পরিবর্ত্তে লক্ষৌতী অর্থাৎ লক্ষ্মণাবতীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই লক্ষ্মণাবতী অধিকারের জন্যই সনন্দ প্রদত্ত হয়। নবদ্বীপ রাজধানী থাকিলে সনন্দে নবদ্বীপের নামই উল্লিখিত হইত।

লক্ষ্মণাবতী উত্তরবঙ্গের সুবিখ্যাত রাজধানী। তাহার পশ্চিমে মিথিলা এবং কান্যকুব্জান্তর্গত জয়চন্দ্রের কাশীরাজ্য। জয়চন্দ্রের রাজ্য ইতিপূর্ব্বে মুসলমানের অধিকারভুক্ত হওয়ায়, মিথিলার সীমা পর্য্যন্ত মুসলমানসেনার আক্রমণপথ পরিষ্কৃত হইয়াছিল। বিহার এবং মুঙ্গের মুসলমানের করতলগত হওয়ায়, লক্ষ্মণাবতীর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী স্থানে সেনাসমাবেশ করিবারও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। নবদ্বীপ-আক্রমণের পক্ষে এরূপ সুযোগ বর্ত্তমান ছিল না। তাহা বাগ্‌ড়ীর অন্তর্গত বলিয়া, উত্তরে লক্ষ্মণাবতী ও পশ্চিমে রাঢ়রাজ্য দ্বারা স্বভাবতই সুরক্ষিত ছিল। প্রথমে উত্তরবঙ্গ বা পশ্চিমবঙ্গ অধিকার না করিলে, নবদ্বীপ আক্রমণ ও অধিকার করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং বঙ্গভূমির মধ্যে প্রথমে নবদ্বীপ মুসলমান-কর্ত্তৃক সহসা আক্রান্ত হওয়ার কথা নিতান্তই রচা-কথা। বক্তিয়ার জীবিত থাকিতে রাঢ় অধিকার করিতে না পারায়, তাঁহার দ্বারা নবদ্বীপ অধিকৃত হওয়ার কাহিনীও নিতান্ত অবিশ্বাসজনক বলিয়া বোধ হয়। নবদ্বীপে রাজধানী থাকা সত্য হইলে, মুসলমানবীর বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপেই রাজধানী স্থাপন করিতেন। কিন্তু মুসলমানের ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়,—লক্ষ্মণাবতীতেই মুসলমানের প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অতঃপর বক্তিয়ার খিলিজি যে যে স্থানে যুদ্ধকলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন, সে সমস্তই উত্তরবঙ্গে; মুসলমানগণ দেশজয় করিয়া পাত্রমিত্র ও সেনানায়কগণকে জায়গীর দিয়া দেশ শাসন করিতেন; উত্তরবঙ্গেই এইরূপ

অতি পুরাতন মুসলমান জায়গীরের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রদেশ প্রথমে মুসলমানের করতলগত হইলেও, সহসা সমস্ত স্থান অবলীলাক্রমে অধিকৃত হয় নাই; দ্বাদশ বৎসরের আক্রমণ ও রণকোলাহলেও উত্তর ও পূর্ব্বাংশ স্বাধীন থাকিয়া বক্তিয়ারের অলৌকিক শৌর্য্যবীর্য্য প্রতিহত করিতে সক্ষম হইয়াছিল। মুসলমানের ইতিহাস অবলম্বন করিয়া এখনও তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলন করা যাইতে পারে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সার সত্যের আলোচনা।

জ্ঞেয়স্থানের কেন্দ্র।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে আছি'র সহিত আছে'র ঐক্য এবং তাহার অন্তর্ভূত জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের এবং কর্ত্তার সহিত কর্ম্মের ঐক্য—এই সকল ঐক্যের বিষয় আলোচনা করা হইয়াছে; এবং বিগত প্রবন্ধে ঐ সকল ঐক্যের গোড়া'র বন্ধনগ্রন্থি কোন্‌খানটিতে, তাহার ঠিকানা নির্দ্দেশ করিবার অভিপ্রায়ে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত ঐক্যের প্রতি পাঠকের অনুসন্ধানদৃষ্টি আকর্ষণ করা হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া সেই যে এক সর্ব্বতঃপ্রসারিত অখণ্ডনীয় ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্বত্র ওতপ্রোত, তাহার নামই বা কি, আর তাহা পদার্থটাই বা কি?

উপরি-উক্ত ঐক্যের একটা নাম দিতে হইলে "সার্ব্বাত্মিক ঐক্য" এই নামটি আপাততঃ চলিতে পারে। সার্ব্বাত্মিক ঐক্য কি? না, ইংরাজিতে যাহাকে বলে Organic Unity.

উচ্চশ্রেণীর জীবশরীরে, বিশেষত মনুষ্য-শরীরে, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, নবদ্বার-পুরের ঘাটিতে ঘাটিতে মস্তিষ্কের সন্তান-সন্ততির পাহারা বসানো রহিয়াছে। তার সাক্ষী বাহুখণ্ড দেখ, দেখিবে—এক প্রহরী বাহুর মূলগ্রন্থিতে, এক প্রহরী কনুইস্থানে, এক প্রহরী মণিবন্ধে, পাঁচ-পাঁচ প্রহরী পাঁচ-পাঁচ অঙ্গুলিমূলে—নির্নিমেষনয়নে জাগিতেছে। এক-এক প্রহরী এক-একটি ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ড। আনখাগ্র বাহুখণ্ডে এ যেমন দেখা গেল—আপাদমস্তক সর্ব্ব-শরীরেই তেমনি। মস্তকের মূলতম মস্তিষ্ক হইতে বাহির হইয়া মেরুদণ্ডের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কপিণ্ডের মধ্য দিয়া বিংশতি অঙ্গুলির বিংশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মস্তিষ্কনিকর পর্য্যন্ত যে একটি নিরবচ্ছিন্ন অখণ্ড ঐক্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহারই নাম দেওয়া হইল সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। মস্তকের সহস্রদল পদ্মে সে ঐক্য যোগাসনে-বিরাজমান

ঋষি তপোধন। হৃৎপদ্মে সে ঐক্য সিংহাসনে-বিরাজমান ক্ষত্রিয় মহারাজ। নাভিপদ্মে সে ঐক্য আহরণ-ব্যাহরণ (আমদানি-রপ্তানি) প্রভৃতি বাণিজ্যকার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক বৈশ্য মহাজন। সে ঐক্য—রাজা, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী; রথী, সারথি, পদাতিক; যোগী, ভোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী; সমস্তই একাধারে। সে ঐক্যের চক্ষু সকল স্থানেই—হস্ত সকল কাজেই। পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে যদি আঘাত লাগে, তবে সে ঐক্যের তৎক্ষণাৎ তাহা গোচরে আসিবে; হস্তে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই; বক্ষে যদি আঘাত লাগে, তাহা হইলেও তাই। তেমনি আবার, হস্ত হইতে যদি অক্ষররাজি বাহির হয়, তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, তাহা শরীরের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য হইতেই বাহির হইতেছে; পদ হইতে যদি ভ্রমণকার্য্য বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই; কণ্ঠ হইতে যদি গীতধ্বনি বাহির হয়, তাহা হইলেও তাই। এই যে এক সার্ব্বাত্মিক ঐক্য, যাহা শরীরের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রত্যেকের অভাব সমস্তকে দিয়া এবং সমস্তের অভাব প্রত্যেককে দিয়া যুগপৎ পূরণ করাইয়া লইতেছে—এ ঐক্য কি কেবল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেই আছে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে নাই? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি নাই—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিল তবে কোথা দিয়া? যাহাকে বলা যাইতেছে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, তাহা আর-তো কিছু না—কেবল বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের একস্থানের একটা শাখা। শাখাতে রসের সঞ্চার হয় কোথা হইতে? অবশ্য মূল হইতে।

তুমি হয় তো বলিবে যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মস্তক হইতে পদপ্রান্ত বড়-জোর সাত-হাত দূরে অবস্থিতি করে; কিন্তু বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের নভস্তল হইতে রসাতল কোটি-কোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে। সাত-হাত স্থানের অবকাশ-রন্ধ্র-নিকর অর্থাৎ ঝাঁঝ্‌রি ঐক্যের প্রলেপদ্বারা ভরাট্ করিবার পক্ষে বিশেষ কোনো বাধা দৃষ্ট হয় না, কিন্তু কোটি যোজনের ব্যবধান পূরণ করা সোজা কথা নহে। কোটি যোজনের দুই পারের দুই বস্তুকে আঁকড়িয়া পাইতে হইলে—তাহা যিনি করিবেন, তাঁহার দৃষ্টি স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল ভেদ করিতে পারিবার মতো তীক্ষ্ণ হওয়া চাই; তাঁহার বাহুদ্বয় স্বর্গমর্ত্ত্যপাতাল পরিবেষ্টন করিতে পারিবার মতো দীর্ঘ হওয়া চাই। ইহার উত্তর এই যে, কিছুই চাই না—কেবল চক্ষু-দুটা উন্মীলন করা চাই। সবিতা দেব কি শতকোটিযোজন দূর হইতে পৃথিবীকে অবলোকন করিতেছেন না? শতকোটি-যোজন দূরে থাকিয়াও পৃথিবীর হস্তধারণ করিয়া রাশিচক্রে দৌড়াদৌড়ি করাইতেছেন না?

পিপীলিকার মস্তক এবং পদতলের মধ্যে যেরূপ অল্প ব্যবধান, তাহাতে পিপীলিকা বলিলেও বলিতে পারে যে, হস্তীর পদাঙ্গুলি হস্তীর ললাটশিখর হইতে কোটিযোজন দূরে অবস্থিতি করে, সুতরাং দুয়ের মধ্যে কোনোপ্রকার ঐক্যের বন্ধন স্থান পাইতে পারে না। তবে কিনা—পিপীলিকার যুক্তি পিপীলিকাকেই শোভা পায়—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতকে শোভা পায় না। কেন না, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের নিকটে একথা গোপন থাকিতে পারে না যে, হস্তীর মস্তক এবং পদের মধ্যে বিশাল ব্যবধান সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে ঐক্যের

বন্ধন যথেষ্ট দৃঢ়, আর, পিপীলিকার মস্তক এবং উদরের মধ্যে অতীব অল্প ব্যবধান সত্ত্বেও দুয়ের মধ্যে বন্ধনের আঁট খুবই আল্‌গা।

যদি এমন হয় যে, একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্য হইতে দশ ভাই দশ দিকে ছট্‌কিয়া পড়িলে ভ্রাতাদিগের কাহারো তাহা বড়-একটা গায়ে লাগে না, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনি বড্ড আল্‌গা। কিন্তু যদি এমন হয় যে, দশ ভাইয়ের মধ্য হইতে এক ভাই পৃথক্ হইলে তাহার তো মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়ই, তা ছাড়া অপর নয় ভাইয়ের প্রত্যেকেরই প্রাণে আঘাত লাগে, তবে তাহাতে প্রমাণ হয় এই যে, ভ্রাতাদিগের মধ্যে ঐক্যের বাঁধুনি অত্যন্ত সুদৃঢ়। অতএব এটা যখন সকলেরই দেখা কথা যে, পিপীলিকার কিংবা বোল্‌তার শরীর মধ্যদেশে দ্বিখণ্ডিত হইলে তাহার পূর্ব্বার্দ্ধ এবং পশ্চার্দ্ধ উভয় খণ্ডই মিনিট-দশেক ধরিয়া জীবিত থাকে; পক্ষান্তরে, হস্তীর সেরূপ হইলে উভয় খণ্ডেরই যুগপৎ প্রাণবিয়োগ হয়; তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের বন্ধনের আঁট পিপীলিকাদেহে বড়ই আল্‌গা, হস্তিদেহে রীতিমত দৃঢ়। তা ছাড়া, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে এটা একটা নির্ঘাত বেদবাক্য যে, পৃথিবী হইতে সূর্য্য শতকোটি-যোজন দূরে অবস্থিতি করে, ইহা সত্য হইলেও সূর্য্যের জীবনই পৃথিবীর জীবন, সূর্য্যের আলোকই পৃথিবীর আলোক, সূর্য্যের বলই পৃথিবীর বল। এইজন্য বলিতেছি যে, সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের নিকটে স্থানাস্থান নাই, কালাকাল নাই, পাত্রাপাত্র নাই, দূর-নিকট নাই, বড়-ছোটো নাই। কিন্তু কি হিসাবে নাই? সত্তা-হিসাবেই নাই। শক্তি-হিসাবে—স্থানাস্থানও আছে, কালাকালও আছে, পাত্রাপাত্রও আছে, দূর-নিকটও আছে, বড়-ছোটোও আছে। তার সাক্ষী—সত্তা-হিসাবে (অর্থাৎ শুদ্ধকেবল 'অস্তি-নাস্তি' বিবেচনায়) শরীরের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য মস্তকের উচ্চ শিখরেও যেমন—পদের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতেও তেমনি—উভয় স্থানেই সমান। কিন্তু শক্তিহিসাবে (অর্থাৎ শক্তির কর্ত্তৃস্থানই বা কোথায় এবং কর্ম্মস্থানই বা কোথায়; কে চালক, কে চালিত; এইরূপ চাল্য-চালক-বিবেচনায়) শরীরের মধ্যে মস্তকই সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন। সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া সার্ব্বাত্মিক ঐক্য একই ঐক্য—এ কথা খুবই সত্য; কিন্তু এ কথাও তেমনিই সত্য যে, সেই একই ঐক্য মস্তকের উচ্চমঞ্চে সারথিরূপে অধ্যাসীন রহিয়াছে এবং পদযুগে অশ্বযুগলরূপে যোজিত রহিয়াছে। ফলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপনাকে এক বলিয়া ভাবনা করিবার সময় আমরা মস্তিষ্কমণ্ডলেই মনঃসমাধান করি—পদযুগে মনঃসমাধান করি না।

মস্তিষ্কমণ্ডল যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন, দৃশ্যমান সূর্য্য তেমনি সৌরজগতের সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন; আদিসূর্য্য তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের প্রধান আসন। এইজন্য সৌরজগৎকে এক বলিয়া ভাবনা করিতে হইলে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি প্রধানত লক্ষ্যসমাধান করা আবশ্যক হয়;—বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা করেনও তাই। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা বলেন যে, সুদূর

পুরাকালে সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া সূর্য্য একাকী অবস্থিতি করিতেছিলেন; কাল-ক্রমে সূর্য্য হইতে গ্রহগণ এবং তাহাদের এক ভগ্নী আমাদের এই পৃথিবী মাতা প্রসূত হইলেন। সূর্য্য হইতে পৃথিব্যাদি প্রসূত হইয়াছে বলিয়া সূর্য্যের আর-এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা।

এ তো গেল পুরাণো কালের পুরাণো কথা। তা ছাড়া, বর্ত্তমানে আমাদের চক্ষের সম্মুখে কি হইতেছে— সে কথাটির ও খবর রাখা চাই; কেন না, সেইটিই কাজের কথা। বর্ত্তমানের সৌর-সমাচার বিজ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে বিজ্ঞান তাঁহার তান্ত্রিকী ভাষায়—এক-প্রকার ছেঁদো কথায়—যে-সকল অদ্ভুত রহস্য-কাহিনী বলিতে আরম্ভ করেন, তাহা বিধিমত টীকা এবং ভাষ্যের দ্যোতনা ব্যতিরেকে বুঝিতে পারা সুকঠিন। তাহার মধ্যে প্রধান একটি রহস্যকথা এই যে, খনিগর্ত্তস্থিত অঙ্গারের ভিতরে সূর্য্যরশ্মি পুঞ্জীভূত রহিয়াছে;—অঙ্গারকে যখনি প্রজ্বালিত করিয়া কাজে লাগানো যায়, তখনি তাহার সেই বহু-পুরাতনকালের সঞ্চিত গুপ্তধন অগ্নি-আকারে প্রকাশ্যে বাহির হইয়া পড়ে। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এইখানেই থামিতেছে না; অধিকন্তু আমরা জানিতে চাই এই যে, সূর্য্য-রশ্মি কি কেবল অঙ্গারের ভিতরেই সংগোপিত রহিয়াছে—আর কোথাও সংগোপিত নাই?

বিজ্ঞান বলেন এই যে, সকল বস্তুরই অন্তঃপুরে তড়িতের প্রকৃতিপুরুষাত্মিকা যুগলমূর্ত্তি (Negative এবং Positive Electricity) একত্রে নিলীন রহিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে বহিঃক্ষেত্রে বাহির হইবার সময় জোড় ভাঙিয়া দোঁহে দুই দিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়ায়। তাহার পরে কোনো-প্রকার সঙ্কীর্ণ ব্যবধানের দুই পারে দাঁড়াইয়া দোঁহার সহিত দোঁহার যখন চোখোচোখি হয়, তখন হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, এবং সেই প্রজ্বলিত হুতাশনে যুগল-তড়িৎ একীভূত হইয়া যায়। তার সাক্ষী—আকাশের বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের উদ্ভাসনে নর-তড়িৎ এবং নারী-তড়িৎ কেমন আগ্রহের সহিত বিচ্ছেদের বাঁধ ভাঙিয়া-ফেলিয়া একত্র সম্মিলিত হয়, আর, কেমন তেজের সহিত উভয়ের অন্তর্নিগূঢ় অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। ফলে, সকল বস্তুতেই যুগল তড়িৎ একত্রে নিলীন রহিয়াছে বলাও যা, আর, সকল বস্তুতে অগ্নি নিগূঢ় রহিয়াছে বলাও তা—একই কথা।* এই যে অগ্নি, যাহা সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে নিগূঢ় রহিয়াছে, তাহা পদার্থটা আর-কিছু না—সূর্য্যেরই প্রভাবাংশ। অগ্নি একপ্রকার পৃথিবীস্থ সূর্য্য। তবেই হইতেছে যে, সুদূর পুরা-কালেও যেমন, এখনো তেমনি, সূর্য্যের প্রভা-বাগ্নি সমস্ত সৌরজগৎ ব্যাপিয়া জলে-স্থলে-অনলে-অনিলে সর্ব্বত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনু-প্রবিষ্ট রহিয়াছে। আসন গুটানো থাকিলেও আসন, বিছানো থাকিলেও আসন; তেমনি, সৌরজগৎ সূর্য্যে বিলীন থাকিলেও

* শক্তির বহুরূপিতা (Transformation of forces) বিজ্ঞানের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত। এক অগ্নি—উত্তাপ, আলোক এবং তড়িৎ, তিনের একাধার। বস্তু-পক্ষে তিনের মধ্যে প্রভেদ নাই।

তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব, সূর্য্য হইতে ছট্‌কিয়া বাহির হইলেও তাহা সূর্য্যেরই প্রভাব।

ছট্‌কিয়া বাহির হওয়ার নামই প্রকটিত হওয়া বা প্রকাশিত হওয়া বা আবির্ভূত হওয়া; আর, আবির্ভূতির প্রকরণ-পদ্ধতি হ'চ্চে দ্বন্দ্বের প্রতিযোগ। জল ডাঙার প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; ডাঙা জলের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; বনকানন-গিরি-নদী-সাগরের বিচিত্র বর্ণসকল পরস্পরের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। বর্ণবৈচিত্র্য আলোকের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়; আলোকও তেমনি আবার বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগে প্রকাশিত হয়। গোড়া'র প্রতিযোগ হ'চ্চে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের প্রতিযোগ, অথবা, আলোক এবং অন্ধকারের প্রতিযোগ, আর, তাহার আনুষঙ্গিক আর-দুইটি অবান্তরশ্রেণীর প্রতিযোগ হচ্চে—(১) আলোক এবং বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রতিযোগ; (২) অন্ধকার এবং বর্ণবৈচিত্র্যের প্রতিযোগ; নিম্নে দেখ :—

(১) প্রতিযোগ

আলোক বর্ণবৈচিত্র্য অন্ধকার

(২) প্রতিযোগ (৩) প্রতিযোগ

প্রতিযোগের মুখ্য প্রয়োজনীয়তা প্রকাশেরই জন্য। কিন্তু প্রকাশের সঙ্গে আনন্দের যোগ থাকা চাই, তা নহিলে প্রকাশের সমুচিত সার্থকতা হয় না। প্রতিযোগের পথ দিয়া যেমন প্রকাশ ফুটিয়া বাহির হয়, সংযোগের পথ দিয়া তেমনি আনন্দ ফুটিয়া বাহির হয়। শাস্ত্রের মতানুসারে প্রকাশও যেমন—আনন্দও তেমনি, দুইই সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণ বলিতে সত্তা, প্রকাশ এবং আনন্দ, তিনই একসঙ্গে বুঝায়। সত্ত্বগুণ যে সত্তাবাচক, তাহা তাহার গায়ে লেখা রহিয়াছে। কবিত্ব এবং কবিতা যেমন একই কথা, সত্ত্ব এবং সত্তাও তেমনি। তা ছাড়া, সত্ত্বগুণের মুখ্য ধর্ম্ম দুইটি; একটি হ'চ্চে প্রকাশ এবং আর-একটি হ'চ্চে আনন্দ। খাপছাড়া রকমের প্রকাশে আনন্দ হয় না, চৌকোষ রকমের প্রকাশেই আনন্দ হয়। অন্ধকার এবং আলোকের প্রতিযোগ মাত্রাতীত হইলে একদিকে আলোকের প্রকাশ অতিশয় তীব্রভাব ধারণ করে, আর-এক দিকে অন্ধকারের প্রকাশ অতিশয় ভীষণভাব ধারণ করে। তাহাতে দর্শকের মন ব্যথিত হয়। প্রতিযোগ দর্শকের চক্ষে-অঙ্গুলি দিয়া দৃশ্য-বস্তুসকলের প্রভেদলক্ষণ দেখাইয়া দ্যায়, আর সেই সঙ্গে প্রত্যেকের বিশেষত্ব ফুটাইয়া তোলে। সংযোগ সকলের মধ্যে সদ্ভাব, সামঞ্জস্য এবং শান্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেকের অভাব সকলকে দিয়া এবং সকলের অভাব প্রত্যেককে দিয়া পূরণ করাইয়া লয়। আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের সুব্যবস্থামতো সংযোগ হইলে, বর্ণবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া অন্ধকার হইতে আলোকে এবং আলোক হইতে অন্ধকারে ওঠা-নাবার পথ সুগম এবং সুখাবহ হইয়া যায়, আর, সেই-গতিকে তিনের (কিনা আলোক, বর্ণবৈচিত্র্য এবং অন্ধকারের) প্রকাশও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়, আর, প্রকাশের মধ্য দিয়া আনন্দও ফুটিয়া বাহির হইতে পথ পায়। আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে—প্রকাশ এবং অপ্রকাশের মধ্যে—প্রতিযোগের

উপলব্ধি খুবই সহজ; কিন্তু দুয়ের মধ্যে সংযোগের উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ। আলোক এবং অন্ধকার, অথবা অব্যক্ত এবং ব্যক্ত, দুইকে এক করিয়া দ্যাখা-ও যা, আর, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় দুইকে এক করিয়া দ্যাখা-ও তা—একই কথা। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়কে এক দৃষ্টিতে দ্যাখা প্রথম উদ্যমেই সাধকের পক্ষে সম্ভাবনীয় নহে; তাহার পূর্ব্বে জ্ঞেয়-জগৎকে একীভূত করিয়া দেখিতে শেখা চাই। প্রথমে আত্মার জ্ঞেয়স্থানে (অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে) সার্ব্বাত্মিক একত্বের দর্শন পাওয়া চাই; তাহা হইলেই বৃক্ষানলে বৃক্ষানল মিশিয়া যেমন দাবানল হইয়া উঠে, তেমনি সম্মুখে বিরাজমান জ্ঞেয়স্থানের একত্ব এবং পশ্চাতে লুক্কায়িত জ্ঞাতৃস্থানের একত্ব, এই দুই একত্ব একত্রে মিলিয়া আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ একত্ব দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। তাই বলিতেছি যে, প্রথম উপক্রমে আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থানে বা সমষ্টিস্থানে বা হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক। শেষের এই কথাগুলি অতীব সংক্ষেপে বলিলাম; বারান্তরে তাহা সবিস্তরে পর্য্যালোচনা করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিশু।

তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া?
কোমল গায়ে দিল পরায়ে
রঙিন্ আঙিয়া!
বিহান-বেলা আঙিনা-তলে
এসেছ তুমি কি খেলাছলে,
চরণ দুটি চলিতে ছুটি
পড়িছে ভাঙিয়া!
তোমার কটিতটের ধটি
কে দিল রাঙিয়া?

কিসের সুখে সহাসমুখে
নাচিছ বাছনি!

দুয়ারপাশে জননী হাসে
হেরিয়া নাচনি !
তাথেই থেই তালির সাথে
কাঁকণ বাজে মায়ের হাতে,
রাখালবেশে ধরেছ হেসে
বেণুর পাঁচনি !
কিসের সুখে সহাসমুখে
নাচিছ বাছনি !

ভিখারি ওরে, অমন করে'
সরম ভুলিয়া
মাগিস্ কিবা মায়ের গ্রীবা
আঁকড়ি' ঝুলিয়া !
ওরেরে লোভি, ভুবনখানি
গগন হতে উপাড়ি আনি
ভরিয়া দুটি ললিত মুঠি
দিব কি তুলিয়া ?
কি চাস্ ওরে অমন করে'
সরম ভুলিয়া ?

নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।
তপন-শশী হেরিছে বসি
তোমার সাজনা।
ঘুমাও যবে মায়ের বুকে
আকাশ চেয়ে রহে ও মুখে,
জাগিলে পরে প্রভাত করে
নয়ন-মাজনা !
নিখিল শোনে আকুল মনে
নূপুর-বাজনা।

ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢলানী,

গায়ের-পরে-কোমল-করে-
পরশ-বুলানী!
মায়ের প্রাণে তোমারি লাগি
জগৎ-মাতা রয়েছে জাগি,
ভুবনমাঝে নিয়ত রাজে
ভুবন-ভুলানী!
ঘুমের বুড়ি আসিছে উড়ি
নয়ন-ঢুলানী!

ঘুষাঘুষি।

গত বৈশাখমাসের বঙ্গদর্শনে 'রাজকুটুম্ব'-শীর্ষক প্রবন্ধে নিয়ুইণ্ডিয়ায় প্রকাশিত কোন রচনার সমালোচনা করা হইয়াছিল। নিয়ু-ইণ্ডিয়ার সম্পাদকমহাশয় আমাদিগকে ভুল বুঝিয়াছেন। তিনি স্থির করিয়াছেন, এক গালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দেওয়া যদি-বা আমাদের মত না হয়, অন্তত অশ্রুজল-প্রবাহে আহতগণ্ডের আঘাতবেদনার উপশম-চেষ্টাই আমাদের মতে শ্রেয়।

ইংরাজের ঘুষিঘাষা খাইয়া নাকিস্থরে নালিশ করা এদেশে কিছুকাল পূর্ব্বে অত্যন্ত অধিকমাত্রায় প্রচলিত ছিল। একটা কাককে ঢেলা মারিলে পৃথিবীসুদ্ধ কাক যেমন চীৎকার করিয়া মরে, দেশি লোকের মার খাইবার খবরে আমাদের খবরের কাগজগুলি তেম্‌নি করিয়া অবিশ্রাম বিলাপপরিতাপে আকাশ বিদীর্ণ করিত।

আমরাই সর্ব্বপ্রথমে 'সাধনা'পত্রিকায় এই নাকিকান্নার বিরুদ্ধে বারংবার আপত্তি উত্থাপন করিয়াছি—এবং কথঞ্চিৎ ফললাভ করিয়াছি, তাহাও দেখা যাইতেছে। আজ হঠাৎ আত্মপ্রতিবাদের যে কোন কারণ ঘটিয়াছে, তাহা বোধ হয় না।

ছবিতে যেমন চৌকা জিনিষের চারিটা পাশই একসঙ্গে দেখান যায় না, তেম্‌নি প্রবন্ধেও এক সঙ্গে একটা বিষয়ের একটি, বড় জোর, দুইটি দিক্‌ দেখান চলে। রাজ-কুটুম্ব প্রবন্ধেও আমাদের বক্তব্য বিষয় খুব ফলাও নহে। নিয়ুইণ্ডিয়ার সম্পাদকমহা-শয় যখন ভুল বুঝিয়াছেন, তখন সম্ভবত আমা-দের রচনায় কোন ত্রুটি থাকিতে পারে। এবারে ছোট করিয়া এবং স্পষ্ট করিয়া বলি-বার চেষ্টা করিব।

ভারতবর্ষে যে মারে এবং যে মার খায়, এই দুই পক্ষের অবস্থা লইয়া আমরা কিঞ্চিৎ তত্ত্বালোচনা করিয়াছিলাম মাত্র। আমরা কোন পক্ষকেই কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কোন উপদেশ দিই নাই।

যে লোক জলে পড়িয়াছে, ডাঙা হইতে তাহাকে ঢিল ছুঁড়িয়া মারা সহজ। অপরপক্ষের সে মার ফিরাইয়া দেওয়া শক্ত। এরূপ স্থলে কোন্ পক্ষকে কাপুরুষ বলিব? যে মারে, না যে মার ফিরাইয়া দেয় না?

ইংরাজের পক্ষে ভারতবর্ষীয়কে মারা নিতান্ত সহজ—কেবল তাহার গায়ে জোর আছে বলিয়া যে, তাহা নহে। সেও একটা কারণ বটে, কিন্তু সে কারণকে উপেক্ষা করা যাইতে পারে। তাহার বাহুবল বেশি, কিন্তু তাহার পশ্চাতের বল আরো অনেক বেশি। তাহার দৃষ্টশক্তির সঙ্গে লড়াই চলে, কিন্তু তাহার অদৃষ্টশক্তি অত্যন্ত প্রবল। আমি যেমন একটি মানুষ, সে-ও যদি তেম্নি একটি মানুষমাত্র হইত, তবে আমরা কতকটা সমকক্ষ হইতাম। কিন্তু এস্থলে আমি একটি ব্যক্তিমাত্র, আর সে ইংরাজ, সে রাজশক্তি। বিচারকালে, মানুষ বলিয়া আমার বিচার হইবে, আর তাহার বিচার হইবে ইংরাজ বলিয়া।

আর, আমি যখন ইংরাজকে মারি, তখন বিচারক সেটাকে এই বলিয়া দেখে যে, ভারতবর্ষের রাজশক্তিকে আমি আঘাত করিলাম—ইংরাজের প্রেষ্টিজ্‌কে আমি ক্ষুণ্ণ করিলাম—অতএব সামান্য আঘাতকারী বলিয়া আমার বিচার হয় না।

আমাদের মধ্যে এই গুরুতর অসমকক্ষতা আছে বলিয়াই যে মার খায়, তাহার চেয়ে যে মারে, সেই কাপুরুষ বেশি। এই কাপুরুষতার জন্য ইংরাজ আঘাতকারী বিচারে নিষ্কৃতি পাইয়াও যদি স্বজাতির কাছে ধিক্কারলাভ করিত, তাহা হইলে তাহাতেও আমরা একটু বল পাইতাম। কিন্তু দেখিতে পাই, উল্‌টা তাহারা বেশি করিয়া সোহাগ পাইয়া থাকে। তাহাদের জন্য চাঁদা ওঠে, স্বজাতীয় কাগজে আহা-উহুর অন্ত থাকে না। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ায় এইরূপ কাপুরুষতার জন্য কেবল প্রকাশ্যে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ দেওয়া হয় না, এই পর্য্যন্ত!

সম্প্রতি একজন দেশি লোককে খুন করিয়া মার্টিন বলিয়া একজন ইংরাজের দ্বিতীয়বার বিচারে তিনবৎসর জেল হইয়াছে। ইহার পর হইতে ইংলিশম্যান্ প্রভৃতি কাগজে কিরূপ আতঙ্কের আর্ত্তনাদ উঠিয়াছে, তাহার নিম্নলিখিত নমুনাটি কৌতুকজনক:—

There are some things that foreign Governments, and even Native States in India, manage better than we do; one of these is the protection of their own kith and kin, and the maintenance of that prestige so necessary for upholding constituted authority. To the disinterested observer in India, it seems that the white man is becoming very much discounted under the ægis of the British "Raj." Time was when the Britisher, as conqueror and ruler of this land, enjoyed certain rights and privileges, and one of these was his right to be tried by jury. Quite recently we have had the spectacle of the unanimous verdicts of juries, acquitting Europeans, charged with offences triable by these tribunals, set aside, not because there was any outcry against such acquittals, or on the application of the prosecution, but on appeal by the Government against the acquittal. To quote one specific instance, we may refer to the trial of Mr. Rose,

of Dulu Tea Estate, Cachar. The relations between Europeans and natives are becoming acutely antagonistic, and this recial gulf is being widened by the violent writings of the native press. The time has arrived to look into this question a little more closely. The unprovoked assaults on Europeans, especially soldiers, are becoming increasingly frequent. Europeans are insulted, abused and jeered at by the lowest type of natives and if they retaliate, they are set upon by a mob. If the European gets badly mauled, nothing is done, no one cares, but if in the brawl he happens to seriously hurt one of his numerous assailants, in the exercise of his right of self-defence, he is tried for his life and liberty. This we say is one-sided and it behoves the Government to look a little deeper into the causes at work that bring about these frequent conflicts between Europeans and natives.

দেথ, এই একটি সামান্ত ঘটনায় ইংলিশ্‌ম্যান্ কম্পান্বিত। অন্যায় করিবার অপ্রতিহত ক্ষমতা যদি কোন উপায়ে একটু খর্ব্ব হয়, তবে কি আতঙ্কের বিষয়! ইহা হইতে এই প্রমাণ হয় যে, এদেশে ইংরাজ অবিচারের বলেই আপনাকে বলী মনে করে। সেই বলের পশ্চাতে নিরাপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাহারা অত্যাচার করিবার সহজ স্বত্বকে চিরস্থায়ী করিতে চাহে। করিতে পারে করুক্—কিন্তু ইহার পরে ভীরুতার অপবাদ আমাদিগকে দেওয়া আর চলে না।

ইংরাজ ও ভারতবর্ষীয়ের মধ্যে অপক্ষপাত বিচারে “কব্বরস্” ও “রুলর্”দের যে প্রেষ্টিজের হানি হয়, এ আশঙ্কা এ দেশের সাধারণ ইংরাজের মনে জাগিয়া আছে—জজ্ এবং জুরি নিতান্ত অসাধারণ না হইলে ইহার ব্যতিক্রম হয় না। অপক্ষপাতে সুবিচার করিতে যাহারা ভয় করে, তাহারা একদিকে আমাদের পক্ষে ভয়ানক, তেম্নি আর একদিকে তাহাদের এই ভীরুতাই আমাদের কাছে তাহাদের দুর্ব্বলতা প্রতিপন্ন করে। আমাদের কাছে ইহাতে তাহাদের মর্য্যাদা কমিয়া গেছে। এখন আমরা ইংরাজকে ঘরে-ঘরে এবং মনে-মনে খাট করিতেছি। পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধভক্তি একসময়ে আমাদিগকে যেরূপ সম্পূর্ণ অভিভূত করিয়া দিয়াছিল, এখন আমরা ক্রমশই তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতেছি। আমাদের দেশের চিরন্তন ধর্ম্মনীতির যে আদর্শ, তাহা প্রত্যহ আমাদের কাছে উজ্জ্বলতর হইয়া আসিতেছে। আমরা পাশ্চাত্য বর্ব্বরতার নগ্নমূর্ত্তি যতই দেখিতেছি, ততই আশ্রয়লাভের জন্য আমাদের স্বদেশীয় কুলায়ের মধ্যেই একেএকে ফিরিয়া আসিবার উপক্রম করিতেছি। এইরূপে আমাদের অপমানের মধ্য দিয়াও আত্মসম্মানের পথ কিরূপে উদ্ঘাটিত হইয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার আভাস ছিল।

আর একটি কথা ছিল, বোধ হয় “নিয়ু-ইণ্ডিয়া”সম্পাদকমহাশয় সেইটেতেই আপত্তি করিয়াছেন। আমি বলিয়াছিলাম, আমাদের দেশে একান্নবর্ত্তি-পরিবার-প্রথা এমন যে, বাল্যকাল হইতে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে বিরোধের অপেক্ষা মিলনের জন্যই প্রস্তুত করে। আমাদিগকে আত্মত্যাগ এবং ধৈর্য্যই শিক্ষা দিতে থাকে। আমরা যদি ক্ষমার

দীক্ষিত না হই, তবে এতগুলি লোকের একত্রে থাকা অসম্ভব হয়। অতএব আমরা যে খপ্ করিয়া কাহারো নাক-চোখের উপর ঘুষি মারিতে, বা ভূপতিত ব্যক্তির মুখের উপর বা রাগ করিয়া কাহারো তলপেটে উপর্য্যুপরি লাথি মারিতে পারি না, তাহার কারণ আমাদের সাহসের অভাব নহে—তাহার প্রধান কারণ, আমাদের দেশের সামাজিক আদর্শে আমাদিগকে নিরীহ করিয়াছে। ইংরাজ কথঞ্চিৎ পরিহাসের ভঙ্গীতে আমাদিগকে "mild Hindu" বলিয়া থাকে—বস্তুতই আমরা মাইল্ড্ হিন্দু। ইহাতে আমাদের অসুবিধা ঘটিতেছে, তাহা দেখিতেছি এবং এখন বর্ত্তমান অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য, তাহাও বিচার্য্য—কিন্তু মাইল্ড্ বলিয়া আমাদের লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিবার কথা নহে। ভারতবাসী মৃত্যুকে ভয় করে বলিয়া যে কাহাকেও আক্রমণ করে না, তাহা নহে—বোয়ারযুদ্ধে ভারতবর্ষীয় ডুলিবাহকেরাও দেখাইয়াছে যে, তাহারা বিনা উত্তেজনাতেও অবিচলিতভাবে মৃত্যুর মুখের সম্মুখে আপনার কাজ করিয়া যাইতে পারে—* কিন্তু তাহার ধর্ম্ম, তাহার সমাজ, তাহার হিংস্রপ্রবৃত্তি লোপ করিয়া দিয়াছে—এতদূর করিয়াছে যে, তাহাতে তাহার স্বার্থহানি ও অসুবিধা ঘটে এবং তাহার মানহানি ঘটিতেছে। এই নিরীহতাকে যদি তিরস্কার করিতে হয়, তবে ভীরুতাকে যে ভাষায় করিবে, ইহাকেও কি সেই ভাষায় করিবে ?

যাহাই হউক্, ইংরাজের মার খাইয়া মার ফিরাইয়া দেওয়া আমাদের পক্ষে কি কি কারণে সহজ নহে, "রাজকুটুম্ব" প্রবন্ধে তাহারই আলোচনার চেষ্টা করিয়াছিলাম। ফিরাইয়া দেওয়া উচিত কি না, সে কথা তুলি নাই। কর্ত্তব্য দুঃসাধ্য হইলেও কর্ত্তব্য—বরঞ্চ সে কর্ত্তব্যের গৌরব বেশি। এলাহাবাদের কোন দেশীয় ধনী ব্যাঙ্কর্ স্বত্বরক্ষা উপলক্ষ্যে তাঁহার কোন ইংরাজ ভাড়াটিয়াকে ফুলগাছের টব্ লইতে ভৃত্যদের দ্বারা বাধা দেন—সেই স্পর্দ্ধায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়। স্বত্বরক্ষা বা আত্মরক্ষা বা মানরক্ষার খাতিরে কোন ইংরাজের গায়ে হাত তুলিলে তাহার পরিণাম সুখজনক না হইতে পারে, এ আশঙ্কা স্বীকার করিয়াও যখন আমাদের দেশের লোক আঘাতের পরিবর্ত্তে আঘাত করিতে শিখিবে, তখনি ইংরাজের কাপুরুষতার সংশোধন হইবে—এই অত্যন্ত সহজ কথাটি যদি অস্বীকার করি, তবে স্বভাবের নিয়মসম্বন্ধে আমার সুগভীর অজ্ঞতা প্রকাশ পাইবে।

স্বভাবের নিয়মের অপেক্ষা উচ্চতর নীতি আছে। কিন্তু সে নীতি যতক্ষণ পর্য্যন্ত না সমস্ত বাধা পরাভূত করিয়া নিজেকে দুর্নিবারভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া তোলে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত স্বভাবের নিয়মকেই আশ্রয় করিতে হয়!

কিন্তু এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এই যে ঘুষাঘুষির উত্তেজনা আমাদের মনে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে, ইহা আমাদের ধর্ম্ম-

* স্যাভেজল্যাণ্ডর-নামক ভ্রমণকারী যখন তিব্বতভ্রমণে গিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সমুদয় ভৃত্যই প্রাণভয়ে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করে, কেবল চন্দনসিং ও মানসিং বলিয়া তাঁহার যে দুটিমাত্র হিন্দুভৃত্য ছিল, তাহারা কখনো পলায়নের চেষ্টামাত্রও করে নাই—তাহারা আসন্নমৃত্যুর শঙ্কায় এবং অসহ্য উৎপীড়নেও অবিচলিত থাকে—অথচ নূতন দেশ আবিষ্কারের উত্তেজনা, সমাজে যশের প্রত্যাশা বা ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাপাইয়া অর্থলাভের প্রলোভন, তাহাদের কিছুই ছিল না। তাহাদের প্রভুও বিদেশী এবং অল্পদিনের—কিন্তু তাহারা হিন্দু, অন্যকে মারিবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই উদ্যত নয়, অথচ মরিতে ভয় করে না।

নীতিতে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। অশুভপ্রবৃত্তি প্রয়োজনটুকু সিদ্ধ করিয়াই অন্তর্দ্ধান করে না। তাহাকে দাসত্বের ছুতায় আহ্বান করিলেও শেষে সে রাজত্ব করিতে চায়। কোন কোন দুর্বৃত্ত মদ না খাইলে যেমন কাজ করিতে পারে না, বিদ্বেষ সেইরূপ অন্ধ না হইলে পূরাদমে কাজ করিতে পারে না। গুণ্ডাগিরিকে যদি একবার রীতিমত জাগাইয়া তুলি, তবে সে অন্ধবিদ্বেষের নেশায় না মাতিয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে উঠিয়া-পড়িয়া কাজ আরম্ভ করিবে বটে, কিন্তু আমাদের উচ্চতন মনুষ্যত্বের বুকের রক্ত হইতে সে প্রতিদিন তাহার খোরাক আদায় করিতে থাকিবে। গুণ্ডাগিরি বল পাইয়া উঠিয়া মনুষ্যত্বকে শোষণ করে—বাহাদুরির নেশা জাগিয়া ওঠে।

এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, শুদ্ধ উপদেশে কোন ফল হয় না—অভ্যাস তাহা অপেক্ষা দরকারী জিনিষ। মারা উচিত বলিলেই মারা যায় না, মারা অভ্যাস করা চাই। যাহাদের ঘুষি প্রস্তুত হইয়া আছে, তাহারা শিশুকালে প্রতিবেশীর ছেলেকে মারে, বিদ্যালয়ে সহপাঠীকে মারে, কলেজে gownsman হইয়া townsmanকে মারে—এম্নি করিয়া একেবারে এমন পাকিয়া যায় যে, তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থের উপদেশ অরণ্যে রোদনে পরিণত হয়। তাই হর্বার্ট স্পেন্সার তাঁহার Facts and Comments গ্রন্থের ৩০তম পৃষ্ঠায় লিখিতেছেন :—

But the refusal to recognize the futility of mere instruction as a means to moralization, is most strikingly shown by ignoring the conspicuous fact that after two thousand years of Christian exhortations, uttered by a hundred thousand priests throughout Europe, pagan ideas and sentiments remain rampant, from emperors down to tramps. Principles admitted in theory are scorned in practice. Forgiveness is voted dishonourable. An insult must be wiped out by blood: the obligation being so peremptory that an officer is expelled the army for even daring to question it. And in international affairs the sacred duty of revenge, supreme with the savage, is supreme also with the so-called civilized.

ইহা না হইয়া যায় না। চালের একটি খড় পোড়াইতে গেলেও সমস্ত চালে আগুন লাগে। কাড়াকাঁড়ি-ঘুষাঘুষিকে সমাজের সর্ব্বত্র প্রচলিত করিলে, তবেই আবশ্যকের সময় তাহা অনায়াসপ্রাপ্য হয়।

ট্রুথ প্রভৃতি বিলাতি কাগজে পুলিশ-আদালতের বিবরণে নিজের স্ত্রীকে, পুত্রকন্যাকে, আত্মীয় প্রতিবেশীকে যেরূপ নির্ম্মম পাশবভাবে আঘাত করার উদাহরণ দেখিতে পাই, আমাদের হিন্দুসমাজে তাহার সিকির সিকিও দেখা যায় না। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখিলেই চেনা যায়;—কে পীলা ফাটাইবে এবং কাহার পীলা ফাটিবে, এই পুলিশের বিবরণী হইতেই তাহা স্পষ্ট দেখা যাইবে।

আমাদের দেশে ছেলেতে-ছেলেতে ঝগড়া যদি মারামারি পর্য্যন্ত ওঠে, তবে যাহাতে আঘাত গুরুতর না হয়, লড়াইকারীর সে চেষ্টা বরাবর থাকে—গালে চড়, পিঠে চাপড়ের ঊর্দ্ধে প্রায় ওঠে না। সে আমাদের সমাজের শিক্ষা;

দূর হইতে সুদূরে আত্মীয়তা বিস্তার করাই আমাদের অভ্যাস,—আমরা ঘনিষ্ঠ হইয়া বাস করি—আমরা যদি ক্ষমা না করি, ধৈর্য্য না ধরি, তবে আমাদের সমাজ ভাঙিয়া যায়, শাস্ত্রের শিক্ষা ব্যর্থ হয়।

অতএব আমাদের দুই জাতের দুইরকম আচরণ। য়ুরোপে শাস্ত্রের শিক্ষা ও সমাজের ব্যবহার পরস্পর-বিরোধী। আমাদের সমাজ ক্ষমা, ধৈর্য্য, সন্তোষ ও সর্ব্বভূতে দয়া, এই শাস্ত্রমতের অনুকূলে প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজে সুদীর্ঘকাল হইতে আমাদের চরিত্র গঠিত। অতএব মারামারিতে আমাদিগকে ইংরাজের কাছে হঠিতে হয়—কেবল ভয়ে নহে, অনভ্যাসে।

যদি হঠিতে না চাও, তবে শিশুকাল হইতে ঘরে-পরে সর্ব্বত্র তাহার আয়োজন করিতে হয়। যাহা আমার, তাহাতে কাহাকেও অংশ বসাইতে দিব না; যাহা পরের, তাহা জবরদখল করিতে চেষ্টা করিব; দুর্ব্বল সহপাঠীর উপর অন্যায় অত্যাচার করিব; ঘুষি মারিবার সময় কাহারো নাকচোখ বাঁচাইয়া চলিব না, এবং নিষ্ঠুরতায় বিমুখ হওয়াকে পৌরুষের অভাব বলিয়া গণ্য করিব।

এইরূপে যখন আমাদের আমূল পরিবর্ত্তন হইবে, তখন ইংরাজে-দেশীতে হাতাহাতি সমানভাবে চলিবে। বাঘে-সিংহে থাবা-মারামারি যেমন অত্যন্ত আমোদজনক দৃশ্য, আমাদেরও দাঁতভাঙাভাঙি সেইরূপ পরম কৌতুকাবহ হইতে পারিবে।

নতুবা কি হইবে? যে ব্যক্তি শিক্ষায় ও অভ্যাসে ও পুরুষানুক্রমে স্বভাববর্ব্বর নহে, সে যদি কর্ত্তব্যের অনুরোধে চোখকান বুজিয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ উদ্যোগে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে ভীষণ বর্ব্বরতাকে জাগাইয়া তুলিবে, তাহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উপযুক্ত নখ-দন্ত কোথায় মিলিবে? আমরা উপদেশের তাড়নায় অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে কাজ আরম্ভ করিব, কিন্তু যে নিষ্ঠুর বিদ্বেষ উন্মথিত হইয়া উঠিবে, সেই হলাহল অনায়াসে গলাধঃকরণ করিবার শক্তি ও অভ্যাস আমাদের নাই।

আমি এ কথা ভয় হইতে বলিতেছি না। দাঁতভাঙা, নাক-থ্যাব্‌ড়ানো, জেলে যাওয়া অত্যন্ত গুরুতর অশুভ বলিয়া গণ্য না-ই হইল। কিন্তু যে গরলকে পরিপাক করিতে আমরা স্বাভাবিক কারণেই অক্ষম, সেই গরলকে উদ্রিক্ত করিয়া তোলা দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক কি না, জানি না।

কিন্তু একটা অবস্থা আছে, যখন ফলাফল বিচার অসঙ্গত এবং অন্যায়। ইংরাজ যখন অন্যায় করিয়া আমাকে অপমান করে, তখন যতটুকু আমার সামর্থ্য আছে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করিয়া জেলে যাওয়া এবং মরাও উচিত। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, হয় ত ঘুষায় পারিব না এবং হয় ত বিচার-শালাতেও দোষী সাব্যস্ত হইব; তথাপি অন্যায় দমন করিবার জন্য প্রত্যেক মানুষের যে স্বর্গীয় অধিকার আছে, যথাসময়ে তাহা যদি না খাটাইতে পারি, তবে মনুষ্যের নিকট হেয় এবং ধর্ম্মের নিকট পতিত হইব। নিজের দুঃখ ও ক্ষতি আমরা গণ্য না করিতে পারি, কিন্তু যাহা অন্যায়, তাহা সমস্ত জাতির প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি অন্যায় এবং বিধাতার ন্যায়দণ্ডের ভার আমাদের প্রত্যেকের উপরেই আছে। বিদ্বেষ হইতে, বাহাদুরি হইতে,

স্পর্দ্ধা হইতে নিজেকে সর্ব্বপ্রযত্নে বাঁচাইয়া, ন্যায়নীতির সীমার মধ্যে কঠিনভাবে নিজেকে সংবরণ করিয়া দুষ্টশাসনের কর্ত্তব্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। শারীরিক কষ্ট, ক্ষতি বা অকৃতকার্য্যতা ভয়ের বিষয় নহে—ভয়ের বিষয় এই যে, ধর্ম্মকে বিস্মৃত হইয়া প্রবৃত্তির হাতে পাছে আত্মসমর্পণ করি, পরকে দণ্ড দিতে গিয়া পাছে আপনাকে কলুষিত করি, বিচারক হইতে গিয়া পাছে গুণ্ডা হইয়া উঠি। আমরা দেখিয়াছি, দুই-দিক্ বাঁচাইয়া চলা সাধারণ মানুষের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন, এইজন্য ভালমন্দ ওজন করিয়া অনেকসময় আমাদিগকে একটা দিক্ অবলম্বন করিতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মের সঙ্গে সেরূপ রফা করিতে গেলেই সেই ছিদ্র-যোগে শনি প্রবেশ করে—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির যে সামঞ্জস্যপথ আছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ হইলেও তাহাই আমাদিগকে নিয়তযত্নে অনুসন্ধান ও অবলম্বন করিতে হইবে—নতুবা বিনাশপ্রাপ্ত হইতেই হইবে। ধর্ম্মের এই অমোঘ নিয়ম হইতে য়ুরোপ বা এসিয়া কাহারো নিষ্কৃতি নাই।

অতএব ঘুষাঘুষি-মারামারির কথা যখন ওঠে, তখন সাবধান হইতে বলি। দেবতার তূণেও অস্ত্র আছে, দানবের তূণও শূন্য নহে—অপ্রমত্ত হইয়া অস্ত্রনির্ব্বাচন যদি করিতে পারি, তবেই যুদ্ধের অধিকার জন্মে, তখন—কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

সরলা দেবী।

সুভদ্রা সারথি হয়ে কি অক্রুদ্ধ করে
চালাইলা জয়রথ! কি দৃপ্ত ভঙ্গীতে
কৃষ্ণা সংহরিলা বেণী তৃপ্ত গর্ব্বভরে!
কি উদ্দীপ্ত চণ্ডতেজে জনার ইঙ্গিতে
যুঝেছিলা ক্ষুদ্র সেনা! যেদিন রমণী
রচি' দিত ধনুর্গুণ নিজ কেশপাশে,—
পতিরে পরাত বর্ম্ম স্বহস্তে আপনি,
সেদিন শমনত্রাস মরিত তরাসে!
তুমি শক্তিরূপা দেবী, তব মাতৃভাষা
এ বঙ্গে অভয়মন্ত্র করুক্ প্রচার!
কটাক্ষেতে কর চূর্ণ দীনতা নিরাশা—
কার্য্যে কার্য্যে কর পূর্ণ জীবন-প্রসার!
তোমার তরুণ তেজে নবীন গৌরবে
প্রভাত-অরুণ-রশ্মি জাগুক্ পূরবে!

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

বঙ্গদর্শন।

ধর্ম্মবোধের দৃষ্টান্ত।

জুরির বিচার একবার এদেশ হইতে উঠাইয়া দিবার কথা হইয়াছিল—তাহা লইয়া আমাদের কাগজে-পত্রে সভাসমিতিতে খুব একটা কলরব ওঠে।

সেইসময় আমাদের দেশীয় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির বাড়ীতে কোন নিমন্ত্রণে আমি উপস্থিত থাকি। সেখানে কোন কলেজের ইংরাজ প্রিন্সিপাল্‌ও নিমন্ত্রিত ছিলেন।

তিনি নিজে ইচ্ছা করিয়া এই জুরির কথাটা তুলিলেন। নিমন্ত্রণকর্ত্তা জুরিবিচার এদেশে টেঁকে, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করাতে অধ্যাপক কহিলেন, যে দেশের অর্দ্ধসভ্য লোক প্রাণের মাহাত্ম্য (Sanctity of Life) বোঝে না, তাহাদের হাতে জুরিবিচারের অধিকার দেওয়া অন্যায়।

ইংরাজের এই কথাটি লইয়া চিন্তা করিবার বিষয় অনেকগুলি ছিল। গুরুতর চিন্তার বিষয় এই যে, আমাদের ছেলেদের শিক্ষার ভার ইঁহার হাতে! উপনিষদে আছে "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্"—শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত দান করিবে না। ভিক্ষাদানসম্বন্ধে যদি এ কথার মূল্য থাকে, তবে শিক্ষাদানসম্বন্ধে এ কথা আরো কত খাটে! কেবল ইংরাজি কথার ইংরাজি মানে শেখাই পরম লাভ, তাহা নহে—আত্মসম্মানটা একটা মস্ত জিনিষ। কিন্তু ইহা আমরা প্রত্যহ দেখিতে পাই, সমস্ত বাধা-নিষেধ-অপমান স্বীকার করিয়াও ছেলেকে ইংরাজের ইস্কুলে দিবার জন্য আমাদের অভিভাবকেরা লালায়িত হইয়া ফেরেন; তাহার কারণ, বিশুদ্ধ ইংরাজি উচ্চারণকে ইঁহারা বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের চেয়ে দামী বলিয়া বুঝিয়াছেন। এই অভিভাবকগণ সম্ভবত রায়বাহাদুর হইয়া সুখে মরিতে পারিবেন, কিন্তু অপমানে দীক্ষিত হতভাগ্য ছেলেগুলির জন্য দুঃখ হয়!

আর একটি কথা এই যে, নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোকটি বাঙালি বলিয়া, যে বিদেশী সামান্য শিষ্টতাটুকু ভুলিয়া যায়, বাঙালির প্রতি সুবিচার করিতে সে কি পারে? প্রাণের মাহাত্ম্য যেমন একটা আছে, মানের মাহাত্ম্যও তেম্‌নি আছে। দুটো প্রায় একসঙ্গেই থাকে। তোমার কাছে যাহার মানের মাহাত্ম্য কম, তাহার প্রাণের মাহাত্ম্যও অল্প,

প্রতিদিনই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

প্রাণের মাহাত্ম্য ইংরাজ আমাদের চেয়ে বেশি বোঝে, সে কথা না হয় স্বীকার করিয়াই লওয়া গেল। অতএব সেই ইংরাজ যখন প্রাণ হনন করে, তখন তাহার অপরাধের গুরুত্ব আমাদের মত অর্দ্ধসভ্যের চেয়ে বেশি। অথচ দেখিতে পাই, দেশীয়কে হত্যা করিয়া কোনো ইংরাজ খুনি, ইংরাজ জজ্ ও ইংরাজ জুরির বিচারে ফাঁসি যায় নাই। প্রাণের মাহাত্ম্যসম্বন্ধে তাহাদের বোধশক্তি যে অত্যন্ত সূক্ষ্ম, ইংরাজ অপরাধী হয় ত তাহার প্রমাণ পায়, কিন্তু সে প্রমাণ দেশীয় লোকদের কাছে কিছু অসম্পূর্ণ বলিয়াই ঠেকে।

এইরূপ বিচার আমাদিগকে দুই দিক্ হইতে আঘাত করে। প্রাণ যা যাবার, সে ত যায়ই, ও দিকে মানও নষ্ট হয়। ইহাতে আমাদের জাতির প্রতি যে অবজ্ঞা প্রকাশ পায়, তাহা আমাদের সকলেরই গায়ে বাজে!

ইংলণ্ডে গ্লোব্ বলিয়া একটি সংবাদপত্র আছে। সেটা সেখানকার ভদ্রলোকেরই কাগজ —তাহাতে লিখিয়াছে, টমি অ্যাট্‌কিন্ (অর্থাৎ পল্টনের গোরা) দেশি লোককে মারিয়া ফেলিবে বলিয়া মারে না, কিন্তু মার খাইলেই দেশি লোকগুলা মরিয়া যায়—এইজন্য টমিবেচারার লঘুদণ্ড হইলেই দেশি খবরের কাগজগুলা চীৎকার করিয়া মরে।

টমি অ্যাট্‌কিনের প্রতি দরদ্ খুব দেখিতেছি, কিন্তু স্যাঙ্ক্‌টিটি অফ্ লাইফ্ কোন্‌খানে! যে পাশব আঘাতে আমাদের পীলা ফাটে, এই ভদ্রকাগজের কথছত্রের মধ্যেও কি সেই আঘাতেরই বেগ নাই? স্বজাতিকৃত খুনকে কোমল স্নেহের সহিত দেখিয়া হতব্যক্তির আত্মীয়সম্প্রদায়ের বিলাপকে যাহারা বিরক্তির সহিত ধিক্কার দেয়, তাহারাও কি খুন পোষণ করিতেছে না?

কিছুকাল হইতে আমরা দেখিতেছি, য়ুরোপীয় সভ্যতায় ধর্ম্মনীতির আদর্শ সাধারণত অভ্যাসের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—ধর্ম্মবোধশক্তি এই সভ্যতার অন্তঃকরণের মধ্যে উদ্ভাসিত হয় নাই। এইজন্য অভ্যাসের গণ্ডির বাহিরে এই আদর্শ পথ খুঁজিয়া পায় না, অনেকসময় বিপথে মারা যায়।

য়ুরোপীয় সমাজে ঘরে-ঘরে কাটাকাটি-খুনাখুনি হইতে পারে না—এরূপ ব্যবহার সেখানকার সাধারণ স্বার্থের বিরোধী। বিষপ্রয়োগ বা অস্ত্রাঘাতের দ্বারা খুন করাটা য়ুরোপের পক্ষে কয়েক শতাব্দী হইতে ক্রমশ অনভ্যস্ত হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু খুন বিনা অস্ত্রাঘাতে—বিনা রক্তপাতে হইতে পারে। ধর্ম্মবোধ যদি অকৃত্রিম আভ্যন্তরিক হয়, তবে সেরূপ খুনও নিন্দনীয় এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে।

একটি বিশেষ দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া এ কথাটা স্পষ্ট করিয়া তোলা যাক্।

হেন্‌রি স্যাভেজ্ ল্যাণ্ডর্ একজন বিখ্যাত ভ্রমণকারী। তিব্বতের তীর্থস্থান ল্হাসায় যাইবার জন্য তাঁহার দুর্নিবার ঔৎসুক্য জন্মে। সকলেই জানেন, তিব্বতীরা য়ুরোপীয় ভ্রমণকারী ও মিশনারী প্রভৃতিকে সন্দেহ করিয়া থাকে। তাহাদের দুর্গম পথঘাট বিদেশীর কাছে পরিচিত নহে, ইহাই তাহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র—সেই অস্ত্রটি যদি তাহারা জিওগ্রাফিকাল্ সোসাইটির হস্তে সমর্পণ

করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে অনিচ্ছুক হয়, তবে তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু অন্যে তাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহারো নিষেধ মানিবে না, য়ুরোপের এই ধর্ম্ম। কোন প্রয়োজন থাক্ বা না থাক্, শুদ্ধমাত্র বিপদ্ লঙ্ঘন করিয়া বাহাদুরি করিলে য়ুরোপে এত বাহবা মিলে যে, অনেকের পক্ষে সে একটা প্রলোভন। য়ুরোপের বাহাদুর লোকরা দেশে-বিদেশে বিপদ্ সন্ধান করিয়া ফেরে। যে কোন উপায়ে হোক্, লাসায় যে য়ুরোপীয় পদার্পণ করিবে, সমাজে তাহার খ্যাতি-প্রতিপত্তির সীমা থাকিবে না।

অতএব তুষারগিরি ও তিব্বতীর নিষেধকে ফাঁকি দিয়া লাসায় যাইতে হইবে। ল্যাণ্ডর্-সাহেব কুমায়ুনে আল্‌মোড়া হইতে যাত্রা আরম্ভ করিলেন। সঙ্গে এক হিন্দু চাকর আসিয়া জুটিল, তাহার নাম চন্দন সিং।

কুমায়ুনের প্রান্তে তিব্বতের সীমানায় বৃটিশরাজ্যে শোকা বলিয়া এক পাহাড়ি জাত আছে। তিব্বতীদের ভয়ে ও উপদ্রবে তাহারা কম্পমান। বৃটিশরাজ তিব্বতীদের পীড়ন হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন না বলিয়া ল্যাণ্ডর্-সাহেব বারংবার আক্ষেপ-প্রকাশ করিয়াছেন। সেই শোকাদের মধ্য হইতে সাহেবকে কুলিমজুর সংগ্রহ করিয়া লইতে হইবে। বহুকষ্টে ত্রিশজন কুলি জুটিল।

ইহার পর হইতে যাত্রাকালে সাহেবের এক প্রধান চিন্তা ও চেষ্টা—কিসে কুলিরা না পালায়। তাহাদের পালাইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ল্যাণ্ডর্ তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তের পঁচিশ-পরিচ্ছেদে লিখিয়াছেন :—"এই বাহকদল যখন নিঃশব্দ গম্ভীরভাবে বোঝা পিঠে লইয়া করুণাজনক শ্বাসকষ্টের সহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে উচ্চ হইতে উচ্চে আরোহণ করিতেছিল, তখন এই ভয় মনে হইতেছিল, ইহাদের মধ্যে কয়জনই বা কোনকালে ফিরিয়া যাইতে পারিবে!"

আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, এ শঙ্কা যখন তোমার মনে আছে, তখন এই অনিচ্ছুক হতভাগ্যদিগকে মৃত্যুমুখে তাড়না করিয়া লইয়া যাওয়াকে কি নাম দেওয়া যাইতে পারে? তুমি পাইবে গৌরব এবং তাহার সঙ্গে অর্থলাভের সম্ভাবনাও যথেষ্ট আছে—তুমি তাহার প্রত্যাশায় প্রাণপণ করিতে পার, কিন্তু ইহাদের সম্মুখে কোন্ প্রলোভন আছে?

বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে জীবচ্ছেদ (vivisection) লইয়া য়ুরোপে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়া থাকে। সজীব জন্তুদিগকে লইয়া পরীক্ষা করিবার সময়ে যন্ত্রণানাশক ঔষধ প্রয়োগ করিবার ঔচিত্যও আলোচিত হয়। কিন্তু বাহাদুরি করিয়া বাহবা লইবার উদ্দেশে দীর্ঘকাল ধরিয়া অনিচ্ছুক মানুষদের উপরে যে অসহ্য পীড়ন চলে, ভ্রমণবৃত্তান্তের গ্রন্থে তাহার বিবরণ প্রকাশ হয়, সমালোচকেরা করতালি দেন, সংস্করণের পর সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া যায়, হাজার হাজার পাঠক ও পাঠিকা এই সকল বর্ণনা বিস্ময়ের সহিত পাঠ ও আনন্দের সহিত আলোচনা করেন। দুর্গম তুষারপথে নিরীহ শোকা-বাহকদল দিবারাত্র যে অসহ্য কষ্টভোগ করিয়াছে—তাহার পরিণাম কি? ল্যাণ্ডর্-সাহেব না হয় লাসায় পৌঁছিলেন, তাহাতে জগতের

এমন কি উপকার হওয়া সম্ভব, যাহাতে এই সকল ভীত-পীড়িত পলায়নেচ্ছু মানুষদিগকে অহরহ এত কষ্ট দিয়া মৃত্যুর পথে তাড়না করা লেশমাত্র বিহিত বলিয়া গণ্য হইতে পারে? কিন্তু কই, এজন্য ত লেখকের সঙ্কোচ নাই, পাঠকের অনুকম্পা নাই?

তিব্বতীরা কিরূপ নিষ্ঠুরভাবে পীড়ন ও হত্যা করিতে পারে, শোকারা সেই কারণে তিব্বতীদিগকে কিরূপ ভয় করে, এবং তাহাদিগকে তিব্বতীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে ব্রিটিশরাজ কিরূপ অক্ষম, তাহা ল্যাণ্ডর্ জানিতেন—ইহাও তিনি জানিতেন, তাঁহার মধ্যে যে উৎসাহ-উত্তেজনা ও প্রলোভন কাজ করিতেছে, শোকাদের মধ্যে তাহার লেশমাত্র নাই। তৎসত্ত্বেও ল্যাণ্ডর্ তাঁহার গ্রন্থের ১৬৫ পৃষ্ঠায় যে ভাষায় যে ভাবে তাঁহার বাহকদের ভয়দুঃখের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তর্জ্জমা করিয়া দিলাম :—

"তাহারা প্রত্যেকে হাতে মুখ ঢাকিয়া ব্যাকুল হইয়া কাঁদিতেছিল। কাচির দুই গাল বাহিয়া চোখের জল ঝরিয়া পড়িতেছিল—দোলা ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, এবং ডাকু ও অন্য যে একটি তিব্বতী আমার কাজ লইয়াছিল, যাহারা ভয়ে ছদ্মবেশ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা তাহাদের বোঝার পশ্চাতে লুকাইয়া বসিয়া ছিল। আমাদের অবস্থা যদিও সঙ্কটাপন্ন ছিল, তবু আমাদের লোকজনদের এই আতুরদশা দেখিয়া আমি না হাসিয়া থাকিতে পারিলাম না।"—

ইহার পরে এই দুর্ভাগারা পলায়নের চেষ্টা করিলে ল্যাণ্ডর্ তাহাদিগকে এই বলিয়া শান্ত করেন যে, যে কেহ পলায়নের বা বিদ্রোহের চেষ্টা করিবে, তাহাকে গুলি করিয়া মারিব!

কিরূপ তুচ্ছ কারণেই ল্যাণ্ডর্-সাহেবের গুলি করিবার উত্তেজনা জন্মে, অন্যত্র তাহার পরিচয় পাওয়া গেছে। তিব্বতী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে ল্যাণ্ডর্ যখন প্রথম নিষেধ প্রাপ্ত হইলেন, তখন তিনি ভাণ করিলেন, যেন ফিরিয়া যাইতেছেন। একটা উপত্যকায় নামিয়া আসিয়া দূরবীণ কষিয়া দেখিলেন, পাহাড়ের শৃঙ্গের উপর হইতে প্রায় ত্রিশটা মাথা পাথরের আড়ালে উঁকি মারিতেছে! সাহেব লিখিতেছেন—"আমার বড় বিরক্তিবোধ হইল। যদি ইচ্ছা হয় ত ইহারা প্রকাশ্যভাবেই আমাদের অনুসরণ করে না কেন—দূর হইতে পাহারা দিবার দরকার কি! অতএব আমি আমার আটশ'-গজী রাইফেল্ লইয়া মাটিতে চ্যাপ্টা হইয়া শুইলাম এবং যে মাথাটাকে অন্যদের চেয়ে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল, তাহার প্রতি লক্ষ্য স্থির করিলাম।"

এই "অতএব"-এর বাহার আছে! লুকাচুরিকে ল্যাণ্ডর্-সাহেব কি ঘৃণাই করেন! তিনি এবং তাঁহার সঙ্গের আর একটা মিশনারি-সাহেব নিজেদের হিন্দু তীর্থযাত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, প্রকাশ্যে ভারতবর্ষে ফিরিবার ভাণ করিয়া গোপনে লাসায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন, কিন্তু পরের লুকাচুরি ইঁহার এতই অসহ্য যে, ভূমিতে চ্যাপ্টা হইয়া শুইয়া আত্মগোপনপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ আটশ'-গজী রাইফেল্ বাগাইয়া কহিলেন, "I only wish to teach these cowards a lesson.—আমি এই কাপুরুষদিগকে শিক্ষা

দিতে ইচ্ছা করি!" দূর হইতে লুকাইয়া রাইফেল্-চালনায় সাহেব যে পৌরুষের পরিচয় দিতেছিলেন, তাহার বিচার করিবার কেহ ছিল না। আমাদের ওরিয়েণ্টাল্‌দের অনেক দুর্ব্বলতার কথা আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু চালুনি হইয়া ছুঁচ্‌কে বিচার করিবার প্রবৃত্তি পাশ্চাত্যদের মত আমাদের নাই। আসল কথা, গায়ের জোর থাকিলে বিচারাসনের দখল একচেটে করিয়া লওয়া যায়—তখন অন্যকে ঘৃণা করিবার অভ্যাসটাই বদ্ধমূল হইয়া যায়, নিজেকে বিচার করিবার অবসর পাওয়া যায় না।

আসিয়ায়-আফ্রিকায় ভ্রমণকারীরা অনিচ্ছুক ভৃত্য বাহকদের প্রতি যেরূপ অত্যাচার করিয়া থাকেন, দেশ-আবিষ্কারের উত্তেজনায় ছলে-বলে-কৌশলে তাহাদিগকে যে করিয়া বিপদ্ ও মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া লইয়া যান, তাহা কাহারো অগোচর নাই। অথচ Sanctity of Life সম্বন্ধে এই সকল পাশ্চাত্য সভ্যজাতির বোধশক্তি অত্যন্ত সুতীব্র হইলেও কোথাও কোন আপত্তি শুনিতে পাই না। তাহার কারণ, ধর্ম্মবোধ পাশ্চাত্য সভ্যতার আভ্যন্তরিক নহে—স্বার্থরক্ষার প্রাকৃতিক নিয়মে তাহা বাহির হইতে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য য়ুরোপীয় গণ্ডির বাহিরে তাহা বিকৃত হইতে থাকে। এমন কি, সে গণ্ডির মধ্যেও যেখানে স্বার্থবোধ প্রবল, সেখানে দয়াধর্ম্ম রক্ষা করার চেষ্টাকে য়ুরোপ দুর্ব্বলতা বলিয়া ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধের সময় বিরুদ্ধপক্ষের সর্ব্বস্ব জ্বালাইয়া দেওয়া, তাহাদের অনাথ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে বন্দী করার বিরুদ্ধে কথা কহা "সেণ্টিমেণ্টালিটি"। য়ুরোপে সাধারণত অসত্যপরতা দূষণীয়, কিন্তু পলিটিক্সে একপক্ষ অপরপক্ষকে অসত্যের অপবাদ সর্ব্বদাই দিতেছে। গ্লাড্‌ষ্টোন্‌ও এই অপবাদ হইতে নিষ্কৃতি পান নাই। এই কারণেই চীনযুদ্ধে য়ুরোপীয় সৈন্যের উপদ্রব বর্ব্বরতারও সীমা লঙ্ঘন করিয়াছিল এবং কংগো-প্রদেশে স্বার্থোন্মত্ত বেল্‌জিয়ামের ব্যবহার পৈশাচিকতায় গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকায় নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ আচরণ চলিতেছে, তাহা নিউইয়র্কে প্রকাশিত "পোস্‌ট্"সংবাদপত্র হইতে গত ২রা জুলাই তারিখের বিলাতী ডেলিনিউসে সঙ্কলিত হইয়াছে। তুচ্ছ অপরাধের অছিলায় নিগ্রো স্ত্রীপুরুষকে পুলিস্‌কোর্টে হাজির করা হয়—সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহাদিগকে জরিমানা করে, সেই জরিমানা আদালতে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গেরা শুধিয়া দেয় এবং এই সামান্য টাকার পরিবর্ত্তে তাহারা সেই নিগ্রোদিগকে দাসত্বে ব্রতী করে। তাহার পর হইতে চাবুক, লৌহশৃঙ্খল এবং অন্যান্য সকলপ্রকার উপায়েই তাহাদিগকে অবাধ্যতা ও পলায়ন হইতে রক্ষা করা হয়। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে ত চাবুক মারিতে মারিতে মারিয়া ফেলা হইয়াছে। একটি নিগ্রো স্ত্রীলোককে দ্বৈধব্য-(bigamy)-অপরাধে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছিল। হাজতে থাকার সময় একজন ব্যারিষ্টার তাহার পক্ষ অবলম্বন করিতে স্বীকার করে। কিন্তু কোন বিচার না হইয়াই নির্দ্দোষী বলিয়া এই স্ত্রীলোকটি খালাস পায়। ব্যারিষ্টার ফি-এর দাবি করিয়া তাহার প্রাপ্য টাকার পরিবর্ত্তে এই নিগ্রো স্ত্রীলোক-

টিকে ম্যাক্রি-ক্যাম্পে চোদ্দমাস কাজ করিবার জন্য পাঠায়। সেখানে তাহাকে নয়মাস চাবিতালা দিয়া বন্ধ করিয়া খাটানো হইয়াছে, জোর করিয়া আর-এক ব্যক্তির সহিত তাহার বিবাহ দিয়া বলা হইয়াছে যে, তোমার বৈধ-স্বামীর সহিত তোমার কোনকালে মিলন হইবে না—পলায়নের আশঙ্কা করিয়া তাহার পশ্চাতে কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রভু ম্যাক্রিরা তাহাকে নিজের হাতে চাবুক মারিয়াছে এবং তাহাকে শপথ করাইয়া লইয়াছে যে, খালাস পাইলে তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সে মাসে পাঁচডলার করিয়া বেতন পাইত।

ডেলিনিয়ুস্ বলিতেছেন, রাশিয়ায় ইহুদি-হত্যা, কংগোয় বেল্‌জিয়ামের অত্যাচার প্রভৃতি লইয়া প্রতিবেশীদের প্রতি দোষারোপ করা দুরূহ হইয়াছে। After all, no great Power is entirely innocent of the charge of treating with barbarous harshness the alien races which are subject to its rule.

আমাদের দেশে ধর্ম্মের যে আদর্শ আছে, তাহা অন্তরের সামগ্রী, তাহা বাহিরে গণ্ডির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার নহে। আমরা যদি Sanctity of Life একবার স্বীকার করি, তবে পশুপক্ষিকীটপতঙ্গ কোথাও তাহার সীমাস্থাপন করি না। ভারতবর্ষ একসময়ে মাংসাশী ছিল—মাংস আজ তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ। মাংসাশী জাতি নিজেকে বঞ্চিত করিয়া মাংসাহার একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে, জগতে বোধ হয় ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। ভারতবর্ষে দেখিতে পাই, অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও যাহা উপার্জ্জন করে, তাহা দূর আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না—স্বার্থেরও যে একটা ন্যায্য অধিকার আছে, এ কথাটাকে আমরা সর্ব্বপ্রকার অসুবিধা স্বীকার করিয়া যতদূর সম্ভব খর্ব্ব করিয়াছি। আমাদের দেশে বলে, যুদ্ধেও ধর্ম্মরক্ষা করিতে হইবে—নিরস্ত্র, পলাতক, শরণাগত শত্রুর প্রতি আমাদের ক্ষত্রিয়দের যেরূপ ব্যবহার ধর্ম্মবিহিত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, য়ুরোপে তাহা হাস্যকর বলিয়া গণ্য হইবে। তাহার একমাত্র কারণ, ধর্ম্মকে আমরা অন্তরের ধন করিতে চাহিয়াছিলাম। স্বার্থের প্রাকৃতিক নিয়ম আমাদের ধর্ম্মকে গড়িয়া তোলে নাই, ধর্ম্মের নিয়মই আমাদের স্বার্থকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেজন্য আমরা যদি বহির্বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া থাকি,—সেইজন্যই বহিঃশত্রুর কাছে যদি আমাদের পরাজয় ঘটে, তথাপি আমরা স্বার্থ ও সুবিধার উপরে ধর্ম্মের আদর্শকে জয়ী করিবার চেষ্টায় যে গৌরব-লাভ করিয়াছি, তাহা কখনই ব্যর্থ হইবে না—একদিন তাহারো দিন আসিবে।

নৌকাডুবি।

১৫

রমেশ অন্নদাবাবুর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তখন অন্নদাবাবু মুখের উপরে খবরের কাগজ চাপা দিয়া কেদারায় পড়িয়া নিদ্রা দিতেছিলেন। রমেশ ঘরে প্রবেশ করিয়া কাশিতেই তিনি চকিত হইয়া উঠিয়া খবরের কাগজটা তুলিয়া ধরিয়াই কহিলেন, "দেখিয়াছ রমেশ, এবারে ওলাউঠায় কত লোক মরিয়াছে?"

অন্নদাবাবু নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য ও শারীরিক দুর্ব্বলতার কথা প্রচার করিতে কখনো কুণ্ঠিত হইতেন না. কিন্তু নিদ্রা যে তাঁহাকে অসময়ে অভিভূত করিতে পারে. ইহা স্বীকার করা তাঁহার পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি যে সহরের মৃত্যুতালিকা লইয়া অত্যন্ত নিবিষ্টচিত্তে মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন. রমেশের নিকট ইহাই প্রতিপন্ন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। সহরের আবর্জ্জনা দূর করিবার প্রতি ম্যুনিসিপালিটির ঔদাসীন্য যে কিরূপ দৃঢ়বদ্ধমূল, অত্যন্ত গম্ভীর উদ্বেগের সহিত ইহাই তিনি রমেশের সহিত আলোচনা করিতে উৎসাহসহকারে প্রবৃত্ত হইলেন।

রমেশ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে দুইএকবার সায় দিল। যদিও রমেশের মুখ দেখিয়া মনে হইতে পারিত যে, ওলাউঠার জন্য কলিকাতা-সহরের সমস্ত উৎকণ্ঠা তাহারি মাথায় চাপিয়াছে, কিন্তু আলোচনায় তাহার শৈথিল্য দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত, মৃত্যুতালিকার চেয়েও গুরুতর চিন্তার কারণ তাহার ছিল।

অন্নদাবাবু তাহা বুঝিলেন না। তিনি কহিলেন—"সহরের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, বিবাহে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজনটা সংক্ষেপ করিতে হইবে।"

দূষিত জলে মাছ বাস করে এবং সেই মাছ ঝোলের বাটিযোগে ঘরে-ঘরে মহামারী বণ্টন করিয়া দেয়, অতএব রোগভয়ের সময় লঘুপাক পরিমিত নিরামিষ ভোজই যে ব্যবস্থা, অন্নদাবাবু এই সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য বিবৃত করিতেছিলেন। এই সুযোগ অবলম্বন করিয়া রমেশ কহিল, "বিবাহটা আর কিছুদিন পিছাইয়া দিলেই ভাল হয়।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"পাগল হইয়াছ রমেশ? ব্যামোকে কি অত ভয় করিলে চলে? তাহা হইলে কলিকাতা-সহরে লোকের বিবাহ করা একেবারে বন্ধই করিতে হয়। আমাদের যে ম্যুনিসিপালিটি! কমিশনারগুলি যমদূত!"

নিজের এই রসিকতায় অন্নদাবাবু বিশেষ আমোদ প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অন্যমনস্ক রমেশের নিকট সমস্তই ব্যর্থ হইল।

রমেশ কহিল, "বিবাহ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখিতে হইবে—আমার বিশেষ কাজ আছে।"

অন্নদাবাবুর মাথা হইতে সহরের মৃত্যুতালিকার বিবরণ একেবারে লুপ্ত হইয়া গেল।

ক্ষণকাল রমেশের মুখের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"সে কি কথা রমেশ! নিমন্ত্রণ যে হইয়া গেছে!"

রমেশ কহিল, "এই রবিবারের পরের রবিবারে দিন পিছাইয়া দিয়া আজই পত্র বিলি করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।"

অন্নদা। রমেশ, তুমি আমাকে অবাক্ করিলে! এ কি মকদ্দমা যে, তোমার সুবিধা-মত তুমি দিন পিছাইয়া মুল্‌তুবি করিতে থাকিবে? তোমার প্রয়োজনটা কি, শুনি!

রমেশ। সে অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজন, বিলম্ব করিলে চলিবে না!

অন্নদাবাবু বাতাহত কদলীবৃক্ষের মত কেদারার উপর হেলান্ দিয়া পড়িলেন—কহিলেন—"বিলম্ব করিলে চলিবে না! বেশ কথা, অতি উত্তম কথা! এখন তোমার যাহা ইচ্ছা হয় কর! নিমন্ত্রণ ফিরাইয়া লইবার ব্যবস্থা তোমার বুদ্ধিতে যাহা আসে, তাহাই হোক্! লোকে যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি বলিব, 'আমি ও সব কিছুই জানি না,—তাঁহার কি আবশ্যক, সে তিনিই জানেন, আর কবে তাঁহার সুবিধা হইবে, সে তিনিই বলিতে পারেন!'"

রমেশ উত্তর না করিয়া নতমুখে বসিয়া রহিল। অন্নদাবাবু কহিলেন, "হেমনলিনীকে সব কথা বলা হইয়াছে?"

রমেশ। না, তিনি এখনো জানেন না।

অন্নদা। তাঁহার ত জানা আবশ্যক! তোমার ত একলার বিবাহ নয়!

রমেশ। আপনাকে আগে জানাইয়া তাঁহাকে জানাইব স্থির করিয়াছি।

অন্নদাবাবু ডাকিয়া উঠিলেন—"হেম, হেম!"

হেমনলিনী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল, "কি বাবা!"

অন্নদা। রমেশ বলিতেছেন, উঁহার কি একটা বিশেষ কাজ পড়িয়াছে, এখন উঁহার বিবাহ করিবার অবকাশ হইবে না!

হেমনলিনী একবার বিবর্ণমুখে রমেশের মুখের দিকে চাহিল। রমেশ অপরাধীর মত নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

হেমনলিনীর কাছে এ খবরটা যে এমন করিয়া দেওয়া হইবে, রমেশ তাহা প্রত্যাশা করে নাই। সে যে কি করিয়া আস্তে আস্তে কথাটা পাড়িবে, তাহা নানা রকম করিয়া ভাবিয়া রাখিয়াছিল। ভালবাসার মৃদু দক্ষিণ-হাওয়াকে রমেশ দূত করিবে স্থির করিয়াছিল, হঠাৎ বজ্রমন্দ্রিত কালবৈশাখী তাহার মুখের কথা ছিনাইয়া লইয়া গেল। অপ্রিয়-বার্ত্তা অকস্মাৎ এইরূপ নিতান্ত রূঢ়ভাবে হেমনলিনীকে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিকরূপে আঘাত করিল, রমেশ তাহা নিজের ব্যথিত অন্তঃকরণের মধ্যেই সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারিল। কিন্তু যে তীর একবার নিক্ষিপ্ত হয়, তাহা আর ফেরে না,—রমেশ যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইল, এই নিষ্ঠুর তীর হেমনলিনীর হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে গিয়া বিঁধিয়া রহিল!

এখন কথাটা কোনমতে আর নরম করিয়া লইবার উপায় নাই। সবই সত্য—বিবাহ এখন স্থগিত রাখিতে হইবে, রমেশের বিশেষ প্রয়োজন আছে, কি প্রয়োজন, তাহাও সে বলিতে ইচ্ছা করে না। ইহার উপরে এখন আর নূতন ব্যাখ্যা কি হইতে পারে!

অন্নদাবাবু হেমনলিনীর দিকে চাহিয়া কহিলেন—"তোমাদেরই কাজ, এখন তোমরাই ইহার যা হয় একটা মীমাংসা করিয়া লও!"

হেমনলিনী মুখ নত করিয়া বলিল—"বাবা, আমি ইহার কিছুই জানি না!" এই বলিয়া, ঝড়ের মেঘের মুখে সূর্য্যাস্তের ম্লান আভাটুকু যেমন মিলাইয়া যায়, তেমনি করিয়া সে চলিয়া গেল।

অন্নদাবাবু খবরের কাগজ মুখের উপর তুলিয়া পড়িবার ভাণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রমেশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

হঠাৎ রমেশ একসময় চমকিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল। বসিবার বড় ঘরে গিয়া দেখিল, হেমনলিনী জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার দৃষ্টির সম্মুখে আসন্ন পূজার-ছুটির কলিকাতা জোয়ারের নদীর মত তাহার সমস্ত রাস্তা ও গলির মধ্যে স্ফীত জনপ্রবাহে চঞ্চল-মুখর হইয়া উঠিয়াছে।

রমেশ একেবারে তাহার পার্শ্বে যাইতে কুণ্ঠিত হইল। পশ্চাৎ হইতে কিছুক্ষণের জন্য স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতে লাগিল। শরতের অপরাহ্ণ-আলোকে বাতায়নবর্ত্তিনী এই স্তব্ধমূর্ত্তিটি রমেশের মনের মধ্যে একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া দিল। ঐ সুকুমার কপোলের একটি অংশ, ঐ সযত্নরচিত কবরীর ভঙ্গী, ঐ গ্রীবার উপরে কোমল-বিরল কেশগুলি, তাহারি নীচে সোনার হারের একটুখানি আভাস, বামস্কন্ধ হইতে লম্বিত অঞ্চলের বঙ্কিম প্রান্ত, সমস্তই রেখায়-রেখায় তাহার পীড়িত চিত্তের মধ্যে যেন কাটিয়া-কাটিয়া বসিয়া গেল। ব্যর্থ বেশবিন্যাসের আক্ষেপ বহন করিয়া একটি মৃদু সুগন্ধ ঘরময় ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। এই গন্ধটুকু, ঐ ছবিটি রমেশের কত ভবিষ্যৎ শারদীয় অবকাশকে আবিষ্ট করিয়া তুলিবার জন্য স্মৃতির মধ্যে সঞ্চিত হইয়া রহিল!

রমেশ আস্তে আস্তে হেমনলিনীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। হেমনলিনী রমেশের চেয়ে রাস্তার লোকদের জন্য যেন বেশি ঔৎসুক্য বোধ করিতে লাগিল। রমেশ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "আপনার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

রমেশের কণ্ঠস্বরে উদ্বেল বেদনার আঘাত অনুভব করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে হেমনলিনীর মুখ ফিরিয়া আসিল। রমেশ বলিয়া উঠিল—"তুমি আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না!" রমেশ এই প্রথম হেমনলিনীকে 'তুমি' বলিল। "এই কথা আমাকে বল যে, তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করিবে না! আমিও অন্তর্যামীকে অন্তরে সাক্ষী রাখিয়া বলিতেছি, তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হইব না!"

রমেশের আর কথা বাহির হইল না, তাহার চোখের প্রান্তে জল দেখা দিল। তখন হেমনলিনী তাহার স্নিগ্ধকরুণ দুই চক্ষু তুলিয়া রমেশের মুখের দিকে স্থির করিয়া রাখিল। সেই অনিমেষ দৃষ্টি রমেশের প্রতি নীরবে সংশয়লেশহীন ধ্রুববিশ্বাস নিবেদন করিল—তাহার পরে সহসা বিগলিত অশ্রুধারা হেমনলিনীর দুই কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সেই নিভৃত বাতায়নতলে দুইজনের মধ্যে একটি বাক্যবিহীন শান্তি ও সান্ত্বনার স্বর্গখণ্ড

স্থগিত হইয়া গেল—জনসমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল, খরস্রোত সংসারের আঘাত-অভিঘাত ক্ষণকালের জন্য তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ এই অশ্রুজলপ্লাবিত সুগভীর মৌনের মধ্যে হৃদয়মন নিমগ্ন রাখিয়া একটি আরামের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ কহিল—"কেন আমি এখন সপ্তাহের জন্য বিবাহ স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তাহার কারণ কি তুমি জানিতে চাও ?"

হেমনলিনী নীরবে মাথা নাড়িল—সে জানিতে চায় না।

রমেশ কহিল, "বিবাহের পরে আমি তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিব।"

এই কথাটায় হেমনলিনীর কপোলের কাছটা একটুখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

আজ আহারান্তে হেমনলিনী যখন রমেশের সহিত মিলনপ্রত্যাশায় উৎসুকচিত্তে সাজ করিতেছিল, তখন সে অনেক হাসিগল্প, অনেক নিভৃত পরামর্শ, অনেক ছোটখাট সুখের ছবি কল্পনায় সৃজন করিয়া লইতেছিল। কিন্তু এই যে অল্প কয় মুহূর্ত্তে দুই হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাসের মালা বদল হইয়া গেল—এই যে চোখের জল ঝরিয়া পড়িল, কথাবার্ত্তা কিছুই হইল না, কিছুক্ষণের জন্য দুইজনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিল—ইহার নিবিড় আনন্দ, ইহার গভীর শান্তি, ইহার পরম আশ্বাস সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। চতুর্দ্দিক্ প্রসন্ন হইয়া গেল, সমস্ত সংসার মেঘমুক্ত আনন্দরশ্মিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—উদার আকাশ স্নেহপূর্ণ পিতৃক্রোড়ের মত উভয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

হেমনলিনী কহিল, "তুমি একবার বাবার কাছে যাও, তিনি বিরক্ত হইয়া আছেন।"

রমেশ প্রফুল্লচিত্তে সংসারের ছোট-বড় আঘাত-সংঘাত বুক পাতিয়া লইবার জন্য চলিয়া গেল।

১৬

অন্নদাবাবু সমস্ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠাকে ভয় করিতেন—পাছে তাহাতে তাঁহার পরিপাকের বিপাক বৃদ্ধি পায়; আজিকার গোলমালের পর তিনি একটা শারীরিক দুর্যোগ আশঙ্কা করিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া ছিলেন, এমনসময় রমেশ পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিল। উৎসুক হইয়া তিনি তাহার মুখের দিকে চাহিলেন।

রমেশ কহিল, "নিমন্ত্রণের ফর্দ্দটা যদি আমার হাতে দেন, তবে দিনপরিবর্ত্তনের চিঠিগুলি আজই রওনা করিয়া দিতে পারি।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "তবে দিনপরিবর্ত্তনই স্থির রহিল ?"

রমেশ কহিল, "হাঁ, অন্য উপায় আর কিছুই দেখি না !"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "দেখ বাপু, তবে আমি ইহার মধ্যে নাই। যাহা কিছু বন্দোবস্ত করিবার, সে তুমিই করিয়ো। আমি লোক হাসাইতে পারিব না। বিবাহব্যাপারটাকে যদি নিজের মর্জ্জি অনুসারে ছেলেখেলা করিয়া তোল, তবে আমার মত বয়সের লোকের ইহার মধ্যে না থাকাই ভাল। এই লও তোমার নিমন্ত্রণের ফর্দ্দ। ইতিমধ্যে আমি কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার

অনেকটাই নষ্ট হইবে। এমনি করিয়া বার-বার টাকা জলে ফেলিয়া দিতে পারি, এমন সঙ্গতি আমার নাই!"

নিজেকে ক্রিয়াকর্ম্মের গোলমাল হইতে বাঁচাইবার এই সুযোগটুকু পাইয়া অন্নদাবাবু ভিতরে-ভিতরে কিছু যে আশ্বস্ত হন নাই, তাহা বলিতে পারি না। পরের প্রতি দোষারোপ করিবার সুখ এবং কর্ম্মের ঝঞ্ঝাট্ হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আরাম, দুটাই তাঁহার পক্ষে উপাদেয়। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপেরও সম্ভাবনা আছে।

রমেশ সমস্ত ব্যয় ও ব্যবস্থার ভার নিজের স্কন্ধে লইতেই প্রস্তুত হইল। সে উঠিবার উপক্রম করিতেছে, এমন-সময় অন্নদাবাবু কহিলেন—"রমেশ, বিবাহের পরে তুমি কোথায় প্র্যাক্‌টিস্ করিবে, কিছু স্থির করিয়াছ? কলিকাতায় নয়?"

রমেশ কহিল—"না। পশ্চিমে একটা ভাল জায়গার সন্ধান করিতেছি।"

অন্নদাবাবু। সেই ভাল, পশ্চিমই ভাল। এটোয়া ত মন্দ জায়গা নয়। সেখানকার জল হজমের পক্ষে অতি উত্তম—আমি সেখানে মাসখানেক ছিলাম—সেই একমাসে আমার আহারের পরিমাণ ডবল বাড়িয়া গিয়াছিল। দেখ বাপু, সংসারে আমার ঐ একটিমাত্র মেয়ে—আমি সর্ব্বদা উহার কাছে-কাছে না থাকিলে সে-ও সুখী হইবে না, আমিও নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না। তাই আমার ইচ্ছা, তোমাকে একটা স্বাস্থ্যকর জায়গা বাছিয়া লইতে হইবে।

অন্নদাবাবু রমেশের একটা অপরাধের অবকাশ পাইয়া সেই সুযোগে নিজের বড় বড় দাবীগুলা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। সে সময়ে রমেশকে তিনি যদি এটোয়া না বলিয়া গারো বা চেরাপুঞ্জির কথা বলিতেন, তবে তৎক্ষণাৎ সে রাজি হইত। সে কহিল, "যে আজ্ঞা, আমি এটোয়াতেই প্র্যাক্‌টিস্ করিব।"—এই বলিয়া রমেশ নিমন্ত্রণ-প্রত্যাখ্যানের কার্য্যভার লইয়া প্রস্থান করিল।

অনতিকাল পরে অক্ষয় ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, "অন্নদাবাবু, আজকের খবরের কাগজে দেখিয়াছেন ত—কাল সহরে ২৩৫ জন রোগে মরিয়াছে।"

অন্নদাবাবু কহিলেন—"মরুক্ না, আমার তাহাতে কি?"

অক্ষয় ভাবিল, "একি হইল—আজ এতবড় মৃত্যুতালিকাতেও অন্নদাবাবুর রুচি নাই? নিশ্চয় একটা গুরুতর অনর্থপাত কিছু ঘটিয়াছে।"

অক্ষয় মৃদুস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, "আপনার শরীর—"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "আমার শরীর চুলোয় যাক্ গে—এদিকে রমেশ তাহার বিবাহের দিন একসপ্তাহ পিছাইয়া দিয়াছে!"

অক্ষয়। না না, আপনি বলেন কি! সে কি কখনো হইতে পারে? পরশু যে বিবাহ।

অন্নদা। হইতে ত না পারাই উচিত ছিল—সাধারণ লোকের ত এমনতর হয় না। কিন্তু আজকাল তোমাদের যে-রকম কাণ্ড দেখিতেছি, সবই সম্ভব।

অক্ষয় অত্যন্ত মুখ গম্ভীর করিয়া আড়ম্বর-সহকারে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছু-

ক্ষণ পরে কহিল, "আপনারা যাহাকে একবার সৎপাত্র বলিয়া ঠাওরাইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে দুটি চক্ষু বুজিয়া থাকেন। মেয়েকে যাহার হাতে চিরদিনের মত সমর্পণ করিতে যাইতেছেন, ভাল করিয়া তাহার সম্বন্ধে খোঁজখবর রাখা উচিত। হোক্ না কেন সে স্বর্গের দেবতা, তবু সাবধানের বিনাশ নাই।"

অন্নদা। রমেশের মত ছেলেকেও যদি সন্দেহ করিয়া চলিতে হয়, তবে ত সংসারে কাহারো সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অক্ষয়। আচ্ছা, এই যে, দিন পিছাইয়া দিতেছেন, রমেশবাবু তাহার কারণ কিছু বলিয়াছেন?

অন্নদাবাবু মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—"না, কারণ ত কিছুই বলিল না—জিজ্ঞাসা করিলে বলে, বিশেষ দরকার আছে।"

অক্ষয় মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ একটু হাসিল মাত্র। তাহার পরে কহিল, "বোধ হয় আপনার মেয়ের কাছে রমেশবাবু একটা কারণ নিশ্চয় কিছু বলিয়াছেন।"

অন্নদাবাবু। সম্ভব বটে।

অক্ষয়। তাঁহাকে একবার ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলে ভাল হয় না?

"ঠিক বলিয়াছ" বলিয়া অন্নদাবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেমনলিনীকে ডাক দিলেন। হেমনলিনী ঘরে ঢুকিয়া অক্ষয়কে দেখিয়া তাহার বাপের পাশে এমন করিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে অক্ষয় তাহার মুখ না দেখিতে পায়।

অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিবাহের দিন যে হঠাৎ পিছাইয়া গেল, রমেশ তাহার কারণ তোমাকে কিছু বলিয়াছেন?"

হেমনলিনী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"না।"

অন্নদাবাবু। তুমি তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা কর নাই?

হেমনলিনী। না।

অন্নদাবাবু। আশ্চর্য্য ব্যাপার! যেমন রমেশ, তুমিও দেখি তেম্‌নি। তিনি আসিয়া বলিলেন, 'আমার বিবাহে ফুরসৎ হইতেছে না'—তুমিও বলিলে, 'বেশ ভাল, আর একদিন হইবে!' বাস্, আর কোন কথাবার্ত্তা নাই!

অক্ষয় হেমনলিনীর পক্ষ লইয়া কহিল, "একজন লোক যখন স্পষ্টই কারণ গোপন করিতেছে, তখন সে কথা লইয়া তাহাকে কি কোন প্রশ্ন করা ভাল দেখায়? যদি বলিবার মত কিছু হইত, তবে ত রমেশবাবু আপনিই বলিতেন!"

হেমনলিনীর মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে কহিল, "এই বিষয় লইয়া আমি বাহিরের লোকের কাছে কোন কথাই শুনিতে চাই না। যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই, সংশয় নাই—অন্যলোকের যদি অত্যন্ত দুশ্চিন্তা জন্মিয়া থাকে, তবে সেটা আমি সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিয়া জ্ঞান করি!"

এই বলিয়া হেমনলিনী দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অক্ষয় পাংশু মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল—"সংসারে বন্ধুর কাজটাতেই সব চেয়ে লাঞ্ছনা বেশি। সেইজন্যই আমি বন্ধুত্বের গৌরব বেশি অনুভব করি। আপনারা আমাকে ঘৃণা করুন আর গালি দিন, রমেশকে সন্দেহ করাই আমি বন্ধুর কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। আপনাদের যেখানে কোনো বিপদের সম্ভা-

বনা দেখি, সেখানে আমি অসংশয়ে থাকিতে পারি না—আমার এই একটা মস্ত দুর্ব্বলতা আছে, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। যাই হোক্, যোগেন্ ত কালই আসিতেছে, সে-ও যদি সমস্ত দেখিয়া-শুনিয়া নিজের বোনের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকে, তবে এ বিষয়ে আমি আর কোন কথা কহিব না।”

রমেশের ব্যবহারসম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার সময় আসিয়াছে, অন্নদাবাবু এ কথা একেবারে বোঝেন না, তাহা নহে—কিন্তু সন্দেহ না করিলেই নিশ্চিন্ত থাকা সম্ভব এবং নিশ্চিন্ত থাকিলেই সুস্থ থাকিবার আশা করা যায়। যাহা অগোচরে আছে, তাহাকে বলপূর্ব্বক আলোড়িত করিয়া তাহার মধ্য হইতে হঠাৎ একটা ঝঞ্ঝা আবিষ্কারের সম্ভাবনায় তিনি স্বভাবত তাহাতে কিছুমাত্র আগ্রহবোধ করেন না। মুনিসিপ্যালিটির আচরণসম্বন্ধে আশঙ্কা ও আতঙ্ককে প্রশ্রয় দিতে তিনি উৎসাহ অনুভব করেন, কারণ, কলিকাতা-সহর তাঁহার কন্যা নহে—কিন্তু উদ্বেগকে তিনি যে-কোন প্রকারে হউক্ নিজের ঘরের মধ্য হইতে ঠেকাইয়া রাখিতে চান। কারণ সেখানে তাহার আবির্ভাব হইলে বন্ধুবান্ধবদের সহিত তাহার সম্বন্ধে কেবল আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত থাকিবার জো থাকে না—সে তাঁহার দুর্ব্বল পাকস্থলী এবং অনিদ্রাপীড়িত ললাটফলককে খাতির করিয়া চলিবে না, ইহা তিনি নিশ্চয় জানেন। এই কারণে অন্নদাবাবু যেখানে নিশ্চিন্তমনে সন্দেহ করিতে পারেন, সেখানে সন্দেহ করিতেই ভালবাসেন এবং যেখানে চিন্তা করা উচিত ও স্বাভাবিক, সেখানেই তিনি নিঃসন্দিগ্ধ থাকিতে ইচ্ছা করেন।

অক্ষয়ের উপর তাঁহার অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি কহিলেন, “অক্ষয়, তোমার স্বভাবটা বড় সন্দিগ্ধ! প্রমাণ না পাইয়া কেন তুমি—”

অক্ষয় আপনাকে দমন করিতে জানে, কিন্তু উত্তরোত্তর আঘাতে আজ তাহার ধৈর্য্য ভাঙিয়া গেল। সে উত্তেজিত হইয়া কহিল, “দেখুন অন্নদাবাবু, আমার অনেক দোষ আছে! আমি সৎপাত্রের প্রতি ঈর্ষা করি, আমি সাধুলোককে সন্দেহ করি। ভদ্রলোকের মেয়েদের ফিলজফি পড়াইবার মত বিদ্যা আমার নাই এবং তাঁহাদের সহিত কাব্য আলোচনা করিবার স্পর্দ্ধাও আমি রাখি না—আমি সাধারণ দশজনের মধ্যেই গণ্য—কিন্তু চিরদিন আমি আপনাদের প্রতি অনুরক্ত, আপনাদের অনুগত। রমেশবাবুর সঙ্গে আর-কোন বিষয়ে আমার তুলনা হইতে পারে না—কিন্তু এইটুকুমাত্র অহঙ্কার আমার আছে, আপনাদের কাছে কোনদিন আমার কিছু লুকাইবার নাই! আপনাদের কাছে আমার সমস্ত দৈন্য প্রকাশ করিয়া আমি ভিক্ষা চাহিতে পারি, কিন্তু সিঁদ কাটিয়া চুরি করা আমার স্বভাব নহে। এ কথার কি অর্থ, তাহা কালই আপনারা বুঝিতে পারিবেন।”

১৭

চিঠি বিলি করিয়া দিতে রাত হইয়া পড়িল। রমেশ শুইতে গেল, কিন্তু ঘুম হইল না। তাহার মনের ভিতরে গঙ্গাযমুনার মত শাদা-কালো দুই রঙের চিন্তাধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দুইটার কল্লোল একসঙ্গে মিশিয়া তাহার বিশ্রামক্ষণকে মুখর করিয়া তুলিতেছিল।

বারকয়েক পাশ ফিরিয়া সে উঠিয়া পড়িল। জানলার কাছে দাঁড়াইয়া দেখিল, শরৎরাত্রির নিস্তব্ধ আকাশ চাঁদের আলোতে বিহ্বল হইয়া গেছে। তাহাদের জনশূন্য-গলির এক পাশে বাড়ীগুলির ছায়া, আর-এক পাশে শুভ্র জ্যোৎস্নার রেখা। এক-দিকের গৃহশ্রেণী সহাস্য নিদ্রিত গৌরতনু উলঙ্গ শিশুদের মত ধব্‌ধব্‌ করিতেছে, আর তাহার সম্মুখদিকের বাড়ীগুলি কালো-কাপড়-পরা জাগ্রত প্রহরীর মত অন্ধকারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

নিশীথরাত্রে সুপ্ত রাজধানীর উপর যখন জ্যোতিষ্কলোক হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া আসে, তখন তাহার মধ্যে মাধুরীমিশ্রিত একটি অপরূপ গাম্ভীর্য্য বিরাজ করে। সুখ-দুঃখ লাভ-ক্ষতির এতবড় বিরাট্‌ উদ্দাম চেষ্টা যখন একেবারে পরাভব মানিয়া শিশুর মত অনন্তের ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করে—তখন সেই অভিভূত বিপুল কর্ম্মশালার উপরে একাকী যোগাসনে আসীন সেই অনন্তের অবিচলিত মুখশ্রী সৌধশিখরসঙ্কুল আকাশতলে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ অরণ্যে-সমুদ্রে-গিরিশিখরে দেখা যায় না।

রমেশ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যাহা নিত্য, যাহা শান্ত, যাহা বিশ্বব্যাপী, যাহার মধ্যে দ্বন্দ্ব নাই, দ্বিধা নাই, রমেশের সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি বিগলিত হইয়া তাহার মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল। যে শব্দবিহীন সীমা-বিহীন মহালোকের নেপথ্য হইতে চিরকাল ধরিয়া জন্ম এবং মৃত্যু, কর্ম্ম এবং বিশ্রাম, আরম্ভ এবং অবসান, কোন্‌ অশ্রুত সঙ্গীতের অপরূপ তালে বিশ্বরঙ্গভূমির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে—রমেশ সেই আলো-অন্ধকারের অতীত দেশ হইতে নরনারীর যুগল প্রেমকে এই নক্ষত্রদীপালোকিত নিখিলের মধ্যে আবির্ভূত হইতে দেখিল। রমেশ ক্ষণকালের জন্য আপন ভালবাসাকে সংসার হইতে সুদূরে বিচ্ছিন্ন করিয়া এক বিশ্ববিস্তৃত মহি-মার মধ্যে শান্ত শুদ্ধ সুন্দর সম্পূর্ণমূর্ত্তিতে দেখিতে পাইল। সেই অম্লান প্রেমের চারি-দিক্‌ হইতে ক্ষুব্ধ জনসমাজের সমস্ত ভয়, সংশয়, ঈর্ষা, বিরোধ, ভ্রান্তি স্খলিত হইয়া পড়িল, বাধা ও বিচ্ছেদ কুহেলিকার মত বিলীন হইয়া গেল।

রমেশ তখন ধীরে ধীরে ছাদের উপর উঠিল। অন্নদাবাবুর বাড়ীর দিকে চাহিল। সমস্ত নিস্তব্ধ। বাড়ীর দেয়ালের উপরে, কার্ণিশের নীচে, জান্‌লা-দরজার খাঁজের মধ্যে, চুনবালিখসা ভিতের গায়ে জ্যোৎস্না এবং ছায়া বিচিত্র আকারের রেখা ফেলি-য়াছে।

আজ অপরাহ্নে রমেশ ও হেমনলিনী যে জানলার কাছে দাঁড়াইয়াছিল, সেই জানলাটি তখন ছায়ার মধ্যে অবগুণ্ঠিত হইয়া ছিল। সেই জানলার দিকে চাহিয়া রমেশ হাঁটু গাড়িয়া জোড় হাত করিয়া বসিয়া সেই জ্যোৎস্না-ভিষিক্ত নিস্তব্ধ আকাশের নীচে নিজের ললাট ভূতলে লুণ্ঠিত করিল। তাহার প্রেম একটি বৃহৎ ভক্তিতে প্রসারিত হইয়া গেল। একি বিস্ময়! এই জনপূর্ণ নগরের মধ্যে ঐ সামান্য গৃহের ভিতরে একটি মানবীর বেশে একি বিস্ময়! এই রাজধানীতে কত ছাত্র, কত উকীল, কত প্রবাসী ও নিবাসী আছে,

তাহার মধ্যে রমেশের মত একজন সাধারণ লোক কোথা হইতে একদিন আশ্বিনের পীতাভ রৌদ্রে ঐ বাতায়নে একটি বালিকার পাশে নীরবে দাঁড়াইয়া জীবনকে ও জগৎকে এক অপরিসীম আনন্দময় রহস্যের মাঝখানে ভাসমান দেখিল—একি বিস্ময়! হৃদয়ের ভিতরে আজ একি বিস্ময়, হৃদয়ের বাহিরে আজ একি বিস্ময়! বিশ্বের যে নিগূঢ় অন্তস্তলে প্রাণ ও প্রেম ও সৌন্দর্য্য অনাদিকাল হইতে অহোরাত্র স্বত উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে, সংসারের সমস্ত বন্ধন, জীবনের সমস্ত তুচ্ছতা অতিক্রম করিয়া আজ কেমন করিয়া রমেশ সেই নির্জ্জন অমৃতনির্ঝরের তটে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল! সেজন্য রমেশ আজ রাত্রে কাহার কাছে জীবন সমর্পণ করিবে, কাহার কাছে আপনাকে নত করিয়া, লুণ্ঠিত করিয়া, লুপ্ত করিয়া নিবেদন করিয়া দিবে!

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত রমেশ ছাদে বেড়াইল। ধীরে ধীরে কখন্ একসময়ে খণ্ড চাঁদ সম্মুখের বাড়ীর আড়ালে নামিয়া গেল। পৃথিবীতলে রাত্রির কালিমা ঘনীভূত হইল — আকাশ তখনো বিদায়োন্মুখ আলোকের আলিঙ্গনে পাণ্ডুবর্ণ। অল্প একটুখানি বাতাস জাগিয়া উঠিল—সে বাতাসে শিশিরের স্পর্শ জড়িত। দুটো-একটা গাড়ির চাকার শব্দ শুনা যাইতেছে। গ্রাম হইতে তরকারীবোঝাই গাড়ি সহরের বাজারে যাত্রা করিয়াছে।

রমেশের ক্লান্ত শরীর শীতে শিহরিয়া উঠিল। হঠাৎ একটা আশঙ্কা থাকিয়া-থাকিয়া তাহার হৃৎপিণ্ডকে চাপিয়া ধরিতে লাগিল। মনে পড়িয়া গেল, জীবনের রণক্ষেত্রে কাল আবার সংগ্রাম করিতে বাহির হইতে হইবে। ঐ আকাশে যদিও চিন্তার রেখা নাই, জ্যোৎস্নার মধ্যে চেষ্টার চাঞ্চল্য নাই, রাত্রি যদিও নিস্তব্ধ শান্ত, বিশ্বপ্রকৃতি ঐ অগণ্য নক্ষত্রলোকের চিরকর্ম্মের মধ্যে চিরবিশ্রামে বিলীন—তবু মানুষের আনাগোনা-যোঝাযুঝির অন্ত নাই, সুখে-দুঃখে বাধায়-বিঘ্নে সমস্ত জনসমাজ তরঙ্গিত। অনন্তকালের নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যে, অনন্ত আকাশের নির্ব্বাক্ নিস্তব্ধতায় মানবের এই ক্ষুদ্রজীবনের দুইদিনকার ক্ষোভও নিমগ্ন করিয়া দিতে পারিল না। একদিকে অনন্তের ঐ নিত্য শান্তি, আর-এক দিকে সংসারের এই নিত্য সংগ্রাম—দুই একইকালে একসঙ্গে কেমন করিয়া থাকিতে পারে, দুশ্চিন্তার মধ্যেও রমেশের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে রমেশ বিশ্বলোকের অন্তঃপুরের মধ্যে প্রেমের যে একটি শাশ্বত সম্পূর্ণ শান্তমূর্ত্তি দেখিয়াছিল, সেই প্রেমকেই ক্ষণকাল পরে সংসারের সংঘর্ষে, জীবনের জটিলতায়, পদে পদে ক্ষুব্ধ-ক্ষুণ্ণ দেখিতে লাগিল! ইহার মধ্যে কোন্‌টা সত্য, কোন্‌টা মায়া! রমেশ মনে মনে কহিল, "যদি বিঘ্ন ঘটে, আশার প্রতিমা যদি চূর্ণ হইয়া যায়, জীবন যদি ব্যর্থ হইতে থাকে, তবে জগৎ-চরাচরের মধ্যে প্রেমের এই যে প্রশান্ত বিশ্বরূপ দেখিয়াছি,—যাহাকে ভালবাসি, অনন্তের বক্ষের মধ্যে তাহার যে চিরন্তন প্রসন্নমূর্ত্তি দেখিয়াছি, তাহাকে ভুলিব না, ছাড়িব না, তাহাকে সংসারের সমস্ত বিরোধ-বিচ্ছেদ-ব্যর্থতার অন্তরালে মানসমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিব'—তাহা হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। হে ভগবন্,

আমার সেই আশা, সেই সুখ, সেই মানুষটিকে তোমার মধ্যে তুলিয়া রাখিলাম—সেখানে তাহার আর ক্ষয় নাই, বিকার নাই, অন্ত নাই।"—এই বলিয়া সেই জনশূন্য অন্ধকার ছাদের উপরে আবার সে জোড়হাত করিয়া মস্তক ভূমিতলে অবলুণ্ঠিত করিল।

ক্রমশ।

কৌশল্যা।

ভরদ্বাজমুনি দশরথের মহিষীবৃন্দের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইলে ভরত অঙ্গুলীদ্বারা কৌশল্যাকে দেখাইয়া বলিলেন, "ভগবন্, ঐ যে দীনা, অনশনকৃশা, দেবতার ন্যায় সৌম্যশান্ত মূর্ত্তি দেখিতেছেন, উনিই আমার জ্যেষ্ঠা অম্বা কৌশল্যা।"

এই যে দীনহীনা ব্রতোপবাসক্লিষ্টা দেবীর চিত্র দেখিলাম, ইহাই কৌশল্যার চিরন্তন মূর্ত্তি। ইনি দশরথ রাজার অগ্রমহিষী হইয়াও স্বামীর আদরে বঞ্চিতা। রামচন্দ্রের বনবাস-সংবাদে ইঁহার মনে রুদ্ধ কষ্টের বেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি স্বামীর অনাদরের কথা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—

"ন দৃষ্টপূর্ব্বং কল্যাণং সুখং বা পতিপৌরুষে।"

'স্ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠসুখ স্বামীর অনুরাগ, আমি তাহা লাভ করিতে পারি নাই।'

'স্বামী প্রতিকূল, এজন্য আমি কৈকয়ীর পরিবারবর্গকর্ত্তৃক নিতান্ত নিগৃহীত হইয়া আসিতেছি।'—

"অতো দুঃখতরং কিন্নু প্রমদানাং ভবিষ্যতি।"

'সপত্নীর এরূপ লাঞ্ছনা হইতে স্ত্রীলোকের আর বেশী কি কষ্ট হইতে পারে!'

'যে আমার সেবা করে, কৈকয়ীর ভয়ে সে একান্ত শঙ্কিত হয়। আমি কৈকয়ীর কিঙ্করীবর্গের সমান অথবা উহাদের অপেক্ষাও অধম হইয়া আছি।'

একমাত্র রামের ন্যায় পুত্র লাভ করিয়া তিনি জীবনে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। এই পুত্র সহজে তিনি লাভ করেন নাই,—পুত্রকামনা করিয়া বহু তপস্যা ও নানাপ্রকার শারীরিক কৃচ্ছ্র সাধন করিয়াছিলেন। আমরা রামায়ণের আদিকাণ্ডে দেখিতে পাই, পুত্রকামনায় তিনি একদা স্বয়ং যজ্ঞের অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া সারারাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এই ব্রতনিরতা ক্ষৌমবাসা সাধ্বী চিরনম্রমধুরপ্রকৃতিসম্পন্না। ভগ্নীবৎ স্নিগ্ধ ব্যবহার দ্বারা তিনি কৈকয়ীর নিষ্ঠুরতার শোধ দিয়াছিলেন; ভরত কৈকয়ীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "কৌশল্যা চিরদিনই তোমাকে ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন, তুমি তাঁহার প্রতি এরূপ বজ্রাঘাত কেন করিলে?" ক্ষমাশীলা কৌশল্যা কৈকয়ীর শত অত্যাচার ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার স্বামীর চিত্তে একাধিপত্য-

স্থাপন সত্ত্বেও তাঁহাকে ভগ্নীর মত ভালবাসিতেন। জ্যেষ্ঠা মহিষীর এই ক্ষমা ও উদার স্নিগ্ধতার তুলনা কোথায়? দশরথ অনেক সময়েই কৈকয়ীর গৃহে বিশ্রাম করিতেন, তাহাও আমরা ভরতের কথাতেই জানিতে পারি।—"রাজা ভবতি ভূয়িষ্ঠমিহাম্বায়া নিবেশনে।" সুতরাং কৌশল্যাকে আমরা যখনই দেখিতে পাই, তখনই তাঁহাকে ব্রত ও পূজার্চ্চনাদিতে রত দেখি, স্বামিকর্ত্তৃক নিগৃহীতা কেবল এক স্থানেই শান্তি পাইতে পারেন। জগতে তাঁহার দাঁড়াইবার স্থান নাই, কিন্তু যিনি অনাথের আশ্রয়, যাঁহার স্নেহকোমল বাহু ব্যথিতকে আদরে ক্রোড়ে লইয়া শান্তিদান করে, সেই পরমদেবতাকে কৌশল্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাই সংসারের দুঃখ সহ্য করিয়া তাঁহার চরিত্র কঠোর কিংবা কটু হইয়া যায় নাই, উহা যেন আরও অমৃতরসে ভরপুর হইয়া উঠিয়াছিল। রামায়ণে দেবসেবানিরতা কৌশল্যাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন তিনি সর্ব্বদা সংসারের তাড়না ভুলিবার জন্য ভগবানের আশ্রয়ভিক্ষা করিয়া কালাতিপাত করিতেন।

এই দুঃখিনীর একমাত্র সুখ রামের মত পুত্রলাভ। যেদিন রামচন্দ্র তাঁহাকে স্বীয় অভিষেকের সংবাদ দিলেন, সেদিন তিনি দেবতাদিগের প্রীতিতে একান্তরূপ আস্থাস্থাপন করিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার পূজা-অর্চ্চনা সমস্তই এতদিনে সার্থক হইল। তিনি, রামচন্দ্রের শত শত গুণের মধ্যে যে মহাগুণে তিনি পিতৃস্নেহ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, সেই গুণ স্মরণেই একান্ত প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন—

"কল্যাণে বত নক্ষত্রে ময়া জাতোঽসি পুত্রক।
যেন ত্বয়া দশরথো গুণৈরারাধিতঃ পিতা॥"

'তুমি অতি শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তাই তুমি স্বগুণে দশরথ রাজার প্রীতিলাভ করিতে পারিয়াছ।' দশরথ রাজার স্নেহলাভ যে কি দুর্লভ ভাগ্যের ফল, সাধ্বী তাহা আজীবন তপস্যা করিয়া জানিয়াছিলেন। শুভাভিষেকস্মরণে রাণী গলদশ্রু বস্ত্রাঞ্চলাগ্রে মার্জ্জনা করিয়া রামচন্দ্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রামের অভিষেক-উৎসব; এতদিনে দুঃখিনী মাতা আজ আনন্দের আহ্বানে আমন্ত্রিত হইয়াছেন। কিন্তু তিনি মহার্ঘ বস্ত্রালঙ্কারে শোভিত হইয়া হর্ষগর্ব্বস্ফুরিতাধরে এই প্রসঙ্গে প্রগল্‌ভা রমণীর ন্যায় আচরণ করিলেন না। মন্থরা-দাসী শশাঙ্কসঙ্কাশ-প্রাসাদ-শীর্ষে দাঁড়াইয়া মনে মনে ভাবিল—"রামমাতা ধনং কিন্নু জনেভ্যঃ সম্প্রযচ্ছতি।" কৌশল্যা দরিদ্র, ব্রাহ্মণ ও যাচকদিগকে ধনদান করিতেছিলেন। রাম দেখিলেন, তিনি পবিত্র পট্টবস্ত্র পরিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন ও একমনে বিষ্ণুপূজায় রত রহিয়াছেন। ধর্ম্মিষ্ঠা কৌশল্যা দেবসেবা করিয়া সফলকামা হইয়াছেন, সেই দেবসেবায় তিনি আরও আগ্রহসহকারে নিযুক্ত হইলেন।

এই স্থানে রামচন্দ্র মাতাকে নিষ্ঠুর বনবাস-সংবাদ শুনাইলেন; সে সংবাদ পুত্রসম্বল জননীর হৃদয় বিদীর্ণ করিল।

"সা নিকৃত্তেব শালস্য যষ্টিঃ পরশুনা বনে।
পপাত সহসা দেবী দেবতেব দিবশ্চ্যুতা।"

অরণ্যে কুঠারাঘাতে কর্ত্তিত শালযষ্টির ন্যায়,—স্বর্গচ্যুত দেবতার ন্যায় দেবী কৌশল্যা

সহসা ভূতলে পড়িয়া গেলেন;—পড়িয়া গেলেন, কিন্তু দশরথের মত প্রাণত্যাগ করিলেন না।

দশরথ স্বকৃত পাপের ফলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, রামকে বনে পাঠাইয়া তাঁহার গভীর শোক হইয়াছিল, কিন্তু বিনা অপরাধে এই কার্য্য করার জন্ত তাঁহার তদপেক্ষা গভীরতর মনস্তাপ ঘটিয়াছিল। তিনি শোকে মরিলেন, কি লজ্জায় মরিলেন, চিরসুখাভ্যস্ত কুমারকে জটা ও চীরবাস পরিহিত দেখিয়া সেই কষ্টই তাঁহার অসহনীয় হইল কিংবা যিনি কোন অপরাধে অপরাধী নহেন, তাঁহাকে অপরাধিনীর বাক্যে এই নির্ব্বাসনদণ্ড দেওয়ার লজ্জা তাঁহাকে অভিভূত করিল, নিশ্চয় করিয়া বলা সুকঠিন। আজন্মতপস্বিনী কৌশল্যার পুত্রবিরহে গভীর শোক হইল, কিন্তু দশরথের মত অনুতপ্ত হইবার তাঁহার কোন কারণ ছিল না। বিশেষত দশরথ চিরসুখাভ্যস্ত, গার্হস্থ্যজীবনে স্নেহের অভিশাপ তিনি এই প্রথমবার পাইলেন, বৃদ্ধবয়সে তাহা সহ্য করিবার শক্তি হইল না। কৌশল্যা চিরদুঃখিনী, চিরস্নেহবঞ্চিতা, দেবতায় বিশ্বাসপরায়ণা। এই দুঃখ পূর্ব্ববর্ত্তী দুঃখরাশির প্রকারভেদ মাত্র, তিনি স্নেহজনিত কষ্ট অনেক সহিয়াছিলেন, তাহা সহিতে সহিতে ধর্ম্মশীলার অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা জন্মিয়াছিল; তিনি এই মহাদুঃখের সময় যে অপূর্ব্ব সহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া তুলে।

বনগমনসম্বন্ধে তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "তুমি পিতৃসত্যরক্ষণার্থ বনে যাওয়া স্থির করিয়াছ, কিন্তু মাতার নিকট কি তোমার কোন ঋণ নাই! আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, তুমি এখানে থাকিয়া এই বৃদ্ধকালে আমার পরিচর্য্যা কর, তাহাতে তুমি ধর্ম্মে পতিত হইবে না। পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে যাইয়া মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ধর্ম্মসঙ্গত হইবে না।" শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন, "আমি পূর্ব্বেই প্রতিশ্রুত হইয়াছি, বিশেষ পিতা তোমার এবং আমার উভয়েরই প্রত্যক্ষ দেবতা, পিতৃ-আদেশে ঋষি কণ্ডু গোহত্যা করিয়াছিলেন, জামদগ্ন্য স্বীয় মাতা রেণুকার শিরশ্ছেদ করিয়াছিলেন, আমাদের পূর্ব্বপুরুষ সাগরের পুত্রগণ পিতৃ-আদেশে দুরূহ ব্রত অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, পিতৃ-আদেশ আমি লঙ্ঘন করিতে পারিব না। তিনি কাম কিংবা মোহ বশত যদি এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকেন, তাহা আমার বিচার্য্য নহে, —তাঁহার প্রতিশ্রুতিপালন আমার অবশ্যকর্ত্তব্য।" কৌশল্যা বলিলেন, "দেখ, বনের গাভীগুলিও তাহাদের বৎসের অনুসরণ করিয়া থাকে, তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিরূপে বাঁচিব? তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল, তোমার মুখ দেখিয়া তৃণ খাইয়া জীবনধারণ করাও আমার পক্ষে শ্রেয়।" রাম বলিলেন, "পিতা তোমারও প্রত্যক্ষদেবতা, তাঁহার পরিচর্য্যাই তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ ব্রত, তুমি সংযতাহারী হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠানে এই চতুর্দ্দশবৎসর অতিবাহিত কর, এই-সময়অন্তে শীঘ্র আমি ফিরিয়া আসিয়া তোমার শ্রীচরণবন্দনা করিব।" লক্ষ্মণ ঘোর বাখিতণ্ডা উত্থাপিত করিয়া রামচন্দ্রকে এই অন্যায়-আদেশ-প্রতিপালন হইতে প্রতিনিবৃত্ত

করিতে চেষ্টা পাইতেছিলেন; সজল নেত্র-প্রান্তের অশ্রু অঞ্চলাগ্রে মুছিতে মুছিতে কৌশল্যা সকলই শুনিতেছিলেন—তাঁহার পার্শ্বে ধর্ম্মাবতার সৌম্যমূর্ত্তি মাতৃদুঃখে বিষণ্ণ রামচন্দ্র ধর্ম্মের জন্য, পবিত্র প্রতিশ্রুতিপালনের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবার অটল সঙ্কল্প স্নেহবশীভূত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জ্ঞাপন করিতেছিলেন, এবং ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণের হস্তধারণপূর্ব্বক তাঁহার উত্তেজনাপ্রশমনার্থ অনুনয় করিয়া বলিতেছিলেন;—দেবীরূপিণী কৌশল্যা দেবরূপী পুত্রের অপূর্ব্ব ধর্ম্মভাব দেখিয়া অপূর্ব্বভাবে সহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন;—ধর্ম্মের কথা কৌশল্যার হৃদয়ে ব্যর্থ হইবার নহে। সহসা পুত্রশোকার্দ্রা মহিষী ধীরগম্ভীর মূর্ত্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং রামের বনগমন অনুমোদন করিয়া অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন—

> "গচ্ছ পুত্র ত্বমেকাগ্রো ভদ্রস্তেঽস্তু সদা বিভো।
> পুনস্ত্বয়ি নিবৃত্তে তু ভবিষ্যামি গতক্লমা॥
> পিতুরানৃণ্যতাং প্রাপ্তে স্বপিষ্যে পরমং সুখম্।
> গচ্ছেদানীং মহাবাহো ক্ষেমেণ পুনরাগতঃ।
> নন্দয়িষ্যসি মাং পুত্র সাম্না শ্লক্ষ্ণেন চারুণা॥"

"পুত্র, তুমি একাগ্রমনে বনগমন কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি ফিরিয়া আসিলে আমার সমস্ত দুঃখ অপনোদিত হইবে। তুমি এই চতুর্দ্দশবৎসর ব্রতপালনপূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইলে আমি পরমসুখে নিদ্রা যাইব। বৎস, এখন প্রস্থান কর, নির্ব্বিঘ্নে পুনরাগত হইয়া হৃদয়হারী নির্ম্মল সান্ত্বনাবাক্যে আমাকে আনন্দিত করিও।" সেই করুণ শোকধ্বনি, ধর্ম্মপূর্ণ সঙ্কল্প ও ক্রোধের নানাকথায় মুখরিত প্রকোষ্ঠে কৌশল্যাদেবীর এই চিত্র সহসা মহত্ত্বগৌরবে আপূরিত হইয়া উঠিল। কৌশল্যাদেবী যে দেবতাদিগকে রামের অভিষেকের জন্য পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগকেই বনে রামের শুভসম্পাদনের জন্য প্রার্থনা করিয়া পুনরায় পূজা করিতে লাগিলেন। কৃতাঞ্জলি হইয়া রামের বনবাসে শুভকামনা করিয়া বলিতে লাগিলেন—"হে ধর্ম্ম, তোমাকে আমার বালক আশ্রয় করিয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা করিও। হে দেবগণ, চৈত্য ও আয়তন সমূহে রাম তোমাদিগকে নিত্য পূজা করিয়াছে, তোমরা ইহাকে রক্ষা করিও। হে বিশ্বামিত্রপ্রদত্ত দেবপ্রভাব অস্ত্রসকল, তোমরা রামকে রক্ষা করিও। পিতৃমাতৃসেবা দ্বারা যে পুণ্যসঞ্চয় করিয়াছে, সেই সকল পুণ্য যেন বনাশ্রিত রামকে রক্ষা করে।" অশ্রুপূর্ণচক্ষে ধর্ম্মশীলা কৌশল্যা একটি একটি করিয়া সমস্ত দেবতার নিকট রামচন্দ্রের মঙ্গলকামনা করিলেন। পুত্রের মস্তকে শুভাশিষপ্রদায়ী হস্ত অর্পণ করিয়া বলিলেন—"আমার মুনিবেশধারী ফলমূলোপজীবী কুমার যেন রাক্ষস ও দানবদিগের হস্ত হইতে রক্ষিত হয়; দংশ, মশক, বৃশ্চিক, কীট ও সরীসৃপেরা যেন ইহার শরীর স্পর্শ না করে; সিংহ, ব্যাঘ্র, মহাকায় হস্তী, বরাহ, শৃঙ্গী ও মহিষেরা এবং নরখাদক রাক্ষসগণ যেন ধর্ম্মাশ্রিত পিতৃসত্যপালনরত ত্যাগী বালকের দ্রোহাচরণ না করে। হে পুত্র, তোমার পথ সুখকর হউক, তোমার পরাক্রম সতত সিদ্ধ হউক,—তুমি বনে গমন কর, আমি অনুমতি দিতেছি।"—বলিতে বলিতে ধর্ম্মশীলা রাণী গৌরবদৃপ্ত হইয়া পূজার উপকরণ লইয়া ধ্যানস্থ হইলেন, তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস এতটুকুও

শিথিল হইল না। যে পবিত্র যজ্ঞাগ্নি অভিষেকের শুভকামনায় প্রজ্বালিত করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি পুত্রের বনপ্রস্থানকল্পে মঙ্গলভিক্ষা করিয়া পুনরায় ঘৃতাহুতি দিতে লাগিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুনরায় প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "বৃত্রনাশকালে ভগবান্ ইন্দ্রকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন; দেবগণ অমৃত-লাভোদ্দেশে কঠোর তপঃসাধন করিবার পর যে মঙ্গল তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রকে সেই মঙ্গল আশ্রয় করুন; স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল আক্রমণ করিবার সময় বামনরূপী বিষ্ণুকে যে মঙ্গল আশ্রয় করিয়াছিলেন, সেই মঙ্গল বনবাসী রামচন্দ্রকে আশ্রয় করুন।" সহসা ধর্ম্মপ্রাণা কৌশল্যা ধর্ম্মের অপূর্ব্ব ও গম্ভীর শান্তি লাভ করিলেন। তিনি স্থির ও স্নেহগদ্গদ কণ্ঠে রামচন্দ্রকে বলিলেন, "পুত্র, তুমি সুখে বনগমন কর, রোগশূন্য শরীরে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিও। এই চতুর্দ্দশবৎসর নিবিড় কৃষ্ণারজনীর ন্যায় কাটিয়া যাইবে, অযোধ্যার রাজপথে তুমি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হইবে, আমি তোমাকে লাভ করিয়া সুখী হইব। পিতাকে ঋণ হইতে উদ্ধার করিয়া, সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিয়া তুমি পুনঃপ্রত্যাগত হইবে, আমি সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় জীবন ধারণ করিয়া রহিলাম।"

তৎপরে যখন রামচন্দ্র শেষ-বিদায়-গ্রহণের জন্য রাজসকাশে উপস্থিত হন, তখন সমস্ত মহিষীবর্গ ও সচিবমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা কৈকয়ীকে নিন্দা করিয়া ও দশরথের অন্যায় প্রতিশ্রুতির উপর কটাক্ষপাত করিয়া ঘোর বাগ্বিতণ্ডা উপস্থিত করিলেন, কত জনে কত কথা বলিতে লাগিলেন,—রাজকুমারদ্বয় ও সীতার হস্তে কৈকয়ী চীরবাস প্রদান করিলেন; সেই অভিষেকব্রতোজ্জ্বল রাজকুমার রাজপরিচ্ছদ খুলিয়া জটাবল্কলধারী হইয়া দাঁড়াইলেন, এই মর্ম্মবিদারক দৃশ্য বৃদ্ধ সচিব সিদ্ধার্থ, সুমন্ত্র এবং কুলপুরোহিত বসিষ্ঠের চক্ষে অসহ্য হইল—তাঁহারা কৈকয়ীর তীব্র নিন্দা করিতে লাগিলেন, সেই ঘোর তর্ক ও বাগ্বিতণ্ডা পূর্ণ গৃহের এক প্রান্তে অশ্রুমুখী কৌশল্যা উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি কোন কথা বলেন নাই। তাঁহার দিকে চাহিয়া রাম রাজাকে বলিলেন—

"ইয়ং ধার্ম্মিক কৌশল্যা মম মাতা যশস্বিনী।
বৃদ্ধা চাক্ষুদ্রশীলা চ নচ ত্বাং দেব গর্হতে॥
ময়া বিহীনাং বরদ প্রপন্নাং শোকসাগরম্।
অদৃষ্টপূর্ব্বব্যসনাং ভূয়ঃ সংমন্তুমর্হসি॥"

'আমার উদারস্বভাবা যশস্বিনী বৃদ্ধা মাতা আপনার কোনরূপ নিন্দাবাদ করিতেছেন না। আমার বিয়োগে ইনি শোকসাগরে পতিত হইবেন, ইনি এরূপ দুঃখ আর পান নাই, আপনি ইঁহাকে অধিকতর সম্মান প্রদর্শন করিবেন।"

এই দেবী দশরথের অনাদৃতা ছিলেন; কিন্তু দশরথ কি ইঁহার প্রকৃত মর্য্যাদা বুঝিতে পারেন নাই? কৌশল্যা তাঁহার কিরূপ আদরণীয়া, দশরথ তাহা জানিতেন। কৈকয়ীর নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—

'আমি রামকে বনে পাঠাইলে কৌশল্যা আমাকে কি বলিবেন? এরূপ অপ্রিয় কার্য্য করিয়া আমি তাঁহাকে কি উত্তর দিব?'

"যদা যদা চ কৌশল্যা দাসীবচ্চ সখীব চ।
ভার্য্যাবদ্ভগিনীবচ্চ মাতৃবচ্চোপতিষ্ঠতে॥
সততং প্রিয়কামা মে প্রিয়পুত্রা প্রিয়ংবদা।
ন ময়া সৎকৃতা দেবী সৎকারার্হা কৃতে তব॥"

"কৌশল্যা দাসীর ন্যায়, সখীর ন্যায়, স্ত্রীর ন্যায়, ভগিনীর ন্যায় এবং মাতার ন্যায় আমার অনুবৃত্তি করিয়া থাকেন। তিনি আমার নিয়ত হিতৈষিণী এবং প্রিয়ভাষিণী ও প্রিয় পুত্রের জননী। তিনি সর্ব্বতোভাবে সমাদরের যোগ্যা, আমি তোমার জন্য তাঁহাকে আদর করিতে পারি নাই।" কৈকয়ী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়াছিলেন—

"সহ কৌশল্যয়া নিত্যং রন্তুমিচ্ছসি দুর্ম্মতে।"

কিন্তু অযোধ্যা ছাড়িয়া রামচন্দ্র যখন চলিয়া গেলেন, যখন মৌনভাবে কৌশল্যা দশরথের সঙ্গে সঙ্গে রামের রথের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বিসংজ্ঞ হইয়া পড়িলেন, তখন হইতে দশরথের জীবনের শেষ কয়েকটি দিবসে কৌশল্যার প্রতি তাঁহার আদর ও স্নেহ অসীম হইয়া উঠিয়াছিল। দশরথ পথে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু জ্ঞানলাভ করিয়া বলিলেন, "আমাকে মহারাণী কৌশল্যার গৃহে লইয়া চল, আমি অন্যত্র শান্তি পাইব না।" অর্দ্ধরাত্রে শোকাবেগে আচ্ছন্ন হইয়া কৌশল্যাকে তিনি বলিলেন,—"দেবি, রামের রথের ধূলির দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে আমি দৃষ্টিহারা হইয়াছি, আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি না, তুমি আমাকে হস্তদ্বারা স্পর্শ কর।"

নিভৃত প্রকোষ্ঠে দশরথকে পাইয়া কৌশল্যা তাঁহাকে কটূক্তি করিয়াছিলেন। মাতৃপ্রাণের এই নিদারুণ বেদনা, সপত্নীর বশীভূত স্বামীর এই ব্যবহার লোকসমক্ষে তিনি মৌনভাবে সহিয়াছিলেন, কিন্তু আজ সেই কষ্ট তিনি আর সহিতে পারিলেন না। কাঁদিতে কাঁদিতে দশরথকে বলিলেন—"পৃথিবীর সর্ব্বত্র তুমি যশস্বী, প্রিয়বাদী ও বদান্য বলিয়া কীর্ত্তিত। কি বলিয়া তুমি পুত্রদ্বয় ও সীতাকে ত্যাগ করিলে?—সুকুমারী চিরসুখোচিতা জানকী কিরূপে শীতাতপ সহিবেন! সূপকারগণের প্রস্তুত বিবিধ উপাদেয় খাদ্য যিনি আহার করিতে অভ্যস্ত, তিনি বনের কষায় ফল খাইয়া কিরূপে জীবনধারণ করিবেন! রামচন্দ্রের সুকেশান্ত পদ্মবর্ণ ও পদ্মগন্ধিনিশ্বাসযুক্ত মুখ আমি জীবনে আর কি দেখিতে পাইব?" এইরূপ বিলাপ করিতে করিতে কৌশল্যা অধীর হইয়া স্বামীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিলেন—"জলজন্তুরা যেরূপ স্বীয় সন্তানকে ত্যাগ করে, তুমি সেইরূপ করিয়াছ। তুমি রাজ্যনাশ ও পৌরজনের সর্ব্বনাশ করিলে। মন্ত্রীরা একেবারে নিশ্চেষ্ট ও বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছেন, আমিও পুত্রের সহিত উৎসন্ন হইলাম।

গতিরেকা পতির্নার্য্যা দ্বিতীয়া গতিরাত্মজঃ।
তৃতীয়া জ্ঞাতয়ো রাজন্ চতুর্থী নৈব বিদ্যতে॥"

কৌশল্যার মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া দশরথ মুহূর্ত্তকাল দুঃখিতভাবে মৌন হইয়া রহিলেন, তাঁহার যেন সংজ্ঞা লুপ্ত হইয়া আসিল। জ্ঞানলাভান্তে তিনি সাশ্রুনেত্রে, তপ্ত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পার্শ্বে কৌশল্যাকে দেখিয়া পুনরায় চিন্তিত ও মৌন হইলেন। তিনি স্বীয় পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া শোকে দগ্ধ হইতে লাগিলেন এবং অশ্রু-

পূর্ণচক্ষে অধোমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-দেহে কৌশল্যার প্রসাদভিক্ষা করিয়া বলিলেন, "দেবি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও, তুমি স্নেহশীলা ও শত্রুগণের প্রতিও ক্ষমা প্রদর্শন করিয়া থাক। স্বামী গুণবান্ বা নির্গুণ হউন, স্ত্রীলোকের নিত্য গুরু। আমি দুঃখসাগরে পতিত হইয়াছি এবং তোমার স্বামী, এই মনে করিয়া আমার প্রতি অপ্রিয়কথাপ্রয়োগে বিরত হও।" রাজা বদ্ধাঞ্জলি, তাঁহার অশ্রু ও করুণ দৈন্য দর্শনে কৌশল্যার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি রাজার অঞ্জলিবদ্ধ কমলকর ধারণ করিয়া স্বীয় মস্তকে রাখিলেন এবং ত্রস্ত হইয়া ভীতকণ্ঠে বলিলেন — "দেব, আমি তোমার পদতলে আশ্রিতা,— প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি আমার নিকট কৃতাঞ্জলি হইলে সেই পাপে আমার ইহকাল-পরকাল দুইই যাইবে, আমি তোমার ক্ষমার যোগ্য হইব না। চিরারাধ্য স্বামী যাহাকে এইরূপে প্রসন্ন করিতে চান, সে কুলস্ত্রীর মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়াছে,—সে আর কুলস্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না। ধর্ম্ম কি, আমি তাহা জানি,—তুমি সত্যের অবতারস্বরূপ, তাহাও বুঝিতেছি। পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া আমি তোমার প্রতি দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি— আমার প্রতি প্রসন্ন হও। শোকে ধৈর্য্য নষ্ট হয়, শোকে ধর্ম্মজ্ঞান অন্তর্দ্ধান করে, শোকে সর্ব্বনাশ হয়, শোকের মত রিপু নাই। পঞ্চ রাত্রি অতীত হইল রাম অযোধ্যা হইতে গিয়াছে, এই পঞ্চ রাত্রি আমার নিকট পঞ্চ বৎসরের মত দীর্ঘ বোধ হইয়াছে।" এই সময়ে সূর্য্যদেব মন্দরশ্মি হইয়া নভঃপ্রান্তে বিলীন হইলেন এবং ধীরে ধীরে রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল—দশরথ কৌশল্যার কথায় আশ্বস্ত হইয়া নিদ্রিত হইলেন।

এই দাম্পত্যচিত্রে কৌশল্যার অপূর্ব্ব স্বামিভক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দৃশ্যটি সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল, আমরা মূলকাব্যের এই অংশ অশ্রুবেগে পড়িতে পারি নাই।

পররাত্রে দশরথের জীবন শেষ হয়, তখন কৌশল্যা পুত্রশোকে আকুল হইয়া নিদ্রায় আক্রান্তা, তিনি পতির মৃত্যু জানিতে পারেন নাই। পরদিন প্রত্যূষে সেই দুঃখময় রাজ-প্রাসাদের চিরপ্রথানুসারে বন্দিগণ গান আরম্ভ করিল, বীণার মধুর নিক্কণে প্রবুদ্ধ হইয়া শাখাবিহারী ও পিঞ্জরাবদ্ধ বিহগকুল কাকলি করিয়া উঠিল, প্রসুপ্তা কৌশল্যার মুখে বিবর্ণতা ও শোক অঙ্কিত হইয়াছিল—

"নিষ্প্রভা চ বিবর্ণা চ সন্না শোকেন সন্নতা।
ন ব্যরাজত কৌশল্যা তারেব তিমিরাবৃতা॥"

গত ভীষণ রজনীর দুর্ঘটনার চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া যখন উষাদেবী দর্শন দিলেন, তখন মৃত স্বামীকে দেখিয়া মহিষীগণ আকুলিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাষ্পপূর্ণচক্ষে কৌশল্যা স্বামীর মস্তক ধারণ করিয়া কৈকয়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—

"সকামা ভব কৈকেয়ি ভুঙ্‌ক্ষ্ব রাজ্যমকণ্টকম্।"

"রাম বনবাসী হইয়াছেন, রাজা ছাড়িয়া গেলেন, এখন আমি আর কি লইয়া থাকিব?

—ইদং শরীরমালিঙ্গ্য প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্।"

'এই প্রিয়দেহ আলিঙ্গন করিয়া আমি

অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব।' ইহার পরে ভরত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্ঘটনার কোন সংবাদ জানিতেন না; কৈকয়ীর মুখে সমস্ত সংবাদ অবগত হইয়া তাঁহাকে শোকার্ত্তকণ্ঠে ভর্ৎসনা করিয়া বিলাপ করিতেছিলেন, অপর প্রকোষ্ঠ হইতে কৌশল্যা তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া সুমিত্রার দ্বারা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভরত কৌশল্যার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিলেন, "তোমার মাতা রাজ্যকামনায় আমার পুত্রকে চীর ও বল্কল পরাইয়া বনে পাঠাইয়া দিয়াছেন, রাজা স্বর্গগত হইয়াছেন, আমি এখানে কোনরূপেই থাকিতে পারিতেছি না, তুমি ধনধান্যশালিনী অযোধ্যাপুরী অধিকার কর, আমাকে বনে রামের নিকট পাঠাইয়া দাও।" ভরত নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আর্য্যে, আপনি কেন না জানিয়া আমার প্রতি এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতেছেন,—রামের আমি চির-অনুরাগী, আমাকে সন্দেহ করিবেন না।" এই বলিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভরত নানাপ্রকার শপথ করিতে লাগিলেন। রামের প্রতি যদি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, তবে মহাপাতকীদের সঙ্গে যেন অনন্ত নরকে তাঁহার স্থান হয়, ইহাই বিবিধপ্রকারে বিলাপ করিয়া বলিতে লাগিলেন; বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইয়া পরিশ্রান্ত ভরত শোকোচ্ছ্বাসে মৌনী হইয়া রহিলেন। কৌশল্যা বলিলেন—"বৎস, তুমি শপথ করিয়া কেন আমাকে মর্ম্মবেদনা প্রদান করিতেছ? ভাগ্যক্রমে তোমার স্বভাব ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় নাই, আমার দুঃখবেগ এখন আরও প্রবল হইয়া উঠিল।" এই বলিয়া কৌশল্যা ভ্রাতৃবৎসল ভরতকে সস্নেহে ক্রোড়ে লইয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন।

ভরত অযোধ্যার সমস্ত পৌরজনে পরিবৃত হইয়া রামকে আনিতে গেলেন; শোককর্শিতা কৌশল্যা সঙ্গে গিয়াছিলেন। শৃঙ্গবেরপুরীতে ভরত রামের তৃণশয্যা দেখিয়া শোকে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল, তিনি অনেকক্ষণ কথা কহিতে পারেন নাই। ভরত ভূলুণ্ঠিত হইয়া অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছিলেন,—কেহ কিছু জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর করিতে পারিতেছিলেন না,—কৌশল্যা ভরতকে তদবস্থ দেখিয়া দীন ও আর্ত্ত স্বরে ও স্নিগ্ধসম্ভাষণে তাঁহাকে বলিলেন—

"পুত্র ব্যাধির্ন তে কচ্চিচ্ছরীরং প্রতিবাধতে।
ত্বাং দৃষ্ট্বা পুত্র জীবামি রামে সভ্রাতৃকে গতে।"

'পুত্র, তোমার শরীরে ত কোন ব্যাধি উপস্থিত হয় নাই। রাম ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইয়াছেন, এখন তোমার মুখখানি দেখিয়াই আমি জীবনধারণ করিতেছি।'

প্রকৃতপক্ষেও রামের বনগমনের পরে ভরত কৌশল্যারই যেন গর্ভজাত পুত্রের স্থানীয় হইয়াছিলেন—কৈকয়ী তাঁহার বিমাতার ন্যায় হইয়া পড়িয়াছিলেন। চিত্রকূট-পর্ব্বতে রামের সঙ্গে মিলন সঙ্ঘটিত হইল। কৌশল্যা সীতার মুখের উজ্জ্বল শ্রী আতপক্লিষ্ট দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। অশ্রুপূর্ণাক্ষী সীতা শ্বশ্রূমাতাকে প্রণাম করিয়া নীরবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন, কৌশল্যা বলিলেন—"যিনি মিথিলাধিপতির কন্যা, মহারাজ দশরথের পুত্রবধূ এবং রামচন্দ্রের স্ত্রী, তিনি বিজনবনে কেন এত দুঃখ পাইতেছেন?

বৎসে, আতপসন্তপ্ত পদ্মের ন্যায়, ধূলিধ্বস্ত কাঞ্চনের ন্যায় তোমার মুখের ছটা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, তোমার এ মলিন মুখ দেখিয়া আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।”

রাম ইঙ্গুদীফল দিয়া পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়াছিলেন,—ভূতলে দক্ষিণাগ্র দর্ভের উপর প্রদত্ত সেই ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড দেখিয়া কৌশল্যা বিলাপ করিয়া বলিলেন —“রাম এই ইঙ্গুদীফলে পিতৃপিণ্ড দান করিয়াছেন, এ দৃশ্য আমার সহ্য হয় না—”

“চতুরান্তাং মহীং ভুক্ত্বা মহেন্দ্রসদৃশো ভুবি।
কথমিঙ্গুদিপিণ্যাকং স ভুঙ্‌ক্তে বসুধাধিপঃ॥
অতো দুঃখতরং লোকে ন কিঞ্চিৎ প্রতিভাতি মে।
যত্র রামঃ পিতুর্দদ্যাদিঙ্গুদীক্ষোদমৃদ্ধিমান্‌॥”

“ইন্দ্রতুল্যপরাক্রান্ত মহারাজ দশরথ সসাগরা পৃথিবী ভোগ করিয়া এই ইঙ্গুদীফল কিরূপে ভক্ষণ করিবেন? রামচন্দ্র ইঙ্গুদীফলের পিণ্ড পিতাকে প্রদান করিলেন, ইহা হইতে আমার অধিকতর দুঃখ আর কিছুই নাই।” সামান্য বিষয় লইয়া এই সকল বিলাপপূর্ণ উক্তির একদিকে পুত্রের বনবাসে জননীর দারুণ দুঃখ, অপরদিকে স্বামিবিয়োগে সাধ্বীর সুগভীর মর্ম্মবেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এই কৌশল্যাচিত্র হিন্দুস্থানের আদর্শ-জননীর চিত্র—আদর্শ স্ত্রীচরিত্র। প্রতি পল্লী-গৃহের হিন্দুবালক এখনও এই স্নেহ ও আত্ম-ত্যাগ উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতেছেন। এখনও শত শত স্নেহময়ী কৌশল্যা হিন্দু-স্থানের প্রতি তরুপল্লবচ্ছায়ায় স্বীয় কোমল বাহুবন্ধনে আশ্রিত শিশুগণকে পালন করিতেছেন ও তাহাদের শুভকামনায় কঠোর ব্রত-উপবাস ও দেবারাধনা করিয়া নিরন্তর স্নেহার্থ আত্মবিসর্জ্জন করিতেছেন। এখনও বঙ্গদেশের কবি “কে আসে ধীরে ধীরে আকুল নয়ননীরে” প্রভৃতি সুমিষ্ট বন্দনা-গীতে সেই স্নেহপ্রতিমার অর্চ্চনা করিতেছেন। কিন্তু কৌশল্যার মত কয়জন জননী এখন ধর্ম্মব্রতে আত্মসুখবিসর্জ্জনকারী বল্কলধারী পুত্রকে বলিতে পারেন—

“ন শক্যতে বারয়িতুং গচ্ছেদানীং রঘূত্তম।
শীঘ্রঞ্চ বিনিবর্ত্তস্ব বর্ত্তস্ব চ সতাং ক্রমে॥
যং পালয়সি ধর্ম্মং ত্বং প্রীত্যা চ নিয়মেন চ।
স বৈ রাঘবশার্দ্দূল ধর্ম্মস্ত্বামভিরক্ষতু॥”

‘বৎস, তোমাকে আমি কিছুতেই নিবারণ করিয়া রাখিতে পারিলাম না, এক্ষণে তুমি প্রস্থান কর, কিন্তু শীঘ্রই ফিরিয়া আসিও এবং সৎপথে প্রতিষ্ঠিত থাকিও। তুমি প্রীতির সহিত—নিয়মের সহিত যে ধর্ম্মপালনে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই ধর্ম্ম তোমায় রক্ষা করুন।” আমাদের চিরপূজার্হা শচীমাতাও বুক বাঁধিয়া এমন কথা বলিতে পারেন নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আমাদের নিবাস।

'আপনার নিবাস ?'—প্রশ্নটি সকলেরই পরিচিত। কিন্তু সকল স্থলে উত্তর একপ্রকার হয় না। উত্তর দিবার সময় প্রশ্নকর্তার দেশবিদেশের জ্ঞান অনুমান করিয়া লইতে হয়। তিনি দূরদেশবাসী হইলে তাঁহাকে গ্রামের নাম বলা মিছে; জেলার নাম করিলেও প্রশ্নকর্তা নিবাস ঠিক বুঝিতে পারেন না। হুগলি কিংবা বৰ্দ্ধমান জেলায় বাস হইলেও বলিতে হয়, নিবাস কলিকাতা, কিংবা বঙ্গদেশ।

আমেরিকা, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশের লোক আমাদের নিবাস জিজ্ঞাসা করিলে বঙ্গদেশ বলিলেও চলে না। হয় ত বলিতে হইবে, নিবাস ভারতখণ্ডে।

কিন্তু মনে করুন, বৃহস্পতিগ্রহের কোন অধিবাসীকে আমাদের নিবাস বলিতে হইবে। তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের নাম করা মিছে। হয় ত বলিতে হইবে, নিবাস পৃথিবীতে। বৃহস্পতিবাসী নিশ্চয়ই সূর্য্যকে জানেন। সুতরাং বলিতে হইবে, আমাদের নিবাস সেই পৃথিবীতে, যে পৃথিবী সূর্য্য হইতে নয়-কোটি ত্রিশলক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া তাহার সমন্তাৎ ভ্রমণ করিতেছে। বৃহস্পতিবাসী দেশবিদেশে অভিজ্ঞ হইলে আর একটু বলিতে পারা যায়। বলিতে পারা যায়, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহের মধ্যবর্ত্তী আকাশে পৃথিবী।

কিন্তু লুব্ধক-(Sirius)-তারার অধিবাসীকে এই উত্তর দিলে চলিবে না। হয় ত তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিবেন, সূর্য্যটা কোথায়? আকাশে? ব্রহ্মাণ্ডে? ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে সূর্য্য কোথায়? আপনার ব্রহ্মাণ্ডই বা কোথায়?

উপরে যে প্রশ্ন-প্রতিপ্রশ্নের আভাস দেওয়া গেল, তাহা একটি কঠিন সমস্যার ভূমিকামাত্র। প্রশ্নটি বহু পুরাতন, কিন্তু য়ুরোপে গত দুইশত বৎসর চাপা ছিল। কয়েকমাস হইল, স্বনামখ্যাত প্রাণিবেত্তা ডাঃ রাসেল্ বালেস্ উহাকে জাগাইয়া তুলিয়াছেন। ইনি যে-সে লোক নহেন; যে দার্‌বিন্ সভাসমাজের চিন্তাপথ আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, সেই দার্‌বিনের প্রায় তুল্য আসনে ইনি উপবেশন করিতে পারেন।

প্রাচীনেরা—শুধু এদেশে নহে, অন্যান্য দেশেও—ভাবিতেন, এই ভূমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূমণ্ডলের জীবসমূহের মধ্যে মানব শ্রেষ্ঠ; সুতরাং মানবের নিমিত্ত ভূমণ্ডল, সূর্য্য, তারা, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি যাবতীয় মণ্ডল সৃষ্ট হইয়াছে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি পরিমাণ করিতেও নিরস্ত হন নাই। তাঁহারা ব্রহ্মাণ্ডকে সান্ত ভাবিয়া উহার অপর পারে লোকালোক-পর্ব্বত বসাইয়াছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন, সূর্য্যের রশ্মিতেই গ্রহতারা প্রভৃতি

দীপ্তিদীপ্ত হইয়াছে, এবং যতদূর রবিকরে সমুদ্ভাসিত, ততদূর ব্রহ্মাণ্ড। ব্রহ্মাণ্ডের পরিধি আছে শুনিয়া ভাস্করাচার্য্য অবাক্ হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহাদিগের নিকট ব্রহ্মাণ্ড করামলকবৎ অমল বোধ হইত, তাঁহাদিগের কথা খণ্ডন করিতে ভাস্করের সাধ্য ছিল না। ফলত তিনি কথাটা মানিয়াও মানেন নাই, এবং নূতন ব্যাখ্যা কল্পনা করিয়া কথাটার একটা সঙ্গত অর্থ দিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আমাদের কোন কোন পৌরাণিক ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটি বলিয়াও ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-বর্ণনস্থলে উহাকে সসীম ভাবিয়াছিলেন। ডাঃ বালেস্ এই প্রাচীন বিশ্বাস আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্যে পুনঃস্থাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি বলেন, এবং আধুনিক জ্যোতিষ হইতে প্রমাণও দিয়াছেন যে, তারাময় ব্রহ্মাণ্ড সসীম, সূর্য্য ছায়াপথের ঠিক তলে (plane) এবং প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত। সূর্য্য সমগ্র দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থিত বলিয়া সম্ভবত সমগ্র জড়ময় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত। তদনন্তর তিনি জীবসঞ্চারের অনুকূল অবস্থা-সকল অনুসন্ধান করিয়া বলেন যে, একমাত্র পৃথিবীই জীবের বাসোপযোগী হইয়াছে। শত শত নহে, সহস্র সহস্র নহে, কোটি কোটি বৎসর কোন গ্রহের পৃষ্ঠদেশ সমমাত্রায় উষ্ণ না থাকিলে জীবের বাসোপযোগী হইতে পারে না। জীবের আবির্ভাবপক্ষে এই পৃথিবীতে অনেক গুলি অনুকূল অবস্থা বিদ্য-মান ছিল। সূর্য্য হইতে পৃথিবীর এমন অন্তর যে, পৃথিবীর উষ্ণতার সমভাব সম্পাদিত হইতে পারিয়াছে। পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া আবশ্যকমত ঘন আবহ রহিয়াছে; পৃথিবীতে গভীর বিস্তীর্ণ সমুদ্র রহিয়াছে; মরুভূমি ও আগ্নেয়গিরি সমূহ রহিয়াছে। সূর্য্য তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়াই পৃথিবীর অবস্থা এরূপ হইতে পারিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের প্রান্তে এমন কোন তারা-রূপ সূর্য্য নাই, যাহার গ্রহসকলে জীবসঞ্চা-রের অনুকূল অবস্থা থাকিতে পারে।

বলা বাহুল্য, ডাঃ বালেসের জ্যোতিষিক আধার শিথিল হইলে তাঁহার জীবসঞ্চার-বিষয়ক অনুমান নিরর্থক হইবে। ইহাও বলা বাহুল্য, এমন একটা কথা বিনা আলো-চনায় বিদ্বৎসমাজে স্থান পাইতে পারে না। কয়েকজন জ্যোতিষী ঘোরতর আপত্তি তুলিয়া-ছেন। তন্মধ্যে ইংলণ্ডের মণ্ডর-সাহেব এবং ফরাসীদেশের প্রসিদ্ধ ফ্লামারিয়োঁ-সাহেব যে সকল যুক্তি দ্বারা বালেসের অনুমান খণ্ডন করিয়াছেন, তৎসমুদয়ের সারাংশ সঙ্কলিত হইল।* ব্রহ্মাণ্ডসম্বন্ধে আধুনিক জ্যোতিষের মত কি, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

অবশ্য কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার নহে। হাসিয়া সকল তর্কের মীমাংসা করা যাইতে পারে। বিচারে, প্রমাণপ্রয়োগে বিমুখ হইয়া স্ব স্ব সংস্কারের বশবর্ত্তী হইলে কোন বিষয়েরই বিচার আবশ্যক হয় না। ব্রহ্মাণ্ড সান্ত না অনন্ত, এ প্রশ্ন আধুনিক

* *Knowledge* for April and June.

কোন কোন জ্যোতিষীর মনে স্থান পাইয়াছে।*

প্রথমেই দেখা যায়, ব্রহ্মাণ্ড সসীম না হইলে তাহার মধ্যস্থল নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না। বস্তুত ব্রহ্মাণ্ড সসীম, না অসীম? বালেসের তর্ক এই যে, ব্রহ্মাণ্ড অসীম হইলে তারা অসংখ্য হইত। কিন্তু দূরবীক্ষণের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারাসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায় না। অল্প ক্ষমতায় তারাসংখ্যা যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, অধিক ক্ষমতায় সে অনুপাতে পায় না, ন্যূন অনুপাতে পায়। তারা অ-সংখ্য হইলে এরূপ হইত না। অতএব মনে হয় যে, সমধিক-ক্ষমতাশালী দূরবীক্ষণ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় তারা দৃষ্টিগোচর হইতে পারে। তবে, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত কই?

কিন্তু এ যুক্তি নির্দ্দোষ নহে। দূরবীক্ষণ যত বৃহৎ বা ক্ষমতাশালী হয়, তাহার কাচ তত বৃহৎ ও স্থূল হয়। কাচদ্বারা আলোক শোষিত হয়; এবং কাচ যত স্থূল হয়, আলোকও তত অধিক শোষিত হয়। সুতরাং দূরবীক্ষণের ক্ষমতাবৃদ্ধির অনুপাতে তারার সংখ্যাবৃদ্ধি হইতে পারে না। কিন্তু তারাগণনার নিমিত্ত দূরবীক্ষণই একমাত্র উপায় নহে। ফটোগ্রাফীর কাচ আকাশের দিকে উন্মুক্ত রাখিলে কাচে তারাসকল অঙ্কিত হয়। পনরমিনিট উন্মুক্ত রাখিলে যত তারার চিহ্ন পাওয়া যায়, ত্রিশমিনিট রাখিলে তদপেক্ষা অধিক পাওয়া যায়, কিন্তু দ্বিগুণ পাওয়া যায় না। অবশ্য অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল তারাসম্বন্ধে কোন কথা নাই; ক্ষীণ তারা লইয়াই কথা। কিন্তু ফটোগ্রাফীর কাচে আলোকদানের (exposure) কালবৃদ্ধির অনুপাতে যে অতিশয় সূক্ষ্ম তারার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, এমন নিয়ম নাই। অতএব কি দূরবীক্ষণ, কি ফটোগ্রাফীর কাচ, কোন উপায়ে নভোমণ্ডলের সমুদয় তারা দৃষ্ট হইতে পারে না।

বালেসের দ্বিতীয় তর্ক এই যে, এক এক তারা বিশালদেহ প্রদীপ্ত সূর্য্য; এই সকল সূর্য্য অ-সংখ্য হইলে তাহাদিগের নিকট হইতে অসীম উজ্জ্বল আলোক আসিত, এবং গগনমণ্ডল মধ্যাহ্নের ন্যায় সর্ব্বদা প্রদীপ্ত থাকিত।

কিন্তু এরূপ প্রখর আলোক না পাইবার অনেক কারণ থাকিতে পারে। (১) দূরত্ববৃদ্ধির বর্গানুসারে আলোকের প্রাখর্য্য হ্রাস পায় বটে, কিন্তু আলোকবহ পদার্থের স্বচ্ছতার কিঞ্চিৎ ন্যূনতায় উক্ত নিয়মে হ্রাস পায় না। কে জানে, কিরূপ পদার্থে দিব্যস্থান পরিব্যাপ্ত আছে? (২) তারা গণিবার সময় কেবল উজ্জ্বল তারাসকল গণি কেন? প্রদীপ্ত তারা ব্যতীত নিষ্প্রভ অদৃশ্য বহু তারা থাকিতে পারে। এরূপ তারা যে আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সময়ে সময়ে নূতন তারা প্রকাশিত হয়। এরূপ তারা কত আছে, কে জানে? সংখ্যায় দৃশ্য ও অদৃশ্য তারা সমান হইতে পারে, এবং এই সকল অদৃশ্য তারা দ্বারা আলোক প্রতিরুদ্ধ হইতে পারে।

* ব্রহ্মাণ্ডশব্দ পুনঃপুন প্রয়োগ করা যাইতেছে। আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিক অর্থ। কল্পনায় কি আসে, প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহাই বিবেচ্য। এতদ্দ্বারা আমাদের দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ড বুঝিতে হইবে। ইহাই কি না আসে,—সে তর্ক তুলিবার সুযোগ নাই। কি

(৩) নীহারিকা (Nebula) দ্বারা দিব্যলোক পূর্ণ। ফটোগ্রাফী এ বিষয়ের সাক্ষী। কিন্তু সমুদয় নীহারিকা প্রকাশমান না হইতে পারে। বরং প্রথম অবস্থায় নীহারিকার অদৃশ্য থাকিবার সম্ভাবনা। এই সকল নীহারিকাও আলোক শোষণ করিতে পারে। (৪) দিব্য রজঃ, যাহার জন্য পরিঘের * (Zodiacal Light) উৎপত্তি, এবং উল্কা, যাহা বৎসরে ভূতলেই কোটি কোটি পতিত হয়,—ইহারাও তারাসমূহের আলোক শোষণ করিতেছে।

বালেসের আর এক তর্ক এই যে, ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত হইলে সকল দিকেই সমানসংখ্যক তারা দেখিতে পাওয়া যাইত। তর্কটি নূতন নহে; অনেক জ্যোতিষী তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের রূপ অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন। এ নিমিত্ত কথাটা কিঞ্চিৎ বিস্তারিতভাবে বলা যাইতেছে। বস্তুত আমাদিগের সকল দিকে একইসংখ্যক তারা দেখা যায় না। স্বর্গঙ্গা বা ছায়াপথের দিকেই তারা অধিক, ছায়াপথের তির্য্যক্ দিকে অল্প। ছায়াপথের যত নিকটের আকাশে দৃষ্টিপাত করা যায়, তত অধিক ও সর্ব্ববিধ উজ্জ্বল তারা নয়নগোচর হয়। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, দূরবীক্ষণ দ্বারা প্রায় ছয়সহস্র তারাপুঞ্জ ও নীহারিকা দেখা গিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ তারাপুঞ্জ ছায়াপথের তলে (plane), এবং অধিকাংশ বাষ্পময় নীহারিকা উক্ত তল হইতে দূরে, এমন কি, ছায়াপথের মেরুর নিকটে দেখা গিয়াছে। অতএব তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের একটা গঠন আছে। তারা ও তারাপুঞ্জ আকাশের সর্ব্বত্র সমান ঘনসন্নিবিষ্ট নহে। ছায়াপথেরও একটা বিশেষ গঠন আছে। রাত্রিকালে নির্ম্মল আকাশে ছায়াপথ নিরীক্ষণ করিলে উহাতে সমঘন তারাসন্নিবেশ দৃষ্টিগোচর হয় না; মনে হয়, ছায়াপথ সৌরজগতের ন্যায় কোন নিয়তাকার চক্র নহে। আমরা দেখি, উহা হংস (Cygnus) এবং বৃশ্চিক নক্ষত্রে দুই অসম শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; দেখি, উহা স্থানে স্থানে যেন বিদীর্ণ হইয়াছে। কোন ঋজুনদী দূর হইতে দেখিলে যেমন উহার দুই তীর পরস্পর নিকটস্থ বোধ হয়, ছায়াপথের তারা কল আমরা বহু-বহু দূর হইতে দেখি বলিয়া তাহারা পরস্পর নিকটস্থ বোধ হয়, এবং ছায়াপথ চক্রাকার দেখায়।

এ সকল কথাই সত্য। তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের একটা রূপ আছে; তারাসমূহ সকলদিকে সমান সংখ্যায় দেখিতে পাই না। কিন্তু তা বলিয়া তাহারা যে সমান দূরে আছে, এ কথা বলিতে পারা যায় না। বস্তুত ছায়াপথের তারাসমূহের পরস্পর অন্তর সমান নহে। সেখানে বহু-বহু দূরে দূরে পশ্চাতে পশ্চাতে অনেক তারা আছে; উপরের দৃষ্টান্তের নদীর ন্যায় দূরদৃষ্টি (perspective) হেতু তৎসমুদয় নিকটে নিকটে অবস্থিত মনে হয়।

সূর্য্য ছায়াপথের মধ্যস্থলে এবং তাহার তলে কি না, তাহা পর্য্যবেক্ষণসাপেক্ষ। ছায়াপথ ঠিক চক্রাকার নহে; সুতরাং

* সংস্কৃত 'পরিঘ'শব্দ দ্বারা Zodiacal Light বুঝাইত কি না, সে তর্কে প্রয়োজন নাই। একটা শব্দ চাই। নানা কারণে এই শব্দটি ভাল বোধ হইয়াছে।

উহার মধ্যস্থল কিংবা তল সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারা যায় না। স্থূলত বলা যাইতে পারে, ছায়াপথের অধিকাংশ তিনশত আলোক-বর্ষ* পথ দূরে রহিয়াছে। দক্ষিণ আকাশের জন্তু-(বা কিন্নর—Centaurus)-নক্ষত্রের ক-তারা চারি আলোকবর্ষ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে আছে। সুতরাং আমরা ছায়াপথের মধ্যস্থলের নিকটে না থাকিয়া বরং জন্তুনক্ষত্রের নিকটে আছি।

তা ছাড়া, সূর্য্যও স্থির নহে। উহা যে বেগে চলিতেছে, সেই বেগে চলিলে উহা পঁয়ষট্টিসহস্র বৎসরে জন্তুনক্ষত্রের ক-তারাতে উপস্থিত হইতে পারে। পৃথিবীর বয়ঃক্রমের তুলনায় এই কাল ক্ষণমাত্র বলিতে হইবে। যদি অতীতকালেও সূর্য্য এই বেগে চলিয়া থাকে, তাহা হইলে সূর্য্য পঞ্চাশলক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ছায়াপথে ছিল, এবং ভবিষ্যতে ঐ বেগে চলিলে উহা ছায়াপথের অপর সীমায় গিয়া পড়িবে। ভূবিদ্যা ও জীববিদ্যা বিৎ পণ্ডিতগণের অনুমানে পার্থিবসৃষ্টির পক্ষে একশত লক্ষ বৎসর গণনার যোগ্য নহে। তবে, সূর্য্যকে ছায়াপথের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলা যাইতে পারে না। এইরূপ, অপর কোন তারাকেও বলিতে পারা যায় না।

অপর তারা অপেক্ষা সূর্য্য-তারা গুরুও নহে। জন্তুনক্ষত্রে যুগ্মতারা আছে; তাহাদের জড়মান সূর্য্যের জড়মানের প্রায় দ্বিগুণ। লুব্ধকের জড়মান চারিটি সূর্য্যের তুল্য।

সূর্য্য তাদৃশ উজ্জ্বলও নহে। ১ম প্রভার তারাসকল যত দূরে আছে, তত দূরে থাকিলে সূর্য্য ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কিংবা ৬ষ্ঠ প্রভা তারার তুল্য ক্ষীণ দেখাইত। ৬ষ্ঠ প্রভার তারা আমাদের প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না। অগস্ত্য-তারা (Canopus) হইতে সূর্য্য দেখাই যাইত না। অথচ অগস্ত্য ১ম প্রভার তারা। অভিজিৎ (Vega) সত্তরটি সূর্য্যের তুল্য উজ্জ্বল, এবং অগস্ত্য দশসহস্র সূর্য্য অপেক্ষাও দীপ্তিশালী। এই সকল কারণে ফ্লামারিয়োঁ-সাহেব বলেন যে, ডাঃ. বালেস্ লুব্ধক কিংবা ব্রহ্মহৃদয় (Capella) কিংবা জ্যেষ্ঠা (Antares) নক্ষত্র লইয়া তাঁহার কল্পনা বিস্তার করিলে বরং তাহা একদিন শোভা পাইত, আমাদের পৃথিবীর ন্যায় ক্ষুদ্র পল্লীর পক্ষে কথাটা আদৌ সাজে না। কোন সূর্য্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে, আমাদের সূর্য্যও নহে; সুতরাং বালেসের কল্পনায় মোহিত হইবার কারণ নাই। সৌরজগতে রাজা সূর্য্য। কিন্তু তারাময় ব্রহ্মাণ্ডে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ নাই; সকলেই রাজা, সকলেই প্রজা।

তারাসকল আকাশে স্থির নহে। তাহাদের স্ব স্ব গতি (proper motion) আছে। অনেকের স্বগতি পরিমিত হইয়াছে। লর্ড কেল্‌ভিন্ তারাসকলের স্বগতি লইয়া গণনা দ্বারা জানাইয়াছেন যে, আমাদের তারাময় ব্রহ্মাণ্ডের সূর্য্যের সংখ্যা একশত কোটির অধিক হইবে না। ইহাদের মাধ্যাকর্ষণশক্তি গড়ে আমাদের সূর্য্যের তুল্য হইলে, ইহাদের বেগ সেকেণ্ডে বার মাইল হইতে ষাট-মাইল পর্য্যন্ত হইবে। কিন্তু এই

* আলোক যে পথ এক বর্ষে অতিক্রম করে। এক সেকেণ্ডে আলোক পৃথিবীকে সাতআটবার প্রদক্ষিণ করিতে পারে।

বেগ অধিক দৃষ্ট হইলে তারাসংখ্যাও বাড়িয়া যাইবে। অধিকন্তু তারাসংখ্যা শত-কোটি অঙ্গীকার করিলেও এমন বুঝায় না যে, কেবল এই শত-কোটিই আছে, এবং ইহাদের পরে দ্বিতীয় শত-কোটি, তৃতীয় শত-কোটি, চতুর্থ শত-কোটি, কিংবা আরও অধিক নাই। আকাশের বিস্তার যতই হউক, ছায়াপথ তাহার বিন্দুমাত্র। আমাদের দৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডের বহির্দ্দেশে অন্য তারা আছে বলিয়া বোধ হয়। অধ্যাপক ম্যাকোম্ এরূপ তারার সংবাদ শুনাইয়াছেন। তেমনই কয়েকটি গোলাকার তারাপুঞ্জও আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের নহে বলিয়া বোধ হইয়াছে।

বালেসের জ্যোতিষিক আধার ভ্রমপূর্ণ। অতএব তাঁহার জীবসঞ্চারবিষয়ক অনুমান দৃঢ় নহে। ফ্লামারিয়োঁ-জ্যোতিষী বলেন, পৃথিবী প্রকৃতি হইতে কোন বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করে নাই; কোন যে বিশেষ কালে উপস্থিত হইয়াছে, এমনও নহে। সৌর-জগতের সকল গ্রহের অবস্থা এক নহে। চন্দ্র ভূতকালের গৌরবের সাক্ষী; বৃহস্পতি ভবিষ্যৎকালের অপেক্ষা করিতেছে। আধুনিক জ্যোতিষ প্রাচীন জ্যোতিষের সঙ্কীর্ণতা ভেদ করিয়া আমাদের দৃষ্টি বহু-বহু দূরে লইয়া গিয়াছে। অথচ তাহা বাস্তবের ছায়ামাত্র। আমরা অনন্তে ডুবিয়া আছি; জীবসৃষ্টি অনাদি ও সার্ব্বত্রিক; আমাদের পৃথিবী সংখ্যাতীত দিব্য দ্বীপপুঞ্জের একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। আকাশ (space) অনন্ত; উহার উচ্চতা নাই, গভীরতা নাই; বাম নাই, দক্ষিণ নাই। সেই-রূপ কালেরও আদি নাই, অন্ত নাই। অতএব আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পার্থিব জ্ঞান লইয়া প্রকৃতির শক্তির সীমানির্দ্দেশ করিতে যাওয়া আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা। আকাশে শিশুর দোলা আছে, বৃদ্ধের সমাধিস্থান আছে। গতকল্য চন্দ্র, আজ পৃথিবী, আগামী কল্য বৃহস্পতি, কালচক্রে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইতেছে। রক্তবর্ণ তারাসকল অচিরে সমাধিস্থ হইবে; লুব্ধক ও অভিজিতের ন্যায় তারাসকল ভবিষ্যতে জাগ্রত হইবে; প্রশ্বা (Procyon), ব্রহ্মহৃদয় (Capella) ও স্বাতীর (Arcturus) ন্যায় তারাসকল বর্ত্তমানে যৌবন ভোগ করিতেছে। রোহিণী (Aldebaran) প্রায় গতায়ু হইতে বসিয়াছে, সূর্য্য এখনও যৌবনে রহিয়াছে। আবার কোন কোন মৃত তারা ক্ষণকালের নিমিত্ত পুনর্জ্জীবিতও হইয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

সাহিত্য-সমালোচনা।

ঘরে বসিয়া আনন্দে যখন হাসি এবং দুঃখে যখন কাঁদি, তখন এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, আরো একটু বেশি করিয়া হাসা দরকার বা কান্নাটা ওজনে কিছু কম পড়িয়াছে। কিন্তু পরের কাছে যখন আনন্দ বা দুঃখ দেখানো আবশ্যক হইয়া পড়ে, তখন

মনের ভাবটা সত্য হইলেও বাহিরের প্রকাশটা সম্পূর্ণ তাহার অনুযায়ী না হইতে পারে।

এমন কি, মা-ও যখন সশব্দ বিলাপে পল্লীর নিদ্রাতন্দ্রা দূর করিয়া দেয়, তখন সে যে শুদ্ধমাত্র পুত্রশোক প্রকাশ করে, তাহা নয়, পুত্রশোকের গৌরব প্রকাশ করিতেও চায়। নিজের কাছে দুঃখ-সুখ প্রমাণ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না—পরের কাছে তাহা প্রমাণ করিতে হয়। সুতরাং শোকপ্রকাশের জন্য যেটুকু কান্না স্বাভাবিক, শোকপ্রমাণের জন্য তাহার চেয়ে সুর চড়াইয়া না দিলে চলে না।

ইহাকে কৃত্রিমতা বলিয়া উড়াইয়া দিলে অন্যায় হইবে। শোকপ্রমাণ শোকপ্রকাশের একটা স্বাভাবিক অঙ্গ। আমার ছেলের মূল্য যে কেবল আমারি কাছে বেশি, তাহার বিচ্ছেদ যে কতখানি মর্ম্মান্তিক ব্যাপার, তাহা পৃথিবীর আর কেহই যে বুঝিবে না, তাহার অভাবসত্ত্বেও পৃথিবীর আর সকলেই যে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দচিত্তে আহারনিদ্রা ও আপিস-যাতায়াতে প্রবৃত্ত থাকিবে, শোকাতুর মাতাকে তাহার পুত্রের প্রতি জগতের এই অবজ্ঞা আঘাত করিতে থাকে। তখন সে নিজের শোকের প্রবলতার দ্বারা এই ক্ষতির প্রাচুর্য্যকে বিশ্বের কাছে ঘোষণা করিয়া তাহার পুত্রকে যেন গৌরবান্বিত করিতে চায়।

যে অংশে শোক নিজের, সে অংশে তাহার একটি স্বাভাবিক সংযম থাকে, যে অংশে তাহা পরের কাছে ঘোষণা, তাহা অনেক সময়েই সঙ্গতির সীমা লঙ্ঘন করে। পরের অসাড়চিত্তকে নিজের শোকের দ্বারা বিচলিত করিবার স্বাভাবিক ইচ্ছায় তাহার চেষ্টা অস্বাভাবিক উদ্যম অবলম্বন করে।

কেবল শোক নহে, আমাদের অধিকাংশ হৃদয়ভাবেরই এই দুইটা দিক্‌ই আছে, একটা নিজের জন্য, একটা পরের জন্য। আমার হৃদয়ভাবকে সাধারণের হৃদয়ভাব করিতে পারিলে তাহার একটা সান্ত্বনা, একটা গৌরব আছে। আমি যাহাতে বিচলিত, তুমি তাহাতে উদাসীন, ইহা আমাদের কাছে ভাল লাগে না।

কারণ, নানা লোকের কাছে প্রমাণিত না হইলে সত্যতার প্রতিষ্ঠা হয় না। আমিই যদি আকাশকে হল্‌দে দেখি, আর দশজনে না দেখে, তবে তাহাতে আমার ব্যাধিই সপ্রমাণ হয়! সেটা আমারই দুর্ব্বলতা।

আমার হৃদয়বেদনায় পৃথিবীর যত বেশি লোক সমবেদনা অনুভব করিবে, ততই তাহার সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। আমি যাহা একান্তভাবে অনুভব করিতেছি, তাহা যে আমার দুর্ব্বলতা, আমার ব্যাধি, আমার পাগ্‌লামি নহে, তাহা যে সত্য, তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ের মধ্যে প্রমাণিত করিয়া আমি বিশেষভাবে সান্ত্বনা ও সুখ পাই।

যাহা নীল, তাহা দশজনের কাছে নীল বলিয়া প্রচার করা কঠিন নহে, কিন্তু যাহা আমার কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয়, তাহা দশজনের কাছে সুখ বা দুঃখ, প্রিয় বা অপ্রিয় বলিয়া প্রতীত করা দুরূহ। সে অবস্থায় নিজের ভাবকে কেবলমাত্র প্রকাশ করিয়াই খালাস পাওয়া যায় না; নিজের ভাবকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হয়,

যাহাতে পরের কাছেও তাহা যথার্থ বলিয়া অনুভূত হইতে পারে।

সুতরাং এইখানেই বাড়াবাড়ি হইবার সম্ভাবনা। দূর হইতে যে জিনিষটা দেখাইতে হয়, তাহা কতকটা বড় করিয়াই দেখান আবশ্যক। সেটুকু বড়, সত্যের অনুরোধেই করিতে হয়। নহিলে জিনিষটা যে পরিমাণে ছোট দেখায়, সেই পরিমাণেই মিথ্যা দেখায়। বড় করিয়াই তাহাকে সত্য করিতে হয়।

আমার সুখদুঃখ আমার কাছে অব্যবহিত, তোমার কাছে তাহা অব্যবহিত নয়। আমি হইতে তুমি দূরে আছ। সেই দূরত্বটুকু হিসাব করিয়া আমার কথা তোমার কাছে কিছু বড় করিয়াই বলিতে হয়।

সত্যরক্ষাপূর্ব্বক এই বড় করিয়া তুলিবার ক্ষমতায় সাহিত্যকারের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনটি ঠিক, তেম্‌নি লিপিবদ্ধ করা সাহিত্য নহে।

কারণ, প্রকৃতিতে যাহা দেখি, তাহা আমার কাছে প্রত্যক্ষ, আমার ইন্দ্রিয় তাহার সাক্ষ্য দেয়। সাহিত্যে যাহা দেখায়, তাহা প্রাকৃতিক হইলেও তাহা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং সাহিত্যে সেই প্রত্যক্ষতার অভাব পূরণ করিতে হয়।

প্রাকৃতসত্যে এবং সাহিত্যসত্যে এইখানেই তফাৎ আরম্ভ হয়। সাহিত্যের মা যেমন করিয়া কাঁদে, প্রাকৃত মা তেমন করিয়া কাঁদে না। তাই বলিয়া সাহিত্যে মার কান্না মিথ্যা নহে। প্রথমত প্রাকৃত রোদন এমন প্রত্যক্ষ যে, তাহার বেদনা আকারে-ইঙ্গিতে, কণ্ঠস্বরে, চারিদিকের দৃশ্যে এবং শোকঘটনার নিশ্চয় প্রমাণে আমাদের প্রতীতি ও সমবেদনা উদ্রেক করিয়া দিতে বিলম্ব করে না। দ্বিতীয়ত প্রাকৃত মা আপনার শোক সম্পূর্ণ ব্যক্ত করিতে পারে না, সে ক্ষমতা তাহার নাই, সে অবস্থাও তাহার নয়।

এইজন্যই সাহিত্য ঠিক প্রকৃতির আরশি নহে। কেবল সাহিত্য কেন, কোনো কলাবিদ্যাই প্রকৃতির যথাযথ অনুকরণ নহে। প্রকৃতিতে প্রত্যক্ষকে আমরা প্রতীতি করি, সাহিত্যে এবং ললিতকলায় অপ্রত্যক্ষ আমাদের কাছে প্রতীয়মান। অতএব এস্থলে একটি অপরটির আরশি হইয়া কোন কাজ করিতে পারে না।

এই প্রত্যক্ষতার অভাববশত সাহিত্যে ছন্দোবন্ধ-ভাষাভঙ্গীর নানাপ্রকার কল-বল আশ্রয় করিতে হয়। এইরূপে রচনার বিষয়টি বাহিরে কৃত্রিম হইয়া অন্তরে প্রাকৃত অপেক্ষা অধিকতর সত্য হইয়া উঠে।

এখানে "অধিকতর সত্য" এই কথাটা ব্যবহার করিবার বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। মানুষের ভাবসম্বন্ধে প্রাকৃত সত্য জড়িত-মিশ্রিত, ভগ্নখণ্ড, ক্ষণস্থায়ী। সংসারের ঢেউ ক্রমাগতই ওঠাপড়া করিতেছে—দেখিতে দেখিতে একটার ঘাড়ে আর একটা আসিয়া পড়িতেছে—তাহার মধ্যে প্রধান-অপ্রধানের বিচার নাই—তুচ্ছ ও অসামান্য গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করিয়া বেড়াইতেছে। প্রকৃতির এই বিরাট্ রঙ্গশালায় যখন মানুষের ভাবাভিনয় আমরা দেখি, তখন আমরা স্বভাবতই অনেক বাদসাদ দিয়া বাছিয়া লইয়া আন্দাজের দ্বারা অনেকটা ভর্ত্তি করিয়া, কল্পনার দ্বারা অনেকটা গড়িয়া তুলিয়া থাকি। আমাদের একজন পরমাত্মীয়ও তাহার সমস্তটা লইয়া

আমাদের কাছে পরিচিত নহেন। আমাদের স্মৃতি নিপুণ সাহিত্যরচয়িতার মত তাঁহার অধিকাংশই বাদ দিয়া ফেলে। তাঁহার ছোটবড় সমস্ত অংশই যদি ঠিক সমান অপক্ষপাতের সহিত আমাদের স্মৃতি অধিকার করিয়া থাকে, তবে এই স্তূপের মধ্যে আসল চেহারাটি মারা পড়ে ও সবটা রক্ষা করিতে গেলে আমাদের পরমাত্মীয়কে আমরা যথার্থভাবে দেখিতে পাই না। পরিচয়ের অর্থই এই যে, যাহা বর্জ্জন করিবার তাহা বর্জ্জন করিয়া, যাহা গ্রহণ করিবার তাহা গ্রহণ করা।

একটু বাড়াইতেও হয়। আমাদের পরমাত্মীয়কেও আমরা মোটের উপরে অল্পই দেখিয়া থাকি। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ আমাদের অগোচর। আমরা তাঁহার ছায়া নহি, আমরা তাঁহার অন্তর্যামীও নই। তাঁহার অনেকখানিই যে আমরা দেখিতে পাই না, সেই শূন্যতার উপরে আমাদের কল্পনা কাজ করে। ফাঁকগুলি পূরাইয়া লইয়া আমরা মনের মধ্যে একটা পূর্ণ ছবি আঁকিয়া তুলি। যে লোকের সম্বন্ধে আমাদের কল্পনা খেলে না, যাহার ফাঁক আমাদের কাছে ফাঁক থাকিয়া যায়, যাহার প্রত্যক্ষগোচর অংশই আমাদের কাছে বর্ত্তমান, অপ্রত্যক্ষ অংশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট অগোচর, তাহাকে আমরা জানি না, অল্পই জানি। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই এইরূপ আমাদের কাছে ছায়া, আমাদের কাছে অসত্যপ্রায়। তাহাদের অনেককেই আমরা উকিল বলিয়া জানি, ডাক্তার বলিয়া জানি, দোকানদার বলিয়া জানি—মানুষ বলিয়া জানি না। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে যে বহির্বিষয়ে তাহাদের সংস্রব, সেইটেকেই সর্ব্বাপেক্ষা বড় করিয়া জানি—তাহাদের মধ্যে তদপেক্ষা বড় যাহা আছে, তাহা আমাদের কাছে কোন আমল পায় না।

সাহিত্য যাহা আমাদিগকে জানাইতে চায়, তাহা সম্পূর্ণভাবে জানায়—অর্থাৎ স্থায়ীকে রক্ষা করিয়া, অবান্তরকে বাদ দিয়া, ছোটকে ছোট করিয়া, বড়কে বড় করিয়া, ফাঁককে ভরাট্ করিয়া, আল্‌গাকে জমাট্ করিয়া দাঁড় করায়! প্রকৃতির অপক্ষপাত প্রাচুর্য্যের মধ্যে মন যাহা করিতে চায়, সাহিত্য তাহাই করিতে থাকে। মন প্রকৃতির আরশি নহে, সাহিত্যও প্রকৃতির আরশি নহে। মন প্রাকৃতিক জিনিষকে মানসিক করিয়া লয়—সাহিত্য সেই মানসিক জিনিষকে সাহিত্যিক করিয়া তুলে।

দুয়ের কার্য্যপ্রণালী প্রায় একইরকম। কেবল দুয়ের মধ্যে কয়েকটা বিশেষ কারণে তফাৎ ঘটিয়াছে। মন যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা নিজের আবশ্যকের জন্য—সাহিত্য যাহা গড়িয়া তোলে, তাহা সকলের আনন্দের জন্য। নিজের জন্য একটা মোটামুটি নোট্ করিয়া রাখিলেও চলে—সকলের জন্য আগাগোড়া সুসম্বদ্ধ করিয়া তুলিতে হয়। এবং তাহাকে এমন জায়গায় এমন আলোকে এমন করিয়া ধরিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণভাবে সকলের দৃষ্টিগোচর হয়। মন সাধারণত প্রকৃতির মধ্য হইতে সংগ্রহ করে—সাহিত্য মনের মধ্য হইতে সঞ্চয় করে। মনের জিনিষকে বাহিরে ফলাইয়া তুলিতে গেলে বিশেষভাবে সৃজনশক্তির আবশ্যক হয়।

এইরূপে প্রকৃতি হইতে মনে ও মন হইতে সাহিত্যে যাহা প্রতিফলিত হইয়া উঠে, তাহা অনুকরণ হইতে বহুদূরবর্ত্তী।

প্রকৃত সাহিত্যে আমরা আমাদের কল্পনাকে, আমাদের সুখদুঃখকে, শুদ্ধ বর্ত্তমান কাল নহে, চিরন্তন কালের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহি। সুতরাং সেই সুবিশাল প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রের সহিত তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য করিতে হয়! ক্ষণকালের মধ্য হইতে উপকরণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে যখন চিরকালের জন্য গড়িয়া তোলা যায়, তখন ক্ষণকালের মাপকাঠি লইয়া কাজ চলে না। এই কারণে প্রচলিত কালের সহিত, সঙ্কীর্ণ সংসারের সহিত, উচ্চসাহিত্যের পরিমাণের প্রভেদ থাকিয়া যায়।

অন্তরের জিনিষকে বাহিরের, ভাবের জিনিষকে ভাষার, নিজের জিনিষকে বিশ্ব-মানবের এবং ক্ষণকালের জিনিষকে চির-কালের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

জগতের সহিত মনের যে সম্বন্ধ, মনের সহিত সাহিত্যকারের প্রতিভার সেই সম্বন্ধ। এই প্রতিভাকে বিশ্বমানবমন নাম দিলে ক্ষতি নাই। জগৎ হইতে মন আপনার জিনিষ সংগ্রহ করিতেছে, সেই মন হইতে বিশ্বমানবমন পুনশ্চ নিজের জিনিস নির্ব্বাচন করিয়া নিজের জন্য গড়িয়া লইতেছে।

বুঝিতেছি কথাটা বেশ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। আর একটু পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিব। কৃতকার্য্য হইব কি না, জানি না।

আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দুইটা অংশের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারি। একটা অংশ আমার নিজত্ব, আর একটা অংশ আমার মানবত্ব। আমার ঘরটা যদি সচেতন হইত, তবে সে নিজের ভিতরকার খণ্ডাকাশ ও তাহারই সহিত পরিব্যাপ্ত মহাকাশ, এই দুটাকে ধ্যানের দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারিত। আমাদের ভিতরকার নিজত্ব ও মানবত্ব সেইপ্রকার। যদি দুয়ের মধ্যে দুর্ভেদ্য দেয়াল তোলা থাকে, তবে আত্মা অন্ধকূপের মধ্যে বাস করে।

প্রকৃত সাহিত্যকারের অন্তঃকরণে যদি তাহার নিজত্ব ও মানবত্বের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে, তবে তাহা কল্পনার কাচের সাশির স্বচ্ছ ব্যবধান। তাহার মধ্য দিয়া পরস্পরের চেনা-পরিচয়ের ব্যাঘাত ঘটে না। এমন কি, এই কাচ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণের কাচের কাজ করিয়া থাকে—ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য, দূরকে নিকট করে।

সাহিত্যকারের সেই মানবত্বই সৃজনকর্ত্তা। লেখকের নিজত্বকে সে আপনার করিয়া লয়, ক্ষণিককে সে অমর করিয়া তোলে, খণ্ডকে সে সম্পূর্ণতা দান করে।

জগতের উপরে মনের কারখানা বসি-য়াছে—এবং মনের উপরে বিশ্বমনের কার-খানা—সেই উপরের তলা হইতে সাহিত্যের উৎপত্তি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মনোরাজ্যের কথা আসিয়া পড়িলে সত্যতা বিচার করা কঠিন হইয়া পড়ে। কালোকে কালো প্রমাণ করা সহজ, কারণ অধিকাংশের কাছেই তাহা নিশ্চয় কালো—কিন্তু ভালোকে ভালো প্রমাণ করা তেমন সহজ নহে, কারণ এখানে অধিকাংশের একমত সাক্ষ্য সংগ্রহ করা কঠিন।

এখানে অনেকগুলি মুস্কিলের কথা আসিয়া পড়ে। অধিকাংশের কাছেই যাহা ভাল, তাহাই কি সত্য ভাল, না, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের কাছে যাহা ভাল, তাহাই সত্য ভাল?

যদি বিজ্ঞানের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে প্রাকৃতবস্তুসম্বন্ধে এ কথা নিশ্চয় বলিতে হয় যে, অধিকাংশের কাছে যাহা কালো, তাহাই সত্য কালো। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, এ সম্বন্ধে মতভেদের সম্ভাবনা এত অল্প যে, অধিক সাক্ষ্য সংগ্রহ করিবার কোন প্রয়োজন হয় না।

কিন্তু ভালো যে ভালোই এবং কত ভালো, তাহা লইয়া মতের এত অনৈক্য ঘটিয়া থাকে যে, সে সম্বন্ধে কিরূপ সাক্ষ্য লওয়া উচিত, তাহা স্থির করা কঠিন হয়।

বিশেষ কঠিন এই জন্য, সাহিত্যকারদের শ্রেষ্ঠ চেষ্টা কেবল বর্ত্তমান কালের জন্য নহে। চিরকালের মনুষ্যসমাজই তাঁহাদের লক্ষ্য। যাহা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎকালের জন্য লিখিত, তাহার অধিকাংশ সাক্ষী ও বিচারক বর্ত্তমান কাল হইতে কেমন করিয়া মিলিবে?

ইহা প্রায়ই দেখা যায় যে, যাহা তৎসাময়িক ও তৎস্থানিক, তাহাই অধিকাংশ লোকের কাছে সর্ব্বপ্রধান আসন অধিকার করে। কোন একটি বিশেষ সময়ের সাক্ষিসংখ্যা গণনা করিয়া সাহিত্যের বিচার করিতে গেলে অবিচার হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। এইজন্য বর্ত্তমান কালকে অতিক্রম করিয়া সর্ব্বকালের দিকেই সাহিত্যকে লক্ষ্যনিবেশ করিতে হয়।

কালে কালে মানুষের বিচিত্র শিক্ষা, ভাব ও অবস্থার পরিবর্ত্তনসত্ত্বেও যে সকল রচনা আপন মহিমা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে, তাহাদেরই অগ্নিপরীক্ষা হইয়া গেছে। মন আমাদের সহজগোচর নয় এবং অল্প সময়ের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া দেখিলে অবিশ্রাম গতির মধ্যে তাহার নিত্যানিত্য সংগ্রহ করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়। এইজন্য সুবিপুল কালের পরিদর্শনশালার মধ্যেই মানুষের মানসিক বস্তুর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়—ইহা ছাড়া নিশ্চয় অবধারণের চূড়ান্ত উপায় নাই।

কিন্তু কাজ চলিবার মত উপায় না থাকিলে সাহিত্যে অরাজকতা উপস্থিত হইত। হাইকোর্টের আপিল-আদালতে যে জজ-আদালতের সমস্ত বিচারই পর্য্যস্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সাহিত্যেও সেইরূপ জজ-আদালতের কাজ বন্ধ থাকিতে পারে না। আপিলের শেষমীমাংসা অতিদীর্ঘকাল-সাপেক্ষ—ততক্ষণ মোটামুটি বিচার একরকম পাওয়া যায় এবং অবিচার পাইলেও উপায় নাই।

যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্ব্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে,—সর্ব্বকালের আসন অধিকার করে, তেম্‌নি সমালোচনার প্রতিভাও আছে। একএকজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সঙ্কীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্ত্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ

করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা অজ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন—স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্ব্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।

আবার ব্যবসাদার সমালোচকও আছে। তাহাদের পুঁথিগত বিদ্যা। তাহারা সারস্বত-প্রাসাদের দেউড়িতে বসিয়া হাঁকডাক, তর্জ্জনগর্জ্জন, ঘুষ ও ঘুষির কারবার করিয়া থাকে—অন্তঃপুরের সহিত তাহাদের পরিচয় নাই। তাহারা অনেক সময়েই গাড়িজুড়ি ও ঘড়ির চেন দেখিয়াই ভোলে। কিন্তু বীণাপাণির অনেক অন্তঃপুরচারী আত্মীয় বিরলবেশে দীনের মত মার কাছে যায় এবং তিনি তাহাদিগকে কোলে লইয়া মস্তকাঘ্রাণ করেন। তাহারা কখন-কখন তাঁহার শুভ্র অঞ্চলে কিছু-কিছু ধূলিক্ষেপও করে—তিনি তাহা হাসিয়া ঝাড়িয়া ফেলেন। এই সমস্ত ধূলা-মাটি-সত্ত্বেও দেবী যাহাদিগকে আপনার বলিয়া কোলে তুলিয়া লন—দেউড়ির দরোয়ান-গুলা তাহাদিগকে চিনিবে কোন্ লক্ষণ দেখিয়া? তাহারা পোষাক চেনে, তাহারা মানুষ চেনে না। তাহারা উৎপাত করিতে পারে, কিন্তু বিচার করিবার ভার তাহাদের উপর নাই। সারস্বতদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার ভার যাঁহাদের উপরে আছে, তাঁহারাও নিজে সরস্বতীর সন্তান—তাঁহারা ঘরের লোক, ঘরের লোকের মর্য্যাদা বোঝেন।

আবাহন।

(১)

জাগিয়া উঠেছে এ প্রাণের মাঝে
শতেক দুঃখের কাহিনী
শুনিতে সে কথা আসিবে কি নামি'
জননি দ্যুলোকবাসিনি?
অশ্রুসলিল ফুটিছে নয়নে
ঝরিছে অঝোরে গোপনে
নিত্য এ মোর অশ্রুর মেলা
নিরখিবে কেগো নয়নে?

(২)

কতই বেদনা উঠিছে নিত্য
রুদ্ধ হৃদয় ভেদিয়া

উদাস মুক্ত বায়ুর মাঝারে
ঘুরিছে নিত্য ভ্রমিয়া।
শীর্ণ পাংশু— আপ্লুত আঁখি
ধূলিতে রেখেছে আবরি'
কে আর তাহাতে সিঞ্চিবে বারি
সদয় হৃদয়ে আহরি'।

(৩)

অন্তিম কালে ভুলিয়া যাতনা
আমারি দুঃখ ভেবেছ
সজল নয়নে আশিষপুষ্প
এ শিরে বরষি' দিয়েছ।
অপার-করুণা— সাগররূপিণি!
সাগর শুকাল কেমনে?
তনয়ের তব পূজার অর্ঘ্য
কেমনে দলিলে চরণে?

(৪)

যতই তোমার করুণার আঁখি
নেহারি মানসনয়নে
ততই কঠিন খল ছলভরা
নিরখি নিখিল ভুবনে।
তব স্মৃতি হ'তে যত দূরে আসি'
কালের কঠিন তাড়নে
তত দুস্তর নেহারি জননি!
ঘন সংসারগহনে।

(৫)

হবে না কি শেষ হবে না কি শেষ
দুঃখ তামসী যামিনী
শত-বৃশ্চিক— দংশনে নিতি
জ্বলিয়া মরিব জননি?
স্বরগবাসিনি এ ধরা ত্যজেছ
কাটিয়াছ মায়া-শিকলি,

তনয়ের তরে রাখিয়া গিয়াছ
বিষাদ-দৈন্য কেবলি !

(৬)

যেখানে জাগে না তোমার হাস্য
সে গৃহ কেমনে গণিব ?
যেখানে রাজে না তোমার অভয়
ভবন কি তারে বলিব ?
সে যদি গো গেহ শান্ত-মধুর
অরণ্য কারে কহে গো ?
তোমারে হারায়ে শ্মশানে রহিতে
হৃদয়ে কি সাধ রহে গো ?

(৭)

তরুণ জীবনে সব সাধ মোর
মিটিয়াছে সব কামনা
গরলে দিগ্ধ মরণ আসিয়া
সহসা হরেছে চেতনা।
জীবনপাত্র উঠেছে ভরিয়া
সুনীল তীব্র গরলে
ঘোর জ্বালাময় দীর্ঘ জীবন
বহিতে হইবে বিরলে।

(৮)

এস নেমে এস শান্তিরূপিণি
জননি ! জ্বালার জগতে
বিতর শান্তি করুণার বারি
তাপদুঃসহ মরতে।
শান্ত প্রসর অঞ্চলে তব
আবৃত কর তনয়ে
দুঃসহ শোক দূর কর ত্বরা
উরি' এ মরতে অভয়ে !

(৯)

ভগ্নহৃদয় ভিক্ষু তনয়
পড়িয়া অকুল পাথারে

চিরবিশ্রাম লভেছ যথায়
তুলে লহ তথা তাহারে।
অমিয় শিশির কোমল পরশে
মুছাও হৃদয়বেদনা
হর দুঃসহ পাপতাপরাশি
হর দুঃসহ যাতনা।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

মেঘচ্ছবি।

আমাদের প্রান্তরে মেঘবৃষ্টির ক্রীড়া আরম্ভ হইয়াছে।

এই প্রান্তরই বটে শৃঙ্খলমুক্ত বর্ষাপ্রকৃতির সুযোগ্য ক্রীড়াঙ্গন। মুক্ত আকাশ এবং মুক্ত প্রান্তর মুখোমুখী হইয়া চাহিয়া থাকে; তরুলেখাশূন্য চক্রবালে, যেখানে মৃত্তিকা অসীম আকাশসমুদ্রের প্রান্তে স্তম্ভিত হইয়া যেন থামিয়া দাঁড়াইয়াছে, দৃশ্যপটের সেই দূরান্ত সীমায়, - শূন্যতার অবাধ-বিস্তারে এক অগাধ এবং কঠোর ঔদাসীন্য ব্যঞ্জিত দেখিতে পাই;—আর একদিকে, যেখানে ধরণী-আকাশের সঙ্গমরেখায় এই সুদূর হইতে লক্ষ্যগোচর একসারি চিত্রবৎ স্পন্দহীন তালগাছ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ওই অগাধ শূন্যতাকে প্রতিহত করিতেছে, ওখানকার দৃশ্যটি কি সকরুণ! ঐ দূরলক্ষ্য ক্ষীণ তালগাছ-ক'টি দেখিয়া আমার মনে কেমন-একটু অসহায়তার ভাবের সঙ্গে একটি করুণা আবির্ভূত হয়। বিশ্বগ্রাসী শূন্যতার মধ্যে ওই ঋজুক্ষীণ জীবনরেখা-কয়েকটি বাস্তবিকই বড় সকরুণ।

কিন্তু চারিদিকেই, ঔদাসীন্য এবং কারুণ্যে সকলি ভরিয়া আজ ব্যাকুলতার নিবিড় সঞ্চার। ঐ যে তালীশ্রেণীর পশ্চাতে ঘননিবদ্ধ মেঘস্তর বিলম্বিত হইয়া তালীবনশ্রীতে কৃষ্ণকোমল সজলস্পর্শে গভীরতর কারুণ্য অর্পণ করিয়াছে। এবং পশ্চিম দিগন্তেও ঐ নির্লিপ্ত শূন্যতার অন্তর আজ বৃহৎ বাষ্পোচ্ছ্বাসতরঙ্গে গদ্গদ এবং ব্যাকুল।

আমাদের ধরাতলের বাষ্পোচ্ছ্বাসে বুঝি আজ গগনের জ্যোতির্লোক অবরুদ্ধ; দীর্ঘায়িত গুরুগুরু মেঘধ্বনিতে বুঝি আজ পৃথিবীর মর্ম্মবেদনা আকাশপ্রাঙ্গণে শব্দায়মান। শূন্যতার উদাসীন ললাটে চিন্তাকালিমা, জ্যোতির্ম্ময় স্বর্লোক নিরুদ্ধ, আকাশপ্রাঙ্গণে সিন্ধুনির্ঘোষ, ধরণীর বনে-প্রান্তরে নিবিড়তর মলিনিমা—আজ ধরণী-গগনের সহানুভূতির

দিন, আজ অপেক্ষার দিন, আজ অশ্রুজলে মিলনের দিন, আজিকার দিনান্তের পরিব্যাপ্ত অন্ধকারে ধরাতলে অভিসারের একরজনী আবির্ভূত হইবে।

কোথা হইতে কোথা চলিলাম? কিন্তু আজিকার দিনে সহজেই রাত্রির কথা মনে পড়ে। দিন আজ রাত্রির মত প্রায়, সমস্ত সুখ আজ দুঃখের মত প্রায়। নীপসুন্দর-স্মিতা সুন্দরি—তোমার হাস্য আজি সিন্ধু-তলের রত্নের মত অন্ধকার। স্মরচাপ-ভ্রূ-বিলসিতা, তোমার উজ্জ্বল চক্ষুতারকা আজ ঘনঘোর আকাশের মত বাষ্পময় অন্ধকারে আবিষ্ট। কোথায় রাত্রি? কোথায় রাত্রি-মুখে সন্ধ্যা? আজ কিরূপে তাহাকে চিনিয়া লইব? তাহার নীলাকাশভরা কোমলতা নীলাভা হইতে নীলাভায় বিগলিত হইয়া আজ কখন্ কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইবে!—ঘনবিন্যস্ত মেঘের রন্ধ্রে কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইব কি? কিন্তু না,—আজিকার সন্ধ্যা অপূর্ব্বতর। একি অভিনব সন্ধ্যা। বিকচ-জবাপুষ্প-রাগরক্ত এই সায়াহ্নকাল। ক্ষণকালের জন্য একটি রক্তমেঘ হইতে কোমলতর রক্তাভা নির্গত হইয়া এমনি তীব্র উজ্জ্বলতা ধারণ করিল যে, মনে হইতেছে, যেন বিশ্বকর্ম্মার অগ্নিকুণ্ডে দেবসেনাপতির বহ্নিদগ্ধ কঠিন লৌহবর্ম্ম নির্ম্মাণ হইতেছে। রক্তাভার নিম্নদেশে পৃথিবীও একটি বনচ্ছবি মিলাইয়া দিল, বৃষ্টিধৌত মেঘচ্ছায়াচকিত নিবাত-নিষ্কম্প বনচ্ছবি এমনি প্রগাঢ় সবুজ যে, ঐ ছবিটিকেও যেন কার্ত্তিকেয়ের একটি কঠিন তাম্র-ঢালের উপরে উৎকীর্ণ বলিয়াই মনে হইতেছে। মেঘে এবং বনে মিলিয়া একখানি রক্ত-পীত-নীল-হরিত-তরঙ্গায়িত প্রগাঢ়বর্ণ তাম্রপত্রে খচিত বৃহৎ ছবি।

এই চিত্রখানির, এই প্রতিমাখানির বেদিকা—এই অপার মুক্তপ্রান্তর,—এই ছায়া-মলিন সিক্ত-সুগন্ধি তৃণক্ষেত্র। ধীরে ধীরে সিক্ত মাঠের প্রতি অণুটিতে সন্ধ্যারাগ প্রবেশ করিয়াছে। কোথাও কালো ছায়া পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষেতের স্থানে স্থানে বর্ষার জল-রাশি সঞ্চিত হইয়া আছে—ঐখানেই আকাশের বর্ণে ভূবেদিকা অতিশয় সুরঞ্জিত। ঐ যে বাঁধের বর্ষাস্ফীত তীরতরুমূলচুম্বিত জলরাশি দেখিতে দেখিতে সমস্ত অবয়বে সিন্দুর হইয়া উঠিয়াছে, কোথাও বা জলকান্তি জম্বুরস-কষায়িতবৎ ঈষৎ বেগুনী। ধরণী-গগনের সহানুভূতির মধ্যে, পরস্পরের সিন্দুরী অনু-রঞ্জনের মধ্যে বসিয়া মনে হইতেছে, যেন আমার চারিদিকে নানাবর্ণদন্তুর একটি বিরাট্ দাড়িমফল ফাটিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে—চারিদিকেই এই স্বচ্ছতা, সরসতা এবং বর্ণ-বিলাস। আজ আমার স্তম্ভিত দুঃখিত হৃদয়। তাহা না হইলে চিত্তপটে এই মেঘচ্ছবি বিম্বিত হইয়া, শত উপমায় জীবন্ত হইয়া এক অলকাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিত। তাহা হইল না,—সন্ধ্যার ছায়ায় আমার অদৃশ্য বীণা পদতলে ফেলিয়া দিয়া নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। সিন্দুরলেখা ক্রমে ম্লানিমায় বিলীন হইয়া যাইতেছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

অতিপ্রাকৃত।

অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করিব কি না, একালের একটা প্রধান সমস্যা। সেকালের লোক নির্ব্বিবাদে বিশ্বাস করিত। একালেরও এত লোকে বিশ্বাস করে যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসটাই মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক ও অবিশ্বাসটাই অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। অস্বাভাবিক হইলেও একালের বৈজ্ঞানিকেরা অতিপ্রাকৃতে অবিশ্বাস করেন। আর যাঁহারা আপনাদের অবৈজ্ঞানিকতা-স্বীকারে কুণ্ঠিত, তাঁহারাও একালের বিজ্ঞানের খাতিরে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন। কিন্তু যখন শোনা যায়, দুইএকজন বড় বড় বৈজ্ঞানিক অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করেন, তখন বড়ই খট্‌কা দাঁড়ায়। থিয়সফিষ্টদের সহিত তর্ক উপস্থিত হইলেই তাঁহারা উল্লাসের সহিত ওয়ালাশ, ক্রুকস ও লজের নাম করিয়া ফেলেন। তখন তাঁহাদের দশনপ্রভায় আঁধার ঘর আলো হইয়া পড়ে। আমাদের মত অপণ্ডিত লোক, যাঁহারা উক্ত পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যমহিমায় মুগ্ধ আছেন, তাঁহারা তখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন।

অগত্যা তখন বলা যায়, বিজ্ঞানের রাজ্যে রাজশাসন নাই। যিনি যত বড় বৈজ্ঞানিক হউন না কেন, তাঁহার কথা বেদবাক্য বলিয়া মানিতে আমরা বাধ্য নহি। তিনি যথোচিত প্রমাণ উপস্থিত করুন, তখন তাঁহার কথা শুনিব। নাম দেখিয়া ভয় বৈজ্ঞানিকের রীতি নহে।

বলা বাহুল্য, এইরূপ উত্তর দেওয়া যায় বটে, কিন্তু মনের ভিতর গোল থাকিয়া যায়। কথাটা যদি নিতান্তই অমূলক হইবে, তবে ওয়ালাশ-সাহেব মানেন কেন? আর কেহ নহে,—যে-সে নহে,—ওয়ালাশ কেন মানেন?

বড় কঠিন সমস্যা। হিউম নাকি বলিয়া গিয়াছেন অতিপ্রাকৃত,—যাহার ইংরাজি নাম মিরাক্‌ল্‌,—তাহা ঘটিতে পারে না। টিণ্ডাল নাকি বলিয়াছেন, জগতে মিরাক্‌লের স্থান নাই। এখন কোন্ পথে যাই?

থিয়সফিষ্ট বন্ধুগণকে খুসী করিতে পারিব না জানি, তথাপি একবার বিচারসমুদ্রে অবগাহন করা যাক।

ইংরাজি মিরাক্‌ল্ শব্দের অর্থ কি ঠিক জানি না; অতিপ্রাকৃত শব্দের অর্থ জানি। প্রাকৃত অর্থে যাহা প্রকৃতির অঙ্গ, যাহা প্রকৃতিতে ঘটে; অতিপ্রাকৃত অর্থে, প্রকৃতিকে যাহা অতিক্রম করে, যাহা প্রকৃতির বাহির।

যাহা কিছু ঘটে, তাহাই প্রকৃতির অঙ্গীভূত—তা সে যতই অদ্ভুত হউক না কেন। অদ্ভুত হইলেও তাহা যখন ঘটিতেছে, তখন তাহা প্রাকৃত, তাহা অতিপ্রাকৃত নহে।

বাইবেলে গল্প আছে, জোশুয়ার আদেশে সূর্য্য আকাশে স্থির হইয়াছিল। যীশুখৃষ্ট

মৃত্যুর পর অনেককে দেখা দিয়াছিলেন। ঐ ঐ গল্প হয় সত্য, নয় মিথ্যা। হয় উহা ঘটিয়াছিল, নয় ঘটে নাই। যদি ঘটিয়া থাকে—তবে উহা প্রাকৃত—অতিপ্রাকৃত নহে—অত্যদ্ভুত হইলেও অতিপ্রাকৃত নহে। যদি না ঘটিয়া থাকে ত কথাই নাই।

যাহা ঘটে, তাহাই যখন প্রাকৃত, তখন অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ। কাজেই অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করায় প্রয়োজন নাই।

এইরূপে ভাষাগত বা ব্যাকরণগত তর্ক তুলিয়া প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করা চলে। কিন্তু তাহাতে আসল কথার মীমাংসা হয় না। আসল কথা এই, জোশুয়ার আদেশে সূর্য্যের গতিরোধে বিশ্বাস করিব কি না? ঐ ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না? যীশুখৃষ্টের প্রেতমূর্ত্তি লোকে দেখিয়াছিল কি না? ভূত মানিব কি না?

কেহ কেহ বলিবেন, না, মানিব না! ঐ সকল ব্যাপার অসম্ভব; উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ। যাহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা ঘটিতে পারে না। টিণ্ডাল হয় ত ঐরূপ বলিতেন।

ভাল; কিন্তু উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা জানিলে কিরূপে? প্রকৃতির নিয়ম কি?

হয় ত বলিবে, ঐ ব্যাপার অতি অদ্ভুত, অতি নূতন; বাইবেলের গল্পে ছাড়া এরূপ ঘটনা কেহ কখন দেখে নাই, শোনে নাই। উহা অতি অদ্ভুত, অতি অসাধারণ, অতি নূতন—কাজেই উহা প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ।

এরূপ বলিতে পার না। এই কয়েক-বৎসরমধ্যে বিজ্ঞানশাস্ত্র কত অদ্ভুত নূতন কাণ্ড আবিষ্কার করিয়াছে। বায়ুমধ্যে আর্গন, ক্রিপটন প্রভৃতি কত-কি অদ্ভুত নূতন পদার্থ বাহির হইল; কত-কি-রকম অদ্ভুত আলো বাহির হইল, তাহা কাঠ-পাথর মানে না, তাহার ভিতর দিয়া অনা-য়াসে চলিয়া যায়;—এই সকল অত্যদ্ভুত, অতি নূতন, স্বপ্নের অগোচর ব্যাপারে বিশ্বাস কর, আর বাইবেলের গল্পে বিশ্বাস করিবে না?

ইহার উত্তর নাই। নূতন বলিয়া, অদ্ভুত বলিয়া, অদৃষ্টপূর্ব্ব বলিয়া, অবিশ্বাস করিবার জো নাই। অজ্ঞাতপূর্ব্ব হইলেই বা অদ্ভুত হইলেই প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ হয় না।

তার চেয়েও সূক্ষ্ম তর্ক আছে। প্রকৃতির নিয়ম কি? প্রকৃতিতে যা ঘটে, তাহা লইয়াই ত প্রকৃতির নিয়ম। যাহা ঘটে, তাহা নিয়ম-বিরুদ্ধ হইতেই পারে না। আমি বলিতেছি সূর্য্যের গতিরোধ যখন ঘটিয়াছিল, তখন উহা নিয়মসঙ্গত। তুমি যদি বল, উহা নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা হইলে যাহা বিচারের বিষয়, যাহা বিরোধস্থল, যাহাকে অসম্ভব প্রমাণ করিতে হইবে, তাহাকে আগেই অসম্ভব ধরিয়া লইতেছ। এ কিরূপ যুক্তি? ন্যায়শাস্ত্রে এরূপ যুক্তি টিকে না। তুমি হয় ত বলিবে, চিরকাল ধরিয়া মানুষে যখন সূর্য্যকে গতিশীল দেখিয়া আসিতেছে, তখন সূর্য্যের অবিরাম গমনই নিয়ম; এত সহস্র বৎসর-মধ্যে কেবল একবারমাত্র গতির রোধ নিয়ম-বিরুদ্ধ।

বিখ্যাত ব্যাবেজ-সাহেব ইহার উত্তর দিয়াছিলেন। তিনি নানাবিধ আঁক-কষা যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। নির্দ্দিষ্ট নিয়মবলে সেই যন্ত্র আঁক কষিয়া উত্তর বাহির করিয়া

দিতে পারে। একটি যন্ত্র এইরূপ। এক, দুই, তিন, এইরূপে আরম্ভ করিয়া পর পর সংখ্যা যন্ত্র হইতে বাহির হইতেছে। এগার হাজার সাত শ বাইশ পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। তুমি এগার হাজার সাত শ তেইশের অপেক্ষায় বসিয়া আছ, এমন সময়ে অকস্মাৎ বাহির হইল তেত্রিশ হাজার পাচ। তার পর আবার নিয়মমত যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ঘটনাটা যন্ত্রের মিরাকল্ বটে, তবে নিয়মের বহির্ভূত নহে। যন্ত্র এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে, ঐ সময়ে এই সংখ্যা বাহির না হইয়া ঐ সংখ্যাই বাহির হইবে। তবে যন্ত্রটির নির্ম্মাতা অপর লোককে বেশ ঠকাইতে পারেন। যে জানে না, সে যন্ত্র বিকল হইয়াছে, মনে করিতে পারে।

এইরূপ জগদ্‌যন্ত্রসম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। সূর্য্য দিনের পর দিন যথানিয়মে উঠিতেছেন ও আকাশপথে ভ্রমণ করিতেছেন। একদিন অকস্মাৎ যদি থামিয়া যান, তাহা হইলে জগদ্‌যন্ত্র বিকল হইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। যিনি যন্ত্রের নির্ম্মাতা, তিনি এইরূপ ব্যবস্থাই করিয়া রাখিয়াছেন। সূর্য্য চলিতে চলিতে সহসা একএকবার থামিবেন, যন্ত্রের বন্দোবস্ত এইরূপই আছে।

বস্তুত ব্যাবেজ-সাহেবের আপত্তির উত্তর নাই। মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, ঐটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যভিচার নাই বা হইতে পারে না, এরূপ নির্দ্দেশ অন্যায়, অসঙ্গত, অসমীচীন, অবৈজ্ঞানিক। এরূপ দুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমানকে সাজে না।

মাধ্যাকর্ষণ, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা প্রভৃতি কয়েকটি ঘোরতর প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বড়ই বাবদূকতা প্রদর্শন করিতেন। আজিকালি অনেকে সাবধান হইয়া কথা কহেন। যতটুকু আমাদের অভিজ্ঞতা, তাহার সীমা ছাড়াইয়া কোন কথা বলিবার আমাদের অধিকার নাই। যে কালটুকু ও যে দেশটুকু ব্যাপিয়া আমরা ঐ সকল নিয়মের অস্তিত্ব দেখি, উহারা ততটুকুর মধ্যেই ঠিক। তাহার বেশী আমরা বলিতে পারিব না। ঐ সকল নিয়মের ব্যভিচার অকল্পনীয় নহে, অসম্ভবও নহে। হয় ত কিছুদিন পরে শুনিতে পাইব, অমুক নক্ষত্রপুঞ্জমধ্যে জড়ের নূতন সৃষ্টি ঘটিতেছে, শক্তির ধ্বংস ঘটিতেছে; তাহাতে বিস্মিত হইতে পারি, কিন্তু যদি ঘটে, তাহার অপলাপ করিতে পারিব না। প্রকৃতিতে যাহা ঘটিবে, তাহাকেই প্রাকৃত ও প্রাকৃতিক-নিয়ম-সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই চলিবে না। শক্তিকে অনশ্বর জানিয়া এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলাম ও কত বক্তৃতা করিয়াছি; এখন উহাকে স্থলবিশেষে নশ্বর দেখিলে দুঃখিত হইব, কিন্তু দুঃখই সার হইবে। যাহা যেখানে নশ্বর, তাহা আমার খাতিরে সেখানে অনশ্বর হইবে না।

তাই যদি ব্যাবেজের কলের মত সূর্য্য লাখ-বৎসর অন্তর একবার করিয়া কাহারও আদেশমত থামিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া গ্রাহ্য করিতে হইবে। অসম্ভব বলিয়া প্রাকৃতিক ঘটনাকে উড়াইতে পারিব না।

কোন নূতন ধরণের সামুদ্রিক জীব যদি মাঝে মাঝে জাহাজের নিকট ভাসিয়া উঠে, তাহাতে কোন প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হয় কি? তবে মাঝে মাঝে যদি কোন নূতন ধরণের জীব তাহার ইথরীয় ছায়াময় শরীর লইয়া আসিয়া দেখা দেয় বা ভয় দেখায় বা নাকি-সুরে কথা কয়, তাহাতেই বা প্রাকৃতিক নিয়মের ভঙ্গ হইবে কোথায়?

কখনই না। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করে, অতএব অসম্ভব, - এটা কোন কাজের কথাই নয়। প্রকৃতির নিয়ম কি, তাহাই যখন পূরা সাহসে বলিতে পারি না, তখন ঐ উক্তি হঠোক্তিমাত্র। প্রকৃতির এক দেশের সহিত আমার পরিচয়, লেনাদেনা, কারবার রহিয়াছে; কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা অকস্মাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক-নিয়ম-বিরুদ্ধ বলিবার কাহারও অধিকার নাই। তবে কি আজ হইতে ভূত মানিব? বাইবেলের যত অদ্ভুত গল্পে বিশ্বাস করিব?

ইহার উত্তর হক্‌সলি স্পষ্টভাবে দিয়াছেন। জগতে একবারে অসম্ভব কিছুই নাই, সূর্য্যের গতিরোধ হইতে ভূতের উৎপাত পর্য্যন্ত কিছুই অসম্ভব বলিতে পারা যায় না। তেমনি গুলিখোরের সভায় যত গল্পের সৃষ্টি হয়, তাহারও কোনটাও হয় ত অসম্ভব নহে। তথাপি এই ক্ষেত্রে আমরা ঐ সকল গল্পে বিশ্বাস করা আবশ্যক বিবেচনা করি না। ঘটনা সম্ভব হইলেই সত্য হয় না। সত্যতার প্রমাণ আবশ্যক হয়। বাইবেলের গল্পের যদি যথোচিত প্রমাণ থাকে, তাহার যাথার্থ্যে বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি।

প্রমাণ কিন্তু যথোচিত হওয়া আবশ্যক; ঐ যথোচিত কথাটাতেই যত গোল। সর্ব্বসাধারণে যে প্রমাণে সন্তুষ্ট থাকেন, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তাহাতে সন্তুষ্ট থাকেন না। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও মতভেদ ঘটে। কতটুকু প্রমাণ হইলে সত্যতায় বিশ্বাস করা যাইবে, এ বিষয়ে ন্যায়শাস্ত্র নীরব। ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিবার জো নাই; চোখে ভুল দেখে, কান ভুল শোনে, বুদ্ধি বিকৃত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যচরিত্র দুর্ব্বোধ্য। কাহার মনে কি আছে, বলা অসাধ্য। নিজের উপরেই যখন সর্ব্বদা বিশ্বাস চলে না। সাক্ষীর কথায়—তিনি যত-বড় সাক্ষীই হউন, সাক্ষীর কথায় নির্ভর করিয়া অনেক সময়ে ঠকিতে হয়।

মোটের উপর কথা এই, কতটুকু প্রমাণের উপর নির্ভর করা চলিতে পারে, এ বিষয়ে ব্যক্তিভেদে আদর্শভেদ রহিয়াছে। সকলের আদর্শ সমান নহে; সমান হইবারও উপায় নাই। কাজেই যে কথায় তুমি অবলীলাক্রমে বিশ্বাস কর, আমি তাহাতে আদৌ আস্থা করি না। পরস্পর গালিগালাজ করিয়া শান্তিভঙ্গ করি। ফল কিছু হয় না।

বৈজ্ঞানিকদের বিরুদ্ধে ওপক্ষের একটা অভিযোগ আছে। তাঁহারা বলেন, প্রমাণ আমরা দিতে প্রস্তুত; কিন্তু তোমরা ধীরভাবে প্রমাণ গ্রহণ করিতেই অসম্মত; তোমরা গোড়াতেই আমাদিগকে মিথ্যাবাদী, প্রতারক বা অন্ধ-প্রতারিত বলিয়া ধ্রুব জানিয়া রাখিয়াছ। আমাদের প্রমাণ না দেখিয়াই, না জানিয়াই, তোমরা রায় বাহাল রাখিতেছ, এটা নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক প্রথা।

বৈজ্ঞানিকের পক্ষে সাফাই এই যে, আমরা বারবার প্রমাণ শুনিয়া ও সাক্ষ্য শুনিয়া এত বিরক্ত হইয়াছি যে, আর ও মিছা অভিনয় ভাল লাগে না। জীবন চিরস্থায়ী নহে, আমাদের অনেক কাজ আছে; আর পুনঃপুন সময় নষ্ট করিয়া ঠকিতে প্রস্তুত নহি।

সাফাই নিতান্ত ফেলিবার নহে। এতবার বৈজ্ঞানিকদিগকে ঠকিতে হইয়াছে যে, তাঁহারা পুনরায় ঠকিতে কুণ্ঠিত হইলে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া উচিত হয় না। তবে তাঁহারা প্রতিপক্ষকে একবারে না চটাইয়া এইরূপ জবাব দিলেই বোধ করি সঙ্গত হয়। বন্ধু, মনুষ্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, জীবন ও অচিরস্থায়ী; একজনেই যে জগতের যত সত্য বাহির করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। আমার কাজ আমি করিতেছি; তোমার কাজ তুমি কর। আমরা উভয়েই প্রকৃতির সাম্রাজ্যে সত্যানুসন্ধানে নিযুক্ত আছি। যে যাহা আপন চেষ্টায় পারে, সে তাহা করুক। তুমি যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব অদৃষ্টচর অদ্ভুত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিতেছ, তাহা সমস্তই সত্য হইতে পারে। তোমাকে আমি মিথ্যাবাদী বলিতেছি না; তবে বলি, তোমার সংগৃহীত প্রমাণ জনসমাজে উপস্থিত কর, আরও নূতন প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাক, যদি তোমার আবিষ্কৃত সংবাদ সত্য হয়, একদিন না একদিন তাহা গৃহীত হইবেই। সত্যমেব জয়তে—সত্যের জয় হইবেই। তবে ভিক্ষা এই, নিতান্ত অধীর হইও না—সত্যের জয় হয় বটে, কিন্তু যত শীঘ্র হওয়া উচিত, তাহা হয় না—কি করিবে, সংসারের বন্দোবস্তটাই এইরূপ। আর ভিক্ষা—আমি আমার কাজে নিতান্ত ব্যাপৃত থাকায় নিতান্ত অবকাশের অভাবে যদি তোমার আবিষ্কৃত নূতন তথ্যে মনোযোগ দিবার অবকাশ না পাই, আমাকে গালি দিও না।

আসল কথাটা এই, জগতে সময়ে সময়ে এমন একএকটা ঘটনা ঘটে, তাহা আমাদের পরিচিত জগৎ-প্রণালীর সঙ্গে সমঞ্জস হয় না; উহার সহিত ঠিক খাপ খায় না। যাঁহারা বৈজ্ঞানিক, তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ খাপছাড়া ঘটনার সাক্ষাৎলাভ সদাসর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা দিনদিন যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কার করেন, তাহার অধিকাংশই বোধ করি খাপছাড়া। রন্তগেনের ও অন্যান্য পণ্ডিতের আবিষ্কৃত নূতন রশ্মিগুলি এইরূপ খাপছাড়া; আমাদের চিরপরিচিত আলোকরশ্মির সহিত উহাদের মিল নাই; উহারা কি, আমরা ঠিক বুঝিতে পারি না। সেইরূপ আর্গন ক্রিপটনাদি বায়ুগুলিও কতকটা খাপছাড়া; আমাদের চিরপরিচিত জড়পদার্থসঙ্ঘের মধ্যে উহারা কোথায় স্থান পাইবে, তজ্জন্য রাসায়নিক পণ্ডিতেরা আকুল হইয়া আছেন। এইরূপ খাপছাড়া ব্যাপার নিত্য নূতন আবিষ্কার করিতেছেন বলিয়াই বৈজ্ঞানিকের এতটা বাহাদুরি; অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, বৈজ্ঞানিক তাহা দেখিতে পান; ইহাতেই উঁহার এত দর্প। অথচ সেই বৈজ্ঞানিকেরাই অবৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত একটা নূতন তথ্যের সংবাদ পাইলে তাহাতে বিশ্বাস করিতে চান না এবং সহসা উহাকে মিথ্যা বলিয়া ফেলেন, তাহাই অবৈজ্ঞানিকদের পক্ষে ক্ষোভের হেতু হয়। আপাতত ইহা একটা সমস্যা ঠেকে। কিন্তু একটু ধীরভাবে আলোচনা করিলে ইহা

বুঝা যায়। খাপছাড়া নূতন তথ্য লইয়া বৈজ্ঞানিকের কারবার বটে; কিন্তু যতক্ষণ তিনি খাপছাড়াকে খাপে পূরিতে না পারেন, যতক্ষণ অসমঞ্জসকে সমঞ্জস করিতে না পারেন, যতক্ষণ অপরিচিত নূতন সত্যকে পুরাণ পূর্ব্বপরিচিত সত্যের সঙ্গে মিলাইয়া, সম্বন্ধ আবিষ্কার করিয়া, তাহার কোঠায় না ফেলিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার তৃপ্তি হয় না। চেষ্টার বলে ও বুদ্ধিবলে তিনি কালে সম্বন্ধের আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন, তখন তাহা আর অসমঞ্জস খাপছাড়া থাকে না। বিজ্ঞানশাস্ত্রের ইতিহাসই তাহাই, যাহা এককালে খাপছাড়া ঠেকিত, তাহা কালে খাপের মধ্যে আসে। যাহা ধূমকেতুর মত অকস্মাৎ প্রত্যক্ষগোচর হইয়া বিভীষিকা দেখাইত, তাহা সৌরজগতের পরিচিত প্রণালীবদ্ধ জড়পিণ্ডে পরিণত হয়। এইরূপে অসম্বদ্ধ অসমঞ্জস জগতে সামঞ্জস্য ও সম্বন্ধের পুনঃপুন আবিষ্কারে সমর্থ হইয়া বৈজ্ঞানিকের সেই সামঞ্জস্যের প্রতি একটা মজ্জাগত প্রীতি জন্মিয়া যায়। তখন যদি সহসা কেহ একটা নূতন সংবাদ আনিয়া দেয়, যে সংবাদ তাঁহার পরিচিত জগৎপ্রণালীর সঙ্গে মিলে না বা তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিতে চাহে, তখন তাঁহার মনে একটা ব্যাকুলতা আসে। তিনি ও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তিগণ উৎকট পরিশ্রমে যে সৌধখানি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, কোথায় তাহা ভাঙিয়া যাইবে, সেই ভয়ে কতকটা ব্যাকুল হন। সেই সৌধের কোন প্রকোষ্ঠমধ্যে এই নূতন জিনিসটাকে স্থান দিতে না পারায় তাঁহার সামঞ্জস্যবুদ্ধিতে, তাঁহার সৌন্দর্য্যবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। এই নূতন জিনিষটাকে কতকটা সংশয়ের, কতকটা ভয়ের চোখে দেখেন, এবং যদি কোনরূপে উহার অলীকতা প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তাহা হইলে যেন হাঁফ ছাড়িবার অবসর পান। তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে মার্জ্জনা করা যাইতে পারে।

বস্তুত এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকে ও অবৈজ্ঞানিকে যে জাতিগত ভেদ আছে, তাহা নহে। বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ মানুষ বস্তুতই একশ্রেণীর লোক। জগদ্‌যন্ত্র যদি একেবারে এলোমেলো, শৃঙ্খলারহিত, একটা গণ্ডগোলমাত্র হইত, তাহা হইলে সাধারণ মানুষেরও জীবনযাত্রা সুকর হইত না। জগদ্‌যন্ত্রে বেশ একটা শৃঙ্খলা আছে। ভাত খাইলে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়; হঠাৎ যদি এই নিয়মটা বদ্‌লাইয়া যায়, এবং যত খাবে, তত ক্ষুধা বাড়িবে, এইরূপই যদি বন্দোবস্ত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মনুষ্যের বুদ্ধি দুর্ভিক্ষনিবারণের উপায়নির্দ্ধারণে একবারে অসমর্থ হইয়া পড়ে। অতিপ্রাকৃতের প্রতি বা মিরাকলের প্রতি যাঁহার যত ভক্তি থাক্, জগদ্‌যন্ত্রে যদি কোনরূপ শৃঙ্খলা না থাকিত, তাহা হইলে কাহাকেও ধরাপৃষ্ঠে বিচরণ করিতে হইত না। কাজেই কতকটা সামঞ্জস্য ও কতকটা শৃঙ্খলা মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই প্রীতিকর না হইলে চলে না। সামঞ্জস্যের প্রতি, শৃঙ্খলার প্রতি মনুষ্যমাত্রেরই কতকটা আন্তরিক অনুরাগ রহিয়াছে। রহিয়াছে বলিয়াই মানুষ পশুর উপরে; রহিয়াছে বলিয়াই সভ্য মানুষ অসভ্য মানুষের উপরে। মনুষ্যমাত্রেই ন্যূনাধিক মাত্রায় বৈজ্ঞানিক।

ন্যূনাধিক মাত্রায় কেন? না, সামঞ্জস্যে প্রীতি সকলের পক্ষে সমান নহে,

সকলের জগৎ ঠিক সমানমাত্রায় সমঞ্জস নহে। ব্যাবহারিক হিসাব ছাড়িয়া একটু পরমার্থের হিসাবে দেখিলে বুঝিতে হয়, আমরা আপন আপন জগৎ আপনার আপনার মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছি। প্রত্যক্ষ জগৎকে কতকগুলি প্রত্যয়ের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছু বলিতে পারা যায় না। বস্তুতই বলা চলে না। এই প্রত্যয়গুলি মানসিক পদার্থ; প্রত্যেক ব্যক্তি উহাদিগকে নানাভাবে সাজাইয়া আপন আপন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া লয়। সকলের প্রত্যয় ঠিক সমান নহে, সেইজন্য সকলের জগৎ ঠিক এক নহে; প্রায় এক; কিন্তু ঠিক এক নহে।

দর্শনশাস্ত্র হইতে জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিনটা শব্দ গ্রহণ করিলে বুঝিবার কতকটা সুবিধা হইতে পারে। প্রত্যেক ব্যক্তির চেতনার তিন অবস্থা;—জাগরণের, স্বপ্নের ও সুষুপ্তির অবস্থা। জাগরণের অবস্থায় জগৎ সুশৃঙ্খল, সুবিন্যস্ত, সমঞ্জস; স্বপ্নাবস্থায় জগৎ শৃঙ্খলাশূন্য, অসমঞ্জস, এলোমেলো—তবে যতক্ষণ স্বপ্নাবস্থা থাকে, ততক্ষণ উহা সুশৃঙ্খল বলিয়াই বোধ হয়। আর সুষুপ্তির অবস্থায় জগৎ প্রায় নাস্তিত্বে লীন হইয়া যায়। অবস্থা এই তিনটা, কিন্তু চেতনা যুগপৎ এই তিন অবস্থাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। চেতনা পূর্ণ জাগ্রত, বা পূর্ণ স্বপ্নাবস্থ, বা পূর্ণ সুষুপ্ত কখনও থাকে, তাহা বোধ হয় না। জাগরণে, স্বপ্নে ও সুপ্তিতে মিলাইয়া-মিশাইয়া চেতনার প্রকাশ। জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে চেতনার কিয়দংশ স্বপ্ন দেখে ও কিয়দংশ স্বপ্নহীন ঘুমে থাকে। আজকাল subliminal self বা subliminal consciousness নামে একটা কথা শুনা যায়। প্রেততাত্ত্বিকেরা ঐ শব্দের বহুল ব্যবহার করেন, এবং উহার দ্বারা নানাবিধ মানসিক বিকারাবস্থার ব্যাখ্যা করেন। ঐ শব্দের অর্থ এইরূপে বুঝান যাইতে পারে। মানুষের চেতনার একটা প্রকোষ্ঠমাত্র পূর্ণ-চেতন বা পূর্ণ-জাগ্রত; যাহা সেই প্রকোষ্ঠের অন্তর্ব্বর্ত্তী, তাহাই আমাদের স্পষ্ট প্রত্যক্ষ। সেই প্রকোষ্ঠের দ্বার দিয়া প্রত্যয়গুলি যাতায়াত করিতেছে; যতক্ষণ উহা সেই দ্বারের বাহিরে থাকে, ততক্ষণ উহা প্রত্যক্ষ হয় না, ততক্ষণ উহা subliminal, ততক্ষণ উহা জ্ঞানের বিষয় হয় না। সেই subliminal অবস্থাকে আমরা সুপ্ত অবস্থা, এবং যাহা প্রকোষ্ঠের ভিতরে আসিয়াছে, যাহা জ্ঞানের বিষয়, যাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ, মায়ার্স-সাহেব যাহাকে supraliminal বলেন, তাহাকে জাগ্রদবস্থা বলিতে পারি। সুপ্ত অবস্থায় যে সকল প্রত্যয় জাগ্রত চেতনার প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া উঁকিঝুঁকি মারে, কখন ক্ষণেকের মত দ্বারের ভিতর প্রবেশ করিয়া আবার তখনই পলাইয়া যায়, তাহাদিগকে স্বপ্নাবস্থ মনে করিতে পারি। মানুষের ঘুমন্ত অবস্থায় বা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় (ইংরাজিতে যাহাকে হিপ্‌নটিক্‌ অবস্থা বলে, তাহাতে), বা ওষধিমুগ্ধ অবস্থায় (অর্থাৎ নেশার অবস্থায়) এই আকস্মিক, আগন্তুক, অপরিচিত বা অল্পপরিচিত প্রত্যয়গুলি আসিয়া উঁকি মারে। তখন উহাদিগকে আমরা দেখি; কিন্তু জাগ্রদবস্থার পরিচিত পূর্ণপ্রকাশ প্রত্যয়গুলির সহিত উহাদের সামঞ্জস্য রাখিতে পারি না। প্রেততাত্ত্বিকের ভাষায় আমাদের পূর্ণ জাগ্রদবস্থাতেও এই sublimi-

nal—প্রকোষ্ঠের বহিস্থ—চেতনা কাজ করে ও মাঝে মাঝে দেখা দেয়। আমরা তাহাদিগকে দেখিয়া বিস্মিত হই বা স্তম্ভিত হই ও তাহাদের সহিত পুরা সাহসে কারবার চালাইতে, তাহাদিগকে জীবনের কাজে লাগাইতে সাহস করি না। তাহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, তাহা ঠিক বুঝি না; কাজেই আশঙ্কা ও আতঙ্কের সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করি বা প্রত্যাখ্যান করিতে উদ্যত হই।

ব্যাখ্যার ভাষাটা যাহাই হউক, কথাটা কিন্তু ঠিক। আমাদের চেতনায় সর্ব্বদা জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি মিলিয়া অবস্থান করিতেছে। তিনের তারতম্যানুসারে চেতনার অবস্থাভেদ ঘটে। আমরা যাহাকে পূর্ণ-জাগরণ বলি, তাহা পূর্ণ-জাগরণ নহে—তাহাতে স্বপ্নের অভাব নাই; এবং তখন চৈতন্যের কিয়দংশ যে নিদ্রিত নহে, তাহাও বলা যায় না। যাহা জাগরণে দেখি, তাহা সুশৃঙ্খল, যথাবিন্যস্ত; যাহা স্বপ্নে দেখি, তাহা শৃঙ্খলাহীন, বিপর্য্যস্ত; তাহা জাগ্রদবস্থাদৃষ্ট পরিচিত প্রণালীর সহিত অসম্বদ্ধ। কিন্তু যাহা এইরূপ অসম্বদ্ধ ও অসংযত, তাহাকে সংযমের শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করাই চেতনার কাজ। অন্তত তাহাতেই চেতনার অভিব্যক্তি। ইহা প্রেততাত্ত্বিকেরাও অস্বীকার করিবেন না। করিলে তাঁহারা দেহমুক্ত প্রেতপুরুষের সহিত ঘনিষ্ঠ কারবারের জন্য এত উৎসুক হইতেন না। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা, চিঠিচালাচালির জন্য এত ব্যগ্র হইতেন না। তাহাদের ফটোগ্রাফ তুলিবার জন্য এত ব্যাকুল হইতেন না। এইরূপ স্বপ্নকে জাগরণে লইয়া আসিবার জন্যই চেতনা ব্যাকুল। স্বপ্নের জাগরণে পরিণতিতেই চেতনার স্ফূর্ত্তি ও সার্থকতা।

প্রশ্ন উঠে, কেন এমন হয়? জাগরণের অবস্থাতেই প্রত্যয়গুলি কেন সংযত, সুশৃঙ্খল, ও স্বপ্নাবস্থাতেই বা কেন অসংযত? ব্যাবহারিক হিসাবে ইহার উত্তর এই যে, জগৎপ্রণালীর অন্তত খানিকটা সংযত, নিয়মবদ্ধ, সমঞ্জস না হইলে মানুষ ধরাধামে টিকিত না। নিম্ন-পর্য্যায়ের জীবে মানুষের মত জগৎকে সুনিয়ত দেখে না, তাহা ঠিক। মানুষ দেখে বলিয়াই মানুষ উচ্চপর্য্যায়ের জীব; মানুষ জীবনসংগ্রামে জয়ী। এবং যে মানুষ জগৎকে যত সুশৃঙ্খল, যত সুনিয়ত দেখে, সে তত জীবনসংগ্রামে যোগ্য, সে তত উন্নত। মনুষ্যের ইতিহাস তাহার সাক্ষী; বিজ্ঞানের ইতিহাস তাহার সাক্ষী। স্বপ্ন জীবনসংগ্রামে অনুকূল নহে; তাহার সাক্ষী পাগল। সে কেবল স্বপ্ন দেখে—তাহার জগতে শৃঙ্খলা নাই—সে জীবনসমরে অশক্ত। সেইজন্য বলিতে পারা যায়, প্রত্যেক মনুষ্য আপনার জীবনসংগ্রামে সুবিধার জন্য আপনার জগৎকে যথাসাধ্য আপন শক্তি অনুসারে নিয়মিত, সংযত, শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া গড়িয়া লইয়াছে; আপনার গঠিত জগতে, আপনার কল্পিত জগতে নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জাগ্রত; নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে বলিয়াই সে জীবনসংগ্রামে সমর্থ।

অনিয়মের প্রতি, বিশৃঙ্খলার প্রতি বৈজ্ঞানিকের বিষদৃষ্টির মূল এইখানে। অতিপ্রাকৃত লইয়া কোলাহলের মূলও এইখানে।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

১৯

পরদিন সকালের গাড়িতে যোগেন্দ্র পশ্চিম হইতে ফিরিয়া আসিল। আজ শনিবার, কাল রবিবারে হেমনলিনীর বিবাহের কথা। কিন্তু যোগেন্দ্র তাহাদের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া উৎসবের স্বাদগন্ধ কিছুই পাইল না। যোগেন্দ্র মনে করিয়া আসিতেছিল, এতক্ষণে তাহাদের বাসার বারান্দার উপর দেবদারু-পাতার মালা ঝোলানো সুরু হইয়াছে—কাছে আসিয়া দেখিল, শ্রীহীন মালিন্যে পাশের বাড়ীর সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর কোন প্রভেদ নাই।

ভয় হইল, পাছে কাহারো অসুখ-বিসুখ করিয়া থাকে। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দেখিল, চায়ের টেবিলে তাহার জন্য আহারাদি প্রস্তুত রহিয়াছে এবং অন্নদাবাবু অর্দ্ধভুক্ত চায়ের পেয়ালা সম্মুখে রাখিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন।

যোগেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, "হেম কেমন আছে ?"

অন্নদাবাবু। ভাল।

যোগেন্দ্র। বিবাহের কি হইল ?

অন্নদাবাবু। কাল রবিবারের পরের রবিবারে হইবে।

যোগেন্দ্র। কেন ?

অন্নদাবাবু। কেন, তাহা তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা কর। রমেশ আমাদের কেবল এইটুকু জানাইয়াছে যে, তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে,—এ রবিবারে বিবাহ বন্ধ রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র তাহার অক্ষম বাপের উপরে মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল—"বাবা, আমি না থাকিলে তোমাদের নানান্ গলদ্ ঘটে। রমেশের আবার প্রয়োজন কিসের ? সে স্বাধীন। তাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই বলিলেই হয়। যদি তাহার বৈষয়িক বিশেষ কোন গোলযোগ ঘটিয়া থাকে, সে কথা খুলিয়া বলিবার কোন বাধা দেখি না! রমেশকে তুমি এত সহজে ছাড়িয়া দিয়ে কেন ?"

অন্নদাবাবু। আচ্ছা বেশ ত, সে ত এখনো পালায় নাই—তুমিই তাহাকে প্রশ্ন করিয়া দেখ না!

যোগেন্দ্র শুনিয়া তৎক্ষণাৎ এক পেয়ালা

গরম চা তাড়াতাড়ি নিঃশেষ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু কহিলেন—"আহা, যোগেন, এত তাড়াতাড়ি কিসের! তোমার যে খাওয়া হইল না।"

সে কথা যোগেন্দ্রের কানে পৌঁছিল না। সে রমেশের বাসায় ঢুকিয়া সশব্দ দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল। "রমেশ! রমেশ!" রমেশের কোন সাড়া নাই। ঘরে-ঘরে খুঁজিয়া দেখিল, রমেশ শুইবার ঘরে নাই, বসিবার ঘরে নাই, ছাদে নাই, একতলায় নাই। অনেক ডাকাডাকির পর বেহারাটাকে সন্ধান করিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু কোথায়?"

বেহারা কহিল—"বাবু ত ভোরে বাহির হইয়া গেছেন।"

যোগেন্দ্র। কখন্ আসিবে?

বেহারা জানাইল—বাবু তাঁহার কতক-কতক কাপড়-চোপড় লইয়া চলিয়া গেছেন। বলিয়া গেছেন, ফিরিয়া আসিতে তাঁহার চারপাঁচদিন দেরি হইতে পারে। কোথায় গেছেন, তাহা বেহারা জানে না।

যোগেন্দ্র গম্ভীর হইয়া চায়ের টেবিলে ফিরিয়া আসিল। অন্নদাবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইল?"

যোগেন্দ্র বিরক্ত হইয়া কহিল—"হইবে আর কি, যাহার সঙ্গে আজ-বাদে-কাল মেয়ের বিবাহ দিবে, তাহার কি কাজ পড়িয়াছে, সে কখন্ কোথায় থাকে, তাহার খোঁজ-খবর তোমরা কিছুই রাখ না! অথচ তোমার বাড়ীর পাশেই তাহার বাসা!"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "কেন, কাল রাত্রেও ত রমেশ ঐ বাসাতেই ছিল!"

যোগেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "তোমরা জান না সে কোথায় যাইবে, তাহার বেহারা জানে না সে কোথায় গেছে, এ কি-রকম লুকাচুরি ব্যাপার চলিতেছে? আমার কাছে এত কিছুই ভাল ঠেকিতেছে না! বাবা, তুমি এমন নিশ্চিন্ত আছ কি করিয়া?"

অন্নদাবাবু এই ভর্ৎসনায় হঠাৎ অত্যন্ত চিন্তিত হইবার চেষ্টা করিলেন। গম্ভীর মুখ করিয়া কহিলেন, "তাই ত, এ সব কি?"

কাণ্ডজ্ঞানহীন রমেশ অনায়াসে কাল রাত্রে অন্নদাবাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে পারিত। কিন্তু সে কথা তাহার মনে উদয়ও হয় নাই। ঐ যে সে "বিশেষ প্রয়োজন আছে" বলিয়া রাখিয়াছে, তাহার মধ্যেই তাহার সকল কথা বলা হইয়া গেছে, এইরূপ রমেশের ধারণা। ঐ এক কথাতেই আপাতত সকল রকমের ছুটি পাইয়াছে জানিয়া, সে তাহার উপস্থিত কর্ত্তব্যসাধনে বিব্রত হইয়া বেড়াইতেছে।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনী কোথায়?

অন্নদাবাবু। সে আজ সকাল-সকাল চা খাইয়া উপরেই গেছে।

যোগেন্দ্র কহিল—"রমেশের এই সমস্ত অদ্ভুত আচরণে বেচারা বোধ হয় অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া আছে—সেইজন্য সে আমার সঙ্গে দেখা হইবার ভয়ে পালাইয়া রহিয়াছে!"

সঙ্কুচিত ও ব্যথিত হেমনলিনীকে আশ্বাস দিবার জন্য যোগেন্দ্র উপরে গেল। হেমনলিনী তাহাদের বড় ঘরে চৌকির উপরে চুপ করিয়া একা বসিয়া ছিল। যোগেন্দ্রের পদশব্দ

শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িবার ভাণ করিল। যোগেন্দ্র ঘরে আসিতেই বই রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে কহিল—"এই যে, দাদা কখন্ এলে? তোমাকে ত তেমন বিশেষ ভাল দেখাইতেছে না!"

যোগেন্দ্র চৌকিতে বসিয়া-পড়িয়া কহিল, "ভাল দেখাইবার ত কথা নয়! আমি সব কথা শুনিয়াছি হেম! কিন্তু এ সম্বন্ধে তুমি কোন চিন্তা করিয়ো না। আমি ছিলাম না বলিয়াই এই-রকম গোলমাল ঘটিতে পারিয়াছে! আমি সমস্ত ঠিক করিয়া দিব! আচ্ছা হেম, রমেশ তোমাকে কোন কারণ বলে নাই?"

হেমনলিনী মুস্কিলে পড়িল। রমেশসম্বন্ধে এই সকল সন্দিগ্ধ আলোচনা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। রমেশ তাহাকে বিবাহদিন পিছাইবার কোন কারণ বলে নাই, এ কথা যোগেন্দ্রকে বলিতে তাহার ইচ্ছা নাই, অথচ মিথ্যা বলাও তাহার পক্ষে অসম্ভব। হেমনলিনী কহিল, "তিনি আমাকে কারণ বলিতে প্রস্তুত ছিলেন, আমি শোনা দরকার মনে করি নাই।"

যোগেন্দ্র মনে করিল, 'ইহা গুরুতর অভিমানের কথা এবং এরূপ অভিমান সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।' কহিল, "আচ্ছা, তুমি কিছুই ভয় করিয়ো না, 'কারণ' আমি আজই বাহির করিয়া আনিব।"

হেমনলিনী কোলের বইখানার পাতা অনাবশ্যক উল্টাইতে উল্টাইতে কহিল—"দাদা, আমি ভয় কিছুই করি না! 'কারণ' বাহির করিবার জন্য তুমি তাঁহাকে পীড়াপীড়ি কর, এমন্ আমার ইচ্ছা নয়!"

যোগেন্দ্র ভাবিল, 'ইহাও অভিমানের কথা!' কহিল, "আচ্ছা, সে তোমাকে কিছুই ভাবিতে হইবে না!"—বলিয়া তখনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

হেমনলিনী তখনি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া কহিল—"না দাদা, এ কথা লইয়া তুমি তাঁহার সঙ্গে আলোচনা করিতে যাইতে পারিবে না! তোমরা তাঁহাকে যাহাই মনে কর না কেন, আমি তাঁহাকে কিছুমাত্র সন্দেহ করি না!"

তখন যোগেন্দ্রের হঠাৎ মনে হইল, এ ত অভিমানের মত শুনাইতেছে না! তখন স্নেহমিশ্রিত করুণায় তাহার মনে মনে হাসি পাইল। ভাবিল, 'ইহাদের সংসারের জ্ঞান কিছুই নাই। এদিকে পড়াশুনা এত করিয়াছে, পৃথিবীর খোঁজখবরও অনেক রাখে; কিন্তু কোন্‌খানে সন্দেহ করিতে হইবে, সে অভিজ্ঞতাটুকুও ইহার হয় নাই।' এই নিঃসংশয় নির্ভরের সহিত রমেশের ছদ্মব্যবহারের তুলনা করিয়া যোগেন্দ্র মনে মনে রমেশের উপর আরো চটিয়া উঠিল! 'কারণ' বাহির করিবার প্রতিজ্ঞা তাহার মনে আরো দৃঢ় হইল। যোগেন্দ্র দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে হেমনলিনী কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিল—"দাদা, তুমি প্রতিজ্ঞা কর যে, তাঁহার কাছে এসব কথা একেবারে উত্থাপনমাত্র করিবে না!"

যোগেন্দ্র কহিল—"সে দেখা যাইবে!"

হেমনলিনী। না দাদা, দেখা যাইবে না! আমার কাছে কথা দিয়া যাও! আমি তোমাদের নিশ্চয় বলিতেছি, তোমাদের কোন চিন্তার বিষয় নাই! একটিবার আমার এই একটি কথা রাখ!

হেমনলিনীর এইরূপ দৃঢ়তা দেখিয়া যোগেন্দ্র ভাবিল, 'তবে নিশ্চয় রমেশ হেমের কাছে সকল কথা বলিয়াছে! কিন্তু হেমকে যাহা-তাহা বলিয়া ভুলানো ত শক্ত নয়।' কহিল—"দেখ হেম, অবিশ্বাসের কথা হইতেছে না। কন্যাপক্ষের অভিভাবকদের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিতে হইবে ত। তোমার সঙ্গে তার যদি কিছু বোঝাপড়া হইয়া থাকে, সে তোমরাই জান, কিন্তু সেই হইলেই ত যথেষ্ট হইল না—আমাদের সঙ্গেও তাহার বোঝাপড়া করিবার আছে। সত্য কথা বলিতে কি হেম, এখন তোমার চেয়ে আমাদেরি সঙ্গে তাহার বোঝাপড়ার সম্পর্ক বেশি—বিবাহ হইয়া গেলে তখন আমাদের বেশি কথা বলিবার থাকিবে না।"

এই বলিয়া যোগেন্দ্র তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল। ভালবাসা যে আড়াল, যে আবরণ খোঁজে, সে আর রহিল না। হেমনলিনী ও রমেশের যে সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষভাবে ঘনিষ্ঠ হইয়া দুইজনকে কেবল দুইজনেরই করিয়া দিবে; আজ তাহারই উপরে দশজনের সন্দেহের কঠিন স্পর্শ আসিয়া বারংবার আঘাত করিতেছে। চারিদিকের এই সকল আন্দোলনের অভিঘাতে হেমনলিনী এমনি ব্যথিত হইয়া আছে যে, আত্মীয়বন্ধুদের সহিত সাক্ষাৎমাত্রও তাহাকে কুণ্ঠিত করিয়া তুলিতেছে। যোগেন্দ্র চলিয়া গেলে হেমনলিনী চৌকিতে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র বাহিরে যাইতেই অক্ষয় আসিয়া কহিল—"এই যে, যোগেন আসিয়াছ! সব কথা শুনিয়াছ ত? এখন তোমার কি মনে হইতেছে?"

যোগেন্দ্র। মনে ত অনেকরকম হইতেছে, সে সমস্ত অনুমান লইয়া মিথ্যা বাদানুবাদ করিয়া কি হইবে? এখন কি চায়ের টেবিলে বসিয়া মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার সময়?

অক্ষয়। তুমি ত জানই সূক্ষ্ম আলোচনাটা আমার স্বভাব নয়, তা মনস্তত্ত্বই বল, দর্শনই বল, আর কাব্যই বল। আমি কাজের কথাই বুঝি ভাল—তোমার সঙ্গে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

অধীরস্বভাব যোগেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, কাজের কথা হবে। এখন বলিতে পার, রমেশ কোথায় গেছে?"

অক্ষয় কহিল, "পারি।"

যোগেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "কোথায়?"

অক্ষয় কহিল, "এখন সে আমি তোমাকে বলিব না—আজ তিনটার সময় একেবারে তোমাকে রমেশের সঙ্গে দেখা করাইয়া দিব।"

যোগেন্দ্র কহিল—"কাণ্ডখানা কি বল দেখি? তোমরা সবাই যে মূর্ত্তিমান্ হেঁয়ালি হইয়া উঠিলে? আমি এই ক'দিনমাত্র বেড়াইতে গেছি, সেই সুযোগে পৃথিবীটা এমন ভয়ানক রহস্যময় হইয়া উঠিল? না না অক্ষয়, অমন ঢাকাঢাকি করিলে চলিবে না।"

অক্ষয়। শুনিয়া খুসি হইলাম। ঢাকাঢাকি করি নাই বলিয়া আমার পক্ষে একপ্রকার অচল হইয়া উঠিয়াছে—তোমার বোন ত আমার মুখ দেখা বন্ধ করিয়াছেন, তোমার বাবা আমাকে সন্দিগ্ধপ্রকৃতি বলিয়া গালি দেন, আর রমেশবাবুও আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন না। এখন কেবল তুমিই বাকি আছ। তোমাকে

আমি ভয় করি—তুমি সূক্ষ্ম আলোচনার লোক নও, মোটা কাজটাই তোমার সহজে আসে—আমি কাহিল মানুষ, তোমার ঘা আমার সহ্য হইবে না!

যোগেন্দ্র। দেখ অক্ষয়, তোমার ঐ সকল প্যাঁচালো চাল আমার ভাল লাগে না। বেশ বুঝিতেছি, একটা কি খবর তোমার বলিবার আছে, সেটাকে আড়াল করিয়া অমন দর-বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন? সরল-ভাবে বলিয়া ফেল, চুকিয়া যাক্!

অক্ষয়। আচ্ছা বেশ, তাহা হইলে গোড়া হইতেই বলি—তুমি অনেক কথাই জান না।

২০

রমেশ দর্জ্জিপাড়ায় যে বাসায় ছিল, সে বাসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়া যায় নাই, তাহা আর-কাহাকেও ভাড়া দেওয়া সম্বন্ধে রমেশ চিন্তা করিবার অবসর পায় নাই। সে এই কয়েকমাস সংসারের বাহিরে উধাও হইয়া গিয়াছিল, লাভক্ষতিকে বিচারের মধ্যেই আনে নাই।

আজ সে প্রত্যূষে সেই বাসায় গিয়া ঘর-দুয়ার সাফ করাইয়া লইয়াছে, তক্তপোষের উপর বিছানা পাতাইয়াছে এবং আহারাদিরও বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছে। আজ ইস্কুলের ছুটির পর কমলাকে আনিতে হইবে।

সে এখনো দেরি আছে। ইতিমধ্যে রমেশ তক্তপোষের উপর চিৎ হইয়া ভবিষ্যতের কথা ভাবিতে লাগিল। এটোয়া সে কখনো দেখে নাই—কিন্তু পশ্চিমের দৃশ্য কল্পনা করা কঠিন নহে। সহরের প্রান্তে তাহার বাড়ী—তরুশ্রেণীদ্বারা ছায়াখচিত বড় রাস্তা তাহার বাগানের ধার দিয়া চলিয়া গেছে—রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড মাঠ, তাহার মাঝে মাঝে কূপ, মাঝে মাঝে পশুপক্ষী তাড়াইবার জন্য মাচা বাঁধা। ক্ষেত্রসেচনের জন্য গোরু দিয়া জল তোলা হইতেছে, সমস্ত মধ্যাহ্নে তাহার করুণ শব্দ শোনা যায়—রাস্তা দিয়া প্রচুর ধূলা উড়াইয়া মাঝে মাঝে একা-গাড়ি ছুটিয়াছে, তাহার ঝন্‌ঝন্ শব্দে রৌদ্রদগ্ধ আকাশ জাগিয়া উঠিতেছে। এই সুদূর প্রবাসের প্রখর তাপ, উদাস মধ্যাহ্ন ও শূন্য নির্জ্জনতার মধ্যে সে তাহার রুদ্ধদ্বার বাংলা-ঘরে সমস্তদিন হেমনলিনীকে একা কল্পনা করিতে গেলে ক্লেশ অনুভব করিত। তাহার পাশে চিরসখীরূপে কমলাকে দেখিয়া সে আরাম বোধ করিল। কমলার ইতিহাস শুনিলে ও কমলার সুন্দর কিশোর মুখখানি দেখিলে কোমলহৃদয়া হেমনলিনীর সহজেই স্নেহ আকৃষ্ট হইবে, তাহাতে রমেশের কোন সন্দেহ ছিল না। এই মেয়েটিকে মানুষ করা, ইহাকে লেখাপড়া শিখানো, হেমনলিনীর দিনযাপনের একটি প্রধান উপায় হইবে। তাহার পরে রমেশের ঘর যখন শিশুসন্তানের হাসিকান্নায় সরস হইয়া উঠিবে, তখন তাহা-দিগকে মানুষ করিয়া, তাহাদের ভালবাসা পাইয়া, তাহাদের মুখে মাসীসম্ভাষণ শুনিয়া কমলার হৃদয়ের শূন্যতামোচন হইবে, তাহার বুক জুড়াইয়া যাইবে।

রমেশ ঠিক করিয়াছে, এখন সে কমলাকে কিছু বলিবে না। বিবাহের পর হেমনলিনী তাহাকে বুকের উপর টানিয়া-লইয়া সুযোগ বুঝিয়া সকরুণ স্নেহের সহিত ক্রমে ক্রমে তাহাকে তাহার প্রকৃত ইতিহাস জানাইবে,

—যত অল্প বেদনা দিয়া সম্ভব, কমলার জীবনের এই জটিল রহস্যজাল ধীরে ধীরে ছাড়াইয়া দিবে। তাহার পরে সেই দূর বিদেশে, তাহাদের পরিচিত সমাজের বাহিরে, কোনপ্রকার আঘাত না পাইয়া কমলা অতি সহজেই তাঁহাদের সঙ্গে মিশিয়া আপনার হইয়া যাইবে।

তখন দ্বিপ্রহরে গলি নিস্তব্ধ;—যাহারা আপিসে যাইবার, তাহারা আপিসে গেছে, যাহারা না যাইবার, তাহারা দিবানিদ্রার আয়োজন করিতেছে। অনতিতপ্ত আশ্বিনের মধ্যাহ্নটি মধুর হইয়া উঠিয়াছে—আগামী ছুটির উল্লাস এখনি যেন আকাশকে আনন্দের আভাস দিয়া মাথাইয়া রাখিয়াছে। রমেশ তাহার নির্জ্জন বাসায় নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে সুখের ছবি উত্তরোত্তর ফলাও করিয়া আঁকিতে লাগিল।

এমন সময়ে খুব একটা ভারি গাড়ির শব্দ শোনা গেল। সে গাড়ি রমেশের বাসার দ্বারের কাছে আসিয়া থামিল। রমেশ বুঝিল, ইস্কুলের গাড়ি কমলাকে পৌঁছাইয়া দিতে আসিতেছে। তাহার বুকের ভিতরটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। কমলাকে কিরূপ দেখিবে, তাহার সঙ্গে কি ভাবে কথাবার্ত্তা হইবে, কমলাই বা রমেশকে কি ভাবে গ্রহণ করিবে, হঠাৎ এই চিন্তা তাহাকে আন্দোলিত করিয়া তুলিল।

নীচে তাহার দুইজন চাকর ছিল—প্রথমে তাহারা ধরাধরি করিয়া কমলার তোরঙ্গ লইয়া আসিয়া বারান্দায় রাখিল—তাহার পশ্চাতে কমলা ঘরের দ্বারের সম্মুখ পর্য্যন্ত আসিয়া থম্‌কিয়া দাঁড়াইল, ভিতরে প্রবেশ করিল না।

রমেশ কহিল—"কমলা, ঘরে এস।"

কমলা একটা সঙ্কোচের আক্রমণ কাটাইয়া লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছুটির সময়ে রমেশ তাহাকে বিদ্যালয়ে ফেলিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, সে কান্নাকাটি করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, এই ঘটনায় এবং কয়েকমাসের বিচ্ছেদে রমেশের সঙ্গে তাহার যেন একটু মনের ছাড়াছাড়ি হইয়া গেছে। তাই কমলা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া একটুখানি ঘাড় বাঁকাইয়া খোলা দরজার বাহিরে চাহিয়া রহিল।

রমেশ কমলাকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া উঠিল। যেন তাহাকে আর-একবার নূতন করিয়া দেখিল। এই কয়মাসে তাহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। অনতিপল্লবিতা লতার মত সে অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে। পাড়াগেঁয়ে মেয়েটির অপরিস্ফুট সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর স্বাস্থ্যের যে একটি পরিপুষ্টতা ছিল, সে কোথায় গেল? তাহার গোলগাল মুখটি ঝরিয়া লম্বা হইয়া একটি বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার গালদুটি পূর্ব্বের শ্যামাভ চিক্কণতা ত্যাগ করিয়া কোমল পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে, এখন তাহার দুই কালো চোখে কেবল বাহিরের বিশ্বজগতের খেলা প্রতিবিম্বিত নহে, সেখানে তাহার অন্তঃকরণের ছায়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে রমেশ যখন তাহাকে আজকালকার কলিকাতার ছাঁদে সাজাইয়াছিল, তখন বালিকা এবং তাহার সজ্জা যেন আলাদা হইয়া ছিল—আকাশের সঙ্গে জ্যোৎস্না যেমন মিশিয়া যায়, কমলার নূতন ফেশানের কাপড় তাহার গায়ের

সঙ্গে তেমন একাত্ম হইয়া যাইতে পারে নাই—আজ সে তাহার সাজসজ্জাকে অনায়াসে বহন করিয়া তাহাকে অতিক্রম করিয়া সহজে প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছে। সমস্ত আচ্ছাদনের ভিতর দিয়া কমলা যেন নিজেকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতেছে। এখন তাহার গতিবিধি-ভাবভঙ্গীতে কোনপ্রকার জড়তা নাই। আজ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে ঋজুদেহে ঈষৎ বঙ্কিম-মুখে খোলা জানালার সম্মুখে দাঁড়াইল, তাহার মুখের উপরে শরৎ-মধ্যাহ্নের আলো আসিয়া পড়িল, তাহার মাথায় কাপড় নাই, অগ্রভাগে লাল-ফিতার গ্রন্থিবাঁধা বেণীটি পিঠের উপরে পড়িয়াছে, ফিঁকে হল্‌দে রঙের মেরিনোর শাড়ী তাহার স্ফুটনোন্মুখ শরীরকে আঁটিয়া বেষ্টন করিয়াছে—তখন রমেশ কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল।

কমলার সৌন্দর্য্য এই কয়মাসে রমেশের মনে আব্‌ছায়ার মত হইয়া আসিয়াছিল, আজ সেই সৌন্দর্য্য নবতর বিকাশ লাভ করিয়া হঠাৎ তাহাকে চমক লাগাইয়া দিল। সে যেন ইহার জন্য প্রস্তুত ছিল না।

রমেশ কহিল, "কমলা, বোস।"

কমলা একটা চৌকিতে বসিল। রমেশ কহিল, "ইস্কুলে তোমার পড়াশুনা কেমন চলিতেছে?"

কমলা অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল—"বেশ!"

রমেশ ভাবিতে লাগিল, 'এইবার কি বলা যাইবে।' হঠাৎ একটা কথা মনে পড়িয়া গেল—কহিল, "বোধ হয় অনেকক্ষণ খাও নাই। তোমার খাবার তৈরি আছে। এইখানেই আনিতে বলি?"

কমলা কহিল, "খাইব না, আমি খাইয়া আসিয়াছি।"

রমেশ কহিল—"একটু কিছু খাইবে না? মিষ্ট না খাও ত ফল আছে—আতা, আপেল, বেদানা—"

কমলা কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িল। কমলার এই সুদূর নির্লিপ্তভাব রমেশের ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ আগেই রমেশ ভাবিতেছিল, 'স্বামিভ্রম করিয়া কমলার ভালবাসা যদি তাহার প্রতি দৃঢ়বদ্ধ-মূল হইয়া থাকে, তবে কি মুস্কিল হইবে! তাহা হইলে কেমন করিয়া তাহাকে কাছে রাখা চলিবে? কিন্তু তাই বলিয়া একেবারে উদাসীন অনাত্মীয়তা—সেও কি ভাল? কমলাকে যখন চিরদিন রমেশের উপরেই নির্ভর করিতে হইবে, তখন পরস্পরের মধ্যে একটা স্নেহের সম্বন্ধ থাকা ত চাই।'

আসল কথা, যাহার মুখখানি এমন সুন্দর, যাহার বড়-বড় দুটি চোখের মধ্যে এমন সরলতা, যাহার ভাবখানি দেখিলে এটুকু স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভালবাসিবার শক্তি তাহার অপরিণত হৃদয়কোরকের মধ্যে উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষায় উন্মুখ হইয়া আছে, একেবারে পথের পথিকের মত তাহার হৃদয়-সীমানার সম্পূর্ণ বাহিরে পড়িয়া থাকিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক নহে। এই সুন্দরী মেয়েটি জীবনের সুখসান্ত্বনার জন্য স্নিগ্ধ আত্মীয়তার সহিত রমেশের প্রতি নির্ভর করিবে, এই প্রত্যাশাটুকু রমেশ ছাড়িতে পারিল না। কমলার মধ্যে এখন রমেশের প্রেমের চরম সার্থকতা নাই—সে রমেশের জীবনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় নহে। কিন্তু যাহার

প্রয়োজন নাই, তাহারো মূল্য আছে—হীরা-মুক্তার আবশ্যকতা অল্প, কিন্তু তাহার মূল্য অল্প নহে, তাহা হাতে পাইয়া ফেলিয়া দিতে ইচ্ছা করে না। রমেশকে এই মুহূর্ত্তে যদি তাহার অদৃষ্ট আসিয়া বলে, "বাপু, কমলাকে লইয়া তুমি বড়ই মুস্কিলে পড়িয়াছ, এক কাজ করা যাক্, ইহাকে তোমার সংসার হইতে একেবারে সুদূরে সরাইয়া দিয়া তোমাকে জটিল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করি!" তবে রমেশ বোধ হয় এই উত্তর করে—"জটিলতাটা কাটিয়া যাওয়া নিতান্তই দরকার, কিন্তু কোন উপায়ে কমলা যদি থাকিয়া যায় ত থাক্ না! ও বেচারা মৃত্যুর মুখ হইতে ভাসিয়া আমার কাছে আসিয়া ঠেকিয়াছে—আমি উহাকে প্রাণ দিয়াছি, এ সংসারে আমার কাছে ও কি আশ্রয় পাইবে না?"

রমেশ জানিত, কমলার অদৃষ্টে নারীজীবনের প্রধান সুখটা নাই—কিন্তু শিক্ষার দ্বারা, স্নেহের দ্বারা ইহার হৃদয়মনকে বিকশিত করিয়া তুলিবার ভার আজ কাহার উপরে পড়িয়াছে? ঘটনাগুলি এম্‌নি করিয়া ঘটিয়াছে যে, সেই কর্ত্তব্য একমাত্র রমেশেরই। নিজের সুখের জন্য, সুবিধার জন্য এই কর্ত্তব্য রমেশ ফেলিয়া দিতে পারে না।

রমেশ আর-একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। কমলা তখন ঈষৎ মুখ নত করিয়া তাহার ইংরাজিশিক্ষার বহি হইতে ছবি দেখিতেছিল। সুন্দর মুখ সোনার কাঠির মত নিজের চারিদিকের সুপ্ত সৌন্দর্য্যকে জাগাইয়া তোলে। শরতের আলোক হঠাৎ যেন প্রাণ পাইল, আশ্বিনের দিন যেন আকার ধারণ করিল—একটি তরুণ সুকুমার লাবণ্যে চারিদিকের আকাশ যেন ঢল্‌ঢল্ করিতে লাগিল। কেন্দ্র যেমন তাহার পরিধিকে নিয়মিত করে—তেম্‌নি এই মেয়েটি আকাশকে, বাতাসকে, আলোককে আপনার চারিদিকে যেন বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়া আনিল—যে সুরগুলি বিচ্ছিন্ন, তাহাতে যেন একটি বিশেষ রাগিণী সঞ্চার করিল—যে কথাগুলি বিক্ষিপ্ত, তাহাকে যেন বিশেষ অর্থে ও ছন্দে সুপরিণত করিয়া তুলিল। অথচ সে নিজে ইহার কিছুই না জানিয়া চুপ করিয়া বসিয়া তাহার পড়িবার বইয়ের ছবি দেখিতেছিল।

রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "হেমনলিনীকে লইয়া রমেশ যে সংসার পাতিয়া বসিবে, কমলার এই কিশোর-কোমল কান্তি তাহার উপরে একটি বৈচিত্র্যপাত করিবে। এই সৌন্দর্য্যের প্রতিমা, এই স্নেহের পুতলী, রমেশ ও হেমনলিনীর ভালবাসার মাঝখানে আরো একটি বিশেষ রসসঞ্চার করিয়া দিবে—ইহার মাধুর্য্য তাহাদের প্রেমের মাধুরীর মধ্যে আরো একটি রঙীন রশ্মি বিকীর্ণ করিবে। তাহাদের প্রেমের উপরে চন্দ্র যেমন বিশেষভাবে আলো দিবে, বসন্তের ফুল যেমন বিশেষভাবে গন্ধ মিলাইবে, এই মেয়েটিও তেম্‌নি ইহার বিকচোন্মুখ নবীন জীবনের নব নব বিকাশবৈচিত্র্য তাহাদের প্রেমের সহিত মিশ্রিত করিতে থাকিবে।

এইরূপে রমেশ একবার কমলার নিজের দিক্ হইতে, একবার আপনাদের সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসার দিক্ হইতে কমলাকে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিজেদের আত্মীয় করিয়া দেখিল।

তাহার হৃদয় বিস্ফারিত হইল, তাহার মন হইতে সমস্ত সঙ্কট যেন কাটিয়া গেল।

রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া একটা থালায় কতক গুলি আপেল, নাস্‌পাতি, বেদানা লইয়া উপস্থিত করিল। কহিল, "কমলা, তুমি ত খাবে না দেখিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষুধা পাইয়াছে, আমি ত আর সবুর করিতে পারি না।"

শুনিয়া কমলা একটুখানি হাসিল। এই অকস্মাৎ হাসির আলোকে উভয়ের ভিতর-কার কুয়াশা যেন অনেকখানি কাটিয়া গেল।

রমেশ ছুরি লইয়া আপেল কাটিতে লাগিল। কিন্তু কোনপ্রকার হাতের কাজে রমেশের কিছুমাত্র দক্ষতা নাই। তাহার একদিকে ক্ষুধার আগ্রহ, অন্যদিকে এলো-মেলো কাটিবার ভঙ্গী দেখিয়া বালিকার ভারি হাসি পাইল—সে খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমেশ এই হাস্যোচ্ছ্বাসে খুসি হইয়া কহিল, "আমি বুঝি ভাল কাটিতে পারি না, তাই হাসিতেছ! আচ্ছা, তুমি কাটিয়া দাও দেখি, তোমার কিরূপ বিদ্যা!"

কমলা কহিল, "বঁটি হইলে আমি কাটিয়া দিতে পারি, ছুরিতে পারি না।"

রমেশ কহিল, "তুমি মনে করিতেছ, বঁটি এখানে নাই ?"—চাকরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বঁটি আছে ?" সে কহিল, "আছে—রাত্রের আহারের জন্য সমস্ত আনা হইয়াছে।"

রমেশ কহিল, "ভাল করিয়া ধুইয়া একটা বঁটি লইয়া আয়।"

চাকর বঁটি লইয়া আসিল।

কমলা জুতা খুলিয়া বঁটি পাতিয়া নীচে বসিল এবং হাসিমুখে নিপুণহস্তে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ফলের খোসা ছাড়াইয়া চাক্‌লা-চাক্‌লা করিয়া কাটিতে লাগিল। রমেশ তাহার সম্মুখে মাটিতে বসিয়া ফলের খণ্ড-গুলি থালায় ধরিয়া লইল।

রমেশ কহিল, "তোমাকেও খাইতে হইবে।"

কমলা কহিল—"না।"

রমেশ কহিল—"তবে আমিও খাইব না।"

কমলা রমেশের মুখের উপরে দুই চোখ তুলিয়া কহিল—"আচ্ছা, তুমি আগে খাও, তার পরে আমি খাইব।"

রমেশ কহিল—"দেখিয়ো, শেষকালে ফাঁকি দিয়ো না!"

কমলা গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"না, সত্যি বলিতেছি, ফাঁকি দিব না!"

বালিকার এই সত্যপ্রতিজ্ঞায় আশ্বস্ত হইয়া রমেশ থালা হইতে একটুক্‌রা ফল লইয়া মুখে পুরিয়া দিল।

হঠাৎ তাহার চিবানো বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ দেখিল, তাহার সম্মুখেই দ্বারের বাহিরে যোগেন্দ্র এবং অক্ষয় আসিয়া উপস্থিত।

অক্ষয় কহিল, "রমেশবাবু, মাপ করিবেন—আমি ভাবিয়াছিলাম, আপনি এখানে বুঝি একলাই আছেন। যোগেন্, খবর না দিয়া হঠাৎ এমন করিয়া আসিয়া পড়াটা ভাল হয় নাই। চল, আমরা নীচে বসি গিয়া।"

বঁটি ফেলিয়া কমলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। ঘর হইতে পালাইবার পথেই দুজনে

দাঁড়াইয়া ছিল। যোগেন্দ্র একটুখানি সরিয়া পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু কমলার মুখের উপর হইতে চোখ ফিরাইল না—তাহাকে তীব্র-দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিয়া লইল। কমলা সঙ্কুচিত হইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ক্রমশ।

দৃষ্টিতত্ত্ব।

কৃত্রিম চক্ষু।

আধুনিক শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণকে দৃষ্টি-জ্ঞান-উৎপত্তির কারণ জিজ্ঞাসা কর, তাঁহারা বলিবেন,—চক্ষুর পশ্চাদ্বর্ত্তী কৃষ্ণপর্দ্দায় (Retina) বাহিরের আলোক পড়িয়া উত্তেজনা উপস্থিত করিলে, সেই উত্তেজনা ও মস্তিষ্কের যোগে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়। কিন্তু সেই উত্তেজনাটা যে কি, এবং অতি সূক্ষ্ম অতীন্দ্রিয় ঈথরতরঙ্গই বা অক্ষি-পর্দ্দায় আঘাত দিবামাত্র যে কিপ্রকারে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন করে, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে।

একদল বৈজ্ঞানিকের মতে, অক্ষিপর্দ্দায় লিপ্ত পদার্থবিশেষের রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দৃষ্টিজ্ঞানের মূলকারণ। বাহিরের আলোক অক্ষিছিদ্রের (Pupil) মধ্য দিয়া পর্দ্দালিপ্ত পদার্থে পড়িয়া সেই রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সাধন করে। ইঁহারা আরো বলেন,—এই পরিবর্ত্তন ঠিক সাধারণ রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের অনুরূপ নয়, আলোকদ্বারা পর্দ্দালিপ্ত পদার্থ অবস্থাবিশেষে কখন ধ্বংস এবং কখনও বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ক্ষয় এবং বৃদ্ধি (Katabolic and Anabolic chanages) দ্বারা দৃষ্টিজ্ঞান সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের আলোকদ্বারা আমরা স্পৃষ্টপদার্থে যে নানাবর্ণের বিকাশ দেখিতে পাই, ইঁহাদের মতে উক্ত দুইপ্রকার রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের (Metabolic changes) মিশ্রণই তাহার মূল কারণ।

প্রাকৃতিক কার্য্যসকল বাহির হইতে দেখিলে খুব জটিল ও অনিয়ন্ত্রিত বলিয়া বোধ হয় সত্য, কিন্তু একবার রহস্যাবরণ উন্মোচিত হইলে তাহাদের প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি ব্যাপারেও সুব্যবস্থা ও সরল-নিয়ম ধরা পড়িয়া যায়। দৃষ্টিজ্ঞান-উৎপাদনের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় নানা জটিলতা থাকায়, সেটা কতকটা অস্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং এইজন্য আজকাল অনেকেই সেটিকে প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন। আলোকপাতমাত্র অক্ষিপর্দ্দা-লিপ্ত পদার্থের ক্ষয় ও নিমেষমধ্যে সেই ক্ষয়ের

পূরণ এবং তার পর আবার সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপাদন, এ সকলই আমাদেরও নিকট অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এপ্রকার ত্বরিত রাসায়নিক কার্য্যের উদাহরণও জড়-বিজ্ঞানে দুর্লভ বটে। যা হউক, দৃষ্টিজ্ঞানোৎ-পত্তির রাসায়নিক ব্যাখ্যার এই সকল গলদ্ দেখিয়া, একদল আধুনিক পণ্ডিত তাহার আর-এক মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। ইঁহাদের মতে দৃষ্টিজ্ঞানের মূলকারণ বিদ্যুৎ। আলোকপাতমাত্র কৃষ্ণপদার্থলিপ্ত অক্ষি-পর্দ্দায় তড়িৎ উৎপন্ন হয়, এবং তার পর সেই তড়িৎ-তরঙ্গ অক্ষিস্নায়ু (Optic nerve) দ্বারা প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কে নীত হইলে দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়। অক্ষিস্নায়ুর কার্য্য কতকটা টেলিগ্রাফের তারের কার্য্যের অনুরূপ এবং প্রাণিমস্তিষ্কটা যেন টেলিগ্রাফের সঙ্কেতগ্রহণযন্ত্র,—অতি মৃদু তরঙ্গও ইহাতে আসিয়া প্রবল সাড়ার উৎপাদক হয়।

উল্লিখিত নূতন মতবাদ প্রচারের পর এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। কি কারণে আলোকপাতে তড়িৎ উৎপন্ন হয় এবং চক্ষুপ্রবিষ্ট আলোকের প্রকারভেদেই বা কোন্ প্রক্রিয়ায় বর্ণ-বৈচিত্র্যের বিকাশ হয়, এই সকল তথ্যের সহজ মীমাংসা এই মতবাদে পাওয়া যায় নাই। ভারতের সুসন্তান বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ চন্দ্র বসু মহাশয় বহু গবেষণাদ্বারা সম্প্রতি দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় বৈদ্যুতিক মতবাদের পোষক অনেকগুলি প্রত্যক্ষযুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। অধ্যাপক বসুমহাশয়ের এই সকল আবিষ্কারদ্বারা শিশু মতবাদটির ভিত্তি সুদৃঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছে. এবং অপর বৈজ্ঞা-নিকগণ দৃষ্টিব্যাপারের যে সকল জটিল ঘটনার কোন কারণই এপর্য্যন্ত উল্লেখ করিতে পারেন নাই, বসুমহাশয়ের গবেষণায় তাহা-দেরও উৎপত্তিতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়া পড়িয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসু-মহাশয়ের দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় আবিষ্কারের কিঞ্চিৎ আভাস দিব।

হোম্‌গ্রেন (Holmgren), কুনে (Kuhne), ডিওয়ার (Dewar) এবং ষ্টেনার (Steiner) প্রমুখ প্রাচীন ও আধুনিক অনেক পণ্ডিত দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধে নানা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। আলোকপাতজনিত বিদ্যুৎ-প্রবাহে যে দৃষ্টিজ্ঞানের উৎপত্তি করে, ভেকের চক্ষে আলোকপাত করিয়া ইঁহারাই তাহা প্রথমে দেখিতে পান। অধ্যাপক বসু-মহাশয়ও পূর্ব্ব বৈজ্ঞানিকগণের ন্যায় প্রাণি-চক্ষে আলোকপাত করিয়া বিদ্যুৎলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং হঠাৎ আলোক-পাতরোধ ও আলোকের প্রাখর্য্যপরিবর্ত্তন করিলে, প্রবাহের কিপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়, তাহাও লিপিবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। এই পরীক্ষাকালে বসুমহাশয়ের মনে হইয়াছিল, যদি প্রকৃতই আলোকদ্বারা প্রাণিচক্ষে বিদ্যু-তের উৎপত্তি সম্ভবপর, তবে সুকৌশলে চক্ষুর অনুরূপ একটা যন্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আলোকপাত করিলে নিশ্চয়ই বিদ্যুতের উৎপত্তি হইবে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া একটি নাতিস্থূল রৌপ্যদণ্ডের একপ্রান্ত পিটাইয়া বসুমহাশয় সেটাকে অক্ষিকোষের আকার প্রদান করিয়াছিলেন। এবং তার সেই অক্ষিপুটে ব্রোমিনের (Bromine) প্রলেপদ্বারা কৃত্রিম অক্ষিপর্দ্দা রচনা করিয়া

তাহাতে আলোকপাত করিয়া দেখিয়াছিলেন,—প্রাণিচক্ষুতে আলোকপাত হইলে, যেমন অক্ষিপর্দ্দা ও অক্ষিস্নায়ুর মধ্য দিয়া একটা বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিচলন করে, কৃত্রিম চক্ষুতেও অক্ষিপুট ও সেই রৌপ্যদণ্ডের মুক্তপ্রান্ত-সংলগ্ন তারের মধ্য দিয়াও তদ্রূপ তড়িৎপ্রবাহ দেখা যায়।

পূর্ব্ববর্ণিত সহজ ও অতিসূক্ষ্ম যন্ত্রটি অধ্যাপক বসুমহাশয়ের দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় আবিষ্কারের প্রধান অবলম্বন। প্রাণিচক্ষু ও উক্ত কৃত্রিম চক্ষুর উপর আলোকের কার্য্য যখন অবিকল এক, সে স্থলে প্রথমে কেবল কৃত্রিম চক্ষুর উপরে আলোকের নানা খুঁটি-নাটি কার্য্য পরীক্ষা করিলে, দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় অনেক সমস্তার মীমাংসা হইবে বলিয়া ইঁহার মনে হইয়াছিল। এই প্রথায় পরীক্ষা করিয়া এবং পরীক্ষালব্ধ ফল প্রাণিচক্ষুর উপর আলোকের নানা কার্য্যের সহিত তুলনা করিয়া, অধ্যাপকমহাশয় অত্যাশ্চর্য্য ফললাভ করিয়াছেন। এত অনায়াসে এবং এপ্রকার সহজ যন্ত্রের সাহায্যে দৃষ্টিতত্ত্বের নানা জটিল রহস্তের উদ্ভেদ দেখিয়া আজ সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাণি চক্ষেপতিত আলোক ও পূর্ব্ববর্ণিত কৃত্রিম চক্ষে পাতিত আলোক দ্বারা যে সকল বৈদ্যুতিক লক্ষণের বিকাশ হয়, অধ্যাপক বসুমহাশয় তাহাদের ঐক্য কিপ্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। প্রাণিচক্ষে একই প্রকারের আলোকরশ্মি পুনঃপুন নিয়মিতভাবে আঘাত করিলে, প্রতি আঘাতেই তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া অল্লক্ষণের মধ্যে লয়প্রাপ্ত হয়। আচার্য্য বসু-মহাশয় এইপ্রকার নিয়মিত আলোকতাড়ন-জাত প্রাণিচক্ষুর সাড়ালিপি অঙ্কিত করিয়া, এবং ঠিক সেই অবস্থায় কৃত্রিম চক্ষুর বৈদ্যুতিক প্রবাহপরিবর্ত্তন পরীক্ষা করিয়া, অবিকল একই সাড়ালিপি পাইয়াছেন।

নিম্নস্থ চিত্রগুলি দেখিলে পাঠক বক্তব্যটা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ১ম চিত্রটি প্রাণিচক্ষুর উপর পতিত আলোকোৎ-

১ম চিত্র।
জীবচক্ষুর সাড়ালিপি।
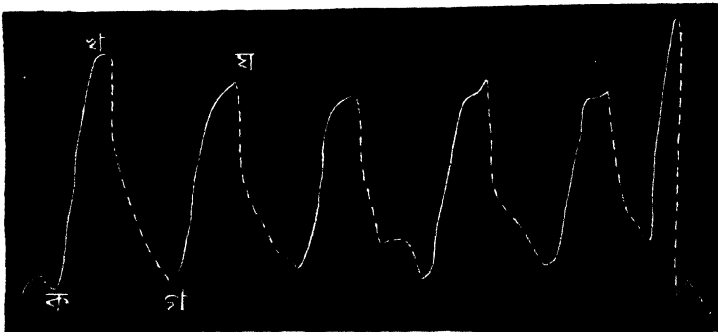
পন্ন সাড়ার ছবি। ছয়বার নিয়মিতভাবে আলোকপাত হওয়াতে, প্রতিবারে কি-প্রকারে বিদ্যুৎতরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় হইয়াছিল, তাহা চিত্রের ছয়টি তরঙ্গরেখা-

দ্বারা পাঠক দেখিতে পাইবেন। এই শ্রেণীর চিত্রে কখ, গঘ ইত্যাদি স্থূল রেখাগুলির দৈর্ঘ্য ও ভূমির সহিত তাহাদের অবনতি তুলনা করিলে, প্রত্যেক আলোকপাতে, কত সময়ে, কি পরিমাণ, তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা বুঝা যাইবে। চিত্রে কখ-রেখা গঘ অপেক্ষা দীর্ঘতর। ইহা হইতে বুঝিতে হইবে, প্রথম আলোকপাতে যে তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছিল, দ্বিতীয় আলোকপাতে তদপেক্ষা অল্প তড়িৎ উৎপন্ন হইয়াছে। গঘ-রেখা যদি কখ অপেক্ষাও লম্বভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কগ-ভূমিরেখার সহিত বৃহত্তর কোণ উৎপন্ন করিত, তাহা হইলে পাঠক বুঝিবেন, দ্বিতীয় আলোকপাতজাত প্রবাহ, প্রথম প্রবাহটি অপেক্ষা দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ণতাপ্রাপ্তির পর, প্রবাহ কিপ্রকারে ক্রমে লয় পাইয়া চক্ষুকে প্রকৃতিস্থ করে, নিম্নগামী সূক্ষ্ম রেখাগুলিদ্বারা তাহা বুঝিতে হইবে। যে রেখা যত হেলিয়া ভূমির সহিত সংযুক্ত হইবে, তাহার উৎপাদক তড়িৎপ্রবাহ তত অধিক সময়ে লয় পাইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

২য় চিত্রটি সেই রৌপ্যনির্ম্মিত কৃত্রিম-চক্ষে পাতিত আলোক হইতে উৎপন্ন বিদ্যুতের

২য় চিত্র।

কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালিপি।
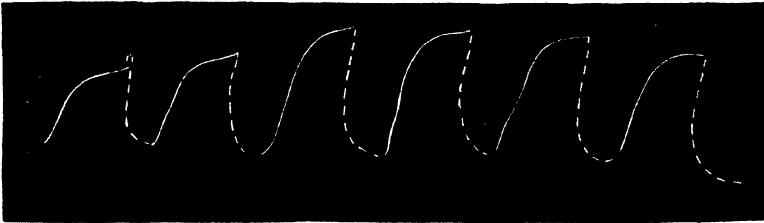
সাড়ালিপি। পাঠক উভয় চিত্রের অদ্ভুত ঐক্য দেখুন।

আলোকপাতের কাল ও তদুৎপন্ন বিদ্যুৎ-প্রবাহের মধ্যে একটা অতি নিকট সম্বন্ধ আছে। প্রাণিচক্ষুতে একই আলোক যথাক্রমে ১, ২, ৩ ইত্যাদি সেকেণ্ড ধরিয়া পাতিত কর, এই সকল আলোকতাড়নায় সমান সাড়া দেখিতে পাইবে না। কালবৃদ্ধির সহিত সাড়া প্রথমে বৃদ্ধি পাইয়া এমন একটি সীমায় উপস্থিত হইবে যে, তখন সময় বাড়াইলেও সাড়া অপরিবর্ত্তনীয় থাকিয়া যাইবে। ইহার পরও কালবৃদ্ধি করিতে থাকিলে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা মৃদু সাড়া দিতে থাকিবে। কৃত্রিম চক্ষুর সাড়ালিপিতে কাল ও সাড়ার পূর্ব্বোক্ত সম্বন্ধ অবিকল ধরা পড়িয়াছে। ৩য় ও ৪র্থ চিত্র দুইটি প্রাণী ও কৃত্রিমচক্ষুর পূর্ব্ববর্ণিত সাড়ার ছবি। চিত্রের নিম্নস্থ সংখ্যাগুলি দ্বারা আলোকপাতের কাল এবং তাহাদের প্রত্যেকের উপরকার তরঙ্গরেখাদ্বারা তত্তৎকালের সাড়া-পরিমাণ সূচিত হইতেছে। কালসহকারে সাড়ার পরিবর্ত্তন যে প্রাণী ও কৃত্রিম

চক্ষুতে অবিকল এক, তাহা পাঠক চিত্রদ্বয়ে একবার দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবেন। আলোকপাতকাল আটসেকেণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশসেকেণ্ড পর্য্যন্ত

৩য় চিত্র।

প্রাণিচক্ষের সাড়া।

৪র্থ চিত্র।

কৃত্রিম চক্ষের সাড়া।
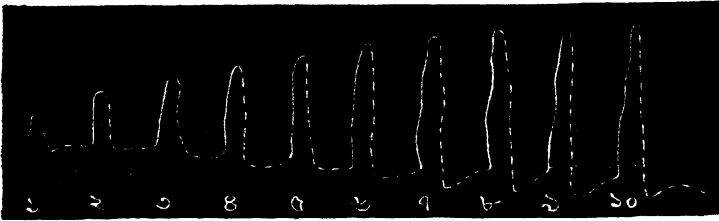
স্থায়ী করিলেও, উভয়ের সাড়া যে আর বৃদ্ধি পায় না, পাঠক তাহাও চিত্রদ্বয় তুলনা করিলে বুঝিবেন।

সুদীর্ঘকাল অবিচ্ছিন্ন আলোকপাতদ্বারা প্রাণিচক্ষুর সাড়া চরমসীমায় উপনীত হইলে পর যদি আলোকপাত হঠাৎ রহিত করা যায়, তাহা হইলে আর-একপ্রকার বৈদ্যুতিক লক্ষণ দেখা গিয়া থাকে। অধ্যাপক বসুমহাশয় ইহাকে after oscillation বা পরান্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ৪র্থ চিত্রের শেষ অংশে দীর্ঘকাল আলোকপাতজনিত যে তরঙ্গরেখাগুলি আছে, পাঠক তাহার মূলদেশ পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবেন,—ইহার কতকগুলিতে নিম্নগামী সূক্ষ্মরেখা চক্ষুর স্বাভাবিক অবস্থাজ্ঞাপক সেই ভূমিরেখাকে অতিক্রম করিয়া ক্রমে আবার ভূমিরেখার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহাই পুনরান্দোলনের সূচক। অধ্যাপক বসুমহাশয় বলেন,—বহুক্ষণ আলোকে উন্মুক্ত থাকায় চক্ষুর অণুসকল যখন বিকৃত হইয়া পড়ে, সেই সময় হঠাৎ আলোকপাত রোধ করিলে প্রত্যেক অণুরই প্রকৃতিস্থ হইবার জন্য একটা চেষ্টা হয় এবং এই চেষ্টার আধিক্যেই তাহারা স্বাভাবিক অবস্থার সীমা অতিক্রম করিয়া সাড়ালিপিতে তাহার লক্ষণ অঙ্কিত করে। প্রকৃত এবং কৃত্রিম চক্ষুতে বসুমহাশয় অবিকল পূর্ব্বোক্ত পুনরান্দোলন আবিষ্কার করিয়াছেন। আণবিক-বিকৃতি-

জাত এই অনিয়মিত সাড়ার ফলে, প্রাণীর যে দৃষ্টিবিভ্রম হয়, তাহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।

প্রাণী মরণোন্মুখ বা মৃত হইলে তাহাদের চক্ষুর অণুসকল বিকৃত হইয়া পড়ে, কাজেই গলিতচক্ষে আলোকপাত করিলে যে বৈদ্যুতিক লক্ষণ বিকাশ পায়, তাহা সুস্থচক্ষুর সাড়ার সহিত মিলে না। অধ্যাপক বসুমহাশয় সুকৌশলে কৃত্রিমচক্ষুর আণবিক বিকার উপস্থিত করাইয়া, ঠিক গলিতচক্ষুর সাড়ালিপির অনুরূপ রেখাচিত্র পাইয়াছেন।

প্রাণিচক্ষে আলোকপাত করিয়া হঠাৎ সেই আলোক রোধ করিলে, কখন-কখন সেই পূর্ব্বের আলোকজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহ যথানিয়মে হ্রাস না হইয়া ক্ষণিককালের জন্য প্রবলতর হইয়া পড়ে। কুনে (Kuhne) এই ব্যাপারের সহিত পরিচিত ছিলেন। প্রথম চিত্রের ৪র্থ এবং ৫ম সাড়ালিপিতে ইহা দেখা যায়। অধ্যাপক বসুমহাশয় তদবস্থ কৃত্রিমচক্ষে বৈদ্যুতিক সাড়ার উক্ত উচ্ছৃঙ্খলতাও আবিষ্কার করিয়াছেন। ২য় চিত্রের প্রথম সাড়ালিপিতে ইহা প্রদর্শিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত শৈত্যতাপাদিভেদে এবং আলোকের প্রাখর্য্য অনুসারে চক্ষে যে পরিবর্ত্তন হয়, কৃত্রিমচক্ষে অবিকল তাহাই প্রত্যক্ষ দেখা গিয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রাণিচক্ষু ও কৃত্রিমচক্ষুর উপর আলোকের কার্য্য অবিকল এক, এবং অতি খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এই একতার ভঙ্গ দেখা যায় না। উভয় চক্ষুর এই ঐক্য অবলম্বন করিয়া অধ্যাপক বসুমহাশয় কিপ্রকারে নানা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপত্তিতত্ত্ব স্থির করিয়াছেন, পরপ্রবন্ধে আমরা তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

সাহিত্যের সামগ্রী।

একেবারে খাঁটিভাবে নিজের আনন্দের জন্যই লেখা সাহিত্য নহে। অনেকে কবিত্ব করিয়া বলেন যে, পাখী যেমন নিজের উল্লাসেই গান করে, লেখকের রচনার উচ্ছ্বাসও সেইরূপ আত্মগত—পাঠকেরা যেন তাহা আড়ি পাতিয়া শুনিয়া থাকেন।

পাখীর গানের মধ্যে পক্ষিসমাজের প্রতি যে কোনো লক্ষ্য নাই, এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি না। না থাকে ত না-ই রহিল, তাহা লইয়া তর্ক করা বৃথা—কিন্তু লেখকের রচনার প্রধান লক্ষ্য পাঠকসমাজ।

তা বলিয়াই যে সেটাকে কৃত্রিম বলিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। মাতার স্তন্য একমাত্র সন্তানের জন্য, তাই বলিয়াই তাহাকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত বলিবার কোন বাধা দেখি না।

নীরব কবিত্ব এবং আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাস, সাহিত্যে এই দুটো বাজে কথা কোন কোন মহলে চলিত আছে। যে কাঠ জ্বলে নাই,

তাহাকে আগুন নাম দেওয়াও যেমন, যে মানুষ আকাশের দিকে তাকাইয়া আকাশেরই মত নীরব হইয়া থাকে, তাহাকেও কবি বলা সেইরূপ। প্রকাশই কবিত্ব, মনের তলার মধ্যে কি আছে বা না আছে, তাহা আলোচনা করিয়া বাহিরের লোকের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কথায় বলে 'মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ'—ভাণ্ডারে কি জমা আছে, তাহা আন্দাজে হিসাব করিয়া বাহিরের লোকের কোন সুখ নাই, তাহাদের পক্ষে মিষ্টান্নটা হাতে-হাতে পাওয়া আবশ্যক।

সাহিত্যে আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসও সেইরকমের একটা কথা। রচনা রচয়িতার নিজের জন্য নহে, ইহাই ধরিয়া লইতে হইবে—এবং সেইটে ধরিয়া লইয়াই বিচার করিতে হইবে।

আমাদের মনের ভাবের একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই এই, সে নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করিতে চায়। প্রকৃতিতে আমরা দেখি, ব্যাপ্ত হইবার জন্য, টিঁকিয়া থাকিবার জন্য, প্রাণীদের মধ্যে সর্ব্বদা একটা চেষ্টা চলিতেছে। যে জীব সন্তানের দ্বারা আপনাকে যত বহুগুণিত করিয়া যত বেশি জায়গা জুড়িতে পারে, তাহার জীবনের অধিকার তত বেশি বাড়িয়া যায়, নিজের অস্তিত্বকে সে যেন তত অধিক সত্য করিয়া তোলে।

মানুষের মনোভাবের মধ্যেও সেইরকমের একটা চেষ্টা আছে। তফাতের মধ্যে এই যে, প্রাণের অধিকার দেশে ও কালে, মনোভাবের অধিকার মনে এবং কালে। মনোভাবের চেষ্টা বহুকাল ধরিয়া বহুমনকে আয়ত্ত করা।

এই একান্ত আকাঙ্ক্ষায় কত প্রাচীন কাল ধরিয়া কত ইঙ্গিত, কত ভাষা, কত লিপি, কত পাথরে খোদাই, ধাতুতে ঢালাই, চামড়ায় বাঁধাই, কত গাছের ছালে, পাতায়, কাগজে, কত তুলিতে, খোন্তায়, কলমে, কত আঁকজোক, কত প্রয়াস—বাঁ দিক্ হইতে ডাহিনে, ডাহিন দিক্ হইতে বাঁয়ে, উপর হইতে নীচে, এক সার হইতে অন্য সারে! কি? না, আমি যাহা চিন্তা করিয়াছি, আমি যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহা মরিবে না, তাহা মন হইতে মনে, কাল হইতে কালে চিন্তিত হইয়া, অনুভূত হইয়া, প্রবাহিত হইয়া চলিবে! আমার বাড়ীঘর, আমার আস্‌বাব্‌পত্র, আমার শরীরমন, আমার সুখদুঃখের সামগ্রী, সমস্তই যাইবে—কেবল আমি যাহা ভাবিয়াছি, যাহা বোধ করিয়াছি, তাহা চিরদিন মানুষের ভাবনা, মানুষের বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া সজীব সংসারের মাঝখানে বাঁচিয়া থাকিবে।

মধ্য এসিয়ায় গোবি-মরুভূমির বালুকাস্তূপের মধ্য হইতে যখন বিলুপ্ত মানবসমাজের বিস্মৃত প্রাচীনকালের জীর্ণ পুঁথি বাহির হইয়া পড়ে, তখন তাহার সেই অজানা ভাষার অপরিচিত অক্ষরগুলির মধ্যে কি-একটি বেদনা প্রকাশ পায়! কোন্ কালের কোন্ সজীব চিত্তের চেষ্টা আজ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশলাভের জন্য আঁকুপাকু করিতেছে। যে লিখিয়াছিল, সে নাই, যে লোকালয়ে লেখা হইয়াছিল, তাহাও নাই—

কিন্তু মানুষের মনের ভাবটুকু মানুষের মনের সুখদুঃখের মধ্যে লালিত হইবার জন্য যুগ হইতে যুগান্তরে আসিয়া আপনার পরিচয় দিতে পারিতেছে না—দুই বাহু বাড়াইয়া মুখের দিকে চাহিতেছে।

জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ অশোক আপনার যে কথাগুলিকে চিরকালের শ্রুতি-গোচর করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তিনি পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া দিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, পাহাড় কোনোকালে মরিবে না, সরিবে না—অনন্তকালের পথের ধারে অচল হইয়া দাঁড়াইয়া নব নব যুগের পথিক-দের কাছে এক কথা চিরদিন ধরিয়া আবৃত্তি করিতে থাকিবে। পাহাড়কে তিনি কথা কহিবার ভার দিয়াছিলেন।

পাহাড় কালাকালের কোন বিচার না করিয়া তাঁহার ভাষা বহন করিয়া আসিয়াছে। কোথায় অশোক, কোথায় পাটলিপুত্র, কোথায় ধর্ম্মজাগ্রত ভারতবর্ষের সেই গৌরবের দিন! কিন্তু পাহাড় সেদিনকার সেই কথা-কয়টি বিস্মৃত অক্ষরে অপ্রচলিত ভাষায় আজও উচ্চারণ করিতেছে! কতদিন অরণ্যে রোদন করিয়াছে,—অশোকের সেই মহাবাণীও কত-শত-বৎসর মানবহৃদয়কে বোবার মত কেবল ইশারায় আহ্বান করিয়াছে। পথ দিয়া রাজপুত গেল, পাঠান গেল, মোগল গেল, বর্গির তরবারি বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্রবেগে দিগ্‌দিগন্তে প্রলয়ের কষাঘাত করিয়া গেল—কেহ তাহার ইশারায় সাড়া দিল না। সমুদ্রপারের যে ক্ষুদ্রদ্বীপের কথা অশোক কখনো কল্পনাও করেন নাই—তাঁহার শিল্পীরা পাষাণফলকে যখন তাঁহার অনুশাসন উৎকীর্ণ করিতে-ছিল, তখন যে দ্বীপের অরণ্যচারী "দ্রুয়িদ্"-গণ আপনাদের পূজার আবেগ ভাষাহীন প্রস্তরস্তূপে স্তম্ভিত করিয়া তুলিতেছিল, বহু-সহস্র বৎসর পরে সেই দ্বীপ হইতে একটি বিদেশী আসিয়া কালান্তরের সেই মূক ইঙ্গিত-পাশ হইতে তাহার ভাষাকে উদ্ধার করিয়া লইলেন। রাজচক্রবর্ত্তী অশোকের ইচ্ছা এত শতাব্দী পরে একটি বিদেশীর সাহায্যে সার্থকতালাভ করিল। সে ইচ্ছা আর কিছুই নহে, তিনি যত বড় সম্রাট্ই হউন, তিনি কি চান্ কি না চান্, তাঁহার কাছে কোন্‌টা ভাল কোন্‌টা মন্দ, তাহা পথের পথিককেও জানা-ইতে হইবে। তাঁহার মনের ভাব এত যুগ ধরিয়া সকল মানুষের মনের আশ্রয় চাহিয়া পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে। রাজচক্রবর্ত্তীর সেই একাগ্র আকাঙ্ক্ষার দিকে পথের লোক কেহ বা চাহিতেছে, কেহ বা না চাহিয়া চলিয়া যাইতেছে।

তাই বলিয়া অশোকের অনুশাসনগুলিকে আমি যে সাহিত্য বলিতেছি, তাহা নহে। উহাতে এইটুকু প্রমাণ হইতেছে, মানবহৃদয়ের একটা প্রধান আকাঙ্ক্ষা কি? আমরা যে মূর্ত্তি গড়িতেছি, ছবি আঁকিতেছি, কবিতা লিখিতেছি, পাথরের মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছি, দেশে-বিদেশে চিরকাল ধরিয়া অবিশ্রাম এই যে একটা চেষ্টা চলিতেছে, ইহা আর কিছুই নয়, মানুষের হৃদয় মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অমরতা প্রার্থনা করিতেছে।

যাহা চিরকালীন মানুষের হৃদয়ে অমর হইতে চেষ্টা করে, সাধারণত তাহা আমাদের ক্ষণকালীন প্রয়োজন ও চেষ্টা হইতে নানা-

প্রকারের পার্থক্য অবলম্বন করে। আমরা সাংবৎসরিক প্রয়োজনের জন্যই ধান-যব-গম প্রভৃতি ওষধির বীজ বপন করিয়া থাকি, কিন্তু অরণ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে চাই যদি, তবে বনস্পতির বীজ সংগ্রহ করিতে হয়।

সাহিত্যে সেই চিরস্থায়িত্বের চেষ্টাই মানুষের প্রিয় চেষ্টা। সেইজন্য দেশহিতৈষী সমালোচকেরা যতই উত্তেজনা করেন যে, সারবান্ সাহিত্যের অভাব হইতেছে—কেবল নাটক-নভেল-কাব্যে দেশ ছাইয়া যাইতেছে, তবু লেখকদের হুঁস্ হয় না। কারণ, সারবান্ সাহিত্যে উপস্থিত প্রয়োজন মিটে, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় সাহিত্যে স্থায়িত্বের সম্ভাবনা বেশি।

কারণ, যাহা জ্ঞানের কথা, তাহা প্রচার হইয়া গেলেই তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়া শেষ হইয়া যায়। মানুষের জ্ঞানসম্বন্ধে নূতন আবিষ্কারের দ্বারা পুরাতন আবিষ্কার আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। কাল যাহা পণ্ডিতের অগম্য ছিল, আজ তাহা অর্ব্বাচীন বালকের কাছেও নূতন নহে। যে সত্য নূতন বেশে বিপ্লব আনয়ন করে, সেই সত্য পুরাতন বেশে বিস্ময়মাত্র উদ্রেক করে না। আজ যে সকল তত্ত্ব মূঢ়ের নিকটে পরিচিত, কোনকালে যে তাহা পণ্ডিতের নিকটেও বিস্তর বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহাই লোকের কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু হৃদয়ভাবের কথা, প্রচারের দ্বারা পুরাতন হয় না। জ্ঞানের কথা একবার জানিলে আর জানিতে হয় না; আগুন গরম, সূর্য্য গোল, জল তরল, ইহা একবার জানিলেই চুকিয়া যায়—দ্বিতীয়বার কেহ যদি তাহা আমাদের নূতন শিক্ষার মত জানাইতে আসে, তবে ধৈর্য্যরক্ষা করা কঠিন হয়। কিন্তু ভাবের কথা বারবার অনুভব করিয়া শ্রান্তিবোধ হয় না। সূর্য্য যে পূর্ব্বদিকে ওঠে, এ কথা আর আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে না—কিন্তু সূর্য্যোদয়ের যে সৌন্দর্য্য ও আনন্দ, তাহা জীবসৃষ্টির পর হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের কাছে অম্লান আছে। এমন কি, অনুভূতি যত প্রাচীন কাল হইতে যত লোকপরম্পরার উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া আসে, ততই তাহার গভীরতাবৃদ্ধি হয়—ততই তাহা আমাদিগকে সহজে আবিষ্ট করিতে পারে।

অতএব চিরকাল যদি মানুষ আপনার কোন জিনিষ মানুষের কাছে উজ্জ্বল নবীনভাবে অমর করিয়া রাখিতে চায়, তবে তাহাকে ভাবের কথাই আশ্রয় করিতে হয়। এইজন্য সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন জ্ঞানের বিষয় নহে, ভাবের বিষয়।

তাহা ছাড়া যাহা জ্ঞানের জিনিষ, তাহা এক ভাষা হইতে আর এক ভাষায় স্থানান্তর করা চলে। মূল রচনা হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া অন্য রচনার মধ্যে নিবিষ্ট করিলে অনেকসময় তাহার উজ্জ্বলতাবৃদ্ধি হয়। তাহার বিষয়টি লইয়া নানা লোকে নানা ভাষায় নানা রকম করিয়া প্রচার করিতে পারে—এইরূপেই তাহার উদ্দেশ্য যথার্থভাবে সফল হইয়া থাকে।

কিন্তু ভাবের বিষয়সম্বন্ধে এ কথা খাটে না। তাহা যে মূর্ত্তিকে আশ্রয় করে, তাহা হইতে আর বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না।

জ্ঞানের কথাকে প্রমাণ করিতে হয়,

আর ভাবের কথাকে সঞ্চার করিয়া দিতে হয়। উষা যে আরক্তবর্ণ, তাহা প্রমাণ করিয়া দিবার যে কয়টি উপায় আছে, তাহা জানা শক্ত নহে—কিন্তু উষা আমার যে কেমন লাগিতেছে, তাহা অন্যকে ঠিকমত অনুভব করাইতে গেলে কোনো বাঁধা উপায়ের দোহাই দেওয়া চলে না। যুক্তিশাস্ত্রের বিধানের মত তাহা নির্দ্দিষ্ট নহে। তাহার জন্য নানাপ্রকার আভাস-ইঙ্গিত, নানাপ্রকার ছলাকলার দরকার হয়। তাহাকে কেবল বুঝাইয়া বলিলেই হয় না, তাহাকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে হয়।

এই কলাকৌশলপূর্ণ রচনা, ভাবের দেহের মত। এই দেহের মধ্যে ভাবের প্রতিষ্ঠায় সাহিত্যকারের পরিচয়। এই দেহের প্রকৃতি ও গঠন অনুসারেই তাহার আশ্রিত ভাব মানুষের কাছে আদর পায়—ইহার শক্তি অনুসারেই তাহা হৃদয়ে ও কালে ব্যাপ্তিলাভ করিতে পারে।

প্রাণের জিনিষ দেহের উপরে একান্ত নির্ভর করিয়া থাকে। জলের মত তাহাকে এক পাত্র হইতে আর এক পাত্রে ঢালা যায় না। দেহ এবং প্রাণ পরস্পর পরস্পরকে গৌরবান্বিত করিয়া একাত্ম হইয়া বিরাজ করে।

যেখানে রচনার সঙ্গে তাহার বিষয়ের এইরূপ একাত্মতা আছে, সেইখানেই সাহিত্য সজীবমূর্ত্তিতে প্রকাশ পায়। কুমারসম্ভবের মধ্যে যে বিষয়টুকু আছে, তাহা জানা হইলেই যে কুমারসম্ভব পড়ার ফল পাওয়া যায়, তাহা নহে। উহার ছন্দোবন্ধ, উহার আগাগোড়াই পড়িতে হইবে। কুমারসম্ভব ছাড়া আর কোনখানেই কুমারসম্ভবপাঠের উদ্দেশ্য সফল করিবার কোন উপায় নাই। উজ্জয়িনীতে বসিয়া কত শতাব্দী পূর্ব্বে কালিদাস যে কয়টি কথা লিখিয়াছেন, তাহার একটি অক্ষর বাদ দিলে চলিবে না। তাঁহারই ভাব তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই রচনার ভঙ্গীতে আমাদিগকে সমগ্র আকারে গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহার প্রাণহানি হইবে। ইহাই যথার্থ বাঁচিয়া থাকা।

ভাব, বিষয়, তত্ত্ব সাধারণ মানুষের। তাহা একজন যদি বাহির না করে ত কালক্রমে আর একজন বাহির করিবে। কিন্তু রচনা লেখকের সম্পূর্ণ নিজের। তাহা একজনের যেমন হইবে, আর একজনের তেমন হইবে না। সেইজন্য রচনার মধ্যেই লেখক যথার্থরূপে বাঁচিয়া থাকে—ভাবের মধ্যে নহে, বিষয়ের মধ্যে নহে।

অবশ্য রচনা বলিতে গেলে ভাবের সহিত ভাবপ্রকাশের উপায় দুই সম্মিলিতভাবে বুঝায়—কিন্তু বিশেষ করিয়া উপায়টাই লেখকের।

দীঘি বলিতে জল এবং খনন-করা আধার দুই একসঙ্গে বোঝায়। কিন্তু কীর্ত্তি কোন্‌টা? জল মানুষের সৃষ্টি নহে—তাহা চিরন্তন। সেই জলকে বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের জন্য সুদীর্ঘকাল রক্ষা করিবার যে উপায়, তাহাই কীর্ত্তিমান্ মানুষের নিজের। ভাব সেইরূপ মনুষ্যসাধারণের, কিন্তু তাহা বিশেষ মূর্ত্তিতে সর্ব্বলোকের বিশেষ আনন্দের সামগ্রী করিয়া তুলিবার উপায়-রচনাই লেখকের কীর্ত্তি।

অতএব দেখিতেছি, ভাবকে নিজের

করিয়া সকলের করা, ইহাই সাহিত্য, ইহাই ললিতকলা। অঙ্গার-জিনিষটা জলে-স্থলে-বাতাসে নানা পদার্থে সাধারণভাবে সাধারণের আছে—গাছপালা তাহাকে নিগূঢ়-শক্তিবলে বিশেষ আকারে প্রথমত নিজের করিয়া লয়, এবং সেই উপায়েই তাহা সুদীর্ঘ-কাল বিশেষভাবে সর্ব্বসাধারণের ভোগের দ্রব্য হইয়া উঠে। শুধু যে তাহা আহার এবং উত্তাপের কাজে লাগে, তাহা নহে—তাহা হইতে সৌন্দর্য্য, ছায়া, স্বাস্থ্য বিকীর্ণ হইতে থাকে।

সাহিত্যের মূল জিনিষটা সেইরূপ অত্যন্ত সাধারণ। লেখক তাহাকে প্রথমত নিজের করিয়া লন। সেই উপায়ে তাহা মূর্ত্তিগ্রহণ করে, সৌন্দর্য্যলাভ করে, সহজে সর্ব্বসাধারণের গ্রহণযোগ্য হইয়া বিশেষ আকারে স্থায়িত্বপ্রাপ্ত হয়।

সৃষ্টির মূল উপাদান অসংখ্য নহে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন আধারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া অসীম বৈচিত্র্য রচনা করিতেছে। সাহিত্যেরও মূল উপাদান সীমাবদ্ধ। একই ভাব সহস্র চিত্ত হইতে সহস্রভাবে প্রতিফলিত হইয়া মানুষের আনন্দলোককে নব নব বৈচিত্র্য দান করিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, সাধারণের জিনিষকে বিশেষভাবে নিজের করিয়া সেই উপায়েই তাহাকে পুনশ্চ বিশেষভাবে সাধারণের করিয়া তোলা সাহিত্যের কাজ।

তা যদি হয়, তবে জ্ঞানের জিনিষ সাহিত্য হইতে আপনি বাদ পড়িয়া যায়। কারণ, ইংরাজিতে যাহাকে ট্রুথ্ বলে এবং বাংলাতে যাহাকে আমরা সত্য নাম দিয়াছি অর্থাৎ যাহা আমাদের বুদ্ধির অধিগম্য বিষয়—তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের নিজত্ববর্জ্জিত করিয়া তোলাই একান্ত দরকার। সত্য সর্ব্বাংশেই ব্যক্তিনিরপেক্ষ, শুভ্র-নিরঞ্জন। মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব আমার কাছে একরূপ, অন্যের কাছে অন্যরূপ নহে। তাহার উপরে বিচিত্র হৃদয়ের নূতন নূতন রঙের ছায়া পড়িবার জো নাই।

যে সকল জিনিষ অন্যের হৃদয়ে সঞ্চারিত হইবার জন্য প্রতিভাশালী হৃদয়ের কাছে সুর, রং, ইঙ্গিত প্রার্থনা করে—যাহা আমাদের হৃদয়ের দ্বারা সৃষ্ট না হইয়া উঠিলে অন্য হৃদয়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, তাহাই সাহিত্যের সামগ্রী। তাহা আকারে-প্রকারে, ভাবে-ভাষায়, সুরে-ছন্দে মিলিয়া তবেই বাঁচিতে পারে—তাহা মানুষের একান্ত আপনার—তাহা আবিষ্কার নহে, অনুকরণ নহে, তাহা সৃষ্টি। সুতরাং তাহা একবার প্রকাশিত হইয়া উঠিলে তাহার রূপান্তর, অবস্থান্তর করা চলে না—তাহার প্রত্যেক অংশের উপরে তাহার সমগ্রতা একান্তভাবে নির্ভর করে। যেখানে তাহার ব্যত্যয় দেখা যায়, সেখানে সাহিত্য-অংশে তাহা হেয়।

এমার্সন্।

জীবনের এক অতি ঘোর দুর্দ্দিনে, শোক ও নিরাশার নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে এমার্সনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। সে কাহিনী কহিতে গেলে, কিয়ৎপরিমাণে আত্মকথা কহিতে হয়; অবস্থাধীনে পাঠক এ অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

যৌবনের প্রারম্ভে, আর-দশজনের ন্যায় আমারও জ্ঞানের সমক্ষে জটিল বিশ্ব-সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। সে সময়ে, লৌকিক ন্যায় অনুসরণ করিয়া, বিশ্বমূলে আমি যুগপৎ দুইটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করি—এক জড়তত্ত্ব, অপর চেতনতত্ত্ব। জড় ও চৈতন্য, পরমাণু ও ঈশ্বর, উভয়ই অনাদি, উভয়ই অনন্ত, জড়-চেতনার সমাবেশে বিচিত্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপনীত হই।

'নাসতো সজ্জায়তে'—অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে না, এ ধারণা বহুদিন হইতেই বুদ্ধিতে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। প্রচলিত খৃষ্টীয় সৃষ্টিতত্ত্বকে এইজন্য বহুদিনই একেবারে অসিদ্ধ বলিয়া বর্জ্জন করিয়াছিলাম। স্বদেশের সৃষ্টিতত্ত্বাদিসম্বন্ধে তখন কোনও জ্ঞানই ছিল না। সুতরাং আত্মচেষ্টা দ্বারাই সৃষ্টিসমস্যাভেদের উপায় উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হই। এই প্রয়াস হইতেই আমার দ্বৈতসিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা।

স্থূলদৃষ্টিতে তখন জগতে দুই পরস্পর-বিরোধী অথচ পরস্পরাপেক্ষী বস্তু দেখিয়াছিলাম—এক জড়, অপর চৈতন্য। দুই প্রত্যক্ষের বিষয়, প্রত্যক্ষকে অগ্রাহ্য করি কিরূপে? জড়কে যতদিন জড় বলিয়াই জানিবে, ততদিন চৈতন্য হইতে তাহার উৎপত্তি কল্পনাও করিতে পারিবে না। আমিও কল্পনা করিতে পারি নাই। সুতরাং জড় হইতে জড়, চৈতন্য হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়াছে, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া পড়িল।

বিশেষত, কেন বলিতে পারি না, অদ্বৈতবাদের প্রতি একটা বিকট বিদ্বেষ বহুদিন হইতেই প্রাণে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। এবং অদ্বৈতবাদের বিভীষিকা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্যই, যৌবনের প্রারম্ভে জিজ্ঞাসার উদয় হইবামাত্র, ঘোর দ্বৈতবাদের এই দুর্ভেদ্য দুর্গ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

কিন্তু আমাদের কল্পনারচিত সিদ্ধান্ত কখনই শুদ্ধ তর্কযুক্তির সাহায্যে বেশিদিন স্থির থাকিতে পারে না। প্রত্যক্ষ সত্যই একমাত্র স্থির ও সনাতন সত্য। সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার উপরে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠালাভ করে, অভিজ্ঞতার প্রকৃত মর্ম্ম অবিসংবাদিতরূপে যে সিদ্ধান্ত অভিব্যক্ত করিতে পারে, তাহাই অটুট, অচ্যুত থাকে। তাহার বিকাশ হয়, কিন্তু বিনাশ সম্ভবে না।

জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অলক্ষিতে আমার দ্বৈতসিদ্ধান্তের ভিত্তিভূমি ক্রমে শিথিল হইয়া যাইতে লাগিল।

যৌবনে আত্মশক্তির উপরে অটল বিশ্বাস

থাকে। যৌবনে বিকাশোন্মুখ শক্তি ও বৃত্তিসকল মানবকে অপরিসীম শক্তিমদে প্রমত্ত করিয়া রাখে। মানবের অসাধ্য যে কিছু আছে, তখন ইহা কল্পনাতেও প্রায় স্থান-প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু জীবনসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া, সংসারের ভীষণ শক্তিসংঘর্ষের মধ্যে একবার পড়িয়া গেলে, সহজেই সেই কল্পিত আত্মবিশ্বাস চূর্ণ হইয়া যায়। জীবনের কঠোর অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানবের অকিঞ্চনতা ও অক্ষমতার জ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠে। এ সম্বন্ধে আস্তিক-নাস্তিকের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ থাকে না। নাস্তিক্যবাদী ব্রাড্‌লর মুখে পর্য্যন্ত এ কথা শুনিয়াছি—'Oh, what little, man can do!' ইহাই মানবের সর্ব্বজনীন অভিজ্ঞতা।

জীবনের অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের শক্তিমদ যত ক্ষীণ হইতে লাগিল, ততই মানবের শক্তিসাধ্যের অতীত এক বিশ্বব্যাপিনী বিধাতৃশক্তিতে বিশ্বাস জন্মিতে আরম্ভ করিল। প্রথমত এই শক্তিকে অন্ধ প্রাক্তন—Blind Fate বলিয়া ভাবিতাম। ক্রমে এই কল্পনা হইতেই এক অনন্তকল্যাণকারিণী বিশ্বশক্তির সত্তায় বিশ্বাসের বিকাশ হইতে লাগিল। সংসারের ঘাতপ্রতিঘাতে, আশা ও নৈরাশ্যের সংঘর্ষে এই বিশ্বাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল; তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বসিদ্ধ জড়চৈতনবাদের ভূমি শিথিল হইল বটে, কিন্তু একেবারে পরিত্যক্ত হইল না।

এই একত্বানুভূতি যে সময়ে অল্পে অল্পে প্রাণে জাগিয়া উঠিতেছিল, তখনই প্রকৃতপক্ষে এমার্সনের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকার হয়। এই অভিজ্ঞতা জন্মিবার পূর্ব্বে এমার্সন্‌কে জানিতাম বটে, কিন্তু ভাল করিয়া চিনিতে পারি নাই।

অদৃষ্টের সন্ধান তখন ঈষৎ পাইয়াছি বটে, কিন্তু দৃষ্টের উপরেও পূর্ণ আশ্বাসই রহিয়াছে। আর থাকিবারই কথা। তখনও স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য, সুখ ও সম্ভোগের পসরা লইয়া জীবনতরণী মৃদুমন্দ কালতরঙ্গে আনন্দে ভাসিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সহসা একদিন প্রলয়ঝঞ্ঝায় সমুদায় বিপর্য্যস্ত ও বিনষ্ট হইয়া গেল। মৃত্যুর সূচিভেদ্য অন্ধকার চক্ষের নিমেষে চারিদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া দিল। সেই অন্ধকারে, নিরাশার নির্ম্মম নিস্তব্ধতার মধ্যে, অসার অনিত্যের বিভীষিকা জাগিয়া উঠিয়া, মৃত্যুর ছবিকেও যেন ম্রিয়মাণ করিয়া তুলিল।

সেই দুর্দ্দিনে, সেই মৃত্যুচ্ছায়ায়, সেই বিভীষিকার মধ্যে, এমার্সনের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়।

এদেশের নব্য শিক্ষিতসমাজের আর-দশজনের ন্যায় আমিও বহুদিনই এমার্সনের নাম জানিতাম; বহুদিন তাঁহার গ্রন্থাবলীও কিছু কিছু পড়িয়াছিলাম; কিন্তু আস্বাদন করিতে পারি নাই। ফলত এতাবৎকাল এমার্সনের সঙ্গে আমার মানস-সাক্ষাৎকার হয় নাই। আর গ্রন্থকারের সাক্ষাৎ পরিচয় ব্যতিরেকে, শুদ্ধ ব্যাকরণ ও অভিধানের সাহায্যে কোন গ্রন্থেরই নিগূঢ় মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারা যায় না।

জগতের শিক্ষাগুরুদিগের সঙ্গে এই সাক্ষাৎ-পরিচয়ব্যাপারটা নিতান্তই দুর্লভ, কেবল দেবপ্রসাদেই সম্ভব হয়। কারণ সমানে

সমানেই কেবল প্রকৃত চেনাশোনা হইয়া থাকে, আর দেবতার কৃপা ভিন্ন প্রাকৃতজনের পক্ষে অলৌকিক প্রতিভার সঙ্গে কোনও বিষয়ে সমতা লাভ করা সম্ভব হয় না। মানবের সর্ব্বজনীন অভিজ্ঞতার ভূমিতে, দৈবক্রমে গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎকার হইলেই কেবল, সেই অভিজ্ঞতার উপরে দাঁড়াইয়া, অকৃতী শিষ্য, মহাজন গুরুর তত্ত্বোপদেশের মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হয়। এমার্সনের সঙ্গেও এই ভূমিতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

মৃত্যুচ্ছায়ায় বসিয়া একদিন সহসা বহুকালোপেক্ষিত এমার্সনের গ্রন্থাবলী খুলিলাম। 'ক্ষতিপূরণ'শীর্ষক প্রবন্ধের উপরেই প্রথমে দৃষ্টি পড়িল। তাহার শেষভাগে দেখিলাম লেখা আছে—

Such also is the natural history of calamity. The changes that break up at short intervals the prosperity of men are advertisements of a nature whose law is growth—ইত্যাদি।

অর্থাৎ দুর্ঘটনার প্রাকৃত ইতিহাসও এইরূপই। যে সকল অবস্থাবিপর্য্যয়ে মধ্যে মধ্যে লোকের সুখসৌভাগ্য ভাঙিয়া দেয়, তাহা দ্বারা মানবপ্রকৃতিনিহিত অনন্ত উন্নতির বিধানই বিজ্ঞাপিত হইয়া থাকে।

এই প্রবন্ধ যে এই প্রথম পড়িলাম, তাহা নহে। কিন্তু যে অভিজ্ঞতার ভূমিতে দাঁড়াইয়া এমার্সন্ এ সকল কথা লিখিয়াছিলেন, আমার তখনও সে অভিজ্ঞতা হয় নাই। বন্ধ্যা কি কখন মাতৃস্নেহ সত্যভাবে জানিতে পারে বা পুত্রশোকের মর্ম্মযাতনা কোনক্রমে অনুভব করিতে সমর্থ হয়?

এমার্সন্ এখানে শোকার্ত্তের অন্তর্জীবনচরিত বিবৃত করিতেছেন; শোকাহত ব্যক্তিই কেবল ইহার গভীর মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবে, অপরে তাহা কল্পনা করিতে পারে, ধারণা করিবে কিরূপে? আর শোকার্ত্তমাত্রেই যে বুঝিবে, এমনও নহে। ঋষিবাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করা সর্ব্বথাই দেবানুগ্রহসাপেক্ষ।

এই ক্ষতিপূরণ প্রবন্ধে এমার্সন্ শেষভাগে শোকার্ত্তের কথা কহিয়াছেন। কিন্তু এমন করিয়া শোকার্ত্তকে কেহ সান্ত্বনা দিতে পারে, পূর্ব্বে জানিতাম না।

সংসারে শোকার্ত্তের অভাব নাই; সহৃদয় লোকেও সততই শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাদান করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন। ইহার ফল কি হয়, তাহাও অনেকেই জানি। এই সকল সান্ত্বনাবাক্যের নির্ব্বাক্ বেদনা শোকার্ত্তমাত্রেই স্বল্পাধিক ভোগ করিয়া থাকেন।

অসারে সার-বুদ্ধি, অনিত্যে নিত্য-ধারণা হইতেই শোকের উৎপত্তি হয় সত্য; কিন্তু যে আত্মহারা হইয়া অসারকেই বুকে ধরিয়া কাঁদিতেছে, তাহার নিকটে অসারের অসারত্বের অলীক বর্ণনায় শোকের সান্ত্বনা হয় না, কেবল প্রীতিরই অবমাননা হইয়া থাকে। অথচ অজ্ঞ অরসিক লোকে সর্ব্বদাই শোকাতুরকে সান্ত্বনা দিতে যাইয়া এইরূপ অর্ব্বাচীনভাবে তাহার প্রীতির অবমাননা করে। অনিত্যের অনিত্যতা দেখিয়া যে সেই অনিত্যেরই জন্য কাঁদিতেছে, তাহাকে আবার

সেই মর্ম্মঘাতী অনিত্যতা বুঝাইতে যাওয়া অযথা বেদনাদায়ক বিড়ম্বনামাত্র !

অথচ সংসারের লোকে নিয়তই ইহা করিতেছে। ধর্ম্মব্যবসায়িগণ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সমধিক পটু। শোকের সম্মুখীন হইলেই ইঁহারা অনিত্যতার অসার উপদেশ প্রদানে অগ্রসর হন।

এমার্সন্‌ও শোকার্ত্তকেই সান্ত্বনা দিতেছেন ; অথচ তাঁহার উপদেশে অনিত্যতার অসার বর্ণনা নাই ; শ্মশানবৈরাগ্যের উদ্দীপনা নাই ; স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্য-সম্পৎ-সুখ-সম্ভোগের প্রতি বিরক্তি নাই ; জীবন-যৌবনের প্রতি নির্ম্মমতা নাই ; শোকার্ত্ত যাহার জন্য অবিরাম হাহাকার করে, যাহার পুণ্যস্মৃতি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অশ্রুজলে প্রতিদিন তাহার তর্পণ করে, তৎপ্রতি উপেক্ষা-ঔদাসীন্যের লেশমাত্র নাই ; অথচ কি অপূর্ব্ব অমিয়ধারাসেচনের দ্বারা মৃত্যুর উপরেই অমৃতের প্রতিষ্ঠার প্রয়াস রহিয়াছে !

প্রেমের সম্বন্ধ কেবলই দানে নহে, গ্রহণেও। আদান ও প্রদানের মধ্যে প্রেম কোন্‌টাতে সমধিক পরিতৃপ্ত হয়, বলা সহজ নহে। সেবা করিয়া যেমন সুখ, সেবা পাইয়াও তেম্‌নি। এমার্সন্‌ আপনার অসাধারণ প্রতিভাবলে মৃত্যুকেও এই বিশ্বব্যাপী প্রেমের আদানপ্রদানের সম্বন্ধজালে আবদ্ধ করিয়াছেন। মৃত্যু কি কেবলই ক্ষতির কারণ, লাভ কি তাহাতে কিছু নাই? মৃত্যু হরণ করে অসারকে, কিন্তু দিয়া যায় সারবস্তু ; হরণ করে অনিত্যকে, দিয়া যায় অনন্ত অমৃত।

The death of a dear friend, wife, brother, lover, which seemed nothing but privation, somewhat later assumes the aspect of a guide or a genius......and the man or woman who would have remained a sunny garden flower with no room for its roots, and too much sunshine for its head, by the falling of the walls, and the neglect of the gardener is made the banian of the forest, yielding shade and fruit to wide neighbourhoods of men.

বিশ্ববিধানের এই অপ্রতিহত কল্যাণে বিশ্বাস কেবল একত্বানুভূতি হইতেই উৎপন্ন হইতে পারে এবং এই একত্বানুভূতিতেই পাশ্চাত্য প্রতিভাসমাজে এমার্সনের গৌরব ও বিশেষত্ব। এমন করিয়া আর কেহ সে দেশে অনিত্যের মধ্যে নিত্য, অসারের মধ্যে সার, ও মৃত্যুর মধ্যে অমৃতকে দর্শন করিতে পারে নাই। এই একত্বানুভূতিই তাঁহার শিক্ষার ও প্রতিভার, জীবনের ও উপদেশের মূলসূত্র। এই সূত্র যে ধরিতে পারিল, তাহারই নিকটে এমার্সনের সমুদয় রহস্য সহজে প্রকাশিত হইয়া পড়িল ; যে পারিল না, চিরদিনই সে তাঁহার প্রতিভার বহিরঙ্গনে পড়িয়া রহিল, অন্তঃপুরে প্রবেশের অধিকার পাইল না।

এই একত্বানুভূতি জগতে অতি বিরল। এইজন্যই এমার্সনের গ্রন্থাবলী পড়ে অনেকে, কিন্তু তাহার প্রকৃত মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে অতি অল্প লোকে। মার্কিন কবি হুইট্‌ইয়ার বলিয়াছেন যে, সহস্র বৎসর পরে লোকে আমেরিক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেবল এমার্সনের

গ্রন্থাবলীই সাদরে পাঠ করিবে। কিন্তু হুইট্-ইয়ার্ এমার্সনের প্রতিভার গৌরব যেরূপ বুঝিয়াছেন, তাঁহার স্বদেশীয়েরা তাহার শতাংশের একাংশও বুঝিতে পারে নাই। পারিলে তাহারা কখনই হথরন্কে এমার্সনের উপরে স্থানদান করিত না। যেমন মার্কিনে, সেইরূপ ইংলণ্ডে। এমার্সন্ ইউনিটেরিয়ান্ ছিলেন। ইংলণ্ডে ইউনিটেরিয়ান্ দলেই তাঁহার প্রতিপত্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাও স্বগণপক্ষপাতিতামূলক। ইংলণ্ড এখনও এমার্সনের প্রতিভার গৌরব ও তাঁহার শিক্ষার মূল্য বুঝিতে সমর্থ হয় নাই।

ইহাতে বিস্ময়ের কথা কিছুই নাই। 'ভবানীভ্রুকুটীভঙ্গং ভবো বেত্তি ন ভূধরঃ'—ভবানীর ভ্রুকুটিভঙ্গ ভবই কেবল বুঝিতে পারেন, ভূধর বুঝিবেন কিরূপে? এমার্সনের সঙ্গে যাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা, ভাব-আদর্শ কোনবিষয়েই সমতা নাই, তাঁহারা তাঁহার মর্ম্ম বোঝেন না, ইহা আর আশ্চর্য্য কি?

পাশ্চাত্যজগতে প্রথম হইতেই এমার্সন্ একরূপ দুর্ব্বোধ্য ছিলেন। মিড্‌ভিল্-তত্ত্ব-বিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক বার্‌বার্-সাহেবের মুখে এ বিষয়ে একটি বড়ই কুতূহলোদ্দীপক কাহিনী শুনিয়াছিলাম।

বার্‌বার্ যখন যুবক, হার্ভার্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন, তখন ব্রহ্ম Brahma নামে এমার্সনের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। সে কবিতাটি এই:—

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

Far or forgot to me is near;
Shadow and sunlight are the same;
The vanished gods to me appear;
And one to me are shame and fame.

They reckon ill, who leave me out;
When me they fly I am the wings;
I am the doubter and the doubt,
I am the hymn the Brahmin sings.

The strong gods pine for my abode,
And pine in vain the sacred Seven;
But thou, meek lover of the good,
Find me, and turn thy back on heaven!

সে সময়ে এই কবিতাটি লোকের নিকটে এমনই দুর্ব্বোধ্য হইয়াছিল যে, মার্কিনের শিক্ষিত যুবকেরা যাহা-কিছু অবোধ্য ও অর্থশূন্য, তাহাকেই পরস্পরের মধ্যে কথাবার্ত্তায় পরিহাসচ্ছলে "ব্রহ্ম" বলিয়া ব্যাখ্যা করিত। আজিও শুধু এই বিশেষ কবিতাটি নহে, কিন্তু এমার্সনের অনেক রচনাই ইংরাজ ও মার্কিন সমাজে এই "ব্রহ্ম"পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

স্তুতিনিন্দার সমত্ব এবং ছায়াতপ ও হন্তা-হতের মৌলিক একত্বের অনুভূতি পাশ্চাত্যসমাজে এখনও নিরতিশয় ক্ষীণ রহিয়াছে। অথচ ইহাই এমার্সনের বিশেষত্ব, এই গভীর অধ্যাত্ম একত্বানুভূতিতেই তাঁহার ঋষিত্ব। এই একত্বানুভূতি যাঁহার অন্তরে স্বল্লাধিক জাগ্রত হয় নাই, সে কদাপি এমার্সনের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারে না।

এমার্সন্ ঋষি ছিলেন। 'ঋষয়ো মন্ত্রদ্রষ্টারঃ'—মন্ত্রের সাক্ষাৎকার যাঁহারা লাভ করেন,

তাঁহারাই ঋষি। মন্ত্রে তত্ত্বের অভিব্যক্তি; মন্ত্রদর্শী আর তত্ত্বদর্শী একই কথা। এমার্সন্ সৃষ্টির নিগূঢ়তত্ত্ব আপনার অসাধারণ অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

সৃষ্টির তত্ত্ব জড় নহে, অজড় আত্মা; এই আত্মবস্তু হইতেই, যথা প্রদীপ্ত পাবক হইতে অসংখ্য স্ফুলিঙ্গের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ এই বিচিত্র বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে। এই আত্মবস্তুতেই তাহার স্থিতি,—আত্মতত্ত্বের এই মহাস্ফুরণেই বিশ্বের গতি ও পরিণতি। এমার্সন্ এই মহাসত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। এই আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহাকে অবাধে ঋষি বলিয়া অভিহিত করিতে পারা যায়।

আর আত্মচৈতন্য এইরূপে যাঁহার স্ফুরিত হইয়া থাকে, তাঁহার নিকটে জগতের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব স্বতঃপ্রকাশিত হইয়া পড়ে। এইজন্য ঋষিগণ বৈজ্ঞানিক নহেন, কিন্তু বিজ্ঞানের পরম তত্ত্বসকল কখন-কখন তাঁহাদের জ্ঞানে আপনি ফুটিয়া উঠে। তাঁহারা দার্শনিক নহেন, কিন্তু লৌকিক দর্শন যে সকল মহাসত্যের অন্বেষণে যাইয়া ঋজুকুটিল বহু পন্থা বৃথা পরিভ্রমণ করে, অনেক সময়ে তাঁহারা সে সকল মহাসত্য সহজে আয়ত্ত করিয়া থাকেন। এই অলৌকিক অধ্যাত্ম দৃষ্টিতেই ঋষিগণের ঋষিত্ব। এই অধ্যাত্মদৃষ্টি দ্বারাই এমার্সন্ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র বস্তু ও ঘটনার মধ্যে এক অখণ্ড একত্ব অনুভব করিয়াছিলেন।

যে একত্বানুভূতিতে এমার্সনের বিশেষত্ব ও ঋষিত্ব, য়ুরোপে তাহা কিয়ৎপরিমাণে নূতন হইলেও, ভারতে নূতন নহে। এই একত্বানুভূতি ভারতীয় শিক্ষা ও সাধনার বিশেষত্ব; ইহাতেই আমাদের জাতীয় চিন্তা ও চরিত্রের মৌলিকত্ব। বেদে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ইহার অঙ্কুর, উপনিষদে ইহার বিকাশ, পুরাণে ইহার পরিণতি। অতএব পাশ্চাত্যজগতে এমার্সনের শিক্ষা দুর্ব্বোধ্য হইলেও, হিন্দুর নিকটে সেরূপ দুরধিগম্য হইতে পারে না।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হিন্দু বহুদিন আপনার শাস্ত্রসাহিত্যের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকারের সাক্ষাৎ যোগ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছে; সুতরাং যে একত্বানুভূতিতে তাহার জাতীয় সাধনার বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব, তাহা বর্ত্তমান-হিন্দুমণ্ডলীমধ্যে স্বল্পাধিক ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। এইজন্য হিন্দুও ইংরাজ এবং মার্কিনের ন্যায় এমার্সনের মর্ম্মগ্রহণে সহজে সমর্থ হয় না। কেবল দৈবানুগ্রহে যাঁহারা কোনপ্রকারে সেই সর্ব্বজনীন একত্বের সন্ধানে চলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটেই এমার্সনের প্রতিভা প্রকৃতরূপে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে।

আমিও এই সন্ধানের পথেই এমার্সনের সাক্ষাৎকার লাভ করি। যতদিন ঘোর জড়বাদী ও দ্বৈতবাদী ছিলাম, এমার্সন্ পড়িতাম বটে, কিন্তু কিছুই বুঝিতাম না। ক্রমে যখন সংসারচক্রের তাড়নায়, শোক ও নিরাশার নির্ম্মম নিষ্পেষণে, আত্মশক্তির উপরে অবিশ্বাস হইয়া এক অখণ্ড অদ্বৈত বিশ্বশক্তির উপরে চক্ষু পড়িতে লাগিল; জড়ে-চেতনে, জীবনে-মরণে এক অনন্ত বিধাতৃশক্তির লীলাচ্ছবি মানসপটে, উষার উদ্ভিন্ন আলোকে জগচ্চিত্রের ন্যায়, ফুটিয়া উঠিতে

লাগিল ; তখনই প্রকৃতপক্ষে আমার নিকটে এমার্সনের মর্ম্মও প্রকাশিত হইতে লাগিল। সংসারমোহে ভ্রান্ত হইয়া ভ্রমিতে ভ্রমিতে, যাঁহার ঈষৎ সঙ্কেত পাইয়া, অন্ধকারে যাঁহার অনুসন্ধান করিতেছিলাম, এমার্সন্ তাঁহাকেই স্বহস্তে ধরিয়া আমার নিকটে আনিয়া উপস্থিত করিলেন।

ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যায় এমার্সন্ আমার প্রথম গুরু। এমার্সন্ই গীতোপনিষদাদি অধ্যাত্মশাস্ত্রের অমূল্য শিক্ষায় আমাকে দীক্ষিত করেন। এমার্সন্কে জানিবার পূর্ব্বে এদেশের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের আর-দশজনের ন্যায় আমার চিত্তও পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সাধনার বাহ্য চাক্‌চিক্যে সম্পূর্ণ অভিভূত হইয়া ছিল। য়ুরোপের চরিত্র ও আদর্শকেই মানবজাতির আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। সুতরাং স্বদেশের ও স্বজাতির সভ্যতা ও সাধনা, আচার ও আদর্শ, ভাব ও স্বভাব, সকলের প্রতিই একটা অশ্রদ্ধা বিদ্যমান ছিল। অজ্ঞতাজনিত অশ্রদ্ধা যেরূপ উদ্দাম হয়, এ অশ্রদ্ধাও তাহাই ছিল।

যৌবনের প্রথমে অনাথ দরিদ্রশিশুর ন্যায় বিদেশে-বিভূমে, পারি ও লণ্ডনের রাজপথে, মায়ামুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলাম। এমার্সন্ এই প্রবাসী শিশুকে হাতে ধরিয়া, তাহার স্বদেশে আনিয়া, স্বজনগণের মধ্যে রাখিয়া গেলেন। এমার্সনের ঋণ জন্মে শোধ দিতে পারিব না।

এমার্সন্ এই সকল গভীর অধ্যাত্মতত্ত্ব কোথায় শিক্ষা করিলেন, এ প্রশ্নের সদুত্তর দান করা সহজ নহে।

এমার্সনের পিতা ধর্ম্মযাজক ছিলেন। ইউনিটেরিয়ান্ ধর্ম্মযাজকগণের পুস্তকাগারে সে সময়ে যে সকল গ্রন্থাদি থাকা সম্ভব ছিল, এমার্সনের পিতৃগৃহেও তাহাই ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদের খণ্ডনে গভীর অধ্যাত্মদৃষ্টি আবশ্যক হয় না। এই সকল গ্রন্থও কেবল অসার তর্কযুক্তিতেই পূর্ণ থাকিত। এমার্সন্ স্বয়ং ধর্ম্মযাজনার জন্য শিক্ষিত হইয়াছিলেন, সুতরাং এই সকল বাগ্বিতণ্ডার গ্রন্থাদি তাঁহাকে স্বল্পবিস্তর পাঠ করিতে হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এ সকলের দ্বারা তাঁহার মানসিক জীবন গঠিত হয় নাই। বাল্যকালে শেক্‌স্পীয়ার, মিল্টন্, ড্রাইডেন্, ইয়ং, কলিন্স্, বাইরন্, স্কট্ ও ওয়ার্ডস্বার্থই, ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম গুরু ছিলেন। এই মহাকবিদিগের দ্বারাই প্রকৃতপক্ষে এমার্সনের অধ্যাত্মজীবন বহুলপরিমাণে গঠিত হইয়াছিল। পরিণত বয়সে ইনি জর্ম্মান্ তত্ত্ববিদ্যা ও ভারতীয় শাস্ত্রাদিও কিছু পাঠ করিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। ভগবদ্গীতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভক্তি ছিল, ইহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে।

কিন্তু এই সকলের দ্বারা এমার্সনের বুদ্ধি, রঞ্জিনী বৃত্তি ও আত্মদর্পণ সুমার্জ্জিত হইয়াছিল মাত্র, অন্তর্জীবনের মূল উপদানসকল তিনি প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎভাবে গভীর অধ্যাত্মযোগের দ্বারা, একদিকে আত্মবস্তু ও অপরদিকে প্রকৃতিদেবীর স্বহস্ত হইতে গ্রহণ করিতেন।

এমার্সনের জন্মস্থান কন্‌কর্ড (Concord)। কন্‌কর্ডে নদীগিরি ও বনস্থলীর অতি আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

এমার্সনের বাড়ীর সম্মুখেই, রাজপথের পরপারে, কন্‌কর্ড-দর্শনবিদ্যালয়ের পশ্চাতে (Concord School of Philosophy) বহুবৃক্ষরাজিশোভিত পর্ব্বতশ্রেণী। তাঁহার বাটীর অব্যবহিত পশ্চাতে বিস্তীর্ণ গিরি-উপত্যকা, তাহারই প্রান্তদেশে অপর এক পর্ব্বতমালার পাদদেশ ধৌত করিয়া মৃদুমন্দ-গতিতে এক কলকলনাদিনী গিরিনদী সুদূর-প্রান্তরাভিমুখে বহিয়া চলিয়াছে।

বসন্তে এই বিচিত্র বনস্থলী বর্ণনাতীত শোভা ধারণ করিয়া থাকে। সম্মুখস্থ গিরিপার্শ্ব তখন উচ্ছ্বসিতজীবন তরুলতাদির বিচিত্র বর্ণে ও গন্ধে অপার্থিব গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পশ্চাতে প্রান্তরভূমি শ্যামলমসৃণ তৃণপুঞ্জে সুকোমল সুষমায় ভরিয়া যায়। আতটপ্লাবিনী কল্লোলিনী যৌবনের পসরা লইয়া বহিয়া যাইতে থাকে। আর তাহারই তীরদেশে, সে সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া যেন, পর্ব্বতমালা নির্ব্বাক্‌-নিশ্চল হইয়া অধোমুখে সে নিরুপম রূপরাশি পান করিয়া কৃতার্থ হয়। কবিপ্রতিভা-পরিপোষণের জন্যই যেন বিধাতা কন্‌কর্ডকে এমন করিয়া রচনা করিয়াছেন।

প্রকৃতির এই বিচিত্র লীলাভূমিতে এমার্সনের অধ্যাত্মজীবন আজন্ম অতিবাহিত হইয়াছিল। এমার্সন্‌ আশৈশবই নীরবে, নির্জ্জনে, এই পর্ব্বত, উপত্যকা, প্রান্তর ও কল্লোলিনীর সহচর হইয়া, তাহাদেরই মধ্যে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। আপনার অধীত গ্রন্থাদিতে মানব-জাতির যে সকল প্রাচীন গৌরবকাহিনী অধ্যয়ন করিতেন, এই সকল গিরিনদাদির মধ্যে কল্পনাচক্ষে তাহারই যেন পুনরভিনয় দর্শন করিতেন। এমার্সনের পুত্রের মুখে শুনিয়াছি যে, এই বনস্থলী এমার্সনের চক্ষে এক মায়াপুরীর ন্যায় দৃষ্ট হইত। It was an enchanted forest or a cloud of witness.

There in a moment they have seen
The buried past arise:
The fields of Thessaly grew green
Old gods forsook the skies.

আমরণ এমার্সন্‌ প্রকৃতির প্রিয়শিষ্য ছিলেন। স্বদেশীয় যুবকগণকে তিনি সর্ব্বদাই নীরবে, নির্জ্জনে, দিনের মধ্যে অন্তত কিছু-কাল, প্রকৃতির সহবাস করিতে উপদেশ দিতেন। বনে-জঙ্গলে একাকী যাইয়া কি করিব—কেহ এরূপ প্রশ্ন করিলে, তিনি বলিতেন—কান পাতিয়া শুনিও—*Listen*। প্রকৃতির অনুশীলনসম্বন্ধে শিক্ষার্থীদিগকে তিনি দুটি উপদেশ দিতেন, এক—একাকী ভ্রমণ করিও—roam alone, অপর—একটা রোজনামচা রাখিও—keep a journal.

এমার্সন্‌ বলিয়াছেন যে—

In the woods a man casts off his years as the snake his slough, and at what period soever of life, is always a child.

অর্থাৎ বনে-জঙ্গলে, সর্প যেরূপ আপনার খোলস ত্যাগ করে, মানুষ সেইরূপ আপনার বার্দ্ধক্যের খোসা ত্যাগ করিয়া শিশু হইয়া যায়।

আবার—এই বনে-জঙ্গলেই চিরযৌবন বিরাজ করে।

In the woods is perpetual youth. Within these plantations of God,

a decorum and sanctity reign, a perennial festival is dressed, and the guest sees not how he should tire of them in a thousand years.

আবার এইখানেই আমরা বিবেক ও বিশ্বাস পুনঃপ্রাপ্ত হই।

In the woods we return to reason and faith. There I feel that nothing can befall me in life,—no disgrace, no calamity (leaving me my eyes) which nature cannot repair. Standing upon bare ground, —my head bathed by the blithe air, and uplifted into infinite space, —all mean egotism vanishes. I become a transparent eyeball; I am nothing; I see all; the currents of the Universal Being circulate through me; I am part or particle of God.

এখানেও আবার সেই গভীর একত্বানুভূতি! প্রকৃতি সেই একেরই বিগ্রহ। মানবও তাঁহারই বিগ্রহ। এইজন্যই বিচিত্রতার মধ্যেও প্রকৃতি এক। এইজন্যই রুচি, স্বভাব-চরিত্র, শিক্ষা ও সাধনার অশেষ বৈষম্যের মধ্যেও মানবাত্মা এক। মানবজীবন ও মানবীয় ইতিহাসের ঘটনাবৈচিত্র্যেও সেই একেরই প্রকাশ। এই একের সন্ধান ইঙ্গিতেও যিনি পাইয়াছেন, এমার্সনের মর্ম্ম-গ্রহণে কেবল তিনিই সমর্থ।

শ্রীঃ—

আজিকার ভারতবর্ষ।

৩

জাতীয় আন্দোলন

ফরাসী পর্য্যটক মের্তাঁ কংগ্রেস্-প্রভৃতির সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে:—

দেশীয় প্রতিবাদকারীদিগের আপত্তি ও প্রার্থনার কথাগুলি "ন্যাশানাল কংগ্রেসে"র কার্য্যবিবরণী ও কার্য্যপ্রক্রম হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। যাঁহারা ইংরাজের রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যপদ্ধতি অবগত আছেন, তাঁহারাই এই আন্দোলনের প্রবর্ত্তক ও পরিচালক। তাঁহারা ইংরাজি আদর্শে একটি রাষ্ট্রনৈতিক দল সংগঠনের চেষ্টা করিতেছেন। কংগ্রেস-নামক বার্ষিক সভাটি এই আন্দোলনেরই বাহ্য বিকাশ। গোড়ায়, প্রাদেশিক সভা-সমিতিতে, স্থানীয় বিবিধ বিষয়ের আন্দোলন হয়; যে সকল দুঃখদুর্দ্দশার কথা সরকারকে জানানো আবশ্যক, তাহার তালিকা প্রস্তুত হয়; সংস্কারের প্রস্তাবসকল আলোচিত হয়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতি বৎসর ডিসেম্বরের শেষে, ভারতবর্ষের কোন-না-কোন বৃহৎ নগরে এই কংগ্রেস্-

সভার অধিবেশন হইয়া আসিতেছে। এই উপলক্ষে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরিত হয়, তাহার অধিকাংশই হিন্দু; তাহাদের পাশাপাশি অনেকগুলি মুসলমান ও অন্যান্য ক্ষুদ্র সমাজমণ্ডলীরও প্রতিনিধি দেখিতে পাওয়া যায়। দুইএকজন পার্শি এই অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী ও কর্ম্মকর্ত্তা। যাঁহারা য়ুরোপের সমস্ত বৃত্তান্ত বিশেষরূপে অবগত আছেন, তাঁহারাই এই প্রতিবাদকার্য্যের পরিচালক। এই সকল বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া তাঁহারা যেরূপ পরিপাটী যুক্তিবিন্যাস করেন, তাহা য়ুরোপের সর্ব্বোত্তম-শিক্ষিত ব্যক্তিদেরই অনুরূপ। সিপাহীবিদ্রোহের ন্যায় ইহা কোন বিদ্রোহব্যাপার নহে, ইংরাজকে তাড়াইয়া দেশীয় পূর্ব্বাধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। এই আন্দোলনটি দেশীয় উকিল-মোক্তার-ডাক্তারদিগের নিরুপদ্রব আন্দোলন। য়ুরোপের প্রচলিত রাষ্ট্রনৈতিক মূলসূত্রের দোহাই দিয়া, যাহাতে য়ুরোপীয় রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে তাঁহারাও একটু স্থান করিয়া লইতে পারেন, ইহাই তাঁহাদের চেষ্টা।

১৮৯৮ অব্দের কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য এইরূপ বলিয়াছিলেন :—"এই কথাটি আপনারা বিশেষরূপে মনে রাখিবেন যে, আমরা সকলেই ইংরাজ-রাজত্ব-রক্ষণের পক্ষপাতী। ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্থান করা দূরে থাক্, আমরা মনে করি, ইংরাজ-রাজত্বের উচ্ছেদ হইলে, আমাদের মহাদুর্ভাগ্য ও অনর্থ উপস্থিত হইবে। ফলত ইংরাজের প্রসাদেই আমরা 'জাতীয় ভাবে'র ভাবুক হইতে সমর্থ হইয়াছি; এতদিনের পর এই সর্ব্বপ্রথমে আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের উদ্রেক হইয়াছে। ইংরাজের প্রসাদেই আমরা জাতিভেদ ও ধর্ম্মভেদ ভুলিতে সক্ষম হইয়াছি; ইংরাজের নিকট হইতেই আমরা একটি সাধারণ ভাষা প্রাপ্ত হইয়াছি; কেন না, এই কংগ্রেসে আমাদের সমস্ত আলোচনা ইংরাজি ভাষাতেই হইয়া থাকে। আমরা কিসের জন্য এত অনুযোগ-অভিযোগ করি?—ইংরাজসুলভ অধিকার, ইংরাজসুলভ পদমর্য্যাদা লাভ করিবার জন্যই কি নহে? 'আমরা ব্রিটিশ রাজ্যের প্রজা' এই কথা বলিবার অধিকার ও সার্থকতা লাভ করাই কি আমাদের প্রার্থনাদির মূল উদ্দেশ্য নহে?"

এই আন্দোলনের নেতৃগণ এ সম্বন্ধে যাহা-কিছু বলিয়াছেন, তাহার সার-মর্ম্মটি এইরূপে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—"আমরা রাজভক্ত প্রজা; অন্য উপনিবেশসমূহকে যে অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার অধিক আমরা কিছুই প্রার্থনা করি না; কিন্তু আমরা চাহি, যে-সকল মূলসূত্রের উপর ইংরাজের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত, সেই সকল মূলসূত্র আমাদের সম্বন্ধেও কার্য্যত প্রয়োগ করা হয়।"

ন্যাশানাল-কংগ্রেসের প্রার্থনা-তালিকা পাঠ করিলে, একজন য়ুরোপীয়ের মনে, প্রথমে অনুকূল ধারণাই হইয়া থাকে; কেন না, উহা য়ুরোপীয় ধরণের দাবীদাওয়া স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে প্রতীতি হইবে, উহা একটু বেশিমাত্রায় য়ুরোপীয়—উহা ভারতবর্ষের পক্ষে ঠিক খাটে না।

এই প্রতিবাদকারীদিগের দলপুষ্টি

করিতে হইলে, ভারতবর্ষে একটা সাধারণ লোকমত থাকা আবশ্যক। কিন্তু দেখা যায়, অতি অল্প লোকেই সংবাদপত্রাদি পাঠ করে ও শাসনসংক্রান্ত বিষয়ে ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রভাবে ও য়ুরোপীয়দিগের সহিত বিষয়কর্ম্মের সংস্রবে, যদি য়ুরোপীয়সুলভ চিন্তা ও মনোভাব ভারতবর্ষে সংক্রামিত না হইত, তাহা হইলে এই জাতীয় আন্দোলনের অস্তিত্বই থাকিত না। এই সকল সম্পত্তিবিহীন ও পদমর্য্যাদা-বিহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী দলের অতি-প্রাচুর্য্য না থাকিলে, এই আন্দোলনের কোন বলই থাকিত না। ইহাদের আন্দোলন ও দাবীদাওয়ার সহিত আমাদের মধ্যবিত্ত কৃতবিদ্যমণ্ডলীর আন্দোলন ও দাবী-দাওয়ার বিলক্ষণ সাদৃশ্য দেখা যায়। এই সকল অসন্তুষ্ট ব্যক্তিগণ নূতন কার্য্য-পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে ও নির্ব্বাচন-মূলক মন্ত্রিসভার সংগঠন প্রার্থনা করে। * * * ইহার দ্বারা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থসাধন হইবারই কথা। বনেদী রাজা-মহারাজা ও যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি সম্মানের উপাধি ইংরাজ-সরকার হইতে লাভ করি-য়াছে, কিংবা লাভ করিবার আশা করে, এই আন্দোলনের সহিত তাহাদের কোন সহানুভূতি নাই। পক্ষান্তরে, শ্রমজীবি-কৃষিজীবী প্রভৃতি নিরক্ষর ইতরলোকেরা স্বীয় দুঃখদুর্দ্দশার কারণ কিছুই বুঝিতে পারে না, সুতরাং তৎপ্রতিকারের উপায়ও সর-কারকে জানাইতে পারে না; তাই, এই আন্দোলনে তাহারা যোগ দেয় নাই। আবার, আমাদের কৃতবিদ্য মধ্যমশ্রেণীর লোকেরা এ সকল বিষয়ে যেরূপ ইতর-লোকের সাহায্য প্রার্থনা করে, এখানকার সেই শ্রেণীর লোকেরা সে-সব-কিছু করে না।

নিরক্ষর দরিদ্রশ্রেণীর মধ্যে য়ুরোপে যেরূপ জাতীয়ভাবের স্ফূর্ত্তি দেখা যায়, "জাতীয় কংগ্রেস" এই নাম-গ্রহণ-সত্ত্বেও, দেশসাধারণ জাতীয়ভাব ভারতবর্ষে কুত্রাপি দেখা যায় না।

ভারতবর্ষে ইংরাজের প্রতি যত-না বিদ্বেষ, তাহা অপেক্ষা হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের মধ্যে বিদ্বেষভাব আরও অধিক। তত্রস্থ বিভিন্ন বর্ণের লোকেরা আপনাদিগকে পরস্পরের সম্বন্ধে যেন বিদেশী বলিয়া অনুভব করে। এ বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, কংগ্রেসের এই ক্ষুদ্র কৃতবিদ্যমণ্ডলীর মধ্যেও এই চিরাগত জাতিভেদের স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই; তবে, কতকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে বলিতে হইবে। এখনও তাহাদের মধ্যে জাতীয় একতার পূর্ণপ্রতিষ্ঠা হয় নাই। যে-সকল ভাব ও জ্ঞানের কথা প্রাচ্যদেশে কস্মিন্ কালেও জানা ছিল না, তাহাই প্রতিবাদ-কারীর দল মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে ও বক্তৃতা-যোগে দেশময় প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়া-ছেন। এই বিরাট্ চেষ্টার কথা ভাবিতে গেলে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া যাইতে হয়। আবার ইংলণ্ডের জনসাধারণ অনুকূল না থাকায় "স্বদেশীয়" দলের পক্ষে কার্য্যসিদ্ধি আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ-দিগের মধ্যে আমূল সংস্কারের একটি ক্ষুদ্র দল আছে, তাহারাই এই শিক্ষিত ভারত-বাসীদিগের দাবীদাওয়া সাদরে গ্রহণ করে। কিন্তু ইংরাজজাতীয় অধিকাংশ লোকই ইহার

বিরোধী। দুই-তিনটি উদারনৈতিক ও ছেটো-খাটো খৃষ্টসম্প্রদায়ের জনকয়েক ধর্ম্ম-প্রচারক ছাড়া, ভারতবর্ষেরও সমস্ত ইংরাজ একবাক্যে অনিয়ন্ত্রিত প্রভুত্বেরই পক্ষসমর্থন করেন। "স্বদেশী" আন্দোলনের পক্ষপাতী যতগুলি দল আছে, আমি তাহাদের সকল দলের মধ্যেই গিয়াছি; তাহাদের মধ্যে কেবল আমি দুইটি ইংরাজকে দেখিতে পাইলাম। সেই দুইটি ইংরাজকে উহাদের "জাত-ভাই"রা অঙ্গুলীনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইয়া দেয়। একজন ইংরাজমহিলা আমাকে বলিয়াছিলেন—"এই সকল দুষ্ট লোকেরা ভূসম্পত্তির অংশভাগী হইবে, ইহাই তাহাদের একমাত্র অভিসন্ধি।" ইংরাজমহলে সর্ব্বত্রই বাঙালী "বাবু"দিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করা হয়। প্রতিবাদকারী শিক্ষিত দেশীয়-দিগের মধ্যে উহাদিগেরই সংখ্যা সমধিক।

ভারতবর্ষীয়-ইংরাজের সংবাদপত্রসকল এইরূপ ভাণ করে, যেন তাহারা ন্যাশানাল কংগ্রেসের কোন সংবাদই রাখে না; তাহারা শুধু এই কথা বলে, ভারতবর্ষসম্বন্ধে "ন্যাশা-নাল" অর্থাৎ "স্বজাতীয়" এই শব্দ প্রয়োগ করিবার কোন অর্থ নাই।

ইংরাজ-কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন, কংগ্রেস কখনই সমস্ত ভারতবর্ষের মুখপাত্র হইতে পারে না। তা ছাড়া, তাঁহারা বলেন, কোম্পানীর শাসন রহিত হইবার পর হইতে, বরাবর ভারতবর্ষে সংস্কারকার্য্য চলিয়া আসি-য়াছে এবং এখনো তাঁহারা সংস্করণের জন্য উন্মুখ রহিয়াছেন; তবে কিনা, যে-কোন সংস্কারই হউক না কেন, তাহার প্রথম আরম্ভ স্বয়ং তাঁহাদের দ্বারাই প্রবর্ত্তিত হয়, ইহাই তাঁহাদের ইচ্ছা।

ইংলণ্ডে ও ইংরাজ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত উপ-নিবেশসমূহে কতকগুলি মূলসূত্র যে অক্লেশে কার্য্যত প্রয়োগ করা যাইতে পারে, সেপক্ষে তাঁহাদের কোন বিরোধ নাই; তবে তাঁহারা বলেন, তাহার জন্য ভারতবর্ষ এখনো পরিপক্ক হয় নাই। Sir Alfred Lyall ইংরাজ-সরকারকে সতর্ক করিয়া দিয়া এইরূপ বলিয়া-ছেন:—"তাঁহারা যেন উদারনীতির বাড়া-বাড়ি করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভারতবর্ষকে না দেন। তাহা হইলে প্রজায়ত্ত শাসনতন্ত্র ক্রমে রাষ্ট্রবিপ্লবে পরিণত হইবে।

প্রতিবাদকারীদিগেরই সাক্ষ্য অনুসারে, ইংরাজ-সরকারের প্রভাব ও কর্ত্তৃত্বের বলেই, ভারতের একতা সাধিত হইয়াছে। অধি-কন্তু, ইংরাজ রাজপুরুষেরা এই কথা বলেন, যে মুহূর্ত্তে ইংরাজের কর্তৃত্ব রহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই এই একতাও অন্তর্হিত হইবে। এইজন্যই "সমকালীন-পরীক্ষা" স্থাপনসম্বন্ধে ইংরাজ-সরকার বিধিমত-প্রকারে বাধা দিতেছেন। এই পর্য্যন্ত তাঁহারা স্বীকৃত হইয়াছেন যে, নির্ব্বাচনের নিয়মে মন্ত্রিসভায় কতকগুলি দেশীয় সদস্য গ্রহণ করিবেন; কিন্তু অরাজকতার ছুতা করিয়া তাঁহারা ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। সংস্কারা-কাঙ্ক্ষী ভারতবাসীদিগের শিক্ষাপটুতা ও কার্য্যোদ্যম সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন মত-বিরোধ নাই; তবে তাঁহারা বলেন, ইংরাজ-দিগের এমন কতকগুলি বিশেষ গুণ আছে,

যাহা ভারতবর্ষের উন্নতিপক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। Sir Alfred Lyall বলেন—"আমরা ভারতবর্ষে আসিয়াছি রাষ্ট্রীয় সুনীতি শিখাইবার জন্য, শিখিবার জন্য নহে।" ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, সমস্ত ইংরাজ রাজপুরুষেরা, সমস্ত খ্যাতনামা ইংরাজ, এই কথারই পোষকতা করেন। আর অধিক দৃষ্টান্তের প্রয়োজন নাই, একটি ইংরাজি সংবাদপত্রের সম্পাদক আমাদের নিকট যে কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যেখানেই আমরা একটু উস্কাইয়া দিয়া ইংরাজের মনের কথা বাহির করিয়াছি, সেইখানেই সেই সব উক্তির মধ্যে পরস্পর নৈকট্য লক্ষিত হইয়াছে। "অবশ্য, ভারতবাসীরা এ কথা বলিতে পারে যে, তাহারা আমাদিগকে তাড়াইতে ইচ্ছা করে না, কেন না, আমরা তাহাদের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক। আমাদের থাকাতে যে সুবিধা, সে সুবিধাটুকু ভারতবাসীরা খোয়াইতে চাহে না, তাহারা আমাদের দ্বারা শুধু 'পুলিস্‌ম্যানে'র কাজ করাইয়া লইতে চাহে। তাহারা রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় তত্ত্বকথার শিক্ষাগুরু হইতে চাহে, এবং ভারতরাজ্যের লেখনী ও বাক্‌-যন্ত্র নিজায়ত্ত করিতে চাহে। আমাদের সমস্ত অধিকার যদি তাহাদিগকে ছাড়িয়া দি, তবেই তাহাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এইরূপ হইলে, ব্রাহ্মণ-যুবকেরা বন্যার মতো আসিয়া আমাদের কর্ম্মপ্রার্থিগণের স্থান অধিকার করিবে।

কিন্তু ইহা জানা উচিত যে, আমরা যদি আমাদের নিজস্ব অধিকার রক্ষা করি, তবেই ভারতের সাধারণ স্বার্থ রক্ষিত হইবে। কেন না, আমাদের স্বজাতীয়েরাই এদেশকে একতা, শান্তি, ন্যায়বিচার ও সুনীতি প্রদান করিতে সক্ষম। আর, আমরা যদি এই দেশের প্রভু হইয়া থাকি, তবেই সম্যক্‌রূপে এই কর্ত্তব্যটি পালন করিতে আমরা সমর্থ হইব।"

—"তবে কি তোমার বিশ্বাস, ভারতে য়ুরোপীয় তত্ত্বাবধান আবশ্যক?"

—"না, য়ুরোপীয় নহে—ইংরাজের তত্ত্বাবধান আবশ্যক, সুনীতিমূলক তত্ত্বাবধান আবশ্যক।"

প্রায়ই উক্তরূপ প্রত্যুত্তর ইংরাজদিগের মুখে শুনা যায়। কেন না, ইংরাজেরা য়ুরোপীয় দৃষ্টিতে কিছুই দেখিতে ভালবাসে না; অন্যান্য পাশ্চাত্যজাতির সহিত উহারা একদলভুক্ত হইতেও চাহে না। তাহাদের দ্বারা ভারতে যে সভ্যতাবিস্তার হইতেছে, তাহাদের মতে, উহা 'ইঙ্গ-স্যাক্‌সন্‌'-সভ্যতা।"

এক্ষণে আমরা ইংরাজ শাসনপদ্ধতির নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলাম; কিসে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের স্বার্থসাধন ও ব্রিটেনীয় ধনভাণ্ডারের পরিপূর্ত্তি হয়, তাহাই এই শাসনপদ্ধতির পক্ষপাতিগণের একমাত্র চিন্তা। তাঁহারা বলেন, পার্লেমেণ্ট্‌-পদ্ধতি অপেক্ষা "জ্ঞানালোক-সমন্বিত অনিয়ন্ত্রিত কর্ত্তৃত্ব"ই ভারতের উন্নতিসাধনপক্ষে শ্রেষ্ঠতর উপায়।

ফলত, ইংরাজ-সরকার আধুনিক য়ুরোপের শাসনসংক্রান্ত মূলসূত্রগুলি মানিয়া চলেন এবং আসিয়াবাসিসুলভ পুরাতন পদ্ধতি অনুসারে প্রজাশোষণনীতি অনুসরণ করাও উচিত বোধ করেন না। প্রতিবাদকারীদিগের সহিত তাঁহাদের মূলে কোন মত-

ভেদ আছে, এরূপ বোধ হয় না; যাহা-কিছু মতভেদ, সে কেবল পদ্ধতি লইয়া ও পাত্রাপাত্র লইয়া। এক্ষণে ইংরাজশাসন ভারতবর্ষে পূর্ণবলে প্রতিষ্ঠিত; কেন না, ভারতবর্ষ জাতি-ভেদে বিভক্ত এবং ইংলণ্ডের লোক-মতও বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির সম্পূর্ণ অনুকূল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সার সত্যের আলোচনা।

ভিতর-মহলে প্রবেশের উদ্যোগ।

পূর্ব্ব প্রবন্ধের শেষভাগে সংক্ষেপে একটি কথা বলা হইয়াছিল এই যে, "আত্মার একত্ব জ্ঞেয়স্থানে অর্থাৎ জ্ঞানচক্ষুর সম্মুখে দেখিতে হইবে। বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইবে; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে একীভূত করিয়া দেখিতে হইলে হিরণ্ময় কোষে লক্ষ্য নিবিষ্ট করা আবশ্যক।" এই কথাটির আশপাশের পরিধিমহলে ঘোরাফেরা হইয়াছে অনেক—এক্ষণে উহার ভিতর-মহলের কপাট উদ্ঘাটন করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই চেষ্টা দেখা যা'ক্।

পোঁট্‌লা-পুঁট্‌লি বাঁধিয়া যাত্রিগণ প্রয়াণ-পথে চলিয়াছেন—অতি উত্তম। কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য হ'চ্চে গম্য-স্থানে যাওয়া। গম্যস্থান কোন্ স্থান্? গম্যস্থান হ'চ্চে আনন্দ;—নির্ম্মল আনন্দ, সজাগ আনন্দ, প্রশান্ত আনন্দ, পরমানন্দ। যাওয়া হইতেছে কোন্ পথ দিয়া? তত্ত্ব-জ্ঞানের পথ দিয়া। তত্ত্বজ্ঞান-পথের পাথেয়-সম্বল কি? পাথেয়-সম্বল হ'চ্চে মূলতত্ত্ব। মূলতত্ত্ব কাহাকে বলে? মূলতত্ত্ব হ'চ্চে সেই তত্ত্ব, যাহা তত্ত্বজ্ঞানের অনুশীলনের সময় গোড়াতেই (অর্থাৎ পহিলা নম্বরেই) স্বীকার্য্য। দৃষ্টান্ত দেখাও। জ্ঞাতৃজ্ঞান-জ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব; কেন না, আত্মজ্ঞান বলিবামাত্রই বুঝায় যে, সে-জ্ঞানের জ্ঞাতাও আপনি—জ্ঞেয়ও আপনি। তবেই হইতেছে যে, আত্মজ্ঞানের অনুশীলনকালে জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য গোড়াতেই স্বীকার্য্য; এইজন্য বলিতেছি যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব। আত্মজ্ঞানের মূল-তত্ত্ব—কিন্তু আর-আর জ্ঞানের কোন্ তত্ত্ব? যাহা আত্মজ্ঞানের মূলতত্ত্ব, তাহা সকল জ্ঞানেরই মূলতত্ত্ব। প্রমাণ কি? প্রণিধান করা হো'ক্:—

জ্ঞানের কার্য্যই হ'চ্চে সত্যকে প্রকাশ করা। সত্য কি? না, যাহা "আছে" বলিয়া ধ্রুব প্রতীয়মান, তাহাই সত্য। কিন্তু "আছে" দেখা-কথা। দেখা-কথা'র মূলে হওয়া-কথা থাকা চাই; আছে'র মূলে আছি থাকা চাই; জগতের মূলে আত্মা থাকা চাই। অতএব এটা যখন সুনিশ্চিত যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য আত্মার মূলতত্ত্ব, তখন সেইসঙ্গে এটাও সুনিশ্চিত যে, আত্মার ঐ যে মূলতত্ত্ব জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য,

উহা সর্ব্বজগতেরই মূলতত্ত্ব; কেন না, সর্ব্বজগতেরই মূলে আত্মা জাগিতেছে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মাই সত্য এবং সত্যই আত্মা। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, বস্তুসকলের উপরে-উপরে ভাসিয়া বেড়াইলে সত্যে পৌঁছানো যায় না—বস্তুসকলের আত্মাতে ডুব দিলেই সত্যের উপলব্ধি পাওয়া যায়।

এ কথা খুব ঠিক্ যে, জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের ঐক্য সর্ব্বজগতেরই মূলতত্ত্ব, কিন্তু ঐ মূলতত্ত্বটি মস্তিষ্কের ভাণ্ডারে চাবি দিয়া রাখিবার জন্য হয় নাই—কাজে খাটাইবার জন্যই হইয়াছে। কোন্ স্থানে খাটাইতে হইবে? ঐ মূলতত্ত্বটির প্রয়োগ-ক্ষেত্র দুইটি—

একটি হ'চ্চে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড, আরেকটি হ'চ্চে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড। কোন্ কাজে খাটাইতে হইবে? উহাকে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে; বৃহৎব্রহ্মাণ্ডে প্রয়োগ করিয়া বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য অবধারণ করিতে হইবে। এই স্থানটিতে টিপ্পনীচ্ছলে একটি কথা বলিয়া রাখা নিতান্তই আবশ্যক মনে করিতেছি; কথাটি এই:—বৃহৎব্রহ্মাণ্ডকে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড বলা হইতেছে শুদ্ধকেবল ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের সহিত তুলনার অনুরোধে; প্রকৃত কথা এই যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের নামই সর্ব্বজগৎ এবং সর্ব্বজগতের নামই বৃহৎব্রহ্মাণ্ড। সর্ব্বজগতের বাহিরে তো আর দ্বিতীয় জগৎ থাকিতে পারে না—বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড থাকিবে কেমন করিয়া? ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে নাই—কিন্তু আছে তাহাতে আর ভুল নাই; কেন না, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড আমরা আপনারাই। তবেই হইতেছে যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত।

এই যে কথাগুলি বলা হইল, ইহার অন্ধিসন্ধি প্রদেশগুলা ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা যা'ক্।

বলিলাম যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ড বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে নাই—ভিতরে আছে; এ যাহা বলিলাম, এটা এক হিসাবের কথা। আর-এক হিসাবের কথা এই যে, বৃহৎব্রহ্মাণ্ডও ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে আছে। পুরাণে গল্পচ্ছলে কথিত হইয়াছে যে, বালক-কৃষ্ণকে মাটি খাইতে দেখিয়া যশোদা-মাতা তাঁহাকে যখন হাঁ করিতে বলিলেন, তখন বালক যেম্নি হাঁ করিল, যশোদা-মাতা কি দেখিলেন? তিনি দেখিয়া অবাক্—যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই ক্ষুদ্র বালকটির উদরের অভ্যন্তরে। একথার তাৎপর্য্য আর-কিছু না—সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যশরীরে একই সার্ব্বাত্মিক ঐক্য মস্তকে যোগাসনে উপবিষ্ট, হৃদয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট, নাভিকেন্দ্রে কর্ম্মাসনে উপবিষ্ট। ইহাতে প্রকারান্তরে বুঝাইতেছে এই যে, শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মস্থানে সমস্ত শরীর অন্তর্ভূত। তার সাক্ষী—যখন মাথা কাজ করে, তখন মাথার মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে; যখন হৃদয় কাজ করে, তখন হৃদয়ের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে; যখন হস্তপদ কাজ করে, তখন হস্তপদের মধ্য দিয়া সমস্ত শরীর কাজ করে। তবেই হইল যে, শরীরের প্রত্যেক মর্ম্মগ্রন্থির অভ্যন্তরে সমস্ত শরীর জাগিতেছে। এই যে

একটি লোকপ্রসিদ্ধ কথা যে, পরমাত্মা ঘটে-ঘটে বিরাজমান, এ কথার অর্থও তাই। সার্ব্বাত্মিক ঐক্যসূত্রে ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে-মর্ম্মে বৃহৎব্রহ্মাণ্ড জাগিতেছে বলিলেই বুঝায় যে, ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা জীবাত্মার অভ্যন্তরে বৃহৎব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাতা পরমাত্মা জাগিতেছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তাহাই যদি হইল, পরমাত্মা যদি ঘটে-ঘটে বিরাজমান—তবে সাধনভজনের প্রয়োজন কি? পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্যই তো সাধন-ভজন; তিনি যদি সাধকের হৃদয়ের অভ্যন্তরে আছেন—তবে তো তিনি সাধকের মুঠার মধ্যেই আছেন; আবার কেন তবে সাধন-ভজন? তুমি যে রত্ন চাহিতেছ, তাহা তোমার আঁচলে বাঁধা রহিয়াছে—তবে কেন তাহার জন্য এতশত সাধ্যসাধনা? এ কথার একটা মীমাংসা করার নিতান্তই প্রয়োজন। ইহার মীমাংসা এইরূপ:—

তুমি যে বলিতেছ, পরমাত্মাকে লাভ করিবার জন্য সাধাসাধনার প্রয়োজন কি? "লাভ করা" বলিতেছ কাহাকে? লাভ করা অর্থাৎ পাওয়া। চাওয়া ব্যতিরেকে "পাওয়া" কথাটার কোনো অর্থ হইতে পারে কি না? মনে কর যে, ফিন্‌কি-ফিন্‌কি বৃষ্টি পড়িতেছে—আর সেই সময়ে একজন তৃষ্ণার্ত্ত পথিক এক-গণ্ডূষ জলের জন্য হাত বাড়াইল; কিন্তু তাহার অঞ্জলিপুটে এক-ফোঁটা জল পড়িল, আর, তাহার পরেই বৃষ্টি ধরিয়া গেল। পথিক বলিল—"জল পাইলাম না"; তাহার কিয়ৎ পরে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল; পথিক হাত পাতিবামাত্রই এক-গণ্ডূষ জল পাইল। তখন পথিক বলিল—"জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম।" পূর্ব্বে তাহারই হস্তে এক-ফোঁটা জল নিপতিত হইয়াছিল এবং এক্ষণে তাহারই হস্তে এক-গণ্ডূষ জল নিপতিত হইল। অথচ সেবারে পথিক বলিয়াছিল—"জল পাইলাম না", এবারে বলিল—"জল পাইয়া প্রাণ পাইলাম"। দুই বারের দুইরকম কথার তাৎপর্য্য কি? সেবারে পথিক যাহা চাহে নাই, তাহাই তাহার হস্তে পড়িয়াছিল; এবারে পথিক যাহা চাহে, তাহাই তাহার হস্তে পড়িল;—এই তাহার তাৎপর্য্য। পাওয়ার সহিত চাওয়ার এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। চাওয়া তিনরূপ;—প্রাণের চাওয়া, মনের চাওয়া এবং বুদ্ধির চাওয়া। প্রাণের চাওয়া হ'চ্চে ব্যাকুলতা, মনের চাওয়া হ'চ্চে অনুসন্ধান, বুদ্ধির চাওয়া হ'চ্চে অবধারণ। মনে কর, ত্রিপান্তর মাঠের মাঝখানে পথিকের প্রাণ জলের জন্য ব্যাকুল হইল; মন জলের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সম্মুখে একটা নদীর মত দৃশ্য দেখিল, কিন্তু তাহা মরীচিকাও হইতে পারে, জলও হইতে পারে। মন বলিতেছে, উহা মরীচিকা কি জল, তাহা আমি জানিও না, জানিতে চাহিও না; জলেই আমার প্রয়োজন—মরীচিকায় আমার প্রয়োজন নাই, অতএব উহা জলই। শেক্‌স্‌পিয়র্‌ এক স্থানে বলিয়াছেন "এটা তোমার মনের ইচ্ছানুযায়ী চিন্তা—তোমার Wish is father to thy thought, ইচ্ছাই তোমার চিন্তার জনয়িতা।" মন বাসনা-কেই সর্ব্বাগ্রে বরণ করিয়া সত্যাসত্যের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। বুদ্ধি কিন্তু মনের মন-ভুলানিয়া কথায় সন্তোষ মানিতে পারে না। বুদ্ধি বলে, "যাহা দেখা যাইতেছে, তাহা

সত্যাসত্যই জল কি মরীচিকা, তাহা সর্ব্বাগ্রে বিবেচ্য।* এখন বক্তব্য এই যে, ব্যাকুলতার ধাপ হইতে অনুসন্ধানের ধাপ এবং অনুসন্ধানের ধাপ হইতে অবধারণার ধাপে উঠিয়া যখন ইষ্টবস্তুকে হস্তে নাগাল পাওয়া যায়, তখন তাহারই নাম প্রকৃত পাওয়া। আপাতত ভক্তদিগের প্রাণের চাওয়া স্বভাবত কোন্ দিকে উন্মুখ হয়, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্, তাহার পরে তাহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে।

দিঙ্‌নিরূপণ।

এটা একটা দেখা কথা যে, ভক্তগণের প্রাণের চাওয়া যখন তাঁহাদের ইষ্টদেবতার প্রতি উন্মুখ হয়, তখন তাঁহাদের চক্ষের চাওয়া স্বভাবতই আকাশের প্রতি নিবিষ্ট হয়। ভক্তেরা পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী জানিয়াও তাঁহাকে ডাকিবার সময়, বা স্মরণ করিবার সময়, বা ভজনা করিবার সময় করজোড়ে উপরে দৃষ্টিপাত না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তা ছাড়া, সৃষ্টির এক আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাওয়া যায় এই যে, বৃক্ষের মূল ভূতলে প্রোথিত; সরীসৃপ জন্তুদিগের শরীর ভূপৃষ্ঠে অবলুণ্ঠিত; গো-মেষাদির শরীর পৃথিবী হইতে অর্দ্ধোন্নত; মনুষ্যের শরীর পূর্ণসমুন্নত। মনুষ্য বৃক্ষের ঠিক্ উল্টাপিট এবং অন্যান্য জন্তুরা দুয়ের মধ্যবর্ত্তী। তার সাক্ষী—বৃক্ষের মস্তক নিম্নমুখ, হস্তপদ বা ডালপালা ঊর্দ্ধমুখ, মনুষ্যের মস্তক ঊর্দ্ধমুখ, হস্তপদ নিম্নমুখ। মনুষ্যের মস্তক যেমন স্বভাবতই ঊর্দ্ধমুখ, ভক্তগণের প্রাণের চাওয়াও তেমনি স্বভাবতই ঊর্দ্ধমুখ। উপনিষৎশাস্ত্রে স্পষ্ট লেখা আছে যে, "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি স্বরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্ব্বদা দেখেন সূরিগণ—গগনমণ্ডলে যেন চক্ষু আতত। অর্থাৎ গগনমণ্ডল যেন চ[illegible] স্মান্।*

* এখানে ভাষাসম্বন্ধে দুইটি কথা বক্তব্য। প্রথম কথা এই যে, আকাশশব্দের প্রকৃত অর্থ গগন নহে; আকাশশব্দের প্রকৃত অর্থ ইংরাজিতে যাহাকে বলে space। তেমনি দ্যৌ-শব্দের অর্থ space বা আকাশ নহে; দ্যৌ-শব্দের অর্থ sky বা heaven। এইজন্য "দিবি"-শব্দের অর্থ আমি "আকাশে" না করিয়া, করিলাম "গগনমণ্ডলে"। দুঃখের বিষয় এই যে, স্বর্গীয় খ্যাতনামা রাজেন্দ্রলাল মিত্র পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের ইংরাজি অনুবাদ করিতে গিয়া স্বরচিত পুস্তকের স্থানে স্থানে আকাশ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন sky। ঘটাকাশ কি ঘটাবচ্ছিন্ন sky? ঘটাকাশশব্দের অর্থ ঘটাবচ্ছিন্ন space, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। শাস্ত্রীয় বচনসকলের ঐরূপ বিপরীত অর্থ ঘটাইলে শাস্ত্রের প্রাণে যে কিরূপ মর্ম্মান্তিক আঘাত করা হয়, তাহা বলিবার কথা নহে। অতএব, শাস্ত্রের অনুবাদ করিবার পূর্ব্বে কোন শব্দের কোন্‌টি মুখ্য অর্থ—কোন্‌টি গৌণ অর্থ—কোন্‌টি আদিম অর্থ—কোন্‌টি আধুনিক অর্থ—কোনটি বাঙালি অর্থ—কোন্‌টি সংস্কৃত অর্থ—এই সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ, পরীক্ষা এবং অনুসন্ধান করিয়া দেখা অনুবাদকের নিতান্তই কর্ত্তব্য। সংস্কৃতশব্দের বাঙালি অর্থ এবং সংস্কৃত অর্থের মধ্যে অনেক স্থলে প্রভেদ বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। উপন্যাসশব্দের বাঙালি অর্থ উপকথা, সংস্কৃত অর্থ hypothesis। যদি বল "কোথা হইতে পাইলে?" তবে শ্রবণ কর;—ন্যাস-শব্দের অর্থ স্থাপন করা। ন্যস্ত ধন কি? না, যাহা আপাতত কোনো ব্যক্তির হস্তে স্থাপন করা যায়; সে ধন কাহার প্রকৃত প্রাপ্য, তাহা পরে বিচার্য্য। উপন্যাস কি? না, যে কথা উপস্থাপিত করা যায় অর্থাৎ আপাতত আনিয়া দাঁড় করানো হয়;—তাহার সত্যাসত্য পরে বিচার্য্য। hypo = উপ, thesis = স্থাপন বা ন্যাস। hypothesis = উপস্থাপন বা উপন্যাস। পুঁথিগত বিদ্যার প্রধান একটি দোষ এই যে, "যাহা পুঁথিতে পাওয়া যায় না, তাহা মিথ্যা জল্পনা, সুতরাং উপকথারই সামিল" এইরূপ একটি ধারণা। বঙ্গীয় সাধুভাষার মূল-প্রণেতারা পুঁথিগত বিদ্যার বিদ্যাবাগীশ ছিলেন। তাঁহারা বৈজ্ঞানিক hypothesisএর মূল্য কিছুই বুঝিতেন না। সুতরাং hypothesis বা উপন্যাস তাঁহাদের নিকটে মিথ্যা জল্পনা ছাড়া—উপকথা ছাড়া—আর কিছুই হইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু সংস্কৃতগ্রন্থে "যদেতৎ ত্বয়া উপন্যস্তম্" ইহার

ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী—অথচ আমরা তাঁহাকে প্রাণ ভরে' ডাকিবার সময় স্বভাবতই উপরে দৃষ্টিপাত করি, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ দুই-এক ছত্রে বলিয়া বুঝাইবার কথা নহে; অতএব এবারে এইখানেই বিশ্রাম করা বিধেয়।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়।

২

অতি পুরাকাল হইতে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যের সুখৈশ্বর্য্যের কথা ভারতবর্ষে সুপরিচিত ছিল। পদ্মাবতীর তীরবর্ত্তী উত্তরবঙ্গের উর্ব্বরক্ষেত্র ধনধান্যে পরিপূর্ণ বলিয়া পার্ব্বত্য অসভ্য-জাতির উপদ্রবের অভাব ছিল না। তাহারা সময়ে সময়ে উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সহসা আপতিত হইয়া দেশলুণ্ঠন করিয়া পলায়ন করিত। এই উপদ্রব নিবারণের জন্য উত্তর-বঙ্গের অধিপতিকে নিয়ত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিতে হইত। উত্তরবঙ্গের পূর্ব্বাংশে সে-কালের কামরূপরাজ্য করতোয়া-নদীর পূর্ব্ব-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কামরূপের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ্যের যুদ্ধবিগ্রহের অভাব ছিল না। এই সকল বিপ্লবে নিয়ত বিপর্য্যস্ত হইয়া উত্তরবঙ্গ দীর্ঘকাল শান্তিসুখে বঞ্চিত থাকিয়া গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের অধিকার-ভুক্ত হয়। তৎকালে বিহার, মিথিলা, রাঢ়, বাগড়ী, বঙ্গ ও বরেন্দ্র এক শাসনক্ষমতার অধীন হইয়া আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তের বিখ্যাত সাম্রাজ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। এই সাম্রাজ্যের শাসনকৌশল ও বাহুবলের কথা এখনও কোন কোন পুরাতন খোদিত-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকল

অর্থ "এই যাহা তুমি উপন্যাস করিলে বা উপস্থাপন করিলে বা আনিয়া দাঁড় করাইলে" এ ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। hypothesis তো আর গাছে ফলে না;—যাহা আনিয়া দাঁড় করানো হয় এবং যাহার সত্যা-সত্য পরে বিচার্য্য—তাহারই নাম hypothesis। আমার জ্ঞানে আমি কোনো সংস্কৃতগ্রন্থে উপন্যাসশব্দ উপকথা অর্থে ব্যবহৃত হইতে দেখি নাই। আমাদের সেকালের আরব্য উপন্যাসের নাম কথাসরিৎসাগর; তা বই, তাহার নাম উপন্যাসসরিৎসাগর নহে। সংস্কৃতভাষায় উপাখ্যান বটে উপকথারই সহোদর। কিন্তু উপন্যাস-কথাটা (হেতু, নিগমন, সিদ্ধান্ত, দৃষ্টান্ত প্রভৃতির ন্যায়) ন্যায়শাস্ত্রের নিজাধিকারের গণ্ডির ভিতরকার কথা, তাহার অর্থ উপকথা হইতেই পারে না। উপন্যাস তো ন্যায়শাস্ত্রীয় কথা; অনেকানেক লৌকিক ব্যবহার্য্য সংস্কৃতকথার অর্থ বাংলা ভাষায় উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ঘৃণা-শব্দের অর্থ কৃপা, নির্ঘৃণ-শব্দের অর্থ নির্দ্দয়। নির্ঘৃণ-শব্দের অর্থ অনেকে বোঝেন এই যে, যাহার ঘেন্না নাই। ঘৃণিত-শব্দের গৌণ অর্থ নিন্দিত—তাহা তো হইতে পারে। ইংরাজিতেও বলা হইয়া থাকে pitiable case, miserable wretch ইত্যাদি। I pity you একথার ঠিক্ অর্থ এই যে, আমি তোমাকে ঘৃণা করি। কিন্তু I hate you এ কথার অর্থ স্বতন্ত্র। ঘৃণা এবং দ্বেষের মধ্যে বিশাল প্রভেদ। যাঁহারা তিন শ'কে এক শ করিয়াছেন, দুই ব'কে এক ব করিয়াছেন, দুই ন'কে এক ন করিয়াছেন, তাঁহারা যে, উপন্যাস এবং উপকথায় মিশাইয়া, ঘৃণা এবং দ্বেষে মিশাইয়া, আকাশে এবং গগনে মিশাইয়া খিচুড়ি পাকাইবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই!

কবিতানিবদ্ধ সুখপাঠ্য বর্ণনায় নানা অতিশয়োক্তি প্রবিষ্ট হইয়া থাকিলেও, তাহার মূলে কিছু-না-কিছু সত্যসংস্রব থাকা অসম্ভব হইতে পারে না। কিন্তু গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের এই প্রবল প্রতাপ দীর্ঘকাল অক্ষুণ্ণভাবে বর্ত্তমান থাকা বিশ্বাস করা যায় না। পাল-নরপালগণের সহিত সেন-ভূপালগণের সাম্রাজ্য লইয়া যে যুদ্ধকলহের সূত্রপাত হয়, তাহাতে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য আবার বিপ্লবের লীলাভূমি হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে পাল-নরপালগণের গৌড়ীয় সাম্রাজ্য সেনবংশোদ্ভব ভূপতিবর্গের করতলগত হয়। তাঁহারাই গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতি বলিয়া ইতিহাসে সুপরিচিত। কিন্তু কোন্ সেনভূপতির শাসনসময়ে বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গদেশে পদার্পণ করেন, তাহা অদ্যাপি নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হয় নাই। সাধারণত লাক্ষ্মণ্যসেনের শাসনসময়ে এই বিপ্লব সংঘটিত হইবার কথা ইতিহাসে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা সহজ নহে। কারণ লাক্ষ্মণ্যনামক কোন সেনবংশীয় নরপালের এ দেশের সিংহাসনে আরোহণ করিবার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সেনরাজবংশের ইতিহাস ক্রমে জনশ্রুতিমাত্রে পরিণত হইয়াছে। তাঁহারা কি সূত্রে কোন্ সময়ে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যে অধিকারাবস্তার করিয়া কিরূপে এদেশ হইতে অধিকারচ্যুত হন, তাহার সকল কথাই এখন উপকথার ন্যায় নিতান্ত বিস্ময়াবহ হইয়া উঠিয়াছে। ঘটক ও কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে এই রাজবংশের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্দ্বারা ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হয় না। এ পর্য্যন্ত যে সকল পুরাতন লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন আর কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বর্ত্তমান নাই। ঐ সকল প্রাচীনলিপি অবলম্বন করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায়,—কর্ণাটক্ষত্রিয়বংশে চন্দ্রবংশীয় বীরসেননামক কোন ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহারই বংশধরগণ কালক্রমে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। এই বীরসেন কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হন, তিনি কখনও এ দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন কি না, এ সকল বিষয়ে প্রাচীনলিপিতে কোন পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি কেহ কেহ অনুমানবলে বীরসেনকে আদিশূর বলিয়া কল্পনা করিতে ত্রুটি করেন নাই। সমস্ত পুরাতন-লিপিতে বীরসেন সেনবংশের সুবিখ্যাত আদিপুরুষ বলিয়া উল্লিখিত; কিন্তু তিনি কোন্ পুরাকালে বর্ত্তমান ছিলেন, তাহার পরিচয় কোন স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

লক্ষ্মণসেনদেব যে সকল তাম্রশাসন খোদিত করাইয়াছিলেন, তাহাতে বীরসেনের নাম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি চন্দ্রবংশের সুবিখ্যাত নৃপতিকুলে সেনরাজবংশের ক্ষেত্রস্বরূপ হেমন্তসেনের জন্মগ্রহণ করিবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথাঃ—

> সেবাবনম্রনৃপকোটিকিরীটরোচি-
> রম্বুল্লসৎপদনখদ্যুতিবল্লরীভিঃ।
> তেজোবিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্
> ভূমিভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে॥
> আকৌমারবিকস্বরৈর্দিশি দিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ-
> প্রালেয়ৈ রিপুরাজবক্ত্রনলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।

হেমন্তঃ স্ফুটমেব সেনজননক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী-
শালিশ্লাঘ্যবিপাকপীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥"

এই হেমন্তসেনের পুত্রের নাম বিজয়সেন। তিনি "বিজয়ী" বিশেষণে বর্ণিত হইয়াছেন। বিজয়সেনদেব রাজসাহীর অন্তর্গত বরেন্দ্রভূমে প্রদ্যুম্নেশ্বরনামক-শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহাতে যে ফলকলিপি সংযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কৃত হইয়া এসিয়াটিক্-সোসাইটি-কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়াছে। উক্ত ফলকলিখিত কবিতাবলী সুবিখ্যাত উমাপতির রচিত বলিয়া ফলকে খোদিত আছে। তদনুসারে বিজয়সেনদেবের বরেন্দ্রভূমে অধিকার স্থাপন করা জানিতে পারা যায়। বিজয়সেনের পুত্র স্বনামখ্যাত বল্লালসেন যে "দানসাগর"নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে পিতা বিজয়সেনের বরেন্দ্রভূমে প্রাদুর্ভূত হইবার কথা লিখিত আছে। এই সকল কারণে লক্ষণসেনের তাম্রশাসনে বিজয়সেনকে "বিজয়ী" বলিবার বিশেষ কারণ থাকা অনুমান করিতে হয়। এই সকল পুরাতন লিপি সমালোচনা করিয়া স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়,—সেনরাজবংশের বিজয়সেনদেবই বরেন্দ্রবিজয়ী প্রথম নরপতি। তাঁহার পুত্র বল্লাল ও পৌত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়রাজ্য সম্পূর্ণরূপে করতলগত করিয়া গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়সেনও গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করেন, কিন্তু তখনও সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য পালবংশের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

সেনরাজবংশের বিবিধ পুরাতন-লিপি আলোচনা করিয়া যে ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করা যায়, তাহাতে বিজয়, বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের সময়ে সেনসাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লক্ষ্মণসেনের সময়ে কাশীরাজ্য পর্য্যন্তও যে তাঁহার প্রবল প্রতাপ জয়যুক্ত হইয়াছিল, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে তাহারও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশ্বরূপের তাম্রশাসনে "স গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ" বলিয়া বর্ণনা পাঠ করিয়া স্বীকার করিতে হয়,—লক্ষ্মণের পুত্র বিশ্বরূপের সঙ্গে ঘোরীবংশীয়দিগের যুদ্ধকলহ উপস্থিত হইয়া বিশ্বরূপ জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং যবনগণ তাঁহাকে প্রলয়কালরুদ্ররূপে দর্শন করিতেন। মুসলমানের ইতিহাসে স্পষ্টত ইহার উল্লেখ না থাকিলেও, প্রকারান্তরে এই কথা স্বীকৃত হইয়াছে। কারণ মুসলমানলেখক মিন্‌হাজ-উদ্দীন বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ষষ্টি-বৎসর পরে এদেশে পদার্পণ করিয়া তখনও পূর্ব্ববঙ্গ সেনরাজবংশের অধিকারভুক্ত আছে, দেখিয়া গিয়াছেন। বাহুবলে বক্তিয়ার খিলিজির আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিলে, ইহা কদাচ সম্ভব হইত না।

লক্ষ্মণসেনের পর তদীয় পুত্রগণের শাসনসময়েই যে বক্তিয়ার খিলিজি এদেশে অধিকার-বিস্তারের আয়োজন করেন, পুরাতনলিপি অনুসরণ করিলে তাহাই বিশ্বাস করিতে হয়। কোন্ সময়ে বক্তিয়ার প্রথমে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাই এক্ষণে বিশেষভাবে আলোচনা করা আবশ্যক।

মুসলমানলিখিত ইতিহাসে খৃষ্টীয় ১২০৫ সালের সমকালে বক্তিয়ার খিলিজির নিহত হইবার কথা দেখিতে পাওয়া যায়; তৎপূর্ব্বে

তাঁহার দ্বাদশবৎসরকাল বঙ্গদেশ শাসন করিবার কথাও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই বর্ণনা সত্য হইলে, বক্তিয়ার খিলিজির ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে পদার্পণ করা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু মুসলমান-ইতিহাস সমালোচনা করিয়া বিশেষজ্ঞ মহাত্মা বিভারিজ ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দের সমসময়ে বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের কাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুলতানের নিকট হইতে লক্ষ্মণাবতী অধিকার করিবার ক্ষমতাপত্র পাইবার দ্বাদশবৎসর পরে বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া অনুমান করিতে পারিলে, সামঞ্জস্য রক্ষিত হইতে পারে। তদনুসারে ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে সনন্দলাভ, ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গাগমন ও ১২০৫ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন স্থির করিতে হয়। ইহাতে বঙ্গাগমনের উদ্যোগে ৫।৬ বৎসর, লক্ষ্মণাবতী-অধিকার ও শাসন-সংস্থাপনে ৫।৬ বৎসর অতিবাহিত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহার সহিত অষ্টাদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়কাহিনীর সামঞ্জস্য নাই।

এই দ্বাদশ বৎসরের ইতিহাসই প্রকৃতপক্ষে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করা আবশ্যক। মিথিলাপ্রদেশ একদা গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল; তথায় অদ্যাপি লক্ষ্মণসেনের সংবৎ প্রচলিত আছে। ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে উক্ত সংবৎ প্রচলিত হওয়া অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন। তাহা সত্য হইলে, ৮০ লক্ষ্মণ-সংবত্তের সমসময়ে বক্তিয়ারের বঙ্গদেশে পদার্পণ করা স্বীকার করিতে হয়। মিন্হাজের গ্রন্থেও এই কথাই লিখিত আছে। মিন্হাজ বলেন, এই সময়ে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন। তাহা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, লক্ষ্মণসেনদেবের পরিণত-বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বল্লাল ও লক্ষ্মণসেনের বিরচিত যে সকল কবিতা অদ্যাপি বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাতে এই প্রমাণ দেদীপ্যমান। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের পরিণতবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮০বৎসর রাজ্যভোগ করা সত্য হইলে, তাঁহার পরমায়ু অত্যধিক হইয়া পড়ে।

বল্লালসেন 'দানসাগর'নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণও কবি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনদেবের মহাসামন্তাধিপতি বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস ১২০৫ খৃষ্টাব্দের সমকালে নবদ্বীপে রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া "সদুক্তি-কর্ণামৃত" নামে যে কাব্যসংগ্রহ সঙ্কলিত করেন, তাহাতে লক্ষ্মণ ও তৎপুত্র মাধবসেনের কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে। ১২০৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্তও নবদ্বীপ যে মুসলমানের করতলগত হয় নাই, "সদুক্তি-কর্ণামৃত"ই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। লক্ষ্মণসেনের পুত্রদিগের মধ্যে মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপের নাম সুপরিচিত। মাধবের নাম সদুক্তি-কর্ণামৃতে, কেশবের নাম ঘটকদিগের গ্রন্থে ও বিশ্বরূপের নাম তাম্রশাসনে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই তিন পুত্র পিতৃরাজ্যের তিন বিভাগে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়। ঘটকদিগের গ্রন্থে কেশবের গৌড়ে প্রতিষ্ঠিত থাকার কথা স্পষ্টই লিখিত আছে। মাধব রাঢ়ে ও বিশ্বরূপ বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কেশবের যবনাক্রমণ-ভয়ে ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে পলায়ন করা

ঘটকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মাধব বোধ হয় বক্তিয়ারের পরলোকগমনের পর পরাজিত হইয়াছিলেন; কিন্তু সে কথা কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশ্বরূপ যবনাক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনতা-রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সকল প্রমাণের আলোচনা করিলে, বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে পলায়নকলঙ্কে কলঙ্কিত করিতে সাহস হয় না। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়েও আস্থাস্থাপন করা কঠিন হইয়া উঠে। রাঢ় ও বরেন্দ্র জয় করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই নবদ্বীপ জয় করিবার কথাও বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

বাঙ্গলার ইতিহাসের এই অংশ এখনও তমসাচ্ছন্ন। যে সকল তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি ও প্রাচীনপুস্তকে এই সময়ের ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা, সেগুলি জনসমাজে সুপরিচিত না থাকায়, বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে নানা কথা লিখিত হইয়া থাকে।

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলে, যে সকল বিষয় অধ্যয়ন ও আলোচনা করা আবশ্যক, তাহা শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ। যতদূর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে লক্ষ্মণসেনদেবের শাসনকাল সেনরাজবংশের ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল যুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই যুগে ধর্ম্মাধিকার হলায়ুধ, বৈয়াকরণ পুরুষোত্তম প্রভৃতি বিবুধমণ্ডলীর পাণ্ডিত্যে বরেন্দ্রদেশ ভারতবিখ্যাত হইয়াছিল; এই যুগে লক্ষ্মণসেনের বাহুবলে কাশী, কলিঙ্গ ও কামরূপ গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। বক্তিয়ার খিলিজি এই বিপুল সাম্রাজ্যের উত্তরাংশমাত্র অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন;—তজ্জন্য লক্ষ্মণাবতীতেই মুসলমানদিগের প্রথম রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

আশ্রয়।

শুনি দূরে শুনি কাছে তব গানে ছেয়ে আছে
শূন্য জল স্থল
সারাবিশ্ব অভিনব রূপের প্রভায় তব
করে ঢলঢল।
তোমার মধুর হাসি এ হৃদয়ে ঢালে আসি
অরুণ কিরণ
তব মুখগন্ধ ব'য়ে বিহ্বল পরাণ ল'য়ে
ভ্রমিছে পবন।

তুমি যে প্রেমের ভরে কাছে দূরে দিগন্তরে
ঘেরেছ আমায়
আমি তবু উদাসীন ভ্রমিতেছি লক্ষ্যহীন
নাহি দেখি তায়।
সহস্র ছলনারাশি শত বিদ্রূপের হাসি
কপট কঠিন
মুগ্ধ আঁখি অনিমেষ বুঝে না চাতুরীলেশ
ভুলে প্রতিদিন।

জগতেরে দিয়ে প্রাণ পাই শুধু অপমান
শুধু উপহাস
করুণার বিনিময়ে উপেক্ষা এনেছি ব'য়ে
ব্যর্থ অভিলাষ।
যেখানে স্বার্থের লেশ সখ্যের সেখানে শেষ
দেখি বহুবার
পাইয়াছি বহু ব্যথা কহিতে সহস্র কথা
অন্ত নাহি তার।

নিতান্ত আপন মম সুখে-দুঃখে তুমি সম
প্রীতির আধার
অচল নির্ভর তুমি করুণার পুণ্যভূমি
জগতের সার।
অন্ধ এ নয়ন মম দেখেনি অমৃতোপম
মূরতি তোমার
তাই গো পেয়েছি ক্লেশ লাঞ্ছনার অবশেষ
বেদনা অপার।

দূর করি অবসাদ বাঁধিব হৃদয়ে বাঁধ
তব রূপ দিয়া
হবে সুপ্রভাত হবে এস তুমি এস তবে
পূর্ণ কর হিয়া।
কর কাটি' খান-খান দুঃখ লজ্জা অভিমান
ঘৃণা ভয়রাশি

লিখ ভালে প্রীতি-লেখা হান গো বিজলী-রেখা
মোহতম নাশি'।

তব দিব্য কর হানি' কঠিন বেষ্টনী টানি'
রাখ মোরে রাখ
বিশ্ব হ'তে বহুদূরে আমার আনন্দপুরে
থাক একা থাক।
এ জীবন-নিশি-শেষে মধুবেশে মৃদু হেসে
দিয়ো পাশে স্থান
তুমি নিয়ো ভালবাসা হৃদয়ের প্রেম আশা
যেটুকু সম্মান।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

চাক্‌চন্দা।

খাস বাঙ্‌লায় সেকালের গুরুমহাশয়ের দিন-কাল গিয়াছে, কিন্তু বেহার-অঞ্চলে এখনও তিনি শিশুমহলের সম্রাট্। বঙ্গীয় পাঠ-শালার পোড়োরা চিরদিন গুরুকে যমের মত দেখিয়া আসিয়াছে, তাঁহার কঠোর শাসনা-ধীনে বালসুলভ চাপল্য এবং আমোদপ্রিয়তা প্রশ্রয় পাইত না। সে হিসাবে বেহারী গুরুজীকে অনেকপরিমাণে উদার বলিতে হইবে। "চাক্‌চন্দা"পর্ব্ব তাহার একটি বিশিষ্ট প্রমাণ।

নষ্টচন্দ্রের দিন—বেহারে ফসলী ভাদ্রের ৪ঠা তারিখ—চাক্‌চন্দা-পরব। সুধাকর কি অপরাধে সেদিন "নষ্ট" আখ্যা লাভ করেন, অনুসন্ধানে ঠিক্ জানিতে পারি নাই; কিন্তু ইহা স্থির যে, বাঙ্‌লা, বেহার, উড়িষ্যায় হিন্দু-মুসলমানে সেদিন তাঁহার দর্শন দুরপ-নেয়-কলঙ্ক-জনক মনে করে। সকলেই জানেন, দুষ্টছেলে এবং দুষ্টতর যুবকদের জ্বালায় সে রাত্রে বঙ্গে গৃহস্থবাড়ীতে লাউ, কুমড়া, শসা গাছের রক্ষা নাই। বেহারে সে সব কিছু শুনিতে পাই না। তবে ছেলে-বুড়ায় একজোট হইয়া সে রাত্রে তাহারা প্রতিবেশিগৃহে লোষ্ট্রনিক্ষেপ করে এবং ইহা একটি সনাতন প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কবি বিদ্যাপতি সখীমুখে রাধিকাকে বলিয়াছিলেন—

"চান্দক আছয়ে ভেদ কলঙ্ক।
ও যে কলঙ্কী তুহ নিষ্কলঙ্ক॥"

তথাপি কোন শশিমুখী স্ত্রীকবির কথায় বলিতে হয়—

"তোর সঙ্গে কইব না কথা
তুই পরনিন্দুকী।
ও তুই অমন সাধের চাঁদকে
বলিস্ চাঁদা কলঙ্কী॥"

"চাকৃচন্দা"-পরবের কথা হইতেছিল। বেহারে ছেলেদের সেদিন ভারি আমোদ এবং লালাজী গুরুদেব তাহাতে যোগদান করিয়া বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন করেন।

গণপতির পৃথক্ ভাবে পূজা-অর্চ্চনা বঙ্গ-দেশে প্রচলিত নাই। বেহারে এই চাকৃচন্দা-পর্ব্বোপলক্ষে "গুরুপিণ্ডায়" তিনি পূজা পাইয়া থাকেন। পূজার সকল উদ্যোগ-আয়োজন ছেলেদেরই করিতে হয়। তাহারা প্রত্যেকে স্ব স্ব গৃহ হইতে পুষ্প, ধূপ, পান, সুপারি, মিষ্টান্ন এবং খেলিবার জন্য হস্তপরিমিত বিচিত্রবর্ণের দুই দুই কাঠের ডাণ্ডা আনিয়া পূজার থালি ভরিয়া দেয়। অপরাহ্ণে পূজা-শেষে শিশুরা আপন আপন ডাণ্ডা ফিরাইয়া লয় এবং উহা যুগপৎ বাজাইতে বাজাইতে সমস্বরে গণেশজীর জয়গীতি উচ্চারণ করে। সেইভাবে তাহারা গুরুমহাশয়ের সঙ্গে ভ্রমণে বাহির হয়। তিনি তাহাদের প্রত্যেকের গৃহে পদার্পণ করিয়া উৎফুল্ল পিতামাতার নিকট পুরস্কার লাভ করেন। শুনিয়াছি, নগদ মুদ্রা ছাড়া এই উপলক্ষে তৈজস-বস্ত্রাদিও প্রচুরপরিমাণে গুরুজীর গৃহজাত্ হইয়া থাকে।

চাকৃচন্দায় ছেলেরা যে শ্লোক গান করে, তাহার দুইটি নমুনা দিতেছি।

(১)

ভাদো চউঠ গণেশকি আই।
বীচ্ আঙ্গনা বীচ্ কুঁয়া খনাই।
কুঁয়াপর দু চম্প লাগাই॥
যো যো কুঁয়া রাহার লিজ্জে।
সব চটীয়ানকো পূজা দিজীয়ে॥
ডিব্বী যোড়ি তুম্ চড়াম।
সাত পঁচাত্তর গহনা লাম।
এক পঁচাত্তর ঠিক্ ঠিকাম॥
হাঁতি উপর লাদে বোর।
হাত লিয়া সোণেকি তীর॥
গঙ্গাজীসে ঝাড়ু লিয়া।
যে ঝাড়ু কানু নিয়া কো দিয়া॥
সে কানু নিয়া ফুটাহা দিয়া।
সো ফুটাহা ঘাঁসগাঢ়া কো দিয়া॥
ঘাঁসগাঢ়া বেচারা ঘাঁস দিয়া।
সো ঘাঁসনে গৌকে দিয়া॥
গৌ বেচারী দুধা দিয়া।
সে দুধনে মোউর কো দিয়া॥
মোউর বেচারা পাঁখ দিয়া।
সো পাঁখনে রাজাকো দিয়া।
রাজা বেচারা ঘোড়া দিয়া॥
সে ঘোড়ানে আরপার।
তিস্পর চঢ়ে মিয়া দুলার॥
মিয়া দুলারকে লম্বি ছুরী।
থরথর কাঁপে যমুনাপুরী॥
যমুনাপুরীকে আয়ামীর।
মার গেয়া সোণেকা তীর।
ওসি কোমরসে নও সে তীর॥
এক তীর সেই মাঙ্গ্ লিয়া।
বড়াসাহেবকা নাম লিয়া॥
মারতা হুঁজী মারতা হুঁ।
ডিব্বী ছোড় ফুকারতা হু॥
তেরে ডিলিয়া লোটপোট।
মার মোগালিয়া পহিলি চোট॥
পহিলি চোট কি আগান মাগান॥

বীচ্ লহর বীচ্ পানি পিজীয়ে।
গঙ্গাজীকে ধারা লিজীয়ে।
পানকা পান বাট্টা লিজীয়ে॥
হাজিপুরকা ঘোড়া লিজীয়ে।
ঘোড়েকা আসবাব লিজীয়ে॥

(২)

শ্রীগণেশজী চঢ়ে উৎরঙ্গ।
নওসে মোতি ঝলকে রঙ্গ॥
এক মোতি হর তালা তালা।
যাঁহা পঢ়াওৎ পণ্ডিত্ লালা॥
পণ্ডিত্ লালা দিয়া আশীষ।
জীও গুর্ ছাতর লাখ্ বরিষ॥
লাখ্ লাখ্ সো তাক্ মাঙ্গায়া।
ডিল্লী সো গজমোৎ মাঙ্গায়া॥
পহিনো ওঢ়ো করো সিঙ্গার।
দুষমন-ছাতি পরে আঙ্গার।
দুষমন্কে দু ছাতি ভরি।
বীচ্ মাঙ্গ বীচ্ মোতি ভারি॥
লালা লালা হৈ সোণেকি মালা।
হৈ সোণেকি ডাণ্টি।
লোহার চার খাট্টি॥
লোহার চার চোখা।
ডিল্লীসে ঝরোখা॥
দরিয়াসে লাগাই॥
দরিয়া নদী নালা।
যোবনকে হাঁত মালা।
ভবুৎ চার পেয়ালা॥
ভবুৎকে হাঁত ছাপ্পে।
দুচার মোতি লাগ্‌গে॥
ছোট কি কে হাঁত কালি॥
বড় কি কে হাঁত রেজা।
ভগবান দাস নে ভেজা॥
ভগবান দাস হালুয়াই।
তেরে মিঠে মিঠাই॥
দোকান চঢ়ে যাই।
লাড্‌ডু চুন্ চুন্ খাই॥
গুরু শঙ্কাদাস তামোলি।
পীঠ্ ভোরি চোলি॥
চোলি উপর ছিট্‌কা।
শ্রীগণেশজী ঝট্‌কা॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চাকৃচন্দার দিন সন্ধ্যার পর গৃহস্থবাড়ী ঢিল ছুড়িয়া মারা ছেলেদের একটা আমোদ। শিশুদের পক্ষে পাঁচ-পাঁচটি মাত্র ঢিল ফেলিবার ব্যবস্থা এবং তাহা মারাত্মক হইবার কথা নহে। কিন্তু যুবক ও প্রৌঢ়েরা পর্য্যন্ত তাহাতে যোগ দিয়া আনন্দটাকে বীভৎস করিয়া তোলে।

সহরে প্রশস্ত রাজপথে বাদ্যভাণ্ডের তালে তালে বিচিত্রবর্ণের কাষ্ঠদণ্ড বাজাইয়া দলে দলে সুসজ্জিত সুকুমার শিশুরা যখন গুরুজীদের পশ্চাতে পশ্চাতে গণেশজীর গান গাহিয়া চলে, সে বড় সুন্দর দৃশ্য। ফল্গুনদীর তীরে ক্ষুদ্র শৈলের উপর দাঁড়াইয়া সেদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আমরা এই মানবকসেনার পরিক্রমণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র মজুমদার।

নৌকাডুবি।

২১

যোগেন্দ্র কহিল, "রমেশ, এই মেয়েটি কে ?"

রমেশ কহিল—"আমার একটি আত্মীয়।"

যোগেন্দ্র কহিল—"কি রকমের আত্মীয় ? বোধ হয় গুরুজন কেহ হইবেন না, স্নেহের সম্পর্কও বোধ হইল না। তোমার সকল আত্মীয়ের কথাই ত তোমার কাছ হইতে শুনিয়াছি,—এ আত্মীয়ের ত কোন বিবরণ শুনি নাই।"

অক্ষয় কহিল—"যোগেন, এ তোমার অন্যায়,—মানুষের কি এমন কোন কথা থাকিতে পারে না, যাহা বন্ধুর কাছেও গোপনীয় ?"

যোগেন্দ্র। কি রমেশ, অত্যন্ত গোপনীয় নাকি ?

রমেশের মুখ লাল হইয়া উঠিল—সে কহিল, "হাঁ গোপনীয়। এই মেয়েটির সম্বন্ধে আমি তোমাদের সঙ্গে কোন আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি না।"

যোগেন্দ্র। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, আমি তোমার সঙ্গে আলোচনা করিতে বিশেষ ইচ্ছা করি। হেমের সহিত যদি তোমার বিবাহের প্রস্তাব না হইত, তবে কার সঙ্গে তোমার কতটা-দূর আত্মীয়তা গড়াইয়াছে, তাহা লইয়া এত তোলাপাড়া করিবার কোন প্রয়োজন হইত না—যাহা গোপনীয়, তাহা গোপনেই থাকিত।

রমেশ কহিল, "এইটুকু-পর্য্যন্ত আমি তোমাদিগকে বলিতে পারি, পৃথিবীতে কাহারো সহিত আমার এমন সম্পর্ক নাই, যাহাতে হেমনলিনীর সহিত পবিত্র সম্বন্ধে বদ্ধ হইতে আমার কোন বাধা থাকিতে পারে!"

যোগেন্দ্র। তোমার হয় ত কিছুতেই বাধা না থাকিতে পারে—কিন্তু হেমনলিনীর আত্মীয়দের থাকিতে পারে। একটা কথা আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যার সঙ্গে তোমার যেরূপ আত্মীয়তা থাক্ না কেন, তাহা গোপনে রাখিবার কি কারণ আছে ?

রমেশ। সেই কারণটি যদি বলি, তবে গোপনে রাখা আর চলে না। তুমি আমাকে ছেলেবেলা হইতে জান—কোন কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়া শুদ্ধ আমার কথার উপরে তোমাদিগকে বিশ্বাস রাখিতে হইবে।

যোগেন্দ্র। এই মেয়ের নাম কমলা কি না ?

রমেশ। হাঁ।

যোগেন্দ্র। ইহাকে তোমার স্ত্রী বলিয়া পরিচয় দিয়াছ কি না ?

রমেশ। হাঁ দিয়াছি।

যোগেন্দ্র। তবু তোমার উপরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে ? তুমি আমাদিগকে জানাইতে চাও, এই মেয়েটি তোমার স্ত্রী নহে ; অন্য সকলকে জানাইয়াছ, এই তোমার স্ত্রী—ইহা ঠিক সত্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত নহে।

অক্ষয়। অর্থাৎ বিদ্যালয়ের নীতিবোধে এ দৃষ্টান্ত ব্যবহার করা চলে না—কিন্তু ভাই যোগেন, সংসারে দুই পক্ষের কাছে দুইরকম কথা বলা হয় ত অবস্থাবিশেষে আবশ্যক হইতে পারে। অন্তত তাহার মধ্যে একটা সত্য হওয়াই সম্ভব। হয় ত রমেশবাবু তোমাদিগকে যেটা বলিতেছেন, সেইটেই সত্য।

রমেশ। আমি তোমাদিগকে কোন কথাই বলিতেছি না। আমি কেবল এই কথা বলিতেছি, হেমনলিনীর সহিত বিবাহ আমার কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ নহে। কমলাসম্বন্ধে তোমাদের সঙ্গে সকল কথা আলোচনা করিবার গুরুতর বাধা আছে—তোমরা আমাকে সন্দেহ করিলেও সে অন্যায় আমি কিছুতে করিতে পারিব না। আমার নিজের সুখ-দুঃখ মান-অপমানের বিষয় হইলে আমি তোমাদের কাছে গোপন করিতাম না—কিন্তু অন্যের প্রতি অন্যায় করিতে পারি না।

যোগেন্দ্র। হেমনলিনীকে সকল কথা বলিয়াছ ?

রমেশ। না। বিবাহের পরে তাঁহাকে বলিব, এইরূপ কথা আছে—যদি তিনি ইচ্ছা করেন, এখনো তাঁহাকে বলিতে পারি।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, কমলাকে এ সম্বন্ধে দুই-একটা প্রশ্ন করিতে পারি ?

রমেশ। না, কোনমতেই না! আমাকে যদি অপরাধী বলিয়া জ্ঞান কর, তবে আমার সম্বন্ধে যথোচিত বিধান করিতে পার—কিন্তু তোমাদের সম্মুখে প্রশ্নোত্তর করিবার জন্য নির্দ্দোষী কমলাকে দাঁড় করাইতে পারিব না।

যোগেন্দ্র। কাহাকেও প্রশ্নোত্তর করিবার কোনো প্রয়োজন নাই। যাহা জানিবার, তাহা জানিয়াছি। প্রমাণ যথেষ্ট হইয়াছে। এখন তোমাকে আমি স্পষ্টই বলিতেছি, ইহার পরে আমাদের বাড়ীতে যদি প্রবেশের চেষ্টা কর, তবে তোমাকে অপমানিত হইতে হইবে।

রমেশ পাংশুবর্ণমুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল—"আর-একটি কথা আছে,—হেমকে তুমি চিঠি লিখিতে পারিবে না—তাহার সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে তোমার সুদূর সম্পর্কও থাকিবে না। যদি চিঠি লেখ, তবে যে কথা তুমি গোপন রাখিতে চাহিতেছ, সেই কথা আমি সমস্ত প্রমাণের সহিত সর্ব্বসাধারণের কাছে প্রকাশ করিব। এখন যদি কেহ আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমার সঙ্গে হেমের বিবাহ কেন ভাঙিয়া গেল, আমি বলিব, এ বিবাহে আমার সম্মতি নাই বলিয়া ভাঙিয়া দিয়াছি—ভিতরকার কথাটা বলিব না। কিন্তু তুমি যদি সাবধান না হও,

তবে সমস্ত কথা বাহির হইয়া যাইবে। তুমি এমন পাষণ্ডের মত ব্যবহার করিয়াছ, তবু যে আমি আপনাকে দমন করিয়া রাখিয়াছি, সে তোমার উপরে দয়া করিয়া নহে— ইহার মধ্যে আমার বোন্ হেমের সংস্রব আছে বলিয়াই তুমি এত সহজে নিষ্কৃতি পাইলে। এখন তোমার কাছে আমার এই শেষ বক্তব্য যে, কোনোকালে হেমের সঙ্গে তোমার যে কোন পরিচয় ছিল, তোমার কথায়-বার্তায় বা ব্যবহারে তাহার যেন কোন প্রমাণ না পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে তোমাকে সত্য করাইয়া লইতে পারিলাম না, কারণ, এত মিথ্যার পরে সত্য তোমার মুখে মানাইবে না। তবে এখনো যদি লজ্জা থাকে,—অপমানের ভয় থাকে, তবে আমার এই কথাটা ভ্রমেও অবহেলা করিয়ো না।"

অক্ষয়। আহা যোগেন্, আর কেন? রমেশবাবু নিরুত্তর হইয়া আছেন, তবু তোমার মনে একটু দয়া হইতেছে না? এইবার চল! রমেশবাবু, কিছু মনে করিবেন না, আমরা এখন আসি!

যোগেন্দ্র-অক্ষয় চলিয়া গেল। রমেশ কাঠের মূর্ত্তির মত কঠিন হইয়া বসিয়া রহিল। হতবুদ্ধি-ভাবটা কাটিয়া গেলে তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, বাসা হইতে বাহির হইয়া গিয়া দ্রুতবেগে পদচারণা করিতে করিতে সমস্ত অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লয়। কিন্তু তাহার মনে পড়িয়া গেল কমলা আছে, তাহাকে বাসায় একলা ফেলিয়া-রাখিয়া যাওয়া যায় না।

রমেশ পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, কমলা রাস্তার দিকের জান্লার একটা খড়্খড়ি খুলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। রমেশের পদশব্দ শুনিয়া সে খড়্খড়ি বন্ধ করিয়া মুখ ফিরাইল। রমেশ মেজের উপরে বসিল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "উহারা দুজনে কে? আজ সকালে আমাদের ইস্কুলে গিয়াছিল।"

রমেশ সবিস্ময়ে কহিল, "ইস্কুলে গিয়াছিল?"

কমলা কহিল, "হাঁ। উহারা তোমাকে কি বলিতেছিল?"

রমেশ কহিল, "আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, তুমি আমার কে হও?"

কমলা যদিও শ্বশুরবাড়ীর অনুশাসনের অভাবে এখনো লজ্জা করিতে শেখে নাই, তবু আশৈশব-সংস্কারবশে রমেশের এই কথায় তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠিল।

রমেশ কহিল, "আমি উহাদিগকে উত্তর করিয়াছি, তুমি আমার কেউ হও না।"

কমলা ভাবিল, রমেশ তাহাকে অন্যায় লজ্জা দিয়া উৎপীড়ন করিতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া তর্জ্জনস্বরে কহিল, "যাও!"

রমেশ ভাবিতে লাগিল, "কমলার কাছে সকল কথা কেমন করিয়া খুলিয়া বলিব?"

কমলা হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল। কহিল, "ঐ যা, তোমার ফল কাকে লইয়া যাইতেছে।" —বলিয়া সে তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া কাক তাড়াইয়া ফলের থালা লইয়া আসিল।

রমেশের সম্মুখে থালা রাখিয়া কহিল, "তুমি খাইবে না?"

রমেশের আর আহারের উৎসাহ ছিল না—কিন্তু কমলার এই যত্নটুকু তাহার হৃদয়

স্পর্শ করিল। সে কহিল, "কমলা, তুমি খাবে না ?"

কমলা কহিল, "তুমি আগে খাও!"

এইটুকু ব্যাপার, বেশি-কিছু নয়, কিন্তু রমেশের বর্ত্তমান অবস্থায় এই হৃদয়ের কোমল আভাসটুকু তাহার বক্ষের ভিতরকার অশ্রু-উৎসে গিয়া যেন ঘা দিল। রমেশ কোন কথা না বলিয়া জোর করিয়া ফল খাইতে লাগিল।

খাওয়ার পালা সাঙ্গ হইলে রমেশ কহিল, "কমলা, আজ রাত্রে আমরা দেশে যাইব।"

কমলা চোখ নীচু, মুখ বিষণ্ণ করিয়া কহিল, "সেখানে আমার ভাল লাগে না!"

রমেশ। ইস্কুলে থাকিতে তোমার ভাল লাগে ?

কমলা। না, আমাকে ইস্কুলে পাঠাইয়ো না। আমার লজ্জা করে। মেয়েরা আমাকে কেবল তোমার কথা জিজ্ঞাসা করে।

রমেশ। তুমি কি বল ?

কমলা। আমি কিছুই বলিতে পারি না। তাহারা জিজ্ঞাসা করিত, তুমি কেন আমাকে ছুটির সময়ে ইস্কুলে রাখিতে চাহিয়াছ—আমি—

কমলা কথা শেষ করিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের ক্ষতস্থানে আবার ব্যথা বাজিয়া উঠিল।

রমেশ। তুমি কেন বলিলে না, তিনি আমার কেহই হন না!

কমলা রাগ করিয়া রমেশের মুখের দিকে কুটিল-কটাক্ষে চাহিল—কহিল, "যাও!"

আবার রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, 'কি করা যাইবে ?' এদিকে রমেশের বুকের ভিতরে বরাবর একটা চাপা বেদনা কীটের মত যেন গহ্বর-খনন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছিল। এতক্ষণে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে কি বলিল, হেমনলিনী কি মনে করিতেছে, প্রকৃত অবস্থা কেমন করিয়া হেমনলিনীকে বুঝাইবে, হেমনলিনীর সহিত চিরকালের জন্য যদি তাহাকে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তবে জীবন বহন করিবে কি করিয়া—এই সকল জ্বালাময় প্রশ্ন ভিতরে-ভিতরে জমা হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ভাল করিয়া তাহা আলোচনা করিবার অবসর রমেশ পাইতেছিল না। রমেশ এটুকু বুঝিয়াছিল যে, কমলার সহিত রমেশের সম্বন্ধ কলিকাতায় তাহার বন্ধু ও শত্রু মণ্ডলীর মধ্যে তীব্র আলোচনার বিষয় হইয়া উঠিল। রমেশ যে কমলার স্বামী, এই গোলমালে সেই জনশ্রুতি যথেষ্ট ব্যাপ্ত হইতে থাকিবে। এ সময়ে রমেশের পক্ষে কমলাকে লইয়া আর একদিনও কলিকাতায় থাকা সঙ্গত হইবে না।

অন্যমনস্ক রমেশের এই চিন্তার মাঝখানে হঠাৎ কমলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"তুমি কি ভাবিতেছ ? তুমি যদি দেশে থাকিতে চাও, আমি সেইখানেই থাকিব।"

বালিকার মুখে এই আত্মসংযমের কথা শুনিয়া রমেশের বুকে আবার ঘা লাগিল—আবার সে ভাবিল, 'কি করা যাইবে ?' পুনর্ব্বার সে অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে নিরুত্তরে কমলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা মুখ গম্ভীর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল —"আচ্ছা, আমি ছুটির সময়ে ইস্কুলে থাকিতে

চাহি নাই বলিয়া তুমি রাগ করিয়াছ?—সত্য করিয়া বল।”

রমেশ কহিল—“সত্য করিয়াই বলিতেছি, তোমার উপরে রাগ করি নাই, আমি নিজের উপরেই রাগ করিয়াছি।”

রমেশ ভাবনার জাল হইতে নিজেকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া লইয়া কমলার সহিত আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—“আচ্ছা কমলা, ইস্কুলে এতদিন কি শিখিলে বল দেখি ?”

কমলা অত্যন্ত উৎসাহের সহিত নিজের শিক্ষার হিসাব দিতে লাগিল। সম্প্রতি পৃথিবীর গোলাকৃতির কথা তাহার অগোচর নাই জানাইয়া যখন সে রমেশকে চমৎকৃত করিয়া দিবার চেষ্টা করিল, রমেশ গম্ভীরমুখে ভূমণ্ডলের গোলত্বে সন্দেহপ্রকাশ করিল। কহিল, “এ কি কখনো সম্ভব হইতে পারে ?”

কমলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল—“বাঃ, আমাদের বইয়ে লেখা আছে—আমরা পড়িয়াছি।”

রমেশ আশ্চর্য্য জানাইয়া কহিল—“বল, কি বইয়ে লেখা আছে ? কতবড় বই ?”

এই প্রশ্নে কমলা কিছু কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, “বেশি বড় বই নয়—কিন্তু ছাপার বই। তাহাতে ছবিও দেওয়া আছে।”

এত-বড় প্রমাণের পর রমেশকে হার মানিতে হইল। তার পরে কমলা শিক্ষার বিবরণ শেষ করিয়া বিদ্যালয়ের ছাত্রী ও শিক্ষকদের কথা, সেখানকার দৈনিক কার্য্যধারা লইয়া বকিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে মাঝে মাঝে সাড়া দিয়া গেল। কখনো বা কথার শেষসূত্র ধরিয়া এক-আধটা প্রশ্নও করিল। হঠাৎ একসময়ে কমলা বলিয়া উঠিল, “তুমি আমার কথা কিছুই শুনিতেছ না।” বলিয়া সে রাগ করিয়া তখনি উঠিয়া পড়িল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “না না কমলা, রাগ করিয়ো না—আমি আজ ভাল নাই।”

ভাল নাই শুনিয়া তখনি কমলা ফিরিয়া-আসিয়া কহিল—“তোমার অসুখ করিয়াছে ? কি হইয়াছে ?”

রমেশ কহিল—“ঠিক অসুখ নয়—ও কিছুই নয়—আমার মাঝে মাঝে অমন হইয়া থাকে—আবার এখনি চলিয়া যাইবে।”

কমলা রমেশকে শিক্ষার সহিত আমোদ দিবার জন্য কহিল, “আমার ভূগোল-প্রবেশে পৃথিবীর যে ছবি আছে, দেখিবে ?”

রমেশ আগ্রহপ্রকাশ করিয়া দেখিতে চাহিল। কমলা তাড়াতাড়ি তাহার বই আনিয়া রমেশের সম্মুখে খুলিয়া ধরিল। কহিল—“এই যে দুটো গোল দেখিতেছ, ইহা আসলে একটা। গোল জিনিষের দুটো পিঠ কি কখনো একসঙ্গে দেখা যায় ?”

রমেশ কিঞ্চিৎ ভাবিবার ভাণ করিয়া কহিল—“চ্যাপ্টা জিনিষেরও দেখা যায় না।”

কমলা কহিল, “সেইজন্য এই ছবিতে পৃথিবীর দুই পিঠ আলাদা করিয়া আঁকিয়াছে।”

এম্‌নি করিয়া সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

২২

অন্নদাবাবু একান্তমনে আশা করিতেছিলেন, যোগেন্দ্র ভাল খবর লইয়া আসিবে, সমস্ত গোলমাল অতি সহজে পরিষ্কার হইয়া যাইবে। যোগেন্দ্র ও অক্ষয় যখন ঘরে

আসিয়া প্রবেশ করিল, অন্নদাবাবু ভীতভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিলেন।

যোগেন্দ্র কহিল, "বাবা, তুমি যে রমেশকে এতদূর-পর্য্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতে দিবে, তাহা কে জানিত? এমন জানিলে আমি তোমাদের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিতাম না।"

অন্নদাবাবু। রমেশের সঙ্গে হেমনলিনীর বিবাহ তোমার অভিপ্রেত, এ কথা তুমি ত আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। বাধা দিবার ইচ্ছা যদি তোমার ছিল, তবে আমাকে—

যোগেন্দ্র। অবশ্য একেবারে বাধা দিবার কথা আমার মনে আসে নাই, কিন্তু তাই বলিয়া—

অন্নদাবাবু। ঐ দেখ, ওর মধ্যে "তাই বলিয়া" কোথায় থাকিতে পারে! হয় অগ্রসর হইতে দিবে, নয় বাধা দিবে, এর মাঝখানে আর কি আছে?

যোগেন্দ্র। তাই বলিয়া একেবারে এতটা-দূর অগ্রসর—

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "কতকগুলি জিনিষ আছে, যা আপনার ঝোঁকেই অগ্রসর হইয়া পড়ে, তাহাকে আর প্রশ্রয় দিতে হয় না— বাড়িতে বাড়িতে আপনিই বাড়াবাড়িতে গিয়া পৌঁছায়। কিন্তু যা হইয়া গেছে, তা লইয়া তর্ক করিয়া লাভ কি? এখন যা করা কর্ত্তব্য, তাই আলোচনা কর।"

অন্নদাবাবু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন— "রমেশের সঙ্গে তোমাদের দেখা হইয়াছে?"

যোগেন্দ্র। খুব দেখা হইয়াছে—এত দেখা আশা করি নাই। এমন কি, তার স্ত্রীর সঙ্গেও পরিচয় হইয়া গেল।

অন্নদাবাবু নির্ব্বাক্ বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন— "কার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হইল?"

যোগেন্দ্র। রমেশের স্ত্রী।

অন্নদাবাবু। তুমি কি বলিতেছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কোন্ রমেশের স্ত্রী?

যোগেন্দ্র। আমাদের রমেশের। পাঁচ-ছয়-মাস আগে যখন সে দেশে গিয়াছিল, তখন সে বিবাহ করিতেই গিয়াছিল।

অন্নদাবাবু। কিন্তু তার পিতার মৃত্যু হইল বলিয়া বিবাহ ঘটিতে পারে নাই।

যোগেন্দ্র। মৃত্যুর পূর্ব্বেই বিবাহ হইয়া গেছে।

অন্নদাবাবু স্তব্ধ হইয়া বসিয়া মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন, "তবে ত আমাদের হেমের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতেই পারে না!"

যোগেন্দ্র। আমরা ত তাই বলিতেছি—

অন্নদাবাবু। তোমরা ত তাই বলিলে, এদিকে যে বিবাহের আয়োজন সমস্তই প্রায় ঠিক হইয়া গেছে—এ রবিবারে হইল না বলিয়া তাহার পরের রবিবারে দিন স্থির করিয়া চিঠি বিলি হইয়া গেছে—আবার সেটা বন্ধ করিয়া ফের চিঠি লিখিতে হইবে?

যোগেন্দ্র কহিল—"একেবারে বন্ধ করিবার দরকার কি—কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া যাইতে পারে।"

অন্নদাবাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন— "ওর মধ্যে পরিবর্ত্তন কোন্‌খানটায় করিবে?"

যোগেন্দ্র। যেখানে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব, সেইখানেই করিতে হইবে। রমেশের বদলে

আর-কোন পাত্র স্থির করিয়া আস্‌চে রবিবারেই যেমন করিয়া হোক্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে হইবে। নহিলে লোকের কাছে মুখ দেখাইতে পারিব না।

বলিয়া যোগেন্দ্র একবার অক্ষয়ের মুখের দিকে চাহিল। অক্ষয় বিনয়ে মুখ নত করিল।

অন্নদাবাবু। পাত্র এত শীঘ্র পাওয়া যাইবে?

যোগেন্দ্র। সে তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

অন্নদাবাবু। কিন্তু হেমকে ত রাজি করাইতে হইবে।

যোগেন্দ্র। রমেশের সমস্ত ব্যাপার শুনিলে সে নিশ্চয় রাজি হইবে।

অন্নদাবাবু। তবে যা তুমি ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর। কিন্তু রমেশের বেশ সঙ্গতিও ছিল, আবার উপার্জ্জনের মত বিদ্যাবুদ্ধিও ছিল। এই পর্শু আমার সঙ্গে কথা ঠিক হইয়া গেল, সে এটোয়ায় গিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিবে, এর মধ্যে দেখ দেখি কি কাণ্ড!

যোগেন্দ্র। সেজন্য কেন চিন্তা করিতেছ বাবা, এটোয়াতে রমেশ এখনো প্র্যাক্‌টিস্ করিতে পারিবে। একবার হেমকে ডাকিয়া আনি, আর ত বেশি সময় নাই।

কিছুক্ষণ পরে যোগেন্দ্র হেমনলিনীকে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল। অক্ষয় ঘরের এক কোণে বইয়ের আল্‌মারির আড়ালে বসিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র কহিল, "হেম, বোস, তোমার সঙ্গে একটু কথা আছে।

হেমনলিনী শুষ্ক হইয়া চৌকিতে বসিল। সে জানিত, তাহার একটা পরীক্ষা আসিতেছে।

যোগেন্দ্র ভূমিকাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিল, "রমেশের ব্যবহারে সন্দেহের কারণ তুমি কিছুই দেখিতে পাও না?"

হেমনলিনী কোন কথা না বলিয়া কেবল ঘাড় নাড়িল।

যোগেন্দ্র। সে যে বিবাহের দিন এক-সপ্তাহ পিছাইয়া দিল, তাহার এমন কী কারণ থাকিতে পারে, যাহা আমাদের কারো কাছে বলা চলে না!

হেমনলিনী চোখ নীচু করিয়া কহিল, "কারণ অবশ্যই কিছু আছে।"

যোগেন্দ্র। সে ত ঠিক কথা। কারণ ত আছেই—কিন্তু সে কি সন্দেহজনক না?

হেমনলিনী আবার নীরবে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

তাহাদের সকলের চেয়ে রমেশের উপরেই এমন অসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে যোগেন্দ্র রাগ করিল। সাবধানে ভূমিকা করিয়া কথা-পাড়া আর চলিল না!

যোগেন্দ্র কঠিনভাবে বলিতে লাগিল—"তোমার ত মনে আছে, রমেশ মাস-ছয়েক আগে তাহার বাপের সঙ্গে দেশে চলিয়া গিয়াছিল। তাহার পরে অনেকদিন তাহার কোন চিঠিপত্র না পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলাম। ইহাও তুমি জান যে, যে রমেশ দুইবেলা আমাদের এখানে আসিত, যে বরাবর আমাদের পাশের বাড়ীতে বাসা লইয়া ছিল, সে কলিকাতায় আসিয়া আমাদের সঙ্গে একবারো দেখাও করিল না, অন্য

বাসায় গিয়া গা-ঢাকা দিয়া রহিল—ইহা সত্ত্বেও তোমরা সকলে পূর্ব্বের মত বিশ্বাসেই তাহাকে ঘরে ডাকিয়া আনিলে? আমি থাকিলে এমন কি কখনো ঘটিতে পারিত?”

হেমনলিনী চুপ করিয়া রহিল।

যোগেন্দ্র। রমেশের এইরূপ ব্যবহারের কোন অর্থ তোমরা খুঁজিয়া পাইয়াছ? এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্নও কি তোমাদের মনে উদয় হয় নাই? রমেশের 'পরে এত গভীর বিশ্বাস?

হেমনলিনী নিরুত্তর রহিল।

যোগেন্দ্র। আচ্ছা বেশ কথা—তোমরা সরলস্বভাব, কাহাকেও সন্দেহ কর না—আশা করি, আমার উপরেও তোমার কতকটা বিশ্বাস আছে। আমি নিজে ইস্কুলে গিয়া খবর লইয়াছি, রমেশ তাহার স্ত্রী কমলাকে সেখানে বোর্ডার রাখিয়া পড়াইতেছিল। ছুটির সময়েও তাহাকে সেখানে রাখিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিল। হঠাৎ দুই-তিন-দিন হইল, ইস্কুলের কর্ত্রীর নিকট হইতে রমেশ চিঠি পাইয়াছে যে, ছুটির সময়ে কমলাকে ইস্কুলে রাখা হইবে না। আজ তাহাদের ছুটি ফুরাইয়াছে—কমলাকে ইস্কুলের গাড়ি দর্জ্জিপাড়ায় তাহাদের সাবেক বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়াছে। সেই বাসায় আমি নিজে গিয়াছি। গিয়া দেখিলাম, কমলা বঁটিতে আপেলের খোসা ছাড়াইয়া কাটিয়া দিতেছে, রমেশ তাহার সুমুখে মাটিতে বসিয়া এক-এক টুক্‌রা লইয়া মুখে পুরিতেছে। রমেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ব্যাপারখানা কি?' রমেশ বলিল, 'সে এখন এবং আমাদের কাছে কিছুই বলিবে না।' যদি রমেশ একটা কথাও বলিত যে, কমলা তাহার স্ত্রী নয়, তা হলেও না হয় সেই কথাটুকুর উপর নির্ভর করিয়া কোনমতে সন্দেহকে শান্ত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা যাইত। কিন্তু সে হাঁ, না, কিছুই বলিতে চায় না। এখন, ইহার পরেও কি রমেশের উপর বিশ্বাস রাখিতে চাও?”

প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় যোগেন্দ্র হেমনলিনীর মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, তাহার মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ হইয়া গেছে, এবং তাহার যতটা জোর আছে, দুই হাতে চৌকির হাতা চাপিয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। মুহূর্ত্তকাল পরেই সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া চৌকি হইতে সে নীচে পড়িয়া গেল।

অন্নদাবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি ভূলুণ্ঠিতা হেমনলিনীর মাথা দুই হাতে বুকের কাছে তুলিয়া-লইয়া কহিলেন—“মা, কি হইল মা! ওদের কথা তুমি কিছুই বিশ্বাস করিয়ো না—সব মিথ্যা!”

যোগেন্দ্র তাহার পিতাকে সরাইয়া তাড়াতাড়ি হেমনলিনীকে একটা সোফার উপর তুলিল,—নিকটেই কুঁজায় জল ছিল, সেই জল লইয়া তাহার মুখে-চোখে বারংবার ছিটাইয়া দিল—এবং অক্ষয় একখানা হাতপাখা লইয়া তাহাকে বেগে বাতাস করিতে লাগিল।

হেমনলিনী অনতিকাল পরে চোখ খুলিয়াই চম্‌কিয়া উঠিল—অন্নদাবাবুর দিকে চাহিয়া চীৎকার করিয়া বলিল, “বাবা, বাবা, অক্ষয়বাবুকে এখান হইতে সরিয়া যাইতে বল।”

অক্ষয় পাখা রাখিয়া ঘরের বাহিরে দরজার আড়ালে গিয়া দাঁড়াইল। অন্নদাবাবু সোফার উপরে হেমনলিনীর পাশে বসিয়া তাহার মুখে-গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন—এবং গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কেবল একবার বলিলেন, "মা!"

দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর দুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—তাহার বুক ফুলিয়া-ফুলিয়া উঠিল—পিতার জানুর উপর বুক চাপিয়া-ধরিয়া তাহার অসহ্য রোদনের বেগ সংবরণ করিতে চেষ্টা করিল। অন্নদাবাবু অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন—"মা, তুমি নিশ্চিন্ত থাক মা। রমেশকে আমি খুব জানি—সে কখনই অবিশ্বাসী নয়—যোগেন নিশ্চয়ই ভুল করিয়াছে!"

যোগেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না, কহিল, "বাবা, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ো না!—এখনকার মত কষ্ট বাঁচাইতে গিয়া উহাকে দ্বিগুণ কষ্টে ফেলা হইবে। বাবা, হেমকে এখন কিছুক্ষণ ভাবিবার সময় দাও।"

হেমনলিনী তখনি পিতার জানু ছাড়িয়া উঠিয়া বসিল—এবং যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—"আমার যাহা ভাবিবার, সব ভাবিয়াছি। যতক্ষণ তাঁহার নিজের মুখ হইতে না শুনিব, ততক্ষণ আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিব না, ইহা নিশ্চয় জানিয়ো!"

এই কথা বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল। অন্নদাবাবু ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিলেন—কহিলেন, "পড়িয়া যাইবে।"

হেমনলিনী অন্নদাবাবুর হাত ধরিয়া তাহার শোবার ঘরে গেল। বিছানায় শুইয়া কহিল, "বাবা, আমাকে একটুখানি একলা রাখিয়া যাও, আমি ঘুমাইব।"

অন্নদাবাবু কহিলেন, "হরির মাকে ডাকিয়া দিব?—বাতাস করিবে?"

হেমনলিনী কহিল, "বাতাসের দরকার নাই বাবা।"

অন্নদাবাবু পাশের ঘরে গিয়া বসিলেন। এই কন্যাটিকে ছয়মাসের শিশু-অবস্থায় রাখিয়া ইহার মা মারা যায়, সেই হেমের মার কথা তিনি ভাবিতে লাগিলেন। সেই সেবা, সেই ধৈর্য্য, সেই চিরপ্রসন্নতা মনে পড়িল। সেই গৃহলক্ষ্মীরই প্রতিমার মত যে মেয়েটি এতদিন ধরিয়া তাঁহার কোলের উপর বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার অনিষ্ট-আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পাশের ঘরে বসিয়া-বসিয়া তিনি মনে মনে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা, তোমার সকল বিঘ্ন দূর হউক্, চিরদিন তুমি সুখে থাক—তোমাকে সুখী দেখিয়া, সুস্থ দেখিয়া, যাহাকে ভালবাস তাহার ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর মত প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আমি যেন তোমার মার কাছে যাইতে পারি!" এই বলিয়া জামার প্রান্তে আর্দ্রচক্ষু মুছিলেন।

মেয়েদের বুদ্ধির প্রতি যোগেন্দ্রের পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট অবজ্ঞা ছিল, আজ তাহা আরো দৃঢ় হইল। ইহারা প্রত্যক্ষ প্রমাণও বিশ্বাস করে না—ইহাদিগকে লইয়া কি করা যাইবে? দুইয়ে দুইয়ে যে চার হইবেই, তাহাতে মানুষের সুখই হোক্ আর দুঃখই হোক্, তাহা ইহারা স্থলবিশেষে অনায়াসেই অস্বীকার করিতে পারে! যুক্তি যদি কালোকে কালোই বলে, আর ইহাদের ভালবাসা তাহাকে বলে

শাদা, তবে যুক্তি-বেচারার উপরে ইহারা ভারি খাপা হইয়া উঠিবে! ইহাদিগকে লইয়া যে কি করিয়া সংসার চলে, তাহা যোগেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না!

যোগেন্দ্র ডাকিল—"অক্ষয়!"

অক্ষয় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। যোগেন্দ্র কহিল—"সব ত শুনিয়াছ, এখন ইহার উপায় কি?"

অক্ষয় কহিল—"আমাকে এ সব কথার মধ্যে কেন মিছামিছি টান ভাই! আমি এতদিন কোন কথাই বলি নাই—তুমি আসিয়াই আমাকে এই মুস্কিলে ফেলিয়াছ।"

যোগেন্দ্র। আচ্ছা, সে সব নালিশের কথা পরে হইবে। এখন হেমনলিনীর কাছে রমেশকে নিজের মুখে সকল কথা কবুল না করাইলে উপায় দেখি না।

অক্ষয়। পাগল হইয়াছ? মানুষ নিজের মুখে—

যোগেন্দ্র। কিম্বা যদি একটা চিঠি লেখে, তাহা হইলে আরো ভাল হয়। তোমাকে এই ভার লইতেই হইবে। কিন্তু আর দেরি করিলে চলিবে না।

অক্ষয় কহিল—"দেখি, কতদূর কি করিতে পারি!"

ক্রমশ।

সাহিত্যের তাৎপর্য্য।

বাহিরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা জগৎ হইয়া উঠিতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহিরের জগতের রং, আকৃতি, ধ্বনি প্রভৃতি আছে, তাহা নহে—তাহার সঙ্গে আমাদের ভাললাগা-মন্দলাগা, আমাদের ভয়-বিস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জড়িত—তাহা আমাদের হৃদয়বৃত্তির বিচিত্র রসে নানাভাবে আভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

এই হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া-তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।

যেমন জঠরে জারকরস অনেকের পর্য্যাপ্তপরিমাণে না থাকাতে বাহিরের খাদ্যকে তাহারা ভাল করিয়া আপনার শরীরের জিনিষ করিয়া লইতে পারে না—তেম্‌নি হৃদয়বৃত্তির জারকরস যাহারা পর্য্যাপ্তরূপে জগতে প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহারা বাহিরের জগৎটাকে অন্তরের জগৎ, আপনার জগৎ, মানুষের জগৎ করিয়া লইতে পারে না।

একজন সাধারণ ভ্রমণকারীর সঙ্গে কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের এই প্রভেদ। সাধারণ ভ্রমণকারী যখন শৈলবেষ্টিত সরোবর দেখে, তখন যে তার ভাল লাগে না, তাহা নয়—সে যে নিতান্ত কেবল পাহাড়টা কত উঁচু, সরোবরটা কত গভীর, সেই খবরটুকু লইবার চেষ্টা করে, তাহা নহে—সে হৃদয়ের আবেগের দ্বারা এই বাহিরের দৃশ্যটিকে আপনার করিয়া

লইতে চায়। কিন্তু তাহার কল্পনা এবং হৃদয়াবেগ কবির তুলনায় সামান্য। কবি আপন হৃদয়ের দ্বারা, কল্পনার দ্বারা বহিঃপ্রকৃতিকে ওতপ্রোত করিয়া লইয়াছেন—ছোট বনফুল হইতে বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত সমস্তই তাঁহার—এবং সেই সূত্রে মানবের।

যে কবির হৃদয়বৃত্তি জগতের যত বিচিত্র ও অধিক স্থান ব্যাপ্ত করিয়া লইতে পারে, তাঁহার কবিত্বের গৌরব তত বাড়ে। কারণ, তিনি বিশ্বকে অধিকপরিমাণে এবং বিচিত্রভাবে মানুষের আপনার করিয়া গড়িয়া দেন।

এক-একটি জড়প্রকৃতি লোক আছে, জগতের খুব অল্প বিষয়েই যাহার হৃদয়ের ঔৎসুক্য—তাহারা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াও অধিকাংশ জগৎ হইতে বঞ্চিত। তাহাদের হৃদয়ের গবাক্ষগুলি সংখ্যায় অল্প এবং বিস্তৃতিতে সঙ্কীর্ণ বলিয়া বিশ্বের মাঝখানে তাহারা প্রবাসী হইয়া আছে।

এমন সৌভাগ্যবান্ লোকও আছেন, যাঁহাদের বিস্ময়, প্রেম এবং কল্পনা সর্ব্বত্র সজাগ—প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে।

বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রংয়ে, নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।

ভাবুকের মনের এই জগৎটি বাহিরের জগতের চেয়ে মানুষের বেশি আপনার। তাহা হৃদয়ের সাহায্যে মানুষের হৃদয়ের পক্ষে বেশি সুগম হইয়া উঠে। তাহা আমাদের চিত্তের প্রভাবে যে বিশেষত্ব লাভ করে, তাহাই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, বাহিরের জগতের সঙ্গে মানবের জগতের প্রভেদ আছে। কোন্‌টা শাদা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা বড়, কোন্‌টা ছোট, মানবের জগৎ সেই খবরটুকুমাত্র দেয় না। কোন্‌টা প্রিয়, কোন্‌টা অপ্রিয়, কোন্‌টা সুন্দর, কোন্‌টা অসুন্দর, কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ, মানুষের জগৎ সেই কথাটা নানা সুরে বলে।

এই যে মানুষের জগৎ, ইহা আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে বহিয়া আসিতেছে। এই প্রবাহ পুরাতন এবং নিত্যনূতন। নব নব ইন্দ্রিয়—নব নব হৃদয়ের ভিতর দিয়া এই সনাতন স্রোত চিরদিনই নবীভূত হইয়া চলিয়াছে।

কিন্তু ইহাকে পাওয়া যায় কেমন করিয়া? ইহাকে ধরিয়া রাখা যায় কি উপায়ে? এই অপরূপ মানস-জগৎকে রূপ দিয়া পুনর্ব্বার বাহিরে প্রকাশ করিতে না পারিলে ইহা চিরদিনই সৃষ্ট এবং চিরদিনই নষ্ট হইতে থাকে।

কিন্তু এ জিনিষ নষ্ট হইতে চায় না। হৃদয়ের জগৎ আপনাকে ব্যক্ত করিবার জন্য ব্যাকুল। তাই চিরকালই মানুষের মধ্যে সাহিত্যের আবেগ। তাই মানুষ কেবলি লিখিতেছে, খুদিতেছে, গাহিতেছে, আঁকিতেছে—তাহার বিশ্রাম নাই। তাহার প্রকাশচেষ্টা নানারূপে স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছে। ইহা প্রয়োজন বুঝিয়া কাজ করে না—ইহা বিস্তর অনাবশ্যক সৃষ্টি করে—ইহা কেবল আকার ধরিতে চায়, বাহির হইতে চায়।

অতএব সাহিত্যকারের প্রথম কাজ কল্পনাশক্তির দ্বারা, হৃদয়বৃত্তির দ্বারা বাহিরের

জগৎকে আপনার মনের করিয়া তোলা। তার পরে রচনাশক্তির দ্বারা সেই মনের জিনিষকে বাহিরের, আপনার জিনিষকে সকলের করিয়া দেওয়া।

অতএব সাহিত্যের বিচার করিবার সময় দুইটা জিনিষ দেখিতে হয়। ১ম, বিশ্বের উপর সাহিত্যকারের হৃদয়ের অধিকার কতখানি—২য়, তাহা স্থায়ী আকারে ব্যক্ত হইয়াছে কতটা?

সকল সময় এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানেই সোনায় সোহাগা।

কবির কল্পনাসচেতন হৃদয় যতই বিশ্বব্যাপী হয়, ততই তাঁহার রচনার গভীরতায় আমাদের পরিতৃপ্তি বাড়ে। ততই মানববিশ্বের সীমা বিস্তারিত হইয়া আমাদের চিরন্তন বিহারক্ষেত্র বিপুলতা লাভ করে।

কিন্তু রচনাশক্তির নৈপুণ্যও সাহিত্যে মহামূল্য। কারণ, যাহাকে অবলম্বন করিয়া সে শক্তি প্রকাশিত হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত তুচ্ছ হইলেও এই শক্তিটি একেবারে নষ্ট হয় না। ইহা ভাষার মধ্যে, সাহিত্যের মধ্যে সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহাতে মানবের প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া দেয়। এই ক্ষমতাটি লাভের জন্য মানুষ চিরদিন ব্যাকুল। যে কৃতিগণের সাহায্যে মানুষের এই ক্ষমতা পরিপুষ্ট হইতে থাকে, মানুষ তাঁহাদিগকে যশস্বী করিয়া ঋণশোধের চেষ্টা করে।

যে মানসজগৎ হৃদয়ভাবের উপকরণে অন্তরের মধ্যে সৃষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাকে বাহিরে প্রকাশ করিবার উপায় কি?

তাহাকে এমন করিয়া প্রকাশ করিতে হইবে, যাহাতে হৃদয়ের ভাব উদ্রিক্ত হয়।

হৃদয়ের ভাব উদ্রেক করিতে সাজসরঞ্জাম অনেক লাগে।

পুরুষমানুষের আপিসের কাপড় শাদাসিধা—তাহা যতই বাহুল্যবর্জ্জিত হয়, ততই কাজের উপযোগী হয়। মেয়েদের বেশভূষা, লজ্জাসরম, ভাবভঙ্গী, সমস্ত-সভ্যসমাজেই প্রচলিত।

মেয়েদের কাজ হৃদয়ের কাজ। তাহাদিগকে হৃদয় দিতে হয় ও হৃদয় আকর্ষণ করিতে হয়—এইজন্য তাহাদিগকে নিতান্ত সোজাসুজি, শাদাসিধা, ছাঁটাছোঁটা হইলে চলে না। পুরুষদের যথাযথ হওয়া আবশ্যক—কিন্তু মেয়েদের সুন্দর হওয়া চাই। পুরুষের ব্যবহার মোটের উপর সুস্পষ্ট হইলেই ভাল—কিন্তু মেয়েদের ব্যবহারে অনেক আবরণ, আভাস-ইঙ্গিত থাকা চাই।

সাহিত্যও আপন চেষ্টাকে সফল করিবার জন্য অলঙ্কারের, রূপকের, ছন্দের, আভাসের-ইঙ্গিতের আশ্রয় গ্রহণ করে। দর্শন-বিজ্ঞানের মত নিরলঙ্কার হইলে তাহার চলে না।

অপরূপকে রূপের দ্বারা ব্যক্ত করিতে গেলে বচনের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তাকে রক্ষা করিতে হয়। নারীর যেমন শ্রী এবং হ্রী, সাহিত্যের অনির্ব্বচনীয়তাটিও সেইরূপ। তাহা অনুকরণের অতীত। তাহা অলঙ্কারকে অতিক্রম করিয়া উঠে, তাহা অলঙ্কারের দ্বারা আচ্ছন্ন হয় না।

ভাষার মধ্যে এই ভাষাতীতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহিত্য প্রধানত ভাষার মধ্যে

দুইটি জিনিষ মিশাইয়া থাকে—চিত্র এবং সঙ্গীত।

কথার দ্বারা যাহা বলা চলে না, ছবির দ্বারা তাহা বলিতে হয়। সাহিত্যে এই ছবি-আঁকার সীমা নাই। উপমা-তুলনা-রূপকের দ্বারা ভাবগুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতে চায়। "দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়" এই এক কথায় বলরামদাস কি না বলিয়াছেন? ব্যাকুল দৃষ্টির ব্যাকুলতা কেবলমাত্র বর্ণনায় কেমন করিয়া ব্যক্ত হইবে? দৃষ্টি পাখীর মত উড়িয়া ছুটিয়াছে, এই ছবিটুকুতে প্রকাশ করিবার বহুতর ব্যাকুলতা মুহূর্ত্তে শান্তিলাভ করিয়াছে।

এ ছাড়া ছন্দে, শব্দে, বাক্যবিন্যাসে, সাহিত্যকে সঙ্গীতের আশ্রয় ত গ্রহণ করিতেই হয়। যাহা কোনমতে বলিবার জো নাই, এই সঙ্গীত দিয়াই তাহা বলা চলে। অর্থ-বিশ্লেষ করিয়া দেখিলে যে কথাটা যৎসামান্য, এই সঙ্গীতের দ্বারাই তাহা অসামান্য হইয়া উঠে। কথার মধ্যে বেদনা এই সঙ্গীতই সঞ্চার করিয়া দেয়।

অতএব চিত্র এবং সঙ্গীতই সাহিত্যের প্রধান উপকরণ। চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতিদান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ।

কিন্তু কেবল মানুষের হৃদয়ই যে সাহিত্যে ধরিয়া রাখিবার জিনিষ, তাহা নহে। মানুষের চরিত্রও এমন একটি সৃষ্টি, যাহা জড়-সৃষ্টির ন্যায় আমাদের ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আয়ত্তগম্য নহে। তাহাকে দাঁড়াইতে বলিলে দাঁড়ায় না। তাহা মানুষের পক্ষে পরম ঔৎসুক্যজনক, কিন্তু তাহাকে পশুশালার পশুর মত বাঁধিয়া খাঁচার মধ্যে পুরিয়া ঠাহর করিয়া দেখিবার সহজ উপায় নাই।

এই ধরাবাঁধার অতীত বিচিত্র মানব-চরিত্র—সাহিত্য ইহাকেও অন্তরলোক হইতে বাহিরে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। অত্যন্ত দুরূহ কাজ। কারণ, মানবচরিত্র স্থির নহে, সুসঙ্গত নহে—তাহার অনেক অংশ, অনেক স্তর—তাহার সদরে-অন্দরে অবারিত গতি-বিধি সহজ নয়। তা ছাড়া, তার লীলা এত সূক্ষ্ম, এত অভাবনীয়, এত আকস্মিক যে, তাহাকে পূর্ণ আকারে আমাদের হৃদয়গম্য করা অসাধারণ ক্ষমতার কাজ। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন।

এইবার আমাদের সমস্ত আলোচ্য বিষয়কে এক কথায় বলিতে গেলে এই বলিতে হয়, সাহিত্যের বিষয় মানবহৃদয় এবং মানব-চরিত্র।

কিন্তু মানবচরিত্র, এটুকুও যেন বাহুল্য বলা হইল। বস্তুত বহিঃপ্রকৃতি এবং মানব-চরিত্র মানুষের হৃদয়ের মধ্যে অনুক্ষণ যে আকার ধারণ করিতেছে, যে সঙ্গীত ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে, সেই চিত্র এবং সেই গানই সাহিত্য।

ভগবানের আনন্দ প্রকৃতির মধ্যে, মানব-চরিত্রের মধ্যে আপনাকে আপনি সৃষ্টি করিতেছে। মানুষের হৃদয়ও সাহিত্যে আপনাকে সৃজন করিবার, ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টার অন্ত নাই, ইহা বিচিত্র। কবিগণ মানবহৃদয়ের এই চিরন্তন চেষ্টার উপলক্ষ্যমাত্র।

ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত—মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎ-সৃষ্টির আনন্দগীতের ঝঙ্কার আমাদের হৃদয়-বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে—সেই যে মানসসঙ্গীত—ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কি রাগিণী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। সাহিত্য ব্যক্তিবিশেষের নহে, তাহা রচয়িতার নহে—তাহা দৈববাণী। বহিঃসৃষ্টি যেমন তাহার ভালমন্দ, তাহার অসম্পূর্ণতা লইয়া চিরদিন ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে—এই বাণীও তেম্‌নি দেশে দেশে, ভাষায় ভাষায় আমাদের অন্তর হইতে বাহির হইবার জন্য নিয়ত চেষ্টা করিতেছে।

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়।

শেষাংশ।

মহানন্দার পূর্ব্ব, করতোয়ার পশ্চিম, হিমাচলপদতলগত আরণ্যপ্রদেশের দক্ষিণ এবং পদ্মাবতীর উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তর্গত শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী স্থান "বরেন্দ্র"নামে পরিচিত ছিল। অদ্যাপি ইহার অনেক স্থান "বরেন্দ্র"নামেই পরিচিত। ইহার পশ্চিমে মিথিলা এবং পূর্ব্বে কামরূপের রাজ্য। উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বিবিধ পার্ব্বত্য দস্যুদল নিয়ত বরেন্দ্রভূমির উর্ব্বরক্ষেত্রে আপতিত হইত। তাহাদের আক্রমণ নিবারণ করিবার জন্য করতোয়াতটে নানাস্থানে প্রান্তদুর্গ বর্ত্তমান ছিল। অদ্যাপি বর্দ্ধনকোট ও মহাস্থান নামক পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ করতোয়াতটে দেখিতে পাওয়া যায়।

মগধের পূর্ব্ব, সমতট বা বাগ্‌ড়ীর পশ্চিম, মিথিলার দক্ষিণ ও ওড্রদেশের উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থান "রাঢ়"নামে পরিচিত ছিল; অদ্যাপি সেই নাম প্রচলিত আছে। রাঢ় দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চল হইতে আক্রান্ত হইত বলিয়া, তাহার নানাস্থানে গিরিদুর্গ ও বনদুর্গ বর্ত্তমান ছিল।

ব্রহ্মদেশের পূর্ব্ব, সমতটের পশ্চিম, কামরূপের দক্ষিণ ও বঙ্গোপসাগরের উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থান "বঙ্গ"নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বাঞ্চল ও উত্তরাঞ্চল হইতে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকায়, বঙ্গবিভাগেও রণপোতাদি রক্ষিত হইত।

রাঢ়ের পূর্ব্ব, বঙ্গের পশ্চিম, বরেন্দ্রের দক্ষিণ এবং সমুদ্রের উত্তর,—এই চতুঃসীমান্তর্গত স্থান "সমতট" অথবা "বাগ্‌ড়ী" নামে পরিচিত ছিল। এই সমতট-প্রদেশ স্বভাবত সুরক্ষিত বলিয়া, এই বিভাগে কোন

দুর্গাদি বর্ত্তমান ছিল না। এই প্রদেশ অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যে বঙ্গ, রাঢ় ও বরেন্দ্র প্রদেশেই প্রাদেশিক রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। সমতটপ্রদেশে কখনও কোন রাজধানী থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। উত্তরকালে কেবল কিছুদিনের জন্য সুন্দরবনান্তর্গত চন্দ্রদ্বীপে রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল।

এই সকল কারণে সমতটের অন্তর্গত নবদ্বীপে রাজধানী থাকিবার কোন ইতিহাস বা প্রমাণ বা জনশ্রুতিও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মিন্‌হাজ নিজেও তথায় কোন রাজধানীর অস্তিত্ব দেখিয়া যান নাই। কেবল বক্তিয়ারের পার্শ্বচর মুসলমানসেনার নিকট গল্প শুনিবার সময় তাহারই মুখে নবদ্বীপে রাজধানী থাকার কথা শুনিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বিচারে বা তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, প্রকৃত তথ্য জ্ঞাত হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিচারবুদ্ধির আশ্রয়গ্রহণ আবশ্যক মনে করেন নাই। যেখানে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

সেনরাজবংশের রাজ্যবিস্তারের পূর্ব্বে রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও সমতট পালরাজবংশের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহাদের শাসনসময়ে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের নানা রাজধানীর নাম ও পরিচয় পুরাতন তাম্রশাসনে খোদিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা যায়, প্রথমাবস্থায় পাল-নরপালগণ তাঁহাদের ইতিহাসবিখ্যাত পাটলিপুত্রের পুরাতন রাজধানীতে বসিয়াই গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। পরে মুদ্গগিরি-(মুঙ্গের)-নগরে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তাহার পর গৌড়ান্তর্গত পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নানা উপবিভাগে রাজধানী সংস্থাপিত হয়। কিন্তু পাল-নরপালবর্গের শাসনসময়েও সমতটের অন্তর্গত কোন স্থানে কোন রাজধানী সংস্থাপিত হওয়ার প্রমাণ নাই। নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেখা যায়, সমতটনিবাসী শিল্পী ঐ তাম্রশাসনে রাজাজ্ঞা উৎকীর্ণ করিয়াছিল। সেনরাজবংশের অধিকার বিস্তৃত হইয়া সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য তাঁহাদের করতলগত হইবার পর রাঢ়, বরেন্দ্র ও বঙ্গেই রাজধানী সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারাও শ্রীবিক্রমপুরের পুরাতন রাজধানীকেই প্রধান রাজধানী মনে করিতেন।

বক্তিয়ার খিলিজির এদেশে উপনীত হইবার সমসময়ে, সমতটপ্রদেশে কোন রাজধানী থাকিলে, তাহা জয় করিবার জন্য তাঁহাকে অবশ্যই চেষ্টা করিতে হইত। বক্তিয়ারের বঙ্গবিজয়সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারা সম্ভব, তাহাতে লক্ষ্ণৌর, লক্ষ্মণাবতী ও শ্রীবিক্রমপুর আক্রমণের চেষ্টাই জ্ঞাত হওয়া যায়। বক্তিয়ার জীবিত থাকিতে, লক্ষ্মণাবতী ভিন্ন আর কোন গৌড়ীয় হিন্দুরাজধানী তাঁহার করতলগত হয় নাই। তিনি আর যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছেন। বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয় বলিতে কি বুঝিব, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, তাঁহার বঙ্গবিজয়সময়ে এ দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক। যে সকল প্রমাণ অবলম্বন করিয়া এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

(১) প্রথম প্রমাণ,—বিজয়সেনের

প্রদ্যুম্নেশ্বরনামক-শিবমন্দিরের প্রস্তরফলক-লিপি। ইহা উমাপতিনামক কবির রচিত বলিয়া লিখিত আছে। জয়দেব উমাপতির সমসাময়িক। জয়দেব লিখিয়া গিয়াছেন—"উমাপতি বাক্যকে বড় পল্লবিত করিয়া থাকেন।" উমাপতির এই রচনাতেও পল্লবিত বাক্যাবলীর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে যে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নাই, এরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত। উমাপতি বিজয়সেনকে বিজয়ী বীর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য প্রমাণেও ইহা দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। বিজয়সেন বীর না হইলে, পালবংশের অধিকৃত বরেন্দ্রপ্রদেশে রাজধানী ও রাজ্য সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতেন না। সুতরাং অন্য প্রমাণ না থাকিলেও, তাঁহাকে বিজয়ী বীর বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। বিজয়সেন "গৌড়েশ্বর" উপাধি গ্রহণ করিলেও, তিনি যে সমগ্র গৌড়রাজ্য করতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। সত্য হইলে, তিনি রাজশাহীর অন্তর্গত গোদাগাড়ীর নিকট বরেন্দ্রনামক স্থানে রাজধানীসংস্থাপন ও শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠা না করিয়া, ইতিহাসবিখ্যাত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের পুরাতন রাজধানীতেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। কিন্তু প্রস্তরলিপিতে বিজয়সেন গৌড়, কলিঙ্গ ও কামরূপ জেতা বলিয়া বর্ণিত। যথা :—

"ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃতকামরূপ-
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥"

(২) দ্বিতীয় প্রমাণ,—বল্লালবিরচিত "দানসাগর"নামক গ্রন্থের পরিচয়শ্লোকাবলী। তাহাতে বিজয়সেনদেবের বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইবার কথা লিখিত আছে। বিজয়সেন যে সমগ্র গৌড়রাজ্য করতলগত করিতে পারেন নাই, "দানসাগরের" শ্লোকই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। যথা :—

"হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ স্বর্গস্থ নৈসর্গিকে-
রুদ্গীতঃ স্বগণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।"
"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।".

ইহাতে বিজয়সেন বীর ও বিজয়ী বলিয়াই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি বরেন্দ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন,—সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারেন নাই।

(৩) তৃতীয় প্রমাণ,—লক্ষ্মণসেনদেবের বিবিধ তাম্রশাসন। ইহাতে বিজয়সেনের রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, জানিতে পারা যায়। এ পর্য্যন্ত লক্ষণসেনদেবের যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে তদীয় রাজ্যাব্দের সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীবিক্রমপুরের রাজধানীতে থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সকল তাম্রশাসনে বিজয়সেন "বিজয়ী" এবং বল্লালসেন "সংগ্রামাবতার" বলিয়া কীর্ত্তিত। বল্লালই যে সেনরাজবংশের নরপতিবর্গের মধ্যে গৌড়ে রাজধানীসংস্থাপনের পথপ্রদর্শক, গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বল্লালবাড়ীনামক স্থান অদ্যাপি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। লক্ষ্মণসেনদেবের যে তাম্রশাসন মাধাইনগরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি "গৌড়েশ্বর" বলিয়া

আপনার পরিচয়প্রদান এবং কাশীরাজের সহিত সন্ধিস্থাপনের উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) চতুর্থ প্রমাণ,—লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসন। ইহাতে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও, তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাধির উল্লেখ আছে। তাহা কবিকল্পনামাত্র বলিয়া প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তাহা অবশ্যই কোন-না-কোন ঐতিহাসিক তথ্য সুব্যক্ত করিত। উপাধিগুলি এইরূপে কীর্ত্তিত, যথা :

(১) অরিরাজবৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়সেনদেব।
(২) অরিরাজনিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব।
(৩) অরিরাজমদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব।

এই তিন বিখ্যাত নরপতির মধ্যে লক্ষ্মণসেনদেবের পরিচয়স্বরূপ আরও একটি উপাধির উল্লেখ আছে। লক্ষ্মণসেন "অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি" বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। লক্ষ্মণসেনদেবের শ্রীক্ষেত্রে, কাশীধামে ও প্রয়াগেও "সমরজয়স্তম্ভমালা" স্থাপন করিবার কথা এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। এই কয়েকটি প্রমাণে বিজয়সেন, বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের শাসনসময়ে সেনরাজ্যের শৌর্য্যবীর্য্য ও বিজয়কাহিনীর পরিচয় পাওয়া যায়, এবং লক্ষ্মণসেনদেবই যে বাহুবলের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসিত ছিলেন, তাহারও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা বিশ্বরূপসেনের রাজ্যাব্দের চতুর্দ্দশবর্ষীয় লিপি ; তখন লক্ষ্মণসেন স্বর্গারূঢ় ও যবনগণ বিশ্বরূপের নিকট পরাভূত ; বিশ্বরূপ তাঁহাদের পক্ষে "প্রলয়কালরুদ্র" নামে পরিচিত। লক্ষ্মণসেন নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় রাজ্য, রাজধানী ও রাজধর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া, প্রাণ লইয়া অন্তঃপুর হইতে পলায়নের জন্য ব্যাকুল ছিলেন কি না, তাহার বিচার করা অনাবশ্যক। মুসলমান ইতিহাসলেখক রায়-লছ্‌মণিয়া-নামক নরপতির স্কন্ধেই পলায়নকলঙ্ক নিক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন। এই রায় লছ্‌মণিয়া কে ছিলেন ? পুরাতত্ত্ববিৎ জেম্‌স্‌ প্রিন্‌সেফ্‌ প্রথমে এই অনুসন্ধানকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি সেনরাজবংশের নরপতিবর্গের এক নামাবলী স্থির করিয়া যান। তাহা এইরূপ :—

খৃষ্টাব্দ।	নরপতির নাম।
১০৬৩	বিজয়সেন।
১০৬৬	বল্লালসেন।
১১১৬	লক্ষ্মণসেন।
১১২৩	মাধবসেন।
১১৩৩	কেশবসেন।
১১৫১	সদাসেন।
১১৫৪	নারায়ণ।
১২০০	লছ্‌মণিয়া।

এই তালিকা অনুসারে লছ্‌মণিয়া লক্ষ্মণসেনের বহুপরবর্ত্তী নরপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহার পর স্যার আলেক্‌জাণ্ডার কনিংহাম্‌ কতকগুলি তাম্রশাসন, প্রস্তরলিপি ও আইন আক্‌বরি অবলম্বনে আর একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। তাহা এইরূপ :—

খৃষ্টাব্দ।	নরপতির নাম।
১০২৫	বিজয়সেন।
১০৫০	বল্লালসেন।
১০৭৬	লক্ষ্মণসেন।
১১০৬	মাধবসেন।
১১০৮	কেশবসেন।

খৃষ্টাব্দ।	নরপতির নাম।
১১১৮	লছ্‌মণিয়া।
১১৯৮	বক্তিয়ারের বঙ্গবিজয়।

এই তালিকা অনুসারেও লছ্‌মণিয়া লক্ষ্মণসেনের বহুপরবর্ত্তী নরপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন। মিন্‌হাজ বলেন, লছ্‌মণিয়ার রাজ্যাব্দের ৮০ অব্দে বক্তিয়ার বঙ্গদেশে উপনীত হন। মিথিলাপ্রদেশে "লক্ষ্মণাব্দ" নামে এক অব্দ প্রচলিত আছে। খৃষ্টীয় ১১১৯ সাল তাহার আরম্ভকাল। এই প্রমাণ অবলম্বনে বক্তিয়ারের বঙ্গদেশে আগমন ৮০ লক্ষ্মণাব্দে অনুমিত হইলে, কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—লছ্‌মণিয়াই লক্ষ্মণসেন। ৮০ বৎসর রাজ্যভোগ করা সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেন পরিণতবয়সে সিংহাসনে আরোহণ করায়, তাঁহার ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তদীয় রাজ্যাব্দের ৮০ সালে বক্তিয়ারের বঙ্গদেশে উপনীত হওয়া সত্য হইলেও, তৎকালে লক্ষ্মণসেনের জীবিত থাকা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

কিন্তু এই অনুমানই ক্রমে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যে ইতিহাস বলিয়া প্রচারিত হইয়াছে। এখন লক্ষ্মণসেনের পুত্র পর্য্যন্ত সেনরাজবংশের নরপতিবর্গের নামাবলী বিবিধ তাম্রশাসনে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপের যবনসমরে বিজয়ী প্রলয়কালরুদ্র বলিয়া পরিচিত থাকাও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে লছ্‌মণিয়া যে প্রকৃত নাম নহে, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবামাত্র, কেহ কেহ ঐ নাম সংশোধনের চেষ্টা করিয়া উহাকে লাক্ষ্মণ্য-আখ্যা প্রদান করেন। লাক্ষ্মণ্য-নামও মনঃপূত বা ব্যাকরণসম্মত হইল না; তখন লছ্‌মণিয়া "লক্ষ্মণসেন" বলিয়াই অনুমিত হইলেন। এই অনুমান বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বঙ্গসাহিত্যে নানারূপ কবিকল্পনার প্রশ্রয়দান করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক কবিতা কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের লেখনীপ্রসূত। পরিহাসরসিক দ্বিজেন্দ্রলালের রচনাকৌশল লক্ষ্মণসেনদেবকে সভ্যজগতে নিরবচ্ছিন্ন ঘৃণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে:—

"——এই সেই নবদ্বীপ,
যেইখানে বীর আর্য্যকুলের প্রদীপ
বঙ্গেশ লক্ষ্মণসেন, প্রবৃত্ত আহারে,
শুনি সপ্তদশ সেনা উপনীত দ্বারে,
অত্যদ্ভুত-প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব-সহিত,
পশ্চাদ্দ্বার দিয়া, নৌকারূঢ়, পলায়িত,—
একেবারে না চাহিয়া দক্ষিণে ও বামে,
একেবারে উপনীত বারাণসীধামে।"

কবিকুল নিরঙ্কুশ!—স্বদেশের স্মরণীয় বীরচরিত্র বিকৃত করিবার সময়েও নিরঙ্কুশ! এতই নিরঙ্কুশ যে,—প্রাণভয়ে ভীত পলায়নপরায়ণ লক্ষ্মণসেন মুসলমানসেনার আক্রমণে দূরে পলায়ন না করিয়া, মুসলমানের নবাধিকৃত বারাণসীধামে গমন করায়, কাব্য যে কতখানি অসঙ্গত হইয়া উঠিল, তাহার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ নাই!

দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্বে নবীনচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রও লক্ষ্মণসেনকেই পলায়নের কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্র ইহা লইয়া পরিহাসপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করেন নাই; মর্ম্মবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে মর্ম্মবেদনার যথাসাধ্য উপশমসাধনার্থ পশুপতির বিশ্বাসঘাতকতা কল্পনা

করিয়া, যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিতেন, তথায় পশুপতি উপবিষ্ট বলিয়া আক্ষেপপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এস্থলে পশুপতির নাম গৃহীত না হইলেই ভাল হইত। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠের নামই পশুপতি। তিনি বিবিধশাস্ত্রবিশারদ সাধুব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার স্মৃতি বড় নির্দ্দয়রূপে বঙ্গসাহিত্যে পদবিদলিত হইয়াছে!

বরেন্দ্রভূমি সেনরাজবংশের আদিরাজ্য ছিল না। বিজয়, বল্লাল ও লক্ষ্মণ ক্রমে ক্রমে তাহা পাল-নরপালগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বক্তিয়ারের আগমন-সময়ে এই প্রদেশে সেনরাজবংশের সুদৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠিত না থাকায়, লক্ষণের পুত্রগণ আদি-রাজ্যরক্ষার্থ বরেন্দ্র পরিত্যাগ করায়, বক্তিয়ার তাহা কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। বঙ্গরক্ষাই লক্ষ্মণের পুত্রগণের লক্ষ্য ছিল, তাহাতে তাঁহা-দের সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইবার কথা মুসল-মানের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ে সেনরাজবংশীয় কোন নরপতিরই কলঙ্ক ঘোষিত হইতে পারে না। ঘটকদিগের গ্রন্থে যে পুরাতন জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে, তদনুসারে লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কেশবসেন গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিলেও, রাঢ় ও বঙ্গ পরিত্যক্ত হয় নাই। বক্তিয়ার খিলিজি পরিত্যক্ত গৌড়-বিভাগই অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; অপরিত্যক্ত রাঢ় ও বঙ্গবিভাগ অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইতে হইয়াছিল। রাঢ় বক্তিয়ার খিলিজির জীবিত থাকা পর্য্যন্ত অধিকৃত হয় নাই; বঙ্গ বক্তিয়ার খিলিজির মৃত্যুর পর অর্দ্ধশতাব্দী পর্য্যন্তও অধিকৃত হয় নাই;— তাহার প্রমাণ মুসলমানের ইতিহাসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। বঙ্গকবি পলায়নকলঙ্কের সরস কবিতায় বঙ্গসাহিত্য পূর্ণ করিয়াছেন; কিন্তু লক্ষ্মণাত্মজ বিশ্বরূপসেনের স্বদেশরক্ষার কীর্ত্তিকাহিনী ঘোষণা করিবার জন্য লেখনী-চালনা করেন নাই।

লক্ষ্মণসেন দুর্ব্বলহস্তে রাজদণ্ড ধারণ করেন নাই। তাঁহার শাসনসময়ে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য দক্ষিণ ও পশ্চিমে বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। অদ্যাপি মিথিলাপ্রদেশে "লক্ষ্মণ-সংবৎসর" প্রচলিত থাকিয়া লক্ষ্মণসেনের রাজ্যবিস্তারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। বিশ্বরূপসেনের তাম্র-শাসনে লিখিত আছে:—

"বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুসলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালা ন্যধায়ি॥"

এই বর্ণনার সহিত লক্ষ্মণসেনদেবের "অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি"-নামক সুদীর্ঘ উপাধির সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই সুবিস্তৃত গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য যে প্রণালীতে শাসিত হইত, তাম্রশাসনে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। লক্ষ্মণশাসনসময়ে গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্য যে সুরক্ষিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল হইতে মিথিলার পথে কেহ আক্রমণ করিলে, তাহার গতিরোধের কোন উপায় ছিল না।

বনদুর্গে ও গিরিদুর্গে রাঢ়ের পশ্চিমাঞ্চল সুরক্ষিত ছিল; করতোয়ার প্রবল প্রবাহ এবং করতোয়াতটাবস্থিত প্রান্তদুর্গ উত্তরবঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চল সুরক্ষিত করিয়াছিল। কিন্তু উত্তরবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চল কাশী পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত সমতলক্ষেত্র;—তাহা কোনরূপে দুর্গাদি-দ্বারা সুরক্ষিত ছিল না। কাশীরাজ্য যবন-হস্তে পতিত হইবার পর, কাহারও পক্ষে সহজে মিথিলা ও উত্তরবঙ্গ রক্ষা করিবার সম্ভাবনা ছিল না;—তজ্জন্যই তাহা কেশব-সেন-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়া সম্ভব। গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রাজ্যের শেষ স্বাধীন নরপতির প্রাণভয়ে অন্তঃপুর হইতে পলায়ন করা সত্য হইলে, বক্তিয়ার খিলিজি সমগ্র গৌড়ীয় হিন্দু-সাম্রাজ্যেই অধিকারবিস্তার করিতে পারি-তেন; তাঁহাকে উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিতে হইত না। মিন্‌হাজ পুরাতন সৈনিকের মুখে যে গল্পগুজব শ্রবণ করিয়া-ছিলেন, তাহা যে গল্পমাত্র,—ঐতিহাসিক সত্য নহে, এই ঘটনাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

বক্তিয়ার খিলিজির উত্তরবঙ্গ অধিকার করিয়া লক্ষ্মণাবতীতে রাজধানীস্থাপন করার কথা মুসলমানের ইতিহাসে লিখিত থাকিলেও, কোন্ সময়ে এই কার্য্য সাধিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে বিলক্ষণ তর্কবিতর্ক উত্থাপিত হইতে পারে। বক্তিয়ার খিলিজি বিহার অধিকার করিবার পরই উত্তরবঙ্গ অধিকার করেন। কিন্তু তিনি তথায় বাস করিতেন বলিয়া বোধ হয় না। ৫৯৯ হিজরীতে (১২০১ খৃষ্টাব্দে) সুলতান যখন কালেঞ্জরের দুর্গ জয় করিয়া কাল্‌পী অধিকার করেন, তখন বক্তিয়ার খিলিজি বঙ্গবিজয়ের বৃত্তান্ত সম্রাটের গোচর করিয়া উপঢৌকনপ্রদানার্থ তাঁহার নিকট উপনীত হন। মুসলমান-লিখিত ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, বক্তিয়ার এই সময়ে বিহার হইতেই সম্রাটের নিকট গমন করিয়াছিলেন; এবং সুলতানের নিকট হইতে প্রত্যাগত হইয়া বহুসংখ্যক অপরিশুদ্ধ হিন্দুদেবমন্দির ধ্বংস ও অচিহ্ন করিয়া পরমপবিত্র মোহম্মদীয় ধর্ম্মের উপাসনাগৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ারের বঙ্গবিজয় এবং তাঁহার দ্বাদশবর্ষ বঙ্গদেশশাসনের কথা কেবল কথার কথা।* ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তরবঙ্গ আক্রান্ত ও ১২০১ খৃষ্টাব্দের পর তথায় মুসলমানশাসনের সূত্রপাত হইয়া-ছিল বলিয়া বোধ হয়। গৌড়ীয় হিন্দুসাম্রা-জ্যের যে অংশ এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া মুসলমানের করতলগত হয়, তাহা প্রকৃত-পক্ষে অধিকার করিতে বক্তিয়ার খিলিজির তিন-চারি-বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। ইহার পর তিনি দুইবৎসরমাত্র জীবিত ছিলেন। সে দুই বৎসরের ইতিহাস কেবল সৈন্যসংগ্রহ, যুদ্ধকলহ, মহানন্দার তীর হইতে করতোয়ার তীর পর্য্যন্ত যুদ্ধযাত্রা; করতোয়া উত্তীর্ণ হইবার পর প্রত্যাবর্ত্তন ও পথিমধ্যে মৃত্যু প্রভৃতি বিবিধ বিবরণে পরিপূর্ণ। সুতরাং বক্তিয়ার খিলিজির প্রকৃতপক্ষে উত্তরবঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সসৈন্যে নানাস্থান পরি-ভ্রমণ করা ভিন্ন যথারীতি শাসনকার্য্য পরি-চালনা করিবার অবসর প্রাপ্ত হওয়া ও দ্বাদশ-

* এই সকল কারণে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গবিজয়ের কথা লিখিত হইয়া থাকিবে।

বৎসর বঙ্গদেশ শাসন করা বিশ্বাস করা যায় না। যাহারা পলায়নপর কাপুরুষ বলিয়া কাব্যে, উপন্যাসে ও ইতিহাসে লাঞ্ছিত, তাহাদের দেশে বক্তিয়ার খিলিজির বীরবাহু দ্বাদশবৎসরেও মুসলমানশাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। কেন পারে নাই, তাহার কারণপরম্পরার বিস্তৃত বিবরণ বিলুপ্ত হইলেও, তাহা অনুমান করিয়া লইতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে না। ইতিহাসে যত কথা লিখিত আছে, তাহা সত্য হইলে, এরূপ ঘটনা সংঘটিত হইত না। বক্তিয়ার খিলিজি যে দুইবৎসর স্বয়ং উত্তরবঙ্গে বিচরণ করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তৃত কাহিনী "রিয়াজ-উস্-সালাতিন" হইতে উদ্ধৃত হইল।

"অতঃপর* বখ্‌তিয়ার খেতো † ও তাব্বৎ আক্রমণের জন্য ১০।১২হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বাঙ্গালার উত্তরপূর্ব্ব পার্ব্বত্যপথে গমন করিলেন। পথিমধ্যে কোচ-প্রদেশের আলিমেচ-নামক জনৈক শ্রেষ্ঠব্যক্তি বখ্‌তিয়ারের হস্তে পবিত্র এস্‌লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি বখ্‌তিয়ারের সৈন্যগণের পার্ব্বত্যপ্রদেশের পথপ্রদর্শক ও অগ্রগামী হইলেন।

"আলিমেচ বখ্‌তিয়ারের সৈন্যগণকে অন্য একটি প্রদেশে লইয়া যান। ঐ প্রদেশে আবদ্ধন ও বরমনগতি নামক নগর বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই নগর রাজা গরসাসেপের কীর্ত্তি। গঙ্গানদীর ত্রিগুণ গভীরতা ও বিস্তার বিশিষ্ট নমকদ্দী-নাম্নী এক নদী ‡ ঐ নগরের সম্মুখে প্রবাহিত হইত। উহা পার হইবার কোন উপায় ছিল না। এজন্য বখ্‌তিয়ার ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া দশদিন পরে অন্য একস্থানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে নদীর উপর এক বৃহৎ সেতু ছিল; উহা ২৯টি প্রস্তর-নির্ম্মিত খিলানের উপর দণ্ডায়মান। §

"ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ বলিয়া গিয়াছেন যে, গরসাসেপ যখন হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন, তখন ঐ সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তিনি কামরূপে আসিয়াছিলেন। মোহম্মদ বখ্‌তিয়ার সেতু-পথে নদী পার হইয়া অগ্রসর হইলেন। দুই-

* "When several years had elapsed he (Bakhtiyar) received information about the territories of Turkistan and Tibet to the east of Lakhnanti and he began to entertain a desire of taking (them). For this purpose he prepared an army of about ten thousand horse." Tabakht-i-Nasiri. *Trans.*

ষ্টুয়ার্ট-সাহেব এখানে এক বৎসর (In the course of a year) বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন।—Stewart's Bengal. p. 28.

† তুর্কিস্থানের নাম।

‡ গোলাম হোসেন এখানে স্থানের নাম লইয়া গোল করিয়াছেন। অথবা তাঁহার অপরাধ কি? হস্তলিখিত 'নাসিরী'পুস্তক এজন্য দায়ী। পরবর্ত্তী লেখকে এগুলি নানারূপে পাইয়াছে। কথিত নগরটি 'বর্দ্ধনকোট' ও নদীর নাম 'বাঘমতী'—নাসিরীগ্রন্থের অনেক খণ্ড মিলাইয়া এরূপ স্থিরীকৃত হইয়াছে। বগুড়াজেলার উত্তরাংশে গোবিন্দগঞ্জের নিকট করতোয়া-নদী-তীরে প্রাচীন বর্দ্ধনকোটের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। 'বাঘমতী'ই করতোয়া এবং দশদিন ধরিয়া করতোয়া ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর পার্শ্ব দিয়া বখ্‌তিয়ারের সৈন্যেরা যাত্রা করে,—পণ্ডিতবর ব্লকম্যান্ এইরূপ অনুমান করেন।

§ ইলিয়ট্‌-সাহেবের ইতিহাসের অনুবাদে খিলান্‌-সংখ্যা ২০টি এবং ষ্টুয়ার্টের গ্রন্থে ২২টি, অথচ উভয়েই এক নাসিরীগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াছেন। সম্ভবত মূলগ্রন্থের বিংশত্যধিক (Twenty odd) কথা নানা জনে নানা ভাবে লইয়াছেন।

জন অশ্বারোহী কতিপয় সৈনিক সহ পুলের রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত রহিল। কামরূপের রাজা অগ্রসর হইতে বাধা দিয়া কহিলেন,* 'যদি অধুনা তীব্বৎ-অভিযানে ক্ষান্ত হইয়া আগামী বর্ষে উপযুক্ত সৈন্য ও দূত সহ বখ্‌তিয়ার আগমন করেন, তবে তিনি এস্‌লাম-সৈন্যের অগ্রগামী হইয়া (তাহাদের সহায়তা-সাধনার্থ) পরিশ্রম করিবেন।' কিন্তু বখ্‌তিয়ার কামরূপের রাজার বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইলেন এবং ষোড়শ-দিবস পরে তীব্বৎ-দেশে উপনীত হইলেন। তথায় গরসাসেপ শাহের এক সুদৃঢ় দুর্গে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। যুদ্ধে বহু এস্‌লাম-সৈন্য নিহত হইল, তথাপি বখ্‌তিয়ার দুর্গ অধিকার করিতে পারিলেন না।

"শত্রুপক্ষীয় যে সকল লোক বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের নিকট বখ্‌তিয়ার অবগত হইলেন যে, উক্ত দুর্গের পঞ্চক্রোশ দূরে এক বৃহৎ নগর আছে। † পঞ্চাশৎসহস্র ধনুর্ধারী তুর্কী অশ্বারোহী ঐ নগরে অবস্থান করে। প্রত্যহ ঐ নগরের অশ্ববিপণীতে ১৫শত অশ্ব বিক্রীত হয়। এই স্থান হইতেই লক্ষ্ণৌতী-দেশে অশ্ব প্রেরিত হইয়া থাকে। ‡ বন্দিগণ কহিল, 'এই সামান্যসৈন্যবলে উক্ত নগর অধিকার করা অসম্ভব।' বখ্‌তিয়ার নগরের দুরাক্রম্যতা চিন্তা করিয়া নিরাশ-ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের সময় তাঁহাকে বিষম দুরবস্থায় পড়িতে হইয়াছিল। দেশের অধিবাসিগণ খাদ্যদ্রব্য ও গৃহপালিত পশু সহ স্ব স্ব আবাস-গৃহসকল দগ্ধ করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি সঙ্গে লইয়া পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত হইয়াছিল। প্রত্যাগমনের পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত বখ্‌তিয়ারের সৈন্য কুত্রাপি মনুষ্য বা পশুর আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিল না। পঞ্চদশ দিন কেবল পশুমাংসে জীবনরক্ষা করিয়া বখ্‌তিয়ার সসৈন্যে সেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। যে দুইজন অশ্বারোহীকে বখ্‌তিয়ার সেতুর রক্ষা-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, পরস্পর বিবাদ করিয়া তাহারা প্রস্থান করিলে, তদ্দেশের অধিবাসিগণ সেতু ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। আশান্বিত হইয়া বখ্‌তিয়ার সেতুর নিকট আসিয়াছিলেন, সেতু ভগ্ন দেখিয়া সকলেরই হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। বখ্‌তিয়ার চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইয়া ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অনেক অনুসন্ধানে সংবাদ পাওয়া গেল যে, নিকটবর্ত্তী একস্থানে একটি বৃহৎ দেবালয় আছে। ঐ দেবালয়ে রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্ম্মিত অতি বৃহৎ বৃহৎ নির্জীব মূর্ত্তিসকল দণ্ডায়মান ছিল। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ দেবালয়ে সহস্র-মণ-পরিমিত একটি দেবমূর্ত্তি ছিল। বখ্‌তিয়ার স্বীয় সৈন্যসহ ঐ দেবালয়ে অবস্থান করিয়া নদী উত্তরণের জন্য তরি নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন।

* বখ্‌তিয়ারের গন্তব্যপথ কামরূপরাজ্যের পার্শ্বদেশ ও কথিত সেতু দার্জিলিং-এর নিকটবর্ত্তী স্থানে ছিল, ইহাই ব্লকম্যান্‌-সাহেবের বিশ্বাস। বর্ত্তমানেও মেচ্‌জাতির বাসস্থান হইতে অন্যান্য পার্ব্বত্যজাতির বাসস্থানের সীমান্তরেখা দার্জিলিং-এর ৬ক্রোশ দক্ষিণ পাঙ্খাবাড়ী-নামক স্থান।

† নাসিরী-পুস্তকে এই নগরের নাম—'করমূনাটান্‌' বা 'করবাটান্‌'। ইহার স্থান অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

‡ এগুলি 'টাঙ্গট' ঘোড়া (Targ) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। নাসিরী-পুস্তককার বলিয়াছেন, তীব্বৎ হইতে কামরূপে আসিতে ৩৫টি পার্ব্বত্যপথ আছে। এই সমস্ত পথ দিয়া এ দেশে অশ্ব আনীত হইত

"কামরূপাধিপতির আদেশে ঐ দেশের সৈন্য ও প্রজাবর্গ দেবালয়-অবরোধার্থ তাহার চতুর্দ্দিকে বাঁশের খুঁটিসমূহ প্রোথিত করিয়া প্রাচীরের ন্যায় প্রস্তুত করিল। দেবালয়ে অবস্থান করিলে মৃত্যু নিশ্চিত দেখিয়া বখ্‌তিয়ার সসৈন্যে প্রাচীরের দিকে যুদ্ধার্থ ধাবিত এবং এক দিকে ভগ্ন করিয়া দেবালয় হইতে বহির্গত হইলেন। শত্রুসৈন্য নদীকূল পর্য্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

"মোসলমানসৈন্য সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় নদীতীরে দণ্ডায়মান ছিল। তাহাদের কতক সৈন্য তরবারির আঘাতে নিহত, কতক বা নদীজলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই সময় হঠাৎ বখ্‌তিয়ারের একজন অশ্বারোহী নদীতে অবতরণ করিল। একটি বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে যতদূর যায়, জলমধ্যে সে ততদূর হাঁটিয়া যাইতে পারিল। তদ্দর্শনে সমস্ত সৈন্য জলে অবতরণ করিল। নদীর গর্ভ কেবল বালুকাময় ছিল, বহুলোকের পদাঘাতে উহার বালুকারাশি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া জলের গভীরতা বর্দ্ধিত হওয়ায় বহুসৈন্য জলমগ্ন হইল। কেবল বখ্‌তিয়ার ও একসহস্র অশ্বারোহী (মতান্তরে ৩০০শত) পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। হতাবশিষ্ট সঙ্গিগণ সহ বখ্‌তিয়ার ভগ্নহৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুরুতর অবসাদে তাঁহার জ্বর ও কাশরোগ হইল। তিনি দেবকোটে উপনীত হইয়াই পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইলেন।"

সমাপ্ত।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

সার সত্যের আলোচনা।

আলোচ্য বিষয়।

বিগত প্রবন্ধের শেষভাগে একটি প্রশ্ন উঠিয়াছিল এই যে, কাতরভাবে পরমেশ্বরকে ডাকিবার সময় লোকে করজোড়ে উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করে, অথচ সর্ব্বসাধারণের ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী; ইহার ভাবখানা কি? আমাদের দেশের শাস্ত্রে তো আছেই—"তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"—সেই বিষ্ণুর পরম স্থান সর্ব্বদা দেখেন সূরিগণ দ্যুলোকে যেন চক্ষু আতত"; তা ছাড়া, অন্যান্য দেশেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি যত্র-তত্র শুনিতে পাওয়া যায়—যেমন এই একটি কথা—"Heart within and God o'erhead"। ইহার কারণ কি? কারণ হ'চ্চে এই:—

মনে কর, তোমার আত্মার সঙ্গে আমি বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করিতেছি; কোথায় আমি তোমার আত্মার সাক্ষাৎ পাইব? তুমি হয় তো বলিবে যে, "যাঁহার

মধ্যে যেমন পাখী থাকে—আমার শরীরের মধ্যে তেমনি আত্মা আছেন।" কিন্তু সে কথা হইতে পারে না এইজন্য—যেহেতু ভিতর-বাহির দূর-নিকট প্রভৃতি কোনোপ্রকার আকাশঘটিত সম্বন্ধ নিরাকার আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না; আত্মাকে নাগালই পায় না—স্পর্শ করিবে কেমন করিয়া? আকাশঘটিত কোনোপ্রকার সম্বন্ধ আত্মাকে স্পর্শ করিতে না পারুক্, তথাপি তোমার সহিত আমি যখন বাক্যালাপ করিতেছি তখন কাজের গতিকে আমাকে অগত্যা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, তোমার আত্মা আমার ডাহিনেও নহে—বামেও নহে—উপরেও নহে—নীচেও নহে—পরন্তু সম্মুখে বর্ত্তমান; কেন না, তোমার সহিত বাক্যালাপের সময় তোমার আত্মা তোমার মুখ-চক্ষুর অভ্যন্তর হইতে উঁকি দিতেছে, এই ভাবে আমি তোমার আত্মাকে উপলব্ধি করি। এক-তো আত্মা অনাকাশে অবস্থিতি করেন, আর, সেইজন্য ভিতর-বাহির দূর-নিকট প্রভৃতি আকাশঘটিত সম্বন্ধ আত্মাতে সংলগ্নই হয় না; তাহাতে আবার, যদি-বা পাঁচজনের মতে মত দিয়া মোটামুটি মানিয়া লওয়া যায় যে, আত্মা শরীরের ভিতরে আছেন, তাহা হইলে আর-এক দিকে গোল বাধে এই যে, আত্মা তো মনুষ্যের সর্ব্বশরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন; আমরা তবে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলেরই প্রতি লক্ষ্য করি কেন? পদাঙ্গুলির প্রতি লক্ষ্য করি না কেন?

উপরে যাহা ইঙ্গিত করা হইল, তাহাতে সহজ-বুদ্ধিতে সহজেই এইরূপ প্রতীয়মান হইতে পারে যে, যে-কারণে লোকে মনুষ্যের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় মনুষ্যের মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপ্রেরণ করে, সেই কারণে ঈশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় ঊর্দ্ধ আকাশে দৃষ্টিপ্রেরণ করে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, সে কারণ কি?

ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

সে কারণ যে কি, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে চারিটি বিষয় আনুপূর্ব্বিক বুঝিয়া দেখা আবশ্যক—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা।

(৩) দুয়ের সৌসাদৃশ্য।

(৪) সমস্তের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য।

আপাতত মনে হইতে পারে যে, মনুষ্য-শরীরে রক্তবাহিনী নাড়ির নদী-নালা, বায়ু-বাহিনী নাড়ির ডালপালা, তৈজসতন্তুর মাকড়-সার জাল, অস্থি'র ইষ্টক-গাঁথুনি, মাংসপেশীর কব্‌জা-বন্ধন, মেদের প্রলেপ এবং মাংসের ছাউনি, এই সকল নানাবিধ উপকরণের একটা পরিপাটি-রকমের ব্যবস্থা আছে; সেই ব্যবস্থার পশ্চাৎ ধরিয়া প্রাণ-মন-বুদ্ধি অনাহূতভাবে একে একে শরীরের মধ্যে আসিয়া জোটে; পক্ষান্তরে, বহির্জগতে সকলই এলোমেলো কাণ্ড;—সেখানে প্রাণ-মন-বুদ্ধির বাসের উপযোগী না আছে বসিবার আসন, না আছে শোবার বিছানা, না আছে ব্যবহার্য্য-দ্রব্যাদির আয়োজন;—সেখানে কেহ কাহাকেও চেনে না—কেহ কাহারো খোঁজ লয় না—কেবল একএকটা বিশাল বিশাল কাণ্ড (সমুদ্র—পর্ব্বত—মরুভূমি—অরণ্য—ইত্যাকার বৃহৎ বৃহৎ

অসাড় অচেতন ভূত-নিচয়) শত-শত-যোজন জায়গা জুড়িয়া পড়িয়া আছে যেন কুম্ভকর্ণের প্রপিতামহ !

বলিতেছ কি ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা নাই—না তোমার চক্ষু নাই ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে যদি ব্যবস্থা না থাকিবে, তবে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে ব্যবস্থা আসিবে কোথা হইতে ? (১) পৃথিবীর স্তরসজ্জা ; (২) বায়ুমণ্ডলের স্তরসজ্জা ; (৩) অভ্রভেদী পর্ব্বত এবং পাতালস্পর্শী সমুদ্রের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের বোঝা-পড়া ;—তুষার মুকুটের বাষ্পরূপী কাঁচা-মাল বায়ু-বোঝাই করিয়া পর্ব্বতসমীপে পাঠাইবেন সমুদ্র, আর, নানা দেশের নানা-জাতীয় মৃত্তিকান্তরণ নদনদী-বোঝাই করিয়া সমুদ্রসমীপে পাঠাইবেন পর্ব্বত, উভয়ত এইরূপ আমদানি-রপ্তানির বন্দোবস্ত ; (৪) বিস্পষ্ট আলোক লইয়া সূর্য্য উঠিবেন দিবা-ভাগে, নিদ্রারসার্দ্র সুমধুর আলোক লইয়া চন্দ্রমা উঠিবেন রাত্রিকালে, এইরূপ রকম-ওয়ারি আলোকের উদয়াস্তের পালা-বিভাগ ;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের এ কি কম ব্যবস্থা ? বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ইত্যাকার অনি-র্ব্বচনীয় মহা-মহা ব্যবস্থার কোনো একটা'র একচুল এদিক্-ওদিক্ হউক্ দেখি—তৎক্ষণাৎ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের আভ্যন্তরিক ব্যবস্থার বিপর্য্যয়-দশা উপস্থিত হইবে। অতএব ব্যবস্থা-পারিপাট্য ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেও তেমনি ; অণুবীক্ষণের চক্ষেও যেমন তাহা প্রকাশমান, দূরবীক্ষণের চক্ষেও তেমনি তাহা প্রকাশমান। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, কে আগে, কে পিছে ? কে বড়, কে ছোটো ? কে দাতা, কে গ্রহীতা ? কে কাহার খাইয়া মানুষ ? এ কথার উত্তর স্পষ্টই পড়িয়া আছে ;—ধান্যক্ষেত্রের মৃত্তিকাতেই মনুষ্যের শরীর গঠিত, সমুদ্রের নোনতা জলেই মনুষ্যের রক্ত রসান্বিত, সূর্য্যের আলোকেই মনুষ্যের চক্ষু আলো-কিত ; মনুষ্যের নিশ্বাস-প্রশ্বাস আকাশের বায়ুমণ্ডলেরই জোয়ার-ভাঁটা। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পদার্থটা কি ? না, সেদিনকার আমি বা তুমি বা তিনি। বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড কি ? না, যেখানে যত আমি বা তুমি বা তিনি আছেন বা ছিলেন বা থাকিবেন, সমস্ত লইয়া বৃহৎ এক ব্যাপার। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা আছে, তাহা তো বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেই ; তা ছাড়া, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে যাহা নাই, তাহাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে ; দশবৎসর পরে যে বালক ভূমিষ্ঠ হইবে, সেই অজাত-বালকও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছে (বালকরূপে না থাকুক্—আর-কোনোরূপে আছে) ; আর, একশত-বৎসর পূর্ব্বে যে মহাত্মারা বঙ্গদেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই স্বর্গীয় মহাত্মারাও বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আছেন ; কি বেশে এবং কি ভাবে আছেন, সে কথা স্বতন্ত্র। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে জ্ঞান, প্রাণ, মন প্রভৃতি যেখানে যত-কিছু ব্যাপার আছে, সমস্তেরই আকর-ভূমি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। অতএব এটা স্থির যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড বড়, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ছোটো ; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড দাতা, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড গ্রহীতা ; বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড চিরযৌবনসম্পন্ন কত-কালের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ তাহা বলা যায় না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-গুলি সেদিনকার অভিনব বালক, তাহার মধ্যে অনেকে অকালবৃদ্ধ।

দুই পক্ষের নাম তুমি যাহাই দেও না কেন—সমষ্টি-ব্যষ্টি নামই দেও, বড়-ছোটো

নামই দেও, আর দাতা-গ্রহীতা নামই দেও— নাম যাহা দিতে হয় দেও, কেবল এইটি মনে রাখিও যে, দুই পক্ষ একসূত্রে গাঁথা। সে সূত্র হ'চ্চে সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। কাজেই দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ অবশ্যম্ভাবী। সম্বন্ধ যখন অবশ্যম্ভাবী—তখন সম্বন্ধানুযায়ী কার্য্যও অবশ্যম্ভাবী। সে কার্য্য কি? না, অভাবের পূরণ। অভাব কাহার? যে ছোটো, যে গ্রহীতা, যে ব্যষ্টি, তাহার: ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের। অভাবের পূরণকর্ত্তা কে? না, যিনি বড়, যিনি দাতা, যিনি সমষ্টি, তিনি;—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, দোঁহার মধ্যে ব্যাপার যাহা চলিতেছে, তাহা সংক্ষেপে এই ঃ—

(১) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড চা'ন।

(২) বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড ছ্যান।

(৩) ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পা'ন।

চাওয়ার সহিত পাওয়ার সংযোগের নামই আনন্দ। চাওয়ার পূরণচেষ্টার নামই কর্ম্মচেষ্টা এবং চাওয়ার পূরণের নামই ভোগ। একাকী কেবল আমি নহি বা তুমি নহ, পরন্তু জগৎশুদ্ধ সমস্ত লোকই চাহিতেছে, চেষ্টা করিতেছে, পাইতেছে; কাজেই, চাওয়া'র সহিত চাওয়া'র সুর-মিলানো চাই, চেষ্টার সহিত চেষ্টার সুর-মিলানো চাই, পাওয়ার সহিত পাওয়ার সুর-মিলানো চাই; লোকমধ্যে একটা ব্যবস্থা চাই। চাহিবারও একটা ব্যবস্থা আছে, চেষ্টা করিবারও একটা ব্যবস্থা আছে, পাইবারও একটা ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চাহিলে চাওয়াও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া চেষ্টা করিলে চেষ্টাও নিষ্ফল হয়, ব্যবস্থাকে উল্লঙ্ঘন করিয়া পাইলে পাওয়াও নিষ্ফল হয়। দৈত্যদানবেরা যখন দেবতাদিগের যজ্ঞের ভাগ হরণ করিয়া "পাইয়াছি" বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করে, তখন তাহাদের জানা উচিত যে,—

> "অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
> ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥"

"অধর্ম্মের দ্বারা লোকে তো বৃদ্ধি পায়, তাহার পরে কল্যাণ দ্যাখে, তাহার পরে শত্রুদিগকে জয় করে, সমূলে কিন্তু বিনাশ পায়!" ব্যবস্থা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও যেমন—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যেও তেমনি ইহা পূর্ব্বে দেখা হইয়াছে। তা ছাড়া, দুই ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগেরও একটা ব্যবস্থা আছে: সে ব্যবস্থার একটা সংসামান্য নমুনা এই ঃ—

ক্ষুধা হ'চ্চে চাওয়া; ক্ষেত্রকর্ষণ হ'চ্চে কর্ম্মচেষ্টা: বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষেত্রজাত অন্ন দ্বারা ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের উদরপূরণ হ'চ্চে ভোগ। ক্ষুদ্‌বোধ করিতে হইবে, কর্ম্মচেষ্টা করিতে হইবে, অন্নভোজন করিতে হইবে, এই হ'চ্চে ব্যবস্থা। তুমি হয় তো বলিবে যে, "এ যে ব্যবস্থা তুমি দেখাইতেছ—এটা বড্ড-একটা নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা; উহার নাম করিতে লজ্জাবোধ হয়! মনুষ্য দেবতুল্য জীব—সে কিনা পেটের জ্বালায় লাঙল ধরিবে! ধিক্!" মুখে বলিতেছ—"নীচের শ্রেণীর ব্যবস্থা"—কিন্তু সেই নীচশ্রেণীর ব্যবস্থা উল্লঙ্ঘন করিয়া উচ্চশ্রেণীর ব্যবস্থায় ওঠো দেখি—কেমন তুমি বীরপুরুষ! তোমার উদরে একদিন অন্ন না পড়িলে

তোমার সাধের মস্তিষ্ক চতুর্দ্দিক্ ভোঁভাঁ দেখিতে থাকিবে! কি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড, কি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড, দুয়েরই ব্যবস্থা এমনি কড়াকড় যে, মস্তক যে মাথা উঁচু করিয়া উদরকে বলিবেন—"তুমি কোনো কাজের নহ, তোমাকে চাহি না"; অথবা উদর যে পিত্তবমন করিয়া মস্তককে বলিবেন—"তুমি কোনো কাজের নহ, তোমাকে চাহি না"; সূর্য্য যে চোখ রাঙাইয়া পৃথিবীকে বলিবেন—"দূর হও, তোমাকে চাহি না"; অথবা পৃথিবী যে মুখ বাঁকাইয়া সূর্য্যকে বলিবেন—"তুমি যাও, তোমাকে চাহি না"; তাহার জো নাই। সকলেরই সকলকে চাহিতে হইবে—তবে কিনা ব্যবস্থা অনুসারে। উদর যদি চায় যে, "মস্তক আমার কাজ করুন্, আমি মস্তকের কাজ করিব", তবে সেরূপ চাওয়া ব্যবস্থাবিরুদ্ধ, সুতরাং নিতান্তই নিষ্ফল।

এখন দেখিতে হইবে এই যে, ব্যবস্থা প্রধানত বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডেরই ব্যবস্থা—ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের ব্যবস্থা সেই মূল ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত। কথাটার ভাব এই:—

সমস্ত-শরীরের যেমন মস্তিষ্ক আছে বাহুরও তেমনি মস্তিষ্ক আছে; বাহুর মস্তিষ্ক বাহুমূলে অবস্থিতি করে। কিন্তু "মস্তিষ্ক" বলিতে প্রধানত মাথার মস্তিষ্কই বুঝায় বাহুর মস্তিষ্ক বুঝায় না। অঙ্গুলি যদি বলে যে, "মাথার মস্তিষ্কের খবরে আমার কি কাজ—আদা'র ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কি কাজ? আমার কাছে বাহুর মস্তিষ্কই মস্তিষ্ক!" তবে অঙ্গুলির মুখে সে কথা শোভা পাইলেও মস্তকের মস্তিষ্ক সে কথায় কখনই সায় দিতে পারে না; মস্তকের মস্তিষ্ক হাসিয়া বলে যে, "আমি যদি শক্তিসংহার করি—তবে বাহুর মস্তিষ্ক সেই দণ্ডে আড়ষ্ট হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িবে, তাহা সে জানে না।" ফল কথা এই যে, সমষ্টির কাছে ব্যষ্টির প্রভুত্ব খাটে না। বাহুমূলের প্রভুত্ব অঙ্গুলির কাছেই খাটে—মস্তকের কাছে খাটে না। বাহুর মস্তিষ্ক এবং মস্তকের মস্তিষ্কের মধ্যে যেমন ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ এবং বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের মধ্যেও তেমনি ব্যষ্টি-সমষ্টি-সম্বন্ধ। কাজেই বলিতে হয় যে, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষই মুখ্য হিরণ্ময় কোষ, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ তাহার একটা চুম্বক অনুলিপি বা প্রতিলিপি। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ যেমন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রদল আসন, বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষ তেমনি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে আত্মার সহস্রাংশু আসন। অতএব সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ্বরের প্রতি প্রণিধান করিবার সময় লোকের চক্ষের চাওয়া এবং প্রাণের চাওয়া দুইই যে স্বভাবতই উৰ্দ্ধে—বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের হিরণ্ময় কোষের দিকে—প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, সূর্য্যের এক নাম সবিতা কিনা প্রসবিতা। সূর্য্য এক সময়ে পৃথিবী ছাড়াইয়া আরো অনেকদূর পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। "কে বলিল?" বলিয়াছেন কম কেহ ন'ন—জ্যোতির্বিদ্যা! বিদ্যার কথার ভাবে এইরূপ প্রতিপন্ন হয় যে, আদিমকালে মহৎ এক তৈজসপদার্থ—অতীব

সূক্ষ্ম তৈজসপদার্থ—নিখিল আকাশে পরিব্যাপ্ত ছিল: সেই সুসূক্ষ্ম তৈজসপদার্থ হইতে পৃথিব্যাদি লোকমণ্ডল প্রসূত হইল। পৃথিবী সূর্য্য হইতে নীচে নাবিয়া আসিয়াছে অনেকদূর পর্য্যন্ত ;—সূর্য্য পৃথিবীর প্রাণকে উপরের দিকে অর্থাৎ আপনার দিকে টানিতেছে। তা'র সাক্ষী—বৃক্ষেদের মূল বা মস্তক যদি-চ ভূগর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে, তথাপি বৃক্ষেরা ঊর্দ্ধে হাত-পা ছুঁড়িয়া আকাশের অভিমুখে ডালপালা বিকীর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে না। বৃক্ষেরা ভূগর্ভ হইতে মূল বা মাথা বাহির করিতে পারে না—সর্পেরা কিন্তু তাহা পারে। তবে কিনা সর্পেরা পৃথিবীর সঙ্গে লপ্‌টা-লপ্‌টি-ভাবে চলাফেরা করে। পশ্বাদি জন্তুরা কেহ বা সরু-সরু দুই স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন সারসপক্ষী ; কেহ বা মোটামোটা চারি স্তম্ভে ভর করিয়া পৃথিবী হইতে অলগ্ হইয়া দাঁড়ায়—যেমন হস্তী। জীবগণের মধ্যে মনুষ্যই কেবল একাকী পূর্ণমাত্রায় পৃথিবী হইতে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যের মস্তক যেমন পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া দাঁড়াইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয়প্রদান করে, মনুষ্যের চাওয়াও তেমনি পৃথিবী হইতে ঊর্দ্ধে উন্মুখ হইয়া মনুষ্যের অপার্থিব বিশেষত্বের পরিচয়প্রদান করে।

মনুষ্যের আধ্যাত্মিক প্রাণের চাওয়া স্বভাবতই দুই দিকে দৌড়ে—মনুষ্যের দিকে এবং পরমেশ্বরের দিকে। মনুষ্যের চক্ষের চাওয়াও তাহার সঙ্গে গোড় দিয়া সম্মুখে মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি এবং ঊর্দ্ধমুখে ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর, ঐ দুই দিকের দৃষ্টি-চালনা-কার্য্য যাহাতে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার মতো একটা দীপ-ব্যবস্থাও মনুষ্য-শরীরে আছে। অশ্বগবাদির দুই চক্ষু তাহাদের ললাটের দুই পার্শ্বে আড়াআড়ি ভাবে বসানো রহিয়াছে—ইহা সকলেরই দেখা কথা। কেবল মনুষ্যের এবং মনুষ্যাকৃতি জীবের দুই চক্ষু ললাটের সম্মুখে একপংক্তিতে বসানো রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞাতিভাইদিগের পরস্পরকে পরস্পরের চক্ষের চাওয়ার মধ্য দিয়া মনের চাওয়া জানানো চাই—তাই মনুষ্য এবং মনুষ্যাকৃতি জীবদিগের দুই চক্ষু সম্মুখদৃষ্টির উপযোগী করিয়া ললাটের মধ্যস্থলে একপংক্তিতে বসাইয়া রাখা হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, জ্ঞাতিভাইদিগের সহিত সম্মুখদৃষ্টি চালাচালি করিতে বানরদিগকেও দেখা যায় ; কিন্তু ঈশ্বরোদ্দেশে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে আর-কোনো জীবকেই দেখা যায় না সওয়ায় মনুষ্য। কাজেই বলিতে হয় যে, ভ্রূমধ্যস্থিত তৃতীয়চক্ষুর ঊর্দ্ধদৃষ্টি মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব। তবে কিনা, মনুষ্য সবে-কেবল হামাগুড়ি ছাড়িয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে শিখিয়াছে—এখনো মনুষ্যের তৃতীয়চক্ষু ভাল করিয়া ফোটে নাই। ফলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনুষ্যের চাওয়ার যতটা টান মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি, তার সিকির সিকি টানও ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি এখনো লোকসমাজে জন্মে নাই। মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া মনুষ্য কি না করে? মনুষ্যের চক্ষুর প্রতি চাহিয়া যোদ্ধা হেলায় প্রাণ

স্থায়, নাবিক ভেলায় সমুদ্র পার হয়, কবির কণ্ঠের ফোয়ারা খুলিয়া যায়, বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতের সূক্ষ্মদৃষ্টি পাষাণভেদী হইয়া উঠে। কোনো দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষের চতুর্দ্দিক্ হইতে যদি মনুষ্যমণ্ডলীর চক্ষু সুদূরে সরাইয়া রাখা যায়, তবে তাঁহার মহাপ্রতাপান্বিত শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভাবপরাক্রম সমস্তই একমুহূর্ত্তে মাটি হইয়া যায়! দেশশুদ্ধ লোকের প্রাণের চাওয়া এবং চক্ষের চাওয়া দুইই মনুষ্যের চক্ষুর দিকেই দিবানিশি উন্মুখ; তা বই, বর্ত্তমান-কালের কৃতবিদ্যসমাজে কয়জনের প্রাণের এবং চক্ষের চাওয়া ঈশ্বরের চক্ষুর প্রতি দিনের মধ্যে একবারও প্রত্যাবর্ত্তন করে? কিন্তু যাহাই হউক্ না কেন মনুষ্য সত্য-সত্যই কিছু আর পশু নহে -মনুষ্য মনুষ্য।

এটা যখন স্থির যে, তৃতীয়চক্ষুর ঊর্দ্ধ-দৃষ্টি মনুষ্যের একটি স্বজাতীয় বিশেষত্ব, তখন তাহা হইতেই আসিতেছে এই যে, সম্মুখ-দৃষ্টিই মনুষ্যের সর্ব্বস্ব নহে। কিন্তু তথাপি সম্মুখদৃষ্টি এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি, দুয়ের মধ্যে এমনি একটা ক্রমান্বয়িতা-সম্বন্ধ আছে—যাহা কোনো অংশেই উপেক্ষণীয় নহে; সে সম্বন্ধ এইরূপ:—

মনে কর, একটা অরণ্যের মধ্যে শাখায় শাখায় ঘর্ষাঘর্ষি হইয়া এক স্থানে অগ্নি উত্থিত হইল। প্রথমে সে অগ্নি বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া সম্মুখে বিস্তৃত হইতে লাগিল, এবং পরিশেষে সমস্ত অরণ্যটা কবলিত করিয়া আকাশাভিমুখে উদ্ধৃত হইয়া উঠিল। একটি এখানে দ্রষ্টব্য এই যে, যে দাবানলের নীচের বিস্তার যত বেশী, তাহার উপরের শিখাগ্র ততই উচ্চে উত্থান করে। আর-একটি দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির শিখাগ্র বিন্দু-পরিমাণ; অথচ সেই স্থানটিতে অগ্নির সমস্ত উত্তাপ যেন কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিয়াছে—এমনি তাহার প্রবলা দাহিকা শক্তি। তৃতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, অগ্নির নীচের বিস্তার, শিখার ঊর্দ্ধগামিতা এবং শিখাগ্রের প্রাখর্য্য, তিনের পরিমাণ পরস্পরের সদৃশ। এই উপমার সাহায্যে মোটামুটি এইরূপ একটা ভাবের উপলব্ধি সহজেই হইতে পারে যে, সম্মুখদৃষ্টির বিস্তার, ঊর্দ্ধদৃষ্টির একতানতা, এবং লক্ষ্য কেন্দ্রের প্রভাবমাহাত্ম্য, তিনের মধ্যে সৌসা-দৃশ্য রহিয়াছে। এবারকার প্রবন্ধে আলোচ্য বিষয়গুলি মোটামুটি লৌকিকভাবে বলিয়া-চোকা হইল। যাহা বলা হইল—কথাগুলি মোটামুটি-ধরণের বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক তত্ত্ব চাপা দেওয়া রহিয়াছে। শেষোক্ত তত্ত্ব-গুলি খোলসা করিয়া ভাঙিয়া না বলিলে পাঠকবর্গের মনের ধন্দ কিছুতেই মিটিবে না, তাহা আমি বিলক্ষণই বুঝিতেছি। কাজেই সেই সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি অবশ্যপ্রকাশ্য—কিন্তু শনৈঃশনৈঃ ক্রমশ।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আচার্য্য বসুর আবিষ্কার।

দৃষ্টিবিভ্রম।

অধ্যাপক বসুমহাশয় সুকৌশলে কৃত্রিম চক্ষু নির্ম্মাণ করিয়া, প্রাণিচক্ষুর সহিত তাহার সাড়ার ঐক্য কিপ্রকারে আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি। সেই কৃত্রিম চক্ষুরই কার্য্য পরীক্ষা করিয়া, তিনি কিপ্রকারে নানা দৃষ্টিবিভ্রমের উৎপত্তিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সেই রৌপ্যময় কোষাকার কৃত্রিমচক্ষুর মধ্যে এবং তাহার বাহিরের সেই অক্ষিস্নায়ুসদৃশ রৌপ্যদণ্ডে তার সংলগ্ন করিয়া ইহার বৈদ্যুতিক-সাড়া পরীক্ষা করা হইয়া থাকে। এখন পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন, কৃত্রিম চক্ষুর উপরে যদি আলোকপাত না হয় এবং উভয়েরই আণবিক অবস্থা যদি সমান থাকে, তাহা হইলে তারে প্রবাহের অণুমাত্র চিহ্ন দেখা যাইবে না।* কিন্তু ভিতর-বাহিরের এপ্রকার সাম্যভাব প্রায়ই দেখা যায় না, এজন্য অতি সতর্কতার সহিত আলোকপাত বা অপর বাহ্য উত্তেজনা রোধ করিলেও, অনেকসময় তার দিয়া ক্ষীণ বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিয়া থাকে। প্রাণিচক্ষুর অবস্থাও তাই, অক্ষি-পর্দ্দা ও চক্ষুস্নায়ুর ঠিক্ আণবিক সাম্যভাব প্রায় ঘটে না, কাজেই একটা ক্ষীণ তড়িৎপ্রবাহ নিয়তই চক্ষুস্নায়ু বাহিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছিতে থাকে। কিন্তু তড়িৎপ্রবাহ থাকিলেই তজ্জাত একটা দৃষ্টিজ্ঞান অবশ্যম্ভাবী। পাঠক দেখিয়া থাকিবেন, আমরা চক্ষু মুদ্রিত করিলে ঘোর অন্ধকার দেখি না, চক্ষু বন্ধ রাখা সত্ত্বেও একপ্রকার ক্ষীণ আলোক ("the intrinsic light of the retina) যেন আমাদের চতুর্দ্দিক্ ঘেরিয়া থাকে। অধ্যাপক বসু মহাশয় বলেন, এই আভ্যন্তরীণ আলোক চক্ষুর নানা অংশের আণবিক-বৈষম্য-জাত ক্ষীণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কার্য্য।

কৃত্রিম চক্ষুতে অতি স্বল্পকালস্থায়ী কোন আলোকপাত করিলে, তদুৎপন্ন বিদ্যুতের বিকাশ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় না। আলোকপাত রহিত করার পর প্রবাহটা ক্রমে পূর্ণতালাভ করে। তা ছাড়া, যদি পাতিত ক্ষণিক আলোকটা খুব উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে বৈদ্যুতিক সাড়া সেপ্রকার স্বল্পকালস্থায়ী হয় না; তদুৎপন্ন বৈদ্যুতিক প্রবাহ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল প্রবহমান থাকিয়া শেষে লয়প্রাপ্ত হইয়া যায়। অধ্যাপক বসুমহাশয় প্রাণিচক্ষুর উপর ক্ষণিক আলোকের অবিকল একইপ্রকার কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন।

* পদার্থের নানা অংশের আণবিক বৈষম্য যে বিদ্যুৎ-উৎপত্তির কারণ, অধ্যাপক বসুমহাশয় তাহা নানা পরীক্ষাদ্বারা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন। আমরা প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়টির বিশেষ আলোচনা করিব।—লেখক।

একটি নাতিদীর্ঘ নলের এক প্রান্তে একখণ্ড কাচ সংলগ্ন করিয়া, তাহার বাহির-ভাগটা দীপশিখাদ্বারা কজ্জলাবৃত কর এবং তার পর কোন সূক্ষ্মাগ্র পদার্থদ্বারা তাহার উপর যথেচ্ছ অক্ষর লিখ,- লেখনীদ্বারা কজ্জল স্থানচ্যুত হওয়ায় কাচে স্বচ্ছ অক্ষর অঙ্কিত হইয়া পড়িবে। এখন যদি নলের মুক্ত অংশে চক্ষু সংলগ্ন করিয়া, তাহার কজ্জললিপ্ত প্রান্তটাকে অতি অল্পক্ষণের জন্য কোন উজ্জ্বল আলোকের দিকে উন্মুক্ত রাখা যায়, তাহা হইলে কাচের স্বচ্ছ অংশ দিয়া সেই ক্ষণিক আলোক দর্শকের চক্ষে আসিয়া পড়িবে। আলোকপাতমাত্রই চক্ষু মুদ্রিত করিলে দর্শক প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইবেন না, কিন্তু আরও কিছুকাল চক্ষু বন্ধ করিয়া থাকিলে, উল্লিখিত কাচাঙ্কিত অক্ষরগুলিকে তিনি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে দেখিবেন। কিন্তু চক্ষুর এই অন্তর্দৃষ্টি অধিককাল থাকে না, অক্ষরগুলি অল্পক্ষণের জন্য উজ্জ্বল থাকিয়া ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বলা বাহুল্য, কৃত্রিম চক্ষুতে পাতিত ক্ষণিক আলোকের ন্যায়, পূর্ব্বোক্ত আলোক অতি অল্পকালস্থায়ী হওয়ায়, তজ্জাত বৈদ্যুতিক প্রবাহের পূর্ণতা-প্রাপ্তিতে দীর্ঘসময়ের আবশ্যক হয়। কাজেই মূল আলোক নির্ব্বাপিত বা স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও বিদ্যুৎপ্রবাহদ্বারা দৃষ্টি-জ্ঞানের উৎপত্তি হয়।

অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোকপাতে কৃত্রিমচক্ষে যে দীর্ঘকালব্যাপি-প্রবাহ-উৎপত্তির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অধ্যাপক বসুমহাশয় প্রাণিচক্ষে অত্যুজ্জ্বল আলোক-পাত করিয়া ঠিক তদনুরূপ কার্য্য আবিষ্কার করিয়াছেন। ম্যাগ্‌নিসিয়ম্‌-ধাতুচূর্ণ দ্বারা কৃষ্ণ কাষ্ঠফলকের উপর কয়েকটি অক্ষর রচনা করিয়া, তাহাতে অগ্নিসংযোগ কর। ধাতুচূর্ণ অত্যুজ্জ্বল শিখায় অল্পকালের জন্য জ্বলিতে থাকিবে। কিন্তু দর্শক ধোঁয়া ও উজ্জ্বলতার আধিক্যে, অক্ষরগুলিকে তখন পড়িতে পারিবেন না। কিন্তু অগ্নি নির্ব্বাপিত হইবামাত্র যদি দর্শক চক্ষু মুদ্রিত করেন, তাহা হইলে অল্পক্ষণ পরে তিনি সেই অক্ষরগুলিকেই উজ্জ্বল অবস্থায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতে পাইবেন।*

সুদীর্ঘ আলোকতাড়নায় চক্ষুর বিভিন্নাংশের আণবিক বিকার দ্বারা, এবং আলোক-রোধের পর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির অতিরিক্ত চেষ্টায়, যে অনিয়মিত বৈদ্যুতিক সাড়া বা পরান্দোলনের (after-oscillation) কথা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা প্রাণিচক্ষে কিপ্রকার দৃষ্টিজ্ঞানের সঞ্চার হয়, এখন দেখা যাউক। এই স্থলে আলোক-রোধমাত্র, স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় অণুগুলি বৈদ্যুতিক প্রবাহ শীঘ্র রোধ করিয়া, তাহাদের নির্দ্দিষ্টস্থান অতিক্রম করিয়া বিচলিত হইয়া পড়ে। কাজেই যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিপরীতদিকে স্বতই তাহাদের আর-একটা আন্দোলন আসিয়া

* কয়েকমাস পূর্ব্বে আমরা এই পদ্ধতিক্রমে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সূর্য্যগ্রহণ দেখিয়াছিলাম। গ্রহণকালে সূর্য্য-গোলকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করি। বলা বাহুল্য, ইহার অত্যুজ্জ্বলতায় কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই। কিন্তু ইহার পরই চক্ষু মুদ্রিত করায় খণ্ডিত সূর্য্যগোলক কিয়ৎকালের জন্য স্পষ্ট দেখা গিয়াছিল।—লেখক।

পড়ে এবং সূত্রলম্বিত গোলকের আন্দোলনের ন্যায় অণুসকল বহুক্ষণ গমনাগমন করিয়া শেষে সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। অধ্যাপক বসুমহাশয় পদার্থের অণুসকলের এইপ্রকার আন্দোলনজাত তড়িৎপ্রবাহকে "পরান্দোলন" সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। পাঠক একটি উজ্জ্বল আলোকের প্রতি কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে, উক্ত আন্দোলনের কার্য্য বেশ বুঝিতে পারিবেন। চক্ষু বন্ধ করিবামাত্র ঘোর অন্ধকার সম্মুখে দেখা দিবে। পূর্ব্ব-আলোকপাত-জাত আণবিক বিচলন দ্বারা যে তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছিল, চক্ষুর অণুগুলির স্বভাবপ্রাপ্তির প্রবল চেষ্টায় এখনকার আণবিক বিচলন ঠিক্ তাহার বিপরীত দিকে হয় বলিয়া, সেই প্রবাহ ক্রমে লয়প্রাপ্ত হয়। কাজেই চক্ষুর বৈদ্যুতিক সাম্যাবস্থায় ঘোর অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। কিন্তু পাঠক যদি কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অপেক্ষা করেন, তাহা হইলে সেই পূর্ব্বদৃষ্ট উজ্জ্বল আলোকের ছবি চক্ষু বুজিয়াও দেখিতে পাইবেন। বলা বাহুল্য, স্বভাবপ্রাপ্তির অতিরিক্ত চেষ্টায় নির্দ্দিষ্টস্থান অতিক্রম করার পর, পুনরায় স্বাভাবিক স্থানে আসিবার চেষ্টায় অণুগুলির যে নূতন বিচলন হয়, উক্ত অস্পষ্ট ছবি তাহারই কার্য্য।

কোন উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত রাখিলে, সেই পদার্থের যে আলোকময় ছবি ক্রমে আবির্ভূত ও তিরোভূত হয়, তাহা আমরা অনেক সময়েই দেখিতে পাই। পূর্ব্ব-বৈজ্ঞানিকগণও এই দৃষ্টিবিভ্রম দেখিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা ইহার একটা কারণও স্থির করিয়াছিলেন। ইঁহারা বলিতেন,—উজ্জ্বল পদার্থে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখায়, আলোক অন্তর্হিত হইলেও সেই উত্তেজনার কতকটা চক্ষে থাকিয়া যায়; কিন্তু চক্ষু আলোকদর্শনে ক্লান্ত হইয়া পড়ায় সে সময়ে আমরা ঐ উত্তেজনার কোন কার্য্যই দেখিতে পাই না। ক্লান্তির উৎপত্তিসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের দুইটি প্রচলিত সিদ্ধান্ত আছে। একদল পণ্ডিত বলেন, শ্রমদ্বারা শরীরে একপ্রকার অবসাদজনক পদার্থের (Fatigue substance) উৎপত্তি হয়, বিশ্রামসহকারে শোণিতপ্রবাহদ্বারা সেই পদার্থ স্থানান্তরিত হইলে, জীব আবার শ্রমক্ষম হইয়া পড়ে। আর একদল পণ্ডিত বলেন,—শ্রম শরীরের ক্ষয়সাধন করে, এবং ক্ষয়ই শ্রান্তির কারণ। প্রাণীকে বিশ্রাম করিতে দাও, স্বাভাবিক শারীরকার্য্যে সেই ক্ষয়ের পূরণ হইয়া যাইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে নূতন শ্রমভারবহনের উপযোগী দেখিবে। দৃষ্টিবিভ্রমটির উল্লিখিত ব্যাখ্যা নির্ভুল হইলে,—বিশ্রামসহকারে চক্ষুর প্রকৃতিস্থ হওয়ার পর অন্ধকারেরই মোচন হওয়াই সঙ্গত; কিন্তু প্রত্যক্ষ ব্যাপারে বিশ্রামলাভের পরও আমরা পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের আলোক ও অন্ধকারময় ছবির পুনঃপুন বিকাশ দেখিতে পাই। এই বিসদৃশ ঘটনার কারণ উক্ত দৃষ্টিবিভ্রমের প্রচলিত ব্যাখ্যানে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অধ্যাপক বসুমহাশয় প্রচলিত সিদ্ধান্তের এইপ্রকার আরও অনেক ভ্রম দেখাইয়া, তাঁহার আবিষ্কৃত তত্ত্বটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছেন।

জগতের অতি বৃহৎ আবিষ্কারগুলির মূলান্বেষণ করিলে, অনেকস্থলেই একএকটা তুচ্ছ অবান্তর ঘটনাকে মহদাবিষ্কারের কারণ হইতে দেখা যায়। চক্ষুসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার সময়ে, বসুমহাশয় ঐপ্রকার এক ক্ষুদ্র ব্যাপারে দৃষ্টিতত্ত্বসম্বন্ধীয় একটা মহদাবিষ্কার সাধন করিয়াছেন। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি এই আবিষ্কারের বিষয়। উভয় চক্ষুরই দৃষ্টিশক্তি অপরিবর্ত্তনীয় বলিয়া, এ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকগণ বিশ্বাস করিয়া আসিতেছিলেন। বসুমহাশয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা দ্বারা দেখাইয়াছেন, প্রকৃত ব্যাপার তাহা নয়। বামচক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যখন প্রবল থাকে, দক্ষিণচক্ষু তখন ক্ষীণশক্তি হইয়া বিশ্রাম করে, এবং পরমুহূর্ত্তে দক্ষিণচক্ষু যখন বিগতশ্রম হইয়া দাঁড়ায়, তখন দর্শনের ভার তাহার উপর দিয়া বামচক্ষু বিশ্রামের অবকাশ লয়। চক্ষুর দৃষ্টিশক্তির এই পরিবর্ত্তন অতি ঘনঘন হইয়া থাকে, কিন্তু স্থূলত উভয়ের সমবেতশক্তি অপরিবর্ত্তনীয় থাকিতে দেখা যায়।

অধ্যাপক বসুমহাশয়ের আবিষ্কৃত ব্যাপারটি সহজে পরীক্ষা করিবার একটি সুন্দর উপায় আছে। ১ম-চিত্রাঙ্কিত রেখার ন্যায় বিপরীতদিকে হেলানো দুইটি স্থূল সরলরেখা কাগজে অঙ্কিত করিয়া, সেটিকে ষ্টেরিয়োস্কোপ্-(stereoscope)-যন্ত্রে সংযুক্ত কর। এই যন্ত্রে ফোটোগ্রাফের ছবি যেমন

১ম চিত্র।

২য় চিত্র।

উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত হইয়া পড়ে, এখানেও ঐ হেলানো রেখাদ্বয় পরস্পরের উপরে পড়িবে এবং ২য়-চিত্রস্থ ক্রসের অনুরূপ একটা ছবি দর্শক দেখিতে পাইবেন। কিন্তু এখন যদি যন্ত্রটিকে আকাশের উজ্জ্বল আলোকের দিকে ধরিয়া দর্শক কিয়ৎকালের জন্য ছবিটিকে দেখিতে থাকেন, তবে সেই ক্রস্‌টিকে (cross) সম্পূর্ণ দেখিতে পাইবেন না ;—উহার একটি রেখাকে কিয়ৎকালের জন্য খুব উজ্জ্বল ও অপরটিকে লুপ্তপ্রায় দেখিবেন এবং পরক্ষণেই ম্লানটিকে স্ফুটতর ও উজ্জ্বলটিকে ক্ষীণজ্যোতি হইতে প্রত্যক্ষ করিবেন।

দুইটি বিভিন্ন লেখার প্রতি যুগপৎ দুই চক্ষু ন্যস্ত রাখিয়া পড়িবার চেষ্টা করিলে, পূর্ব্বোক্ত আবিষ্কারটির পরিচয় সহজে গ্রহণ করা যাইতে পারে। একই সময়ে দুই চক্ষু দুইটা পৃথক্ লেখার উপর আবদ্ধ থাকায়, পাঠক কোনটিই পড়িতে পারিবেন না। কিন্তু ইহার পরই যদি চক্ষু মুদ্রিত করা যায়, তাহা হইলে পর্য্যায়ক্রমে সেই লেখারই এক একটিকে চক্ষুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে ফুটিয়া মিলাইতে দেখা যাইবে। এইজন্যই অধ্যাপক বসুমহাশয় তাঁহার আবিষ্কারসম্বন্ধীয় গ্রন্থের একস্থানে বলিয়াছেন,—"মুক্তচক্ষে আমরা যাহা পড়িতে না পারি, চক্ষু মুদ্রিত করিলে তাহাই সহজপাঠ্য হইয়া পড়ে।"

যে সকল পদার্থ আমরা স্বেচ্ছায় ও

সজ্ঞানে দেখি, কেবল তাহারই ছবির যে পুনরাবির্ভাব হয়, তাহা নহে। অজ্ঞাতসারে ও অন্যমনে দৃষ্ট পদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাবও বসুমহাশয় আবিষ্কার করিয়াছেন। দৃষ্টি-তত্ত্বের গবেষণাকালীন ইনি একদিন একটি জানালার প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিয়া তাহার ছবির পুনরাবির্ভাব পরীক্ষা করিতেছিলেন। ছবি যথারীতি কয়েকবার আবির্ভূত হইয়াছিল; কিন্তু পুনঃপুন পরীক্ষায় অক্ষিপর্দ্দা অবসন্ন হইয়া পড়ায় শেষে বহুক্ষণ মুদ্রিত-নেত্রে থাকিয়াও আর জানালার ছবি দেখিতে পান নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে চক্ষুর এক প্রান্ত হইতে একটি ক্ষুদ্র গবাক্ষের সুস্পষ্ট ছবি আবির্ভূত হইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক বসু সেই গবাক্ষটির প্রতি পূর্ব্বে স্বেচ্ছায় দৃষ্টি-পাত করেন নাই এবং ইতঃপূর্ব্বে সেটির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত জানিতেন না। বলা বাহুল্য, বসুমহাশয় সেই পূর্ব্বের জানালাটি দেখিতে গিয়া, নিশ্চয়ই গবাক্ষটিকেও অজ্ঞাতসারে দেখিয়া-ফেলিয়াছিলেন এবং তাহাতেই শেষে সেই অজ্ঞানদৃষ্ট পদার্থ ছবিদ্বারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল। সুস্থ মানুষের বিভীষিকাদর্শনের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা শারীর-বিদ্যায় পাওয়া যায় না। পূর্ব্ববর্ণিত ব্যাপারের সহিত বিভীষিকাদর্শনের একটা নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়া বসুমহাশয় অনুমান করিতেছেন।

কোন উজ্জ্বল পদার্থে কিয়ৎকাল দৃষ্টিপাত করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলে, দৃষ্ট বস্তুর ছবির যে আবির্ভাব-তিরোভাব হয়, তাহা বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলে, দর্শক প্রত্যেক পুনরাবির্ভাবের সহিত ছবিটিকে ক্রমেই ম্লানতর হইতে দেখিবেন এবং অবশেষে সেটি এত অস্পষ্ট হইয়া পড়িবে যে, তখন ছবি দেখা যাইতেছে, কি পূর্ব্বদৃষ্ট পদার্থের স্মৃতি মনে জাগিতেছে, তাহা নিঃসংশয়ে ঠিক্ করা যাইবে না। অধ্যাপক বসুমহাশয় এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া বলিতেছেন,—ইন্দ্রিয়ের এই পরান্দোলনজাত সাড়ার সহিত সম্ভবত স্মৃতির সাড়ার কোন পার্থক্য নাই। দৃষ্টপদার্থের ছবির পুনরাবির্ভাব ও বিলোপের ন্যায়, স্মৃতিরও তদনুরূপ আবির্ভাব ও লোপ দেখা গিয়া থাকে, সুতরাং উভয়েই একই শ্রেণীর প্রাকৃতিক ঘটনা।

অধ্যাপক বসুমহাশয় কেবল আবিষ্কার করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহার প্রত্যেক আবিষ্কারের সহিত যে শত শত ব্যাপার জড়িত রহিয়াছে, তাহাদেরও আভাস দিয়াছেন। সেই সকল আভাসের প্রত্যেকটির আলোচনা ও অনুসন্ধান এক একজন বৈজ্ঞানিকের জীবনব্রত হইলেও, অনুমিত ব্যাপারগুলির মীমাংসা হয় কি না, সন্দেহ। শত অবান্তর কার্য্য ও বাধাবিঘ্নের মধ্যে ধ্যানমগ্ন মুনির মত তিনি আজও গবেষণানিরত রহিয়াছেন। একক অধ্যাপক বসুমহাশয়ের নিকট হইতে জড়-বিজ্ঞান যাহা পাইয়াছে, তাহা অমূল্য এবং আমাদের সেই নবীন বৈজ্ঞানিকের নিকট হইতে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান যে আরো অনেক অমূল্যরত্ন সংগ্রহ করিবে, তাহার সন্দেহ নাই।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

রামচরিত।*

রামের চরিত্র কিছু জটিল। ভরত, লক্ষ্মণ, সীতা প্রভৃতি অপরাপর সকলের চরিত্রই তুলনায় অপেক্ষাকৃত সরল, একমাত্র রামের সম্পর্কেই ইঁহাদের চরিত্র বিকাশ পাইয়াছে। ভরত ও লক্ষ্মণ ভ্রাতৃত্বে, সীতা সতীত্বে এবং দশরথ ও কৌশল্যা পিতৃত্বমাতৃত্বে বিকাশ পাইয়াছেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত হইয়া নদীগুলি এক সমুদ্রে পড়িয়া যেরূপ আপনাদের সত্তা হারাইয়া ফেলে, রামায়ণের বিচিত্র চরিত্রাবলীও সেইপ্রকার নানাদিক্ হইতে রামমুখী হইয়াছে—রামের সঙ্গে যতটুকু সম্বন্ধ, ততখানিতেই তাঁহাদের সত্তা ও বিকাশ—এজন্য রামের সঙ্গে তুলনায় অপরাপর চরিত্র ন্যূনাধিক সরল। কিন্তু রামচরিত্র সকলের সঙ্গে সম্পর্কিত;—তিনি রামায়ণে পুত্ররূপে প্রাধান্যলাভ করিয়াছেন,—ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে, স্বামি ও প্রভু রূপে—সকল রূপেই তিনি অগ্রগণ্য; বহুদিক্ হইতে তাঁহার চরিত্রের বিকাশ পাইয়াছে—এবং বহু বিভাগ হইতে তাঁহার চরিত্র দর্শনীয়। আবার তাঁহার চরিত্রের কতকগুলি আপাতবৈষম্যের সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাকে বুঝিতে হইবে; কতকগুলি জটিল রহস্যের মীমাংসা না করিলে তিনি ভালরূপে বোধগম্য হইবেন না। তিনি আদর্শপুত্র—কৌশল্যাকে তিনি বলিয়াছিলেন,—"কাম মোহ বা অন্য যে-কোন ভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই পিতা এই প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া থাকুন না কেন, আমি তাহার বিচার করিব না, আমি তাহার বিচারক নহি, আমি তাঁহার আদেশ পালন করিব—তিনি প্রত্যক্ষ দেবতা।" সেই রামচন্দ্রই গঙ্গার অপরতীরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্যে বিটপিমূলে বসিয়া সাশ্রুনেত্রে লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন—"এমন কি কোথাও দেখিয়াছ লক্ষ্মণ, প্রমদার বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া কোন পিতা আমার ন্যায় ছন্দানুবর্ত্তী পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়াছেন? মহারাজ অবশ্যই কষ্ট পাইতেছেন—কিন্তু যাহারা ধর্ম্মত্যাগ করিয়া কামসেবা করে—রাজা দশরথের ন্যায় কষ্ট তাহাদের অবশ্যম্ভাবী।" যিনি সীতাকে "শুদ্ধায়াং জগতীমধ্যে" বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং যাঁহাকে হারাইয়া তিনি শোকারুণচক্ষে উন্মত্তবৎ পুষ্পতরুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন এবং "আগচ্ছ ত্বং বিশালাক্ষি শূন্যোঽয়মুটজস্তব" বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন—লঙ্কাতে প্রবেশ করিয়া 'অশোকবন হইতে সীতাকে স্পর্শ করিয়া বায়ুপ্রবাহ তাঁহার অঙ্গ ছুঁইতেছে' বলিয়া পুলকাশ্রুনেত্রে ধ্যানী হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—সেই রাম বিপুল সৈন্যসজ্যের সাক্ষাতে—"লক্ষ্মণ, ভরত, বিভীষণ বা সুগ্রীব, ইঁহাদের যাঁহাকে ইচ্ছা, তুমি ভজনা করিতে

* লেখক রামায়ণের চরিত্রসম্বন্ধীয় যে পুস্তক শীঘ্র প্রকাশ করিতেছেন, তন্মধ্যে এবং অন্যত্র রামচন্দ্রের বিবরণ বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হইয়াছে,—এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ তাহার অঙ্গীভূত বিশ্লেষণমাত্র।

পার—দশদিক্ পড়িয়া আছে—তুমি যথা ইচ্ছা গমন কর—আমার তোমাতে কোন প্রয়োজন নাই"—গলদশ্রুনেত্রা, শোকশীর্ণা, অনপরাধিনী সীতাকে এইরূপ নির্ম্মম কঠোর উক্তি করিয়াছিলেন। যিনি বনবাসদণ্ডের কথা শুনিয়া কৈকয়ীর নিকট স্পর্দ্ধাসহকারে বলিয়াছিলেন—"বিদ্ধি মাং ঋষিভিস্তুল্যং বিমলং ধর্ম্মমাস্থিতম্"—'আমাকে ঋষিগণের মত বিমলধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবেন', তিনিই কৌশল্যার সমীপবর্ত্তী হইয়া "নিশ্বসন্নিব কুঞ্জরঃ" পরিশ্রান্ত হস্তীর ন্যায় নিরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন, এবং সীতার অঞ্চলপার্শ্ববর্ত্তী হইয়া মুখে অপূর্ব্ব মলিনিমা প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণ ভরতকে বিনষ্ট করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে যিনি তাঁহাকে কঠোর-বাক্যে বলিয়াছিলেন—"তুমি রাজ্যলোভে এইরূপ কথা বলিয়া থাকিলে, আমি ভরতকে কহিয়া রাজ্য তোমাকে দিব" এবং যিনি ভরত তাঁহার "প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর" বারংবার এই কথা কহিতেন—তিনিই সীতার নিকট বলিয়াছিলেন, "তুমি ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না, ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তিরা অপরের প্রশংসা সহ্য করিতে পারেন না।" ভরতের ভ্রাতৃভক্তির অপূর্ব্ব পরিচয় পাইয়া তিনি সীতাবিরহের সময়েও ভরতের দীন শোকাতুর মূর্ত্তি বিস্মৃত হন নাই—পুষ্পভারা-লঙ্কৃতা পম্পাতীরতরুরাজির পার্শ্বে ভরতের কথা স্মরণ করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছিলেন, —বিভীষণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইজন্য সুগ্রীব তাঁহাকে অবিশ্বাস্ত বলিয়া নিন্দা করাতে, রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—"বন্ধু, ভরতের ন্যায় ভাই এই পৃথিবীতে তুমি কয়জন পাইবে?" তিনিই আবার বনবাসান্তে ভরদ্বাজের আশ্রমে যাইয়া হনুমান্‌কে নন্দিগ্রামে পাঠাইবার সময় বলিয়াছিলেন,—"আমার আগমনসংবাদ শুনিয়া ভরতের মুখে কোন বিকৃতি হয় কি না, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিও।" এইরূপ বহুবিধ আপাতবৈষম্য তাঁহার চরিত্রকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

রামায়ণপাঠককে আমরা একটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। নাটক ও মহাকাব্য দুই পৃথক্ সামগ্রী—গ্রীক্ রীতি অনুসারে নাটকবর্ণিত কাল তিন দিবসের ঊর্দ্ধ হওয়ার বিধান নাই। এই দিবসত্রয়ের ঘটনাবর্ণনায় চরিত্রবিশেষকে একভাবাপন্ন করা একান্ত আবশ্যক,—কোন্ কথাটি কাহার মুখ হইতে বাহির হইবে, লেখককে সতর্কতার সহিত তাহা লক্ষ্য করিয়া নাটকরচনা করিতে হয়—চরিত্রগুলির যেটুকু বিশেষত্ব, লেখককে সেই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া তাহা সংক্ষেপে সঙ্কলন করিতে হয়। কিন্তু যে কাব্যের ঘটনা জীবন-ব্যাপী, সে কাব্যের চরিত্রগুলি নাটকের রীতি অনুসারে বিচার্য্য নহে। এই দীর্ঘকালে নানারূপ অবস্থাচক্রে পতিত হইয়া চরিত্র-গুলির ক্রিয়াকলাপ ও কথাবার্ত্তা বিচিত্র হইয়া থাকে—তাহা সময়োপযোগী হয় কি না—তাহাই সমধিকপরিমাণে বিচার্য্য। শ্রেষ্ঠতম সাধুরও সারাজীবনের অন্তর্বর্ত্তী দুইএকটি ঘটনা বা উক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া আলোকে ধরিলে তাহা তাদৃশ শোভন বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। অবস্থার

ক্রমাগত উৎপীড়ন সহ্য করিয়া লোকে সাধারণত সাত্ত্বিকগুণসম্পন্ন হইলেও দুইএক স্থলে ভাবের ব্যত্যয় ঘটা স্বাভাবিক। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পতিত হইয়া রামচন্দ্র যাহা করিয়াছেন বা বলিয়াছেন—তাহা তাঁহার সমগ্র জীবনী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইলে দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক বলিয়া অনুমিত হইতে পারে, কিন্তু অবস্থার আলোকপাতে সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাহা অনেক সময়েই অন্যরূপ প্রতিপন্ন হইবে। তাঁহার "দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক" উক্তিগুলি বাদ দিলে হয় ত তিনি আমাদের সহানুভূতির অভ্যার্দ্ধে যাইয়া পড়িতেন, আমরা তাঁহাকে ধরিতে-ছুঁইতে পারিতাম না। রামচরিত্র বিশাল বনস্পতির ন্যায়—উহা কচিৎ নমিত হইয়া ভূস্পর্শ করিলেও সেই অবনমন তাহার নভঃস্পর্শী গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করে না—পার্থিব জাতিত্বের পরিচয় দিয়া আমাদিগকে আশ্বস্ত করে মাত্র। রামচন্দ্র সাধারণত উৎকৃষ্ট নীতি অবলম্বন করিয়াই আপনার চরিত্রকে অপূর্ব্বশ্রীসমন্বিত রাখিয়াছেন – তাঁহার কোন চিন্তা বা কার্য্যই পরের অনিষ্ট করিবার প্রবৃত্তি হইতে উত্থিত নহে, এমন কি, বালীকেও তিনি কনিষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যাপহারী দস্যু বলিয়া সত্যসত্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, এইজন্যই দণ্ড দিতেও গিয়াছিলেন! সুগ্রীবের শত্রু তাঁহার শত্রু, তাহাকে বধ করিতে তিনি অগ্নিসমক্ষে প্রতিশ্রুত ছিলেন—এই প্রতিশ্রুতিপালনও তিনি ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।* মহাকাব্যের কোন গূঢ়দেশে

* আমরা রামায়ণের সমস্ত প্রসঙ্গই লঙ্কাকাণ্ড পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়াছি। উত্তরকাণ্ডে রামকে আমরা রাজরূপে দর্শন করি। প্রজা লইয়াই রাজা,—সেই প্রজার মনোরঞ্জনের জন্য তিনি স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। এস্থলে দেখিতে হইবে, প্রজাদের এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণ করিবার তাঁহার কোন উপায় ছিল কি না?—প্রজারা ভুল বুঝিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহারা যাহা বুঝিয়াছিল, তাহা তাদৃশ অবস্থায় স্বাভাবিক,—সীতা এতদিন শত্রুগৃহে ছিলেন, তজ্জন্য তাহারা সীতার চরিত্রে সন্দেহপরায়ণ হইয়াছিল—এই সন্দেহের জন্য তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না—এবং তাহাদের এই সন্দেহ নিরাকরণের যোগ্য কোন উপায়ই রামের করায়ত্ত ছিল না—অথচ তিনি যে সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক, সেই সিংহাসনের মর্য্যাদা ও পবিত্রতা লোকহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য—সীতাকে বর্জ্জন ভিন্ন তাঁহার উপায়ান্তর ছিল না। প্রজার কল্যাণ—তাঁহাদের মতের সম্মানরক্ষা তিনি স্বীয় রাজজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়াছিলেন,—এইজন্য তিনি আদর্শ রাজা বলিয়া পরিগণিত। শুধু মনুষ্যত্বের দিক্ হইতে দেখিলে, তিনি যাহা নিজে সত্য বলিয়া জানেন, তাহা লঙ্ঘন করিয়া অপরের ভ্রমাত্মক মতের অনুকূল কার্য্য করিয়া অবলা রমণীকে কেন আজন্মদুঃখিনী করিলেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তিনি প্রজারঞ্জনের উদ্দেশ্যে নিজের এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজের বনিতার জীবন চিরদুঃখপূর্ণ করিয়া তুলিয়াছিলেন,—এইপ্রকার উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যের আদর্শসম্বন্ধে মতদ্বৈধ হইতে পারে, কিন্তু তিনি যে স্বীয়বিশ্বাসানুসারে উচ্চ কর্ত্তব্যের লক্ষ্যে ত্যাগস্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। সীতাবর্জ্জনের পরে তিনি অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহা সদার হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়,—তিনি স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া এই যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন ও প্রজাগণকে বুঝাইলেন,—তাহারা যাঁহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে,—তিনি তাহাদের মতের অনুকূলে কার্য্য করিয়া তাঁহার এবং নিজের দাম্পত্যজীবন দুঃসহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু খাঁটি স্বর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল সীতার চরিত্রের মাহাত্ম্য তিনি তিলমাত্রও বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ একএকজন বহু বিবাহ করিয়াছেন, তিনি সে সকল দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা দূরে থাকুক, "ন রাম পরদারান্ স চক্ষুর্ভ্যামপি পশ্যতি" প্রভৃতি বাক্যে দৃষ্ট হয়, তাঁহার দাম্পত্যনিষ্ঠা ও সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসা তাঁহার চরিত্রকে চিরালঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। যদিও উত্তরকাণ্ডসম্বন্ধে আমার বলিবার নানারূপ কথাই আছে, এবং যদিও এপর্য্যন্ত তাহার আলোচনা মজুত রাখিয়াছিলাম, তথাপি সীতাবর্জ্জনসম্বন্ধে কিছু না বলিলে রামচরিত্রের আলোচনা যাঁহারা অসম্পূর্ণ মনে করিবেন, তাঁহাদের জন্য এই কয়েকটি কথা লিখিলাম।

অবস্থায় দারুণ পীড়নে নিষ্পেষিত হইয়া তিনি দুইএকটি অধীরবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহা লইয়া হট্টগোল করা এবং হিমালয়ের কোন শিলা কি পাদপে একটু ক্ষতচিহ্ন আছে, তাহা আবিষ্কার করিয়া পর্ব্বতরাজের মহত্ত্বকে তুচ্ছ করা, দুইই একবিধ। সাহিত্যিক ধূর্ত্তগণ রামচরিত্রের তদ্রূপ সমালোচনার ভার লইবেন। বাল্মীকি-অঙ্কিত রামচরিত্র অতিমাত্রায় জীবন্ত—এ চিত্রে সূচিকা বিদ্ধ করিলে তাহা হইতে যেন রক্তবিন্দু ক্ষরিত হয়—এই চরিত্র ছায়া কিংবা ধূম্রবিগ্রহে পরিণত হইয়া পুস্তকান্তর্গত আদর্শ হইয়া পড়ে নাই।

সঙ্গীতের ন্যায় মানবজীবনেরও একটা মূলরাগিণী আছে—গীতি যেরূপ নানারূপ আলাপচারিতে ঘুরিয়া-ফিরিয়াও স্বীয় মূলরাগিণীর বাহিরে যাইয়া পড়ে না, মানবচরিত্রেরও সেইরূপ একটা স্বপরিচায়ক স্বাতন্ত্র্য আছে—সেইটিকে জীবনের মূলরাগিণী বলা যায়, জীবনের কার্য্যকলাপ সমগ্রভাবে বিবেচনা করিলে উহা আবিষ্কৃত হয়। যিনি যাহাই বলুন,—সেই অভিষেকোপযোগী বিশাল সম্ভারের প্রতি তাচ্ছীল্যের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া অভিষেকব্রতোজ্জ্বল শুদ্ধপট্টবস্ত্রধারী রামচন্দ্র যখন বলিয়াছিলেন—"এবমস্তু গমিষ্যামি বনং বস্তুমহং ত্বিতঃ। জটাচীরধরো রাজ্ঞঃ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্"—'তাহাই হউক, আমি রাজার প্রতিজ্ঞা পালনপূর্ব্বক জটাবল্কল ধারণ করিয়া বনবাসী হইব'—সেই দিনের সেই চিত্রই রামের অমর চিত্র। এই অপূর্ব্ব বৈরাগ্যের শ্রী তাঁহাকে চিনাইয়া দিবে। প্রজাগণ জলভারাচ্ছন্ন আকুল চক্ষে তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছেন—

"যা প্রীতির্বহুমানশ্চ মষ্যযোধ্যানিবাসিনাম্।
মৎপ্রিয়ার্থং বিশেষেণ ভরতে সা বিধীয়তাম্॥"

'অযোধ্যাবাসিগণ, তোমাদের আমার প্রতি যে বহুমান ও প্রীতি, তাহা ভরতের প্রতি বিশেষভাবে অর্পণ করিলেই আমি প্রীত হইব।' এই উদার উক্তিই রামচরিত্রের পরিচায়ক। লক্ষ্মণের ক্রোধ ও বাগ্‌বিতণ্ডা পরাভূত করিয়া ঋষিবৎ সৌম্য রামচন্দ্র অভিষেকশালার প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক বলিলেন—

"সৌমিত্রে যোঽভিষেকার্থে মম সম্ভারসম্ভ্রমঃ।
অভিষেকনিবৃত্ত্যর্থে সোঽস্তু সম্ভারসম্ভ্রমঃ॥"

'সৌমিত্রে, আমার অভিষেকের জন্য যে সম্ভ্রম ও আয়োজন হইয়াছে, তাহা আমার অভিষেকনিবৃত্তির জন্য হউক।' এই বৈরাগ্যপূর্ণ কণ্ঠধ্বনি সমস্ত ক্ষুদ্রস্বর পরাজিত করিয়া আমাদের কর্ণে বাজিতে থাকে। যেদিন রাবণ রামের শরাসনের তেজে ভ্রষ্টকুণ্ডল ও হতশ্রী হইয়া পলাইবার পন্থা পাইতেছিল না, সেদিন রামচন্দ্র ক্ষমাশীল গম্ভীরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"রাক্ষস, তুমি আমার বহুসৈন্য নষ্ট করিয়া এখন একান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, আমি ক্লান্ত ব্যক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করি না, তুমি আজ গৃহে যাইয়া বিশ্রাম কর, কল্য সবল হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিও।" সেই মহাহবের মহতী প্রাঙ্গণভূমিতে ধার্ম্মিকপ্রবরের এই কণ্ঠস্বর স্বর্গীয় ক্ষমা উচ্চারণ করিয়াছিল;—উহাই তাঁহার চিরাভ্যস্ত কণ্ঠধ্বনি,—রাম ভিন্ন জগতে এ কথা শত্রুকে আর কে বলিতে পারিত? কৈকেয়ীকে লক্ষ্মণ প্রসঙ্গক্রমে নিন্দা করিলে রামচন্দ্র

পঞ্চবটীতে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"অম্বা কৈকয়ীর নিন্দা তুমি আমার নিকট করিও না"—এরূপ উদার উক্তি রামের মুখেই স্বাভাবিক; সীতাকেও তিনি এইভাবে বলিয়াছিলেন—"স্নেহপ্রণয়সম্ভোগে সমা হি মম মাতরঃ"— আমার প্রতি স্নেহ ও আদর প্রদর্শনের সম্পর্কে,—সকল মাতাই আমার পক্ষে তুল্য।" যেদিন শরাহত লক্ষ্মণ মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন, এদিকে দুর্দ্ধর্ষ রাবণ তাঁহাকে ধরিবার চেষ্টা পাইতে-ছিল,—ব্যাঘ্রী যেরূপ স্বীয় শাবককে রক্ষা করে, রামচন্দ্র সেইভাবে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছিলেন; রাবণের শরজাল তাঁহার পৃষ্ঠদেশ ছিন্নভিন্ন করিতেছিল, সেদিকে দৃষ্টি-পাত না করিয়া রামচন্দ্র সজলচক্ষে লক্ষ্মণকে বক্ষে লইয়া বসিয়াছিলেন, এবং বলিয়া-ছিলেন—"তুমি যেরূপ বনে আমাকে অনুগমন করিয়াছ, আমিও আজ সেই-রূপ মৃত্যুতে তোমাকে অনুগমন করিব, তোমাকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিতে পারিব না।"—এইরূপ শত শত চিত্র রামায়ণকাব্যে অমর হইয়া আছে, শত শত উক্তিতে সেই চিত্র স্বর্গের আদর্শ পৃথিবীতে আঁকিয়া ফেলিতেছে, বহু পত্রে সেই চিত্র ও উক্তি আমাদিগকে এই আশ্চর্য্য চরিত্রের সমুন্নত সৌন্দর্য্য দেখা-ইয়া মুগ্ধ ও বিস্ময়াভিভূত করিতেছে। রামায়ণকাব্যপাঠান্তে রামচন্দ্রের এই উজ্জ্বল ও সাধু মূর্ত্তি মানসপটে চিরতরে মুদ্রিত হইয়া যায়, অপর কোন কথা মনে উদয় হয় না; আর একান্ত সাত্বিকভাবে বিচার করিলে সীতাবিরহে রামের প্রেমোন্মাদ যদি দৌর্ব্বল্যজ্ঞাপক হয়, তবে তাহার এই সান্ত্বনা যে, প্রণয়িগণের নিকট রামের এই প্রেমোন্মাদের ন্যায় মনোহর কিছু নাই—এখানে বৈরাগ্যের শ্রী নাই, কিন্তু অপর্য্যাপ্ত কাব্যশ্রী সে অভাব পূরণ করিয়া দিতেছে, আর নির্জ্জন গিরিপ্রদেশের শোভান্বিত দৃশ্যাবলীতে বিরহাশ্রুর সংযোগ করিয়া সেই সমস্ত বিচিত্র বাহ্যসম্পদ্ চিরসুন্দর করিয়া রাখিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সিদ্ধিদাতা গণেশ।

"হেরি গণেশজননীরূপ রাণী ভাসে নয়ন-জলে।" সে কথা বুঝিতে পারি। মাতার চক্ষে পুত্রবতী কন্যা বড় মহিমময়ী মূর্ত্তি। কিন্তু একাকী গণেশঠাকুর এই নরলোকের চক্ষে দেখিতে কেমন, তাহা ঠিক বলিয়া ওঠা দায়। একে স্থূলতনু, তাহে খর্ব্বাকৃতি, তাহার উপর আবার লম্বোদর। ওই ধড়ের উপর একটা মানুষের মাথা থাকিলে যে দৃশ্যটা কিরূপ হইত, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু গজেন্দ্রবদনের সহিত খর্ব্বস্থূলতনু ও লম্বোদর, বেশ মানানসই হইয়াছে।

সমগ্র দেবতাবর্গের মধ্যে গণেশ ভিন্ন আর কাহারও স্কন্ধে একটা জন্তুবিশেষের মুণ্ড স্থাপিত হয় নাই। অথচ পঞ্চদেবতার

পূজায় ইঁহার পূজা সর্ব্বপ্রথম, এবং ইনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বলিয়া স্বীকৃত। কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে ইঁহার উদ্ভব হইল, যথাসাধ্য তাহার অনুসন্ধান করিব।

পুরাণে ইঁহার উৎপত্তিসম্বন্ধে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, সংক্ষেপত তাহা বলিয়া লইতেছি। নন্দি-ভৃঙ্গি প্রভৃতি মহাদেবের অনেকগুলি অনুচর ছিল; এই অনুচরেরা "গণ"নামে আখ্যাত হইত। মহাদেব অনেকসময়ে এই "গণ" সমভিব্যাহারে নানা স্থানে চলিয়া যাইতেন, এবং পার্ব্বতীকে একাকিনী অরক্ষিতাভাবে অবস্থান করিতে হইত। এইজন্য একদিন মহাদেবের অনুপস্থিতি-কালে পার্ব্বতী একতাল কাদা লইয়া একটি পুতুল গড়িয়া, তাহার দেহে প্রাণসঞ্চার করিলেন; এবং দ্বারদেশে প্রহরিস্বরূপে রক্ষা করিয়া এই নবসৃষ্ট পুরুষকে বলিয়া দিলেন যে, কেহ যেন তাঁহার অনুমতি ভিন্ন গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে। সজীব পুত্তলিকা,—কর্ত্তব্যপালন করিতেছেন, এমন সময়ে নন্দি-ভৃঙ্গি প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া মহাদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাদেব কত অনুনয়-বিনয় করিলেন, নন্দি কত ভয় দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই এই পুত্ত-লিকা দ্বার ছাড়িয়া দিল না। তখন কাজে-কাজেই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পার্ব্বতীর এ সকল কথার খোঁজখবর নাই; এদিকে কিন্তু স্বর্গ-ময় সোরগোল পড়িয়া গেল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি যে যেখানে ছিলেন, সসৈন্যে মহাদেবের সহায়তায় উপস্থিত হইলেন। পুত্তলিকার কাছে প্রায় সকলেই হটিয়া যাইতেছিলেন, এমন-সময় ছলে ও কৌশলে মহাদেব উহার শিরশ্ছেদ করিলেন। এইবার পার্ব্বতীর খবর হইল। ঠাকুরাণী একেবারে সপ্তমে চড়িয়া বলিলেন যে, তাঁহার আদরের পুত্রটির সেই বধের জন্য তিনি সৃষ্টি ওলট্‌পালট্ করিয়া দিবেন। মহাদেব সভয়ে ভৃত্যাদিগকে আদেশ করিলেন যে, "প্রথমে যাহার মুণ্ড পাও, লইয়া আইস,—পার্ব্বতীপুত্রের জীবনবিধান করিতে হইবে।" আদেশের ফলে একটা হাতীর মুণ্ড আসিল; এবং সেইটি লইয়াই মহাদেব মৃতপুত্রের জীবনবিধান করিলেন। তাহার পর ওই বীর পুত্রকে গণদিগের অধিপতি বা নায়ক করিয়া দিয়া উঁহাকে গণেশ করা হইল।

বৈদিক সাহিত্যে যখন একালের অনেক দেবতারই অস্তিত্ব অনুভূত হয় না, তখন সেস্থলে গণেশকে না পাইলে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু মার্কণ্ডেয়পুরাণাদির সৃষ্টির পূর্ব্বে যে কুত্রাপি গণেশকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, ইহাই সমস্যার কথা। মহাভারতের অনুক্রমণিকায় গণেশের লিপিকার্য্যের ভার গ্রহণ করিবার কথা আছে। ওইটি যে সম্পূর্ণ প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপত্তি করিবেন না। মূল মহা-ভারতের মধ্যে মহাদেব, পার্ব্বতী, স্কন্দ প্রভৃতি সকল দেবতারই নাম এবং ইতিহাস আছে; কিন্তু কোথাও গণেশের কথা ভ্রমেও উল্লিখিত নাই। যখন কেবল অনুক্রমণিকায় একবার-মাত্র তাঁহার নাম উল্লিখিত, তখন ঐ দেবতা মহাভারতরচনার সময়ে কদাচ পরিচিত ছিলেন বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। ঐ উপক্রমণিকা যে পরবর্ত্তী সময়ের রচনা, সে কথা প্রবন্ধান্তরে লিখিয়াছি।

রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে একটি শিবস্তোত্র আছে। এই শিবস্তোত্রে স্বয়ং মহাদেবকেই গণেশ বলা হইয়াছে। মহাদেবের অনুচরেরা 'গণ'নামে আখ্যাত; কাজেই মহাদেবকে সেই গণের অধিপতি বলা যাইতে পারে। রামায়ণের এই সর্গটি স্বদেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতেরাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু সেটা অন্য বিশিষ্ট কারণে। মহাদেবের নামে গণের অধিপতি, গণেশ এবং গণপতি শব্দ আরও অনেক স্থলে পাওয়া যায়। যাহা হউক, গণেশনামক স্বতন্ত্র দেবতাটির কথা যে রামায়ণে নাই, ইহাই যথেষ্ট।

পঞ্চতন্ত্রগ্রন্থ একালে অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে সত্য, তথাপি ঐ গ্রন্থের আদিতে যেখানে সমগ্র সিদ্ধিদাতা দেবতাদিগের নাম করিয়া প্রণামাদি করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে গণেশ নাই। যিনি সকল দেবতার অগ্রে পূজিত, তাঁহার যদি পঞ্চম শতাব্দীতে জন্ম হইয়া থাকিত, তবে কদাচ এরূপ অনুল্লেখ সম্ভবপর হইত না। বৎস, ভট্টি, কালিদাস, ভারবি প্রভৃতি ৫ম এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কোন কবির গ্রন্থে গণেশের নাম নাই। ঐ যুগের কোন প্রস্তরলিপিতেও উঁহার নাম পাওয়া যায় না।

ভরতপ্রণীত নৃত্যশাস্ত্র এখন নাট্যশাস্ত্র নামে প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ যখন নৃত্যশাস্ত্র হইতে নাট্যশাস্ত্রে পরিণত হয়, তখন এ দেশে অনেক নাটকের সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রন্থ পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত হইলেও মূল অংশটার যে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই, তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই নাট্যশাস্ত্রে রঙ্গভূমির কল্যাণ এবং শুভসঙ্কল্পে যত দেবতার নাম পাওয়া যায়, তাহাতে তৎসময়পূজিত কোন দেবতার অনুল্লেখ নাই। দেবতাদিগের এই সুদীর্ঘ তালিকাতেও গণেশের নাম নাই। গণেশের অনস্তিত্ব ভিন্ন ইহার অন্য কোন ব্যাখ্যা সম্ভব নহে।

বাণভট্ট এবং ভবভূতি সপ্তম শতাব্দীর কবি। বাণভট্ট উত্তরপ্রদেশের এবং ভবভূতি দক্ষিণপ্রদেশের। এই সময়ে যে শ্রীপর্ব্বতসন্নিহিত প্রদেশে এবং দ্রাবিড়দিগের মধ্যে কাপালিক এবং তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা উভয় কবির গ্রন্থেই দেখিতে পাই। বাণভট্টের কাদম্বরীতে একটি স্থলে গণপতির কথা পাওয়া যায়। সাহিত্যে হস্তিমুণ্ডধারী গণপতির সহিত এই প্রথম সাক্ষাৎ। এখানেও দেখিতে পাই যে, যেখানে বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতির চিহ্নে চিহ্নিত দেশের কথা বলা হইতেছে, সেই স্থলে 'গণ'-দিগের গাত্রমার্জ্জনচিহ্নের কথা বলিয়া, তৎসঙ্গেই তাহাদের অধিপতির অবগাহনের চিহ্নের উল্লেখ করা হইয়াছে। লিখিত হইয়াছে—

"অবকীর্ণভস্মসূচিত-মগ্নোত্থিত-গণবৃন্দোদ্ধূলনম্ অবগাহাবতীর্ণ-গণপতি-গণ্ডস্থলগলিত-মদপ্রস্রবণ-সিক্তম্।"

এস্থলে অন্য কোন দেবতার কথা নাই; এবং কুত্রাপি দেবতার চিহ্ন এরূপ ভাবেও ব্যক্ত হয় নাই। এখানে গণপতি গণদিগের সহচর এবং অন্যান্য গন্ধর্ব্বকিন্নরদিগের একদলে। গণপতি যদি তখন পূজিত দেবতাবর্গের মধ্যে একজন হইতেন, তাহা হইলে কাদম্বরীর যে যে স্থানে দেবতাদিগের কথা উঠিয়াছে,

সেই সেই স্থানে ইঁহাকে পাওয়া যাইত। যেখানে গৃহপ্রতিষ্ঠিত সকল দেবতাদিগেরই নাম এবং আয়তনের উল্লেখ আছে, সেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, অম্বিকা, কার্ত্তিক প্রভৃতি তো আছেনই, তদ্ব্যতীত বৌদ্ধদিগের শৌদ্ধোদন, অবলোকিতেশ্বর এবং অর্হতও উল্লিখিত হইয়াছেন। সেখানে গণপতির নাম নাই; কিন্তু আছে যেখানে অন্যান্য 'গণ' এবং গন্ধর্ব্বদিগের আবাসের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় যে, প্রথমত গণদিগের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ গণের কল্পনা হইয়াছিল; এবং পরে তাঁহার পূজার প্রচলন হইলে, কোনপ্রকারে তাঁহাকে পার্ব্বতীর হাতে কাদার তালে উদ্ভূত করাইয়া, মহাদেবের পুত্রস্থানীয় করিয়া লওয়া হইয়াছিল।

ভবভূতির মালতীমাধবে সর্ব্বপ্রথমে গণেশের পূজ্যপদবীলাভ দেখিতে পাই। দক্ষিণপ্রদেশে যে প্রথমত গণেশের পূজা ও পুরাণের উৎপত্তি, তাহা দেখাইতেছি। ভবভূতিতে যাহা দক্ষিণপ্রদেশে সুপ্রচলিত বলিয়া দেখিতে পাই, উত্তরপ্রদেশের বাণভট্টে তাহার কেবল অস্তিত্বমাত্র উপলব্ধ হয়। ইহাতে মনে হয় যে, গণেশের জন্ম সপ্তম শতাব্দীর অধিক পূর্ব্ববর্ত্তী নহে।

রাষ্ট্রকূট এবং চালুক্য রাজাদিগের বিজয়ের পূর্ব্বে যে দক্ষিণদেশে আর্য্যনিবাস স্থাপিত হয় নাই, তাহা বিশেষ করিয়া দেখাইতে গেলে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কুতূহলী পাঠকগণ এ বিষয়ে সংক্ষেপত শ্রীযুত রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মহাশয়ের দক্ষিণাপথের ইতিহাস পড়িতে পারেন।

দক্ষিণপ্রদেশে বিশেষভাবে আর্য্যনিবাস সংস্থাপিত হইবার পরে যে অমরকণ্টক, চিত্রোৎপলা প্রভৃতি এবং মহীশূরপ্রদেশের তুঙ্গভদ্রা প্রভৃতি পবিত্র তীর্থ হইয়াছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। যে পুরাণে তুঙ্গভদ্রাদি পবিত্র তীর্থ, নিশ্চয়ই তাহা দক্ষিণপ্রদেশে রচিত; এবং কাজেই উহা কদাচ অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী হইতে পারে না। মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং স্কন্দপুরাণ, নিশ্চয়ই দ্বিতীয় পুলকেশীর সময়ের পরবর্ত্তী।

ভবভূতির সময়ে গণপতি কোন আস্ত পুরাণে স্থান পাইয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু অল্পসময় পরেই যাঁহার জন্য পুরাণ রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয়ই দক্ষিণপ্রদেশে তাঁহার পূজা একটু পূর্ব্ব হইতেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

দক্ষিণের চণ্ডী ও দক্ষিণের তীর্থমহিমায় পূরিত মার্কণ্ডেয়পুরাণ এবং চালুক্যদিগের কুলদেবতা স্কন্দের পুরাণ যে অন্য পুরাণের সহিত প্রতিযোগিতায় দক্ষিণপ্রদেশে লিখিত, তাহার আরও প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ঐ পুরাণগুলি পাঠ করিলেই দক্ষিণপ্রদেশের প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে। পুরাণের কালনির্ণয়ের সময়ে বিশেষ কথা পরে লিখিব। পাঠকেরা হয় ত জানেন যে, এখনও দক্ষিণপ্রদেশে গণপতির প্রভাব এবং পূজা যত প্রচলিত, অন্য কোন দেশে তাহা পরিলক্ষিত হয় না।

মহাদেবের বা রুদ্রের 'গণ' পূর্ব্বকালের মরুৎগুলির বংশধর। এই গণদিগের মধ্যে কাহারও ষাঁড়ের মুণ্ড, কাহারও বা অন্য জন্তুর মুণ্ড এবং কাহারও বা মুণ্ড নাই।

এরূপ স্থলে, জন্তুদিগের মধ্যে একটা শ্রেষ্ঠ-জন্তুর মাথা বসাইয়া যে গণদিগের অধিপতির সৃষ্টি হইবে, তাহা স্বাভাবিক। গণপতি হইয়া আবার যখন গণেশ পূজা পাইতে লাগিলেন, তখন যে উঁহার নামে পুরাণ রচিত হইয়া, উঁহাকে দেববংশজ করা হইবে, তাহাও স্বাভাবিক। যখন যে দেবতার নামে প্রথম পুরাণ হয়, তিনিই তখন সকলের উপরে আসন পাইবার মত গুণ লাভ করেন। গণেশ, কার্ত্তিকের কনিষ্ঠ হইয়াও, একটা ফাঁকির জোরে আগে বিবাহ করিলেন, এ কথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে আছে। এখন কিন্তু কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠ বলিয়াই সর্ব্বত্র পরিচিত।

গণেশের বয়স প্রায় ১৩শত বৎসর। ইনি দেববর্গের মধ্যে শিশু হইলেও, এখন একটু বয়স্ক; তাই এখন ইনি অতি নির্ব্বিরোধী এবং সিদ্ধিদাতা মাত্র। কিন্তু ইনি প্রথম বয়সে যে সকল কার্য্য করিয়াছেন, তান্ত্রিক-ধর্ম্মের আলোচনার সময়ে তাহা না বলিলে চলিবে না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আমাদের ভাবী অবতার।

জগতের প্রয়োজন হইলে ভগবান্ অবতীর্ণ হন—ইহাই আমাদের প্রাচীন ধারণা।

পাপের আধিক্য হইলে দুইটি ফলের একটি অবশ্যম্ভাবী। পাপ পূর্ণ হইলে জীব এক হয় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, না হয় উদ্ধারের পন্থায় আসিয়া পড়িবে।

দোষের মাত্রা চড়িয়া উঠিলে অনেক ব্যক্তি, অনেক সমাজ ধ্বংসের মুখে পতিত হয়—আবার কোন্ কোন ব্যক্তি বা জাতির জীবনের গতি বিপরীত পন্থা অবলম্বন করে। এই হিসাবে "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" শ্লোকের অর্থ একটু নূতনভাবে বুঝিতে হইবে। যেখানেই অন্যায়ের আবর্ত্ত প্রবল, সেইখানেই যে ভগবৎ-কৃপার আলোকবর্ত্তিকা প্রকাশ পাইয়া ধ্বংসমুখ হইতে সমাজকে রক্ষা করিবে, তাহা নহে। অত্যাচারের মুখে কত জাতি একেবারে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। যুরোপীয় সভ্যজাতি-গণের অত্যাচারে নিরীহ রেড্ ইণ্ডিয়ান্ বিনষ্ট হইয়া গেল, সেখানে ত অত্যাচারীর হস্তের খড়্গ ও বন্দুক কাড়িয়া লইবার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইলেন না,—সুতরাং আমরা যদি কখনও দুঃখে-কষ্টে পড়িয়া একান্ত আর্ত্ত-ভাবে আশান্বিত হই যে, দুঃখের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, এইবার ভগবান্ নিশ্চয়ই ভাগ্য-চক্রের পরিবর্ত্তন করিবেন, তাহা আমাদের অন্ধবিশ্বাস বই আর কিছু নহে।

ব্যক্তিগত জীবনে যাহা প্রত্যক্ষ হয়—সামাজিক জীবনের প্রশস্ত ক্ষেত্র সেই সত্যকে আরও বেশী ফলাইয়া তোলে। কোন কোন জীবন রোগ, শোক বা পরপীড়ন প্রভৃতি দুর্ঘটনায় উৎসন্ন হইয়া যায়, আবার এরূপও দুইএক স্থলে দৃষ্ট হয় যে, ঘোর বিপদে

পড়িয়া সহসা মানুষের আভ্যন্তরীণ মহাশক্তি জাগিয়া উঠে ও তাহাকে দেবশ্রীমণ্ডিত করিয়া জগতে প্রচার করে,—সেই স্থলে ভগবানের অনুকম্পা দৃষ্ট হইয়া থাকে।

যে জাতি পাপের মোহে অন্ধ হইয়া যায়, আর জাগ্রত হয় না,—পাপ তাহাকে ধ্বংস করে; সে জাতি কখনই আশা করিতে পারে না যে, তাহাদের কষ্ট ভগবদ্দয়ার উদ্রেক করিবে। শাস্ত্রে লিখিত আছে, এদেশে কল্কির অবতার হইবে, তিনি ম্লেচ্ছাধিকার দূর করিয়া সাধুর পরিত্রাণ করিবেন। মুর্শিদাবাদকাহিনীর লেখক নিখিলবাবু একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, যদি ম্লেচ্ছ-বিনাশকল্পে ভগবানের আসা সম্ভবপর হয়, তাহাতে আমাদের আশ্বাসিত হইবার কোন কারণ নাই—সে ম্লেচ্ছ আমরা। বাস্তবিকই সৎপথভ্রষ্ট, আচারবর্জ্জিত, কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ, ভীরু ও বিলাসী কাপুরুষ আমাদের অপেক্ষা ম্লেচ্ছ আর বর্ত্তমান জগতে কে আছে? শাস্ত্রের শ্লোক হিন্দুজাতির প্রতি পক্ষপাতী নহে—উহার অর্থ সনাতন ও ব্যাপক, সমস্ত জীবজগৎকে লক্ষ্য করে। তাহাই যদি হয়, তবে অশ্বারূঢ় কল্কিমূর্ত্তি আমাদের আশ্বাসপ্রদ নহে, উহার কল্পনায় আমাদের আত্মাপুরুষের আতঙ্কিত হইয়া উঠিবার কথা।

কিন্তু যে জাতি অন্যায় সহিয়া, বিবিধ দুষ্কর্ম্মের স্রোতে ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া পুনরায় জাগ্রত হয়—অনুতাপাগ্নি জ্বালিয়া পূর্ব্বকৃত সমস্ত দুষ্কর্ম্মের জঞ্জাল ভস্মীভূত করিয়া নবশক্তিলাভের পুনরারাধনায় রত হয়,—তাহাদের মধ্যে ঐশশক্তিবিকাশের সম্ভাবনা দাঁড়ায়। সমস্তজাতির তপশ্চরণে যে জ্যোতির উদগম হয়—অবতারের ললাটে তাহাই বিচ্ছুরিত হইয়া উঠে। সে জাতি যত ক্ষুদ্র, যত তুচ্ছ হউক না কেন, ভগবানের কৃপাভাজন হইতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না। শাস্ত্রে দেখিতে পাই, তিনি কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন—যে জাতির যেরূপ অভাব, তাহাই মোচন করিবার উপযোগী সুব্যবস্থা করিতে তাঁহার কিছুমাত্র ইতস্তত হয় না, এতদর্থে মনুষ্য ও কূর্ম্মমূর্ত্তি তাঁহার নিকট তুল্যরূপে গ্রাহ্য।

কিন্তু অবতার যে আকারেই উপস্থিত হউন না কেন, তিনি সমাজের একজন হইয়াও সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন থাকেন। কূর্ম্ম, বরাহ প্রভৃতি রূপ গ্রহণে তাঁহার কোন আপত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু স্বর্গের আলোক তাঁহার নখর বা শৃঙ্গ হইতে ফলিয়া উঠে ও তাঁহাকে চিনিতে বিলম্ব হয় না। প্রাচীন সংস্কার যখন সমাজে বদ্ধমূল হইয়া যায়, প্রাচীন পাপ যখন ধর্ম্মবেদি আশ্রয় করিয়া অথবা শাস্ত্রবচনে পুষ্ট হইয়া সমাজের মূর্দ্ধায় অভিষিক্ত হয়—যখন সমাজদেহের যেখানে বিষ, সেখানে বেদনাবোধ লুপ্ত হয়—তখন সেই পুরুষবর একহস্তে চৈতন্যের আলোকবর্ত্তিকা, অপর হস্তে প্রাণসঞ্জীবন মহৌষধ লইয়া উপস্থিত হন, তাঁহার বাহ্যরূপ সমাজের উপযোগী হয়, কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরের বিগ্রহ মানবসমাজের চিরন্তন স্বর্গকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যায়। এই হিসাবে নরসিংহ ও কূর্ম্ম রূপের সঙ্গে বুদ্ধাবতারের কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। একজন অবিশ্বাসীর মুণ্ড নখরে ছেদন করিয়া

ছিলেন, অপর জগতের সারধন বেদকে রক্ষা করিয়াছেন; আর বুদ্ধদেব এই নিষ্ঠুর রাজ্যে স্বর্গীয় করুণার বেদি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সময়োপযোগী ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সত্য—কিন্তু প্রত্যেকের উদ্দেশ্য এক ছিল। পৃথিবীর সঙ্গে যখন স্বর্গের সম্পর্ক লুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা হইয়াছিল, তখন ইঁহারা সেই সম্পর্কের পুনরুদ্ধার করিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখন যদি গারো কিংবা কুকিজাতির মধ্যে মহাপুরুষের আবির্ভাবের প্রয়োজন হয়, তবে বোধ হয় তাঁহাকে নরসিংহের মত মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইতে হইবে, পরমসৌম্য বুদ্ধের মহিমা সেই সকল সমাজের উপযোগী নহে; কিন্তু তাই বলিয়া বুদ্ধ ও নরসিংহের মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য কিছুই নাই—চিরন্তন বিশ্ববিধানের পবিত্রতা-রক্ষাই মহাপুরুষের আবির্ভাবের কারণ। প্রথম কয়টি অবতারের কথা যদি রূপকথা বলিয়া গণ্য হয়, ভগবানের অপার করুণায় বিশ্বাসই সেই রূপকথার সৃষ্টি করিয়াছিল, সন্দেহ নাই।

আমাদের দেশ এখন একজন মহাপুরুষের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে; আমরা বিপৎসাগরে পতিত; যে মহিমা হিন্দুস্থানের ললাটে উজ্জ্বল এবং প্রকৃত রাজচিহ্ন আঁকিয়া রাখিয়া ছিল, তাহা মুছিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা পরপ্রেক্ষী, অনশনতপ্ত ও নানা অপমানে লাঞ্ছিত। আমাদের এই অন্ধ তমসাচ্ছন্ন রাত্রি কোন্ তেজস্বী মহাজনের মহিমায় কাটিয়া যাইবে? শত শত বৎসর যে হিন্দুস্থান স্বীয় নিবৃত্তি ও সংযমের পুণ্য যজ্ঞাগ্নি সম্মুখে রাখিয়া তপশ্চরণে নিযুক্ত ছিল—যে ব্রতসিদ্ধির ফলস্বরূপ শত শত মহাজন আবির্ভূত হইয়া এই দেশ হইতে ধর্ম্ম, দর্শন ও কবিত্বের সাধু-শুভ্র জ্যোতি চিরকালের জন্য জগতের অন্ধকার দূর করিতে নিযুক্ত রাখিয়াছেন—সেই ব্রত কি এতদিনে সাঙ্গ হইয়াছে? এই যে উপবাস, সংযম, দেবারাধনা, নির্জ্জন-চিন্তা—যাহা হিন্দুস্থানের শুভ্রতম-কিরীটস্বরূপ, তাহা দূর করিয়া কোন্ অন্ধ সভ্যতা আমাদের মধ্যে অতৃপ্ত বিলাস ও বুভুক্ষার অগ্নি জ্বালিয়া দিল? হায়! আমাদের বুঝি ধ্বংস হইবার দিন সম্মুখীন!—এইজন্য স্বর্গের আলো ছাড়িয়া আমরা আলেয়ার আশ্রয়ে সুগম পন্থার আবিষ্কার করিতে চাহিতেছি! আমাদের যোগসাধনা করিবার প্রাচীন কৌপীনখানি ফেলিয়া রাখিয়াছি ও য়ুরোপীয় বিলাসের রঙিন ন্যাকড়ায় শোভান্বিত হইতে চাহিতেছি। কিন্তু যদি মহাপরীক্ষার দিনে হিন্দুস্থানকে গর্ব্ব করিয়া স্বীয় নিজস্ব প্রমাণ করিতে হয়—জগতের সম্মানশালায় তাহার আত্ম-পরিচয় দিতে হয়, তবে সেই ছিন্ন-গলিত কৌপীনখানিরই অনুসন্ধান করিতে হইবে; সেই বেদান্তধর্ম্ম হিমালয়ের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে জগৎকে নির্ম্মলতম, শুভ্রতম আলো দেখাইয়া আমন্ত্রণ করিতেছে—আমাদের পরিত্যক্ত কৌপীনখানি সেই বেদান্তকারগণের পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন,—আমরা বহুভাগ্যে উত্তরাধিকার-সূত্রে তাহা পাইয়াছি, আমাদের উহাই জাতীয় পতাকা। যিনি মানবজাতির দুঃখ-বিমোচনের জন্য রাজপুত্র হইয়াও ফকিরের বেশে বনে বনে কি-এক স্বর্গীয় ঔষধ খুঁজিয়া

বেড়াইয়াছিলেন, সেই ভিষক্‌রাজ এই পৃথিবীতে যে জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া রহিয়াছেন—তাহার বৈরাগ্যের শুভ্রদীপ্তি শত শত ময়ূরাসনের তীব্র জ্যোতি ম্লান করিয়া দিতেছে। বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে নহে—কপিলাবস্তুর বনরাজির চিরহরিৎ পল্লবনিচয় আমাদিগকে যে বৈরাগ্যের স্বপ্ন দেখাইতেছে, তাহা প্রত্যাখ্যান করিলে আমাদের প্রকৃত মহিমা বিদূরিত হইবে। এই বৈরাগ্যজনিত মহাপ্রেম একদিন বন্যার ন্যায় নবদ্বীপ হইতে বঙ্গদেশকে ভাসাইয়া দিয়াছিল। আমাদের যাহা-কিছু গৌরব, যাহা-কিছু মহিমা—তাহা নিবৃত্তির, তাহা বৈরাগ্যের। হিন্দু পান্থ, এই পূর্ব্বপুরুষপ্রদর্শিত পন্থা ত্যাগ করিলে তোমাদের অস্তিত্বরক্ষার সম্ভাবনা নাই।

প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনে বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়; বালক বৃদ্ধের মত হইয়া পড়িলে তাহার অকাল জ্যেষ্ঠতাতত্বের জন্য সে নিন্দিত হয়, বৃদ্ধও যৌবনের আড়ম্বর-প্রকাশে উৎসাহী হইলে তাহার গুম্ফের কলপ ও পরিচ্ছদের পারিপাট্য হাস্যের উদ্রেক করে।

হিন্দুজাতি এখন বয়োবৃদ্ধ। যাঁহারা এখন নবযৌবনের স্ফূর্ত্তিতে দুই হাতে বিজয়-ডঙ্কা বাজাইয়া পৃথিবী চমকিত করিয়া তুলিতেছেন, রাজ্যলুব্ধ ও ধনগৃধ্নু হইয়া সর্ব্বজনীন হিতের মস্তকে বজ্রাঘাত করিতেছেন,—পশুহননের জন্য নহে, স্বজাতির সংহারকামনায় ভয়ঙ্কর শত শত মৃত্যুর উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, যাঁহারা মনুষ্যজাতির প্রতি স্বর্গীয়সখ্যজ্ঞাপক মহাগ্রন্থ বাইবেলের নীতি মুখে স্বীকার করিয়াও সেই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে শেল বিদ্ধ করিয়া যাইতেছেন, আমরা তাঁহাদের দৃষ্টান্তে নাচিয়া-উঠিয়া কয়েকখানি বংশযষ্টি সংগ্রহ করিয়া জগতে বরণীয় হইব, ইহা নিতান্তই উপহাসের কথা—এই বংশদণ্ডের বীরত্ব ও প্রতাপাদিত্যের প্রেতাত্মার আমন্ত্রণ—আমাদের ললাটে গৌরবচিহ্ন অঙ্কিত করিতে পারিবে না। ইহার অপেক্ষা উপহাসের কথা কি হইতে পারে যে, যেকালে ম্যাক্সিম্‌-গন্‌ প্রভৃতি মৃত্যুর ভয়াবহ যন্ত্রসকল উদ্ভাবিত হইতেছে এবং বৈজ্ঞানিক যুদ্ধবিস্তার লোলরসনা বিনাশশক্তি তাণ্ডবনৃত্যের সূচনা দেখাইয়া জগৎকে আতঙ্কিত করিতেছে, সেইকালে আমরা জগতের একপ্রান্তে বসিয়া কয়েকটি বংশযষ্টিতে সর্ষপতৈল সংযোগ করিতেছি ও প্রতাপাদিত্য, উদয়াদিত্য প্রভৃতি পল্লিবীরগণের মৃতস্বপ্নের পুনরুদ্ধারকল্পে সচেষ্ট হইয়া রঙ্গালয়ের ক্ষণিক উত্তেজনার আত্মপ্রসাদে চরিতার্থ হইতেছি। গীতার "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ" সকলেই জানেন। আমরা এখন ঐরূপ বীরত্বে অনুপ্রাণিত হইবার অবস্থা অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি—উহা আমাদের ধর্ম্ম নহে। বৃদ্ধব্যক্তির গুম্ফে কলপ দেওয়ার ন্যায় এই ধার-করা বীরত্ব উপহাসের সৃষ্টি করিতেছে মাত্র। আমরা দেশীয় ব্যায়ামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার হিসাবে এই বংশযষ্টির অনুশীলন স্বাস্থ্যের হিতকর বলিয়া গণ্য করি, কিন্তু কোন রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় ইহা আমাদের রাজোন্নতির নির্ভরদণ্ড হইবে—এ কল্পনা নিতান্ত অসাড়। আশা করি, এরূপ উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা কাহারও মাথায় আইসে নাই।

বয়োবৃদ্ধের যে সম্মান, তাহা আমাদের যথেষ্ট ছিল, বর্ত্তমান কালের ছিড়িকে আমরা

তাহা হারাইতে বসিয়াছি। গ্রীস্ ও রোম্ তাহাদের প্রাচীন বীরত্ব ফিরিয়া পায় নাই। বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধের প্রাপ্য মর্য্যাদা দেখাইয়া সসম্ভ্রমে য়ুরোপ তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে মাত্র। উহাদের অপেক্ষা উচ্চতর ও উজ্জ্বলতর মর্য্যাদা ভারতের প্রাপ্য। যে তপস্যা আমাদের পুর্ব্বপুরুষগণের ছিল—সেই তপস্যা অক্ষুণ্ণ ও অপ্রতিহত রাখিলে তাঁহাদের প্রদত্ত অমূল্য শাস্ত্র ও ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের অধিকার জন্মিবে। আমাদের মত সেই তপস্যা কোন জাতি করে নাই এবং যেদিন প্রজ্বলিত গৃহকলহে য়ুরোপের প্রবৃত্তিসঞ্জাত বিষম প্রতি-দ্বন্দ্বিতার শেষ আহুতি পড়িবে, সেদিন পরিতপ্ত জগৎ ব্যাকুলভাবে শান্তি ও প্রীতি শিক্ষার জন্য চতুর্দ্দিকে তাকাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষ মহাশিক্ষক—মহাভিষক্ রূপে তাহার ব্যথিত স্থানে নিবৃত্তি ও পরার্থপ্রীতির হস্ত বুলাইয়া দিবেন এবং অঙ্গুলিসঙ্কেতে সেই মহারাজরাজেশ্বরকে চিনাইয়া দিবেন—যাঁহার শান্তিময়, অমৃতময় নিকেতনের আভাস পাইলে মানুষের ভয় ও অশান্তি চিরতরে ঘুচিয়া যায়। আমাদের কল্পনা এই দৃশ্য আঁকিয়া হৃষ্ট হইতেছে। যে অস্ত্রশস্ত্রের ঝন্‌ঝনা চারিদিক্ হইতে শ্রুত হইতেছে—ইহা প্রলয়ের সূচনা করিতেছে। ইহা য়ুরোপের নানা শিল্পসৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত বিলাসকলা শোভিত রাজধানীগুলিকে মহাশ্মশানে পরি-ণত করিবার আশঙ্কা দেখাইতেছে,—য়ুরোপের আকাশচুম্বী মনুমেণ্টগুলির শীর্ষে গৃধ্ররাজ বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন, এই-রূপ মনে হয়। এই অস্ত্রশস্ত্র—মৃত্যুর এই ভয়া-বহ যন্ত্রগুলি যে অগ্নিজ্বালা উদ্গিরণ করিবে, তাহাতে হয় ত য়ুরোপে দ্বিতীয় কুরুক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠা হইবে। যাহাদের এত তেজ ও পরস্পরের সহিত এত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, তাহারা এই বিষময় জ্বালা বেশিদিন ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না; মহামন্ত্রে যেদিন লৌহ-যন্ত্রগুলি অগ্নি উদ্গিরণ করিবে, সেদিন স্পর্দ্ধা, বিক্রম ও অহঙ্কারের হয় ত শেষ আহুতি পড়িবে, সেইদিন য়ুরোপের গতি হয় ত ভিন্নদিকে প্রবাহিত হইবে। এই দুষ্টব্রণ উদ্গীরিত হইয়া যাউক। এই যে অর্দ্ধপৃথিবী গ্রাস করিতে উদ্যত হইয়া রুষভল্লুক রোষকষায়িতনেত্রে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে ও শান্তিময় ক্ষুদ্র জাপান-রাজ্যখানিকে এক প্রাণান্তক থাবায় চূর্ণ করিয়া ফেলিবার স্পর্দ্ধা করিতেছে, এই ভল্লুকরাজের উদ্যত পাদমুষ্টিই য়ুরোপের সমৃদ্ধিলক্ষ্মীকে চিরবিনাশের পথে লইয়া যাইবার পূর্ব্বাভাস দিতেছে কি না, কে বলিবে? কিন্তু নিষ্ঠুরতা ও বৈষম্যের পরে শান্তির দিন আছে। এমন দিন আসিতে পারে, যখন শান্তির জন্য জগতে হাহাকার উঠিবে। হে ভারতবাসি, তুমি ধীরহস্তে সন্ধ্যার ধ্রুবজ্যোতি,—নিবৃত্তির আলো জ্বালা-ইয়া রাখ। এই হট্টগোলপূর্ণ বিদ্বেষদুষ্ট কলরবের দিবাবসানে মানবজাতি হয় ত পুনশ্চ এই দীপের অনুসন্ধান করিবে, ইহার নির্ম্মল ভাতিতে তাহার চক্ষে নবজ্যোতি ফিরিয়া আসিবে; হিন্দু, এই দীপ নিবাইও না। তোমার চরিত্র সংযত হউক, সামাজিক শত শত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া, নির্ম্মলদেহে নির্ভীক অন্তঃকরণে তপস্যা কর;—সত্যনিষ্ঠা, বিষয়ে বৈরাগ্য, অবস্থার প্রতি উপেক্ষা শিখিয়া শরীর ও মনকে দুঃখকষ্টে অভ্যস্ত কর।

একদিন নারীজাতির দ্বারা যে উপবাস, সেবা ও পরার্থ আত্মসমর্পণের চর্চ্চা করাইয়া লইয়াছ, পুনরায় নিজেরা সেই সকল বৃত্তির অনুশীলনে প্রবৃত্ত হও। সত্যের সহিত সহমরণে প্রস্তুত হও, নিবৃত্তির পবিত্র যজ্ঞাগ্নিতে ঋণলব্ধ বিলাসিতার সামগ্রীগুলি পোড়াইয়া ফেল। এই তপস্যা পূর্ণ হইলে নিবৃত্তির মহাক্ষেত্রে মহানিবৃত্তিপরায়ণ আবির্ভূত হইতে পারেন। তাঁহার শুভ্র-সুমধুর হাস্যচ্ছটা চন্দ্রকরলেখার ন্যায় উত্তপ্ত ধরাবক্ষকে শান্তিময় করিয়া তুলিবে,—সমস্ত বিদ্রোহ তাঁহার সাম্য-শান্তি-পরিঘোষক মেঘদুন্দুভিনাদী কণ্ঠস্বরে দমিত হইয়া যাইবে,—তখন গুরুগৃহ বা দেবগৃহের যে সম্মান, তাহাই প্রদান করিয়া জগদ্বাসী হিন্দুস্থানকে রক্ষা করিবে। আমরা তপশ্চরণ না করিলে তিনি আসিবেন না,—বিদেশীয়গণের উন্মত্ততা ও বিলাসিতায় যোগদান করিলে আমাদের ধ্বংস অবধারিত; কারণ যৌবন যাহা সহিতেছে বা করিতেছে—বার্দ্ধক্যে তাহা সহিবে না। তাহা হইলে কল্কি আমাদের মত ম্লেচ্ছের উচ্ছেদের জন্যই আবির্ভূত হইবেন। নরসিংহাবতার আমাদের সমাজে হইয়া গিয়াছে, সেই অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনরাকৃতি দেবতা আর আমাদের সমাজের উপযোগী নহে। যে স্থান দম্ভ, অহঙ্কার ও অবিশ্বাসের ক্রীড়াক্ষেত্র, সেই স্থানে নরসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব হইতে পারে,—অথবা য়ুরোপে নেপোলিয়ানমূর্ত্তিতে তাহা হইয়াও গিয়াছে। আমরা বুদ্ধচৈতন্যের পরম কৃপা পাইয়াছি; আমাদের এখানে যিনি আসিবেন, তিনি সম্পূর্ণ দেবভাব লইয়া আসিবেন—অন্য কোন মূর্ত্তি আমাদের উপাস্য হইবে না। তিনি শুভ্র প্রীতিপুষ্পের মাল্য পরিয়া আসিবেন, তিনি বিবিধকারুকার্য্যখচিত উজ্জ্বলরাগরঞ্জিত বিচিত্র অম্বরে সংবৃত হইয়া ভুলাইবেন না, তিনি আমাদের কৌপীনবাসেরই মহিমা ঘোষিত করিয়া বিলাসী জগৎকে পুণ্যদীপ্ত দৈন্যের অলঙ্কার পরাইয়া দিবেন; তিনি শত্রুদমনের জন্য অসিচর্ম্ম বা বন্দুক লইয়া আসিবেন না,—জ্ঞানের তৃতীয়চক্ষু লইয়া আসিবেন,—জগতের মোহবন্ধন তাঁহার ইঙ্গিতে টুটিয়া যাইবে। এইরূপ মহাশিক্ষকের আবির্ভাব সঙ্কল্প করিয়া জাতীয়ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক আমাদের প্রতীক্ষা করা উচিত। আমরা কুশিক্ষা ও উচ্ছৃঙ্খলতার তাপে ম্লান হইয়া পড়িলেও আমাদের শোণিতে যে সাত্ত্বিকতা সঞ্চিত আছে, জগতের কোন জাতির তাহা নাই, তাহারই বিকাশ করিবার সময় হইয়াছে। রাক্ষসের বদনব্যাদান দেখিয়া, আমাদের দন্তরুচিবিকাশের চেষ্টা হাস্যকর ও অসার। "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য"—মৃত্যুকে ভয় না করিয়া, জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছাড়িয়া, জগতের হিতব্রত পরিগ্রহ করিয়া আমাদের ভাবী অবতারকে আবাহন করিয়া আনিতে হইবে। যখন ভীষণ বিদ্বেষে নিপীড়িত মানবজাতি 'পরিত্রাহি' বলিয়া চীৎকার করিবে, তুষারশুভ্র অবিচলিত মূর্ত্তিতে তখন শ্বেতচন্দনদ্যুতি-দীপ্ত হইয়া, তুমি ব্রাহ্মণ, আর একবার জগতে শান্তির শুভ আদেশ প্রচার করিয়া যাইও। যে ভারতবর্ষ শান্তির লক্ষ্যে এত কৃচ্ছ্র, এত তপশ্চরণ করিল, সেই ভারতবর্ষ হইতে যদি জগতে শান্তি প্রচারিত না হয়, তবে তাহা আর কোন্ স্থান হইতে হইবে?

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

২৩

রাত্রি নয়টার সময় রমেশ কমলাকে লইয়া শেয়ালদহ-ষ্টেশনে যাত্রা করিল। যাইবার সময় একটু ঘুরপথ দিয়া গেল। গাড়োয়ানকে অনাবশুক গোটাকতক গলি ঘুরাইয়া লইল। কলুটোলায় একটা বাড়ীর কাছে আসিয়া আগ্রহসহকারে মুখ বাড়াইয়া দেখিল। পরিচিত বাড়ীর ত কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই! রমেশ এমন কত রাত্রে এই গলিতে পায়চারি করিয়া বেড়াইয়াছে—স্তব্ধরাত্রে বাড়ীর একটি চেহারা দিনের বেলার চেয়ে আরো যেন ফুটিয়া উঠিত—গলি যখন জনশূন্য এবং নিঃশব্দ, তখন এই বাড়ীর বুকের ভিতরকার একটি মহামূল্য রহস্য অন্ধকারের মধ্যে যেন বাহির হইয়া আসিত,–রাত্রে বাড়ীর সূক্ষ্মশরীর যেন ইঁটকাঠের মধ্য হইতে মুক্ত হইয়া ভিত্তিচ্ছায়ায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। বহুতর গভীর রাত্রের সেই নিবিড় ভাবাবেগ তাহার চিত্তের মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। পলকের মধ্যে এই বাড়ীর দীপালোক ও অন্ধকার, রুদ্ধদ্বার ও মুক্ত বাতায়ন, বারান্দার শূন্যতা ও শাদা দেয়ালের শুভ্রচ্ছটা রমেশের ব্যগ্রদৃষ্টির উপর দিয়া চলিয়া গেল। যদি আজ না হইয়া গতকল্য হইত, তবে অনায়াসে রমেশ গাড়োয়ানকে ডাকিয়া বলিত, "রোখো, রোখো!" এই দ্বারের সম্মুখে লাফাইয়া পড়িয়া সবেগে ঐ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিত এবং কথা ও দৃষ্টির দ্বারা সকলের কাছ হইতে বিদায় লইয়া আসিতে পারিত। প্রবেশদ্বার আজও খোলা রহিয়াছে, কিন্তু প্রবেশ করিবার পথ নাই। এই দরজা দিয়া রমেশ এই বাড়ীতে আর কখনো প্রবেশ করিতে পারিবে কি না, তাহাই ভাবিতে লাগিল। গাড়ি চলিয়া গেল—রমেশের হৃদয়ের একান্ত আগ্রহ এই দরজার কাছে গাড়ির গতিকে লেশমাত্র বাধা দিল না—গাড়ি অপক্ষপাত দ্রুততার সহিত গলির সব বাড়ীকেই অতিক্রম করিয়া বড়রাস্তায় গিয়া পৌঁছিল।

রমেশ এমন একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল যে, নিদ্রাবিষ্ট কমলা চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার কি হইয়াছে?"

রমেশ উত্তর করিল—"কিছুই না।" আর-

কিছুই বলিল না—গাড়ির অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ির কোণে মাথা রাখিয়া কমলা আবার ঘুমাইয়া পড়িল। ক্ষণকালের জন্য কমলার অস্তিত্বকে রমেশের যেন অসহ্য বোধ হইল। প্রাণপণ শক্তিতে ইহার বন্ধন একেবারে ছিন্ন করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিল। একটি-মাত্র এই বালিকা তাহার ভবিষ্যৎকে এমন করিয়া আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, যে দিকেই তাকায়, কোথাও সে কোন পথ খুঁজিয়া পায় না। রাত্রে গাড়ি যখন দুই পার্শ্বের হর্ম্ম্যশ্রেণীর মাঝখান দিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, তাহার মনে হইতে লাগিল, কমলা যেন একটা বন্যার মত তাহার পরিচিত লোকালয় হইতে রমেশকে একটা কালো স্রোতের উপর দিয়া দুর্নিবার বেগে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে—কোথায় ঠেকিবে, কোথায় থামিবে, কিছুই জানা নাই এবং রমেশের সমস্ত আশ্রয়স্থান এই স্রোতের সংঘাতে ভাঙিয়া-চুরিয়া কি দশা পাইবে, তাহাও কল্পনা করা কঠিন। সাঁতার দিবার সময় পায়ে কাপড় জড়াইয়া ডুবিবার মত হইলে মজ্জমান ব্যক্তি বন্ধনমোচনের জন্য যেমন করিয়া পা ছুঁড়িতে থাকে, রমেশের সমস্ত মনটা ভিতরে-ভিতরে তেমনি হাঁসফাঁস করিতে লাগিল। ইচ্ছা করিতে লাগিল, এখনি গাড়ি ফিরাইয়া সেই গলির মধ্যে সেই বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করে এবং সকলের সাম্‌নে কমলাকে রাখিয়া আজ রাত্রেই সকল কথা পরিষ্কার করিয়া বলে। কিন্তু কথা পরিষ্কার হইবার পক্ষে অনেক বিলম্ব হইয়া গেছে। দেশে তাহাদের পরিবারের মধ্যে রমেশ কমলাকে লইয়া স্বামিস্ত্রীর মত অনেক-দিন যাপন করিয়াছে—কমলার ইতিহাস হইতে তাহা মুছিয়া ফেলিবার আর কোন উপায় নাই; এখন সত্য কথা বলিতে গেলে কমলাকে একেবারে ভাসাইয়া দিতে হয়। যদি তাহার স্বামী থাকে, তবে সে অবলম্বন হইতে কমলা ভ্রষ্ট হইয়াছে; আর সমাজে বৈধব্যের যে নিভৃত আশ্রয়, তাহা হইতেও কমলা বিচ্যুত। এমন অবস্থায় তাহাকে একাকিনী ফেলিয়া আর কেহ পলায়ন করিতে পারে, কিন্তু রমেশ পারে না।

গাড়ি যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিল। একটি সেকেণ্ড-ক্লাস গাড়ি পূর্ব্ব হইতেই রিজার্ভ করা ছিল—রমেশ ও কমলা তাহাতে উঠিল। একদিকের বেঞ্চিতে কমলার জন্য বিছানা পাতিয়া গাড়ির বাতির নীচে পর্দ্দা টানিয়া অন্ধকার করিয়া দিয়া রমেশ কমলাকে কহিল, "অনেকক্ষণ তোমার শোবার সময় হইয়া গেছে, এইখানে তুমি ঘুমাও।"

কমলা কহিল, "গাড়ি ছাড়িলে আমি ঘুমাইব, ততক্ষণ আমি এই জানালার ধারে বসিয়া একটু দেখিব?"

রমেশ রাজি হইল। কমলা মাথায় কাপড় টানিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের দিকের আসনপ্রান্তে বসিয়া লোকজনের আনাগোনা দেখিতে লাগিল। রমেশ মাঝের আসনে বসিয়া অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিল। গাড়ি যখন সবে ছাড়িয়াছে, এমন-সময় রমেশ চম্‌কিয়া উঠিল—হঠাৎ মনে হইল, তাহার একজন চেনালোক গাড়ির অভিমুখে ছুটিয়াছে।

পরক্ষণেই কমলা খিল্‌খিল্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিল। রমেশ জান্‌লা হইতে মুখ

বাড়াইয়া দেখিল—রেলোয়ে কর্ম্মচারীর বাধা কাটাইয়া একজন লোক কোনক্রমে চলন্ত গাড়িতে উঠিয়াছে এবং টানাটানিতে তাহার চাদর কর্ম্মচারীর হাতেই রহিয়া গেছে। চাদর লইবার জন্য সে ব্যক্তি যখন জান্‌লা হইতে ঝুঁকিয়া-পড়িয়া হাত বাড়াইল, তখন রমেশ স্পষ্ট চিনিতে পারিল, সে আর-কেহ নয়, অক্ষয়।

এই চাদর-কাড়াকাড়ির দৃশ্যে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত কমলার হাসি থামিতে চাহিল না।

রমেশ কহিল—"সাড়ে দশটা বাজিয়া গেছে—গাড়ি ছাড়িয়াছে, এইবার তুমি ঘুমাও।"

বালিকা বিছানায় শুইয়া যতক্ষণ না ঘুম আসিল, মাঝে মাঝে খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু এই ব্যাপারে রমেশের বিশেষ কৌতুকবোধ হইল না।

রমেশ জানিত, কোন পল্লিগ্রামের সহিত অক্ষয়ের কোন সম্বন্ধ ছিল না--সে পুরুষানুক্রমে কলিকাতাবাসী· আজ রাত্রে এমন উদ্ধশ্বাসে সে কলিকাতা ছাড়িয়া কোথায় যাইতেছে? রমেশ নিশ্চয় বুঝিল, অক্ষয় তাহারই অনুসরণে চলিয়াছে।

অক্ষয় যদি তাহাদের গ্রামে গিয়া অনুসন্ধান আরম্ভ করে এবং সেখানে রমেশের স্বপক্ষবিপক্ষমণ্ডলীর মধ্যে এই কথা লইয়া একটা ঘাঁটাঘাঁটি হইতে থাকে, তবে সমস্ত ব্যাপারটা কিরূপ জঘন্য হইয়া উঠিবে, তাহাই কল্পনা করিয়া রমেশের হৃদয় অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহাদের পাড়ায় কে কি বলিবে, কিরূপ্ ঘোঁট চলিবে, তাহা রমেশ যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিল। কলিকাতার মত সহরে সকল অবস্থাতেই অন্তরাল খুঁজিয়া পাওয়া যায়—কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর গভীরতা কম বলিয়াই অল্প আঘাতেই তাহার আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল হইয়া উঠে। সেই কথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল, রমেশের মন ততই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল।

বারাকপুরে যখন গাড়ি থামিল, রমেশ মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল, অক্ষয় নামিল না। নৈহাটিতে অনেক লোক উঠানামা করিতে লাগিল, তাহার মধ্যে অক্ষয়কে দেখা গেল না। একবার বৃথা আশায় বগুলা-ষ্টেশনেও রমেশ ব্যগ্র হইয়া মুখ বাড়াইল—অবরোহীদের মধ্যে অক্ষয়ের চিহ্ন নাই। তাহার পরের আর কোনো ষ্টেশনে অক্ষয়ের নামিবার কোন সম্ভাবনা সে কল্পনা করিতে পারিল না।

অনেক রাত্রে শ্রান্ত হইয়া রমেশ ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রাতে গোয়ালন্দে গাড়ি পৌঁছিলে রমেশ দেখিল, অক্ষয় মাথায়-মুখে চাদর জড়াইয়া একটা হাতব্যাগ্ লইয়া তাড়াতাড়ি ষ্টীমারের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে।

যে ষ্টীমারে রমেশের উঠিবার কথা, সে ষ্টীমার ছাড়িবার এখনো বিলম্ব আছে। কিন্তু অন্য ঘাটে আর একটা ষ্টীমার গমনোন্মুখ অবস্থায় ঘনঘন বাঁশী বাজাইতেছে। রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "এ ষ্টীমার কোথায় যাইবে?" উত্তর পাইল, "পশ্চিমে।"

"কতদূর পর্য্যন্ত যাইবে?"

"জল না কমিলে কাশী পর্য্যন্ত যায়।"

শুনিয়া রমেশ তৎক্ষণাৎ সেই ষ্টীমারে

উঠিয়া কমলাকে একটা কামরায় বসাইয়া আসিল—এবং তাড়াতাড়ি কিছু দুধ, চাল-ডাল এবং একছড়া কলা কিনিয়া লইল।

এদিকে অক্ষয় অন্য ষ্টীমারে সকল আরোহীর আগে উঠিয়া মুড়িসুড়ি দিয়া এমন একটা জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল, যেখান হইতে অন্যান্য যাত্রীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করা যায়। যাত্রিগণের বিশেষ তাড়া ছিল না। জাহাজ ছাড়িবার দেরি আছে—তাহারা এই অবকাশে মুখ-হাত ধুইয়া, স্নান করিয়া, কেহ কেহ বা তীরে রাঁধাবাড়া করিয়া খাইয়া লইতে লাগিল। অক্ষয়ের কাছে গোয়ালন্দ পরিচিত নহে। সে মনে করিল, নিকটে কোথাও হোটেল বা কিছু আছে, সেইখানে রমেশ কমলাকে খাওয়াইয়া লইতেছে।

অবশেষে ষ্টীমারে বাঁশী দিতে লাগিল। তখনো রমেশের দেখা নাই। কম্পমান তক্তার উপর দিয়া যাত্রীর দল জাহাজে উঠিতে আরম্ভ করিল। ঘনঘন বাঁশীর ফুৎকারে লোকের তাড়া ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু আগত ও আগন্তুকদের মধ্যে রমেশের কোন চিহ্ন নাই। যখন আরোহীর সংখ্যা শেষ হইয়া আসিল—তক্তা টানিয়া লইল এবং সারেং নোঙর তুলিবার হুকুম করিল, তখন অক্ষয় ব্যগ্র হইয়া কহিল, "আমি নামিয়া যাইব"—কিন্তু খালাসিরা তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না। ডাঙা দূরে ছিল না, অক্ষয় ষ্টীমার হইতে লাফ দিয়া পড়িল।

তীরে উঠিয়া রমেশদের কোন খবর পাওয়া গেল না। অল্পক্ষণ হইল, গোয়ালন্দ হইতে সকালবেলাকার প্যাসেঞ্জার-ট্রেন্ কলিকাতা-অভিমুখে চলিয়া গেছে। অক্ষয় মনে মনে ভাবিল, কাল রাত্রে গাড়িতে উঠিবার সময়কার টানাটানিতে নিশ্চয় সে রমেশের দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং রমেশ তাহার কোন বিরুদ্ধ অভিসন্ধি অনুমান করিয়া দেশে না গিয়া আবার সকালের গাড়িতেই কলিকাতায় ফিরিয়া গেছে। কলিকাতায় যদি কোন লোক লুকাইবার চেষ্টা করে, তবে ত তাহাকে বাহির করাই কঠিন হইবে!

২৪

অক্ষয় সমস্তদিন গোয়ালন্দে ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইয়া সন্ধ্যার ডাকগাড়িতে উঠিয়া পড়িল। পরদিন ভোরে কলিকাতায় পৌঁছিয়া প্রথমেই সে রমেশের দর্জ্জিপাড়ার বাসায় আসিয়া দেখিল, তাহার দ্বার বন্ধ—খবর লইয়া জানিল, সেখানে কেহই আসে নাই।

কলুটোলায় আসিয়া দেখিল, রমেশের বাসা শূন্য। অন্নদাবাবুর বাসায় আসিয়া যোগেন্দ্রকে কহিল "পালাইয়াছে—ধরিতে পারিলাম না।"

যোগেন্দ্র কহিল—"সে কি কথা ?"

অক্ষয় তাহার ভ্রমণবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া বলিল।

অক্ষয়কে দেখিতে পাইয়া রমেশ কমলাকে সুদ্ধ লইয়া পালাইয়াছে, এই খবরে রমেশের বিরুদ্ধে যোগেন্দ্রের সমস্ত সন্দেহ নিশ্চিত বিশ্বাসে পরিণত হইল।

যোগেন্দ্র কহিল—"কিন্তু অক্ষয়, এ সমস্ত যুক্তি কোন কাজেই লাগিবে না। শুধু হেমনলিনী কেন, বাবা-সুদ্ধ ঐ এক বুলি ধরিয়াছেন—তিনি বলেন, রমেশের নিজের মুখে শেষ কথা না শুনিয়া তিনি রমেশকে অবিশ্বাস

করিতে পারিবেন না। এমন কি, রমেশ আজো আসিয়া যদি বলে, 'আমি এখন্ কিছুই বলিব না', তবু নিশ্চয় বাবা তাহার সঙ্গে হেমের বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাদের লইয়া আমি এম্‌নি মুস্কিলে পড়িয়াছি। বাবা হেমনলিনীর কিছুমাত্র কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না—হেম যদি আজ আব্দার করিয়া বসে, 'রমেশের অন্ত স্ত্রী থাক্, আমি তাহাকেই বিবাহ করিব, তবে বাবা বোধ হয় তাহাতেই রাজি হন। যেমন করিয়া হোক্ এবং যত শীঘ্রই হোক্, রমেশকে দিয়া কবুল করাইতেই হইবে। তোমাকে হতাশ হইলে চলিবে না। আমিই এ কাজে লাগিতে পারিতাম, কিন্তু কোনপ্রকার ফন্দী আমার মাথায় আসে না—আমি হয় ত রমেশের সঙ্গে একটা মারামারি বাধাইয়া দিব। এখনো বুঝি তোমার মুখ ধোওয়া, চা খাওয়া হয় নাই।"

অক্ষয় মুখ ধুইয়া চা খাইতে খাইতে ভাবিতে লাগিল। এমন সময়ে অন্নদাবাবু হেমনলিনীর হাত ধরিয়া চা খাইবার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয়কে দেখিবামাত্র হেমনলিনী ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

যোগেন্দ্র রাগ করিয়া কহিল—"হেমের এ ভারি অন্যায়! বাবা, তুমি উহার এই সকল অভদ্রতায় প্রশ্রয় দিয়ো না। উহাকে জোর করিয়া এখানে আনা উচিত। হেম! হেম!"

হেমনলিনী তখন উপরে চলিয়া গেছে। অক্ষয় কহিল, "যোগেন্, তুমি আমার কেস্ আরো খারাপ করিয়া দিবে দেখিতেছি! উঁহার কাছে আমার সম্বন্ধে কোন কথাটি কহিয়ো না। সময়ে ইহার প্রতিকার হইবে—জবরদস্তি করিতে গেলে সব মাটি হইয়া যাইবে।"

এই বলিয়া অক্ষয় চা খাইয়া চলিয়া গেল। অক্ষয়ের ধৈর্য্যের অভাব ছিল না। যখন সমস্ত লক্ষণ তাহার প্রতিকূলে, তখনো সে লাগিয়া থাকিতে জানে। তাহার ভাবেরও কোন বিকার হয় না। অভিমান করিয়া সে মুখ গম্ভীর করে না বা দূরে চলিয়া যায় না। অনাদর-অবমাননায় সে অবিচলিত থাকে। লোকটা টাঁাক্‌সই। তাহার প্রতি যাহার ব্যবহার যেমনি হোক্, সে টি'কিয়া থাকে।

অক্ষয় চলিয়া গেলে আবার অন্নদাবাবু হেমনলিনীকে ধরিয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত করিলেন। আজ তাহার কপোল পাণ্ডুবর্ণ—তাহার চোখের নীচে কালি পড়িয়া গেছে। ঘরে ঢুকিয়া সে চোখ নীচু করিল, যোগেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিতে পারিল না। সে জানিত, যোগেন্দ্র তাহার ও রমেশের উপর রাগ করিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে কঠিন বিচার করিতেছে। এইজন্য যোগেন্দ্রের সঙ্গে মুখোমুখি-চোখোচোখি হওয়া তাহার পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে।

ভালবাসায় যদিও হেমনলিনীর বিশ্বাসকে আগ্‌লাইয়া রাখিয়াছিল, তবু যুক্তিকে একেবারেই ঠেকাইয়া রাখা চলে না। যোগেন্দ্রের সম্মুখে হেমনলিনী কাল আপনার বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে শয়নঘরের মধ্যে একলা সেই বল সম্পূর্ণ থাকে না। বস্তুতই প্রথম হইতে রমেশের ব্যবহারের কোন অর্থ পাওয়া যায় না।

সন্দেহের কারণগুলিকে হেমনলিনী যত প্রাণপণ বলে তাহার বিশ্বাসের দুর্গের মধ্যে ঢুকিতে দেয় না—তাহারা বাহিরে দাঁড়াইয়া ততই সবলে আঘাত করিতে থাকে। সাংঘাতিক আঘাত হইতে মা যেমন ছেলেকে বুকের মধ্যে দুই হাতে চাপিয়া-ধরিয়া রক্ষা করে, রমেশের প্রতি বিশ্বাসকে হেমনলিনী সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে তেম্‌নি জোর করিয়া হৃদয়ে আঁক্‌ড়িয়া রাখিল। কিন্তু হায়, জোর কি সকল-সময় সমান থাকে!

হেমনলিনীর পাশের ঘরেই রাত্রে অন্নদা-বাবু শুইয়াছিলেন। হেম যে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করিতেছিল, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছিলেন। একএকবার তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে বলিতেছিলেন, "মা, তোমার ঘুম হইতেছে না?" হেমনলিনী উত্তর দিতেছিল, "বাবা, তুমি কেন জাগিয়া আছ? আমার ঘুম আসিতেছে আমি এখনি ঘুমাইয়া পড়িব।"

পরের দিন ভোরে উঠিয়া হেমনলিনী ছাদের উপর বেড়াইতেছিল। রমেশের বাসার একটি দরজা, একটি জান্‌লাও খোলা নাই। হেমনলিনীর মনে হইতে লাগিল, তাহার জীবন হইতেও রমেশ যেন এম্‌নি-ভাবেই রুদ্ধ হইয়া গেছে। পরস্পরের সম্বন্ধের কোন পথই যেন কোথাও খোলা নাই। তবে এখন হইতে কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া তাহার অন্তরের মধ্যে আকাশের আলোক আসিবে, দক্ষিণের বাতাস প্রবেশ করিবে? রমেশ—রমেশ!—কোথায় রমেশ! যে এতই কাছে ছিল, সে কোথায় গেল! যে অনায়াসে এই প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোকে ঐ ছাদের উপরে আসিয়া দাঁড়াইতে পারে—যাহার আগমনে আনন্দিত হৃদয়ের মত ঐ বাড়ীর সমস্ত জান্‌লা-কবাট উন্মুক্ত হইয়া গৃহের মধ্যে শুভ-প্রভাতকে অভ্যর্থনা করিয়া লইতে পারে—সে সমস্ত বাধা দুইহাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া কেন এখনি আসিতেছে না! তাহার জন্য সমস্ত প্রস্তুত—তাহার জন্য সবাই অপেক্ষা করিতেছে—তাহারই জন্য হেমনলিনী ভিক্ষুকের ঊর্দ্ধপ্রসারিত ব্যাকুলবাহুর মত আপনার সমস্ত হৃদয়কে আজ এই অরুণরাগরক্ত অনন্ত আকাশের মাঝখানে উত্তোলিত করিয়া ধরিয়াছে।—এস, এস, এস! সমস্ত কুয়াসা কাটাইয়া, সমস্ত মেঘ ঠেলিয়া, সমস্ত অন্ধকার পার হইয়া শিশিরাশ্রুধৌত প্রভাতের আলোকটির মত এস—এখনি একমুহূর্ত্তে হেমনলিনীর সমস্ত উৎসুক জীবনকে, উন্মুখ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেল!

সূর্য্য ক্রমে পূর্ব্বদিকের সৌধশিখরমালার উপরে উঠিয়া পড়িল। হেমনলিনীর কাছে আজিকার এই নূতন-অভ্যুদিত দিনটি এম্‌নি শুষ্ক-শূন্য, এম্‌নি আশাহীন-আনন্দহীন ঠেকিল যে, সে সেই ছাদের এক কোণে বসিয়া-পড়িয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিয়া উঠিল। আজ সমস্তদিন কেহই আসিবে না, চায়ের সময় কাহাকেও আশা করিবার নাই, পাশের বাড়ীতে কেহ একজন আছে, এই কল্পনা করিবার সুখটুকু পর্য্যন্ত ঘুচিয়া গেছে!

"হেম! হেম!"

হেমনলিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া চোখ মুছিয়া-ফেলিয়া সাড়া দিল—"কি বাবা!"

অন্নদাবাবু ছাদে উঠিয়া-আসিয়া হেমনলি-

নীর পিঠে হাত বুলাইয়া কহিলেন—"আমার আজ উঠিতে দেরি হইয়া গেছে।"

অন্নদাবাবু উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুমাইতে পারেন নাই—ভোরের দিকে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। আলো চোখে লাগিতেই উঠিয়া-পড়িয়া তাড়াতাড়ি মুখ ধুইয়া হেমনলিনীর খবর লইতে গেলেন। দেখিলেন, ঘরে কেহ নাই। সকালে তাহাকে একলা বেড়াইতে দেখিয়া তাঁহার বুকের মধ্যে আঘাত লাগিল। কহিলেন—"চল মা, চা খাইবে চল!"

চায়ের টেবিলে যোগেন্দ্রের সম্মুখে বসিয়া চা খাইবার ইচ্ছা হেমনলিনীর ছিল না। কিন্তু সে জানিত, কোনরূপ নিয়মের অন্যথা তাহার বাপকে পীড়া দেয়। তা ছাড়া, প্রত্যহ সে নিজের হাতে তাহার বাপের পেয়ালায় চা ঢালিয়া দেয়, এই সেবাটুকু হইতে সে নিজেকে বঞ্চিত করিতে চাহিল না।

নাচে গিয়া ঘরে পৌঁছিবার পূর্ব্বে যখন সে বাহির হইতে শুনিল, যোগেন্দ্র কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে—তখন তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল হঠাৎ মনে হইল, বুঝি রমেশ আসিয়াছে। এত সকালে আর কে আসিবে?

কম্পিতপদে ঘরে ঢুকিয়া যেই দেখিল অক্ষয়, অমনি সে আর কিছুতেই আত্মসংবরণ করিতে পারিল না—তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিল।

দ্বিতীয়বার অন্নদাবাবু যখন তাহাকে ঘরের মধ্যে লইয়া আসিলেন, তখন সে তাহার পিতার চৌকির পাশে ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া নতমুখে তাঁহার চা প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিল।

যোগেন্দ্র হেমনলিনীর ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিল। হেম যে রমেশের জন্য এমন করিয়া শোক অনুভব করিবে, ইহা তাহার অসহ্য বোধ হইতেছিল। তাহার পরে যখন দেখিল, অন্নদাবাবু তাহার এই শোকের সঙ্গী হইয়াছেন এবং সেও যেন সংসারের আর সকলের নিকট হইতে অন্নদাবাবুর স্নেহচ্ছায়ায় আপনাকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে, তখন তাহার অধৈর্য্য আরো বাড়িয়া উঠিল। 'আমরা যেন সবাই অন্যায়কারী আমরা যে স্নেহের খাতিরেই কর্ত্তব্যপালনে চেষ্টা করিতেছি, আমরাই যে যথার্থভাবে উহার মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত—তাহার জন্য লেশমাত্র কৃতজ্ঞতা দূরে থাক্, মনে মনে আমাদের দোষী করিতেছে। বাবার ত কোন বিষয়ে কাণ্ডজ্ঞান নাই! এখন সান্ত্বনা দিবার সময় নহে—এখন আঘাত দিবারই সময়। তাহা না করিয়া তিনি ক্রমাগতই অপ্রিয়-সত্যকে উহার নিকট হইতে দূরে খেদাইয়া রাখিতেছেন!"

যোগেন্দ্র অন্নদাবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "জান বাবা, কি হইয়াছে!"

অন্নদাবাবু ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিলেন, "না—কি হইয়াছে?"

যোগেন্দ্র। রমেশ কাল তাহার স্ত্রীকে লইয়া গোয়ালন্দ-মেলে দেশে যাইতেছিল—অক্ষয়কে সেই গাড়িতে উঠিতে দেখিয়া দেশে না গিয়া আবার সে কলিকাতায় পালাইয়া আসিয়াছে।

হেমনলিনীর হাত কাঁপিয়া উঠিল—চা ঢালিতে চা পড়িয়া গেল। সে চৌকিতে বসিয়া পড়িল।

যোগেন্দ্র তাহার মুখের দিকে একবার কটাক্ষপাত করিয়া বলিতে লাগিল—"পালাইবার কি দরকার ছিল, আমি ত কিছুই বুঝিতে পারি না। অক্ষয়ের কাছে ত পূর্ব্বেই সমস্ত প্রকাশ হইয়া গিয়াছিল। 'একে ত তাহার পূর্ব্বের ব্যবহার যথেষ্ট হেয়—তাহার পরে এই ভীরুতা, এই চোরের মত ক্রমাগত পালাইয়া-বেড়ানো আমার কাছে অত্যন্ত জঘন্য মনে হয়। জানি না, হেম কি মনে করে—কিন্তু এইরূপ পলায়নেই তাহার অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ হইতেছে!"

হেমনলিনী কাঁপিতে কাঁপিতে চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—কহিল, "দাদা, আমি প্রমাণের কোন অপেক্ষা রাখি না। তিনি ভাল কি মন্দ, তাহা ঈশ্বর জানেন—এখন তাহা আমার সন্ধান করিবার সময় নয়। তোমরা তাঁহার বিচার করিতে চাও কর—আমি তাঁহার বিচারক নই—তিনি যদি দোষ করিয়া থাকেন, তবে দুঃখভোগ করিতে পারি, কিন্তু দণ্ড দিতে পারি না—তবে আমার কাছে কেন বারবার তোমাদের গুপ্তচরের প্রমাণ আনিয়া উপস্থিত করিতেছ?"

যোগেন্দ্র। তোমার সঙ্গে যাহার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, সে কি আমাদের নিঃসম্পর্ক?

হেমনলিনী। বিবাহের কথা কে বলিতেছে? তোমরা ভাঙিয়া দিতে চাও, ভাঙিয়া দাও—সে তোমাদের ইচ্ছা। কিন্তু আমার মন ভাঙাইবার জন্য মিথ্যা চেষ্টা করিতেছ। তোমাদের কোন ক্ষতি না করিয়া আমি যদি মনে মনে কোথাও সুখ পাই,—নির্ভর পাই—তোমাদের তাহাতে কি?

বলিতে বলিতে হেমনলিনী স্বরবদ্ধ হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। অন্নদাবাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহার অশ্রুসিক্ত মুখ বুকে চাপিয়া-ধরিয়া কহিলেন—"চল হেম, আমরা উপরে যাই!"

২৫

ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় কেহই ছিল না। রমেশ একটি কামরা বাছিয়া লইয়া বিছানা পাতিয়া দিল। সকালবেলায় দুধ খাইয়া সেই কামরার দরজা খুলিয়া কমলা নদী ও নদীতীর দেখিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, "জান কমলা, আমরা কোথায় যাইতেছি?"

কমলা কহিল, "দেশে যাইতেছি।"

রমেশ। দেশ ত তোমার ভাল লাগে না—আমরা দেশে যাইব না।

কমলা। আমার জন্যে তুমি দেশে যাওয়া বন্ধ করিয়াছ?

রমেশ। হাঁ, তোমারই জন্যে।

কমলা মুখ ভার করিয়া কহিল—"কেন তা করিলে? আমি একদিন কথায়-কথায় কি বলিয়াছিলাম, সেটা বুঝি এমন করিয়া মনে লইতে আছে? তুমি কিন্তু ভারি অল্পেতেই রাগ কর!"

রমেশ হাসিয়া কহিল—"আমি কিছুমাত্র রাগ করি নাই। দেশে যাইবার ইচ্ছা আমারও নাই।"

কমলা তখন উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তবে আমরা কোথায় যাইতেছি?"

রমেশ। পশ্চিমে।

"পশ্চিমে" শুনিয়া কমলার চক্ষু বিস্ফা-

রিত হইয়া উঠিল। পশ্চিম! যে লোক চির-দিন ঘরের মধ্যে কাটাইয়াছে, এক "পশ্চিম" বলিতে তাহার কাছে কতখানি বোঝায়! পশ্চিমে তীর্থ, পশ্চিমে স্বাস্থ্য, পশ্চিমে নব নব দেশ, নব নব দৃশ্য, কত রাজা ও সম্রাটের পুরাতন কীর্ত্তি, কত কারুখচিত দেবালয়, কত প্রাচীন কাহিনী, কত বীরত্বের ইতিহাস!

কমলা পুলকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"পশ্চিমে আমরা কোথায় যাইতেছি?"

রমেশ কহিল, "কিছুই ঠিক নাই। মুঙ্গের, পাটনা, দানাপুর, বক্সার, গাজিপুর, কাশি, যেখানে হউক, এক জায়গায় গিয়া উঠা যাইবে।"

এই সকল কতক-জানা এবং না-জানা সহরের নাম শুনিয়া কমলার কল্পনাবৃত্তি আরো উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে হাত-তালি দিয়া কহিল, "ভারি মজা হইবে!"

রমেশ কহিল—"মজা ত পরে হইবে, কিন্তু এ কয়দিন খাওয়াদাওয়ার কি করা যাইবে? তুমি খালাসিদের হাতের রান্না খাইতে পারিবে?"

কমলা ঘৃণায় মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—"মাগো! সে আমি পারিব না!"

রমেশ। তাহা হইলে কি উপায় করিবে?

কমলা। কেন, আমি নিজে রাঁধিয়া লইব।

রমেশ। তুমি রাঁধিতে পার?

কমলা হাসিয়া-উঠিয়া কহিল—"তুমি আমাকে কি যে ভাব, জানি না! রাঁধিতে পারি না ত কি! আমি কি কচিখুকি! মামার বাড়ীতে আমি ত বরাবর রাঁধিয়া আসিয়াছি।"

রমেশ তৎক্ষণাৎ অনুতাপ প্রকাশ করিয়া কহিল, "তাই ত, তোমাকে এই প্রশ্নটা করা ঠিক সঙ্গত হয় নাই। তাহা হইলে এখন হইতে রাঁধিবার জোগাড় করা যাক্—কি বল?"

এই বলিয়া রমেশ চলিয়া গেল এবং সন্ধান করিয়া এক লোহার উনুন সংগ্রহ করিল। শুধু তাই নয়, কাশি পৌঁছাইয়া দিবার খরচ ও বেতনের প্রলোভনে উমেশ বলিয়া এক কায়স্থবালককে জলতোলা, বাসনমাজা প্রভৃতি কাজের জন্য নিযুক্ত করিল।

রমেশ কহিল—"কমলা, আজ কি রান্না হইবে?"

কমলা কহিল—"তোমার ত ভারি জোগাড় আছে! এক ডাল আর চাল—আজ খিচুড়ি হইবে।"

রমেশ খালাসিদের নিকট হইতে কমলার নির্দ্দেশমত মসলা সংগ্রহ করিয়া আনিল।

রমেশের অনভিজ্ঞতায় কমলা হাসিয়া উঠিল, কহিল—"শুধু মসলা লইয়া কি করিব? শিল-নোড়া নহিলে বাটিব কি করিয়া? তুমি ত বেশ!"

বালিকার এই অবজ্ঞা বহন করিয়া রমেশ শিল-নোড়ার সন্ধানে ছুটিল। শিল-নোড়া না পাইয়া খালাসিদের কাছ হইতে এক লোহার হামানদিস্তা ধার করিয়া আনিল।

হামানদিস্তায় মসলা-কোটা কমলার অভ্যাস ছিল না। অগত্যা তাহাই লইয়া বসিতে হইল। রমেশ কহিল, "মসলা না হয় আর কাহাকেও দিয়া পিষাইয়া আনিতেছি।"

কমলার তাহা মনঃপূত হইল না। সে

নিজেই উৎসাহসহকারে কাজ আরম্ভ করিল। এই অনভ্যস্ত প্রণালীর অসুবিধাতে তাহার কৌতুকবোধ হইল। মসলা লাফাইয়া-উঠিয়া চারিদিকে ছিটাইয়া পড়ে, আর সে হাসি রাখিতে পারে না। তাহার এই হাসি দেখিয়া রমেশেরও হাসি পায়।

এইরূপে মসলাকোটার অধ্যায় শেষ করিয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া একটা দরমা-ঘেরা জায়গায় কমলা রান্না চড়াইয়া দিল। কলিকাতা হইতে একটা হাঁড়িতে করিয়া সন্দেশ আনা হইয়াছিল, সেই হাঁড়িতেই কাজ চালাইয়া লইতে হইল।

রান্না চড়াইয়া-দিয়া কমলা রমেশকে কহিল, "তুমি যাও, শীঘ্র স্নান করিয়া লও—আমার রান্না হইতে বেশি দেরি হইবে না।"

রান্নাও হইল, রমেশও স্নান করিয়া আসিল। এখন প্রশ্ন উঠিল, থাল ত নাই, কিসে খাওয়া যায়?

রমেশ অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কহিল, "খালাসিদের কাছ হইতে সানকি ধার করিয়া আনা যাইতে পারে।"

কমলা কহিল—"ছি!"

রমেশ মৃদুস্বরে জানাইল, এরূপ অনাচার পূর্ব্বেও তাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

কমলা কহিল—"পূর্ব্বে যা হইয়াছে, তা হইয়াছে, এখন হইতে হইবে না—আমি ও দেখিতে পারিব না।"

এই বলিয়া সে সেই সন্দেশের মুখে যে সরা ছিল, তাহাই ভাল করিয়া ধুইয়া-আনিয়া উপস্থিত করিল। কহিল—"আজকের মত তুমি ইহাতেই খাও, পরে দেখা যাইবে।"

জল দিয়া ধুইয়া আহারস্থান প্রস্তুত হইলে রমেশ শুদ্ধভাবে খাইতে বসিয়া গেল। দুই-এক গ্রাস মুখে তুলিয়া কহিল—"বাঃ, চমৎকার হইয়াছে!"

কমলা লজ্জিত হইয়া কহিল—"যাও, ঠাট্টা করিতে হইবে না!"

রমেশ কহিল—"ঠাট্টা নয়, তাহা এখনি দেখিতে পাইবে!" বলিয়া পাতের অন্ন দেখিতে দেখিতে নিঃশেষ করিয়া আবার চাহিল। কমলা এবারে অনেক বেশি করিয়া দিল। রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল—"ও কি করিতেছ? তোমার নিজের জন্য কিছু আছে ত?"

"ঢের আছে—সেজন্যে তোমার ভাবিতে হইবে না।"

রমেশের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহারে কমলা ভারি খুসি হইল। রমেশ কহিল—"তুমি কিসে খাইবে?"

কমলা কহিল—"কেন, ঐ সরাতেই হইবে!"

রমেশ অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, "না, সে হইতেই পারে না!"

কমলা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"কেন, হইবে না কেন?"

রমেশ কহিল—"না না, সে কি হয়!"

কমলা কহিল—"খুব হইবে—আমি সব ঠিক করিয়া লইতেছি। উমেশ, তুই কিসে খাইবি?"

উমেশ কহিল, "মাঠাকরুণ, নীচে ময়রা খাবার বেচিতেছে, তাহার কাছ হইতে শালপাতা চাহিয়া আনিতেছি।"

রমেশ কহিল, "তুমি যদি ঐ সরাতেই খাইবে ত আমাকে দাও, আমি ভাল করিয়া ধুইয়া আনিতেছি।"

কমলা কেবল সংক্ষেপে কহিল, "পাগল হইয়াছ!"—ক্ষণকাল পরে সে বলিয়া উঠিল, "কিন্তু পান তৈরি করিতে পারি নাই, তুমি আমাকে পান আনাইয়া দাও নাই!"

রমেশ কহিল, "নীচে পানওয়ালা পান বেচিতেছে।"

এম্‌নি করিয়া অতি সহজেই ঘরকন্না সুরু হইল। রমেশ মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। সে ভাবিতে লাগিল, 'দাম্পত্যের ভাবকে কেমন করিয়া ঠেকাইয়া রাখা যায়? গৃহিণীর পদ অধিকার করিয়া লইবার জন্য কমলা বাহিরের কোন সহায়তা বা শিক্ষার প্রত্যাশা রাখে না। সে যতদিন তাহার মামার বাড়ীতে ছিল, রাঁধিয়াছে-বাড়িয়াছে, ছেলে মানুষ করিয়াছে, ঘরের কাজ চালাইয়াছে।' তাহার নৈপুণ্য, তৎপরতা ও কর্ম্মের আনন্দ দেখিয়া রমেশের ভারি সুন্দর লাগিল—কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও সে ভাবিতে লাগিল, 'ভবিষ্যতে ইহাকে লইয়া কি ভাবে চলা যাইবে? ইহাকে কেমন করিয়া কাছে রাখিব, অথচ দূরে রাখিয়া দিব? তাহাদের দুইজনের মাঝখানে গণ্ডীর রেখাটা কোন্‌খানে টানা উচিত? তাহাদের উভয়ের মধ্যে যদি হেমনলিনী থাকিত, তাহা হইলে সমস্তই সুন্দর হইয়া উঠিত! কিন্তু সে আশা যদি ত্যাগ করিতেই হয়, তবে একলা কমলাকে লইয়া সমস্ত সমস্যার মীমাংসা যে কি করিয়া হইতে পারে, তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।' রমেশ স্থির করিল, আসল কথাটা কমলাকে খুলিয়া বলাই উচিত, ইহার পরে আর চাপিয়া-রাখা চলে না।

ক্রমশ।

মন্দিরের কথা।

উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের মন্দির যখন প্রথম দেখিলাম, তখন মনে হইল, একটা যেন কি নূতন গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বেশ বুঝিলাম, এই পাথরগুলির মধ্যে কথা আছে; সে কথা বহুশতাব্দী হইতে স্তম্ভিত বলিয়া, মূক বলিয়া, হৃদয়ে আরো যেন বেশি করিয়া আঘাত করে।

ঋক্‌-রচয়িতা ঋষি ছন্দে মন্ত্ররচনা করিয়া গিয়াছেন, এই মন্দিরও পাথরের মন্ত্র; হৃদয়ের কথা দৃষ্টিগোচর হইয়া আকাশ জুড়িয়া দাঁড়াইয়াছে।

মানুষের হৃদয় এখানে কি কথা গাঁথিয়াছে? ভক্তি কি রহস্য প্রকাশ করিয়াছে? মানুষ অনন্তের মধ্য হইতে আপন অন্তঃকরণে এমন কি বাণী পাইয়াছিল, যাহার প্রকাশের প্রকাণ্ড চেষ্টায় এই শৈলপদমূলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে?

এই যে শতাধিক দেবালয়—যাহার

অনেকগুলিতেই আজ আর সন্ধ্যারতির দীপ জ্বলে না, শঙ্খঘণ্টা নীরব, যাহার খোদিত প্রস্তরখণ্ডগুলি ধূলিলুণ্ঠিত—ইহারা কোনো একজন ব্যক্তিবিশেষের কল্পনাকে আকার দিবার চেষ্টা করে নাই। ইহারা তখনকার সেই অজ্ঞাত যুগের ভাষাভারে আক্রান্ত। যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্ম্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নবজীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তরপুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্রবৎসর পরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে। ইহা কোনো একটি প্রাচীন নবযুগের মহাকাব্যের কয়েকখণ্ড ছিন্নপত্র।

এই দেবালয়শ্রেণী তাহার নিগূঢ়-নিহিত নিস্তব্ধ চিত্তশক্তির দ্বারা দর্শকের অন্তঃকরণকে সহসা যে ভাবান্দোলনে উদ্বোধিত করিয়া তুলিল, তাহার আকস্মিকতা, তাহার সমগ্রতা, তাহার বিপুলতা, তাহার অপূর্ব্বত্ব প্রবন্ধে প্রকাশ করা কঠিন—বিশ্লেষণ করিয়া, খণ্ড-খণ্ড করিয়া বলিবার চেষ্টা করিতে হইবে। মানুষের ভাষা এইখানে পাথরের কাছে হার মানে—পাথরকে পরে-পরে বাক্য গাঁথিতে হয় না, সে স্পষ্ট কিছু বলে না, কিন্তু যাহা-কিছু বলে, সমস্ত একসঙ্গে বলে—এক পলকেই সে সমস্ত মনকে অধিকার করে—সুতরাং মন যে কি বুঝিল, কি শুনিল, কি পাইল, তাহা ভাবে বুঝিলেও ভাষায় বুঝিতে সময় পায় না, অবশেষে স্থির হইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাকে নিজের কথায় বুঝিয়া লইতে হয়।

দেখিলাম, মন্দিরভিত্তির সর্ব্বাঙ্গে ছবি খোদা। কোথাও অবকাশমাত্র নাই। যেখানে চোখ পড়ে এবং যেখানে চোখ পড়ে না, সর্ব্বত্রই শিল্পীর নিরলস চেষ্টা কাজ করিয়াছে।

ছবিগুলি বিশেষভাবে পৌরাণিক ছবি নয়; দশ অবতারের লীলা বা স্বর্গলোকের দেবকাহিনীই যে দেবালয়ের গায়ে লিখিত হইয়াছে, তাও বলিতে পারি না। মানুষের ছোটবড় ভালমন্দ প্রতিদিনের ঘটনা—তাহার খেলা ও কাজ, যুদ্ধ ও শান্তি, ঘর ও বাহির, বিচিত্র আলেখ্যের দ্বারা মন্দিরকে নিবিড়-ভাবে বেষ্টন করিয়া আছে। এই ছবিগুলির মধ্যে আর কোন উদ্দেশ্য দেখি না, কেবল এই সংসার যেমন ভাবে চলিতেছে, তাহাই আঁকিবার চেষ্টা। সুতরাং চিত্রশ্রেণীর ভিতরে এমন অনেক জিনিষ চোখে পড়ে, যাহা দেবালয়ে অঙ্কনযোগ্য বলিয়া হঠাৎ মনে হয় না। ইহার মধ্যে বাছাবাছি কিছুই নাই—তুচ্ছ এবং মহৎ, গোপনীয় এবং ঘোষণীয়, সমস্তই আছে।

কোনো গির্জ্জার মধ্যে গিয়া যদি দেখিতাম, সেখানে দেয়ালে ইংরাজসমাজের প্রতিদিনের ছবি ঝুলিতেছে:—কেহ খানা খাইতেছে, কেহ ডগ্‌কার্ট হাঁকাইতেছে, কেহ হুইষ্ট খেলিতেছে, কেহ পিয়ানো বাজাইতেছে, কেহ সঙ্গিনীকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া পল্কা নাচিতেছে, তবে হতবুদ্ধি হইয়া ভাবিতাম, বুঝি-বা স্বপ্ন দেখিতেছি—কারণ, গির্জ্জা সংসারকে সর্ব্বতোভাবে মুছিয়া-ফেলিয়া আপন স্বর্গীয়তা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। মানুষ সেখানে লোকালয়ের বাহিরে আসে

—তাহা যেন যথাসম্ভব মর্ত্ত্যসংস্পর্শবিহীন দেবলোকের আদর্শ।

তাই, ভুবনেশ্বর-মন্দিরের চিত্রাবলীতে প্রথমে মনে বিস্ময়ের আঘাত লাগে। স্বভাবত হয়ত লাগিত না, কিন্তু আশৈশব ইংরাজিশিক্ষায় আমরা স্বর্গমর্ত্ত্যকে মনে মনে ভাগ করিয়া রাখিয়াছি। সর্ব্বদাই সন্তর্পণে ছিলাম, পাছে দেব-আদর্শে মানবভাবের কোন আঁচ লাগে; পাছে দেবমানবের মধ্যে যে পরমপবিত্র সুদূর ব্যবধান, ক্ষুদ্র মানব তাহা লেশমাত্র লঙ্ঘন করে।

এখানে মানুষ দেবতার একেবারে যেন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে—তাও যে ধূলা ঝাড়িয়া আসিয়াছে, তাও নয়। গতিশীল, কর্ম্মরত, ধূলিলিপ্ত সংসারের প্রতিকৃতি নিঃসঙ্কোচে সমুচ্চ হইয়া উঠিয়া দেবতার প্রতিমূর্ত্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

মন্দিরের ভিতরে গেলাম—সেখানে একটিও চিত্র নাই, আলোক নাই, অনলঙ্কৃত নিভৃত অস্ফুটতার মধ্যে দেবমূর্ত্তি নিস্তব্ধ বিরাজ করিতেছে।

ইহার একটি বৃহৎ অর্থ মনে উদয় না হইয়া থাকিতে পারে না। মানুষ এই প্রস্তরের ভাষায় যাহা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে, তাহা সেই বহু দূরকাল হইতে আমার মনের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

সে কথা এই—দেবতা দূরে নাই, গির্জ্জায় নাই, তিনি আমাদের মধ্যেই আছেন। তিনি জন্মমৃত্যু, সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, মিলনবিচ্ছেদের মাঝখানে স্তব্ধভাবে বিরাজমান। এই সংসারই তাঁহার চিরন্তন মন্দির। এই সজীবসচেতন বিপুল দেবালয় অহরহ বিচিত্র হইয়া রচিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা কোনকালে নূতন নহে, কোনকালে পুরাতন হয় না। ইহার কিছুই স্থির নহে, সমস্তই নিয়ত পরিবর্ত্তমান—অথচ ইহার মহৎ ঐক্য, ইহার সত্যতা, ইহার নিত্যতা নষ্ট হয় না, কারণ এই চঞ্চল বিচিত্রের মধ্যে এক নিত্যসত্য প্রকাশ পাইতেছেন।

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড় করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা মানুষের অন্তরের জ্ঞান, শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান্ করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীনপদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।

এমন-সময় হিন্দুর চিত্ত জাগ্রত হইয়া কহিল—সে কথা যথার্থ—মানুষ দীন নহে, হীন নহে; কারণ, মানুষের যে শক্তি—যে শক্তি মানুষের মুখে ভাষা দিয়াছে, মনে ধী দিয়াছে, বাহুতে নৈপুণ্য দিয়াছে, যাহা সমাজকে গঠিত করিতেছে, সংসারকে চালনা করিতেছে, তাহাই দৈবী শক্তি।

বুদ্ধদেব যে অভ্রভেদী মন্দির রচনা করিলেন, নবপ্রবুদ্ধ হিন্দু তাহারই মধ্যে তাঁহার দেবতাকে লাভ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত হইয়া গেল। মানবের

মধ্যে দেবতার প্রকাশ, সংসারের মধ্যে দেবতার প্রতিষ্ঠা, আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তের সুখদুঃখের মধ্যে দেবতার সঞ্চার, ইহাই নবহিন্দুধর্ম্মের মর্ম্মকথা হইয়া উঠিল। শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের প্রেম ঘরের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল—মানুষের ক্ষুদ্র কাজে-কর্ম্মে শক্তির প্রত্যক্ষ হাত, মানুষের স্নেহ-প্রীতির সম্বন্ধের মধ্যে দিব্যপ্রেমের প্রত্যক্ষ লীলা অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখা দিল। এই দেবতার আবির্ভাবে ছোট-বড়র ভেদ ঘুচিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সমাজে যাহারা ঘৃণিত ছিল, তাহারাও দৈবশক্তির অধিকারী বলিয়া অভিমান করিল—প্রাকৃত পুরাণগুলিতে তাহার ইতিহাস রহিয়াছে।

উপনিষদে একটি মন্ত্র আছে—

"বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ"—

যিনি এক, তিনি আকাশে বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আছেন। ভুবনেশ্বরের মন্দির সেই মন্ত্রকেই আর একটু বিশেষভাবে এই বলিয়া উচ্চারণ করিতেছে—যিনি এক, তিনি এই মানবসংসারের মধ্যে স্তব্ধ হইয়া আছেন। জন্মমৃত্যুর যাতায়াত আমাদের চোখের উপর দিয়া কেবলি আবর্ত্তিত হইতেছে, সুখদুঃখ উঠিতেছে-পড়িতেছে, পাপ-পুণ্য আলোকে-ছায়ায় সংসারভিত্তি খচিত করিয়া দিতেছে, সমস্ত বিচিত্র—সমস্ত চঞ্চল,—ইহারই অন্তরে নিরলঙ্কার নিভৃত, সেখানে যিনি এক, তিনিই বর্ত্তমান। এই অস্থির-সমুদয়, যিনি স্থির তাঁহারই শান্তিনিকেতন,—এই পরিবর্ত্তনপরম্পরা, যিনি নিত্য তাঁহারই চিরপ্রকাশ। দেবমানব, স্বর্গমর্ত্ত্য, বন্ধন ও মুক্তির এই অনন্ত সামঞ্জস্য—ইহাই প্রস্তরের ভাষায় ধ্বনিত।

উপনিষদ্ এইরূপ কথাই একটি উপমায় প্রকাশ করিয়াছেন—

"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি॥"

দুই সুন্দর পক্ষী একত্র সংযুক্ত হইয়া এক-বৃক্ষে বাস করিতেছে। তাহার মধ্যে একটি স্বাদু পিপ্পল আহার করিতেছে, অপরটি অনশনে থাকিয়া তাহা দেখিতেছে।

জীবাত্মা-পরমাত্মার এরূপ সাযুজ্য, এরূপ সারূপ্য, এরূপ সালোক্য, এত অনায়াসে, এত সহজ উপমায়, এমন সরল সাহসের সহিত আর কোথায় বলা হইয়াছে! জীবের সহিত ভগবানের সুন্দর সাম্য যেন কেহ প্রত্যক্ষ চোখের উপর দেখিয়া কথা কহিয়া উঠিয়াছে—সেইজন্য তাহাকে উপমার জন্য আকাশ-পাতাল হাতড়াইতে হয় নাই।—অরণ্যচারী কবি বনের দুটি সুন্দর ডানাওয়ালা পাখীর মত করিয়া সসীমকে ও অসীমকে গায়ে-গায়ে মিলাইয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন, তাই কোনো প্রকাণ্ড উপমার ঘটা করিয়া এই নিগূঢ় তত্ত্বকে বৃহৎ করিয়া তুলিবার চেষ্টামাত্র করেন নাই। দুটি ছোট পাখী যেমন স্পষ্টরূপে গোচর, যেমন সুন্দরভাবে দৃশ্যমান, তাহার মধ্যে নিত্যপরিচয়ের সরলতা যেমন একান্ত, কোনো বৃহৎ উপমায় এমনটি থাকিত না। উপমাটি ক্ষুদ্র হইয়াই সত্যটিকে বৃহৎ করিয়া প্রকাশ করিয়াছে—বৃহৎ সত্যের যে নিশ্চিন্ত সাহস, তাহা ক্ষুদ্র সরল উপমাতেই যথার্থভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।

ইহারা দুটিই পাখী, ডানায়-ডানায় সংযুক্ত

হইয়া আছে—ইহারা সখা, ইহারা একবৃক্ষেই পরিষক্ত—ইহার মধ্যে একজন ভোক্তা, আর একজন সাক্ষী, একজন চঞ্চল, আর একজন স্তব্ধ।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরও যেন এই মন্ত্র বহন করিতেছে—তাহা দেবালয় হইতে মানবত্বকে মুছিয়া ফেলে নাই—তাহা দুই পাখীকে একত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু ভুবনেশ্বরের মন্দিরের মধ্যে আরো যেন একটু বিশেষত্ব আছে। ঋষিকবির উপমার মধ্যে নিভৃত অরণ্যের একান্ত নির্জ্জনতার ভাবটুকু রহিয়া গেছে। এই উপমার দৃষ্টিতে প্রত্যেক জীবাত্মা যেন একাকিরূপেই পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত। ইহাতে যে ধ্যানচ্ছবি মনে আনে, তাহাতে দেখিতে পাই যে, যে আমি ভোগ করিতেছি, ভ্রমণ করিতেছি, সন্ধান করিতেছি, সেই আমির মধ্যে "শান্তং শিবমদ্বৈতং" স্তব্ধভাবে নিয়ত আবির্ভূত।

কিন্তু এই একের সহিত একের সংযোগ ভুবনেশ্বরের মন্দিরে লিখিত হয় নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ তাহার সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত ভোগ লইয়া, তাহার তুচ্ছ-বৃহৎ সমস্ত ইতিহাস বহন করিয়া, সমগ্রভাবে এক হইয়া আপনার মাঝখানে অন্তরতররূপে, স্তব্ধরূপে, সাক্ষিরূপে ভগবান্‌কে প্রকাশ করিতেছে,—নির্জ্জনে নহে, যোগে নহে—সজনে, কর্ম্মের মধ্যে। তাহা সংসারকে, লোকালয়কে দেবালয় বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছে—তাহা সমষ্টিরূপে মানবকে দেবত্বে অভিষিক্ত করিয়াছে। তাহা প্রথমত ছোটবড় সমস্ত মানবকে আপন প্রস্তরপটে এক করিয়া তুলিয়াছে, তাহার পরে দেখাইয়াছে, পরম ঐক্যটি কোন্‌খানে আছে—তিনি কে। এই ভূমা-ঐক্যের অন্তরতর আবির্ভাবে প্রত্যেক মানব সমগ্রমানবের সহিত মিলিত হইয়া মহীয়ান্‌। পিতার সহিত পুত্র, ভ্রাতার সহিত ভ্রাতা, পুরুষের সহিত স্ত্রী, প্রতিবেশীর সহিত প্রতিবেশী, এক জাতির সহিত অন্য জাতি, এক কালের সহিত অন্য কাল, এক ইতিহাসের সহিত অন্য ইতিহাস দেবতাত্মা দ্বারা একাত্ম হইয়া উঠিয়াছে!

শ্রমণ।

"ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি।
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।
সংঘং শরণং গচ্ছামি।"

এক সময়ে এই সংক্ষিপ্ত মন্ত্রে ভারতবর্ষে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে তাহারই নাম—বৌদ্ধযুগ। তাহার কথা কালে সমগ্র সভ্যজগতের সুধীমণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে বৌদ্ধমত নিতান্ত নূতন বলিয়া বোধ হয় না। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর হইতে, এই পুরাতন মত অভিনব বিক্রমে নানা দিগ্দেশে প্রচারিত

হইবার সূত্রপাত হয়। তৎপূর্ব্বে যাঁহারা বিবিধ তপঃক্লেশ সহ্য করিয়া "বুদ্ধত্ব"লাভে কৃতার্থম্মন্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বমত-প্রচারে ব্যগ্র ছিলেন না।* তাঁহারা কোন্ পুরাকালের সাধক, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কিন্তু তাঁহাদের কথা বৌদ্ধ-সাহিত্যেও একেবারে অস্বীকৃত হয় নাই।†

শাক্যসিংহের আবির্ভাবকাল নানা প্রমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছে। তাঁহার সমকালবর্ত্তী বিবিধ বিখ্যাত রাজন্যবর্গেরও পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তখনও ভুবন-বিখ্যাত মগধসাম্রাজ্যের প্রবল প্রতাপ ভারত-বর্ষের বিবিধ বিভাগে ব্যাপ্ত হয় নাই;—নানা প্রদেশ, নানা রাজ্যে বিভক্ত ছিল। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিলে, তাঁহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া যে সকল বৌদ্ধসন্ন্যাসী স্বদেশে-বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া ভারতবর্ষের প্রভাববিস্তারের সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই সাধারণত "শ্রমণ" নামে সুপরিচিত।

শ্রমণগণ নিয়ত পরহিতকামী, আত্মত্যাগী, সৎপথাবলম্বী সন্ন্যাসী বলিয়া এসিয়াখণ্ডের সকল দেশেই সাধুপুরুষোচিত চরিত্রগৌরবে লোকসমাজে সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হিংসাদ্বেষবিনির্ম্মুক্ত স্বধর্ম্মানুরক্ত ভক্তের কাতরকণ্ঠে জগতের জ্ঞানান্ধ নর-নারীকে নবধর্ম্মের সুসমাচার প্রদান করিবার জন্য ভিক্ষাপাত্রহস্তে প্রাসাদ ও কুটীরদ্বারে উপনীত হইবামাত্র, লোকসমাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া চরিত্র-সংশোধনে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের কল্যাণে কত অসভ্য মানবসমাজ জ্ঞান ও ধর্ম্মে সমুন্নত হইয়াছিল; কত মরু-গিরি-মহারণ্য জনকোলাহলময় বিচিত্র গ্রামনগরে অলঙ্কৃত হইয়া সভ্যতাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল; কত অপরিজ্ঞাত ক্ষুদ্র দ্বীপ, কত অপরিচিত বৃহৎ বিদেশ "ধর্ম্মসংঘ ও বুদ্ধ" মন্ত্রে নবজীবন লাভ করিয়া অবনত শিষ্যের ন্যায় ভক্তি-বিস্ময়ে ভারতানুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল,—তাহার কথা এখন নিতান্ত স্বপ্নকাহিনী বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। তথাপি শ্যাম-সিংহল, ব্রহ্ম-তাতার, চীন-জাপান, ভোট-তিব্বতের বৌদ্ধমঠরক্ষিত বিবিধ গ্রন্থে এখনও তাহার ক্ষীণচ্ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রমণগণের ধর্ম্মপ্রচার দিগ্বিজয় বলিয়া কবি-কুলের অমরকাব্যে কীর্ত্তিত না হইলেও, পৃথিবী এরূপ প্রেমের দিগ্বিজয় অল্পই কীর্ত্তন করিতে পারে! এমন নিঃস্বার্থ পরহিত-কামনা, এমন অকৃত্রিম বিশ্বপ্রেমোন্মত্ত মানবসেবা, এমন সরল-সুন্দর আত্মত্যাগের মহিমা সভ্যসমাজের কাব্যে, ইতিহাসে বা উপন্যাসে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রমণশব্দ উত্তরকালে বিশ্ববিখ্যাত হইলেও, তাহা ভগবান্ শাক্যসিংহের আবিষ্কৃত কোন নূতন শব্দ বলিয়া বোধ হয় না।‡ "শ্রমু তপসি খেদে চ"—এই চিরপুরাতন

* শাক্যসিংহের পূর্ব্বে যাঁহারা বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তন্মধ্যে বিপশ্বী, শিখী, বিশ্বভূ, ককুৎসন্দ, কনকমুনি ও কাশ্যপের নাম বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত।

† ললিতবিস্তরঃ।

‡ সন্ন্যাসিমাত্রেই শ্রমণপদবাচ্য ছিলেন, ললিতবিস্তরে তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

ধাতু হইতে শ্রমণশব্দের উৎপত্তি।* ইহা কত পুরাতন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই যে এই শব্দ ভারতীয় পুরাতন সাহিত্যে সুপরিচিত ছিল, তাহার নানা নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধগণ উপাসনা, উপাসক, ভিক্ষু প্রভৃতি পুরাতন শব্দের ন্যায় শ্রমণশব্দও প্রচলিত সাহিত্য হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে বৌদ্ধসন্ন্যাসিগণ শ্রমণ-উপাধি গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইবার পর, এই পুরাতন শব্দ সাধারণত বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিজ্ঞাপক সঙ্কীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হওয়ায়, পুরাতন অর্থ কালে অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। শ্রমণশব্দের ব্যুৎপত্তি ও ইতিহাসের সম্যক্ আলোচনা না করিয়া, কোন কোন ইউরোপীয় অধ্যাপক ইহাকে বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিজ্ঞাপক অভিনব সংজ্ঞামাত্র মনে করিয়া থাকেন। পুরাতন সংস্কৃত-সাহিত্যের কোনও গ্রন্থে "শ্রমণ"শব্দের সন্ধান পাইবামাত্র এই শ্রেণীর অধ্যাপকগণ তাহাকে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ বলিয়া অবলীলাক্রমে অভিমত ব্যক্ত করেন! তাঁহাদের বিশেষ অপরাধ নাই। আমাদের দেশের উত্তরকালের অনেক টীকাকারও "শ্রমণ"শব্দে প্রথমে বৌদ্ধসন্ন্যাসীকেই সূচিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তখনও পুরাতন অর্থ একেবারে বিলুপ্ত না হওয়ায়, প্রসঙ্গক্রমে তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। রামানুজকৃত রামায়ণের প্রসিদ্ধ টীকায় ইহার একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

"ব্রাহ্মণা ভুঞ্জতে নিত্যং নাথবন্তশ্চ ভুঞ্জতে।
তাপসা ভুঞ্জতে চাপি শ্রমণাশ্চৈব ভুঞ্জতে॥" ২।১৪।১২॥

অযোধ্যাকাণ্ডের এই সরল শ্লোকের "শ্রমণ"শব্দের ব্যাখ্যায় রামানুজ প্রথমে "শ্রমণা বৌদ্ধসন্ন্যাসিনঃ" লিখিয়া, পরে প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন—"যদ্বা শ্রমণপদং সন্ন্যাস্যুপলক্ষণম্।" এরূপ ব্যাখ্যা দর্শন করিয়া কেহ কেহ এই শ্লোক অবলম্বনে রামায়ণকে বৌদ্ধযুগের গ্রন্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এই শ্লোকের "শ্রমণ"শব্দ বৌদ্ধসন্ন্যাসিবাচক বলিয়া গৃহীত হইলে, শ্লোকার্থ নিতান্ত অসঙ্গত হয়। শ্রমণগণের পক্ষে বৈদিকধর্ম্মানুরক্ত দশরথ রাজার অশ্বমেধযজ্ঞে আহূত বা অনাহূত অতিথিরূপে ভোজনব্যাপারে নিযুক্ত হওয়া অসম্ভব। জাববলি যে যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ, তাহাতে প্রতিদিন প্রকাশ্যরূপে শ্রমণগণের কদাচ ভোজনার্থ সমাগত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। রামায়ণের নানা শ্লোকের ব্যাখ্যায় রামানুজ আধুনিক যুগের সংস্কার লইয়া প্রাচীন সাহিত্যের টীকারচনা করিতে গিয়া নানাপ্রকার অসঙ্গতির অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। রামায়ণোক্ত "শ্রমণ"শব্দ যে বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিজ্ঞাপক নূতন শব্দ নহে, রামায়ণেই তাহার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

"যদ্বা শ্রমণপদং সন্ন্যাস্যুপলক্ষণম্।"

ইহাতেই বুঝা যায়, সন্ন্যাসিমাত্রের পক্ষেই "শ্রমণ"শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারা রামানুজের সময়েও অপরিজ্ঞাত ছিল না। সন্ন্যাসীর ন্যায়

* শ্রীমহেশ্বরাচার্য্যকৃত "ভাষাবৃত্ত্যর্থবিবৃতিঃ"।

সন্ন্যাসিনীও নিতান্ত পুরাকাল হইতে ভারতবর্ষে দেখিতে পাওয়া যাইত। সন্ন্যাসিগণ শ্রমণ এবং সন্ন্যাসিনীগণ শ্রমণা বা শ্রমণী নামে কথিত হইতেন।* আরণ্যকাণ্ডের চতুঃসপ্ততিতম সর্গে এইরূপ একটি শ্রমণীর বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়;—তাঁহার নাম শবরী।

রামলক্ষ্মণ সীতাশোকে সন্তপ্তহৃদয়ে নানাস্থান অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধের নিকট উপনীত হইয়া সীতা-উদ্ধারের সন্ধান প্রাপ্ত হন। কবন্ধ সন্ধানপ্রদানকালে রামলক্ষ্মণকে পম্পাতীরে গমন করিতে উপদেশদান করেন। তদুপলক্ষে কবন্ধ বলিয়াছিলেন—"পম্পাতীরে মতঙ্গমুনির শিষ্যগণের আশ্রম বর্ত্তমান আছে; শিষ্যগণ স্বর্গারোহণ করায়, তাঁহাদের আশ্রমপরিচারিণী শবরীনাম্নী এক শ্রমণী এক্ষণে তথায় বাস করিতেছেন।" যথা—

"তেষাং গতানামদ্যাপি দৃশ্যতে পরিচারিণী।
শ্রমণী শবরী নাম কাকুৎস্থ চিরজীবিনী॥"৩।৭৩।২৬।

এই শ্লোকের "শ্রমণী"শব্দের ব্যাখ্যায় রামানুজ অন্য কোনরূপে ইতস্তত না করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন—"শ্রমণী তাপসী।" রামলক্ষ্মণ সেই বৃদ্ধা তাপসীর আশ্রমে উপনীত হইয়া আতিথ্যস্বীকার করিলে, তাপসী আশ্রমোচিত বিবিধ সৎকারে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাদের সম্মুখেই হুতাশনে আত্মাহুতি প্রদান করেন।

"ইত্যেবমুক্ত্বা জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা।
অনুজ্ঞাতা তু রামেণ হুত্বাত্মানং হুতাশনে॥
জ্বলৎপাবকসঙ্কাশা স্বর্গমেব জগাম হ।
দিব্যাভরণসংযুক্তা দিব্যমাল্যানুলেপনা॥"৩।৭৪।৩২-৩৩

এই বর্ণনা অনুসারে "জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা" শবরীর যথাবিধি আত্মাহুতিপ্রদানের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীর এরূপ বেশভূষা বা আচরণ কদাচ সম্ভব হইতে পারে না।† শবরীর পূজনীয় গুরুকুল যেখানে অগ্নিতে আহুতি প্রদান এবং যে "প্রত্যক্‌স্থলী"নাম্নী বেদিতে পুষ্পোপহার প্রদান করিতেন, শবরী তৎসমস্ত রামলক্ষ্মণকে দেখাইয়া গুরুকুলের বৈদিকধর্ম্মানুশীলনের পরিচয় দিয়াছিলেন।

উত্তরকালে স্ত্রীলোকের পক্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিবার দৃষ্টান্ত ক্রমে বিলুপ্ত হইলে, বৈদিকযুগের একটি ঐতিহাসিক সূত্র ছিন্ন হইয়া যায়। বেদার্থজ্ঞানবতী না হইলে সন্ন্যাসিনী হওয়া যায় না; শবরী স্ত্রীলোক হইয়া কিরূপে সে জ্ঞানের অধিকারিণী হইতে পারেন,—উত্তরকালের টীকাকারগণের নিকট তাহা একটি কূটপ্রশ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। শবরী "বিজ্ঞানে অবহিষ্কৃতা" বলিয়া কথিতা ছিলেন।—

"রাঘবঃ প্রাহ বিজ্ঞানে তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাম্।"

ইহার ব্যাখ্যায় তীর্থনামধেয় প্রাচীন টীকাকার লিখিয়া গিয়াছেন,—"বিজ্ঞানে আগতানাগতজ্ঞানে অবহিষ্কৃতাং তাদৃশজ্ঞানবতীম্।" এই ব্যাখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়, শবরী তত্ত্বজ্ঞানবতী ছিলেন। কতক-নামধেয় টীকাকার, স্ত্রীলোকের পক্ষে

* "শ্রমণ"শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে "শ্রমণা"শব্দ সুপরিচিত; "শ্রমণী"শব্দ সেরূপ সুপরিচিত নহে। রামায়ণের আদিকাণ্ডের ৫৭সংখ্যক শ্লোকে "শ্রমণী"শব্দ প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহার টীকায় রামানুজ লিখিয়াছেন—"শ্রমণীমিত্যত্র কর্ত্তরি ল্যুট্; তপসা শ্রাম্যতীত্যর্থাৎ"; সুতরাং শ্রমণাশব্দের-ন্যায় শ্রমণীশব্দ ও সংস্কৃত-ব্যাকরণ-সম্মত।

† বৌদ্ধশ্রমণা কাষায়াম্বরা মুণ্ডিতকেশা সন্ন্যাসিনী; জটিলা চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরা তপস্বিনী বলিয়া বর্ণিত হইতে পারেন না।

তত্ত্বজ্ঞানের অধিকার থাকা বিনা প্রমাণে ব্যাখ্যা না করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন ;—"বিজ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্যায়াং মৈত্র্যাত্রেয়্যাদিবৎ অবহিষ্কৃতাং তত্রাপ্যধিকারিণীমিত্যর্থঃ।" মৈত্রী, আত্রেয়ী প্রভৃতি ভারতরমণীগণ যেমন পুরাকালে রমণী হইয়াও ব্রহ্মবিদ্যাধিকার হইতে বহিষ্কৃতা হন নাই, পরন্তু অধিকারিণী বলিয়া স্বীকৃতা হইয়াছিলেন, শবরীও তদ্রূপ গুরুকুলকর্ত্তৃক সন্ন্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। তীর্থ ও কতক নামধেয় টীকাকারগণের এই মূলানুগত ব্যাখ্যা উত্তরকালে গৃহীত হয় নাই। ইহা "স্ত্রী-শূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" এই শাসনবাক্যের নিতান্ত বিরোধী বলিয়া, উত্তরকালের টীকাকার রামানুজ রামায়ণের এই শ্লোকার্থের ব্যাখ্যায় এক নূতন অর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন! সে অর্থ এই—"বিশিষ্টং জ্ঞানং যেষাং তেষাং সম্বন্ধো যস্যাস্তৎসম্বোধনে হে বিজ্ঞানে। ইতি সম্বোধ্য, তাং নিত্যমবহিষ্কৃতাং ভোজনাদি-ব্যাপারাদিতি শেষঃ, তদ্দত্তমাহারাদিকমঙ্গীকৃত্য।" বলা বাহুল্য, রামানুজের এই ব্যাখ্যা নিতান্ত কষ্টকল্পিত। বোধ হয়, তাঁহার সময়ে জনসমাজ স্ত্রীলোকের ব্রহ্মবিদ্যায় অধিকার থাকা স্বীকার করিতেন না বলিয়া, রামানুজ রামায়ণের সরল বাক্যার্থের এরূপ কুটিল কষ্টকল্পিত বিকৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন!

শাক্যসিংহ ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলে, কপিলবস্তুর ক্ষত্রিয়রমণীগণ নবধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা গৃহে বাস করিয়া গৃহীর ধর্ম্ম প্রতিপালন করা অপেক্ষা শাক্যসিংহের ন্যায় সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য ব্যাকুলা হইলে, শাক্যসিংহ তাঁহাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিতে অসম্মত হন। পরে তিনি আনন্দের বিবিধ অনুনয়বাক্যে নিতান্ত বাধ্য হইয়া রমণীগণকে সন্ন্যাসাধিকার প্রদান করেন। তৎকালে শাক্যসিংহ রমণীগণের পক্ষে যে সকল কঠোর ব্রত ও নিয়ম পালনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহার আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়,—তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অবিকৃত রাখিবার উদ্দেশ্যেই মহিলামণ্ডলীর সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রতিবাদী হইয়াছিলেন।*

বৌদ্ধভিক্ষুণীগণ সন্ন্যাসগ্রহণের অধিকার লাভ করিয়া, শ্রমণী বা শ্রমণা নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি না, তাহা নিঃসন্দেহে নির্ণয় করা যায় না। তাঁহারা ভিক্ষুণীনামেই সাহিত্যে সুপরিচিত। যাহা হউক, শাক্যসিংহের ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্ব হইতেই যে "শ্রমণ"শব্দ প্রচলিত ছিল, তাহার সন্দেহ নাই। শাক্যাবির্ভাবের পূর্ব্বকালবিরচিত পাণিনিসূত্রেও "শ্রমণা"শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

"কুমারঃ শ্রমণাদিভিঃ॥" ২।১।৭০॥

"কুমারশব্দঃ শ্রমণাদিভিঃ সহ সমস্যতে, তৎপুরুষশ্চ সমাসো ভবতি।" শ্রমণা, প্রব্রজিতা, কুলটা, গর্ভিণী, তাপসী, দাসী, বন্ধকী প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃতব্যাকরণে "শ্রমণাদি" শব্দ বলিয়া পরিচিত। এই সকল শব্দের সহিত "কুমার"শব্দ মিলিত হইয়া "তৎপুরুষ" সমাস নিষ্পন্ন হইবার কথা পাণিনিসূত্রে ব্যক্ত হইয়াছে। এই সূত্রানুসারে "কুমারী শ্রমণা"

* Rockhill's Life of Buddha, p. 61.

সমাসে "কুমারশ্রমণা" রূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সূত্র একটি পুরাতন ঐতিহাসিক তথ্যের আধার। ইহাতে একদা ভারতবর্ষে চিরকুমারী সন্ন্যাসিনী বর্ত্তমান থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে দেশে উত্তরকালে পুরুষমাত্রেই উদ্বাহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া নানা দুঃখক্লেশ বহন করা অবশ্যপ্রতিপাল্য ধর্ম্মানুশাসন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্র সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই বাল্যে পিতা, যৌবনে পতি, বার্দ্ধক্যে পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণে বসতি করিবার ব্যবস্থা করিয়া, কাহাকেও কদাপি স্বাতন্ত্র্য-অবলম্বনের প্রশ্রয় দান করে নাই, সে দেশে যে এক সময়ে চিরকুমারী সন্ন্যাসিনীগণ স্বতন্ত্রভাবে আমরণ ধর্ম্মাচরণ করিতেন, তাহা নিতান্ত বিস্ময়ের ব্যাপার বলিয়াই প্রতিভাত হইতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের পুরাতন ইতিহাস বিলুপ্ত হইলেও, এ বিষয়ের নানা প্রমাণ অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল প্রমাণ নিতান্ত প্রচ্ছন্নভাবে অপার শাস্ত্রসমুদ্রের অতলগর্ভে ইতস্তত লুক্কায়িত থাকায়, ভারতরমণীর অবস্থাপর্য্যালোচনায় ইউরোপীয় মহিলামণ্ডলী তাঁহাদিগকে কারানিবাসিনী হতভাগিনী বলিয়া কত-না সমবেদনা প্রকাশ করিয়া থাকেন! এ কালের কথা বলিতেছি না;—সেকালের সাহিত্যে, সেকালের ধর্ম্মশাস্ত্রে, সেকালের লোকব্যবহারে, ভারতরমণী স্বকীয় চরিত্রগৌরবে দেবীপদবাচ্যা হইয়া, ভারতবর্ষে জ্ঞান ও ধর্ম্ম বিস্তারের প্রভূত সহায়তাসাধন করিয়াছিলেন। সংসারাশ্রম সর্ব্বাশ্রমের সার বলিয়া পরিগণিত হইলেও, অবস্থাভেদে সংসারাশ্রম গ্রহণ না করিয়া, স্ত্রীপুরুষ উভয়ের পক্ষেই চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধযুগ প্রবর্ত্তিত হইবার বহুপূর্ব্ব হইতে এই অধিকার পরিচালিত হইত। রমণীমাত্রেই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতেন না। সাধারণত পুরুষের ন্যায় রমণীগণও উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন; কিন্তু স্থলবিশেষে পুরুষের ন্যায় রমণীগণও চিরব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন করিতেন। এই শ্রেণীর তাপসীগণ গুরুগৃহে বেদাদি বিবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার অধ্যাপনাকার্য্যেও নিযুক্ত হইতেন, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "নির্ণয়সিন্ধু" নামক স্মার্ত্তগ্রন্থে পুরাকালে এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত থাকার পরিচয় প্রকাশিত রহিয়াছে। পাণিনিসূত্রেও * অধ্যাপিকার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। নাট্যসাহিত্যের নানাস্থানে স্ত্রীলোকের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রসঙ্গ অদ্যাপি দেদীপ্যমান।† সন্ন্যাসধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করা কঠিন হইলেও, ভারতরমণী সে কঠিন ব্রতপালনের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়া পুরাকালে নানা কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের নাম, তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ বিস্মৃতিনিমগ্ন বলিয়া ভারতরমণীগণ সমবেদনার পাত্রী! তথাপি ভগবতী ভারতরমণী নিয়ত দেবীপদবাচ্যা পূজনীয়া তপস্বিনী।

ভারতবর্ষের বৌদ্ধভিক্ষুর ন্যায় বৌদ্ধ-

* ৪।১।৪৯

† মালতীমাধব ও উত্তররামচরিত।

ভিক্ষুণীগণও নানা দিগ্‌দেশে ধর্ম্মপ্রচারের সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের কাহারও কাহারও নাম ও কীর্ত্তিকাহিনী অদ্যাপি বৌদ্ধসাহিত্যে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

শ্রমণগণ যে কঠোর ধর্ম্মপালনের জন্য চিরবিখ্যাত, তাহা অদ্যাপি সভ্যসমাজের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া থাকে। ধর্ম্মার্থে এরূপ আত্মত্যাগ, এরূপ কষ্টসহিষ্ণুতা, এরূপ অপরাজিত অধ্যবসায়, জগতের ইতিহাসে অল্পই পাওয়া যায়। সময়ের উত্তেজনায়, বিধর্ম্মীর অত্যাচারে, নিতান্ত নিরুপায় হইয়া অগ্নিকুণ্ডে জীবনবিসর্জ্জন অলৌকিক-শৌর্য্যবিজ্ঞাপক অমানুষিক ব্যাপার বলিয়া স্বীকার করা যায় না। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া চিরজীবন সংসারসুখ বিসর্জ্জন করিয়া তপঃক্লেশ সহ্য করাই যথার্থ অলৌকিক ব্যাপার। মত ও বিশ্বাস যতই ভ্রান্ত হউক না কেন, ভারতবর্ষের নরনারী বহুবার এই চরিত্রবলের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের চিতাভস্মে এ দেশ আজিও পবিত্র হইয়া রহিয়াছে।*

বৌদ্ধ শ্রমণগণ এ বিষয়ে আরও অক্ষয়-কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বদেশের শাস্ত্রোজ্জ্বল সুখসৌভাগ্য বিসর্জ্জন করিয়া, কেহ চিরতুষারাবৃত অনুর্ব্বর হিমারণ্যে, কেহ তপ্তরবিতাপদগ্ধ প্রচণ্ড গ্রীষ্মমণ্ডলে, কেহ শতশ্বাপদসঙ্কুল অপরিজ্ঞাত অরণ্যপথে, কেহ বা তদপেক্ষা অধিক অপরিজ্ঞাত তরঙ্গতাড়িত সাগরবক্ষে নানা দিগ্‌দেশে গমন করিয়া,—ধর্ম্মপ্রচারে মানবসমাজকে সমুন্নত করিবার জন্য বিদেশের প্রান্তরে, শ্মশানে, গিরিসঙ্কটে বা নদীসৈকতে জীর্ণকঙ্কাল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! ভারতবর্ষের বাহিরে যাঁহারা এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়া ভারতবর্ষের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক শ্রমণের নাম অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহাদের কথা বিশেষভাবে আলোচিত হওয়া আবশ্যক।

প্রথম বৌদ্ধশ্রমণ "পঞ্চ ভদ্রবর্গীয়" নামক পাঁচ ব্যক্তি। তাঁহাদের কথা সকল দেশের বৌদ্ধশাস্ত্রেই সুপরিচিত। তাঁহাদের নাম,—জ্ঞানকৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম ও ভদ্রিক। ইঁহারা কিরূপে শাক্যসিংহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা নানা গ্রন্থে নানারূপে কীর্ত্তিত আছে। "ললিতবিস্তরে" দেখিতে পাওয়া যায়, এই "পঞ্চ ভদ্রবর্গীয়" কৌণ্ডিন্যাদি বৌদ্ধশ্রমণগণ পূর্ব্বে রুদ্রক রামপুত্রের শিষ্য ছিলেন; পরে শাক্যসিংহের অনুসরণ করেন।

"এবং বিমৃষ্য পঞ্চকা ভদ্রবর্গীয়া রুদ্রকরামপুত্রসকাশাৎ অপক্রম্য বোধিসত্ত্বং অববন্ধ।" (অববন্ধুঃ)

ললিতবিস্তরঃ, সপ্তদশাধ্যায়ঃ। †

ইঁহারা শাক্যসিংহের নিকট কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া, তাঁহাকে প্রথমে কৃচ্ছ্রসাধনে ও পরে আহারান্বেষণে প্রবৃত্ত দেখিয়া, তাঁহার নিকট হইতে পলায়নপূর্ব্বক বারাণসীধামে

* রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ বৌদ্ধ শ্রমণ-শ্রমণার আদর্শ গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও ইহা অনুমান করিয়া থাকেন।

† মতান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্রবৎসল শুদ্ধোদন শাক্যসিংহের তপস্যাকালে তাঁহার পরিচর্য্যার জন্য এই সকল লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। এস্থলে "ললিতবিস্তরের" মত গৃহীত হইল। শুদ্ধোদনকর্ত্তৃক প্রেরিত হইলে ইহারা শাক্যসিংহকে পরিত্যাগ করিতেন বলিয়া বোধ হয় না।

"মৃগদাব"নামক ঋষিপত্তনে বাস করিতে আরম্ভ করেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিয়া মৃগদাবে উপনীত হইলে, এই পঞ্চ-শিষ্যই প্রথমে তাঁহার নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া প্রচারব্রত গ্রহণ করেন। ইঁহারা শ্রমণপদবীতে আরোহণ করিয়া কোন্ কোন্ স্থানে প্রচারকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া-ছিলেন, তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্যে ইঁহারা প্রথম শ্রমণ বলিয়া চিরসম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের পর বহুলোকে প্রচারব্রত গ্রহণ করিয়া শাক্য-সিংহের জীবিতকালেই ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও ভারতবর্ষই শ্রমণ-গণের একমাত্র প্রধান প্রচারক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত ছিল। গান্ধারে ও কাশ্মীরে বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচলিত হইবার পর হইতে, তাহা ভারত-বর্ষের বাহিরে প্রধাবিত হইবার সূত্রপাত হয়। তাহার পর ভারতবর্ষের শিক্ষা ও সভ্যতা, ধর্ম্ম ও সদাচার, শিল্প ও সাহিত্য ভূমধ্যসাগরতীর হইতে প্রশান্তমহাসাগর পর্য্যন্ত জলে-স্থলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অনেক স্থান এক্ষণে সে শিক্ষা ও সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, অদ্যাপি ভূমণ্ডলের অধিকাংশ নর-নারী ভারতবর্ষকে গুরুস্থান বলিয়া উদ্দেশে নমস্কার করিয়া থাকে। যাঁহারা নিয়ত আত্মবিসর্জ্জন করিয়া স্বদেশের নাম এইরূপে ভূমণ্ডলে জয়যুক্ত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কীর্ত্তিকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইবার যোগ্য। ভারতবর্ষের কবি যেদিন সে পুণ্য-গাথা গান করিবেন, ভারতবর্ষের ইতিহাস-লেখক যেদিন সে অপূর্ব্ব আত্মত্যাগকাহিনী কীর্ত্তন করিবেন, সেদিন ভারতবর্ষের সাহিত্য নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া পাঠক-সমাজকে আত্মমর্য্যাদার অমৃতগৌরবে গৌরবান্বিত করিবে!

শাক্যসিংহ কৌণ্ডিন্যাদি পঞ্চ ভদ্রবর্গীয় শিষ্যগণকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার পর বারাণসীধামে আরও ৫৫জন তাঁহার নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন। তন্মধ্যে যশঃ, পূর্ণ, বিমল, গবাম্পতি এবং সুবাহুর নাম বৌদ্ধসাহিত্যে সুপরিচিত। এই পঞ্চ যুবক যৌবনোচিত অলীক আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করি-তেন;—অর্থের অভাব ছিল না; প্রবল প্রতাপের অবধি ছিল না; তরুণজীবনে ভোগসুখ বিসর্জ্জন করিয়া ভিক্ষাপাত্র-গ্রহণের সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহাদের সন্ন্যাস-গ্রহণের ও চরিত্রসংশোধনের দৃষ্টান্তে বারা-ণসীর সৎকুলজাত সম্ভ্রান্ত যুবকগণের মধ্যে আরও পঞ্চাশৎ শিষ্য মন্ত্রগ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ এই ষষ্টিসংখ্যক মন্ত্রশিষ্যগণকে ত্রিশ দলে বিভক্ত করিয়া দুই দুই জনকে এক এক দিকে ধর্ম্মপ্রচারে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং উরুবিল্বাভিমুখে প্রস্থিত হন।

তৎকালে উরুবিল্ব-কাশ্যপ, নদী-কাশ্যপ ও গয়া-কাশ্যপ নামে তিন ভ্রাতা নৈরঞ্জনা-নদীতীরে বহুসংখ্যক শিষ্য সহ সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিতেন। তাঁহারা শাক্যসিংহের নবধর্ম্মে দীক্ষিত হন। এই উরুবিল্ব-কাশ্যপ বৌদ্ধসাহিত্যে মহাকাশ্যপ নামে পরিচিত। শাক্যসিংহ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করিলে, মহাকাশ্যপই বৌদ্ধশ্রমণগণের নেতৃত্বপদ প্রাপ্ত হন। তৎকালে জ্ঞান, ধর্ম্ম, চরিত্রবল ও বয়োবার্দ্ধক্যে তিনিই মহাস্থবিরপদের একমাত্র যোগ্যব্যক্তি বলিয়া পরিচিত

ছিলেন। কাশ্যপের চেষ্টায় মগধান্তর্গত সপ্তপর্ণগুহাসমীপে পাঁচশত বৌদ্ধশ্রমণ সম্মিলিত হইয়া "ত্রিপিটক" সঙ্কলন করিবার পর, সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মের তত্ত্ব দেশবিদেশে প্রচারের সূত্রপাত হয়। মহাকাশ্যপের পর আনন্দ, আনন্দের পর শাণবাসিক, শাণবাসিকের পর উপগুপ্ত মহাস্থবিরের পদবী লাভ করেন। আনন্দ নির্ব্বাণলাভের সময়ে মধ্যন্তিকনামক শিষ্যকে মন্ত্রদান করিয়াছিলেন। এই নবদীক্ষিত বৌদ্ধশ্রমণই কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। শাণবাসিকের গান্ধারে ধর্ম্মপ্রচার করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

কাশ্মীরের অবস্থা কিরূপ ছিল, তথায় কিরূপে নবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সুসভ্য-সম্পন্ন গ্রামনগর প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার ঐতিহাসিক বিবরণ নানা অলৌকিক অতিরঞ্জিত উপাখ্যানে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীর তৎকালে অশিক্ষিত নাগজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। তাহারা প্রথমে ধর্ম্মপ্রচারকের উপর নানা অত্যাচার করিয়া, অবশেষে তাঁহার সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও প্রেমের নিকট পরাজিত হইয়া তাঁহাকে স্থানদান করেন।* এই স্থানে গ্রামনগর নিম্মাণ করিয়া শ্রমণগণ গন্ধমাদননামক পর্ব্বত হইতে কুঙ্কুমবৃক্ষ আনয়ন করিয়াছিলেন ;— তাহার কৃষিকার্য্যেই নবধর্ম্মানুরক্ত উপনিবেশনিবাসিগণ ধনধান্যে সমুন্নতি লাভ করেন। বৌদ্ধশ্রমণগণ ভারতবর্ষের বাহিরে ধর্ম্মপ্রচার করিবার সময়ে সেই সকল অনুন্নত দরিদ্রদেশের ধর্ম্ম ও নীতি সমুন্নত করিয়াই নিরস্ত হইতে পারেন নাই ; তথাকার কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সমুন্নতি সাধন করিবার জন্যও চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপে হিমালয়ের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে শাক্যসিংহের নবধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া, তাহা ক্রমশ হিমালয় অতিক্রম করিয়া তাতার, তিব্বৎ ও চীনসাম্রাজ্যে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

তাতারের অন্তর্গত "কুস্তন"নামক রাজ্য হইতেই বৌদ্ধধর্ম্ম সমগ্র এসিয়াখণ্ডের পশ্চিমাংশে প্রচারিত হয়। এই কুস্তননগর এক্ষণে "খোটান" নামে পরিচিত। শাক্যসিংহের এই দেশে উপনীত হইবার কথা তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়। "তাহার মহাপরিনির্ব্বাণলাভের ২৩৪ বৎসর পরে ধর্ম্মাশোকনামক নরপতি মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।† তাঁহার রাজ্যাব্দের ত্রিংশত্তম বর্ষে তদীয় মহিষীর এক পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, ঐ নবজাত শিশু পরিত্যক্ত হয়। চীনদেশের অধিপতি তাহাকে প্রতিপালন করেন। ঐ পুত্রের নাম "কুস্তন"। তিনি উত্তরকালে কুস্তনরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।‡ চীন ও ভারতবর্ষ হইতে বহুলোকে এই দেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করায়, অতি অল্পদিনের মধ্যে এই রাজ্য ভারতবর্ষ, চীন ও মধ্য এসিয়ার সম্মিলনক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। তথায় ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় শিল্প-সাহিত্য, ভারতীয়

* এই কাহিনী নানা লতাপল্লবে অলঙ্কৃত হইয়া সমস্ত বৌদ্ধসাহিত্যে নানাভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

† ইহা তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যের কথা।

‡ Rockhill's Life of Buddha.

লিপিকৌশল ও ভারতীয় সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রচলিত হইয়া, ভারতবর্ষের বাহিরে এক "মহা-ভারতরাজ্য" গঠিত হইবার সূত্রপাত করে। বৌদ্ধশ্রমণগণের অশ্রান্ত অধ্যবসায়ে এই জ্ঞানসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। কালে তাহা মুসলমানধর্ম্মের প্রবল প্রতাপে চূর্ণবিচূর্ণ হইলেও, মরুনিহিত বৌদ্ধবিহারাদি অদ্যাপি সে অতীত কাহিনীর পরিচয় প্রদান করিতেছে।*

এই প্রদেশে কিরূপে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবিষ্ট হইয়া সভ্যতাবিস্তারের সহায়তা করিয়াছিল, হিয়ঙ্গথ্সাঙ্গের ভ্রমণকাহিনীতে তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—কাশ্মীর হইতে বৈরোচন-নামক শ্রমণ আসিয়া এই সংস্কারকার্য্য সাধন করেন। হিয়ঙ্গথ্সাঙ্গ এই দেশে উপনীত হইয়া, ইহার যে সুখসমৃদ্ধি ও সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণগণের আত্মত্যাগ ও প্রচার-কৌশলই তাহার মূলকারণ।† কুস্তন ও চীনরাজ্য হইতে ক্রমে তিব্বতের তুষারাবৃত উচ্চ উপত্যকায় শাক্যসিংহের নবধর্ম্ম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার বিবরণ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তিব্বতে ভাষা ছিল, লিপিকৌশল ছিল না; নরনারী ছিল, সমুন্নত শিল্প-সাহিত্য ছিল না; রাজ্য ছিল, নিয়ত কলহকোলাহল ভিন্ন শান্তিসুখ ছিল না। শ্রমণগণের অক্লান্ত অধ্যবসায়ে কিরূপে ধীরে ধীরে তিব্বতের সর্ব্বপ্রকার সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস নিরতিশয় কৌতূহলের বিষয়।

শ্রমণগণের মধ্যে কালে নানা কুসংস্কার ও কুপ্রবৃত্তি প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরব বিনষ্ট করায়, বৌদ্ধধর্ম্ম ধীরে ধীরে উপধর্ম্মে পরিণত হইয়া এসিয়াখণ্ডের অধিকাংশ স্থান হইতে বিলীন হইয়া গিয়াছে! ব্যাবিলন, মিশর, গ্রীস ও রোমের পূর্ব্বকাহিনী যেমন বিস্ময়োৎপাদন করিলেও, তাহাদের অধঃপতনের মূলে চরিত্রহীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠকচিত্ত অবসাদগ্রস্ত করে, বৌদ্ধশ্রমণের ইতিহাসও সেইরূপ চিত্তক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। যাঁহারা সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিয়া কেবল চরিত্রবলের অজেয়শক্তিতে জলে-স্থলে জয়যুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বেশ, তাঁহাদের ধর্ম্ম, তাঁহাদের পবিত্র উপাধি ধারণ করিয়া উত্তরকালের শ্রমণগণ চরিত্রহীনতায় বৌদ্ধজ্ঞানসাম্রাজ্য চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ইহলোক হইতে অবসরগ্রহণ করিয়াছেন! পৃথিবীর ইতিহাসে নানা দেশ নানা সময়ে বাহুবলে বলীয়ান্ হইয়া কিয়ৎকাল ভূমণ্ডলের কিয়দংশে প্রবল প্রতাপে রাজ্যবিস্তার করিয়াছিল; অদ্যাপি তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। কিন্তু কেবল চরিত্রবলে অর্দ্ধপৃথিবীব্যাপি-জ্ঞানসাম্রাজ্য-সংস্থাপনে ভারতবর্ষের বৌদ্ধশ্রমণই

* এক্ষণে পোটানের নিকটস্থ "টাকলা-মকান"নামক মরুক্ষেত্রে পুরাতন মন্দিরাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

† Their external behaviour is full of urbanity; their customs are properly regulated. Their written characters and their mode of forming their sentences resemble the Indian model; the forms of the letters differ somewhat.—Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. II. p. 309.

জগতে একাকী অগ্রযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সাম্রাজ্য স্বপ্নকাহিনীতে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু তাহার কল্যাণে প্রাচ্যসভ্যতা কিরূপে ধীরে ধীরে প্রতীচ্য মানবসমাজকে সমুন্নত করিয়াছিল, তাহার নিদর্শন অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই।

মধ্য-এসিয়ায় বৌদ্ধ জ্ঞানসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, তাহা ধীরে ধীরে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরতীর পর্য্যন্ত ও পূর্ব্বে চীনসাম্রাজ্যের পূর্ব্বোপকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বেই পশ্চিমাংশে শ্রমণগণের প্রচারচেষ্টা সফল হয়; পূর্ব্বাংশে চীনসাম্রাজ্যের পুরাতন প্রথা ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রবল থাকায় সহসা নবধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা ছিল না। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে চীনসাম্রাজ্যেও শ্রমণগণের প্রচারচেষ্টা সফল হইতে আরম্ভ করে। যে সাম্রাজ্য নিতান্ত বিলাসলোলুপ আলস্যপরায়ণ পুরাতন মানবসমাজের আবাসভূমি বলিয়া চিরপরিচিত, সেই সাম্রাজ্য সহসা নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল। চীনদেশের ধর্ম্মপিপাসু নবদীক্ষিত শ্রমণগণ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তথ্য লাভ করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষের বিবিধ-পুণ্যতীর্থ-দর্শনে আত্মা পবিত্র করিবার আশায় মরুগিরি উত্তীর্ণ হইয়া দলে দলে ভারতবর্ষাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। নালন্দার বৌদ্ধবিদ্যালয়ে চীনদেশের ছাত্রবর্গের জন্য শ্রীগুপ্তনামধেয় মগধেশ্বর মন্দির ও আবাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সে সকল ছাত্র বা শ্রমণগণের নাম ও পরিচয় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চীনদেশের যে সকল তীর্থযাত্রীর নাম সুবিখ্যাত, তন্মধ্যে ফাহিয়ান ও হিয়াঙ্গথ্‌সঙ্গের নাম সভ্যসমাজে সর্ব্বত্র সমাদর লাভ করিয়াছে। ফাহিয়ান খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এবং হিয়াঙ্গথ্‌সঙ্গ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া বহুসংখ্যক গ্রন্থ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ফাহিয়ান সমুদ্রপথে ও হিয়াঙ্গথ্‌সাঙ্গ মধ্য-এসিয়ার স্থলপথে প্রত্যাবর্ত্তন করেন; কিন্তু ভারতবর্ষে আসিবার সময়ে উভয়েই স্থলপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহাদের ভ্রমণকাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিবিধ বিলুপ্ত তথ্যের আবিষ্কারকার্য্যে প্রভূত সহায়তাসাধন করিতেছে। খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দী হইতে সপ্তমশতাব্দী পর্য্যন্ত মধ্য-এসিয়ার বিবিধ সমুন্নত জনপদের শিক্ষা, সভ্যতা ও ধর্ম্মভাবের যে সকল বিবরণ এই সকল ভ্রমণকাহিনীতে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ভারতবর্ষের অকৃত্রিম গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। চীনসাম্রাজ্যে যে সকল বৌদ্ধশ্রমণ প্রচারকার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ফাহিয়ান ও হিয়াঙ্গথ্‌সঙ্গের সময়ে বৌদ্ধগ্রন্থানুবাদে সাহায্য করিবার জন্য যে সকল শ্রমণ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহারও কাহারও নামমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়।

চীন, তাতার ও নেপালের সমবেত চেষ্টায় তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে তিব্বতীয় মানবসমাজের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় ছিল। প্রকৃতি সে দেশকে পৃথিবীর নরনারীর সাধুসঙ্গে চিরবঞ্চিত করিয়া তুষারাবৃত গিরি-

প্রাচীরে চিররুদ্ধ রাখিয়া কতকাল নীরবে অতিবাহিত করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তুষারের উপর তুষার! তাহার মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্রগ্রামের ক্ষুদ্রকুটীরে পশুচর্ম্মে গাত্রাচ্ছাদন করিয়া শরীররক্ষার্থ নিয়ত ব্যতিব্যস্ত তিব্বত-নিবাসী নরনারীর পক্ষে মানসিক-সমুন্নতি-সাধনের অবসর উপস্থিত হয় নাই। কোন-রূপে কথোপকথন পরিচালনা করিয়াই ভাষা পরিতৃপ্ত হইত; কখন কোন গ্রাম্যগীত রচিত হইয়া মুখে মুখে কুটীর হইতে কুটীরা-ন্তরে পরিভ্রমণ করিত;—সাহিত্য ছিল না; তাহাকে চিরস্থায়ী করিবার জন্য কোনরূপ অক্ষর বা লিপিকৌশলও আবিষ্কৃত হয় নাই। সমগ্র উপত্যকা নানা ক্ষুদ্রপল্লীতে বিভক্ত হইয়া নিয়ত সংগ্রামকোলাহলে শান্তিভঙ্গ করিত;—তাহার মধ্যে যথাসম্ভব সুখদুঃখ লইয়া তিব্বতনিবাসী জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া কোনরূপে মানবলীলা সংবরণ করিত। বৌদ্ধশ্রমণ সেই তুষারাবৃত অজ্ঞাত-রাজ্যে নগ্নপদে ভিক্ষাপাত্রহস্তে উপনীত হইবার পর সে দেশের কি মহাপরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে!

তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্রই তিব্বতীয় প্রথম নরপতি বলিয়া উল্লিখিত। কোন পুস্তকে তাঁহার খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ, কোন পুস্তকে বা পঞ্চম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার বংশ "স্বর্গীয়-সপ্ত-নর-পতি"বংশ বলিয়া কীর্ত্তিত। তাহার পর "পার্থিব-অষ্ট-নরপতি"বংশের অভ্যুদয় হয়। এই বংশের পর যে রাজবংশ প্রতিষ্ঠালাভ করে, তদ্বংশীয় তৃতীয় নরপতির শাসনসময়ে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে, তিব্বতে বৌদ্ধশ্রমণ প্রবেশলাভ করেন। প্রথম প্রচারচেষ্টা বিফল হইয়া যায়। এই চেষ্টা নেপাল হইতে আরব্ধ হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চতুর্থ নরপতির শাসনসময়ে চীন হইতে তিব্বতে চিকিৎসা ও গণিতবিদ্যা প্রচলিত হয়। ইঁহার পুত্র খৃষ্টীয় সপ্তম শতা-ব্দীর প্রারম্ভে সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার পর তিব্বতের নবজীবনলাভের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে অক্ষরশিক্ষার্থ ভারতবর্ষে সপ্তদশ তিব্বতীয় শিক্ষার্থী উপনীত হইয়া জনৈক ব্রাহ্মণ লিপিকর ও সিংহঘোষ-নামধেয় পণ্ডি-তের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই শিক্ষার্থিগণের দলপতির নাম সম্ভোট। তিনি কাশ্মীরপ্রচলিত নাগরাক্ষরও শিক্ষা করিয়া কয়েকখণ্ড বৌদ্ধগ্রন্থের অনুবাদ লইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। লিপিকৌশল প্রচলিত হইলে, তিব্বতীয়গণ বহুযুগের জড়-স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, প্রবল উৎসাহে বৌদ্ধ-গ্রন্থের অনুবাদকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, অল্প-দিনের মধ্যেই বিপুল সাহিত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। একালের জাপানের ন্যায় সেকালের তিব্বৎ অতি অল্পকালের মধ্যেই সমু-ন্নতিলাভে কৃতার্থ হইয়াছিল।

যে সকল বৌদ্ধশ্রমণের অধ্যবসায়ে তিব্বতের সমুন্নতি সাধিত হয়, তাঁহারা এ-কালের লোক হইলে, তাঁহাদের নাম ও কীর্ত্তি-কলাপ সভ্যজগতে চিরস্মরণীয় হইত। তিব্ব-তের রাজা নেপাল ও চীনদেশের রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করায়, তিব্বতের উন্নতিলাভের পথ আরও সহজ হইয়াছিল। এই সময়

পশুচর্ম্মের পরিবর্ত্তে সুচিক্কণ পট্টবস্ত্র তিব্বত-বাসীর পরিচ্ছদশোভা বর্দ্ধিত করিয়া বাণিজ্য-বিস্তারে ধনবৃদ্ধির পন্থা প্রদর্শন করে। ভারত-বর্ষ হইতে কুমার-নামধেয় শ্রমণ, নেপাল হইতে মঞ্জুশ্রী, কাশ্মীর হইতে তবুত ও গণুত এবং চীনদেশ হইতে মহাদেব আসিয়া এই সময়ে তিব্বতের শিক্ষাকার্য্যে উৎসাহদান করেন।

খৃষ্টীয় অষ্টমশতাব্দীর প্রারম্ভে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকতর সমুন্নতি সাধিত হইয়াছিল। খোটান হইতে শ্রমণগণ আসিয়া তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচার করেন, ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধগুহ ও বুদ্ধশান্তি নামধেয় অধ্যাপকদ্বয় তিব্বতে আমন্ত্রিত হইয়া গ্রন্থানুবাদে নিযুক্ত হন এবং চীনসাম্রাজ্য হইতে নানা গ্রন্থ তিব্বতে আনীত হইয়া অনুবাদিত হইতে আরম্ভ করে। এই শতাব্দীতে শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব, আনন্দ ও কমলশীল প্রভৃতি ভারতীয় বৌদ্ধশ্রমণগণের তিব্বতে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত থাকিবার বিবরণ তিব্বতীয় বৌদ্ধসাহিত্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কাশ্মীর হইতে পশ্চিমাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রহ্মদেশ হইতে পূর্ব্বাঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। শাক্যসিংহের জীবিতকালেই ব্রহ্মে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা কিয়ৎপরিমাণে প্রচারিত হইয়াছিল। তৎকালে ভারতবর্ষের লোকে বাণিজ্যার্থ যে সকল দ্বীপে ভ্রমণ করিত, সেখানেও ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল।

যাহারা বহুকাল সমুদ্রযাত্রা পরিত্যাগ [ক]রিয়া ক্রমে সমুদ্রযাত্রাকে জাতিনাশের কারণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা যে একদা সমুদ্রপথে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপমণ্ডলে বাণিজ্যোপলক্ষে গমনাগমন করিয়া সেই সকল অনার্য্য জনপদে সভ্যতা-বিস্তার করিয়াছিল, তাহা এখন ভারতবর্ষের লোকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা কোন্ পুরাকালে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু খৃষ্টাবির্ভাবের অন্তত পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেও যে ভারতবর্ষের লোকে বাণিজ্যার্থ সমুদ্রপথে বহুদূর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিতেন, বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধশ্রমণগণের প্রথম নেতা কাশ্যপ, দ্বিতীয় নেতা আনন্দ, তৃতীয় নেতা শাণবাসিক,—তাঁহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাণবাসিক একজন ধনপতি বণিক্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বাণিজ্যোপলক্ষে দীর্ঘকাল সমুদ্রপথে পর্য্যটন করিবার সময়ে ভগবান্ শাক্যসিংহ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। শাণবাসিক স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গুরুদেবের দেহত্যাগের বৃত্তান্ত অবগত হন এবং সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রয় গ্রহণ করেন। সার্দ্ধ-দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে গমনাগমন করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল শাণবাসিকের নাম এইরূপে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত হইয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছে।

শ্রমণগণ মধ্য-এসিয়ার নানাস্থানে যে সকল বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত জনসমাজকে বিবিধ বিদ্যায় অলঙ্কৃত করিয়া সভ্যতামার্গে সমুন্নত করিয়া-

ছিলেন, তাহাদের বংশধরগণই কালে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এসিয়া হইতে আফ্রিকা এবং আফ্রিকা হইতে ইউরোপে রাজ্যবিস্তার করিবার সময়ে নব্য ইউরোপের জ্ঞানবিস্তারের সহায়তাসাধন করে।* সুতরাং ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও, ইউরোপীয় সমুন্নতির প্রথম সোপানে পরোক্ষভাবে ভারতীয় শ্রমণগণের জীবনগত প্রচারশ্রম যে কিয়ৎপরিমাণে বর্ত্তমান ছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস আলোচিত হইলে, কালে এই সকল তথ্য সমগ্র সভ্যসমাজে মুক্তকণ্ঠে স্বীকৃত হইবে; জর্ম্মান্ অধ্যাপকগণের তথ্যানুসন্ধানকৌশলে তাহার পূর্ব্বসূচনা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে!

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

থিয়েটার।

নাটক এ দেশে নূতন নহে, কিন্তু নাট্যালয় নূতন। পুরাকালে রাজাদের প্রাসাদে নাটক অভিনীত হইত, ইদানী ধনীর ঘরে যাত্রা হইত। ইংরাজদিগের দেখাদেখি যখন এ দেশে থিয়েটারের সৃষ্টি হইল, তখন কাজে-কাজেই নাট্যগৃহ নির্ম্মিত হইল। সেকালের নাটক কিংবা যাত্রা সকল আসরে অভিনয় করা যাইত, কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গমঞ্চ, পট প্রভৃতি আসিল, অভিনয়কৌশলের সহিত পটাদি পরিবর্ত্তন মিলিত হইল। থিয়েটারও প্রথমে সখের হয়; প্রথম-প্রথম তাহাতে দেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিতেন। ক্রমে থিয়েটার ব্যবসা হইয়া দাঁড়াইল। তাহাতে নিন্দার কিছু দেখি না, কারণ পেশাদার না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় না। দর্শকের পক্ষে পয়সা দিয়া দেখিলে ভালমন্দ বিচার করিবার অধিকার বাড়ে। মধুসূদন দত্তের নাটক লইয়া আমাদের দেশে থিয়েটারের আরম্ভ। তাহার পর বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ নাটকাকারে ভাঙিয়া এবং দীনবন্ধুর নাটক লইয়া থিয়েটার জাঁকিয়া উঠিল। জাঁকিয়া উঠিবারই কথা, কারণ এরূপ উৎকৃষ্ট নাটকাবলীর সর্ব্বত্রই সমাদর হয়। ক্রমে ছোট ছোট গীতিনাট্য রচিত হইল, শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের মার্জ্জিত ও উচ্চ অঙ্গের নাটকগুলি প্রচারিত ও অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। যাত্রাকে একপ্রকার বিদায় করিয়া দিয়া থিয়েটার তাহার আসনে জমকাইয়া বসিল।

বঙ্গদেশের নাট্যালয়ের ইতিহাস লিখিবার ইচ্ছা আমার নাই, এবং সে ইতিহাস এত আধুনিক যে, তাহার জন্য পুঁথিপাজি হাৎড়াইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে থিয়েটারের ক্রমোন্নতি না হইয়া কেবল অবনতি হইতেছে কেন?

---

* এ বিষয়ে যে সকল ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা "ভারতীয় জ্ঞানসাম্রাজ্য" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রকাশিত হইবে।

এ কথাটা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত, কেন না, থিয়েটারের সঙ্গে সমগ্র জাতির সম্বন্ধ আছে। থিয়েটার শুধু রঙ্গালয় নয়, শিক্ষালয়। আগে যাত্রার দলে মিশিয়া অনেক ছেলে বিগড়াইয়া যাইত; এখন থিয়েটারের জন্ম কত ছেলের সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা কি কাহাকেও বলিতে হইবে? নাট্যালয়ের শিক্ষা বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিরোধী হইল কেন? অল্পকথায় তাহা বলিতেছি।

যাত্রায় ও থিয়েটারে একটা গুরুতর মৌলিক প্রভেদ। যাত্রা সখের হোক বা পেশাদারি হোক, যাত্রায় স্ত্রীলোক নাই, কোনকালে ছিল না। বালকেরা স্ত্রীলোক সাজিত। নির্ব্বাচন সমাজের অবস্থার অনুযায়ী হইয়াছিল। স্ত্রীলোক লইলে যাত্রা খেমটায় গড়াইবে জানিয়া যাত্রার দলপতিরা স্ত্রীলোককে দলে লইতেন না। কিন্তু যখন থিয়েটার পেশা হইল, তখন আর স্ত্রীলোক নহিলে চলে না। যদি বিলাতের মত সমস্তই যথাযথ করিতে হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের পার্ট পুরুষ অথবা পুরুষশিশু কেমন করিয়া অভিনয় করিবে? আপত্তি করা যাইতে পারিত যে, এ দেশে স্ত্রীলোকে ঘরের বাহির হইতে জানে না; আগে তাহাদিগকে লেখাপড়া শেখাও, পথে-ঘাটে-সমাজে বাহির কর, তাহার পর না হয় রঙ্গমঞ্চে তুলিও। সে আপত্তি শোনে কে? থিয়েটারযাত্রীদিগের মনে কোন দ্বিধা হইল না। সুতরাং যে শ্রেণীর স্ত্রীলোক নটী সাজিতে পারে, তাহারাই আসিল। যাহারা রাজপথের পণ্যবীথিকায় দাঁড়াইয়া থাকে, তাহারাই রঙ্গমঞ্চের দীপমালার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের পদমর্য্যাদা বাড়িল বৈ কমিল না, কিন্তু সেই এক বিষম অমঙ্গলের সূত্রপাত হইল।

হইল কি? থিয়েটারে পূর্ব্বে লোকে অভিনয় শুনিতে যাইত, নাট্যকলা দেখিতে যাইত। নৃত্যগীতের সাধ হইলে স্থানান্তরে যাইত। অভিনেতাদিগের গুণাগুণ সর্ব্বত্র বিচারিত হইত, অভিনেত্রীদিগের কথা প্রায় শুনিতে পাওয়া যাইত না। পরিবর্ত্তন অতি দ্রুত ঘটিতে লাগিল। নাটকে গীতের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নটীদিগের নৃত্যকলা দেখিয়া দর্শকেরা মুগ্ধ হইতে লাগিল। দীনবন্ধুর নাটক পুরাতন হইয়া উঠিল। বঙ্কিমের উপন্যাস পড়িতে ভাল লাগে, নাটকাকারে অভিনয় তত ভাল লাগে না। যে নাটক বা নাট্যগীতিতে কেবল রঙ্গরহস্য, ব্যঙ্গবিদ্রূপ, ও নৃত্যগীতের অক্ষয় উৎস, তাহাই দেখিবার জন্য দলে দলে লোক ভাঙে। বিলাতের থিয়েটারের উপমা আর কাহারও মনে রহিল না। সেখানে থিয়েটার, অপেরা ও ব্যালে, এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে যে আনন্দ উৎপাদন করে, এখানে একমাত্র থিয়েটারে সেই আনন্দের ত্রিধারা প্রবাহিত হইল— অবশেষে একবেণী হইয়া ব্যালেরূপী মেঘনামূর্ত্তি ধারণ করিল। হায় দীনবন্ধু-মধুসূদন! মধুকৈটভ আসিয়া আবার তোমাদের সিংহাসন অধিকার করিল। কোথায় গেল বঙ্কিমের ভাষা, দীনবন্ধুর রসিকতা! গানে, কথায়, ভঙ্গীতে এক নূতন ভাষার সৃষ্টি হইল। একটা বর্ণসঙ্কর, অতি কুৎসিত, অস্পৃশ্য, অশ্রাব্য ভাষা থিয়েটারের ভাষা

হইল। তাহাতে বাঙলার আদ্যশ্রাদ্ধ ও হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানী ভাষার পিণ্ডদান একত্রে সম্পন্ন হইল। সেই অদ্ভুত জারজ ভাষায় ভূরি ভূরি গীত রচিত হইল। যে হিন্দীভাষা এখন পর্য্যন্ত গায়কের অবলম্বন, যাহার ললিত-কোমল শ্রুতিমধুর পদাবলীর তুলনা নাই, সেই ভাষাকে কীচকরূপে বধ করিয়া তাহা হইতে উৎকট শ্রুতিপরুষ গীতধ্বনি নিঃসারিত হইতেছে! বালকেরা এই ভাষায় কথোপকথন বা গীত শ্রবণ করিলে মাতৃভাষা বিস্মৃত হয়।

সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটারযাত্রীর দলপরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বেকার সে রসগ্রাহী শিক্ষিত সম্প্রদায়কে আর থিয়েটারে দেখিতে পাওয়া যায় না। অশিক্ষিত ও শিক্ষার্থীতে এখন নাট্যালয় পরিপূর্ণ। যে সকল বালকদিগের নাচমোজ্‌রা দেখিবার কখন সুযোগ হইত না, তাহারা অবলীলাক্রমে ইচ্ছামত থিয়েটারে বিকটহাবভাবযুক্ত নৃত্যাদি দর্শন করিয়া থাকে! যদি কাহারও মনে এমন দুরাশা হইয়া থাকে যে, এই দেশের থিয়েটারে মিসেস্ সিডন্স্ অথবা এলেন টেরীর মত অভিনেত্রীর আবির্ভাব হওয়া বিচিত্র নহে, তবে তিনি সহজেই চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিতে পারেন।

আমাদের নাট্যালয়ের ক্ষুদ্রজীবনের আর একটি যুগের উল্লেখ না করিলে প্রকৃত কথাই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। ইতিপূর্ব্বে যে বর্ত্তমান ঘোর কলিযুগের কথা বলিলাম, উক্ত যুগ উহার পূর্ব্বগামী। সেই যুগকে সত্য, ত্রেতা, কিংবা দ্বাপর নামে অভিহিত করা কর্ত্তব্য, তাহাও বিচার্য্য। আপাতত তাহার নাম ধর্ম্মযুগ দেওয়া যাইতে পারে। সেই সকল নাটকের রচয়িতা স্বয়ং একজন বিখ্যাত অভিনেতা। সীতার বনবাস, বুদ্ধদেব, চৈতন্যলীলা প্রভৃতি এই শ্রেণীর নাটক। যখন এই সকল নাটক প্রথমে অভিনয় হইতে আরম্ভ হইল, তখন শ্রোতা ও দর্শকদিগের মধ্যে অভিনব উৎসাহ দেখা দিল। লোকে মনে করিল, নাট্যজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু গোড়াতেই বিষম গলদ্। সীতার বনবাসে লবকুশের পার্ট কোথায় বালকে অথবা তরুণ যুবকে অভিনয় করিবে, না স্ত্রীলোকে অভিনয় করিতে লাগিল! চৈতন্য স্ত্রীলোকে সাজিল! আশ্চর্য্যের কথা এই যে, দর্শকদিগের মনে অথবা সমাজে কাহারও মনে কোন দ্বিধা বা গ্লানি হইল না। প্রথমত যে অভিনয়-বিপর্য্যয় নিবারণ করিবার জন্য থিয়েটারে অভিনেত্রীর সমাগম হইল, সেই বিপর্য্যয় আরও দোষাবহ হইয়া উঠিল। যদি বালক স্ত্রীলোক সাজিলে রসভঙ্গ হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজিলে কি দোষের হয় না? মুণ্ডিতগুম্ফ শ্রীমান্ নদেরচাঁদ যখন দূতী সাজিয়া হাত নাড়িয়া গান করিত, তখন লোকের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিত; আর অলক্তকরাগরঞ্জিত শ্রীমতী জগদম্বা যখন কুশ, চৈতন্য কিংবা শ্রীকৃষ্ণের বেশে আসরে নামিত, তখন কি দর্শকের চক্ষে কিছুমাত্র বিসদৃশ ঠেকিত না? চৈতন্যের তুল্য মহাপুরুষের লীলা থিয়েটারে অভিনয়যোগ্য কি না, তাহাতেই গুরুতর সন্দেহ। মহম্মদের চরিত্র অভিনয় হইবার প্রস্তাব হওয়াতে মুসলমানেরা কিরূপ ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহা

কি কাহারও স্মরণ নাই ? শুধু এখানে কেন, ফ্রান্সে যখন ঐরূপ কথা হয়, তখন রূমের সুলতান আপত্তি করিয়া অভিনয় রহিত করিয়াছিলেন। যীশুখৃষ্টের চরিত্র থিয়েটারে অভিনয় করিলে কি খৃষ্টানেরা চুপ করিয়া থাকেন ? তাহার পর চৈতন্যের চরিত্র পুরুষে অভিনয় না করিয়া যখন স্ত্রীলোকে অভিনয় করিতে লাগিল, তখন এই ধর্ম্মগতপ্রাণ হিন্দু-জাতির হৃদয়ে কি কিছুমাত্র আঘাত লাগিল না ? এইজন্য নাট্যজগতের ধর্ম্মযুগ অধিক-দিন টিকিল না। লোকের মন অভিনয়ে আকৃষ্ট হয় নাই, অভিনেত্রীদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। বুদ্ধদেব কিংবা চৈতন্য-লীলার অভিনয় হইলে এখন আর থিয়েটারের দ্বারদেশে ঠেলাঠেলি হয় না।

থিয়েটারে আজকালকার অন্তঃসারশূন্য নাটকসকল অভিনীত হয় কেন, স্ত্রীলোককে পুরুষের পার্ট অভিনয় করিতে দেওয়া হয় কেন, জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর এই যে, লোকে যেমন চায়, তেমন পায়। আগে লোকে ঐতিহাসিক কি ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নাটক চাহিত, তাহাই পাইত। এখন লোকে রসবহুল নাটক চায়, সুতরাং তাহাই জোগাইতে হয়। পুরুষ স্ত্রীলোক সাজিলে ভাল দেখায় না, কিন্তু স্ত্রীলোক পুরুষ সাজিলে, চৈতন্য কিংবা শ্রীকৃষ্ণ সাজিলে দেখিতে বেশ মোলায়েম হয়, লোকে দেখিয়া খুসী হয়। রাত্রে থিয়েটার দেখিয়া যদি লোকের বিরক্তি হয়, তাহা হইলে দিনেও তাহাদিগকে দেখাইতে পারা যায়। চরম সীমায় থিয়েটার যে কোথায় পৌছিবে, তাহা কল্পনা করিতে আশঙ্কা হয়। দেখিয়া-শুনিয়া এখন মনে হয়, আমাদের দেশী যাত্রা ছিল ভাল ; বিদেশী থিয়েটার মহা অনর্থ ঘটাইতেছে।

থিয়েটারের অবনতি যে লোকের রুচি-বিকারের সঙ্গে সঙ্গে সাধিত হইয়াছে, এ কথা আর স্বীকার করি না। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ-প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত "প্রতাপাদিত্য" নাটকের অভিনয় দেখিলে আর সে ভ্রম থাকে না। ইহাতে ভাষার প্রতি অত্যাচার নাই, হিন্দীর মস্তকচর্ব্বণের ঘটা নাই। নৃত্য-গীতের আড়ম্বর বড় নাই। থিয়েটারে যেমন নাটক অভিনয় হওয়া উচিত, যেমন পূর্ব্বে হইত, সেইরকম। অথচ লোকে লোকারণ্য। প্রতি রাত্রে শত শত লোক স্থান না পাইয়া ফিরিয়া যায়। স্ত্রীলোকে পুরুষ সাজে না —কেবল একটি ছোট বালিকা বালক সাজে। স্ত্রীলোকে প্রতাপাদিত্য সাজিলে কেমন মানাইত ? এ কথায় যদি কেহ রাগ করেন, তাহা হইলে বলিব যে, স্ত্রীলোক যদি চৈতন্য সাজিতে পারে, তাহা হইলে প্রতাপা-দিত্য সাজিলে ক্ষতি কি ? যাহাই হউক, প্রতাপাদিত্যের অভিনয়ে কোনরূপ রীতি-বৈপরীত্যের প্রয়োজন হয় নাই। তথাপি থিয়েটারে এত লোকসমাগম, এরূপ আগ্রহ, উৎসাহ ও সহানুভূতি অনেকদিন দেখিতে পাওয়া যায় নাই। যাঁহারা বহুকাল থিয়ে-টার দেখেন নাই, যাঁহারা ক্ষুব্ধ হইয়া সে পথ ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও প্রতাপা-দিত্য দেখিয়া প্রীত হইয়াছেন। পেট্রিয়টিস্‌ম্ প্রতাপাদিত্যের প্রধান আকর্ষণী শক্তি ; সে মোহিনী কতদিন থাকিবে বলিতে পারি না। কিন্তু সে মোহিনী উৎকৃষ্ট, না বিভ্রমবিলাসযুক্ত সঙ্গীতলাস্যের মোহিনী উৎকৃষ্ট ? অনেকে

সেই নৃত্যগীত ও সেই উৎকট ভাবাভঙ্গীতে শ্রান্ত হইয়া প্রতাপাদিত্যের অভিনয় দেখিয়া কি কিছু আনন্দ অনুভব করে নাই? ফল কথা এই যে, থিয়েটারের অবনতির কারণ দর্শকেরা নহে—নাটকরচয়িতাগণ ও থিয়েটারের অধ্যক্ষগণ। যে শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা থিয়েটারে অভিনয় করে, তাহাদিগকে মহচ্চরিত্র মহাপুরুষগণের অভিনয় করিতে দেখিলে, হয় অত্যন্ত বিরক্তি জন্মায়, না হয় মনের স্নায়ু দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, মনের ও কল্পনার আদর্শসৃষ্টিশক্তি শিথিল হইয়া পড়ে। এই সকল দৃশ্য ও অনবরত নৃত্যগীতের উচ্ছ্বাস যে বিদ্যালয়ের বালকদিগের পক্ষে কিরূপ অনিষ্টকর, তাহা অনেকে প্রত্যক্ষ অবগত আছেন। পূর্ব্বে যে সকল নাটক অভিনীত হইত, অথবা প্রতাপাদিত্য যে শ্রেণীর নাটক তাহাতে ব্যবসায়ের লাভ এবং দেশেরও কিছু মঙ্গল হয়। যাঁহারা জঘন্য অথবা কুৎসিত নাটক প্রণয়ন বা অভিনয় করেন, তাঁহারা সমাজের নিকট অত্যন্ত অপরাধী। তাঁহাদিগকে শাসন করা সমাজের কর্ত্তব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।

বুলাই।*

(১)

কোথা হ'তে পেলি তুই এই রূপরাশি,
ভাবিয়া না পাই!
সত্য-শিব-সুন্দরের শুভ্র শুভহাসি,
তুই কি বুলাই?

(২)

হুহু করে প্রাণ যার,—দুঃখী যেই জন,
বড়ই উদাসী,
সে-ও হেসে ফেলে, হেরে ও চাঁদবদন
অয়ি রূপরাশি!

(৩)

বেয়াড়া সংসারী যেই, হিংসানল জ্বেলে
জ্বলে' হয় সারা,
তারো প্রাণে শান্তি আসে, তোর কাছে এলে,
লো রূপ-ফোয়ারা!

* বুলাই দশমাসের একটি কচি মেয়ে।

(৪)

জ্যোতির জ্যোতির কোলে তুই ছিলি বুঝি
সুধায় বিভোর ?
সে আনন্দে হুঁস্ নাই !—চক্ষু দুটি বুজি
বুলাই-চকোর !

(৫)

জোছনা-বরণে ছোপা, ও অঙ্গ—পরশে,
তাই কি, বুলাই,
প্রাণ জুড়াইয়া যায় ? নিবিড় হরষে
চিদানন্দ পাই !

(৬)

কর্ম্মনাশা-পাপনদী গঙ্গারে পাইল,—
মুক্ত—অভিশাপে !
কল্যাণি রে, ও শুভাঙ্গ হরে নিল, হরে নিল,
মোর পাপতাপে !

(৭)

একি ! একি ! ফুলে ফুলে ফুলন্ত ভুবন !
সচন্দ্র সলিলে
শত চন্দ্র !—কুঞ্জে কুঞ্জে কোকিলকূজন !
কি শোভা নিখিলে !

(৮)

একি এ জ্যোতির বন্যা ! বিশ্ববিমোহন
একি হেরি রূপ !
হাসিছেন হরি !—চুম্বি সে রাঙা চরণ
গুঞ্জরে মধুপ !

(৯)

চরণসরোজগন্ধে আনন্দে অধীর
আমিও আকুল !
সৌন্দর্য্যনির্ঝরে হেরি, চক্ষে বহে নীর
বুলাই, বুলবুল !

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

ক্ষীরের পুতুল।*

শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের কৃপায় বাঙালীর ছেলেরা একটা পড়িবার মত সাহিত্য পাইয়াছে; বঙ্গসাহিত্যের মহারথিগণ শিশুগুলির জন্য তেমন নাম করিবার যোগ্য কোন পুস্তক রচনা করেন নাই। কিছু পূর্ব্বে 'শিশুপাঠ্য' শুনিলেই অনেকে অবজ্ঞার সহিত বই ফেলিয়া দিতেন;—শিশুপাঠ্য বইগুলি প্রাচীন ব্যক্তিদের অবজ্ঞার সামগ্রী ছিল। এদিকে আবার "সুকুমারমতি বালকবালিকাগণ"ও সেই সকল নীতিপূর্ণ সন্দর্ভের সঙ্গে বেত্রাঘাতের একটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক কল্পনা করিয়া সেই সকল পুস্তক, এমন কি পুস্তকমাত্রই, ভয়ের চক্ষে দেখিত। এই সকল পুস্তকের নীতিকথা এবং শুষ্ক উপদেশও চড়-কিল এবং কানমলার মতই ছেলেদের নিকট পীড়াদায়ক হইত। অনেক স্থলে সরস্বতীর সঙ্গে বালকের চিরশত্রুতার সৃষ্টিপক্ষে এই নীতিপুস্তকগুলি আশাতীতরূপে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিল।

যোগীন্দ্রবাবু শিশুমণ্ডলীর হাতে ছবি ও গল্পপূর্ণ পুস্তক প্রদান করিয়া তাহাদের নিকট দেবী ভারতীকে অনেকপরিমাণে মনোজ্ঞ করিয়াছেন;—তাহারা এখন নির্ভয়ে তাঁহার পদে ফুলের অঞ্জলি দিতে পারিবে, এমন মনে হয়। আমাদের ছোট রাজ্যে এখন চিনির রথ, চীনে পুতুল ও হাসি-খুসীর বই—ইহাদের মধ্যে একটা ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পড়িয়া গিয়াছে। "কি নিবি" বলিলে অনেক জন্মপেটরোগা পেটুক ছেলেও চিনির রথ হইতে সতৃষ্ণ দৃষ্টি ফিরাইয়া 'হাসি ও খেলা' লইতে ছোটে এবং বঙ্গের গৃহে গৃহে হারাধনের সাতপুত্রের কোন্‌টির কি ভাবে অকালমৃত্যু হইয়াছে—তাহা লইয়া প্রায়ই কোমলকণ্ঠের বাদপ্রতিবাদ শোনা যায়। এরূপে স্থলে অনেক সময়েই দেখা যায়, কোন মুখর বালক কবিতাটির সমস্ত নির্ভুল আবৃত্তি করিয়া তর্কের সুমীমাংসা করিয়া দিতেছে।

কিন্তু তথাপি মনে হয়, যোগীন্দ্রবাবুর উপাখ্যানগুলি অনেকটা ইতিহাসের ছন্দে রচিত; কথাগুলি একটুও এঁকিয়া-বেঁকিয়া পড়ে নাই, বর্ণিত বিষয়ের সকল অংশেরই অর্থ করা যায়,—বর্ণিত চরিত্র মেষই হউক, আর গর্দ্দভ কি মনুষ্যই হউক—তাহাদের প্রত্যেকটি কোণ বড় স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে,—উহাতে কথাগুলির আদ্যন্তবন্ধন কোন স্থানেই টুটিয়া পড়ে নাই; উপন্যাসে যেমন কল্পিত বস্তুকে সত্যবৎ দেখাইতে চাহে—এই বহিগুলি কতকটা সেই ছন্দে রচিত। যোগীন্দ্রবাবু ইংরেজী আদর্শেরই বিশেষভাবে অনুকরণ করিয়াছেন। যেখানে প্রাচীন ছড়াগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে—সেখানে তাঁহার মৌলিকতা কিছু নাই, কিন্তু যেখানে কোন গল্প বা আখ্যান তিনি রচনা করিয়াছেন—সেখানে

* শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ২০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, মজুমদার লাইব্রেরিতে প্রাপ্তব্য।

উহা প্রকৃত জীবনের কথার আলোতে একটু বেশী পরিষ্কার দেখাইতেছে—আর-একটু সন্ধ্যার আবছায়া ঘনীভূত হইলে যেন বালক-বুদ্ধির জন্য প্রকৃষ্টতর নীড় প্রস্তুত হইতে পারিত। বহিগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক-বয়স্ক ছেলেদের পক্ষে বেশ উপযোগী, কিন্তু তাহাদের জন্য ও তাহাদের কনিষ্ঠদের জন্য এই সকল পুস্তকের অপেক্ষাও অধিকতর উপযোগী একখানি পুস্তকের পরিচয় দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

যাহার সকল কথার অর্থ হয় ও সামঞ্জস্য আছে, এমন-সকল উপাখ্যান শিশুদিগের প্রতিভার ঠিক অনুকূল কি না, সন্দেহ। তাহারা যে রাজ্যের লোক, সেখানে সত্য ঘটনার তীব্র জ্যোতিতে সকল জিনিষ বিকাশ পাইয়া উঠিলে চক্ষুর কৌতূহল ফুরাইয়া যায়, একটু নিবিড়তা দেখিলে অদৃশ্য-দর্শনের উৎকণ্ঠা তাহাদের মনকে সজাগ করিয়া তোলে। এই কল্পনাপ্রবণতা নষ্ট করিয়া তাহাদের কোমল প্রকৃতিকে সাংসারিক চিত্রের খুটিনাটিতে অভ্যস্ত করিলে, তাহাদের কবিত্বের মূল শুকাইয়া যাইবে। প্রবীণ-বয়সে কল্পনাশক্তি সংযত হইয়া অন্তর্দৃষ্টির সহায় হয়। এই কল্পনার শিকড়টি শিশুপ্রকৃতি হইতে যদি তুলিয়া ফেল, তবে বড় হইলে শিশুর অতিরিক্তমাত্রায় সংসারী ও কতক পরিমাণে অন্তঃকরণশূন্য হইয়া পড়িবার আশঙ্কা।

এইজন্য সেই কল্পনাময়ী প্রকৃতির অনুকূলে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত—তাহাতে উহারা স্বাভাবিক আমোদ পায়, অথচ এমন কোন ধারণা বদ্ধমূল হইতে দেওয়া উচিত নহে, যাহাতে অসত্যের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া শেষে বিকাশ পাইতে পারে;—ছেলেভুলান ছড়ার মধ্যে যে কবিত্বমিশ্র নিরর্থ কল্পনার মুক্ত পরিবেষণ দৃষ্ট হয়—তাহাতে শিশু-প্রকৃতি পুষ্ট হয়, অথচ শিশু বাড়িয়া উঠিলে বুদ্ধি সতেজ হওয়ামাত্র সে কল্পনাগুলি কুয়াশার মত কাটিয়া যায়, তাহাতে হৃদয়ে কোন স্থায়ী দাগ পড়ে না—কিন্তু প্রকৃতিটি ভাব-প্রবণ ও সুকুমার হইয়া থাকে।

"ক্ষীরের পুতুল" শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় রচনা করিয়াছেন। ইহার আখ্যানাংশ এমন চিত্তাকর্ষক হইয়াছে যে, কোন শিশুই ইহা পড়িতে বা শুনিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারিবে না;—ছেলেদের পিতাদের পক্ষেও সেই কথা। কিন্তু ইহার এমন একটা বিশেষত্ব আছে, যাহাতে পুস্তকখানিকে আমরা সর্ব্বতোভাবে শিশুপ্রকৃতির অনুকূল ও দেশের স্থায়ী সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য মনে করি। উহার অনেক স্থান আছে—মাথা খুঁড়িয়াও যাহার কোন অর্থ হইবে না, অথচ গল্পের মধ্যে এমন ভাবে তাহারা জুড়িয়া আছে যে, শিশুগুলি উহা পড়িলে কল্পনার দেশের অনেক অসীম ও আশ্চর্য্য চিত্র তাহাদের মনের ভিতর আনাগোনা করিতে থাকিবে। শিশুগণ শয্যায় শুইয়া মাতামহী বা পিতামহীর যে সকল ছড়া শোনে—সেই নিরর্থ, অসংলগ্ন, আজগুবি কথায় তাহারা কেমন-একটা নির্ম্মল আনন্দ পাইয়া উৎসাহ বোধ করে—উহা তাহারা যেমন বোঝে, আমরা তেমন বুঝি না—কারণ উহাতে বুঝিবার কিছু নাই, অথচ শিশুর সমস্ত অন্তর্নিহিত কৌতূহল, কল্পনা ও চেষ্টার উদ্রেক করিয়া দিতে উহারা

অসামান্যরূপে সার্থক। সেই সকল ছড়া পড়িয়া আমাদের মনে হয়—যেন কোন একটা কথা ভালরূপে বলিবার সময় তাহার সমস্ত বাঁধনগুলি ছিঁড়িয়া গিয়াছে—কথাগুলি পড়িয়া আছে, তাহা যুক্ত হইয়া সার্থক হয় নাই; শিশুগুলির কল্পনা ঠিক সেই লুপ্ত বাঁধনগুলির উদ্ধার করিতে পারে; যাহা আমাদের নিকট অসম্পূর্ণ বা অসংলগ্ন, তাহাদের নিকট তাহাতে একটা সমগ্র-সুন্দর আশ্চর্য্য ও কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র উন্মোচন করিয়া দেয়। একটা অসীম রাজ্য, যাহার প্রত্যন্ত-প্রান্তটি ইন্দ্রিয়ের ধারণাযোগ্যভাবে কঠোর হইয়া উঠে নাই—যাহার সীমা মানচিত্রের কোন নির্দ্দিষ্ট রেখায় পর্য্যবসিত নহে—যাহার বর্ণ কোন চিরদৃষ্ট দীপ্তিতে ভাতিয়া উঠে না—সুন্দর অথচ নির্দ্দিষ্ট নহে, গতিশীল অথচ স্থানের গণ্ডীতে নিয়মিত নহে—স্পষ্ট অথচ সন্ধ্যালোকের কোমল ছায়ায় ও কুহেলিপাতে একটু নিবিড়, এইরূপ এক অচিন্তিতপূর্ব্ব জগতের চিন্তা শিশুর মনে উদ্রেক করিতে সেই ছড়াগুলি বিশেষরূপে উপযোগী। এইভাবের কল্পনা গাঢ় হইয়া প্রবীণবয়সে বিশ্বনিয়ন্তার অসীমত্বের আভাস দিতে বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়।

সমস্ত গ্রাম্য ছড়াগুলির প্রতিভা আয়ত্ত করিয়া অবনীন্দ্রবাবু তাঁহার "ক্ষীরের পুতুল" রচনা করিয়াছেন। উহা এদেশের বালকগণের যেরূপ উপযোগী হইয়াছে, অন্য কোন ছবি বা গল্পের বই তদ্রূপ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। ইহার রচনার ভঙ্গীতে দিদিমার সুরটি ধরা দিয়াছে—তাহা এত মধুর যে, পড়িবার সঙ্গে শৈশবের স্মৃতি উজ্জীবিত না হইয়া যায় না—তেমনই বাহুল্যপূর্ণ কথার অন্ধিসন্ধি—একটা কথা বিনাইয়া নানারূপে বলিবার ভঙ্গী—উহা দিদিমার স্নেহমধুর ধরণটি এমন কৌশলে, এমন সহজভাবে অনুকরণ করিয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন নগ্ন শিশুটির কোমল কপোলে লোলিতচর্ম্ম জীর্ণহস্ত রাখিয়া স্নেহের সুরে তিনি বলিয়া যাইতেছেন এবং ঔৎসুক্যে শিশুর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতেছে—দিদিমা একটু থামিলেই প্রমাদ। এই পুস্তকের প্রত্যেক অংশই উক্ত গুণগ্রামবিশিষ্ট, না বাছিয়া দুইটি স্থল নমুনাস্বরূপ নিম্নে দিলাম।

(১) ছোটরাণী সাতমহল বাড়ীর সাততলার উপর সোনার আয়না সামনে রেখে, সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে, সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টীপ্ পর্‌ছেন, কাজললতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পর্‌ছেন, রাঙা পায়ে আল্‌তা দিচ্ছেন।

(২) তখন মানিনী ছোটরাণী আটহাজার মাণিকের আটগাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশগাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা সখের শাড়ী ধুলোয় ফেলে বল্লেন—"ছাই গহনা, ছাই এ শাড়ী—কোন্ পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ চুড়ি গড়ালে? মহারাজ কোন্ দেশের ধুলোবালিতে এ মল গড়ালে? ছিছি, এ কা'র বাসি মুক্তোর বাসি হার, এ কোন্ রাজকন্যার পরা শাড়ী? দেখ্‌লে যে ঘৃণা আসে, পর্‌তে যে লজ্জা হয়! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা শাড়ী,—পরা গহনায় আমার কাজ নাই।"

এই সমস্ত কথার উপর আমাদের শৈশবে-শ্রুত স্বপ্নরাজ্যের আলোটুকু পড়িয়া চিত্রগুলিকে নানা বিচিত্র বর্ণে ফলাইয়া তুলিতেছে। এক সময় এই সকল কথায় কত আশ্চর্য্য ও সুন্দর ছবিই মনে জাগিয়া উঠিত, কোন কথায় বা ভয়বিহ্বল হইয়া গল্পকারিণীর বক্ষে জড়সড়ভাবে লুকাইয়া পড়িতে হইত, কোন কথায় বা গল্পোক্ত নায়কের আশ্চর্য্যভাবে উদ্ধারের সংবাদে আমাদের দেহে প্রাণ আসিত। ক্ষীরের পুতুলের প্রধান নায়ক বানরটি বরকে লইয়া বিবাহবাসরে উপস্থিত হইতে দেরি করিতেছে—বানর বুঝি বরকে আনিতে পারিল না, এই আশঙ্কায় রাজা চটিয়া গিয়াছেন; তাহাকে কাটিয়া ফেলিতে হুকুম দিবেন, ক্ষুদ্র পাঠকের বুক সেই ভয়ে ভাঙিয়া পড়িবার মধ্যে। তখন উৎফুল্ল হইয়া খোকাবাবুরা শুনিতে পাইলেন, "এমন-সময় -গুরুগুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ-পোঁ বাঁশী বাজিয়ে, টক্‌বক্ ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝক্‌মক্ আলো জ্বালিয়ে বানর বর নিয়ে এল।" এ সব খোকাবাবুদেরই ভাষা, কিংবা যে ভাষা শুনিলে তাঁহারা বড় মজা পান—ইহা ঠিক সেই ভাষা, ইহার সম্বন্ধে আর-কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। আখ্যানটি শিশুদিগের শুনিবার যোগ্য সুখ, দুঃখ, হিংসা ও ক্ষমা পূর্ণ অবস্থার ভিতর দিয়া কৌতূহলের দীপশিখা এক ভাবে জাগ্রত রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে; যে স্থানে ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বুলাইয়া তাহাকে দিব্যচক্ষু দিলেন—ষষ্ঠীতলার সে আশ্চর্য্য দৃশ্য দিব্যচক্ষুপ্রাপ্ত সঞ্জয়ের বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের চিত্র হইতে বালকগণের নিকট ঢের বেশী উজ্জ্বল। যতগুলি গ্রাম্যছড়া, সবগুলি সেই স্থলে অবনীবাবুর লেখনীকে উপাদান জোগাইয়াছে। বানর ষষ্ঠীতলায় ছেলেমেয়েদের যে কাণ্ড দেখিতে পাইল, তাহা অতীব আশ্চর্য্য, অথচ পড়া শেষ করিয়া পাঠক বলিতে পারিবেন না কি দেখিলেন। কোন্ ছবির মাথায় কোন্ ছবি আসিয়া পড়িয়াছে, কোন্ ক্ষেতের ধান কাহার গোলায় গিয়াছে ঠিক নাই,—সত্যাসত্যের তর্ক, বিশ্লেষণের চেষ্টা সে স্থানে একান্ত পরাভব পাইবে, অথচ এমন মনোজ্ঞ চিত্র বালকগণের পক্ষে কল্পনা করা অসম্ভব। যাহারা সবটুকু না বুঝিয়া, সবটুকু না দেখিয়া ঢের বেশী বোঝে বা শোনে—এ তাহাদেরই রাজ্যের কথা, এখানে তাহাদের কোমল নিশ্বাসে হাওয়ার উপর ফুলের সৃষ্টি করে,—যুক্তি তর্কের দর্পকে সম-উচ্চারিত কোমলকণ্ঠের "খবরদার" শব্দ বাহিরে দাঁড় করাইয়া রাখে; এখানে 'তেপান্তর' নামক পৃথিবীর সীমানার বাহিরে একখানি অসীম মাঠ আছে, সেখানে "বনগাঁবাসী মাসি-পিসি খৈয়ের মোআ গড়েন।" যাহা-কিছু অসম্ভব, এ রাজ্যে তাহার সকলই সম্ভব;—অসীম সম্ভাবনা ও বিশ্বাসের বিশ্বজোড়া বিশ্রামক্ষেত্রে এখানে সমস্ত দ্রব্য পুষ্ট হইতেছে—কোন যুক্তিতর্কের প্রখর তেজে ভাবগুলি শুকাইয়া আধমরা হইয়া যায় নাই। তাই—"সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক—ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে একপাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পোণ কড়ি গুণ্‌তে গুণ্‌তে মাছ ধর্‌তে এসেছে; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে, জেলেদের

ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্চে।" কোন কথা নাই—অথচ একরাশ কথা, কোন বিষয়ের সংলগ্ন বর্ণনা নাই—অথচ একএকটি কথাই একএকটি চিত্র। ঠিক নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ গল্প শুনিতে হইলে বুদ্ধিকে বাঁধিয়া একদিকে চালাইতে হয়, আমাদের ছড়ার পাঠকগণের মনোযোগের উপর ততটা পীড়ন হইলে তাহারা ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িবে—তাই তাহাদের জন্য মাতৃহৃদয় বসিয়া-বসিয়া এই সকল ছড়া প্রস্তুত করিয়াছিল। উহাতে কতকটা সত্যের আলো দেখাইয়া আবার তাহা কল্পনার কুহকে নিবাইয়া ফেলা হয়, শিশুবুদ্ধি আবার সেই আলোটুকুর জন্য হামা দিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়—এইভাবে কৌতূহল জাগাইয়া ঐ সকল ছড়ার ভিতর পৃথিবীটা তাহাদের নিকট নানা বিচিত্র বর্ণে ফলিত হইয়া উঠে; কোন মহাপণ্ডিত সহস্র প্রতিভাবলে এই ছড়াগুলি নির্ম্মাণ করিতে পারিতেন না—ইহা মাতৃস্নেহের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এবং শিশুপ্রকৃতিপোষণের একান্ত উপযোগী। এত যে অবান্তর কথা, অসংলগ্ন প্রলাপ, তথাপি লক্ষ্য করিলে একটি জিনিষ ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্যে প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়—তাহা খোকাবাবুর জন্য মাতার ভালবাসা, কথাগুলির সর্ব্বত্র সেই স্নেহাতুর হৃদয়ের করুণার ছায়া পড়িয়াছে। "চাঁদমুখে রোদ পড়েছে"—"খোকাবাবু ক্ষিপ্ত হইয়া ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়াইয়া খেতে দিলেন" প্রভৃতি কথায় নানা দিক্ হইতে একই চিত্র প্রকাশিত হইয়া উঠিতেছে—স্নেহের পুত্তলী যেন ঘুম ভেঙে উঠে ঢুলঢুলে চোখে আমাদের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়িবেন, এইরূপ একটি চিত্রের ভাব সর্ব্বত্র মনে হয়। বানরষষ্ঠীতলায় যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিল, তাহা পল্লীর পল্লবচ্ছায়ায় স্নেহসারে স্থিত শিশুগণকে শান্ত করিবার জন্য আবহমান কাল হইতে অবলম্বিত উপায়—স্নেহপূর্ণ হৃদয় সর্ব্বদেশে এই উপায় আবিষ্কার করিয়া থাকে এবং দুধের বাটীর সঙ্গে সঙ্গে ইহারাও বালকপ্রকৃতি পোষণ করিবার জন্য ঘরে ঘরে আবশ্যক হয়। ক্ষীরের পুতুলের গল্পে সেই সকল মনোহর ছড়া জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। অবনীবাবু তাহা এমন কৌশলে গল্পে জুড়িয়া দিয়াছেন যে, বহিখানিতে যেন শিশুদেহের একটা কোমল স্পর্শ ও স্নিগ্ধ গন্ধ ব্যাপিয়া আছে। "ক্ষীরের পুতুল" সুওরাণী ও দুওরাণীর কথাসংক্রান্ত একখানি গল্পের বহি; ইহাতে অবনীবাবুর হাতের কয়েকখানি রঞ্জিত চিত্র আছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধে বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধসূত্রের পথ ধরিয়া চলিয়া—দুয়েরই উচ্চশিখরে সার্ব্বাত্মিক ঐক্যের কেন্দ্রস্থান রহিয়াছে, আর, সেই কেন্দ্রস্থান বা হিরণ্ময় কোষ পৃথিবীর মধ্যে কেবল মনুষ্যেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই তত্ত্বটির দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়া থামিয়া দাঁড়ানো হইয়াছিল; অতঃপর শাস্ত্র এবং যুক্তির মসাল ধরিয়া ঐ সাক্ষাৎ-লব্ধ তত্ত্বটির ভিতর-মহলের অন্ধিসন্ধিগুলা পর্য্যবেক্ষণ করা আবশ্যক। তাহারই এক্ষণে চেষ্টা দেখা যাইতেছে।

পঞ্চকোষ।

বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে কেমন যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মিল, তাহার সন্ধান পাইতে হইলে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড হইতেই যাত্রারম্ভ করা বিধেয়; কেন না, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড আমাদের হাতের কাছে। শাস্ত্রে লেখে (বিজ্ঞান-পুস্তকেও না লেখে, তাহা নহে, তবে কিনা প্রকারান্তরে) যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চকোষের সমষ্টি। পঞ্চকোষ হ'চ্চে অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পাঁচটি কুটুরীর-ভিতর-কুটুরী। পঞ্চকোষের ল্যাজা-মুড়া বাদ দিয়া মাঝের তিনটি কোষ হ'চ্চে প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়। এই তিনটি কোষের পুঁটুলি-বন্ধি'র নাম সূক্ষ্ম-শরীর। অবশিষ্ট রহিল অন্নময় কোষ এবং আনন্দময় কোষ। এই দুইটি কোষ সূক্ষ্মশরীরের দুই মুড়ার অন্তঃপাতী। অন্নময় কোষের আর-এক নাম স্থূলশরীর; আনন্দময় কোষের আর-এক নাম কারণ-শরীর। নিম্নে দৃষ্টি-পাত কর:—

(১) অন্নময় কোষ ... (১) স্থূলশরীর
(২) প্রাণময় কোষ }
(৩) মনোময় কোষ } (২) সূক্ষ্মশরীর
(৪) বিজ্ঞানময় কোষ }
(৫) আনন্দময় কোষ ... (৩) কারণ-শরীর

স্থূলশরীরের শিকড়জাল।

যিনিই যাহা বলুন, আর, যিনিই যাহা লিখুন—স্নায়ুশব্দের অর্থ Nerve নহে; স্নায়ু-শব্দে বুঝায় আর-কিছু না—একপ্রকার অস্থি-বন্ধনী রজ্জু (সুশ্রুত দেখ)। Sinewশব্দেও তাহাই বুঝায়। কলিকাতা যখন Calcutta হইতে পারিয়াছে, হৃৎ Heart হইতে পারিয়াছে, নাসা Nose হইতে পারিয়াছে, সংস্কৃতের স্নেহ যখন প্রাকৃতের সিনেহ হইতে পারিয়াছে, তখন স্নায়ু যে Sinew হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই—বরং তাহা না হওয়াই আশ্চর্য্য। এই গেল একটা কথা; আর-একটা কথা এই যে, নাড়ীশব্দের অর্থ শুধুই যে নাড়িভুঁড়ি, তাহা নহে; নাড়ী-শব্দের অর্থ—নল। নাড়ী এবং নালী'র মধ্যে "ডলয়োরভেদঃ"। দেশের মধ্যে যেমন নদী, নালা, খাল, পুষ্করিণী, ডোবা,

কূপ প্রভৃতি জলাশয় নানাবিধ, দেহের মধ্যে তেমনি নাড়ী নানাবিধ। নিম্নে দেখ :—

Blood vessel রক্তবহা নাড়ী { ধমনী Artery
শিরা Vein }

Lymphatic vessel মেদোবহা নাড়ী
Lungs (ফুস্ফুস্) নাদবহা নাড়ী
Intestine মলবহা নাড়ী
ইত্যাদি।

তা যেন হইল—পরন্তু Nerve-এরও তো একটা প্রতিশব্দ চাই; তাহার উপায় কি করিলে? Sinew'র বাঙ্লা নাম বলিতেছ স্নায়ু; Nerveএর বাঙ্লা নাম তবে কি? ডাক্তারি-বিদ্যা অতি অল্পই যাহা আমার জানা আছে, তাহা না জানারই মধ্যে; তবে কিনা "কর্ম্মণা বাধ্যতে বুদ্ধিঃ"—জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের একটা সমুচিত মীমাংসা আশু প্রয়োজনীয়—তাহা না করিলে নয়; কাজেই তাহা আমাকর্ত্তৃক যতদুর সম্ভাবনীয়, তাহার চেষ্টায় ক্ষান্ত থাকা আমার পক্ষে উচিত হয় না; অতএব চেষ্টাচুষ্টি করিয়া দেখা যা'ক্:—

আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি আণব (Molecular) গতিক্রিয়াসকলের পরস্পরের মধ্যে প্রভেদ কিপ্রকার, তাহা যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বিজ্ঞান তাহার উত্তর দ্যা'ন এই যে, সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা'র পরস্পরের প্রভেদ যেমন বায়বীয় কম্পনের প্রকারভেদ মাত্র, তেমনি আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি আণব (Molecular) গতিক্রিয়াসকলের পরস্পরের প্রভেদ ঐথরীয় কম্পনক্রিয়ার প্রকারভেদ বই আর-কিছুই নহে। তবেই হইতেছে যে, আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আণব (Molecular) গতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন তালের নৃত্যলীলা। নৃত্য করে যে, সে কে? নৃত্য করে ঈথর! সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি-সা'র সাধারণ নাম নাদ, তাহা কাহারো অবিদিত নাই; আলোক-উত্তাপাদি'র তেমন-তরো কোনো-একটা সাধারণ নাম কি নাই? অবশ্যই আছে। আমি বলিতেছি তেজ। বিলাতি বীণাযন্ত্রের এক সপ্তকের মধ্যে যেমন সাত সুরের সাত দাঁত পংক্তি-সাজানো রহিয়াছে—প্রজ্বলিত অগ্নির তেজের মধ্যে তেমনি আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ (এবং আর যদি কিছু থাকে, তাহাও) সারি-সারি পংক্তি-সাজানো রহিয়াছে—এটা খুব আশ্চর্য্য, কিন্তু সত্য! বিজ্ঞান তাহা চক্ষে দেখিয়াছে। ময়ুর-পক্ষীর পাখা-বিস্তারের ন্যায় তেজ যখন ছটা বিস্তার করে, তখন তাহার মধ্যে আলোকাদি আণবী গতিক্রিয়াদের কে কোথায় লুকাইয়া আছে, তাহা বিজ্ঞানের মর্ম্মভেদী অনুসন্ধানচক্ষে স্পষ্ট ধরা পড়ে। তবেই হইতেছে যে, তেজ বলিলে আলোক, উত্তাপ এবং আর-আর যতপ্রকার আণবী গতি-ক্রিয়া আছে, সবই একসঙ্গে বুঝাইয়া যায়। তেজ হ'চ্চে এক প্রকার-নৃত্য; নর্ত্তক হ'চ্চেন ঈথর। তেজোরূপিণী শক্তিস্ফূর্ত্তির মধ্যে বস্তু যাহা, তাহা ঈথর। "তেজের আধার-বস্তু" এই অর্থে ঈথরকে আমি বলিতেছি তৈজস পদার্থ। Nerveএর খোলসের ভিতরে একটা-কি লুকাইয়া আছে, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে; কিন্তু কে যে সে লুকাইয়া আছে—তাহা যে বস্তুটা কি, তাহার

সটীক* সমাচার বিজ্ঞানের লেখনী দিয়া এখনো বাহির হয় নাই; তাহা না হো'ক্ —কিন্তু এটা স্থির যে, Nerve একপ্রকার সূক্ষ্ম নাড়ী বা নালী; আর সেই সূক্ষ্ম নালী-পথের মধ্য দিয়া আলোকাদি আণব (Molecular) কম্পনক্রিয়াসকল যাতায়াত করে। খুব সম্ভব যে, Nerveএর সূক্ষ্মনালীর অন্তরালে ঈথর বা ঈথর অপেক্ষাও সূক্ষ্মতর আর-কোনো তৈজস পদার্থ ঘাটি মারিয়া লুকাইয়া আছে; আর সেই তৈজস প্রহরীই অভ্যাগত আলোকাদিকে শরীর-মন্দিরের তেতালা-মহলে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়া চেতনার সহিত সাথাসাক্ষাৎ করাইয়া ছায়। এই সকল বিবেচনার বশবর্ত্তী হইয়া আপাতত এখনকার মতো Nerveএর আমি নাম দিলাম তৈজস-নাড়ী।

দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞানে (Physiologyতে) দুই শ্রেণীর তৈজস-নাড়ীর উল্লেখ আছে। এক শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী হ'চ্চে অগ্রমস্তিষ্কভবা মেরুপথগা † (cerebro-spinal) তৈজস-নাড়ী, আর-এক শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী হ'চ্চে মর্ম্মভবা ‡ (sympathetic) তৈজস-নাড়ী। আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটিতে "অগ্রমস্তিষ্কভবা মেরুপথগা" জায়গা জুড়িয়া বসিলে, ছোটো-খাটো কথাগুলির নড়ন-চড়নের ব্যাপার বন্ধ হইয়া যাইবে, তাহা দেখিতেই পাওয়া যাইতেছে। তাই তাহার অর্থের গুরুভার "বরিষ্ঠা" এই ক্ষুদ্র বিশেষণটির স্কন্ধের উপর দিয়া জোশো কৃরিয়া চালাইয়া দেওয়া শ্রেয় বোধ করিতেছি। "বরিষ্ঠা" অর্থাৎ প্রধান-পদবীস্থা। এই যে দুই শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী —বরিষ্ঠা এবং মর্ম্মভবা, উভয়েই দুই দুই অবান্তর শ্রেণীতে বিভক্ত;—(১) Afferent কেন্দ্রমুখী, (২) Efferent বহির্ম্মুখী। কেন্দ্রমুখী তৈজস-নাড়ীর কার্য্য হ'চ্চে বার্ত্তা-বহন, বহির্ম্মুখী তৈজস-নাড়ী'র কার্য্য হ'চ্চে আজ্ঞাবহন। বুদ্ধির সমীপে বার্ত্তাবহন করে বরিষ্ঠা cerebro-spinal কেন্দ্রমুখী, প্রাণের সমীপে বার্ত্তাবহন করে মর্ম্মভবা sympathetic কেন্দ্রমুখী। তেমনি আবার, ইচ্ছার বা মনের আজ্ঞাবহন করে বরিষ্ঠা বহির্ম্মুখী; প্রাণের আজ্ঞাবহন করে মর্ম্মভবা বহির্ম্মুখী। বরিষ্ঠা কেন্দ্রমুখীরা বুদ্ধির সমীপে বার্ত্তাবহন করিয়া বুদ্ধিকে চেতিত করে অর্থাৎ চেয়ায়, তাই বরিষ্ঠা কেন্দ্রমুখীর নাম দিতেছি চেতোবহা তৈজস-নাড়ী (Sensory)। বরিষ্ঠা বহির্ম্মুখীরা ইচ্ছার বা মনের আজ্ঞাবহন করিয়া ইন্দ্রিয়ক্ষেত্রে কার্য্যারম্ভ করে, তাই বরিষ্ঠা বহির্ম্মুখীর নাম দিতেছি কর্ম্মবহা তৈজস-নাড়ী (ইচ্ছাধীন Motor)। ইচ্ছাধীন (Voluntary) কর্ম্মকেই আমি এখানে কর্ম্ম বলিতেছি, এটা যেন মনে থাকে। পক্ষান্তরে, মর্ম্মভবা sympathetic কেন্দ্রমুখীরা প্রাণের সমীপে বার্ত্তা-বহন করিবার মধ্যে করে শুধু দ্বারে আঘাত; কিন্তু সে আঘাতে প্রাণের ঘুম ভাঙে না, যেহেতু প্রাণ মনোবুদ্ধির ন্যায় চেতনাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি নহে। এইজন্য মর্ম্মভবা

* অনেকে লেখেন সঠিক্। সঠিক্-শব্দের অর্থ বুঝা ভার। সটীক-শব্দে বুঝায়—টীকাসহকৃত অর্থাৎ অর্থযোগে পরিষ্কার।

† অর্থাৎ মেরুদণ্ডাশ্রিতা।

‡ অর্থাৎ শরীরের বিশেষ বিশেষ মর্ম্মস্থান হইতে প্রসূত।

sympathetic কেন্দ্রমুখী তৈজস-নাড়ীকে আমি চেতোবহা না বলিয়া বলিতে চাই ঘাতবহা। ঘাত-শব্দের অর্থ এখানে প্রাণে আঘাত; তবে কিনা অব্যক্ত রকমের আঘাত—বেদনার সহিত তাহার বিশেষ কোনো সম্পর্ক নাই। আহার্য্যদ্রব্যের সংস্পর্শমাত্রে জিহ্বার তারে অর্থাৎ প্রাণতন্ত্রীতে এক-প্রকার সূক্ষ্মরকমের আঘাত পড়ে, আর তাহারই প্রতিঘাতে বা তাড়সে জিহ্বাতে রসের উদ্রেক হয়। আঘাত সংক্রামণ করে মর্ম্মভবা কেন্দ্রমুখী, প্রতিঘাত বহন করে মর্ম্মভবা বহির্মুখী। প্রাণ-মহলের এই যে আঘাত-প্রতিঘাত, তাহার বিশেষত্ব এই যে, সে আঘাত বেদনাত্মক নহে, অথচ যেন বেদনাত্মক; সে প্রতিঘাত ইচ্ছাধীন নহে, অথচ যেন ইচ্ছাধীন। পূর্ব্বেকার এক প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে—যে, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধির পরস্পরের সহিত পরস্পরের তলে-তলে একাত্মভাব রহিয়াছে, আর, সেইগতিকে পরস্পরের গাত্রে পরস্পরের ছায়া সংক্রমিত হয়। প্রাণেতে বুদ্ধির ছায়া পড়াতে ফল হয় এই যে, মর্ম্মভবা কেন্দ্র-মুখীর পথ দিয়া প্রাণেতে আঘাত যাহা পৌঁছে—তাহা চেতনাত্মক না হইলেও চেতনা'র ভান বা নাট্যাভিনয় করিতে ছাড়ে না। তেমনি আবার, প্রাণেতে মনের ছায়া পড়াতে তাহার ফল হয় এই যে, মর্ম্মভবা বহির্মুখীর পথ দিয়া প্রতিঘাত যাহা বাহির হয়, তাহা ইচ্ছাধীন না হইলেও ইচ্ছার ভান করিতে ছাড়ে না। প্রাণতন্ত্রীতে আঘাত পড়িলে বহির্মুখীর পথ দিয়া প্রতিঘাত যাহা বাহির হয়, তাহাকে কর্ম্ম বলিতে পারা যায় না এইজন্ত—যেহেতু তাহা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন নহে। তাই মর্ম্মভবা (sympathetic) বহির্মুখী তৈজস-নাড়ীকে আমি কর্ম্মবহা না বলিয়া বলিতে চাই প্রতিঘাতবহা। এখানে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, মর্ম্মভবা (sympathetic) তৈজস-নাড়ী-মহলের ঘাতপ্রতিঘাতবহা নাড়ী-যুগল মাণিকজোড়ের ন্যায় এরূপ একাধারে ঘ্যাঁসাঘেঁসি করিয়া অবস্থিতি করে যে, কেন্দ্রমুখীর পথ দিয়া আঘাত সংক্রমিত হইবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ বহির্মুখীর পথ দিয়া তাহার প্রতিঘাত বাহির হয়—প্রতিঘাত বাহির হইতে একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হয় না। ফলে, প্রাণমহলের ঘাতপ্রতিঘাত একই ক্রিয়াচক্রের দুই অর্দ্ধাঙ্গ। নিশ্বাসের আকর্ষণ এবং প্রশ্বাসের বিসর্জ্জন, এ দুই ক্রিয়াকে আমরা যেমন একসঙ্গে জড়াইয়া মোটের উপর বলি শ্বাসক্রিয়া, তেমনি মর্ম্মভবা তৈজস-নাড়ী-মহলের কেন্দ্রমুখীদের ঘাতবাহিতা এবং বহির্মুখীদের প্রতিঘাত-বাহিতা, এ দুই ব্যাপারকে একসঙ্গে জড়াইয়া মোটের উপর বলা যাইতে পারে মর্ম্মবাহিতা। বলিবও আমি তাই। "মর্ম্মভবা তৈজস-নাড়ী ঘাতপ্রতিঘাতবহা", এই অর্থে মর্ম্মভবা তৈজস-নাড়ীকে বলিব মর্ম্মবহা নাড়ী। এতক্ষণ ধরিয়া যাহা বলা হইল, তাহাতে তৈজস-নাড়ীর নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগের সৌসঙ্গত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে ভরসা করি পাঠক-বর্গের বিশেষ কোনো বাধা ঠেকিবে না—

তৈজস-নাড়ী Nerve {
- চেতোবহা (Sensory)
- কর্ম্মবহা (ইচ্ছাধীন Motor)
- মর্ম্মবহা (Sympathetic)

সূক্ষ্মশরীর।

স্থূলশরীরের সহিত সূক্ষ্মশরীরের মিল রহিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য; কেন না তাহা থাকিবারই কথা। মিল আছে, তাহা সকলেই জানে; কিন্তু “মিল আছে” জানিয়া, বসিয়া থাকিলে চলিবে না; মিল কোন্‌খানে কিরূপ, তাহা খুঁজিয়া-পাতিয়া বাহির করা চাই। আমরা দেখিতেছি মিল আপাদ-মস্তক খাপে-খাপে। এইমাত্র আমরা দেখিলাম যে, স্থূলশরীরের মূল প্রদেশে শিকড় ফাঁদিয়া রহিয়াছে (১) চেতোবহা, (২) কর্ম্মবহা, (৩) মর্ম্মবহা, এই তিন শ্রেণীর তৈজস-নাড়ী। ঐ তিন শ্রেণীর নাড়ীর মধ্য দিয়া তিনপ্রকার শক্তি স্বস্ব গন্তব্যপথে পদসংক্রমণ করে; চেতোবহা'র মধ্য দিয়া পদসংক্রমণ করে ধীশক্তি, কর্ম্মবহা'র মধ্য দিয়া ইচ্ছাশক্তি, মর্ম্মবহা'র মধ্য দিয়া জীবনী শক্তি। ঐ তিনপ্রকার শক্তির কর্ম্মস্থান হ'চ্চে দশেন্দ্রিয়; বাসস্থান হ'চ্চে বুদ্ধি, মন, প্রাণ। দশেন্দ্রিয় বলিতে দশেন্দ্রিয়ের স্থূল আবরণ বুঝিলে চলিবে না—চক্ষুকর্ণাদি বুঝিলে চলিবে না। এটা দেখা চাই যে, দর্শনশ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ জাগ্রৎকালেও যেমন, স্বপ্নকালেও তেমনি, দুই কালেই স্বস্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হয়; আর সেই সঙ্গে এটাও দেখা চাই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির কপাট জাগ্রৎকালেই খোলা থাকে; স্বপ্নকালে বন্ধ থাকে। এখন কথা হ'চ্চে এই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদির কপাট খোলা থাক্ বা না থাক্—এটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, উভয় অবস্থাতেই শ্রবণকার্য্য শ্রবণেন্দ্রিয়েরই কার্য্য, দর্শনকার্য্য দর্শনেন্দ্রিয়েরই কার্য্য। ফল কথা এই যে, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি কেবল দর্শনশ্রবণাদির স্থূল আবরণ, তা বই তাহারা সাক্ষাৎ দর্শনশ্রবণাদি নহে। দর্শনশ্রবণাদি হ'চ্চে তলোয়ার, চক্ষুঃশ্রোত্রাদি হ'চ্চে খাপ। ইহাতে দাঁড়াইতেছে এই (শাস্ত্রেও লেখে তাই) যে, দশেন্দ্রিয় সূক্ষ্মশরীরেরই অঙ্গ—তবে কিনা বহিরঙ্গ; অন্তরঙ্গ হ'চ্চে প্রাণ, মন, বুদ্ধি; আর, দুয়ের মধ্যবর্ত্তী বন্ধনরজ্জু হ'চ্চে জীবনী শক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং ধীশক্তি। সূক্ষ্মশরীরের বহিরঙ্গের এ-মুড়া হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যন্ত জ্ঞানপরিস্ফুটনের কেমন যে সুচারু সোপানব্যবস্থা, তাহার একটা নমুনা দেখাই; তাহা হইলেই সূক্ষ্মশরীরের কলকারখানার কার্য্যনির্ব্বাহপদ্ধতির অনেকটা সন্ধান পাওয়া যাইতে পারিবে।

দর্শনেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'চ্চে দ্যাখা। কিন্তু মনুষ্যের দ্যাখা একরকমের দ্যাখা; অপরাপর জন্তুদিগের দ্যাখা আরেক রকমের দ্যাখা; দুই রকমের এই দুই দ্যাখার মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে খুবই স্পষ্ট। বহুরূপিনামক জন্তুরা অষ্টপ্রহর অমনস্কভাবে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া চাহিয়া থাকে, কিন্তু দ্যাখে যে কি, তাহা তাহারাই জানে। নিদ্রিত ব্যক্তির নেত্র দৈবক্রমে অর্দ্ধোন্মীলিত হইলে তাহা যেমন পলকশূন্য অচল-ভাবে চাহিয়া থাকে মাত্র—বহুরূপীদের পলকশূন্য চক্ষের দ্যাখা অনেকটা সেই রকমের দ্যাখা। বহুরূপী জন্তুর চক্ষের চাহনি'র ভাব দেখিলে এটা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তাহার নিকটে সম্মুখস্থিত দৃশ্যের কোনো খবরই নাই। শিকারান্বেষী ব্যাঘ্রের দ্যাখা আবার আর-একরকম। শিকারান্বেষী ব্যাঘ্র যখন

সম্মুখস্থিত মৃগের প্রতি লক্ষ্য করে, তখন তাহার স্থাখা লোভে এবং ক্রোধে দিখিদিক্-শূন্য হইয়া উঠে। ব্যাঘ্রী আবার যখন শাবকের গাত্রলেহন করে, তখন তাহার স্থাখা স্নেহমমতায় গলিয়া পড়িতে থাকে। ও তিন-রকমের স্থাখা'র কোনোটা'রই সঙ্গে মনুষ্যের স্থাখার মিল খায় না। মনুষ্যের স্থাখা প্রবুদ্ধরকমের স্থাখা—সে স্থাখা'র উপরে মূঢ়তা-মত্ততা এবং বিক্ষেপের অধিকার কম, বুদ্ধির অধিকার বেশী। সে স্থাখা'র কর্ম্মক্ষেত্রে প্রাণমনকে নীচে দাবিয়া-রাখিয়া বুদ্ধি আপনার উচ্চ পদবীতে ভর দিয়া দাঁড়ায়। মনে কর, রাত্রি আগতপ্রায়—আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—এমন সময়ে দেবদত্তনামক জনৈক পথিক মাঠের মাঝখান দিয়া চলিতে চলিতে অনতিদূরে নিবিড় বট-অশ্বত্থের আড়ালে চাহিয়া দেখিল—প্রদীপ জ্বলিতেছে। সেই প্রদীপের রশ্মিচ্ছটা দেবদত্তের চক্ষুর ভিতরে তৈজসী কম্পনক্রিয়া উৎপাদন করিল। তৈজসী কম্পনক্রিয়া চলিতে লাগিল প্রাণে। প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের দ্বারে ঘনঘন আঘাত পড়িতে লাগিল। প্রাণের ডাক শুনিয়া মন দৌড়িয়া আসিল। প্রাণের তৈজসকম্পনে মনের সংযোগ হইবামাত্র প্রাণমনের সম্মিলন-ক্ষেত্রে আলোকদর্শনরূপিণী চেতনা (sensation) উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। রেলগাড়ির প্রহরী যেমন নিশান ঘুরাইয়া বাষ্পযন্ত্রীকে (এঞ্জিন-চালককে) গাড়ী চালাইতে সঙ্কেত করে, চেতনা'র উদ্ভাসন তেমনিতরো একপ্রকার নিশান-ঘুরানো। তদ্দৃষ্টে বুদ্ধির এইরূপ জ্ঞান হয় যে, দৃশ্যমান অবভাসের (phenomenonএর) মধ্যে বস্তু একটা-কিছু আছে। "একটা কিছু আছে" এটা হ'চ্চে সামান্য জ্ঞান। "সে বস্তু না জানি কি?" এইটি হ'চ্চে বিশেষের জিজ্ঞাসা। "দেখি রোসো ভাবিয়া ;—মাঠের চরমসীমায় গাছপালায় ঘেরা গ্রাম থাকিবারই কথা ; গ্রামের প্রান্তভাগে চাসাদের বাসস্থান অবশ্যই আছে!" ইহার নাম ভাবনা। "বুঝিয়াছি—কোনো চাসা'র কুটীরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, তাহারই আলো গাছপালার ফাঁকের মধ্য দিয়া ছট্‌কিয়া বাহির হইতেছে।" ইহার নাম বিশেষ জ্ঞান বা বিজ্ঞান। চেতনার সঙ্কেত শিরোধার্য্য করিয়া বুদ্ধি কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়াতে হইল যাহা, তাহা এই :—

(১) বুদ্ধির এপারে দেখা দিল—"বস্তু একটা আছে" এই সামান্য জ্ঞান।

(২) ওপারে দেখা দিল—"চাসার কুটীরে প্রদীপ জ্বলিতেছে" এই বিশেষ জ্ঞান।

(৩) দুই পারের মাঝখানে দেখা দিল—ভাবনা-ক্রিয়া বা ধীশক্তির পরিচালনা। অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, "একটা কোনো বস্তু আছে" এইপ্রকার সামান্যজ্ঞানের দ্বার দিয়া আমরা আত্মসত্তা উপলব্ধি করি এবং "ঐ খানটিতে প্রদীপ জ্বলিতেছে" এইপ্রকার বিশেষ জ্ঞানের দ্বার দিয়া আমরা বস্তুসত্তা উপলব্ধি করি। শেষের এই কথাটি অতীব একটি গুরুতর কথা ; উহার আদ্যোপান্ত রীতিমত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা আবশ্যক। এইজন্য উহার পর্য্যালোচনাকার্য্য আগামিবারের জন্য হাতে রাখিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

শান্তিলতা।—উপন্যাস। শ্রীউমেশচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

যিনি কেবল গল্পের হিসাবে পড়িবেন, তাঁহাকে এই উপন্যাসখানি পড়িতে মন্দ লাগিবে না। তাহার কারণ এই যে, ইহাতে বর্ণিত ঘটনাবলী কৌতূহলোদ্দীপক এবং তাহার পারম্পর্য্য সুবিন্যস্ত। যদি পূর্ব্ববঙ্গের বাক্যব্যবহারপ্রণালীর পরিচয়স্থলগুলি—বড় অল্প নহে—ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে বলিতে পারা যায় যে, রচনা মোটের উপর সরস ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। সুতরাং উপর-উপর পড়িয়া যাইতে কোন আয়াস লাগে না। কিন্তু যিনি ভিতরে প্রবেশ করিয়া চরিত্রচিত্রের বা সাহিত্যিক নিপুণতার অনুসন্ধান করিবেন, অনেক ত্রুটি ও দোষ তাঁহার চক্ষে পড়িবে।

এই প্রায় দুইশত পাতার উপন্যাসে, চরিত্র কেবল একটিমাত্র—সে গ্রন্থকার স্বয়ং। অনেকগুলি স্ত্রী ও পুরুষের নাম আছে বটে; কিন্তু কেবল নামই আছে—পৃথক্ পৃথক্ মানুষ নাই। উপন্যাসের নর-নারীগুলি যে-ই যাহা বলিয়াছে ও করিয়াছে, সে সকলই গ্রন্থকারের নিজের কথা ও কার্য্য। উমেশবাবু বোধ হয় কথাবার্ত্তায় এবং লেখায় সংস্কৃতবচনের বুকনি দিতে কিছু অতিরিক্ত ভালবাসেন। সেইজন্যই বোধ করি দেখিতে পাই যে, এই উপন্যাসের স্ত্রীপুরুষগুলি যখন-তখন, যেখানে-সেখানে, যার-তার কাছে, সংস্কৃত ঝাড়িবার লোভ সংবরণ করিতে পারে নাই। সংস্কৃত জানা যাহার সম্ভব নহে, সে-ও সংস্কৃতবাক্যের টুক্‌রা ব্যবহার করিতে ছাড়ে না। সুরেশ-বাবু তাঁহার কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়েটিকে জগদম্বা-গোয়ালিনীর হাতে সমর্পণ করিবার সময় বলিয়া দিতে ভুলেন না যে—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।"

ধনবানের দোষ কেহ ধরে না, এই কথা গোয়ালিনীকে বুঝাইতে গিয়া বলেন—

"ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনম্।"

ডাক্তারবাবু রোগী দেখিতে আসিয়া সাংখ্য-দর্শন ঝাড়েন—

"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ।"

নর্ম্মদা ছাত্রবৃত্তি পাস্ করিয়াছে; সুতরাং আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও বাইবেলে লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের অসারতা প্রতিপাদন করিবার অধিকার ত তাহার জন্মিয়াছেই, তদ্ব্যতীত পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বয়ংবরা হইবার অধি-কারও জন্মিয়াছে। অতএব নর্ম্মদা তাহার প্রাইভেট্ টিউটর নটবরবাবুকে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় অতি সংগোপনে নিজের কামরায় ডাকাইয়া আনিল এবং বিবাহের জন্য চাপিয়া ধরিল। অন্যান্য যুক্তিতর্কের পর বলিল—"যিনি আমার এ হৃদয়রাজ্যের রাজা হইবেন, তাঁহাকে আপনিই দেখিয়া-শুনিয়া অভিষিক্ত করিব। আমার সম্বন্ধে তুমিই 'সর্ব্বদেবময়ো হরিঃ'।" আরও বলিল, "যোঽসি সোঽসি নমোঽস্তু তে"—অর্থাৎ আমি তোমারি; আর কাহারও হইব না।

যাহার নামে এই উপন্যাসের নাম, এবং "মনু, গীতা, ভাগবত ও শঙ্করাচার্য্যের স্তোত্র যাহার জিহ্বাগ্রলগ্ন," সেই শান্তিলতা তাহার সংস্কৃতে এম্-এ-পাস্-করা স্বামীকে বলিতেছে—"অবশ্য 'পুরুষ কখনও মানুষ নয়' তা আমি জানি, কিন্তু সকল মানুষ হৃদয়শূন্য হয়, ইহাও প্রকৃতির লক্ষণ নহে, কেন না—'মৌক্তিকং ন গজে গজে'।" উমেশবাবু নিজে অসবর্ণ বিবাহের পক্ষপাতী; তাঁহার অভিমত—'গুণই জাত, জাত আর জাত নয়।' অতএব শিরোমণিঠাকুরের বিধবা পত্নী, শূদ্রকন্যার সহিত আপন পুত্রের বিবাহ দিতে অনায়াসে সম্মত হইলেন। কি সঙ্গত, কি অসঙ্গত, সে বিষয়ে গ্রন্থকারের সাহিত্যবুদ্ধি বড় সজাগ নহে।

সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি সুসংস্কৃত হইয়া যাহাতে অধঃপতিত হিন্দুজাতির পুনরুত্থান হয়, এই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার এই উপন্যাসখানি প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য যে মহৎ, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইতে পারে না; কিন্তু সে উদ্দেশ্য উপন্যাস লিখিয়া সিদ্ধ হইবে কি?

কলিনা।—পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র উপন্যাস। শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র বি. এ. বি. এল. প্রণীত। মূল্য ৵০ দুই আনা।

এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের মূল কল্পনাটি বড়ই সুন্দর, কিন্তু তাহা বিকাশের অবকাশ পায় নাই। গল্পটি নিতান্ত ক্ষুদ্র; এত ক্ষুদ্র যে, পড়িয়া কাহারও তৃপ্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। তবে ইহার তাৎপর্য্য সকলেরই মনে করিয়া রাখা উচিত। তাহা এই যে, যে স্থলে অবস্থাগত ও প্রকৃতিগত প্রভেদ অত্যন্ত অধিক, সে স্থলে প্রেমসংঘটন সুখের বা মঙ্গলের হয় না—যে ক্ষুদ্র, সে শুকাইয়া শুকাইয়া মরিয়া যায়; যে মহৎ, সে মর্ম্মান্তিক দুঃখের নিদারুণ ভার বুকে করিয়া বহন করিতে থাকে। এই অতি-ক্ষুদ্র গল্পটি পড়িয়া টেনিসনের 'Lord Burleigh' মনে পড়ে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন

সাহিত্যের আদর্শ।

লর্ড লিটন তাঁহার একখানি উপন্যাসে মানব-সমাজের একটি ভাবী আদর্শচিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেই-আদর্শসমাজ-ভুক্ত ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে নানারূপ অপূর্ব্ব কথাই তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সে সকল লইয়া এখন আমরা আলোচনা করিতেছি না। তবে একটি কথা তিনি এই বলিয়াছেন যে, সে দেশে শেক্স্পীয়রের নাটক ও কবিতা লোকে পাঠ করে, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিক একটা আমোদ ভিন্ন তাহারা আর-কিছু পায় না। আরব্য উপন্যাসের গল্প পড়িয়া প্রবীণ ব্যক্তির পক্ষে যে আনন্দলাভ সম্ভব, তদতিরিক্ত আনন্দ শেক্স্পীয়র হইতে তাহারা পায় না। ইহার অর্থ এই যে, যে সকল প্রমত্ত বাসনায় পড়িয়া আমরা আকুলি-ব্যাকুলি করি, শেক্স্পীয়রের মধ্যে এখন তাহাদের ভাষা পাই, এইজন্যই তাহাকে আমরা এখন এত পছন্দ করি; কিন্তু এমন একদিন উপস্থিত হইতে পারে, যখন মানুষ বাসনানলে সেরূপ দগ্ধ হইবে না,—তখন শুধু গল্পপাঠের যে আমোদ, শেক্স্পীয়র তাহাই দিয়া ক্ষান্ত থাকিবে। এখন আমরা ঝটিকার মধ্যে পড়িয়া আছি, সুতরাং নরজীবনের কুটিল আবর্ত্তের কথার মধ্যে আপনাদের প্রাণের বেদনার প্রতিধ্বনি পাইয়া সোৎসাহে প্রশংসা করি; কিন্তু যখন দুরাকাঙ্ক্ষা, সন্দেহ, লোভ, স্পর্দ্ধা প্রভৃতি মানবান্তঃকরণ হইতে চিরবিদায় লইবে কিংবা সৎপ্রবৃত্তির তেজে তাহার এক নিভৃত কোণে গিয়া পড়িবে, তখন আমরা শেক্স্পীয়র-সৃষ্ট জগৎকে আমাদের পরিচিত বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাহাকে আত্মীয় জগৎ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইব না। দৈত্যপুরীর দৃশ্যাবলী, দৈত্যগণের প্রভূত আশয় ও বিক্রমের কথা পড়িয়া আমরা যেরূপ ক্ষণকালের কৌতূহল চরিতার্থ করিয়া আরব্যোপন্যাসখানি ডেস্কের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখি, উহাকে জীবনযাত্রার সহচর করিতে ইচ্ছা হয় না—শেক্স্পীয়র এবং তাঁহার সমশ্রেণীর কবিকুলও এক সময়ে সেইরূপ হইয়া পড়িবেন, উঁহাদিগকে আমরা অন্তরঙ্গ ভাবিতে ভুলিয়া যাইব।

য়ুরোপের সে দিন কবে আসিবে, তাহা জানি না; কিন্তু আমাদের সে দিন আসিয়াছে কিংবা আসিতে বিলম্ব নাই। আমাদের

কলেজে পড়িবার সময় ছাত্রমণ্ডলীর নিকট শেক্‌স্পীয়রের কি দুর্নিবার প্রতাপ ছিল—বাল্মীকি-কালিদাস প্রভৃতিকে উড়াইয়া-দিয়া শেক্‌স্পীয়রকে সাহিত্যজগতের মুকুটমধ্যমণি করিয়া রাখিতাম; কিন্তু এখন তাঁহার প্রতি হৃদয়ের প্রগাঢ় পূজার ভাব বিচ্যুত না হইলেও মন যেন ক্রমশই হিন্দু আদর্শের সৌন্দর্য্যে বেশী আকৃষ্ট হইতেছে, সেই সকল কবিতা ও নাটকে আর পূর্ব্বলব্ধ আনন্দ ও আশ্রয় পাই না। মনে হয়, পাশ্চাত্য জগতের মন বড় কঠোর,—উহাতে নিয়ত স্পর্দ্ধা, জয়াকাঙ্ক্ষা ও অহঙ্কারবুদ্ধি একটা কঠিন ও দুর্ভেদ্য আবরণ রচনা করিয়া রাখিয়াছে; নাটক ও কবিতা হইতে উহা শেলের মত তীক্ষ্ণাগ্র এমন একটা অস্ত্র চায়, যাহা হৃদয়ের কর্কশ বাহ্য ত্বকটাকে ছেদন করিয়া তীব্র আঘাত সহকারে অন্তর্নিহিত রসের উৎসটা আবিষ্কৃত করিয়া দিতে পারে। ভীষণ সংঘর্ষ, তীব্র বাক্য, জ্বালাময় ও হৃদয়ভেদী বিয়োগান্ত পরিসমাপ্তি তাহাদের হৃদয়ের করুণা জাগাইতে সমর্থ—সুতরাং তাহাদের কবিরা ও নাটক ও কবিতায় নিরবধি সেইরূপ সামগ্রীই দিতেছেন। ইহাঁদের কবিতা দুঃখকে মূর্ত্তিমান্ করিয়া উহার হস্তে অন্তর্দাহের প্রজ্বলিত মশাল দিয়া বরণ করিয়া আনে,—তবে যদি একটুকু কারুণ্য জন্মে। শুধু করুণা জাগাইবার জন্য, মনকে দ্রব করিবার উদ্দেশ্যে ইঁহারা দুঃখের চিত্র আনিয়া উপস্থিত করেন। যে অন্তঃকরণে বেদনাবোধ লুপ্ত হইয়াছে, সেই অন্তঃকরণে বেদনা জাগাইবার জন্য বিষপ্রক্রিয়ার ন্যায় ইঁহারা উৎকট দুঃখের চিত্র খুঁজিয়া বেড়ান।

আমাদের ঠিক তাহার বিপরীত। অহঙ্কার, স্পর্দ্ধা প্রভৃতি রাজসিক বৃত্তি অপেক্ষা আমাদের প্রাচীন কবিগণ সাত্ত্বিকগুণের মহিমা অধিক বুঝিয়াছিলেন। আমাদের দেশের লোকহৃদয় স্বভাবতই গার্হস্থ্যধর্ম্মে দীক্ষিত—সংযম ও আত্মসংবরণে দক্ষ, শীলতাপ্রিয় এবং অতিশয় কোমল। এই কোমলতা এত বেশী যে, ইহাতে জীবনে আমাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ছেলের জন্য, স্ত্রীর জন্য, ভাই-ভগিনীর জন্য আমাদের স্নেহান্ধ হৃদয়ে এত ব্যথা যে, জীবনসংগ্রামের পক্ষে আমরা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি;—এই স্নেহভারাক্রান্ত হৃদয় শোক ও মমতায় একান্ত পীড়িত হইয়া যে ঔষধ খুঁজিয়া পাইয়াছিল, তাহার নাম মায়াবাদ। সংসারের মমতাগুলি স্নিগ্ধলতার ন্যায় আমাদের পা বাঁধিয়া ফেলিয়াছে, আমাদের নড়িবার সাধ্য নাই, তাই আমাদের সর্ব্বদা বলিতে হয়—দারাপুত্র কেউ কিছু নয়। এই সতর্কতার দ্বারা আমরা পায়ের নিগড় ছিঁড়িতে চাই—আমাদের কোমল হৃদয়ে বলসঞ্চারের প্রয়াস পাই। আমরা ব্যথিত, এইজন্য ব্যথাকে বড় ভয় করি। সংসারে যে সকল ঘটনা ঘটে, তাহা অশুভ হইলে আমরা জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল ও লোকচরিত্র সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা প্রভৃতির কল্পনা করিয়া মনকে আশ্বাস দিই,—ঈশ্বরের বিধান সর্ব্বত্রই শুভ। কিন্তু সাহিত্যে সকল বিষয়কেই কবি চক্ষের সম্মুখে পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়া থাকেন। সেখানে কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল এবং বর্ণিত চরিত্রসকলের সমস্ত সূক্ষ্মভাব আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে—সেখানে অশুভপরিসমাপ্তি আমাদের

হৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাসের তন্ত্রীটার উপর সজোরে আঘাত দেয়। এইজন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য বিয়োগান্ত-পরিসমাপ্তির এত প্রতিকূলে। যে দুঃখ, সৃষ্টির শুভবিধান প্রতিপন্ন না করে, সেই দুঃখকে আমরা বড় ভয় করি, তাহা আমাদের অন্তরাত্মা কখনই সহ্য করিতে চায় না।

য়ুরোপে গার্হস্থ্যস্নেহ আমাদের দেশের ন্যায় বিকাশ পায় নাই। ছেলেটি হইলে সেখানকার লোক তাহাকে অপরের ক্রোড়ে কিংবা বোর্ডিং-গৃহে রাখিয়া নিশ্চিন্ত হয়; স্ত্রীর সহিত সম্পর্ক নালিশ করিয়া ছেদন করে; পিতা বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের ভার বহন করেন না; পুত্রের গৃহে পিতা আসিয়া আহার করিলে তাঁহাকে বিল-শোধ করিয়া যাইতে হয়; পুত্রকে জাপানে কিংবা পোগকেটসেটলে পাঠাইতে তাহাদের দুর্ভাবনার লেশমাত্র হয় না। দুরাকাঙ্ক্ষা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিলে তাহারা গৃহের ভাবনা একেবারে ভুলিয়া যায়। তাহারা যে পরিমাণে আত্মনির্ভরপরায়ণ, সেই পরিমাণে স্নেহকে হৃদয় হইতে দূরে রাখে; সুতরাং তাহাদের হৃদয়ে কোমলতা জাগাইবার জন্য তীক্ষ্ণধার ছুরিকার প্রয়োজন। দুঃখকে অতিমাত্রায় ফলাইয়া তাহারা একটু বেদনাবোধ করিতে চাহে; আমরা যাহাতে শিহরিয়া উঠি, তাহারা তাহাতে অল্পই উত্তেজিত হয়—এজন্য বিয়োগান্ত না হইলে কবিদের সাহিত্যিক চেষ্টা সিদ্ধ হয় না; গৃহ তাহাদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, এইজন্য গৃহকে তাহারা খাঁচা বলিয়া চিত্রিত করে,—তাহাতে সুখদুঃখের তীব্রমদিরার আস্বাদ কল্পনা করে। কিন্তু যাহাকে খাঁচা বলে, তাহাই প্রকৃতরূপে তাহাদের নিকট মিথ্যা; কারণ উহা তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। আর আমরা যাহাকে 'মায়া' 'মিথ্যা' প্রভৃতি আখ্যা দিয়া অস্বীকার করিবার চেষ্টা পাই, তাহা আমাদিগকে নিবিড় বন্ধনে জড়ীভূত করিয়া রাখে। আমরা মায়া বলিয়া যাহা হইতে পরিত্রাণ পাইতে চাই, খাঁচা বলিয়া তাহা আমাদিগকে ধরিয়া রাখিতে চাহে। দুই সমাজের এই শিক্ষা-দীক্ষা— উদয়াস্তের ন্যায় দুই বিরুদ্ধ দিকে।

ইহা ছাড়া আর-একটা কথা আছে। আমাদের সাহিত্য উচ্চনীতি লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছে। যে দুঃখ চিত্তকে উন্নত না করিয়া শুধু বেদনা দেয়, শুধু নিষ্ঠুরতা কি বর্ব্বরতাকে জীবন্ত করে, তেমন দুঃখ আমাদের সাহিত্যে বর্ণনীয় নহে। উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা আর্থ্যরের চক্ষু-উৎপাটনের চেষ্টা, হ্যাম্লেটের পিতার নৃশংস হত্যা কিংবা হ্যাম্লেটের শোকোন্মাদ, এই সকল দুঃখময় ঘটনা কেবল নিষ্ঠুরতা বা বর্ব্বরতাকে জাজ্বল্যমান করিতেছে। শুধু স্বভাব-অঙ্কনের নামে উহা মার্জ্জনীয় নহে; পশুজগতে যদি একটা স্বাভাবিক কবিত্বের উচ্ছ্বাস থাকিত, তবে সেই গাথা মনুষ্যজগতে কাব্য বলিয়া পরিচিত হইবার স্পর্দ্ধা করিতে পারিত না। কিন্তু যে সকল দুঃখ সৎপ্রবৃত্তির উন্মেষ করে—হৃদয়কে মহিয়সী শক্তি প্রদান করে, আমাদের প্রাচীন কবিগণ তাহাই বর্ণনীয় মনে করিয়াছেন। এই দুঃখপীড়িত সংসারে নানারূপ যন্ত্রণা উৎকটভাবে মনুষ্যসমাজকে নিরন্তর আক্রমণ করিতেছে—তাহার উপর সাহিত্যে আবার অনর্থক একরাশ দুঃখের সৃষ্টি

করিয়া উন্মুক্ত ক্ষতে লবণপ্রক্ষেপের প্রয়োজন কি ? শুধু বেদনা জাগাইবার জন্য কতকগুলি দুঃখকে সাহিত্যে বরণ করিয়া আনা—কবিশক্তির অপব্যয়। কিন্তু রামবনবাস, সীতাবর্জ্জন কিংবা শ্রীকৃষ্ণের মাথুরবর্ণিত দুঃখ অন্যবিধ। তাহাতে প্রেম কি কর্ত্তব্যবুদ্ধির মূলে জলসেক করিয়া উহাদিগকে পল্লবিত ও মুকুলিত করিয়া তোলে। এই হিতকর দুঃখকে আমাদের কবিগণ বরণ করিয়া লইয়াছেন, সত্যবান্ ও সাবিত্রীর কষ্ট, যুধিষ্ঠির বা ভীষ্মের ত্যাগজনিত দুঃখ—এ সমস্ত এক উন্নত কর্ত্তব্যরাজ্যকে মহিমান্বিত করিয়া দেখাইতেছে ; কবিগণ সেই সকল চিত্র সকরুণ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া আমাদের চক্ষের নিকট উন্মোচন করিতেছেন।

মনে করুন, হ্যাম্‌লেট কি ওথেলো নাটক;—ইহাতে কি দেখা যাইতেছে ?—কুটিলতা বা সন্দেহ কিরূপে অঙ্কুরিত হইয়া বিকাশ পায় —কিংবা শোক কিরূপে ক্ষিপ্ততার অভিমুখীন হয়—সেই মানসিক ক্রমটি গোচরীভূত করাই নাটকদ্বয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। অসংযত চরিত্রগুলির প্রবৃত্তির পথেই বিকাশ—দুইএকটি স্থলে সংযম ও উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধি বা প্রেমের একটু আভাস পাওয়া যায় মাত্র। কবি এতগুলি ব্যথার অবতারণ করিয়া মনের উপর একটা কঠোর কর্ষণ করিলেন মাত্র, কিন্তু ইহাতে কোন সুফলের প্রাক্‌সূচনা করিলেন কোথায় ? যখন কেহ দুঃখকে গলাধঃকরণ করিয়া নীলকণ্ঠের সৌম্যমূর্ত্তি প্রদর্শন করেন, তখন সেই দুঃখের ইতিহাস আমাদিগকে গরীয়ান্ করিয়া তুলিতে পারে ; কিন্তু যখন ইন্দ্রিয়ের প্রশ্রয়ে বা দৈববিধানে সৃষ্ট দুঃখের অবস্থা মানুষকে ধ্বংস, খর্ব্ব বা ক্ষিপ্ত করিয়া ফেলে, তখন সে পরিচয়ে আমাদের লাভ কি ? এইজন্য আমাদের কাব্যসাহিত্যে উচ্চতর কর্ত্তব্য কিংবা প্রেমের আদর্শ সজাগ করিয়া তুলিবার জন্য যে সকল দুঃখের বর্ণনা আছে—তাহা উৎকট হইলেও মহৌষধের ন্যায় অসুস্থচিত্তকে নিরাময় ও সবল করিয়া তোলে। কোন মহাদৃশ্য ঘোষণা করিবার জন্য যেরূপ একটা কৃষ্ণচর্ম্ম দীর্ঘাকৃতি ইথিওফ্ শুভ্র বিজয়বার্ত্তার নিশান লইয়া অগ্রদূতস্বরূপ সুন্দরসজ্জিত দলবলের পূর্ব্বে উপস্থিত হয়, আমাদের মহাকাব্যের মহত্ত্বদীপ্ত ঘটনাগুলির উচ্চলক্ষ্য প্রতিপন্ন করিবার জন্য কবিগণ সেইরূপ দুঃখের বিকটমূর্ত্তি আঁকিয়া থাকেন —কিন্তু তাহার কুণ্ডলে প্রজ্ঞা ও কর্ত্তব্যের দুইটি উজ্জল রত্ন জ্যোতি বিচ্ছুরিত করিয়া তাহার উপস্থিতিকে সার্থক করিয়া দেয়। আমাদের প্রাচীনকাব্যবর্ণিত দুঃখের কালিমা সর্ব্বদাই কোন মহালক্ষ্যের পশ্চাতে চলে ও সেই লক্ষ্য দ্বিগুণতররূপে উদ্ভাসিত করিয়া দেয়,—শুধু বিভীষিকা দেখাইবার জন্য তাহার আগমন হয় না। আমরা প্রবৃত্তি-আকৃষ্ট দুঃখের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সতত আর্ত্ত—মায়াবাদের শরণ লইয়া জ্বালা ভুলিতে চাই, আর তাহারা নিরর্থক সেই দুঃখকে বরণ করিয়া মনে একটু কষ্ট বা বেদনাবোধ ও গার্হস্থ্যস্নেহের চৈতন্য জন্মাইতে চায়। ইহাতে দেখা যায়, গার্হস্থ্যজীবনের শেষ শিক্ষা আমাদের হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা সেই শিক্ষার জন্য লালায়িত।

গার্হস্থ্যজীবনের শিক্ষা যে তাহাদের তেমন সম্পূর্ণতালাভ করে নাই, তাহাদের

শ্রেষ্ঠকবির রচনাতেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি ভাব দৃষ্টান্তস্থলে লক্ষ্য করা যা'ক। দুহিতৃস্নেহ আমাদের দেশে কি কল্যাণী কবিতার সৃষ্টি করিয়াছে! আগমনী-সংবাদের সঙ্গীতে সারা বঙ্গ ব্যাপিয়া চিরসঞ্চিত অপত্যস্নেহের ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা কেমন পবিত্র, বেদনাতুর ও সরস! শকুন্তলার আশ্রমত্যাগ হিন্দুগৃহে কন্যার স্থানটি কি, তাহা পরিষ্কাররূপে দেখাইতেছে—লতা যেরূপ একটা কুঞ্জের পাদপগুলিকে জড়াইয়া-ধরিয়া তাহাদিগকে স্নিগ্ধ করিয়া রাখে, সমস্ত গৃহটি সেইরূপ কন্যার নানা আদর ও স্নেহকথায় আপূরিত ও সুশীতল হইয়া থাকে। এই কন্যাস্নেহ শেক্স্পীয়রের রচনায় অনেকস্থলেই কেমন উৎকটভাবে দেখা দিয়াছে। ডেস্‌ডেমনা সভাস্থলে দাঁড়াইয়া নির্লজ্জভাবে পিতাকে বলিল, "আপনি আমার পিতা, আপনার প্রতি আমার কর্ত্তব্য আছে, কিন্তু এখানে আমার স্বামী উপস্থিত। আমার মাতা যেমন তাঁহার পিতার অপেক্ষা আপনাকে অনেক বেশী ভাল বাসিয়াছেন, ইহাকেও সেইরূপ আমি আপনার অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে বাধ্য।" অবশ্য তাঁহাদের সমাজে স্ত্রীলোকের শীলতার আদর্শ ভিন্নরূপ, কিন্তু পিতাকে ইহার অপেক্ষা একটু বেশী প্রিয়-ভাষণ কি ডেস্‌ডেমনার প্রকৃতির অধিকতর উপযোগী হইত না? অন্তত পিতৃস্নেহের সহিত স্বামিপ্রেমের একটা নিষ্ঠুর পরিমাপ পিতার সমক্ষে এরূপ গর্ব্বিতভাবে না করিলে বোধ হয় তাহাদের হিসাবেও শীলতার চিত্র উৎকৃষ্ট হইত! কর্ডেলিয়া ভগ্নীগণের অতিরঞ্জিত স্নেহপ্রকাশে বিরক্ত হইয়া পিতাকে কঠোর কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানেও ভাবী স্বামীর প্রীতির সহিত পিতার প্রতি ভালবাসার এরূপ অযথা তুলা না করিলে বোধ হয় চলিত। মুক্তলজ্জ হইয়া পিতার নিকট স্বামীর ভালবাসার এরূপ তুলনায় শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন বোধ হয় স্বভাবশাসিত কোন সমাজেই অনুমোদন করিবে না। আমাদের শত শত বন্ধু থাকিতে পারে, কিন্তু একজনকে মুখের উপর যদি বলিয়া ফেলি যে, অমুককে তোমার অপেক্ষা আমি বেশী খাতির করি, তাহা কেমন বিসদৃশ শুনায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে পিতাকে স্বামীর নিকট এরূপ প্রকাশ্য-ভাবে খর্ব্ব করিবার চেষ্টা শীলতাকে কতদূর অতিক্রম করে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যদি নাটকীয় প্রয়োজন মনে করিয়া ইহার ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা হয়—সে ব্যাখ্যা কখনই গ্রাহ্য হইবে না। কারণ নায়িকার চিত্রে কালিমা-লেপন করিলে নাটকের প্রকৃত গৌরব নষ্ট হইয়া যায়। রোমিও টাইবল্ট্‌কে হত্যা করিয়া নির্ব্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত হইল, এই সূত্র উপলক্ষ্য করিয়া জুলিয়েট টাইবল্ট্ ও রোমিওর প্রতি স্নেহ তুলাদণ্ডে মাপ করিতে বসিলেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইলেন যে, শত শত টাইবল্টের মৃত্যু ও রোমিওর নির্ব্বাসনদণ্ডের সহিত তুলিত হয় না। ভ্রাতার মৃত্যুজনিত যৎকিঞ্চিৎ শোকও তাহার হৃদয়ে স্থান পাইল না। এইরূপ তুলনাগুলি এত অযাচিত ও প্রগল্‌ভতাপূর্ণ যে, আমরা উহাতে স্ত্রীজন-সুলভ শীলতার একান্ত অভাব লক্ষ্য করিয়া দুঃখিত হই। এতদ্দ্বারা মনে হয়, তদ্দেশীয় মহিলাকুল যে পরিমাণে স্বামীর বাহু আশ্রয় করিতে শিখিয়াছে, সেই পরিমাণেই পিতৃ-

গৃহের যত্নপ্রীতি ও স্বাভাবিক বন্ধনের প্রতি উদাসীন হইয়াছে; কিন্তু গার্হস্থ্যক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট ফসল জন্মাইতে হইলে সর্ব্বপ্রকার কোমলবৃত্তির যুগপৎ কর্ষণ আবশ্যক, তাহা হইলে প্রত্যেকের সঙ্গে সম্বন্ধ পূর্ণরূপে বিকাশ পাইবার সম্ভাবনা। শেক্স্পীয়র যে রমণী-প্রকৃতি আঁকিয়াছেন, তাহা আমাদের দেশের নহে। আমাদের পুরস্ত্রীকুল বেপথুমতী পুষ্পভারনতা লতার ন্যায় প্রেমের উষাচ্ছটায় লালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া যে লাজশীলতা, যে সংযম, যে মৌনমাধুরী প্রকাশিত করে, আমরা বলিতে বাধ্য—শেক্স্পীয়র সেরূপ নারীচরিত্রের আভাস পান নাই। তাঁহার পুরুষচরিত্রগুলি বিক্রান্ত, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত—তাহাদের শান্তি ও সংযমের অভাব;—যে শান্তি ও সংযমের ইচ্ছায় হিন্দু হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গ অধিরোহণ করিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই, মৌনী হইয়া অনশনে জীবন কাটাইয়া দিয়াছে—যে শান্তি ও সংযম রাম, লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্রে, যুধিষ্ঠির ও ভীষ্মের আচরণে অপূর্ব্ব মহিমায় ভাতিয়া উঠিয়াছে, শেক্স্পীয়র তাহার আভাস দিতে পারেন নাই,—তাঁহার কবিতা উন্নত কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে জাগাইয়া তোলে না। কতক পরিমাণে বর্ব্বরযুগের দম্ভ, তেজ ও অহঙ্কারের ছায়া পড়িয়া তাঁহার কাব্য ও নাটকগুলিকে রাজসিকগুণের আধার করিয়াছে। উহাতে চূড়ান্ত প্রতিভা আছে, কিন্তু উদ্দাম প্রতিভার শাসন নাই—উহাতে মানবপ্রকৃতির অবাধ স্বাধীনতা ও অদম্য লীলা দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা শীলতা ও স্বভাবনম্রতায় ভূষিত হইয়া লোক-হিতকর হয় নাই। "শিবেতরক্ষতয়ে"—অকল্যাণক্ষয় আমাদের আলঙ্কারিকগণ কাব্যের একটা প্রয়োজন বা ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সরস্বতীর মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আমাদের চক্ষে বড় আদরণীয়—তিনি যেমন সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, তেমনই শুভ্রবসনা। আমাদের মহাকাব্যগুলির ভিত্তি সংযম, উহারা সাত্ত্বিক-গুণের শুভ্রদীপ্তিতে সমস্ত অশুভঘটনাকে কল্যাণের মহিমায় মণ্ডিত করিয়া দেখাই-তেছে। মনে হয়, সেই সকল কাব্য সমাজের যে স্তর উদ্ঘাটন করিয়াছে—শেক্স্পীয়রবর্ণিত সমাজের স্তর তাহার বহুনিম্নে। আমি শেক্স্পীয়রের জ্বলন্তসূর্য্যবৎ প্রতিভার কথা বলিতেছি না;—তাঁহার সময়ের যে সামাজিক অবস্থা তাঁহার কাব্যে প্রতিভাসিত, তাহারই কথা বলিতেছি; তাঁহার কবিত্বের অমর্য্যাদা করি নাই, তাহা করিবার সুযোগও কাহারও নাই।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

চণ্ডালী।

১

"হায় মা, একি মা, আজি একি হ'ল, একি হ'ল তোর—
মুখে অন্ন নাই, নিশি কেঁদে কেঁদে করে' দিলি ভোর।
দেখ, বরষার রাতি গরজি বরষি হ'ল শেষ—
এখনো—এখনো মাগো পড়ে' আছ আলুথালু-বেশ?
কোন্ মণি কোন্ সোনা কারে দাস কারে চাও দাসী—
বল কে সে—বল কি সে—এই দণ্ডে নিয়ে তারে আসি।
জানিস্ নে মা তোহার কত গূঢ় তন্ত্রমন্ত্র জানে—
মানস করিলে—ধরা নিমেষেতে পদতলে আনে?"
—কহিলা চণ্ডালী-মাতা, অম্বিকারে,—কন্যারে সম্ভাষি'—
(মাতা ও তনয়া দোঁহে বৈশালীর প্রান্তগ্রামবাসী)।
অম্বিকা চণ্ডাল-বালা—কোথা হ'তে পেল এত রূপ—
মোহনিয়া এ চিকুর, এমন নয়ন রসকূপ?
এমন কপোলযুগ লাবণ্যললিত ঠোঁট-ছুটি
এমন মোহন গ্রীবা—অনঙ্গের যেন ফুল-মুঠি?
অলাজে বিচরে বালা সঙ্গিসাথে বাহিরে কি ঘরে—
কিবা রঙ্গময় ছাঁদে পা-ছুটি মাটিতে তা'র পড়ে!
বাহুটি বেড়িয়া তার বলয় নাহিক একখানি—
অভূষণ এ রূপেরে বড় আমি ভয়ঙ্কর মানি!
একি এ বলয়বন্ধবিমুক্ত, প্রমত্ত রূপোচ্ছ্বাস—
এ যেন চুম্বিতে চায় বায়ুবহ সকল আকাশ।
প্রত্যেক চরণপাতে তালে তালে বাজিয়া নূপুর
উহার গতিরে কভু করে না ত সরম-মধুর!
ওই কণ্ঠতট হতে বিলম্বিয়া মণিময় হার
বক্ষোচ্ছল যৌবনেরে লাজ নাহি দেয় একবার!
বৈশালীর প্রান্তমাঠে বটমূলে বেণুকুঞ্জতলে,
ময়ূরচরিত পথে এ কিশোরী যত ফিরে চলে—

বেশ নাই, ভূষা নাই—এলোকেশ, মলিন বসন—
চমকি' সবাই কহে—"চণ্ডালী এ ?—কি জানি, কেমন !"
চণ্ডালী জননী তার কন্যারে নেহারি দেখে যত,
চোখে তার আসে জল, ভাবে—"হায় ব্যথা পেলি কত !
কোন্ যক্ষবালা তুই আইলি এ দীনহীন ঘরে—
শৈশবে হারালি বাপে, কত কষ্টে দরিদ্রার ক্রোড়ে
বাড়ি' এমনটি হ'লি !—মরি মরি—একি রূপ মা'র !
এ ল'য়ে কোথায় যাব ?—রেখে দেব হৃদয়ে আমার !"
—ভাবি' ভাবি' হিয়া গলি', নিঠুরা সে চণ্ডালিনী কাঁদে—
যতই স্বামীরে স্মরে অশ্রু আর কিছুতে না বাঁধে।
আলো প্রৌঢ় চণ্ডালিনি কি যে তুই গেলি দরবিয়া—
পরুষা পুরুষ হতে ! কোদালি ও ঝুড়ি কাঁখে নিয়া
বৈশালীনগরশেষে প্রান্তরে ভ্রমিতি তুই যবে,
কপাল সিঁদুরে ভরি' তোর নব-যৌবন-গরবে—
রাখাল-কিশোর যত বাঁশরী-বিলাস বন্ধ করি'
ভীরুতায় ধীরে ধীরে বাঁশবন-আড়ে যেত সরি' !—
প্রতিবেশী যত—তোর ভয়ে সদা ছিল কম্পমান—
কন্যার স্নেহ-সোহাগে একি তোর দ্রবি' গেল প্রাণ ?
শত আবদারে বালা জননীরে যত উদ্বেজিছে—
স্নেহমূঢ়া চণ্ডালিনী সব-কিছু জোগায়ে আনিছে।—
সেই সে অম্বিকা আজি কি লাগিয়া করে' অভিমান
ভূমিতলে পড়ে' আছে ?—চণ্ডালীর বাহিরায় প্রাণ !
"উঠ উঠ মা আমার, উঠ উঠ হৃদয়পুতলি"—
কন্যার শিয়রে বসি' সাধিতেছে শত কথা বলি'।
ত্বরা উঠি' কাঁদি' হাসি' করতলপিঠে আঁখি মুছি'
কহে বালা অভিলাষ—প্রভাতের রবিরশ্মিরুচি
মাটির দেয়াল'পরে খড়ে ঢাকা জানালার ফাঁকে
পড়িল আসিয়া মুখে, অভিমানে-রাঙা চোখে-নাকে,—
বিস্রস্ত চূর্ণচিকুরে, রাঙা-দুটি-অধরোষ্ঠ'পর
—(উপবাসে ক্ষীণ হ'য়ে যাহা আরো হয়েছে সুন্দর)—
—জানাইল আবদার—"মাগো, আমি গিয়েছিনু কালি
যে পথে তোমরা যাও মাঠ এড়ি' নগর বৈশালী—

বটতরুটির মূলে, কূপ হ'তে তুলিবারে জল।--
দারুণ মধ্যাহ্নবেলা, পুড়ি' যায় যেন নভতল—
কলসিটি ভরে' আমি ধীরে ধীরে রাখিয়া পাষাণে
চাহিয়া দেখিতেছিনু ছায়াভরা-বটপাতা-পানে
ঊর্দ্ধদিকে—কচি কচি হইতেছে কোথাও বাহির,
কোথাও সবুজ-গায় শতপাতা ঘেরি' একনীড়।—
কিছুই ছিল না মনে—সহসা তৃষায় হাহা করি'
এক ভিক্ষু মহাজন এসে প'ল উঠিনু শিহরি'!
একি রূপ মরি মরি! একি রূপ আগুনসমান—
তৃষায় শরীরখানি মৃদুমৃদু তাহে কম্পমান—
ঠিক যেন বহ্নিশিখা!—মাগো, আমি তৃষা তাঁর ভুলি'
রহিলাম চাহি' শুধু দুনয়ন প্রাণপণ খুলি'—
আহা!—চমকিয়া শেষে অঞ্জলিতে ঢেলে দিনু জল—
হাসি', আশীর্ব্বাদ করি' চলি গেলা হইয়া শীতল!
—চলি গেল? হায় মাগো—চলি গেল? চলি গেল দূর?
আর ফিরিবে না সে কি? যাব আমি তাহাদের পুর!
নাহি মোর লাজভয়—চিনি আমি বনপথ চিনি,
এখনি যাইব সেথা—যাই, আমি যাব একাকিনী—
অথবা—মা, তোর সেই মন্ত্র মোরে দেগো শিখায়ে দে।
সারারাত্রি জাগি' জাগি' মন্ত্রে তারে আনিবই বেঁধে!"
—জননীর দুই হাত দৃঢ় চাপি' বসিলা অম্বিকা!
চণ্ডালিনী কহে—"হায়, নাহি জানি কি কপালে লিখা!—
তারা যে সন্ন্যাসী ভিক্ষু মহাজন দেবতাসমান,
সমস্ত সংসার তাঁরা নিমিষেতে করে তুচ্ছজ্ঞান—
কি মন্ত্রে তাঁদেরে বাঁধি? বাঁধিলেও, হায় অভাগিনি,
ভিক্ষুর ভাঙিবি ব্রত? হ'বি ঘোরনরকগামিনী?"
"অযুত নরকে যাব"—কহিলা কিশোরী গরজিয়া—
"একবার তাঁরে শুধু এ ভুজবন্ধনমাঝে নিয়া
যাব যেথা যেতে হয়, শিখায়ে দে মন্ত্র ত্বরা করি'।"
দাঁতে দাঁত চাপি' মাতা বসি' রয় কতক্ষণ ধরি'।

২

২

ধরার ব্যথার ব্যথী ওই হের বসি' আছে সব—
বৈশালীর বেণুবনে বুদ্ধে ঘিরি' স্তম্ভিত-নীরব !
বৃহৎ হৃদয়গুলি অধীর বৃহৎ বেদনায় —
হোথা ক্ষুদ্র তৃষালোভ বিকার কভু না স্থান পায় !
আজি ঝঞ্ঝা বহিতেছে গরজবিদ্যুতজলে মাতি—
আজি যথা নভস্তলে হুঙ্কারিছে পাগলিনী রাতি—
তবু তার মাঝে সবে বুদ্ধে ঘিরি' বসি' আছে স্থির—
তেমনি ওদের হিয়া অকম্পিত ঝড়ে পৃথিবীর !
ক্রূর হানাহানি দ্বেষ, যজ্ঞভূমে পশুঘাতমত
লোকনিপীড়নমাঝে—উঁহারাই শুধু শান্তিব্রত !
—সে শান্তি জগতজনে দীনতমে দিবে বিলাইয়া
কি বৃহৎ করুণায় পরিপ্লুত ওই শত হিয়া !
—অনাথপিণ্ডিক হেথা, হোথায় আনন্দ মহাত্রাণ—
চৌদিকে কতই আর, ধ্যানমগ্ন, স্তিমিতনয়ান—
বৈশালীর বেণুবনবিহারে বোধিসত্ত্বেরে ঘিরে'
বসে আছে স্তব্ধ হ'য়ে—গরজিছে ঝটিকা বাহিরে !
—একি ?—আনন্দের মনে সর্ব্বনাশী কি এল বিকার ?
নীরব সে সঙ্ঘসনে হিয়া নাহি মন্ত্র জপে আর !
লালসার একি বহ্নি জ্বলি' ওঠে হৃদয়ের মাঝে
সে আলোকে উদ্ভাসিতা অনিন্দিতা এ কে চিত্তে রাজে ?
—সেই বটতরুমূল, আভরণহীনা সেই ছবি,
সেই চমকিত চোখ !—নিখিল পুড়িছে—দীপ্ত রবি—
তার মাঝে বটচ্ছায়ে তৃষাতুরে করে জলদান—
বহ্নিবর্ণে কে লিখিল নিদারুণ এই ছবিখান
ভিক্ষু আনন্দের বুকে ! দাঁতে দাঁত ঘরষি' সন্ন্যাসী
নিজমর্ম্ম হ'তে যেন আক্রোশে উৎসারি' রক্তরাশি
চাহিল ভুলিয়া যেতে !—হায় !—শেষে সংঘসভা ছাড়ি
কোথায় আনন্দ চলে সেই অন্ধঝটিকা বিদারি' !
হাহা করি' চারিদিকে লোটায়ে পড়িছে বেণুবন—
বিশ্ব দাবাইয়া নভ বারবার করে গরজন—
আপনার সঙ্গে যুঝি' তেমনি ঝটিকা বুকে ধরি'

আনন্দ, প্রান্তরপথ চলিছেন অতিক্রম করি' ;
শাখাপত্র ওড়ে মুখে, ত্রিবস্ত্র বাহিয়া পড়ে নীর—
কি টানে চলিছে ভিক্ষু অম্বিকার সুদূর কুটীর !

হেথা হের চণ্ডালিনী কোন্ যজ্ঞ জ্বালিয়া কুটীরে,
পরি' এক বাঘছাল, রক্তসূত্রে জড়াইয়া শিরে,
জানু পাতি' বসিয়াছে, পড়িতেছে মন্ত্র ভয়ঙ্কর—
সম্মুখে কেহই নাই। মা গেছে সরিয়া দূরপর !
একাকিনী অম্বিকা সে পত্ররাশি বহ্নিমাঝে ছাড়ি'
দু'হাতে চাপিছে বক্ষ যেন হিয়া দেবে বা উপাড়ি'—
সহসা করুণা এ কি চিতে আসি' পশিল তাহার—
কহে চিত "ওই, ওই,—আসিতেছে, দেরি নাই আর '
ওই শুন ঝঞ্চামাঝে !—পদধ্বনি মৃদু মনোহর—
ও বুঝি বাজিছে মোর গূঢ়তম মরমভিতর !
আহা, আমি কিবা দিয়া বরিব হৃদয়রাজে আজি ?
এ মোর ভৈরবীবেশে ?—না না, এই ফুলদলরাজি,—
শিরোভূষা, কর্ণভূষা করি' লই !—থাক্ সেও থাক্—
রব আমি চক্ষু মুদি ভূমিতলে বসিয়া অবাক্,
করজোড়ে !" মুখখানি বুক'পরে পড়িল ঢলিয়া—
ব্যগ্র আরাধনাভরে কাঁপে হিয়া হানিয়া হানিয়া—
এমনি সঘনে বুঝি কেঁপেছিল আদি অন্ধকার
পূর্ব্বক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় এ বিশ্বভুবন ফুটিবার।
অকস্মাৎ মুক্তদ্বারে দীর্ঘমূর্ত্তি দাঁড়াইল আসি'—
ভ্রুকুটি-ভীষণ-মুখে "কি করিলি ?" গর্জ্জিলা সন্ন্যাসী।
"কি করিলি ?"—বিদারিত মরণের ক্ষোভে তীব্রস্বর
বিচরিল গৃহমাঝে শব্দময়ী ঝঞ্চার ভিতর !
অন্ধকারে আত্মহারা তরু যবে থাকে দাঁড়াইয়া—
কে জানে কেমন করি' স্তব্ধতায় কাঁপে তার হিয়া—
অকস্মাৎ বিনামেঘে বজ্র আসি' পড়ে শিরে তার,
পুড়ায়ে দীরিয়া ফেলে, তেমনি বাজিল অম্বিকার।
মুহূর্ত্ত নীরবে চাহি' চমকিয়া দাঁড়াল অম্বিকা—
"হায়, আমি কি করিনু, কি করিনু—এ যে বহ্নিশিখা !

এরে আমি মোর হীন অন্তরের কালিমাখা মেঘে
ঢাকিয়া ফেলেছি কিরে ?" হানে বক্ষ নিদারুণ বেগে !
চকিত নয়ন স্থির, দুই বাহু ঝুলে' স্পন্দহীন
দাঁড়াইয়া রহে নারী পুত্তলিকা যেন চিত্রলীন !
মর্ম্মে বাজে হাহাকার বিশ্বজোড়া বিয়াকুলধ্বনি—
"হায় হায় কি করিনু !—কি করিনু !—জগতের মণি
কোন্ মহাব্রতজনে পথচ্যুত করিলাম আমি।"
হৃদয়-ক্রন্দন-সনে বাহিরের ঝঞ্ঝাময়ী যামি'—
সুর মিলাইয়া দিল—অম্বিকা তাহাই শুনে কানে—
দাঁড়ায়ে নিস্পন্দদেহ—মূর্ত্তি যেন অঙ্কিত পাষাণে !
"কি করিনু !—কি করিনু ! হে তরুণ যতি মনোহর—
মোর বাসনার টান লাগিছে কি তব হিয়া'পর ?
কি করিনু !—কি করিনু ! হায়, আমি কেমনে আমায়,
দিব তব পদতলে ?—এ যে হিয়া ভস্ম লালসায় !"
অম্বিকা দাঁড়ায়ে রহে—হেথা শান্ত হ'য়ে এল ঝড়,
আর না ডাকিল বায়ু—শিথিল বরষা ঝরঝর—
শীতল পরশে কোন, ধীরে ধীরে এল জুড়াইয়া
অম্বিকার হিয়াতল—কহিল সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া—
"কোথা ? দেব, কোথা ফুল ? যেতে হ'ল ফিরে যেতে হ'ল—
আজ ফিরে যাও যতি পাব আমি তব পদতল !
ফুল ফুটাইব আমি এ হৃদয়ে বিজন সাধনে—
এ হৃদয়পুষ্প ল'য়ে সেইদিন যাব আরাধনে।"
অম্বিকা দাঁড়ায়ে র'ল—পদতলে ধরণী তাহার
আর না টলিছে যেন !—খুলি' পড়ে কেশ বালিকার !
বরষা থামিয়া গিয়া একা বায়ু জাগিল তখন,
দ্বার খুলি' অম্বিকার যজ্ঞবহ্নি নিভাল পবন !
অন্ধকারে এলোমেলো উড়ে তার কুন্তল-অঞ্চল
দু'চোখে দ্বিগুণ ধারে অম্বিকার বাহিরিছে জল !

শ্রীসতীশচন্দ্র রায়।

সার সত্যের আলোচনা।

বিগত প্রবন্ধে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের কল-কারখানা-সম্বন্ধে যে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয়ের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহা আনুপূর্ব্বিক এই ;—

(১) চক্ষুশ্রোত্রাদির সারভূত দশেন্দ্রিয়ের উপর সোয়ার হইয়া রহিয়াছে প্রাণ-মন বুদ্ধি, এক কথায়, অন্তঃকরণ *।

(২) অন্তঃকরণের হস্তে রাশ গুচ্ছ বাগানো রহিয়াছে—ত্রিবিধ শক্তি ; (১) জীবনী শক্তি প্রাণের হস্তে, (২) ইচ্ছাশক্তি মনের হস্তে, (৩) এবং ধীশক্তি বুদ্ধির হস্তে। ঐ তিনপ্রকার শক্তির স্থূল আবরণ হ'চ্চে তিন-প্রকার তৈজস-নাড়ী ;—জীবনী শক্তির স্থূল আবরণ মর্ম্মবহা নাড়ী, ইচ্ছাশক্তির স্থূল আবরণ কর্ম্মবহা নাড়ী, ধীশক্তির স্থূল আবরণ চেতোবহা নাড়ী।

(৩) বাহন-ঐ যে সূক্ষ্ম দশেন্দ্রিয়, তাহা সূক্ষ্মশরীরের বহিরঙ্গ ; আর, সোয়ার-ঐ যে অন্তঃকরণ, তাহা সূক্ষ্মশরীরের অন্তরঙ্গ।

সূক্ষ্মশরীর ঐ দ্বিবিধ অঙ্গের অঙ্গী।

(৪) সূক্ষ্মশরীরের বহিরঙ্গের এ-মুড়া হইতে অন্তরঙ্গের ও-মুড়া পর্য্যন্ত একটা ক্রমাভিব্যক্তির সোপান-পথ রহিয়াছে। সেই সোপান-পথের মাঝের ধাপে প্রাণের সঙ্গে দোসর জোটে মন, এবং শেষের ধাপে মনের সঙ্গে দোসর জোটে বুদ্ধি।

(৫) বুদ্ধির দুই অঙ্গ—(১) সামান্য-জ্ঞান এবং (২) বিশেষ জ্ঞান।

পূর্ব্বপ্রবন্ধে এইখানে থামিয়া-দাঁড়াইয়া একটি কথা ইঙ্গিত করা হইয়াছিল এই যে, দ্রষ্টা সামান্য-জ্ঞানের দ্বার দিয়া আত্মসত্তা উপলব্ধি করে, এবং বিশেষ-জ্ঞানের দ্বার দিয়া বস্তুসত্তা উপলব্ধি করে। শেষের এই কথাটির আদ্যোপান্ত ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যা'ক্।

প্রাণ, মন, বুদ্ধির উত্তরোত্তর ক্ষেত্রে আগমন।

যে সময়ে শকুন্তলা দুষ্যন্ত রাজার ধ্যানে তদ্গতচিত্তে নিমগ্না, সেই সময়ে যখন দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তখন প্রদীপের বর্ত্তিকায় যেমন করিয়া আগুন ধরানো হয়, তেমনি করিয়া দুর্ব্বাসা ঋষির কোপপ্রদীপ্ত মুখরশ্মি শকুন্তলার চাক্ষুষ তৈজস-নাড়ীতে কম্পন ধরাইয়াছিল, তাহাতে আর ভুল নাই। কিন্তু হইলে হইবে কি—সে তৈজস-কম্পন যেখানে আরব্ধ হইয়াছিল, সেইখানেই আটক পড়িয়া রহিয়া গেল। প্রাণের অন্ধকারাবৃত বহিঃ-প্রাঙ্গণেই আটক পড়িয়া রহিয়া গেল, তাহার ঊর্দ্ধে মনের দীপালোকিত চেতনাগৃহে বাহিয়া উঠিতে পারিল না। যাহাই হো'ক্ না

* কি কারণে প্রাণকে অন্তঃকরণের কোঠায় স্থান দেওয়া বিধেয়, তাহা পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে।

কেন—শকুন্তলার নয়নারবিন্দে দুর্ব্বাসা ঋষির জটাজুটধারী ছবি যাহা পড়িয়াছিল, তাহাও তো একপ্রকার চাক্ষুষ-ক্রিয়া? তাহারই নাম দ্যাখা। কিন্তু সে দেখা একপ্রকার অন্ধকারে ছায়া দ্যাখা, তাহা না-দ্যাখা'রই নামান্তর। মন কিন্তু আশ্চর্য্য সোনার কাটি! মনের সংস্পর্শমাত্রে চাক্ষুষ-ক্রিয়ার ঘুম ভাঙিয়া যায়;—ঘুম ভাঙিয়া যায় বটে, কিন্তু চক্ষুতে তবুও ঘুমের ঘোর লাগিয়া থাকে। ফলে, মনের দ্যাখা একপ্রকার স্বপ্ন-দ্যাখা;—তাহা প্রাণের দ্যাখা'র ন্যায় সুপ্ত দ্যাখাও নহে, আর, বুদ্ধির দ্যাখা'র ন্যায় প্রবুদ্ধ দ্যাখাও নহে—পরন্তু দুয়ের মাঝামাঝি। শুধু-কেবল "দেখিতেছি-মাত্র" বলিলে যেরূপ দ্যাখা বুঝায়, তাহাই মনের দ্যাখা! দেখিতেছি-মাত্র রকমের দ্যাখা যে একপ্রকার স্বপ্ন-দ্যাখা, তাহার প্রমাণ এই যে, স্বপ্নকালে যাহা-কিছু দেখা যায়, তাহা দেখিতেছি-মাত্র ছাড়া আর-কিছুই নহে। স্বপ্নকালে দ্রষ্টার শরীরে চেতনা (sensation) যে থাকে না, তাহা নহে; স্বপ্নের বন-ভ্রমণে গায়ে কাঁটা বিঁধিলে স্বপ্নদর্শকের চেতন হয় খুবই—হয় না কেবল চৈতন্য (self-consciousness)। স্বপ্ন-কালে দ্রষ্টার একটিবারও এরূপ চৈতন্য হয় না যে, আমি স্বপ্ন দেখিতেছি। স্বপ্নকালে দ্রষ্টার চেতনা (sensation) থাকে, কিন্তু চৈতন্য (self-consciousness) থাকে না;—আত্মবিস্মৃতি স্বপ্নের গলা-জড়ানিয়া সখী। মণি অপেক্ষা মাণিক্যের মূল্য অনেক বেশী, এটা যখন সকলেরই জানা কথা, তখন এ কথা বলা বাহুল্য যে, চেতনার অপেক্ষা চৈতন্যের মূল্য অনেক বেশী। চৈতন্য অপূর্ব্ব স্পর্শমণি! চৈতন্যের সংস্পর্শে মনের স্বপ্ন ভাঙিয়া-গিয়া পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যাহা দেখিতেছি-মাত্র ছিল, পরমুহূর্ত্তে তাহা জানিতেছি হইয়া উঠে। চৈতন্য বুদ্ধিরই অন্তরঙ্গ। তাই বুদ্ধির দ্যাখা মনের দ্যাখা অপেক্ষা আরো এক-ধাপ উচ্চ অঙ্গের দ্যাখা। মনের দ্যাখা সচেতন, কিন্তু সজ্ঞান নহে। বুদ্ধির দ্যাখাই সজ্ঞান দ্যাখা। মন দেখে-মাত্র; বুদ্ধি দেখে শুধু না, সেই সঙ্গে জানে যে, আমি অমুক বস্তু দেখিতেছি। দ্যাখা'র সঙ্গে এইরূপ যখন জানা'র দ্যাখাসাক্ষাৎ হয়—চৈতন্যের দ্যাখাসাক্ষাৎ হয়—তখন দ্রষ্টার চক্ষু হইতে স্বপ্নের ঘোর চলিয়া যায়; স্বপ্নের ঘোর চলিয়া গেলে সত্যাসত্যের খোঁজ পড়ে; সত্যাসত্যের খোঁজ পড়িলে বুদ্ধি স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়; স্বকার্য্য-সে আর-কিছু না—সত্যের অবধারণা। ফল কথা এই যে, যেমন গৃহ-বিড়াল বনে গেলেই বন-বিড়াল হয়, তেমনি প্রাণের অচেতন দ্যাখা মনে পৌঁছিলেই সচে-তন দ্যাখা হয়, এবং মনের আত্মবিস্মৃত রকমের অজ্ঞান দ্যাখা বুদ্ধিতে পৌঁছিলেই সজ্ঞান দ্যাখা হয়। সজ্ঞান দ্যাখা'র কার্য্যক্ষেত্রে বুদ্ধির দুই অঙ্গ একত্রে খাটে; এক অঙ্গ হ'চ্চে সামান্য-জ্ঞান, আর-এক অঙ্গ হ'চ্চে বিশেষ-জ্ঞান।

বুদ্ধির যুগলাঙ্গ।

বুদ্ধিপ্রদেশের কোনো-একটি ছোটোখাটো জ্ঞানক্রিয়া ধরা যা'ক্—যেমন "আমি জানি-তেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই একটি জ্ঞান-ক্রিয়া। এরূপ স্থলে আমার জ্ঞান একযোগে দুইটি ব্যাপারে ব্যাপৃত হইতেছে; একটি ব্যাপার হ'চ্চে আমি

জানিতেছি, আর-একটি ব্যাপার হ'চ্চে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি। বুদ্ধির এই যে ব্যাখ্যা, এটা ব্যাখ্যা শুধু না—এটা একপ্রকার জানা। জানিতেছি'র সংস্পর্শগুণে দেখিতেছিও এক-প্রকার জানিতেছি হইয়া দাঁড়াইতেছে; তাহা না হইবে কেন? পূর্ব্বেই তো বলিয়াছি যে, জ্ঞান একপ্রকার স্পর্শমণি! জ্ঞানের সংস্পর্শগুণে দেখিতেছি যখন জানিতেছি হইয়া দাঁড়ায়, তখন তাহাকে জ্ঞান বলিব না তো আর কি বলিব? তাহা জ্ঞান তাহাতে আর ভুল নাই; তবে কিনা, তাহা বিশেষ একপ্রকার জ্ঞান; তা বই, তাহা সামান্য-জ্ঞান নহে—নির্বিশেষ জ্ঞান নহে। কেন না, দেখিতেছি-ব্যাপারটি বিশেষ একপ্রকার জ্ঞানের ধর্ম্ম—চাক্ষুষ-জ্ঞানের ধর্ম্ম; তা বই, তাহা নির্বিশেষে (বা সামান্যত) সকল জ্ঞানের ধর্ম্ম নহে—জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম্ম নহে। জানিতেছিই সামান্যত সকল জ্ঞানের ধর্ম্ম—জ্ঞানমাত্রেরই ধর্ম্ম। তবেই হইতেছে যে, "আমি জানিতেছি যে, আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই মোট জ্ঞানক্রিয়াটা'র অঙ্গ-দুইটির একটি হ'চ্চে আমি জানিতেছি—এটা সামান্য-জ্ঞান; আর-একটি হ'চ্চে আমি গোলাপফুল দেখিতেছি—এটা বিশেষ-জ্ঞান।

আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা।

বুদ্ধির ঐ যে দুই অঙ্গ—সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে প্রথম অঙ্গটি অর্থাৎ সামান্য-জ্ঞান দুভাঁজ-করা কাগজের মতো দ্বিমণ্ডিত। সামান্য-জ্ঞানে ব্যাপার একটি দেখিতে পাওয়া যায় বড়ই আশ্চর্য্য, তাহা এই:—

"আমি যে জানিতেছি" এটাও জানিতেছি, জানিতেছি-কে জানিতেছি। এ একপ্রকার চোরের উপরে বাটপাড়ি! সামান্য-জ্ঞান নিজেও যেমন, সামান্য-জ্ঞানের বিষয়ও তেমনি, দুইই জানিতেছি ভিন্ন আর-কিছুই নহে। সামান্য-জ্ঞানকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তুমি কি জানিতেছ?—তোমার জ্ঞেয়-বিষয় কি? সামান্য-জ্ঞান বলিবে যে, এইটি কেবল আমি জানিতেছি যে, আমি জানিতেছি; আমার জ্ঞেয়-বিষয়ই হ'চ্চে আমি জানিতেছি। তবেই হইতেছে যে, সামান্য-জ্ঞানে আপনার নিকটে আত্মসত্তা স্বতঃপ্রকাশমান।

অতঃপর দ্রষ্টব্য এই যে, জানিতেছিকেও যেমন, দেখিতেছিকেও তেমনি—দুটা'কেই জানিতে পারা যায় কেবল জ্ঞানে; তা বই, দুয়ের কোনোটিকেই চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্ঞান-ক্রিয়াকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না, দর্শন-ক্রিয়াকেও চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। জানিতেছি'র নিকটে প্রকাশ পায় "জানিতেছি" এবং "দেখিতেছি" দুইই; পক্ষান্তরে, দেখিতেছি'র নিকটে জানিতেছি তো প্রকাশ পায়ই না—তা ছাড়া, দেখিতেছি নিজেও প্রকাশ পায় না। জানিতেছি'র কাছে জানিতেছি প্রকাশ পায়, কিন্তু দেখিতেছি'র কাছে দেখিতেছি প্রকাশ পায় না। তবেই হইতেছে যে, "আমি জানিতেছি" এই সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায়; পক্ষান্তরে, "আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই বিশেষ-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায় না। বিশেষ-জ্ঞানে—কি তবে প্রকাশ পায়? বস্তুসত্তা প্রকাশ

পায়। "আমি গোলাপফুল দেখিতেছি" এই বিশেষ-জ্ঞানে দৃশ্যমান গোলাপফুলের সত্তাই প্রকাশ পায়।

কেহ বলিতে পারেন—"বিশেষ-জ্ঞানে দৃশ্যমান গোলাপফুলের সত্তা প্রকাশ পায়" এ যাহা তুমি বলিতেছ, এ কথা আমি মানি; কিন্তু "সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা প্রকাশ পায়" এ কথাটা আমার নিকটে তেমন প্রামাণিক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে না। সত্য বটে যে, সামান্য-জ্ঞানে জ্ঞানের নিজ-সত্তা প্রকাশ পায়, কিন্তু জ্ঞানের নিজ-সত্তা তো আর আত্মসত্তা নহে, জ্ঞাতা'র নিজ-সত্তাই আত্ম-সত্তা।" ইহার উত্তরে পাতঞ্জল-যোগসূত্রের প্রসিদ্ধ বৃত্তি-কার ভোজরাজ কি বলিতেছেন —তাহা প্রণিধান কর।

পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রের সমাধিপাদের নবম সূত্র এই যে, "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" 'শব্দ-জ্ঞানের পাছু-পাছু দৌড়ায় যে-একপ্রকার বস্তুশূন্য অধ্যবসায় (অর্থাৎ ফাঁকা আওয়াজ), তাহারই নাম বিকল্প।' বৃত্তি-কার ইহার ভাবার্থ খোলসা করিয়া ভাঙিয়া বলিতেছেন এইরূপ :—

বস্তুনস্তথাত্বমনপেক্ষমাণো যোঽধ্যবসায়ঃ স বিকল্প উচ্যতে। যথা পুরুষস্য চৈতন্যং স্বরূপমিতি। অত্র দেবদত্তস্য কম্বল ইতি শব্দজনিতে জ্ঞানে ষষ্ঠ্যা যোঽধ্যবসিতো ভেদস্তমিহাবিদ্যমানমপি সমারোপ্য প্রবর্ত্ততেঽধ্যবসায়ঃ। বস্তুতস্তু চৈতন্যমেব পুরুষঃ।"

ইহার অর্থ।—বস্তুটা যে কি,তাহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া যদি কোনো কথা শূন্যের উপরে দাঁড় করানো হয়, তবে তাহারই নাম বিকল্প; যেমন, "পুরুষের (অর্থাৎ আত্মার) চৈতন্য" এই একটি কথা। আত্মার চৈতন্য বলিলে বুঝায়—দেবদত্তের কম্বলের ন্যায় চৈতন্য যেন আত্মার উপরে বাহির হইতে চাপানো হইয়াছে। বস্তুত চৈতন্যই আত্মা।

স্কট্লাণ্ডদেশীয় প্রসিদ্ধ দর্শনকার হ্যামিণ্টন্ও তাহাই বলেন। চৈতন্য কিনা Selfconsciousness। পঞ্চদশীর গ্রন্থকার বলেন—"সংবিৎ"ই (consciousness) আত্মা। তিন কালের তিন মহাপণ্ডিত একবাক্যে বলিতেছেন যে, চৈতন্যই আত্মা। এরূপ একটা সর্ব্ববাদিসম্মত কথা'র ছল ধরিতে চেষ্টা না করিয়া উহার তাৎপর্য্য এবং মর্ম্ম সবিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝিয়া দেখাই শ্রেয়ঃ-কল্প। এ কথা তো কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, চৈতন্য আপনি আপনার নিকটে প্রকাশ পায়। তবেই হইতেছে যে, চৈতন্য আপনিই জ্ঞান, আপনিই জ্ঞাতা, আপনিই জ্ঞেয়, তিনই একাধারে। অতএব এটা স্থির যে, চৈতন্যরূপী সামান্য-জ্ঞানে আত্মসত্তা স্বতঃপ্রকাশমান। তা ছাড়া, সাংখ্যসারনামক একখানি অনতিপ্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ লেখে যে,

"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতি ধীবলাৎ।"

"সামান্যত 'জানিতেছি' এইরূপ বুদ্ধির বলেই দ্রষ্টা সিদ্ধ হয় অর্থাৎ দ্রষ্টার সত্তা সপ্রমাণ হয়।" আমরাও তাহাই বলিতেছি; বলিতেছি যে, দ্রষ্টা সামান্য-জ্ঞানের দ্বার দিয়া আত্মসত্তা উপলব্ধি করে।

সামান্য-বিশেষের পরস্পরাপেক্ষিতা।

উপরে দেখা গেল যে, বুদ্ধির জ্ঞানালোকে যখন সত্তা প্রকাশ পায়, তখন আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা, দুইই একযোগে প্রকাশ পায়। আত্মসত্তা প্রকাশ পায় সামান্য-জ্ঞানে;

বস্তুসত্তা প্রকাশ পায় বিশেষ-জ্ঞানে। তাহার মধ্যে একটি কথা আছে; সেটি এই :—

শুধু-কেবল মাথাটাকে অথবা শুধু-কেবল ধড়টা'কে যেমন সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন শরীর বলা যাইতে পারে না, তেমনি, শুধু-কেবল সামান্য-জ্ঞানকে অথবা শুধু-কেবল বিশেষ-জ্ঞানকে সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। সামান্য-জ্ঞানও যেমন, বিশেষ-জ্ঞানও তেমনি, দুইই জ্ঞানের একাঙ্গ-মাত্র; তা বই, দুয়ের কোনটিই পূর্ণাবয়ব জ্ঞান নহে। সামান্য-জ্ঞান চায় বিশেষ-জ্ঞানকে; বিশেষ-জ্ঞান চায় সামান্য-জ্ঞানকে। ধীশক্তির কার্য্যই হ'চ্চে সামান্য-জ্ঞানকে বিশেষ-জ্ঞান দিয়া ফোটাইয়া তোলা এবং বিশেষ-জ্ঞানকে সামান্য-জ্ঞান দিয়া শোধন করিয়া তোলা। বিষয়টি যেমন গুরুতর, তেমনি দুরূহ; অতএব এবারে এইখানেই সমাপ্তি করা বিধেয়। সামান্য-বিশেষের মধ্যে, তথৈব আত্মসত্তা এবং বস্তু-সত্তার মধ্যে, শক্তির কিরূপ চলাচলি হয়; এবং দুয়ের মধ্যে মর্ম্মান্তিক ঐক্যসূত্রই বা কিরূপ, এই সকল দুরূহ বিষয় বারান্তরের আলোচনার জন্য হাতে রাখিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নৌকাডুবি।

২৬

তখনো বেলা যায় নাই, এমন-সময় ষ্টীমার চরে ঠেকিয়া গেল। সেদিন অনেক ঠেলাঠেলিতেও ষ্টীমার ভাসিল না। উঁচু পাড়ের নীচে জলচর পাখীদের পদাঙ্কখচিত এক-স্তর বালুকাময় নিম্নতট কিছুদূর হইতে বিস্তীর্ণ হইয়া নদীতে আসিয়া নামিয়াছে। সেইখানে গ্রামবধূরা তখন দিনান্তের শেষ জলসঞ্চয় করিয়া লইবার জন্য ঘট লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কোনো কোনো প্রগল্‌ভা বিনা অবগুণ্ঠনে এবং কোনো কোনো ভীরু ঘোম্‌টার অন্তরাল হইতে ষ্টীমারের দিকে চাহিয়া কৌতূহল মিটাইতেছিল। ঊর্দ্ধনাসিক স্পর্দ্ধিত জলযানটার দুর্ব্বিপাকে গ্রামের ছেলে-গুলা পাড়ের উপরে দাঁড়াইয়া চীৎকারস্বরে ব্যঙ্গোক্তি করিতে করিতে নৃত্য করিতেছিল।

ওপারের জনশূন্য চরের মধ্যে সূর্য্য অস্ত গেল। রমেশ জাহাজের রেলিং ধরিয়া সন্ধ্যার আভায় দীপ্যমান পশ্চিম দিগন্তের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া ছিল। কমলা তাহার বেড়া-দেওয়া রাঁধিবার জায়গা হইতে আসিয়া কামরার দরজার পাশে দাঁড়াইল। রমেশ শীঘ্র পশ্চাতে মুখ ফিরাইবে, এমন

সম্ভাবনা না দেখিয়া সে মৃদুভাবে একটু-আধটু কাশিল—তাহাতেও কোন ফল হইল না—অবশেষে তাহার চাবির গোছা দিয়া দরজায় ঠক্‌ঠক্ করিতে লাগিল। শব্দ যখন প্রবলতর হইল, তখন রমেশ মুখ ফিরাইল। কমলাকে দেখিয়া তাহার কাছে আসিয়া কহিল—"এ তোমার কি-রকম ডাকিবার প্রণালী ?"

কমলা কহিল—"তা, কি রকম করিয়া ডাকিব ?"

রমেশ কহিল, "কেন, বাপমায়ে আমার নামকরণ করিয়াছিলেন কিসের জন্য,—যদি কোনো ব্যবহারেই না লাগিবে ? প্রয়োজনের সময় আমাকে রমেশবাবু বলিয়া ডাকিলে ক্ষতি কি ?"

আবার সেই একই-রকম ঠাট্টা ! কমলার কপোলে এবং কর্ণমূলে সন্ধ্যার আভার উপরে আরো একটুখানি রক্তিম আভা যোগ দিল ;—সে মাথা বাঁকাইয়া কহিল, "তুমি কি যে বল, তাহার ঠিক নাই ! শোন, তোমার খাবার তৈরি ; একটু সকাল-সকাল খাইয়া লও ! আজ ওবেলায় ভাল করিয়া খাওয়া হয় নাই।"

নদীর বাতাসে রমেশের ক্ষুধাবোধ হইতেছিল। আয়োজনের অভাবে পাছে কমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেইজন্য কিছুই বলে নাই—এমন সময়ে অযাচিত আহারের সংবাদে তাহার মনে যে একটা সুখের আন্দোলন তুলিল, তাহার মধ্যে একটু বৈচিত্র্য ছিল। কেবল ক্ষুধানিবৃত্তির আসন্ন সম্ভাবনার সুখ নহে—কিন্তু সে যখন জানিতেছে না, তখনো যে তাহার জন্য একটি চিন্তা জাগ্রত আছে,—একটি চেষ্টা ব্যাপৃত রহিয়াছে,—তাহার সম্বন্ধে একটি কল্যাণের বিধান স্বতই কাজ করিয়া চলিয়াছে, ইহার গৌরব সে হৃদয়ের মধ্যে অনুভব না করিয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু ইহা তাহার প্রাপ্য নহে, এত-বড় জিনিষটা কেবল ভ্রমের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—এই চিন্তার নিষ্ঠুর আঘাতও সে এড়াইতে পারিল না—সে শির নত করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

কমলা তাহার মুখের ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—"তোমার বুঝি খাইতে ইচ্ছা নাই ? ক্ষুধা পায় নাই ? আমি কি তোমাকে জোর করিয়া খাইতে বলিতেছি ?"

রমেশ তাড়াতাড়ি প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া কহিল—"তোমাকে জোর করিতে হইবে কেন, আমার পেটের মধ্যেই জোর করিতেছে। এখন ত খুব চাবি ঠক্‌ঠক্ করিয়া ডাকিয়া আনিলে, শেষকালে পরিবেষণের সময় যেন দর্পহারী মধুসূদন দেখা না দেন !"

এই বলিয়া রমেশ চারিদিকে চাহিয়া কহিল—"কই, খাদ্যদ্রব্য ত কিছু দেখি না। খুব ক্ষুধার জোর থাকিলেও এই আস্‌বাব্‌-গুলা আমার হজম হইবে না—ছেলেবেলা হইতে আমার অন্যরকম অভ্যাস।"—রমেশ কামরার বিছানা প্রভৃতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিল।

কমলা খিল্‌খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসির বেগ থামিলে কহিল—"এখন বুঝি আর সবুর সহিতেছে না ? যখন আকাশের দিকে তাকাইয়া ছিলে, তখন বুঝি ক্ষুধাতৃষ্ণা

ছিল না। আর যেম্‌নি আমি ডাকিলাম, অম্‌নি মনে পড়িয়া গেল ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে! আচ্ছা, তুমি একমিনিট বোস, আমি আনিয়া দিতেছি।”

রমেশ কহিল—“কিন্তু দেরি হইলে এই বিছানাপত্র কিছুই দেখিতে পাইবে না—তখন আমার দোষ দিয়ো না!”

রসিকতার এই পুনরুক্তিতে কমলার কম আমোদবোধ হইল না!, তাহার আবার ভারি হাসি পাইল। সরল হাস্যোচ্ছ্বাসে ঘরকে সুধাময় করিয়া-দিয়া কমলা দ্রুতপদে খাবার আনিতে গেল। রমেশের কাষ্ঠ-প্রফুল্লতার ছদ্মদীপ্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে কালিমায় ব্যাপ্ত হইল।

উপরে-শালপাত-ঢাকা একটা চাঙারি লইয়া অনতিকাল পরেই কমলা কামরায় প্রবেশ করিল। বিছানার উপরে চাঙারি রাখিয়া আঁচল দিয়া ঘরের মেজে মুছিতে লাগিল।

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, “ও কি করিতেছ?”

কমলা কহিল—“আমি ত এখনি কাপড় ছাড়িয়া ফেলিব!”—এই বলিয়া শালপাতা তুলিয়া পাতিল ও তাহার উপরে লুচি ও তরকারী নিপুণহস্তে সাজাইয়া দিল।

রমেশ কহিল—“কি আশ্চর্য্য! লুচির জোগাড় করিলে কি করিয়া?”

কমলা সহজে রহস্য ফাঁস না করিয়া অত্যন্ত নিগূঢ়ভাব ধারণ করিয়া কহিল—“কেমন করিয়া বল দেখি?”

রমেশ কঠিন চিন্তার ভাণ করিয়া কহিল—“নিশ্চয়ই খালাসীদের জলখাবার হইতে ভাগ বসাইয়াছ!”

কমলা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া কহিল—“কখ্‌খন না! রাম বল!”

রমেশ খাইতে খাইতে লুচির আদিকারণ-সম্বন্ধে যত-রাজ্যের অসম্ভব কল্পনা দ্বারা কমলাকে রাগাইয়া তুলিল। যখন বলিল, “আরব্য উপন্যাসের প্রদীপওয়ালা আলাদীন বেলুচিস্থান হইতে গরম-গরম ভাজাইয়া তাহার দৈত্যকে দিয়া সওগাদ পাঠাইয়াছে,” তখন কমলার আর ধৈর্য্য কিছুতেই রহিল না,—সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, “তবে যাও—আমি বলিব না!”

রমেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল—“না না, আমি হার মানিতেছি! মাঝদরিয়ায় লুচি—এ যে কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে, আমি ত ভাবিয়া পাইতেছি না—কিন্তু তবু খাইতে চমৎকার লাগিতেছে!”

এই বলিয়া রমেশ তত্ত্বনির্ণয় অপেক্ষা ক্ষুধানিবৃত্তির শ্রেষ্ঠতা সবেগে সপ্রমাণ করিতে লাগিল।

ষ্টীমার চরে ঠেকিয়া গেলে, শূন্যভাণ্ডার-পূরণের চেষ্টায় কমলা উমেশকে গ্রামে পাঠাইয়াছিল। স্কুলে থাকিতে জলপানি-স্বরূপে রমেশ কমলাকে যে কয়টি টাকা দিয়াছিল, তাহারই মধ্য হইতে অল্প-কিছু বাঁচিয়াছিল, তাহাই দিয়া কিছু ঘি-ময়দা সংগ্রহ হইল। উমেশকে কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“উমেশ, তুই কি খাবি বল্‌ দেখি?”

উমেশ কহিল—“মাঠাকুরুণ, দয়া কর যদি, গ্রামে গোয়ালার বাড়ীতে বড় সরেস দই দেখিয়া আসিলাম—কলা ত ঘরেই আছে, আর পয়সা-দুয়েকের চিঁড়ে-মুড়কি হইলেই পেট ভরিয়া আজ ফলার করিয়া লই।”

লুব্ধ বালকের ফলারের উৎসাহে কমলাও উৎসাহিত হইয়া উঠিল—কহিল, "পয়সা কিছু বাঁচিয়াছে উমেশ ?"

উমেশ কহিল—"কিছু না মা !"

কমলা মুস্কিলে পড়িয়া গেল। রমেশের কাছে কেমন করিয়া মুখ ফুটিয়া টাকা চাহিবে, তাই ভাবিতে লাগিল। একটু পরে বলিল—"তোর ভাগ্যে আজ যদি ফলার না-ই জোটে, তবে লুচি আছে—তোর ভাবনা নাই। চল্, ময়দা মাখ্‌বি চল্ !"

উমেশ কহিল—"কিন্তু মা, দই যা দেখিয়া আসিলাম, সে আর কি বলিব।"

কমলা কহিল, "দেখ্ উমেশ, বাবু যখন খাইতে বসিবেন, তখন তুই তোর বাজারের পয়সা চাহিতে আসিস্।"

রমেশের আহার কতকটা অগ্রসর হইলে, উমেশ আসিয়া দাঁড়াইয়া সসঙ্কোচে মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। রমেশ তাহার মুখের দিকে চাহিল। সে অর্দ্ধোক্তিতে কহিল—"মা, বাজারের পয়সা—"

তখন রমেশের হঠাৎ চেতনা হইল যে, আহারের আয়োজন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন হয়, আলাদীনের প্রদীপের অপেক্ষা করিলে চলে না। ব্যস্ত হইয়া কহিল—"কমলা, তোমার কাছে ত টাকা কিছুই নাই। আমাকে মনে করাইয়া দাও নাই কেন ?"

কমলা নীরবে অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল। আহারান্তে রমেশ কমলার হাতে একটি ছোট ক্যাশ্‌বাক্স দিয়া কহিল—"এখনকার মত তোমার ধনরত্ন সব এইটেতেই রহিল।"

এইরূপে গৃহিণীপনার সমস্ত ভারই আপনা হইতেই কমলার হাতে গিয়া পড়িতেছে, রমেশ তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আবার একবার জাহাজের রেলিং ধরিয়া পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিল। পশ্চিম আকাশ দেখিতে দেখিতে তাহার চোখের উপরে সম্পূর্ণ অন্ধকার হইয়া আসিল।

উমেশ আজ পেট ভরিয়া চিঁড়ে-দই-কলা মাখিয়া ফলার করিল। কমলা সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহার জীবনবৃত্তান্ত সবিস্তারে আয়ত্ত করিয়া লইল।

বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত উমেশ কাশীতে তাহার মাতামহীর কাছে পালাইয়া যাইতেছিল—সে কহিল, "মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ, তবে আমি আর কোথাও যাই না।"

মাতৃহীন বালকের মুখে মা-সম্ভাষণ শুনিয়া বালিকার কোমল হৃদয়ের কোন্‌-এক গভীরদেশ হইতে জননী সাড়া দিল—কমলা স্নিগ্ধস্বরে কহিল—"বেশ ত উমেশ, তুই আমাদের সঙ্গেই চল্ !"

২৭

তীরের বনরাজি অবিচ্ছিন্ন মসীলেখায় সন্ধ্যাবধূর সোনার অঞ্চলে কালো পাড় টানিয়া দিল। গ্রামান্তরের বিলের মধ্যে সমস্তদিন চরিয়া বন্যহংসের দল আকাশের ম্লানায়মান সূর্য্যাস্তদীপ্তির মধ্য দিয়া ওপারের তরুশূন্য বালুচরে নিভৃত জলাশয়গুলিতে রাত্রিযাপনের জন্য চলিয়াছে। কাকেদের বাসায় আসিবার কলরব থামিয়া গেছে ! নদীতে তখন নৌকা ছিল না ;—একটিমাত্র বড় ডিঙি গাঢ় সোনালিসবুজ

নিস্তরঙ্গ জলের উপর দিয়া আপন কালিমা বহিয়া নিঃশব্দে গুণ টানিয়া চলিয়াছিল।

রমেশ জাহাজের ছাদের সম্মুখভাগে নবোদিত শুক্লপক্ষের তরুণচাঁদের আলোকে বেতের কেদারা টানিয়া-লইয়া বসিয়া ছিল। এই শূন্য নদীতটের সন্ধ্যার ঊর্দ্ধদেশে চাঁদ যেমন দিক্‌প্রান্তের কুহেলিকা হইতে নির্ম্মল মধ্যাকাশে আপনি ভাসিয়া উঠিতেছে—তেম্‌নি রমেশের সমস্ত চিত্তের গভীরতা হইতে একটি মধুর স্মৃতি বিকীর্ণ মেঘজালের ভিতর দিয়া আপনি নিঃশব্দপদে সকলের উচ্চে ভাসিয়া উঠিতেছিল।

কালিদাস বলিয়াছেন—রমণীয় দৃশ্য দেখিলে এবং মধুর ধ্বনি শুনিলে জন্মান্তরের ভালবাসাগুলি যেন মনে পড়িয়া যায়। কালিদাসের সেই শ্লোকটি মনে মনে আবৃত্তি করিয়া রমেশ ভাবিতে লাগিল, 'ইহজন্মের মধ্যেই জন্মান্তর ঘটে। বেশিদিনের কথা নয়,—একমাসও হইবে না—সেদিন ত আজ একেবারে গতজন্মের মতই গত। সেই দিনের মধ্যে আজ প্রবেশের কোন পথই দেখা যাইতেছে না—হঠাৎ মাঝখানে যেন একমুহূর্ত্তে বহুশতাব্দী প্রবাহিত হইয়া সেদিনকে অতিদূর পরপারের অস্তাচলচ্ছায়ার মধ্যে লইয়া গেছে।' আজিকার এই নদীতীরের শরৎসন্ধ্যা তাহার জগদ্ব্যাপী বৃহৎ অবসানবেদনার নিস্তব্ধতায় রমেশের সেই গতজন্মকে আচ্ছন্ন করিয়া ঐ স্তব্ধকুলায় আম্রবনে, ঐ তৃণশূন্য বালুতটে, এই তরঙ্গরেখাবিহীন বিপুল জলরাশির উপরে একাকিনী অবগুণ্ঠিতমুখে ক্ষীণজ্যোৎস্ন আকাশতলে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার সেদিনের সহিত আজিকার দিনের ক্ষণকালের মধ্যেই এত-বড় বিচ্ছেদ হইয়া গেছে, তবু সেই অতীতলক্ষ্মী বিশ্বজগৎকে সেই চিরপরিচিত মূর্ত্তিতে উন্মেষিত করিয়া তুলিতেছে। সেই ভাবগভীর মুখ, সেই নির্ম্মল ললাটের উপরে জলভারনম্র নবনীরদের মত স্তম্ভিত কেশরাজি, সেই সুকুমার গ্রীবা, সেই তরুণ তনুদেহে কোমল শাড়ীটির তরঙ্গিত অঞ্চলরেখা, সেই স্নিগ্ধবিশ্বস্ত দৃষ্টির নিবিড় একাগ্রতা আজ সায়াহ্নের ম্লানিমা হইয়া, সন্ধ্যাতারার সুদূরতা হইয়া, তরুপ্রচ্ছন্ন গ্রামের নিভৃত-নিস্তব্ধ বিশ্রাম হইয়া, জনশূন্য বালুতটের দিগন্তপ্রসারিত পাণ্ডুরতা হইয়া বিশাল প্রকৃতির মূক-বৃহৎ অব্যক্তভাষায় জলে-স্থলে-আকাশে,—চন্দ্রের অস্ফুট আলোকে ও বনের প্রগাঢ়চ্ছায়ায়,—নদীর স্তিমিত-গোপন গতিতে ও তটভূমির তিমিরাচ্ছন্ন গম্ভীর নিশ্চলতায় অপরূপভাবে ভাষান্তরিত হইতে লাগিল এবং রমেশকে অন্তরে-বাহিরে, আপাদমস্তকে, তাহার চেতনার কুহরে-কুহরে আবিষ্ট করিয়া ধরিল—অনির্ব্বচনীয় বেদনায় তাহার হৃৎপিণ্ডকে পীড়ন করিয়া তাহার বিদীর্ণ শতচ্ছিদ্র হইতে প্রেমের সুধারসধারা তীক্ষ্ণবেগে নিস্তব্ধ নক্ষত্রলোকের মাঝখানে উৎসারিত করিয়া দিল।

পশ্চিম আকাশ হইতে সন্ধ্যার শেষ স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া গেল; চন্দ্রালোকের ইন্দ্রজালে কঠিন জগৎ যেন গানে, যেন স্বপ্নে, যেন কবির কল্পনারূপে বিগলিত হইয়া আসিল। রমেশ আপনা-আপনি মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—"হেম, হেম!"—সেই নামের শব্দটিমাত্র যেন সুমধুর-স্পর্শরূপে তাহার

সমস্ত হৃদয়কে বারংবার বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া ফিরিল— সেই নামের শব্দটি-মাত্র যেন অপরিমেয়-করুণারসার্দ্র দুইটি ছায়াময় চক্ষুরূপে তাহার মুখের উপরে বেদনা বিকীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিল। রমেশের সর্ব্বশরীর পুলকিত এবং দুই চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিল।

তাহার গত দুই বৎসরের জীবনের সমস্ত ইতিহাস তাহার মনের সম্মুখে প্রসারিত হইয়া গেল;—সমস্ত তুচ্ছকথা, ক্ষুদ্রঘটনা এক অপূর্ব্ব রাগিণীর দ্বারা প্রবাহিত হইয়া তাহার বক্ষের মধ্যে কুহরিত হইতে লাগিল। হেমনলিনীর সহিত তাহার প্রথম পরিচয়ের দিন মনে পড়িয়া গেল। সেদিনকে রমেশ তাহার জীবনের একটি বিশেষ দিন বলিয়া চিনিতে পারে নাই। যোগেন্দ্র যখন তাহাকে তাহাদের চায়ের টেবিলে লইয়া গেল, সেখানে হেমনলিনীকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া লাজুক রমেশ আপনাকে নিতান্ত বিপন্ন বোধ করিয়াছিল। অল্পে অল্পে লজ্জা ভাঙিয়া গেল, হেমনলিনীর সঙ্গ অভ্যস্ত হইয়া আসিল, ক্রমে সেই অভ্যাসের বন্ধন রমেশকে বন্দী করিয়া তুলিল। কাব্যসাহিত্যে রমেশ প্রেমের কথা যাহা-কিছু পড়িয়াছিল, সমস্তই সে হেমনলিনীর প্রতি আরোপ করিতে আরম্ভ করিল। আমি ভালবাসিতেছি মনে করিয়া সে মনে মনে একটা অহঙ্কার অনুভব করিল। তাহার সহপাঠীরা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইবার জন্য ভালবাসার কবিতার অর্থ মুখস্থ করিয়া মরে—আর রমেশ সত্যসত্যই ভালবাসে, ইহা চিন্তা করিয়া অন্য ছাত্রদিগকে সে কৃপাপাত্র মনে করিত। রমেশ আজ আলোচনা করিয়া দেখিল, সেদিনও সে ভালবাসার বহির্দ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন অকস্মাৎ কমলা আসিয়া তাহার জীবনসমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল, তখনি নানা বিরুদ্ধ ঘাত-প্রতিঘাতে দেখিতে দেখিতে হেমনলিনীর প্রতি তাহার প্রেম আকারধারণ করিয়া, জীবন গ্রহণ করিয়া জাগ্রত হইয়া উঠিল। এখন আর এ শাস্ত্রালোচনা নহে, খেলা নহে, এখন সুখদুঃখ নিরতিশয় নিবিড় হইয়া উঠিয়াছে, এখন প্রেম জীবন-মরণ অধিকার করিয়া বসিয়াছে, সংসারের সকল সত্যের চেয়ে সে সত্যতম হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

রমেশ তাহার দুই করতলের উপরে শির নত করিয়া ভাবিতে লাগিল, সম্মুখে সমস্ত জীবনই ত পড়িয়া রহিয়াছে—তাহার ক্ষুধিত উপবাসী জীবন—দুশ্ছেদ্য সঙ্কটজালে বিজড়িত। এ জাল কি সে সবলে দুই হাত দিয়া ছিন্ন করিয়া ফেলিবে না? ছিন্ন করিতেই হইবে—তাহার ইহজীবনের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা সত্য, যাহা সর্ব্বোচ্চ সফলতা, তাহা লাভ করিতেই হইবে! তাহার কোন্ এক জায়গায় কাপুরুষতার ছিদ্র পাইয়া শনি তাহাকে গ্রাস করিয়াছে—কঠিন সত্যকে আশ্রয় করিয়া কোনো আপাত-ফলের দিকে না তাকাইয়া বীরের ন্যায় আপনাকে মুক্তি দিতে হইবে!

এই বলিয়া সে দৃঢ়সঙ্কল্পের আবেগে হঠাৎ মুখ তুলিয়া দেখিল, অদূরে আর-একটা বেতের চৌকির পিঠের উপরে হাত রাখিয়া কমলা দাঁড়াইয়া আছে। কমলা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি ঘুমাইয়া পড়িয়া-

ছিলে, আমি বুঝি তোমাকে জাগাইয়া দিলাম ?”

অনুতপ্ত কমলাকে চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল—“না, না কমলা, আমি ঘুমাই নাই তুমি বোস, তোমাকে একটা গল্প বলি।”

গল্পের কথা শুনিয়া কমলা পুলকিত হইয়া চৌকি টানিয়া-লইয়া বসিল। রমেশ স্থির করিয়াছিল, কমলাকে সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলা অত্যাবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু এত-বড় একটা আঘাত হঠাৎ সে দিতে পারিল না তাই বলিল, “বোস, তোমাকে একটা গল্প বলি।”

রমেশ কহিল—“সেকালে একজাতি ক্ষত্রিয় ছিল, তাহারা—”

কমলা জিজ্ঞাসা করিল—“কবেকার কালে ? অনে—ক-কাল আগে ?”

রমেশ কহিল—“হাঁ, সে অনেককাল আগে। তখন তোমার জন্ম হয় নাই।”

কমলা। তোমারি নাকি জন্ম হইয়াছিল ! তুমি নাকি বহুকালের লোক ! তার পরে !

রমেশ। সেই ক্ষত্রিয়দের নিয়ম ছিল, তাহারা নিজে বিবাহ করিতে না গিয়া তলোয়ার পাঠাইয়া দিত। সেই তলোয়ারের সহিত বধুর বিবাহ হইয়া গেলে তাহাকে বাড়ীতে আনিয়া আবার বিবাহ করিত।

কমলা। না না, ছিঃ ! ও কি-রকম বিবাহ !

রমেশ। আমিও ও-রকম বিবাহ পছন্দ করি না—কিন্তু কি করিব—যে ক্ষত্রিয়দের কথা বলিতেছি, তাহারা শ্বশুরবাড়ী নিজে গিয়া বিবাহ করিতে অপমান বোধ করিত। আমি যে রাজার গল্প বলিতেছি, সে ঐ জাতের ক্ষত্রিয় ছিল। একদিন সে—

কমলা। তুমি ত বলিলে না, সে কোথাকার রাজা ?

রমেশ বলিয়া দিল—“মদ্রদেশের রাজা। একদিন সেই রাজা—”

কমলা। রাজার নাম কি আগে বল !

কমলা সকল কথা স্পষ্ট করিয়া লইতে চায়—তাহার কাছে কিছুই উহ্য রাখিলে চলিবে না। রমেশ এতটা জানিলে আগে হইতে আরো বেশি প্রস্তুত হইয়া থাকিত—এখন দেখিল, কমলার গল্প শুনিতে যতই আগ্রহ থাক্‌, গল্পের কোনো জায়গায় তাহার ফাঁকি সহ্য হয় না।

রমেশ হঠাৎ প্রশ্নে একটু থম্‌কিয়া বলিল, “রাজার নাম রণজিৎ সিং।”

কমলা একবার আবৃত্তি করিয়া লইল—“রণজিৎ সিং, মদ্রদেশের রাজা। তার পরে ?”

রমেশ। তার পরে একদিন রাজা ভাটের মুখে শুনিলেন, তাঁহারি জাতের আর-এক রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে।

কমলা। সে আবার কোথাকার রাজা ?

রমেশ। মনে কর, সে কাঞ্চীর রাজা।

কমলা। মনে করিব কি ! তবে সত্য কি সে কাঞ্চীর রাজা নয় ?

রমেশ। কাঞ্চীরই রাজা বটে। তুমি তার নাম জানিতে চাও ? তার নাম অমরসিং।

কমলা। সেই মেয়ের নাম ত বলিলে না ? সেই পরমা সুন্দরী কন্যা !

রমেশ। হাঁ হাঁ, ভুল হইয়াছে বটে। সেই মেয়ের নাম—তাহার নাম—ওঃ, তাহার নাম চন্দ্রা—

কমলা। আশ্চর্য্য! তুমি এমন ভুলিয়া যাও! তুমি ত আমারি নাম ভুলিয়াছিলে!

রমেশ। কোশলের রাজা ভাটের মুখে এই কথা শুনিয়া—

কমলা। কোশলের রাজা কোথা হইতে আসিল? তুমি যে বলিলে মদ্রদেশের রাজা—

রমেশ। সে কি এক জায়গার রাজা ছিল মনে কর? সে কোশলেরও রাজা, মদ্রেরও রাজা।

কমলা। দুই রাজ্য বুঝি পাশাপাশি?

রমেশ। একেবারে গায়ে-গায়ে লাগাও।

এইরূপে বারংবার ভুল করিতে করিতে ও সতর্ক কমলার প্রশ্নের সাহায্যে সেই সকল ভুল কোনমতে সংশোধন করিতে করিতে রমেশ এইরূপভাবে গল্পটি বলিয়া গেল:—

"মদ্ররাজ রণজিৎসিং কাঞ্চীরাজের নিকট রাজকন্যাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব জানাইয়া দূত পাঠাইয়া দিলেন। কাঞ্চীর রাজা অমরসিং খুসি হইয়া সম্মত হইলেন।

"তখন রণজিৎসিংহের ছোট ভাই ইন্দ্রজিৎসিং সৈন্যসামন্ত লইয়া নিশান উড়াইয়া কাড়ানাকাড়া দুন্দুভিদামামা বাজাইয়া কাঞ্চীর রাজোদ্যানে গিয়া তাঁবু ফেলিলেন। কাঞ্চীনগরে উৎসবের সমারোহ পড়িয়া গেল।

"রাজার দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া শুভ দিনক্ষণ স্থির করিয়া দিল। কৃষ্ণা দ্বাদশীতিথিতে রাত্রি আড়াই প্রহরের পর লগ্ন। রাত্রে নগরের ঘরে ঘরে ফুলের মালা দুলিল এবং দীপাবলি জ্বলিয়া উঠিল। আজ রাত্রে রাজকুমারী চন্দ্রার বিবাহ।

"কিন্তু কাহার সহিত বিবাহ, রাজকন্যা চন্দ্রা সে কথা জানেন না। তাঁহার জন্মকালে পরমহংস পরানন্দস্বামী রাজাকে বলিয়াছিলেন, 'তোমার এই কন্যার প্রতি অশুভগ্রহের দৃষ্টি আছে, বিবাহকালে পাত্রের নাম যেন এ কন্যা জানিতে না পারে।'

"যথাকালে তরবারির সহিত রাজকন্যার গ্রন্থিবন্ধন হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎসিং যৌতুক আনিয়া তাঁহার ভ্রাতৃবধূকে প্রণাম করিলেন। মদ্ররাজ্যের রণজিৎ এবং ইন্দ্রজিৎ যেন দ্বিতীয় রামলক্ষ্মণ ছিলেন। ইন্দ্রজিৎ আর্য্যা চন্দ্রার অবগুণ্ঠিত লজ্জারুণ মুখের দিকে তাকাইলেন না—তিনি কেবল তাঁহার নূপুরবেষ্টিত সুকুমার চরণযুগলের অলক্তরেখাটুকুমাত্র দেখিয়াছিলেন।

"যথারীতি বিবাহের পরদিনেই মুক্তামালার ঝালর-দেওয়া পালঙ্কে বধূকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ স্বদেশের দিকে যাত্রা করিলেন। অশুভগ্রহের কথা স্মরণ করিয়া শঙ্কিতহৃদয়ে কাঞ্চীরাজ কন্যার মস্তকের উপরে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—মাতা কন্যার মুখচুম্বন করিয়া অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিলেন না—দেবমন্দিরে সহস্র গ্রহবিপ্র স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইল।

"কাঞ্চী হইতে মদ্র বহুদূর—প্রায় একমাসের পথ। দ্বিতীয়রাত্রে যখন বেতসানদীর তীরে শিবির রাখিয়া ইন্দ্রজিতের দলবল বিশ্রামের আয়োজন করিতেছে, এমনসময় বনের মধ্যে মশালের আলো দেখা

গেল। ব্যাপারখানা কি, জানিবার জন্য ইন্দ্রজিৎ সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন।

"সৈনিক আসিয়া কহিল, 'কুমার, ইহারাও আর-একটি বিবাহের যাত্রিদল। ইহারাও আমাদের স্বশ্রেণীয় ক্ষত্রিয় অস্ত্রোদ্বাহ সমাধা করিয়া বধূকে পতিগৃহে লইয়া চলিয়াছে। পথে নানা বিঘ্নভয় আছে, তাই ইহারা কুমারের শরণ প্রার্থনা করিতেছে আদেশ পাইলে কিছুদূর পথ ইহারা আমাদের আশ্রয়ে যাত্রা করে।'

"কুমার ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, 'শরণাপন্নকে আশ্রয় দেওয়া আমাদের ধর্ম্ম। যত্ন করিয়া ইহাদিগকে রক্ষা করিবে।'

"এইরূপে দুই শিবির একত্র মিলিত হইল।

"তৃতীয় রাত্রি অমাবস্যা। সম্মুখে ছোট ছোট পাহাড়, পশ্চাতে অরণ্য। শ্রান্ত সৈনিকেরা ঝিল্লীর শব্দে ও অদূরবর্ত্তী ঝরণার কলধ্বনিতে গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

"এমন সময়ে হঠাৎ কলরবে সকলে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, মদ্রশিবিরের ঘোড়াগুলি উন্মত্তের ন্যায় ছুটাছুটি করিতেছে—কে তাহাদের রজ্জু কাটিয়া দিয়াছে—এবং মাঝে মাঝে একএকটা তাঁবুতে আগুন লাগিয়াছে ও তাহার দীপ্তিতে অমারাত্রি রক্তিমবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

"বুঝা গেল, দস্যু আক্রমণ করিয়াছে। মারামারি, কাটাকাটি বাধিয়া গেল—অন্ধকারে শত্রু-মিত্র ভেদ করা কঠিন। সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল—দস্যুরা সেই সুযোগে লুটপাট করিয়া অরণ্যে-পর্ব্বতে অন্তর্দ্ধান করিল।

"যুদ্ধ-অন্তে রাজকুমারীকে আর দেখা গেল না। তিনি ভয়ে শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং একদল পলায়নপর লোককে স্বপক্ষ মনে করিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন।

"তাহারা অন্য বিবাহের দল। গোলেমালে তাহাদের বধূকে দস্যুরা হরণ করিয়া লইয়া গেছে। রাজকন্যা চন্দ্রাকেই তাহারা নিজেদের বধূ জ্ঞান করিয়া দ্রুতবেগে স্বদেশে যাত্রা করিল।

"তাহারা দরিদ্র ক্ষত্রিয়; কলিঙ্গে সমুদ্রতীরে তাহাদের বাস। সেখানে রাজকন্যার সহিত অন্যপক্ষের বরের মিলন হইল। বরের নাম চেৎসিং।

"চেৎসিংহের মা আসিয়া বরণ করিয়া বধূকে ঘরে তুলিয়া লইলেন। আত্মীয়স্বজন সকলে আসিয়া কহিল, 'আহা, এমন রূপ ত দেখা যায় না!'

"মুগ্ধ চেৎসিং নববধূকে ঘরের কল্যাণলক্ষ্মী বলিয়া মনে মনে পূজা করিতে লাগিল। রাজকন্যাও সতীধর্ম্মের মর্য্যাদা বুঝিতেন—তিনি চেৎসিংকে আপন পতি বলিয়া জানিয়া তাহার নিকট মনে মনে আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া দিলেন।

"নবপরিণয়ের লজ্জা ভাঙিতে কিছুদিন গেল। যখন লজ্জা ভাঙিল, তখন কথায়-কথায় চেৎসিং জানিতে পারিল যে, যাহাকে সে বধূ বলিয়া ঘরে লইয়াছে, সে রাজকন্যা চন্দ্রা।"

২৮

কমলা রুদ্ধনিশ্বাসে একান্ত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—"তার পরে?"

রমেশ কহিল—"এই পর্য্যন্তই জানি, তার পরে আর জানি না। তুমিই বল দেখি, তার পরে কি!"

কমলা। না না, সে হইবে না, তার পরে কি আমাকে বল!

রমেশ। সত্য বলিতেছি, যে গ্রন্থ হইতে এই গল্প পাইয়াছি, তাহা এখনো সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই—শেষের অধ্যায়গুলি কবে বাহির হইবে, কে জানে!

কমলা অত্যন্ত রাগ করিয়া কহিল—"যাও, তুমি ভারি দুষ্টু! তোমার ভারি অন্যায়!"

রমেশ। যিনি বই লিখিতেছেন, তাঁর সঙ্গে রাগারাগি কর। তোমাকে আমি কেবল এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, চেৎসিংহের কি করা উচিত এবং ইহার শেষটা কি হইলে ভাল হয়?

কমলা। আচ্ছা, চন্দ্রা কি চেৎসিংকে ভালবাসিয়াছে?

রমেশ। গ্রন্থের ভাব দেখিয়া ত তাই বোধ হয়। কিন্তু ভাল বাসুক্ বা না বাসুক্, এখন উপায় কি? চন্দ্রার যিনি আসল স্বামী, সেই মদ্ররাজের কাছে চন্দ্রাকে পাঠাইয়া দিলে তিনি ত চন্দ্রাকে গ্রহণ করিবেন না।

কমলা। তা ত করিবেন না—তা না-ই করিলেন—তাহাতে চন্দ্রার ক্ষতি কি! চন্দ্রা যখন একবার চেৎসিংকেই স্বামী বলিয়া জানিয়াছে, তখন অন্য লোকে তাহাকে ত্যাগ করে কি গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার কি আসে-যায়!

রমেশ। ভুল কি আর সংশোধন করা যায় না? যে তাহার যথার্থ স্বামী নহে, তাহার কাছ হইতে মন ফিরাইয়া-লওয়া বুঝি একেবারেই অসম্ভব!

কমলা। তুমি কি যে বল, তার ঠিক নাই—মন বুঝি একটা জিনিষপত্রের মত যে, বারবার তাহা দেওয়া-নেওয়া করা যায়?

রমেশ। অচ্ছা বেশ, চেৎসিং ত তাহাকে ধর্ম্মত স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না! সে ত তাহার বিবাহিতা নহে।

কমলা। আমি অমন বিবাহ ভাল বুঝিতে পারি না। মন্ত্র পড়িলেই বুঝি বিবাহ হয়? তার পরে ত স্বামি-স্ত্রী বলিয়া দুজনের মন বোঝা চাই! সেইটেই ত আসল!

রমেশ। আচ্ছা, মদ্ররাজ যদি খবর পাইয়া আসিয়া বলে, 'চেৎসিং, তুমি আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিয়াছ,—দাও, আমাকে ফিরাইয়া দাও!'

কমলা। তখন তাহারা দুজনে কলিঙ্গের সমুদ্রের জলে একত্রে ডুব দিয়া মরিবে—রাজার সঙ্গে ত পারিয়া উঠিবে না!

রমেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, চেৎসিং কি চন্দ্রাকে বলিবে যে, সে অন্যের স্ত্রী।"

কমলা কহিল—"বলিলই বা!"

রমেশ কহিল—"এই এক কথায় চেৎসিংহের উপর সতী স্ত্রীর যে পবিত্র অধিকার, তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে—তখন চন্দ্রা সে ঘরে কেমন ভাবে থাকিবে?"

কমলা কহিল—"সে ঘরে আর থাকিবে না, কিন্তু তবু ত চেৎসিংকে সে—"

রমেশ। বাপের বাড়ীতেও যদি তাহার বাপ না লয়!

কমলা তখন নদীর দিকে চাহিয়া ভাবিতে

লাগিল—অনেকক্ষণ পরে কহিল, "আমি জানি না, সে কি করিবে—আমি ত ভাবিয়া উঠিতে পারি না ! বোধ হয়, সে মরিবে !"

রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল—কহিল, "মরিবে জানিয়াও কি চেৎসিং সকল কথা চন্দ্রাকে প্রকাশ করিয়া বলিবে ?"

কমলা কহিল, "তুমি বেশ যা হোক্, না বলিয়া বুঝি সমস্ত গোলমাল করিয়া রাখিবে ? চন্দ্রাকে সে এক বলিয়া জানিবে, আর চন্দ্রা বুঝি তাহাকে আর বলিয়া বুঝিবে ? সে যে বড় বিশ্রী ! চন্দ্রা মরুক্ বা বাঁচুক, সমস্ত স্পষ্ট হওয়া চাই ত !"

রমেশ যন্ত্রের মত কহিল—"তা ত চাই !"

রমেশ কিছুক্ষণ পরে কহিল, "আচ্ছা কমল, যদি—"

কমলা। যদি কি ?

রমেশ। মনে কর, আমিই যদি সত্য চেৎসিং হই, আর তুমি যদি চন্দ্রা হও—

কমলা বলিয়া উঠিল, "তুমি অমন কথা আমাকে বলিয়ো না ; সত্য বলিতেছি, আমার ভাল লাগে না।"

রমেশ। না, তোমাকে বলিতেই হইবে।—তাহা হইলে আমারই বা কি কর্ত্তব্য, আর তোমারই বা কর্ত্তব্য কি ?

কমলা এ কথার কোনো উত্তর না করিয়া চৌকি ছাড়িয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল। দেখিল, উমেশ তাহাদের কামরার বাহিরে চুপ করিয়া বসিয়া নদীর দিকে চাহিয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিল, "উমেশ, তুই কখনো ভূত দেখিয়াছিস্ ?"

উমেশ কহিল, "দেখিয়াছি মা !"

শুনিয়া কমলা অনতিদূর হইতে একটা বেতের মোড়া টানিয়া-আনিয়া বসিল—কহিল, "কি-রকম ভূত দেখিয়াছিলি বল্ !"

কমলা বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলে রমেশ তাহাকে ফিরিয়া ডাকিল না। চন্দ্রখণ্ড তাহার চোখের সম্মুখে ঘন বাঁশবনের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল। ডেকের উপরকার আলো নিবাইয়া-দিয়া তখন সারং-খালাসিরা জাহাজের নীচের তলায় আহার ও বিশ্রামের চেষ্টায় গেছে। প্রথম-দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাত্রী কেহই ছিল না। তৃতীয়শ্রেণীর অধিকাংশ যাত্রী রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে জল ভাঙিয়া ডাঙায় নামিয়া গেছে। তীরে তিমিরাচ্ছন্ন ঝোপঝাপ-গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে অদূরবর্ত্তী বাজারের আলো দেখা যাইতেছে এবং সেখান হইতে লোকালয়ের কলগুঞ্জনধ্বনি বনভূমির ঝিল্লীরবকে আচ্ছন্ন করিয়া উঠিতেছে। পরিপূর্ণ-নদীর খরস্রোত নোঙরের লোহার শিকলে ঝঙ্কার দিয়া চলিয়াছে এবং থাকিয়া-থাকিয়া জাহ্নবীর স্ফীতনাড়ির কম্পবেগ ষ্টীমারকে স্পন্দিত করিয়া তুলিতেছে। দূর পারের অর্দ্ধনিমগ্ন নির্জ্জন ঝাউবন, নিস্তরঙ্গ নদীর ধারা, এ পারের বনবেষ্টিত গ্রাম, সমস্তই অন্ধকারের মধ্যে অপরিব্যক্তভাবে সৃষ্টির আদিকালীন গর্ভবাসচ্ছবির মত দেখা যাইতেছে।

এই অপরিস্ফুট বিপুলতা, এই অন্ধকারের নিবিড়তা, এই অপরিচিত দৃশ্যের প্রকাণ্ড অপূর্ব্বতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া রমেশ তাহার কর্ত্তব্যসমস্যা উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা করিল। রমেশ বুঝিল যে, হেমনলিনী কিংবা কমলা, উভয়ের মধ্যে একজনকে বিসর্জ্জন দিতেই হইবে। উভয়কেই রক্ষা করিয়া চলিবার

কোনো মধ্যপথ নাই। তবু হেমনলিনীর আশ্রয় আছে—এখনো হেমনলিনী রমেশকে ভুলিতে পারে, সে আর কাহাকেও বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কমলাকে ত্যাগ করিলে এ জীবনে তাহার আর কোনো উপায় নাই।

মানুষের স্বার্থপরতার অন্ত নাই। হেমনলিনীর যে রমেশকে ভুলিবার সম্ভাবনা আছে, তাহার রক্ষার উপায় আছে—রমেশের সম্বন্ধে সে যে অনন্যগতি নহে, ইহাতে রমেশ কোনো সান্ত্বনা পাইল না, তাহার আগ্রহের অধীরতা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মনে হইল, এখনি হেমনলিনী তাহার সম্মুখ দিয়া যেন স্খলিত হইয়া,—চিরদিনের মত অনায়ত্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছে, এখনো যেন বাহু বাড়াইয়া তাহাকে ধরিতে পারা যায়।

দুই করতলের উপরে সে মুখ রাখিয়া ভাবিতে লাগিল। দূরে শৃগাল ডাকিল, গ্রামে দুই-একটা অসহিষ্ণু কুকুর খেউ-খেউ করিয়া উঠিল। রমেশ তখন করতল হইতে মুখ তুলিয়া দেখিল, কমলা জনশূন্য অন্ধকার ডেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। রমেশ চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া-গিয়া কহিল, "কমল, তুমি এখনো শুইতে যাও নাই? রাত ত কম হয় নাই!"

কমলা কহিল "তুমি শুইতে যাইবে না?"

রমেশ কহিল—"আমি এখনি যাইব, পুবদিকের কামরায় আমার বিছানা হইয়াছে। তুমি আর দেরি করিয়ো না।"

কমলা আর-কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে তাহার নির্দ্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করিল। সে আর রমেশকে বলিতে পারিল না যে, কিছুক্ষণ আগেই সে ভূতের গল্প শুনিয়াছে, এবং তাহার কামরা নির্জ্জন।

রমেশ কমলার অনিচ্ছুক মন্দপদবিক্ষেপে অন্তঃকরণে আঘাত পাইল—কহিল, "ভয় করিয়ো না কমল—তোমার কামরার পাশেই আমার কামরা—মাঝের দরজা খুলিয়া রাখিব।"

কমলা স্পর্দ্ধাভরে তাহার শির একটুখানি উৎক্ষিপ্ত করিয়া কহিল—"আমি ভয় করিব কিসের?"

রমেশ তাহার কামরায় প্রবেশ করিয়া বাতি নিবাইয়া-দিয়া শুইয়া পড়িল—মনে মনে কহিল, "কমলাকে পরিত্যাগ করিবার কোনো পথ নাই, অতএব হেমনলিনীকে বিদায়! আজ ইহাই স্থির হইল, আর দ্বিধা করা চলে না।"

হেমনলিনীকে বিদায় বলিতে যে জীবন হইতে কতখানি বিদায়, তাহা অন্ধকারের মধ্যে শুইয়া রমেশ অনুভব করিতে লাগিল। তখন হেমনলিনীর প্রতি একটি অশ্রুপূর্ণ অভিমানে রমেশের সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। যে হেমনলিনী তাহার সম্পূর্ণ পর হইয়া গেছে, সেই ভবিষ্যতের হেমনলিনী তাহার কল্পনানেত্রের সম্মুখে উদিত হইল। রমেশের কথা এখন তাহাকে কেহ স্মরণ করাইয়া দিলে তাহার লজ্জাবোধ হয়, হাসি পায়। রমেশের সহিত সম্বন্ধ এখন তাহার পক্ষে একসময়কার ছেলেখেলামাত্র হইয়া উঠিয়াছে। রমেশের বিরুদ্ধে এখন তাহাকে নানা লোকে নানা কথা শুনাইয়াছে—হেমনলিনী জানিয়াছে যে, রমেশ কমলাকে

বিবাহ করিয়া তাহাদের কাছে গোপন করিয়াছিল। এ সমস্ত কথা শুনিয়াও হেমনলিনী রমেশকে একবার অপবাদক্ষালন করিবার অবকাশমাত্রও দিল না! রমেশের বিরুদ্ধে এত-বড় কথাটা সে অনায়াসে বিশ্বাস করিতে পারিল! ইহার পরে সে যদি রমেশের অস্তিত্ব একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভুলিতে পারিত, তবে তাহা দয়ার কাজ হইত, কিন্তু ঘৃণায় তাহাকে ভুলিতে দিবে না--রমেশের সহিত পূর্ব্বসম্বন্ধ কঠিন লজ্জার দ্বারা খোদিত হইয়া তাহার মনের মধ্যে মুদ্রিত হইয়া থাকিবে! রমেশ আর বিছানায় চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না—উঠিয়া বাহিরে আসিল —নিশীথিনীর অন্ধকারে একবার অনুভব করিয়া লইল যে, তাহারই লজ্জা, তাহারই বেদনা অনন্ত দেশ ও অনন্ত কালকে আবৃত করিয়া নাই। আকাশ পূর্ণ করিয়া চিরকালের জ্যোতির্লোকসকল স্তব্ধ হইয়া আছে—রমেশ ও হেমনলিনীর ক্ষুদ্র ইতিহাসটুকু তাহাদিগকে স্পর্শও করিতেছে না—এই শরতের রজনীতে রমেশের এই মর্ম্মান্তিক ব্যথা জগতের নিদ্রা-মহাসাগরকে কতটুকুই বা নাড়া দিয়াছে! এই আশ্বিনের নদী তাহার নির্জ্জন বালুতটে প্রফুল্ল কাশবনের তলদেশ দিয়া এমন কত নক্ষত্রালোকিত রজনীতে নিষুপ্ত গ্রামগুলির বনপ্রান্তচ্ছায়ায় প্রবাহিত হইয়া চলিবে,—যখন রমেশের জীবনের সমস্ত ধিক্কার শ্মশানের ভস্মমুষ্টির মধ্যে চিরধৈর্য্যময়ী ধরণীতে মিশাইয়া চিরদিনের মত নীরব হইয়া গিয়াছে!

ক্রমশ।

মুক্তি।

ডাক্তার জ্বরপরীক্ষার পর রোগীকে কুইনাইন ব্যবস্থা করিলেন। বলিলেন, 'তোমার কুইনাইন-সেবন কর্ত্তব্য।' এই সময়ে যদি কেহ গম্ভীরভাবে উপদেশ দেন, 'কুইনাইন-সেবন মানুষের কর্ত্তব্য নহে, পরোপকারই মনুষ্যের কর্ত্তব্য', তাহা হইলে বিশুদ্ধ হাস্তরসের সৃষ্টি হয় মাত্র, রোগীর কোন উপকার হয় না।

আজকাল গদ্যে পদ্যে বক্তৃতায় শব্দের অপপ্রয়োগ করিয়া ঐরূপ বা তাহা অপেক্ষাও উৎকট যুক্তিবিভ্রাট ঘটান হয়, কিন্তু তাহাতে হাস্তরসের উদ্ভব কেন হয় না, বুঝিতে পারা যায় না।

প্রাচীনকালে আর্য্যসমাজে কতকগুলি সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান-উৎসবাদি সম্পাদিত হইত; উহাদিগকে যাগযজ্ঞ বলিত ও উহাদের সাধারণ নাম ছিল ধর্ম্ম। তৎকালে তদ্দেশে তৎসমাজে ঐ সকল অনুষ্ঠানের উপযোগিতার বিচার এখন কঠিন। একালে আমরা ধর্ম্মশব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি ও গম্ভীরভাবে বক্তৃতা করি ও কাব্য লিখি—'যজ্ঞে ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্ম লোকহিতে।' আর

যাঁহারা এইরূপ বক্তৃতা করেন, তাঁহাদের আস্ফালনই বা কত!

শব্দের অপপ্রয়োগের এইরূপ আরও উদাহরণ আছে। আমাদের দর্শনশাস্ত্রে মুক্তি-শব্দটি নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। খ্রীষ্টানদের স্বীকৃত salvationনামক একটা ব্যাপার আছে; আজকাল অনেকে salvation অর্থে মুক্তিশব্দ ব্যবহার করিয়া নানাবিধ উৎকট যুক্তির অবতারণা করেন।

মুক্তিশব্দের অর্থ বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য। কিন্তু এইখানেই বলিয়া রাখা উচিত, মুক্তি অর্থে আর যাহাই হউক, উহা খ্রীষ্টানি salvation নহে।

খ্রীষ্টানি salvationএর অর্থ কি? খ্রীষ্টানিমতে মনুষ্যমাত্রই জন্মাবধি পাপী। মনুষ্য আপনার পাপের ফলভোগ করিতে বাধ্য। মনুষ্যের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিচারক খোদা * পাপের দণ্ড দিতে বাধ্য; নতুবা তাঁহার ন্যায়পরতা থাকে না। কিন্তু তিনি আবার করুণাময়। কাজেই তিনি করুণা-বশে খ্রীষ্টরূপে অবতীর্ণ হইলেন ও মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর তুলিয়া লইলেন ও মনুষ্যজাতির প্রতিভূস্বরূপে আপনার শোণিতপাতদ্বারা মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার শোণিতধারায় মনুষ্যের পাপ প্রক্ষালিত হইল। যে তাঁহার শরণাগত হইবে, বিচারের দিনে সে পাপমুক্ত বলিয়া খোদাকর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তাহাকে আর পাপের অবশ্যম্ভাবী শাস্তি ভোগ করিতে হইবে না। সে তৎপরে চিরকাল ধরিয়া স্বর্গে বা খোদা-সান্নিধ্যে বাস করিবে। মনুষ্যের এই পাপমোচন ও স্বর্গপ্রাপ্তির ইংরাজি নাম salvation; বাঙ্‌লায় উহাকে 'পরিত্রাণ' বলা যাইতে পারে। এইরূপে খ্রীষ্টানেরা খোদার ন্যায়পরতা ও করুণাময়তার সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়াছেন। মনুষ্যের পাপমোচন ও স্বর্গলাভের প্রধান উপায় খোদার কৃপা; যে অনুতপ্তচিত্তে সেই কৃপার ভিখারী হইয়া সেই করুণানিধান ত্রাণকর্ত্তার শরণাগত হয়, সেই পরিত্রাণ পায়। এই ব্যাপারকে মুক্তি না বলিয়া পরিত্রাণ বলাই অধিক সঙ্গত। খোদার অবতার যীশুখ্রীষ্ট এই হিসাবে মানব-জাতির পরিত্রাণকর্ত্তা।

খ্রীষ্টানসমাজে এই পরিত্রাণের থিওরি কোথা হইতে আসিল, বলা দুষ্কর। অতি প্রাচীন ইহুদিসমাজে এইরূপ পরিত্রাণ ব্যাপারে বিশ্বাস ছিল কি না, সন্দেহের স্থল। ইহুদিরা আপনাদিগকে জেহোবা-দেবের অনুগৃহীত জাতি বলিয়া জানিত। তাহারা প্রবলতর-জাতিগণ-কর্ত্তৃক পুনঃপুন নিগৃহীত হইয়াছিল। জেহোবার (জাহবে-নামক ইহুদিগণের রাষ্ট্রীয় দেবতার) আদেশলঙ্ঘনই তাহাদের এই নিগ্রহের ও বিপৎপাতের কারণ বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস ছিল। তাহা-দের জাতীয় দুর্দ্দশার সময় তাহারা ভবিষ্যৎ চাহিয়া সান্ত্বনা পাইত। মনে করিত, ভবিষ্যতে মেশায়া জন্মগ্রহণ করিয়া তাহা-দের এই চিরন্তন দুঃখ মোচন করিবেন। এই মেশায়া কতকটা আমাদের কল্কি-অবতারের মত। ভগবান্ কল্কিরূপে অব-

* ইংরাজি God বলিতে যাহা বুঝায়, আমাদের ঈশ্বরশব্দে সর্ব্বত্র তাহা বুঝায় না। এইজন্য Godএর তর্জ্জমায় অগত্যা খোদা-শব্দ ব্যবহার করা গেল।

তীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছনিবহ নিধন করিয়া সনাতন-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবেন, এইরূপ আমাদের পুরাণে ভবিষ্যদ্বাণী রহিয়াছে। ইহুদিদিগেরও সেইরূপ আশা ছিল, মেশায়া জন্মগ্রহণ করিলে তাহাদিগের জাতীয় দুরবস্থার অপনোদন হইবে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে ইহাদিগের মধ্যে প্রফেট্ নামে একশ্রেণীর লোক প্রচুর সম্মানভাজন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ভাবী মেশায়ায় অন্যান্য গুণ ও অন্যান্য কর্ত্তব্য অর্পণ করিতেন। কিন্তু সাধারণ ইহুদিজাতির বিশ্বাস তাহাতে অধিক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই যখন মেরী-পুত্র যীশু জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাকে খ্রীষ্ট ও মেশায়া বলিয়া প্রচার করিলেন, অথচ ইহুদিজাতির আকাঙ্ক্ষিত জাতীয় দুঃখের অবসান হইল না, তখন অধিকাংশ ইহুদি তাঁহাকে মেশায়া বলিয়া স্বীকার করিল না। ইহুদিদের মধ্যে কেহ কেহ উহা স্বীকার করিয়া একটা দল বাঁধিল মাত্র। তৎপরে তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার ঈশ্বরত্ব ও তাঁহার ত্রাণকর্ত্তৃত্ব ইহুদিসমাজের বাহিরে প্রচারিত করিয়া বৃহৎ খ্রীষ্টানসমাজের স্থাপনা করিলেন। এই খ্রীষ্টীয়সমাজ ঊনিশ-শত বৎসর ধরিয়া যীশুখ্রীষ্টকে মনুষ্যজাতির ত্রাণকর্ত্তা ও পাপমোচনকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলা যাইতে পারে, কিন্তু মুক্তিদাতা বলা যায় না। কেন না, আমাদের দর্শনশাস্ত্রে যাহাকে মুক্তি বলে, খ্রীষ্টানেরা সেরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন না। সেরূপ মুক্তি খ্রীষ্টানের শাস্ত্রে আছে কি না, জানি না।

যীশুর জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে গৌতমসিদ্ধার্থের জন্ম হইয়াছিল। তিনি একটা দেশব্যাপী সন্ন্যাসীর দল সৃষ্টি করেন, ও তদ্ভিন্ন গৃহস্থলোকেও দলে দলে তাঁহার সম্মত উপাসকশ্রেণীতে ভুক্ত হইয়াছিল। গৌতমসিদ্ধার্থ অনেক সাধনার পর আপনাকে বুদ্ধ অর্থাৎ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষ বলিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন, এবং তিনি যাহা নির্ব্বাণের একমাত্র পন্থা বলিয়া নিশ্চয় করেন, মানবজাতির নিকট সেই পন্থার নির্দ্দেশ করিয়া যান। মানবজাতির দুঃখদর্শনে তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল; তাঁহার প্রদর্শিত নির্ব্বাণের পথ মানবজাতির সেই সনাতন দুঃখ দূরীকরণের একমাত্র উপায় বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। সেই দুঃখের ব্যথায় তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়াছিল এবং তিনি সেই দুঃখমোচনের উপায় আবিষ্কারের জন্য রাজ্যসম্পৎ ত্যাগ ও ভিক্ষুবৃত্তি গ্রহণ করিয়া দেশে দেশে পরিব্রাজকরূপে বেড়াইয়াছিলেন। তিনি যে নির্ব্বাণের পথ নির্দ্দেশ করেন, তাহা ব্রাহ্মণশাস্ত্রসম্মত মুক্তির পথ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট নির্ব্বাণকে আমরা মুক্তির সহিত এক পর্য্যায়ে গ্রহণ করিলে অধিক দোষ হইবে না। কিন্তু এই নির্ব্বাণ বা এই মুক্তি কোন ব্যক্তি-বিশেষের অনুগ্রহলভ্য নহে। এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বরও ইচ্ছাক্রমে বা অনুগ্রহদ্বারা মনুষ্যকে মুক্ত করিতে পারেন না। ভগবান্ গৌতমবুদ্ধ এইরূপ মনুষ্যভাগ্যবিধাতা কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন কি না, তাহাই সন্দেহের স্থল। বৌদ্ধমতে মনুষ্য আপনার কর্ম্মফল ভোগ করিতে

বাধ্য। সৎকর্ম্মের ফল সদ্‌গতি ও সুখলাভ, অসৎকর্ম্মের ফল অসদ্‌গতি ও দুঃখলাভ। কোন ব্যক্তি কোনরূপে এই কর্ম্মফল হইতে অব্যাহতিলাভে অসমর্থ। মনুষ্য ইহজীবনে তাহার কর্ম্মফল কতক ভোগ করে; কিন্তু তাহার মৃত্যু হইলেও তাহার কর্ম্ম তাহাকে ছাড়ে না। সে এক দেহ ত্যাগ করিয়া দেহান্তর গ্রহণ করিতে পারে, এক লোক ত্যাগ করিয়া অন্য লোকে যাইতে পারে। কিন্তু তাহার কর্ম্ম তাহার সঙ্গে সঙ্গে যায়।* এবং সেই দেহান্তরে ও লোকান্তরে কৃত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য তাহাকে আবার নূতন দেহ ধারণ বা নূতন লোকে বিচরণ করিতে হয়। ইহার নাম সংসার। নরদেহ-পরিত্যাগের পর মনুষ্য দেবদেহ ধারণ করিতে পারে, ইহা অসম্ভব নহে। ভূলোক ত্যাগ করিয়া সে কিছুদিন স্বর্লোকে বিচরণ করিতে পারে, তাহাও অসম্ভব নহে। কিন্তু এই দেবদেহপ্রাপ্তি বা স্বর্গপ্রাপ্তি মুক্তি নহে। সেখানেও কর্ম্ম আছে ও কর্ম্মপাশের বন্ধন আছে। সে বন্ধন হয় ত সোনার শিকলে বন্ধন; আর নরদেহের বন্ধন লোহার শিকলে বন্ধন। কিন্তু উভয়ই বন্ধনদশা। স্বর্গপ্রাপ্তিকে মুক্তি বলে না। সৎকর্ম্ম-ফলে স্বর্গপ্রাপ্তির ও ফলভোগাবসানের পর তাৎকালিক কর্ম্মফলে আবার লোকান্তর-প্রাপ্তি ঘটিবে। কাজেই সংসার হইতে মুক্তি ঘটিল না। সৎকর্ম্মই কর, আর অসৎ-কর্ম্মই কর, সংসারচক্রে পরিভ্রমণ করিতেই হইবে; অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে। কোন দয়ালু পরিত্রাতা এই সংসার-চক্র হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন না। সংসার হইতে অব্যাহতির উপায় নাই।

তবে এক উপায় আছে। এই সংসার বস্তুত অবিদ্যা হইতে উৎপন্ন ভ্রান্ত জ্ঞানমাত্র, ইহা জানিলেই সকল দুঃখ দূর হইতে পারে। নির্ব্বাণলাভের বা দুঃখবিমুক্তির এই এক-মাত্র পন্থা এবং ইহা জ্ঞানের পন্থা। এই জ্ঞানমার্গ ভগবান্ তথাগত আবিষ্কৃত করিয়া-ছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্রের ভাষায়, এই লোক এতকাল ধরিয়া তমঃস্কন্ধাবগুণ্ঠিত হইয়া প্রসুপ্ত অবস্থায় ছিল; ভগবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপ জ্বালিয়া তাহাকে প্রবোধিত করিলেন। মনুষ্য যে দেহধারণ করিয়া জন্মমৃত্যুর অধীন হয়, পুনঃপুন কর্ম্মবশে বিবিধ দেহ ধারণ করিয়া বিবিধ লোকে বিচরণ করিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করে, ইহার মূল অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞান। যে প্রণালীদ্বারা বা প্রক্রিয়া-দ্বারা বা ধারাক্রমে অবিদ্যা হইতে এই সংসারের উৎপত্তি হয়, তাহার নাম প্রতীত্য-সমুৎপাদ। স্থলান্তরে প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাখ্যার চেষ্টা করা গিয়াছে। ফল কথা, যাহা-কিছু পরিদৃশ্যমান বা অনুভূয়মান, যাহা-কিছু প্রতীত হয়, তাহা ভ্রান্তি—তাহার মূল অজ্ঞান বা জ্ঞানের অভাব। স্পর্শ-বেদনা, জন্ম-মৃত্যু, ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, যাহা-কিছু প্রত্যয়ের বিষয়, তাহা

* বুদ্ধদেব আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, অথচ জীবের জন্মান্তরপ্রাপ্তি ও বিভিন্ন-দেহ-ধারণ মানিতেন; এই দুই মতের অনেকে সামঞ্জস্য করিতে পারেন না। ইংরাজি soul শব্দের অনুবাদে "আত্মা"শব্দ ব্যবহার করায় এই বিপত্তির উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, soul অর্থে আত্মা নহে।

কেবল সম্যক্ জ্ঞানের অভাবে উৎপন্ন। উহার ভিতরে কিছুই নাই। সমস্তই শূন্য ও মরীচিকা। সংসার অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই ভ্রান্তি কাটিয়া যাইবে। তখন বুঝিবে, জন্ম-মৃত্যু সবই মিথ্যা, ইহকাল-পরকাল কিছুই নাই, সুখদুঃখও অস্তিত্বহীন। এইটুকু বুঝিলেই নির্ব্বাণ ঘটে বা মুক্তি ঘটে। এইটুকু বুঝিলেই দুঃখ থাকে না; এইটুকু বুঝিলেই জন্মান্তরপরিগ্রহ করিতে হয় না। কেন না, দুঃখ অস্তিত্বহীন পদার্থ, জন্মান্তরপরিগ্রহও ভ্রান্ত বিশ্বাসমাত্র। এই ভ্রান্ত বিশ্বাসটাই অবিদ্যা, এই ভ্রান্তির অপনোদনই নির্ব্বাণ। ইহার ফল দুঃখ-নাশ।

কাজেই ঐ জ্ঞানোদয় ভিন্ন নির্ব্বাণলাভের উপায়ান্তর নাই। কিন্তু সেই জ্ঞানোদয় অতি কঠিন ব্যাপার। ইচ্ছা করিলেই বা চেষ্টা করিলেই সেই জ্ঞানের উদয় ঘটে না। বিশ্বজগৎটা জ্ঞানস্বরূপ পদার্থ, ইহা মনে করিলেই করা যায় না। অন্তত অনেক বড় বড় লোকে যখন এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিতে উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের ত কথাই নাই। তবে সাধারণ মানুষে করিবে কি? তাহারা যথাসাধ্য এই জ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারে; এই জ্ঞান-লাভের জন্য যে সাধনা আবশ্যক, তাহা দ্বারা এই জ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। বুদ্ধ-প্রদর্শিত আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিয়া সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সঙ্কল্পাদি দ্বারা আত্মো-ন্নতিবিধানের পর শেষ পর্য্যন্ত সম্যক্ সমাধি-বলে ঐ জ্ঞানলাভের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। মুক্তি আয়াসলভ্য; উহা জ্ঞানীর প্রাপ্য। আষ্টাঙ্গিক মার্গ অবলম্বন করিতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই অধিকার আছে, এবং ঐ পন্থা ভিন্ন অন্য পন্থায় চলিলে ফললাভের সম্ভাবনাও নাই। কিন্তু অধিকার থাকিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে না।

ভগবান্ বুদ্ধগৌতম এইরূপে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এইহেতু মুক্তির পথপ্রদর্শক বলা যাইতে পারে। কিন্তু তিনি আপনাকে মুক্তিদাতা বলিয়া প্রচার করেন নাই। বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতে কোন মনুষ্য বা কোন দেবতা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাহাকেও মুক্তি দিতে পারেন না; সেইজন্য বিশুদ্ধ বৌদ্ধ-মতে মুক্তিদাতা কেহ থাকিতে পারে না। বিনা অবিদ্যানাশে মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই। কাজেই মুক্তি প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনা-সাপেক্ষ ও চেষ্টাসাপেক্ষ। তবে বুদ্ধপ্রদর্শিত ত্রিশরণমার্গ আশ্রয় করিলে সেই সাধনার পথ পাওয়া যাইতে পারে মাত্র। কিংবা এতটুকু বলা যাইতে পারে যে, বুদ্ধপ্রদর্শিত মার্গ আশ্রয় না করিলে মুক্তির পথ জানিবার উপায় থাকে না, অতএব মুক্তিলাভের উপায় থাকে না। বুদ্ধদেবই জগৎকে মুক্তির পন্থা দেখাইয়াছেন। যাঁহারা অন্য পন্থা দেখাইয়াছেন, তাঁহারা বৌদ্ধগণের মতে ভ্রান্ত।

বৌদ্ধগণ ভগবান্‌কে ভবব্যাধির চিকিৎসক, বৈদ্যরাজ, জ্ঞানসিন্ধু, দয়াসিন্ধু ইত্যাদি বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছিলেন। এই করুণা-নিধান মহাপুরুষের উপাসনা বৌদ্ধসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার কৃপা-মাত্রে যে মুক্তিলাভ হইতে পারে, ইহা বিশুদ্ধ বৌদ্ধমতের স্বীকার্য্য নহে।

বুদ্ধদেব জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের

সম্মুখে আপনার মত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের জন্য মুক্তির পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্তু মুক্তিকে অনায়াসলভ্য বলেন নাই। কিন্তু সর্ব্বসাধারণ অচিরে তাঁহাকে মুক্তিদাতার স্বরূপে গ্রহণ করিল। যিনি মুক্তির একমাত্র পথ প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই যে মুক্তিদাতা, সর্ব্বসাধারণে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইল। করুণাময়ত্ব ও মুক্তিদাতৃত্ব, উভয়ের আধারস্বরূপ হইয়া ভগবান্ বৌদ্ধসমাজে অচিরে পূজিত হইতে লাগিলেন। উত্তরকালে মহাযানী বৌদ্ধেরা বিবিধ কাল্পনিক বুদ্ধের ও বোধিসত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। সংসারতাপক্লিষ্ট মানব সর্ব্বদাই সংসারক্লেশ হইতে ও জরামরণ হইতে উদ্ধারলাভের জন্য ব্যাকুল। ব্রাহ্মণ এই উদ্ধারলাভের কোন সহজ পন্থা দেখান নাই। মহাযানী বৌদ্ধেরা অতি সহজ পন্থা দেখাইয়া দিল। মহাযানীদের কল্পিত বোধিসত্ত্বগণ মূর্ত্তিমৎকরুণাস্বরূপ। তাঁহারা মানবকে দুঃখসাগর হইতে তরাইবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন। সৌগতমার্গের আশ্রয় লইয়া বোধিসত্ত্বগণের শরণাগত হইলে, তাঁহাদের করুণার ভিখারী হইলে, তাঁহাদের উপাসনা করিলে, কাহাকেও এই সংসারতাপ হইতে উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। বোধিসত্ত্বগণের সহকারে তাঁহাদের পত্নীস্থানীয়া বিবিধ দেবতা কল্পিত হইলেন। বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর দয়ার নিধান। তাঁহার শক্তি তারাদেবী সংসারার্ণবতারিণী। তাঁহাদের শরণাগত হও ; সংসারসাগর হইতে অনায়াসে উদ্ধার পাইবে। এইরূপে উপাসকের সিদ্ধিদানে ও সংসারক্লেশনিবারণে সর্ব্বদা উদ্যত অসংখ্য দেবদেবীর প্রতিমায় বৌদ্ধগণের উপাসনামন্দিরসকল পূর্ণ হইতে লাগিল। দলে দলে বৌদ্ধ উপাসকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বেদমার্গভ্রষ্ট বৌদ্ধভিক্ষু ও বৌদ্ধগৃহস্থ উপাসকে দেশ পূর্ণ হইল। মহাযান আশ্রয় করিয়া সংসারবারিধি উত্তীর্ণ হইবার জন্য দলে দলে যাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। ব্রাহ্মণশাসিত আর্য্যসমাজ হইতে সনাতন বৈদিকমার্গ লোপ পাইতে বসিল।

দেখা গেল, খ্রীষ্টানগণের স্বীকৃত পরিত্রাণের পন্থার সহিত বৌদ্ধস্বীকৃত নির্ব্বাণের পন্থার আদৌ কোন মিল ছিল না। কিন্তু কালের পরিণতিতে উভয়ই প্রায় তুল্যমূল্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় পন্থার পরিণতিসাধনে বৌদ্ধপন্থার কোন প্রভাব ছিল কি না, ইহা একটা প্রকাণ্ড ঐতিহাসিক সমস্যা। খ্রীষ্টানগণের বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের সহিত বৌদ্ধ বিশ্বাস ও আচারানুষ্ঠানের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য দেখিলে এই প্রভাব অস্বীকার করিবার উপায় থাকে না। কাহারও কাহারও মতে মিশরদেশের থেরাপিউটগণ ও ইহুদিদেশের এসিনিগণ বৌদ্ধসম্প্রদায় মাত্র। ব্যাপ্‌টিষ্ট জোহন বৌদ্ধ ছিলেন এবং যীশুখ্রীষ্ট বৌদ্ধমতই ইহুদিসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টানেরা ইহা স্বীকার করিতে নারাজ। নারাজ হইবারই কথা। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা ঐতিহাসিক প্রমাণ চাহেন। মাক্সমূলার বলিয়াছেন, বিনা ঐতিহাসিক প্রমাণে খ্রীষ্টানির উপর বৌদ্ধের প্রভাব স্বীকার্য্য নহে। চীনদেশে ও তিব্বতদেশে খ্রীষ্টানেরা প্রবেশ করিয়াছিল, ইহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তদ্দ্বারা খ্রীষ্টানি আচারানুষ্ঠান

বৌদ্ধদেশে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু বৌদ্ধ প্রচারক খ্রীষ্টানের দেশে বাস করিয়া বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছিল, এরূপ ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। কাজেই বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান খ্রীষ্টানকর্তৃক অনুকৃত হইয়াছে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না।

কথাটা ঠিক্। ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত কোন ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইতে পারে না। আমরা ঐতিহাসিক নহি। কিন্তু ঐতিহাসিকগণের মুখেই শুনিতে পাই, মহারাজ অশোক সিরিয়া, মিশর, কাইরিনি, এপাইরস প্রভৃতি যবনদেশে বৌদ্ধমতপ্রচারের জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন; পরবর্ত্তী হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজগণ গ্রীক ও রোমক নৃপতিগণের সভায় দূত পাঠাইতেন; প্রাচ্যদেশের সহিত ভারতবর্ষের বহুদিন হইতে বিস্তৃত বাণিজ্যসম্পর্ক প্রচলিত ছিল; যবন নরপতিরা ভারতবর্ষের সন্ন্যাসীদিগকে ধরিয়া স্বদেশে লইয়া যাইতেন; বর্ত্তমান বিচারে এইগুলি ঐতিহাসিক প্রমাণ বলিয়া কেন গৃহীত হয় না, ঠিক্ বুঝা যায় না।

খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্ত্বের মূলকথা, খোদার করুণা ব্যতীত পাপাত্মা মানবের মুক্তির সম্ভাবনা নাই, এবং তিনি মানবপ্রেমের বশীভূত হইয়া, স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া, স্বেচ্ছাক্রমে মনুষ্যের পাপের বোঝা নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন। যীশুখ্রীষ্ট তাঁহার অবতার এবং তিনিই মনুষ্যের পরিত্রাণকর্ত্তা। বুদ্ধদেব ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, কাহারও করুণা দ্বারা মনুষ্য আপন কর্ম্মফল হইতে মুক্ত হইতে পারে, এরূপ বিশ্বাস তিনি করিতেন না। একমাত্র জ্ঞানের পন্থা ভিন্ন মুক্তির দ্বিতীয় পন্থা তিনি দেখান নাই। তবে সেই পন্থা তিনি নিজে আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি মুক্তির পথপ্রদর্শক ছিলেন মাত্র; মুক্তিদাতা বলিয়া আপনাকে প্রচার করেন নাই; এবং পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই যে, খ্রীষ্টানের পরিত্রাণ ও বৌদ্ধের নির্ব্বাণমুক্তি একবিধ পদার্থ নহে। কিন্তু বুদ্ধ নিজে যে ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করেন নাই, তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার প্রতি সেই ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিল। তাঁহাকে জীবের করুণাময় পরিত্রাণকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। বুদ্ধগণের ও বোধিসত্ত্বগণের ও বুদ্ধশক্তিগণের শরণগ্রহণ ও উপাসনা সংসার হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তির সহজ উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। এমন কি, বৌদ্ধেরা বুদ্ধমুখে বলাইয়াছিলেন, "কলিকলুষকৃতানি যানি লোকে, ময়ি নিপতন্তু বিমুচ্যতাং তু লোকঃ" (তন্ত্রবার্ত্তিক ১।৬।১৩)—কলির বশে জীব যে সকল পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সেই পাপের ভার আমার উপর পতিত হউক, জীব সেই পাপভার হইতে মুক্ত হউক—দয়াময় বুদ্ধে আরোপিত এই উক্তির সহিত দয়াময় যীশুখ্রীষ্টের উক্তির অধিক প্রভেদ নাই। এই উক্তিকে খাঁটি খ্রীষ্টানি মত বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। 'আমি অতি দীনহীন, মুই অতি পাপী, প্রভু নিজগুণে দয়া করিয়া আমাকে উদ্ধার কর'—আধুনিক বৈষ্ণবেরা এ কথা আধুনিক বৌদ্ধের নিকট শিখিয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। বৌদ্ধসম্প্রদায়

ইহা খ্রীষ্টানের নিকট পাইয়াছিলেন অথবা খ্রীষ্টানেরা ইহা বৌদ্ধগণের নিকট পাইয়াছিলেন, ঐতিহাসিকেরা তাহার বিচার করিবেন।

বুদ্ধপ্রচারিত নির্ব্বাণতত্ত্বের সহিত ব্রাহ্মণের স্বীকৃত বৈদান্তিক মুক্তিতত্ত্বের মৌলিক পার্থক্য নাই। কিন্তু খ্রীষ্টপ্রচারিত পরিত্রাণতত্ত্বের সহিত ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্। কিন্তু কালক্রমে বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্ব কিরূপে বিকৃত হইয়া খ্রীষ্টানি পরিত্রাণতত্ত্বের সাদৃশ্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা দেখা গেল। ব্রাহ্মণশাসিত বেদপন্থী সমাজও এই বিকার হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই। মহাযানী, মন্ত্রযানী, বজ্রযানী —বিবিধ বৌদ্ধসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণ যখন সস্তায় ও সহজে ভবসমুদ্র তরাইবার জন্য আপন আপন ডিঙি হাজির করিয়া যাত্রীদিগকে টানাটানি করিতে লাগিল, তখন বেদপন্থার জাহাজের জন্য পাথেয়সংগ্রহে কাহারও আর প্রবৃত্তি থাকিল না। সদাচার ধ্বংসমুখে পতিত হইতে চলিল; বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বিলুপ্ত হইতে চলিল; ব্রাহ্মণের যজ্ঞভূমির উপরে বৌদ্ধগণের চৈত্য ও বিহার প্রতিষ্ঠিত হইল; হোমাগ্নি নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়া অনার্য্য দেবদেবীর প্রতিমায় দেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল; দেশবিদেশ হইতে বৌদ্ধ প্রচারকগণের আনীত অনার্য্য অনুষ্ঠানে আর্য্যসমাজ কলুষিত হইতে চলিল; বৌদ্ধবিহারমধ্যে রাজশাসন, সমাজশাসন ও শাস্ত্রশাসনের বহির্ভূত নরনারী দলবদ্ধ হইয়া নানাবিধ জুগুপ্সিত বীভৎস অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তন করিয়া বেদবিরুদ্ধ তান্ত্রিকতার সৃষ্টি করিয়া কর্ণধারহীন সমাজের তরণিখানিকে মগ্ন করিবার উদ্যোগ করিল। তখন সেই স্রোতের গতি ফিরাইবার জন্য ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধপন্থার সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া কঠোর বৈদিকমার্গকে শিথিল করিয়া সংসারতাপ হইতে পরিত্রাণের সহজ পন্থা নির্দ্দেশ দ্বারা সনাতনধর্ম্মকে রক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন।

যজ্ঞমূর্ত্তি প্রজাপতি,—বিরাট্ ও হিরণ্যগর্ভের সহিত ক্রমশ লোকলোচন হইতে অন্তর্দ্ধান করিলেন। রুদ্রমূর্ত্তি কপর্দ্দী পিনাকপাণি আপনার ধনুঃশর পরিত্যাগ করিয়া অবলোকিতেশ্বরের অনুকরণে আশুতোষ শঙ্করমূর্ত্তিতে পুনর্গঠিত হইলেন। জাতকোক্ত বুদ্ধাবতারগণের অনুকরণে নারায়ণের অবতারনিচয় কল্পিত হইল। গোপাবল্লভ মায়াসুতের স্থলে গোপীবল্লভ যশোদাদুলাল উপাসকের ভক্তি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। উপনিষদের উমা, হৈমবতী ও রুদ্রভগিনী অম্বিকা, ধূম্রবর্ণা কালী-করালাদি যজ্ঞাগ্নির সপ্ত জিহ্বার সহকারে, একদিকে বেদান্তপ্রতিপাদ্য নিখিলপ্রপঞ্চের জনয়িত্রী মহামায়ার ও অন্যদিকে শবরদ্রবিড়পূজিতা চামুণ্ডার সহিত মিলিত হইয়া, ঈশানজননী মহেশ্বরপত্নীরূপে বুদ্ধমাতা প্রজ্ঞাপারমিতার সহিত ও বুদ্ধশক্তি তারাদেবীর সহিত মিশিয়া গেলেন। সিততারা, উগ্রতারা ও নীলতারা, —বজ্রেশ্বরী, বজ্রবারাহী ও উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীর সহিত উপাসনাভাগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। গৌরী-পদ্মা-শচী-মেধাদি মাতৃকাগণ ইন্দ্রাণী-কৌবেরী প্রভৃতি শক্তিগণের ও উগ্রচণ্ডা-প্রচণ্ডাদি নায়িকাগণের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন। দেবগন্ধর্ব্ববাহিতা পুরাতনী বাগ্‌দেবতা বীণাপুস্তকের সহিত [illegible] ও

মদিরাকলস গ্রহণ করিলেন। অবিদ্যা-নাশিনী কামবিজয়িনী মহাবিদ্যা কামোপরি-স্থিতা আত্মঘাতিনী ছিন্নমস্তার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। ভাগবত-পাঞ্চরাত্র-পাশুপত প্রভৃতি বিবিধ সম্প্রদায় আপন আপন ইষ্টদেবতার প্রসাদলাভই সংসার হইতে উদ্ধারের এক-মাত্র সহজ উপায় বলিয়া প্রচারিত করিতে লাগিল। অবশেষে যখন 'হরের্নামৈব কেবলং' কলিকলুষনাশের ও পতিতু-উদ্ধারের সহজ-তম পন্থাস্বরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া গেল, তখন অধঃপতিত ধিকৃকৃত বৌদ্ধনামে পরিচিত হওয়া আর কেহ আবশ্যক বোধ করিল না।

এ কালের পুরাণতন্ত্রে দেবদেবীর উপা-সনা ও দেবদেবীর প্রসাদলাভ চতুর্ব্বর্গ-ফল-প্রদ ও মোক্ষহেতু বলিয়া অকাতরে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বলা বাহুল্য, এই মোক্ষ দর্শনশাস্ত্রের মোক্ষ নহে। সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা সাবধান, তাঁহারা অনেকটা বুঝিয়া কথা কহেন। ইষ্টদেবতার সালোক্য-সামীপ্য প্রভৃতি তাঁহারা প্রার্থনা করেন; সাযুজ্যসম্বন্ধে ভয়ে ভয়ে কথা কহেন; আর নির্ব্বাণমুক্তির নাম শুনি-লেই তাঁহারা চমকিয়া উঠেন। মুক্তি, যাহার বেদান্তসম্মত পন্থা জীবব্রহ্মের একতানিরূপণ, তাহা আধুনিক ভক্ত বা প্রেমিক উপাসকের শিরঃপীড়াজনক। মায়ের ছেলে রামপ্রসাদ চিনি খেতে ভালবাসিতেন, চিনি হ'তে চাহিতেন না। বৈষ্ণব আচার্য্যগণের অনেকে দম্ভের সহিত তাদৃশ উক্তির সমর্থন করিয়া-ছেন। এ বিষয়ে খ্রীষ্টানের সহিত আধুনিক দ্বৈতবাদী হিন্দুর বড় পার্থক্য নাই।

বৌদ্ধ প্রতিবাতে যখন সনাতন ধর্ম্মের তরণিখানি বিপ্লুত হইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, সেই সময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হয়। তিনি অগাধ বিদ্যাবলে ও অগাধ ধীশক্তিবলে বেদান্তপ্রতিপাদ্য মুক্তিতত্ত্বের পুনঃপ্রচার করেন। তৎকালে বৌদ্ধ, জৈন, পাঞ্চরাত্র, পাশুপত, নগ্ন ক্ষপণক, কাপালিক প্রভৃতি বিবিধ সদাচারভ্রষ্ট বেদমার্গচ্যুত সম্প্রদায়ের পরস্পর বিবাদকোলাহলে ভারত-বর্ষের আর্য্যসমাজ "কাকসমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়" মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করা-চার্য্য এই-সকল-সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্য্যগণের সহিত জীবনব্যাপী বিচারসমরে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রুতিসম্মত মুক্তিতত্ত্বের উদ্ধার করেন। তৎ-কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত মুক্তিতত্ত্বের নামান্তর অদ্বয়বাদ।

এইখানে বলা উচিত, শঙ্করাচার্য্যকৃত বেদান্তব্যাখ্যা সকল আচার্য্য গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা অন্যরূপে বেদান্তশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষদের ভাষা অতি প্রাচীন ভাষা; সর্ব্বস্থানে উহার অর্থ-বোধ সুকর নহে। আবার ঐ ভাষা অনেক-স্থলে কবিতার ভাষা, কোথাও বা হেঁয়ালির ভাষা। কাজেই বেদান্তদ্রষ্টা ঋষিগণের প্রকৃত অভিপ্রায় কি ছিল, সে বিষয়ে মতদ্বৈধনিবারণের উপায় নাই। অধুনাতন কালে প্রাচীনভাষায় নানা অর্থ আবিষ্কার করা চলিতে পারে। ঘটিয়াছেও তাহাই। আচার্য্যগণের মধ্যে যিনি যে মতের পক্ষপাতী, তিনি শ্রুতিবাক্য-মধ্যে সেই মতের অনুযায়ী অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং যে এই-রূপ পক্ষপাত করেন নাই, তাহাও বলা যায় না। তিনি অদ্বয়মতের পক্ষপাতী ছিলেন।

তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট পন্থাকে মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রুতিবাক্য দ্বারা সমর্থিত না হইলে কোন নবপ্রচারিত বা নবাবিষ্কৃত মত গৃহীত হওয়া উচিত নহে, ইহা তাঁহার ধ্রুব-বিশ্বাস ছিল। সেইজন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অনেকস্থলে শ্রুতিবাক্যের আত্মমতের অনুযায়ী অর্থ করিতে হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায়। তথাপি ইহাও মানা যাইতে পারে, বেদান্তবাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম শঙ্কর যেমন বুঝিয়াছিলেন ও বুঝাইয়াছিলেন, আর কেহ তেমন পারেন নাই। অন্তত আমাদের সেইরূপ বিশ্বাস।

শঙ্করপ্রচারিত বেদান্তব্যাখ্যা বেদান্তসঙ্গত হউক আর না হউক, এবং শঙ্কর-প্রচারিত অদ্বয়বাদ সত্য হউক আর না হউক, সে প্রসঙ্গ এখানে উত্থাপনের প্রয়োজন নাই। শঙ্করের ব্যাখ্যা পরবর্ত্তী বহু দার্শনিক কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানিসমাজে তৎপ্রচারিত অদ্বয়বাদ যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, অন্যের প্রচারিত অন্য কোন বাদ সেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। অদ্বয়বাদীরা মুক্তিশব্দে কি বুঝিতেন, আমাদের এস্থলে তাহাই আলোচ্য। তাঁহাদের যুক্তির সারবত্তা আমাদের আলোচ্য নহে। তাঁহারা যাহাকে মুক্তির পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা মুক্তির প্রকৃত পথ বা প্রকৃষ্ট পথ না হইতে পারে। তাঁহারা বেদান্তবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহাও প্রকৃত অর্থ না হইতে পারে। অদ্বয়মতানুযায়ী মুক্তির তাৎপর্য্য কি, উপস্থিত আলোচনার ইহাই উদ্দেশ্য।

শঙ্করপ্রচারিত মুক্তির অর্থসম্বন্ধে ও অদ্বয়বাদের তাৎপর্য্যসম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা দেখা যায়। ইংরাজি-বাঙ্‌লা নানাবিধ গ্রন্থে এই অদ্বয়মতের আলোচনা দেখিয়াছি। কিন্তু অধিকাংশস্থলেই হতাশ হইতে হইয়াছে, স্বীকার করিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই সমস্ত প্রচলিত আলোচনার সারসঙ্কলন করিলে কতকটা এইরূপ দাঁড়ায়।

প্রচলিতব্যাখ্যানুসারে অদ্বয়বাদী একমাত্র নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। সেই একমাত্র নিত্য পদার্থের নাম ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। ইংরাজিতে ইহার Universal Soul নাম দেওয়া চলিতে পারে। ইহাই বেদান্তস্বীকৃত ঈশ্বরপদের বাচ্য। তবে অন্য শাস্ত্রের স্বীকৃত ঈশ্বরে ও বেদান্তস্বীকৃত ঈশ্বরে প্রভেদ আছে। খ্রীষ্টানাদির ঈশ্বর সগুণ; বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িকগণের এবং নৈয়ায়িকাদি দার্শনিকগণের স্বীকৃত ঈশ্বরও সগুণ। কিন্তু বেদান্তের ঈশ্বর—যাঁহাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মা বলা হয়—তিনি নির্গুণ।

এই নির্গুণ পরমাত্মা বা ব্রহ্মই একমাত্র সত্যপদার্থ;—তদ্ভিন্ন আর সমস্তই মিথ্যা। এই যে প্রকাণ্ড জগৎ আমাদের সমক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহা মিথ্যা। ইহা সেই ব্রহ্মেরই মায়া হইতে উৎপন্ন। ব্রহ্ম আপনার মায়া দ্বারা এই মিথ্যা-জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই সত্যবস্তু পরমাত্মা ও তাঁহার মায়াকল্পিত এই মিথ্যা-জগৎ ব্যতীত দেহধারী জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে কি না? বেদান্ত এ বিষয়ে কি বলেন? এই জীবাত্মাকে ইংরাজিতে Individual Soul বলা হয়।

জীবাত্মার ভোগের জন্য এই বিশ্বজগৎ বর্ত্তমান; জীবাত্মা কাজেই ভোক্তা, কর্ত্তা, সুখী, দুঃখী রূপে প্রতীয়মান হন। কিন্তু ইহা জীবাত্মার বুঝিবার ভুল। জীবাত্মা বস্তুতই পরমাত্মার সহিত এক পদার্থ। পরমাত্মা নির্গুণ, কাজেই তিনি কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী হইতে পারেন না। জীব অবিদ্যা বা অজ্ঞান বশে আপনাকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন মনে করিয়া আপনাকে সুখী, দুঃখী, কর্ত্তা, ভোক্তা বলিয়া মনে করে। অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে জীব আপনাকে পরমাত্মার সহিত এক বলিয়া জানিতে পারে; তখন সে মুক্তির অধিকারী হয়। মুক্ত হইলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বা ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়। তখন উহাকে আর কর্ম্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয় না। তখন আর উহাকে জন্মান্তরপরিগ্রহ করিয়া সংসারচক্রে ঘুরিতে হয় না।

ব্রহ্ম ও জীব এক; এ কিরূপ ঐক্য? প্রচলিতমতানুসারে উভয়ই এক বস্তুতে নির্ম্মিত। তবে ব্রহ্ম নিরুপাধিক; আর জীব সোপাধিক। মহাকাশের সহিত ঘটাকাশের যেরূপ সম্বন্ধ, জলরাশির সহিত বুদ্বুদের যেরূপ সম্বন্ধ, পরমাত্মার সহিত—Universal Soul-এর সহিত—জীবাত্মার—Individual Soul-এর কতকটা সেইরূপ সম্বন্ধ। ঘটাকাশ ও আকাশ, বস্তুত একই পদার্থ; কেবল ঘটরূপী উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হওয়াতে উহা পৃথক্ দেখায়। বুদ্বুদ ও জল একই পদার্থ; কেবল ভিতরে বায়ু থাকায় বুদ্বুদকে জল হইতে পৃথক্ দেখায়। কিন্তু ঘটটি ভাঙিয়া ফেলিলে ঘটের অন্তর্গত আকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায়; বায়ুটুকু বাহির হইয়া গেলে বুদ্বুদ যেমন জলরাশিতে মিশিয়া যায়; তখন উহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোন চিহ্ন থাকে না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলেই জীবাত্মা পরমাত্মায় মিশিয়া যায়; তখন আর উহা স্বতন্ত্র থাকে না। অজ্ঞান-উপাধি থাকাতে উহাকে কর্ত্তা, ভোক্তা, সুখী, দুঃখী বলিয়া,—ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, বোধ হইতেছিল। অজ্ঞানের বিলোপে উহা নির্গুণ নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপে লীন হইয়া যায়। উহাকে তখন আর স্বতন্ত্র বলিয়া চেনা যায় না। ইহার নাম মুক্তি।

বলা বাহুল্য, এই মুক্তিলাভের পর পুনর্জন্ম ঘটে না; কেন না, জন্মমরণ-আধিব্যাধি, এ সমস্ত অনিত্য অবাস্তব দেহের ধর্ম্ম; নির্গুণ পরমাত্মার পক্ষে এ সকলের সম্ভাবনা নাই।

প্রচলিতব্যাখ্যানুসারে ইহাই অদ্বয়বাদ। জীব ব্রহ্মের সহিত এক ও অভিন্ন; অর্থাৎ উভয়েই একজাতীয় পদার্থ। ব্রহ্মও যেমন নিত্য, নির্ব্বিকার, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ; জীবও তদ্রূপ; তবে অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানের বশে জীব আপনাকে অন্যরূপ মনে করে। যতদিন মনে করে, ততদিন সে কর্ম্মপাশবদ্ধ হইয়া পুনঃপুন জন্মমৃত্যুর অধীন হইয়া সংসারচক্রে ভ্রমণ করে। সেই অবিদ্যাটা কাটিয়া গেলে জীব ব্রহ্মে মিশিয়া যায়—তখন মৃত্যুর পর পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

ভয়ে ভয়ে বলিতেছি; খুব সম্ভব যে, পাঠকগণের অধিকাংশেরই ইহাই অদ্বয়বাদ বলিয়া ধারণা আছে। এবং এইরূপ ধারণা

আছে বলিয়াই দ্বৈতবাদী আচার্য্যগণ অদ্বৈত-বাদের উপর খড়্গহস্ত। এ কি স্পর্দ্ধা! জীব আর ব্রহ্ম কখন কি একজাতীয় পদার্থ হইতে পারে? উভয়ের একাত্মতা কি সম্ভবপর? যেরূপেই হউক, ব্রহ্ম হইতে এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-স্থিতি-লয় ঘটিতেছে। সেই পরিপূর্ণ ব্রহ্মের সহিত ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ, পরিমিত, জন্মমৃত্যু-জরাব্যাধির অধীন জীবের একাত্মতা-স্বীকার—ইহা বাতুলের প্রলাপ। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টের, অপরিমেয়ের সহিত পরিমিতের ঐক্য বা একাত্মতা কখনই স্বীকার করা যাইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে সেব্য-সেবকসম্বন্ধ স্বীকার করা যাইতে পারে। আর মুক্তি অর্থে যাহাই হউক, উহাকে ব্রহ্ম-স্বরূপপ্রাপ্তি বলা যাইতে পারে না; বড় জোর ব্রহ্মসান্নিধ্যলাভ, ব্রহ্মসালোক্যলাভ ইত্যাদি বলা যাইতে পারে। অদ্বয়বাদীর মুক্তি দ্বৈত-বাদীর প্রার্থনীয় নহে; ঐ মুক্তি কেবল মিথ্যাভিমানী অবিদ্বানের মিথ্যা আস্ফালন।

মুক্তির ও অদ্বয়বাদের ঐরূপ অর্থ ধরিয়া দ্বৈতবাদী এইরূপে গর্জ্জন করেন। কিন্তু তাঁহার গর্জ্জন সম্পূর্ণ নিরর্থক। অকারণে তিনি হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া বলক্ষয় করেন। কেন না, অদ্বয়বাদের যে অর্থ উপরে দেওয়া হইল, আমাদের বিশ্বাস উহা প্রকৃত অদ্বয়বাদ নহে। মুক্তিতে যে অর্থ আরোপ করিয়া দ্বৈতবাদী আস্ফালন করেন, আমাদের বিশ্বাস মুক্তির অর্থ তাহা নহে।

বর্ত্তমান লেখকের দৃঢ় বিশ্বাস, উপরে যাহা অদ্বয়বাদ বলিয়া বিবৃত হইল, তাহা অদ্বয়বাদ নহে; তাহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ মাত্র।* এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই প্রচ্ছন্ন দ্বৈত-বাদেরই নিরাসের জন্যই আপনার সমগ্রশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। যে মত শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণের প্রতি আরোপ করা হয়, তাহা তাঁহাদের মত নহে। বরং সেই মত নিরাসের জন্যই তাঁহাদের সমস্ত পরিশ্রম।

Individual Soul আর Universal Soul, এই দুই ইংরেজি তর্জ্জমা হইতেই এই ভ্রমের কথা বুঝা যায়। Individual Soul বলিতে বুঝায়, দেহধারী জীবের আত্মা; আর Universal Soul বলিতে বুঝায় একটা বৃহত্তর আত্মা—পরিমিত জীবের আত্মা অপেক্ষা বৃহত্তর জগদ্ব্যাপী আত্মা। উভয়ের সম্বন্ধ মহাকাশ ও ঘটাকাশের সম্বন্ধের তুল্য। একটা অসীম, অপরিমেয়, উপাধিবর্জ্জিত, অনির্ব্বাচ্য; আর-একটা সসীম, পরিমেয়, উপাধিবিশিষ্ট, নির্দ্দেশ্য। উভয়ে অভিন্ন অর্থাৎ একজাতীয় পদার্থে, একই বস্তুতে নির্ম্মিত। ইহাতে মোটামুটি বুঝায়, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ; জীব ঈশ্বরের অংশ।

কিন্তু আমরা বলিতে চাহি যে, এই Universal Soul ও Individual Soul ঘটিত ব্যাখ্যাটা অদ্বয়বাদ নহে; ইহা প্রচ্ছন্ন দ্বৈতবাদ।

তবে বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি? দেখা যাক।

অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্মপদার্থে ও জীবপদার্থে কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না; বিজাতীয়, সজাতীয়, স্বগত কোনরূপ ভেদ স্বীকার করেন না। এক অন্যের অংশ বলিলে ভুল হয়; উভয়ই সর্ব্বতোভাবে এক। অর্থাৎ কিনা জীব অর্থে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম অর্থে জীব। পরমাত্মা অর্থে জীবাত্মা ও জীবাত্মা অর্থে

পরমাত্মা। আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন—এই বাক্যের অর্থ আত্মার অপর নাম ব্রহ্ম। ব্রহ্মশব্দ বেদান্ত-শাস্ত্র হইতে উঠাইয়া দিয়া সর্ব্বত্র 'আত্মা'শব্দ ব্যবহার করিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

কিন্তু এই কথা বলিতে গেলেই অপর পক্ষ হইতে হাহাকার উঠিবে। জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ- ইহা বরং ছিল ভাল; জীব ও ব্রহ্ম সর্ব্বতোভাবে এক—আত্মার অপর নামই ব্রহ্ম—ইহা যে আরও বিষম কথা! এরূপ যে বলে, সে যে বাতুলেরও অধম!

এ পক্ষের বিভীষিকার একটা হেতু আছে; কিন্তু সেই হেতু তাঁহাদের স্বকপোল-কল্পিত। তাঁহারা বেদান্তের ব্রহ্মশব্দে গোড়া হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট অর্থ আরোপ করিয়া রাখিয়াছেন। অদ্বয়বাদীরা ব্রহ্মশব্দ সম্পূর্ণ ভিন্নার্থে ব্যবহার করেন, তাহা তাঁহারা জানেন না। এবং আপনারা যে অর্থে ব্রহ্ম-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অর্থবাচ্য ব্রহ্মের সম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর ঐরূপ উক্তি দেখিয়া তাঁহারা আতঙ্কে শিহরিয়া উঠেন। বস্তুত তাঁহাদের আতঙ্কের কারণ নাই। তাঁহারা যে অর্থে ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগ করেন, অদ্বয়বাদী সে অর্থে প্রয়োগ করেন না; অদ্বয়-বাদীর ব্রহ্ম তাঁহাদের ব্রহ্ম নহে। সুতরাং অদ্বয়বাদীর ব্রহ্মসম্বন্ধে অদ্বয়বাদীর উক্তি তাঁহাদের ব্রহ্মকে স্পর্শমাত্র করে না। সুতরাং, তাঁহাদের আতঙ্ক ভিত্তিহীন ও নিরর্থক। তাঁহাদের প্রতিবাদও অদ্বয়বাদীকে স্পর্শ করে না। তাঁহাদের লড়াই হাওয়ার সহিত।

অদ্বয়বাদীর ব্রহ্ম তবে কি? তিনি যাহাই হউন, কোনরূপ সগুণ ঈশ্বর নহেন। খ্রীষ্টা-নেরা এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, বিধাতা, অসীমশক্তিশালী, ন্যায়বান্, করুণা-নিধান, এক নিরাকার ব্যক্তির—Person-এর—অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যগণ বেদান্তশাস্ত্রের ব্রহ্মকে যথাসাধ্য সেই খ্রীষ্টানি সৃষ্টিকর্ত্তার নিকট টানিয়া লইয়া গিয়াছেন। বেদান্তের ব্রহ্মের সহিত—অন্তত অদ্বয়বাদপ্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সহিত– তাঁহার কোন সম্পর্ক নাই। আমাদের দেশেও সাম্প্রদায়িকেরা ও দ্বৈত-বাদী দার্শনিকেরা ও ঐশ্বরকারণিকেরা ঐরূপ একজন সৃষ্টিকর্ত্তার কল্পনা করেন —তবে খ্রীষ্টানেরা তাঁহাতে যে সকল গুণ অর্পণ করেন, ইঁহারা সকলে সেই সকল গুণ অর্পণ করিতে চাহেন না। অনেকের মতে তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ও সগুণ; আবার অনেকের মতে নির্গুণ অথবা শুদ্ধচৈতন্য-স্বরূপ। চরাচর ব্রহ্মাণ্ড ইঁহারই সৃষ্টি অথবা ইঁহারই মায়া। কাহারও মতে ইনিই Universal Soul, জীব ইঁহারই অংশ; মুক্তির পর জীব ইঁহাতে লীন হইয়া যান। কেহ বা সে কথা বলিতে গেলে মারিতে আসেন। এই Universal Soul—এই জীব হইতে স্বতন্ত্র "ঈশ্বর" যিনিই হউন, ইনি অদ্বয়-বাদীর ব্রহ্ম নহেন; এবং যাঁহারা অদ্বয়বাদকে শ্রুতিবাক্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাদের মতে ইনি উপনিষৎপ্রতি-পাদ্য শ্রুতিসম্মত ব্রহ্ম নহেন।

তবে এই অদ্বয়বাদীর ব্রহ্মশব্দের অর্থ কি? অদ্বয়বাদীর ব্রহ্মশব্দের অর্থই আত্মা। ইনি আর কেহই নহেন—ইনি আত্মা—তোমরা যাহাকে জীবাত্মা বল বা জীব বল, ইনি সেই জীবাত্মা বা জীব। অদ্বয়বাদমতে

পরমাত্মার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। 'পরমাত্মা'নাম যদি নিতান্তই ব্যবহার করিতে হয়, উহা জীবাত্মার সহিত এক, অভিন্ন ও সমানার্থক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

আর একবার এইখানে বলিয়া রাখি, অদ্বয়বাদ সত্য কি মিথ্যা, তাহার আলোচনা এ প্রসঙ্গের আদৌ উদ্দেশ্য নহে। অদ্বয়বাদী ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, সে কথা তুলিবারই কোন প্রয়োজন নাই। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ স্বীকার্য্য হউক আর না হউক, তাহাতে আপাতত কিছুই যায়-আসে না। বিশুদ্ধ অদ্বয়বাদ কি, তাহা বুঝিয়া দেখাই বর্ত্তমান আলোচনার একমাত্র লক্ষ্য।

এই অদ্বয়বাদকে খাঁটি Idealism বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করেন। বার্কলির idealismএর সহিত ইহার মিল আছে, আবার প্রভেদও আছে। বার্কলি প্রতীয়মান জড়-জগতের পারমার্থিক স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। অদ্বয়বাদীও স্বীকার করেন না। উভয়েরই মতে প্রতীয়মান জগৎ প্রত্যয়সমষ্টিমাত্র। এই প্রত্যয়স্বরূপ জগৎ যে চেতন পদার্থের সমীপে প্রতীত হয়, তাহার নাম আত্মা। বার্কলি ও অদ্বয়বাদী, উভয়েই এই চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের উভয়ের নিকট এই প্রতীয়মান জগতের সাক্ষী চেতন আত্মার অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ সত্য। এই চেতন সাক্ষী না থাকিলে জগৎ কেবল অসম্বদ্ধ প্রত্যয়পরম্পরায়, ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টিতে পরিণত হইত। বার্কলির ভাবায় এই চেতন আত্মাই রূপ দেখে ও শব্দ শুনে ও আপনাকে রূপের দ্রষ্টা ও শব্দের শ্রোতা বলিয়া জানে; চেতন আত্মা না থাকিলে রূপ হয় ত থাকিত, শব্দ হয় ত থাকিত; কিন্তু রূপ শব্দ শুনিতে পাইত না ও শব্দ রূপ দেখিতে পাইত না; রূপের সহিত শব্দের কোন সম্পর্ক থাকিত না; বৌদ্ধগণ জগৎকে ক্ষণিক বিজ্ঞানের সমষ্টি বা প্রত্যয়পরম্পরা বলিয়াই জানেন; তাঁহারা এই আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। ইংরেজ দার্শনিকগণের মধ্যে হিউম স্বীকার করেন না। হিউম স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন, অনেক পণ্ডিতের নিকট এই সাক্ষী আত্মা স্বতঃসিদ্ধ বস্তু; তাঁহারা সেই আত্মাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পান; আমি কিন্তু এই আত্মাকে কখনই দেখিতে পাই নাই। আত্মাকে খুঁজিতে গিয়া কেবল একটা-না-একটা প্রত্যয় দেখি,—শীতাতপ, আলো-আঁধার, সুখ-দুঃখ, এইরূপ একটা-না-একটা প্রত্যয় দেখি; এই প্রত্যয়, এই ক্ষণিক বিজ্ঞানই আমার পক্ষে সর্ব্বস্ব; সুষুপ্তির সময় যখন এই প্রত্যয়গুলি লীন হইয়া যায়, তখন আমিও থাকি না। বার্কলির সহিত ঐ পর্য্যন্ত অদ্বয়বাদীর মিল আছে। কিন্তু তাহার পরে আর মিল নাই। অদ্বয়বাদীর মতে আত্মা বহু নহে, আত্মা একমাত্র। সে কোন্ আত্মা? আমিই যে আত্মা। অন্য মনুষ্যে আত্মার পারমার্থিক অস্তিত্ব আরোপে অদ্বয়বাদী কুণ্ঠিত। তাহার কারণ কতকটা বুঝা যায়। তোমার দেহ আমার প্রত্যক্ষ-বিষয়। সেই প্রত্যক্ষ-বিষয় দেহ দেখিয়া ও তাহার আকার-ইঙ্গিত দেখিয়া তোমার আত্মার অস্তিত্ব আমি অনুমান করিয়া থাকি। তোমার দেহ প্রত্যক্ষ-বিষয়—তোমার আত্মা প্রত্যক্ষ-বিষয় নহে, অনুমান-বিষয় মাত্র।

কিন্তু তোমার দেহেরই পারমার্থিক অস্তিত্ব যখন আমি স্বীকার করিলাম না, তখন সেই দেহ হইতে অনুমিত আত্মারও পারমার্থিক অস্তিত্ব আমি স্বীকার করিতে পারি না। অন্তত আমার আত্মা যেরূপ আমার উপলব্ধির বিষয় ও আমার নিকট স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, তোমার আত্মা সেরূপ উপলব্ধির বিষয় নহে; অতএব উহা স্বতঃসিদ্ধ বস্তুও নহে। এইখানে বার্কলির সহিত অদ্বয়বাদীর প্রভেদ। কেবল বার্কলি কেন, সাংখ্যদর্শনসম্মত পুরুষের সহিত যদি বৈদান্তিক আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়—তাহা হইলে এখানে সাংখ্যের সহিতও বেদান্তীর ভেদ। সাংখ্য বহুপুরুষবাদী; বেদান্তী একপুরুষবাদী বা একাত্মবাদী। বেদান্তের আত্মা আমার আত্মা—অর্থাৎ আমি। তদ্ভিন্ন অন্য কোন আত্মার অস্তিত্ব বেদান্ত স্বীকার করেন না। এই আত্মার নাম জীবাত্মা বা জীব।

এই জীব অর্থাৎ আমি বিশ্বজগৎ-নামক একটা কল্পিত পদার্থকে আমার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছি ও তাহার প্রতি আমার বিবিধ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুখদুঃখ ভোগ করিতেছি। এই বিশ্বজগৎ আমার নিকট নিয়মিত সুব্যবস্থ জগৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয়; ইহার মধ্যে কার্য্যকারণশৃঙ্খলা দেখিতে পাই। এই জগতের মধ্যে শীতগ্রীষ্ম, দিবারাত্রি নিয়মমত পরিবর্ত্তিত হয়। গ্রহনক্ষত্র নিয়মমত উদিত ও অস্তগত হয়। আগুনে হাত পোড়ে, অন্নে ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি বিবিধ নিয়ম ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলা এই জগতে আমি দেখিতে পাই। এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্যকারণশৃঙ্খলা কোথা হইতে আসিল, ইহা বুঝান একটা সমস্যা। হিউম এবং বৌদ্ধ, আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা নাই; কেবল ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানের পরম্পরামাত্র আছে। উহাদের মধ্যে একটা পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধ আমরা দেখিতে পাই। একটা প্রত্যয়ের পর আর একটা প্রত্যয় আসিয়া থাকে। অন্নভোজনরূপ প্রত্যয়ের পর ক্ষুধানিবৃত্তিনামক প্রত্যয় উপস্থিত হয়, এইমাত্র—কিন্তু উপস্থিত হইতেই হইবে, এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই। কেন না, উভয় প্রত্যয়ই ক্ষণস্থায়ী। একের সহিত অন্যের ঐ পৌর্ব্বাপর্য্যসম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। ঐরূপ ঘটিয়া থাকে; ঐরূপ যে ঘটিতেই হইবে, এরূপ কোন কারণ নাই। কেন অন্যরূপ না ঘটিয়া ঐরূপই ঘটে, এ প্রশ্ন নিরর্থক—কেন না, ঐরূপ না ঘটিয়া অন্যরূপ ঘটিলেও ঠিক সেই প্রশ্নই উঠিত। আতাফল ভূমিতে কেন পড়ে, অগ্নিস্পর্শে কেন যন্ত্রণা হয়, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না; আতাফল যদি উর্দ্ধগামী হইত, অগ্নিস্পর্শে যদি আরাম হইত, তাহা হইলেও কেন তেমন হয়, এই প্রশ্ন উঠিত; তাহারও উত্তর দিতে পারিতাম না। যখন একরূপ-না-একরূপ ঘটিতেই হইবে, তখন যাহা ঘটিতেছে, তাহাই মানিয়া লও। কেন এরূপ হইল, কেন ওরূপ হইল না, এ তর্ক তুলিয়া লাভ নাই। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলেন, উহা অবিদ্যা। হিউম বলেন, ও সকল প্রশ্নের উত্তর নাই; উহা হেঁয়ালি।

বার্কলি জগতের এই নিয়ম, এই ব্যবস্থা, এই কার্য্যকারণসম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য এক বৃহৎ চেতনপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, ইহাকে Universal Soul বা Active Reason এইরূপ একটা নাম দেওয়া হয়। বার্কলি খ্রীষ্টান ছিলেন; তিনি বলেন, এই বৃহৎ চৈতন্যময় পদার্থই খ্রীষ্টানদিগের ঈশ্বর বা খোদা— এবং ইনিই প্রতীয়মান-জগতে নিয়মের, ব্যবহারের ও কার্য্যকারণশৃঙ্খলার প্রতিষ্ঠাতা। জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর সেই বিশ্বাত্মা বা ঈশ্বর তৎকল্পিত বিশ্বজগতে স্বেচ্ছায় কতিপয় নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন ও প্রত্যয়গুলিকে কার্য্যকারণশৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; সেইজন্য একের পর অন্যটি ঘটে। তিনি যেরূপ বিধান করিয়াছেন, সেইরূপই ঘটে; অন্যরূপ বিধান করিলে অন্যরূপই ঘটিত। সেইজন্য পরিমিত সঙ্কীর্ণ জীবাত্মা সেইরূপই ঘটিতে দেখে, অন্যরূপ ঘটিতে দেখে না। তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন বলিয়া যথাকালে সূর্য্য উঠে, যথাকালে ঋতুপরিবর্ত্তন হয়, যথাকালে জীবের জন্মমরণ ঘটে, যথানিয়মে সুখদুঃখের আবির্ভাব-তিরোভাব হয়—প্রত্যয়সমষ্টিরূপ প্রত্যক্ষ জগৎচক্রের নেমি যথানিয়মে আবর্ত্তন করে।

প্রতীয়মান বাহ্যজগতে কার্য্যকারণশৃঙ্খলার ও নিয়মের হেতুপ্রদর্শনের জন্য বার্কলি তাঁহার ঐশ্বরিক আত্মার কল্পনা করিয়াছিলেন। অচেতন জড়জগতের প্রত্যয়স্বরূপ উপাদানগুলি আমরা নির্দ্দিষ্টবিধানমত সজ্জিত ও বিন্যস্ত দেখিতে পাই। কে তাহাদিগকে এইরূপে সাজাইল? এই সজ্জায় ও বিন্যাসে কেবল যে একটা সুন্দর শৃঙ্খলা আছে, তাহা নহে; উহাতে একটা উদ্দেশ্যের, একটা লক্ষ্যের, একটা designএর পরিচয় পাওয়া যায়। জগতের স্রোত যথানিয়মে চলিয়াছে—কিন্তু একটা ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। দেখ, সেই প্রাচীনকালের কুজ্ঝটিকাকার নীহারিকা হইতে কেমন সুন্দর সুব্যবস্থ সৌরজগতের অভিব্যক্তি হইয়াছে। ধরাপৃষ্ঠে কেমন বিবিধ জীবের, বিবিধ উদ্ভিদের উৎপত্তি হইয়াছে; কেমন নূতন উৎকৃষ্ট জীব পুরাতন অপকৃষ্ট জীবের স্থান গ্রহণ করিয়াছে; শেষ পর্য্যন্ত এই অত্যুন্নত মনুষ্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছে। সমগ্র জগদ্‌যন্ত্রটি যেমন তারে-তারে চাকায়-চাকায় গাঁথা; এখানের চাকাখানি কেমন ওখানের চাকাখানিকে নিয়মিত করিয়া রাখিয়াছে। লাপ্লাসের ধীশক্তি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছিল, সৌরজগৎরূপ বিশাল যন্ত্রটি কেমন স্থিতিশীল; এতগুলি বৃহৎ জড়পিণ্ড পরস্পরকে কক্ষাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ সকলে ঘুরিয়া-ফিরিয়া আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষাপথেই প্রতিনিবৃত্ত হইতেছে। জগদ্‌যন্ত্রের এই বৃহৎ উদ্দেশ্য, এই design, এই বড়হাতের-P-যুক্ত Purpose, মন্দমতিকে বুঝাইবার জন্য মহা মহাপণ্ডিতে মিলিয়া এতগুলা Bridgewater Treatiseই লিখিয়া ফেলিয়াছেন। যন্ত্রটির নির্ম্মাণেই কেমন মহৎ উদ্দেশ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। আজি যে উন্নত স্পর্দ্ধিত মনুষ্যজাতি ধরাপৃষ্ঠে অতুল মহিমায় বিচরণ করিতেছে, যেন কত-কোটি বৎসর পূর্ব্ব হইতেই তাহার উৎপত্তির জন্য পরামর্শ চলিতেছিল। আলফ্রেড রাসেল ওয়ালাশ

এই বৃদ্ধবয়সে প্রতিপন্ন করিতে চাহেন, মনুষ্যকে কেন্দ্রগত করিয়া তাহার মহিমা বাড়াইবার জন্যই এত-বড় ব্রহ্মাণ্ডের কারখানাটা এত যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। জড়জগৎকে প্রত্যয়সমষ্টি বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু সেই প্রত্যয়সমষ্টিকে এমন ভাবে এমন মহৎ উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইল কে? তাহারা আপনা হইতে ঐরূপে সজ্জিত হইয়াছে, আপনা হইতে আপনাদিগকে ঐরূপ উদ্দেশ্যের অভিমুখ করিয়া ঐরূপে যথানিয়মে ব্যবস্থিত করিয়া লইয়াছে, এরূপ বলিলে নিতান্ত অত্যাচার হয়। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীরা সেইরূপ বলিতে পারেন, কিন্তু তাহাতে মন মানে না। অচেতন জড়ে অথবা অচেতন প্রত্যয়ে এরূপ ক্ষমতা স্বীকার করিতে পারা যায় না। হিউম বলেন, ঐরূপ না হইয়া সম্পূর্ণ অন্যরূপও হইতে পারিত। যাহা হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ কর; কেন হইয়াছে, ওরূপ প্রশ্ন করিও না। কিন্তু হিউমের এ উত্তরেও মনের তৃপ্তি হয় না।

জড়জগৎকে ঐরূপ নিয়মে স্থাপনের জন্য, ঐরূপ একটা উদ্দেশ্যের অনুকূল করিয়া সাজাইবার জন্য, একজন নিয়ামকের প্রয়োজন, একজন ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন, একজন উদ্দেশ্যবান্, ইচ্ছাশালী, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বজ্ঞ চেতনপুরুষের প্রয়োজন; একজন Personএর প্রয়োজন। ইংরাজিতে ইহাকে বলে—Argument from Design. বার্কলি এইজন্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ চেতন বৃহৎ আত্মার, অর্থাৎ চৈতন্যময় জীব হইতে স্বতন্ত্র ও বৃহত্তর চৈতন্যময় ঈশ্বরের, কল্পনা করিয়াছেন। ইতর লোকে এইজন্য জগৎরূপি-বৃহৎঘট-নির্ম্মাতা বৃহৎ-কুম্ভকাররূপী ঈশ্বরের কল্পনা করে। চেতনাসম্পন্ন জীবের ঐরূপ ইচ্ছাশক্তিপ্রয়োগের, ঐরূপে একটা উদ্দেশ্যের অনুকূলে সাজাইবার ক্ষমতা আছে। তাহা দেখিয়াই এই বৃহৎ উদ্দেশ্য সমাধানের জন্য বৃহৎ চৈতন্যের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। এখন অদ্বয়বাদী বৈদান্তিক এ ক্ষেত্রে কি বলেন, দেখা যাউক।

অদ্বয়বাদী বৈদান্তিকও জড়জগতে এই ক্ষমতা অর্পণে কুণ্ঠিত। প্রত্যয়সমষ্টি আপনা হইতে আপনাকে ঐরূপে বিন্যস্ত ও ব্যবস্থিত করিবে, ইহা তিনিও বিশ্বাস করিতে পারেন না। বেদান্তমতে প্রত্যয়সমূহ জড়পদার্থ বা অচেতন পদার্থ। আমরা আজকাল যাহাকে জড়পদার্থ বলি, বৈদান্তিক তদ্ব্যতীত অন্যান্য পদার্থকেও জড়পদার্থ বলিতেন। একালে যাহাকে matter বলে, বেদান্তমতে তাহা প্রত্যয়মাত্র—তাহা ত অচেতন জড় বটেই। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি পদার্থও বৈদান্তিকের ভাষায় জড়পদার্থ—কেন না, উহাদের নিজের চেতনা নাই। আত্মাই চেতন। আত্মা যাহা দেখে, যাহা শুনে, বা যদ্দ্বারা দেখে, যদ্দ্বারা শুনে, সে সকলই অচেতন জড়। চন্দ্র, সূর্য্য, গাছপালা প্রভৃতি যাহা দেখা যায়, যাহা প্রত্যক্ষগোচর, তাহা ত অচেতন জড় বটেই; ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি যে সকলের সাহায্যে আত্মা এই সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করে, তাহারাও অচেতন জড়। তাহাদের নিজের চেতনা নাই। তাহারা আপনারা আপনাকে দেখিতে পায় না। একমাত্র আত্মাই চৈতন্যস্বরূপ। আত্মাই স্বপ্রকাশ;

আর-সকলই তৎকর্তৃক প্রকাশিত হয়। কাজেই জগদ্‌যন্ত্র আপনা হইতে নিয়মিত, সুসংযত, সুসজ্জিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ, উদ্দেশ্যানুকূল হইতে পারে না; উহাকে সাজাইতে-গোছাইতে, উদ্দেশ্যানুকূল করিতে চেতন আত্মার প্রয়োজন। কিন্তু সে কোন্ আত্মা? বার্কলি বলিবেন যে, সে বিশ্বাত্মা—বৃহৎ ঐশ্বরিক আত্মা—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ইচ্ছাময় চৈতন্যরূপী ঈশ্বর—তিনি ঐরূপে সাজাইয়াছেন বলিয়া ইতর সঙ্কীর্ণ-পরিমিত জীবাত্মা ঐরূপ সজ্জিত দেখে। হিউম এইখানে আসিয়া বলিবেন, 'আচ্ছা, জড়জগতের সৃষ্টির জন্য, জড়জগৎকে সুনিয়ত করিয়া সাজাইবার জন্য, যদি একজন চেতনপুরুষের নিতান্তই প্রয়োজন হয়, তবে তজ্জন্য ঈশ্বরের কল্পনার প্রয়োজন কি? অন্য কোন চেতনপুরুষেও সেই বিধানক্ষমতা, সেই নিয়মরচনার ক্ষমতা অর্পণ করিতে ক্ষতি কি?' "Not only the will of the Supreme Being may create matter, but for aught we know *a priori*, the will of any other being might create it." বৈদান্তিক হিউমের বহুশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মিয়াছিলেন; তিনিও জোরের সহিত এইখানে আসিয়া বলেন, 'রহ, তজ্জন্য জীবাত্মা হইতে স্বতন্ত্র বৃহত্তর আত্মার কল্পনার প্রয়োজন দেখি না; আমাকে ছাড়া আর আত্মা নাই এবং আমিই সেই সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বজ্ঞ চৈতন্যরূপী মহেশ্বর। আমিই এই প্রতীয়মান বিশ্বে ঐরূপ নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছি—আমিই আমার কল্পিত জগৎকে ঐরূপ উদ্দেশ্যানুকূল করিয়া সাজাইয়াছি—আমিই জগতের স্রষ্টা, কর্ত্তা ও বিধাতা—আমিই পরমাত্মা ও আমিই ব্রহ্ম।

কথাটা ঠিক্ হউক আর নাই হউক, ইহার অপেক্ষা স্পষ্ট কথা আর হইতে পারে না। বেদান্ত যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, তিনি আর কেহ নহেন, তিনি আমি—সোঽহম্—অহং ব্রহ্মাস্মি। ইহা শ্রুতিসম্মত মহাবাক্য। ইহার অর্থ লইয়া গণ্ডগোল নিষ্ফল। ইহার অর্থ অতি স্পষ্ট। ইহার সত্যতা লইয়া তর্ক তুলিতে পার—এই মত ভ্রান্ত কি অভ্রান্ত, তাহা লইয়া বিচার করিতে পার; কিন্তু ইহার অর্থ লইয়া বিসংবাদের কোন অবকাশ নাই।

বিশুদ্ধাদ্বয়বাদী শঙ্করাচার্য্য বেদান্তবাক্যের যে এই অর্থ বুঝিয়াছেন, তাহা সহস্র স্থল হইতে তাঁহার বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে। আত্মা অর্থে আমি, ইংরেজিতে যাহাকে Ego বলে বা Self বলে, তাহাই; এবং আমার অপর নাম ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মকে যদি পরমাত্মা বলিতে চাও, আমিই সেই পরমাত্মা; আমা ছাড়া স্বতন্ত্র বৃহত্তর পরমাত্মা কিছুই নাই। ইহাই বিশুদ্ধ অদ্বৈতবাদ —ইহাই জীবব্রহ্মের অভেদবাদ। আমা ছাড়া জীব নাই—আমা ছাড়া ব্রহ্ম নাই—আমিই জীব ও আমিই ব্রহ্ম। যাহা জীবাত্মা, তাহাই পরমাত্মা। কিন্তু ইহা বলিলেই অমনি কোলাহল উঠিবে। রামানুজস্বামী হইতে বার্কলি পর্য্যন্ত সকলেই সমস্বরে কোলাহল করিয়া উঠিবেন। কেহ লাঠি বাহির করিবেন, কেহ ভ্রূকুটী করিবেন, কেহ উপহাসের হাসি হাসিবেন এবং সকলেই গর্জ্জন করিবেন। বলিবেন, 'এ কি বাতুলের প্রলাপ, এই সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্ম্মপাশবদ্ধ, সংসারচক্রে

ঘূর্ণমান, জন্মমরণশীল, দুর্ব্বল, ক্ষীণ জীবের এত বড় স্পর্দ্ধা যে, সে জগৎকর্ত্তৃত্ব, জগদ্‌বিধাতৃত্ব, সর্ব্বশক্তিমত্তার স্পর্দ্ধা করে। এই "minute philosopher, not six feet high"—এই ব্যক্তি বিশ্বভুবনপতির সিংহাসন গ্রহণ করিতে চাহে! হা হতোঽস্মি! হা দগ্ধোঽস্মি!!

অদ্বয়বাদী হাসিয়া উত্তর দেন, 'কে বলিল যে, আমি সঙ্কীর্ণ, সসীম, পরিমিত, কর্ম্মপাশবদ্ধ, জরামরণশীল? কে বলিল, আমি সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ নহি? কেন আমাকে ঐরূপে পরিমিত বিবেচনা করিব? ঐরূপ যদি মনে করি, তাহা আমার অবিদ্যা, তাহা আমার ভ্রান্তি, তাহা আমার অজ্ঞান, তাহা আমার জ্ঞানের অভাব। জ্ঞানের উদয় হইলেই বুঝিব, অখিল প্রপঞ্চের স্রষ্টা, বিধাতা, নিয়ন্তা আমিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম। অন্য ব্রহ্ম নাই। কে বলিল, আমি সুখদুঃখভোগী পরিমিতশক্তি জীবমাত্র? এই প্রপঞ্চ যখন আমারই কল্পনা, উহা যখন আমারই প্রত্যয়, এই স্থূলদেহ, এই জন্ম-জরা-মরণ, এই সুখ-দুঃখ, এ সমস্তও তখন আমারই কল্পনা। বস্তুত আমি এ সকল হইতে মুক্ত; নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্, সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ। এইটুকু না জানিয়া আপনাকে সঙ্কীর্ণ ও পরিমিত মনে করাই অবিদ্যা। এইটুকু জানারই নাম অবিদ্যার ধ্বংস—তাহার পারিভাষিক নাম মুক্তি।'

প্রতিপক্ষ বলিবেন, 'ইহা অদ্বয়বাদীর নিতান্তই গায়ের জোর। জীবের সঙ্কীর্ণতা মানিব না বলিলেই কি চলিবে? এক-মুষ্টি অন্ন যাহার জীবত্বের ভিত্তি, তাহার মুখে এমন কথা বাতুলের প্রলাপ।' কাজেই প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিতে হইলে অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির তাৎপর্য্য আর-একটু স্পষ্টভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

পাশ্চাত্যদর্শনে যাবতীয় পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়; একের নাম Subject বা বিষয়ী; অপরের নাম Object বা বিষয়। যে উপলব্ধি করে, সে বিষয়ী; যাহা উপলব্ধ হয়, তাহা বিষয়। এই বিষয়ী আমি—অহং-পদবাচ্য; আর এই বিষয় তুমি—ত্বংপদবাচ্য। তুমি-শব্দে কেবল আমার সম্মুখবর্ত্তী তোমাকে-মাত্র বুঝায় না। তুমি বলিতে, তিনি, সে, রাম-শ্যাম-হরি, বাঘ-ভালুক, কীটপতঙ্গ, গাছ-পালা, চন্দ্রসূর্য্য, লোষ্ট্র-ইষ্টক, সবই বুঝায়। কেন না, এ সকলই কোন-না-কোন সময়ে তোমার স্থলবর্ত্তী হইয়া আমার উপলব্ধির বিষয় বা আমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে বা হইতে পারে। কাজেই এ সকলই বিষয়শ্রেণিভুক্ত। এমন কি, আমার ইন্দ্রিয়, আমার মন, আমার বুদ্ধি, এ সকলও আমি কোন-না-কোন প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধি করিয়া থাকি। কাজেই এ সকলও বিষয়স্থানীয়। এই সমগ্র বিষয়ের মধ্যে কতিপয় বস্তুকে অর্থাৎ তোমাকে, তাঁহাকে, রাম-শ্যাম-হরিকে, আমারই মত চেতনাসম্পন্ন বলিয়া মনে করি; আর চন্দ্রসূর্য্য, গাছপালা, লোষ্ট্র-ইষ্টকাদিকে চেতনাহীন বলিয়া মনে করি। উহা কেবল লোকব্যবহারের জন্য; উহা ব্যাবহারিক সত্য। উহাতে আমার জীবনযাত্রার সুবিধা হয়, এইমাত্র; কিন্তু আমার জীবনযাত্রাই ব্যবহারমাত্র—সুতরাং পারমার্থিকভাবে অসত্য। বিষয়ী আমিই একমাত্র চেতনপদার্থ—আর আমা ছাড়া যাহা-কিছু আমার প্রত্যক্ষগোচর বা অনুমান-

গোচর, যাহা আমার বিষয়, তাহা চেতনাহীন পদার্থ। উহার কোন অংশে যদি চৈতন্য কল্পিত হয় বা অনুমিত হয়, সে আমারই কল্পনা বা অনুমান মাত্র; কাজেই সে চৈতন্যের স্বাধীন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। আপাতত এই বিষয়ী আমাকে জীব-আখ্যা দেওয়া যাউক ও আমা-ছাড়া সমস্ত বিষয়কে জগৎ-আখ্যা দেওয়া যাউক।

এই জীবের ও এই জগতের পরস্পর সম্বন্ধ কি? আপাতত মনে হয়, জগৎ আমার বাহিরে স্বাধীনভাবে, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত। সাংখ্যবাদী তাহাই বলেন; জড়বাদিগণও তাহাই বলেন। আরও মনে হয়, এই বিষয়ের সহিত আমার নিত্য আদানপ্রদান-কারবার চলিতেছে; শব্দস্পর্শগন্ধাদি বাহির হইতে আসিয়া ইন্দ্রিয়দ্বারা আমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার চেতনায় আঘাত করিতেছে; তজ্জন্য আমার সুখদুঃখভোগ ঘটিতেছে। মনে হয়, আমি সর্ব্বতোভাবে বিষয়ের অধীন ও বিষয়ের বশীভূত; বিষয়ের কোন কোন ক্রিয়া আমার প্রাণযাত্রার অনুকূল; কিছু বা প্রতিকূল। যাহা অনুকূল, তাহা আমার উপাদেয়; যাহা প্রতিকূল, তাহা আমার হেয়। উপাদেয়কে গ্রহণ করিবার জন্য, হেয়কে বর্জ্জন ও পরিহার করিবার জন্য, আমি সর্ব্বদা কর্ম্মশীল, তদর্থ আমার কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি সর্ব্বদা চেষ্টাশীল ও কর্ম্মপর। এই অবিরাম চেষ্টাই আমার জীবন। বিষয়ের সহিত আমার যে ক্ষণে কারবার আরম্ভ হয়, সেই ক্ষণকে আমি আমার জন্মকাল বলি; বিষয়ের সহিত কারবার যতদিন চলিতে থাকে, ততদিন আমার বৃদ্ধি, বিপরিণাম, ক্ষয় ঘটে; ও যে সময়ে কারবার থামে, সেই সময়কে মৃত্যুকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করি। এই সমগ্রকাল ধরিয়া আমি বিষয়াধীন থাকিয়া হেয়বর্জ্জন ও উপাদেয়গ্রহণে চেষ্টা করি। বিষয়াধীন হইয়া আমাকে বিবিধ কর্ম্ম করিতে হয় ও সেই সকল কর্ম্মের যথানিয়মে ফলভোগ করিতে হয়। মৃত্যুর পরেই যে আমার সহিত বিষয়ের কারবার চিরকালের জন্য থামে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত তৎপরেও অন্য স্থানে অন্য দেহ ধারণ করিয়া আমাকে অন্য কর্ম্ম করিতে হয় ও তাহার ফলস্বরূপ সুখদুঃখ ভোগ করিতে হয়। সেইরূপ আমার জন্মের পূর্ব্বেও সম্ভবত অন্যস্থানে অন্যদেহে বিষয়ের সহিত আমার কারবার চলিয়াছিল; তাহার স্মৃতি এখন বর্ত্তমান নাই। কিন্তু তাহার ফলভোগ হয় ত অদ্যাপি করিতে হইতেছে। এইরূপ মনে না করিলে, জন্মান্তরকৃত কর্ম্মের ফল বলিয়া না বুঝিলে, এ জন্মের সকল সুখদুঃখের হেতুনির্দ্দেশ হয় না। জগৎপ্রণালীর নৈতিক সামঞ্জস্য—moral justification—ঘটে না।

এইরূপে বিষয়ের সহিত আমার এই কারবারের আরম্ভ, আমার এই সুখদুঃখভোগ, আমার এই কর্ম্মপরতা, কবে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না; কবে শেষ হইবে, তাহাও বলা দুষ্কর। এই জন্মজন্মান্তরব্যাপী বিষয়-বিষয়ীর পরস্পর আদানপ্রদান—ইহার নাম সংসার। ইহাতে কখন বা আমি বিষয়কে আত্মজীবনের অনুকূল করিয়া লইয়া সুখী হই, কখনও বা বিষয়কর্ত্তৃক পরাভূত হইয়া দুঃখভোগ করি। চক্রনেমির আবর্ত্তনের সহিত আমার এই

দশাবিপর্য্যয়কে উপমিত করা চলে। আমাকে আমি এই সংসারচক্রে ঘূর্ণমান, পরিমিত, কর্ম্মবন্ধনবদ্ধ বিষয়াধীন জীব বলিয়া মনে করিয়া থাকি। ঐ বিষয় সর্ব্বতোভাবে আমা হইতে স্বাধীন, স্বতন্ত্র, বহিঃস্থ, ও আমা অপেক্ষা সর্ব্বতোভাবে শক্তিশালী, ইহাই আমার বিশ্বাস। উহা আপন নিয়মে চলিতেছে, সেই নিয়মের উপর আমার প্রভুত্ব নাই; কখন বা আমি চেষ্টা দ্বারা নিয়মকে আমার অনুকূল করিয়া লই বটে, কিন্তু সেই নিয়ম সর্ব্বতোভাবে আমার অনধীন ও শেষ পর্য্যন্ত উহা আমাকে পরাভব করে; তখন আমি জগদ্‌যন্ত্রের চাকার তলে দলিত, পিষ্ট, অভিভূত হইয়া থাকি।

আমার সহিত জগতের সম্বন্ধ আপাতত আমার ঐরূপ বোধ হয়। বোধ হয়, জীব ক্ষুদ্র, জগৎ বৃহৎ। জীব জগতের অধীন এবং জগতের অধীনতাবশে সুখদুঃখভাগী ও জরামরণশীল। বৈদান্তিক এইখানে আসিয়া বলেন, 'যাহা মনে করিতেছ, তাহা ভুল। জীবের স্বভাব ঐরূপ নহে, জগতের স্বরূপও ঐরূপ নহে; এবং উভয়ের সম্বন্ধ যাহা ভাবিতেছ, ঠিক্ তাহার উল্টা। ঐ যে জগৎ, ঐ যে বিষয়, উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই; উহা বিষয়ীর অর্থাৎ আমার কল্পিত পদার্থ। পরমার্থত উহা স্বপ্নবৎ অলীক পদার্থ। এ কথা যে বৈদান্তিক একা বলেন, তাহা নহে। ইহা প্রাচ্য দার্শনিকের আফিমখুরি নহে। বার্কলি ও হিউম্ হইতে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ ও টমাস্ হেন্‌রি হক্‌সলী পর্য্যন্ত সকলেই জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। তাঁহাদের যুক্তি কাটিতে যিনি সাহস করিবেন, তিনি করুন। আমরা সেই যুক্তির সারবত্তা-সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। আমরা তাঁহাদের সহিত মানিয়া লইব—বিষয়ের নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, উহা বিষয়ীর কল্পনামাত্র। বিষয়ী উহাকে সৃষ্টি করিয়া আপনার বাহিরে প্রক্ষিপ্ত করিয়াছে।

এইখানে সৃষ্টিশব্দ একটু বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করা গেল। ইংরেজিতে যাহাকে creation বলে, আজকাল আমরা সৃষ্টিশব্দ সেই অর্থে ব্যবহার করি। ইংরেজি creationশব্দে কখনও গঠন বা নির্ম্মাণ বুঝায়, কখনও অভিব্যক্ত করা বা মূর্ত্ত্যন্তর দেওয়া বুঝায়, আবার কখনও বা অভাব হইতে ভাব-পদার্থের উৎপাদন বুঝায়। কিন্তু বিষয়ী যে অর্থে বিষয়কে সৃষ্টি করে, আমি যে অর্থে আমার জগৎকে সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা ঐরূপ creation বলিলে বুঝায় না। এই সৃষ্টি-শব্দের অর্থ কি, তাহা ৺ উমেশচন্দ্র বটব্যাল তাঁহার সাংখ্যদর্শনপুস্তকে অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। এস্থলে তাঁহার ভাষা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না। "সৃজ্-ধাতুর আদিম অর্থ বোধ হয় ত্যাগ বা নিক্ষেপ। এই ধাতু হইতে বিসর্জ্জন, সর্গ, বিসৃষ্ট, বিসৃষ্টি, সৃষ্টি ইত্যাদি শব্দ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে জ্ঞেয়ের উপর নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা জ্ঞেয়কে আবৃত করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূলভূতের আবির্ভাব হয়—তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি। যেমন গুটিপোকায় রেশমের কোয়া নির্ম্মাণ করিয়া আপনাকে তন্মধ্যস্থ করে, তদ্রূপ নরনারী যে প্রক্রিয়া

যায়া নিজ নিজ সংসারের (ব্যক্তজগতের বা স্থূলভূতসংঘের) তন্তু দ্বারা আপনাকে আবৃত করে, দর্শনশাস্ত্রে তাহার নাম সৃষ্টি” (সাংখ্যদর্শন ৩৬ পৃঃ)। আমরাও সৃষ্টি-শব্দ ঠিক্ এই অর্থে ব্যবহার করিলাম। বটব্যালমহাশয়ের সহিত আমাদের প্রভেদ এই যে, তিনি সাংখ্যমত বুঝাইতেছেন; আমরা বেদান্তমত বুঝাইতেছি। সাংখ্য বহু জীবের, বহু পুরুষের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বৈদান্তিক এক জীবের, এক পুরুষের, এক আত্মার অস্তিত্ব মানেন। বটব্যাল-মহাশয় যেখানে ‘নরনারী’ বলিয়াছেন, বেদান্তী সেখানে কেবল জীব অথবা ‘আত্মা’-শব্দ ব্যবহার করিবেন। অপিচ সাংখ্য জ্ঞেয়-নামক পদার্থের—প্রকৃতির—স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন; তবে এই জ্ঞেয়প্রকৃতি তাঁহার মতে প্রতীয়মান জগৎ নহে; উহা কোন অনির্ব্বাচ্য বস্তু, যাহা আত্মার বা পুরুষের সন্নিধানে আসিয়া আত্মার সৃষ্টিক্ষমতাবলে পরিদৃশ্যমান প্রতীয়মান জগতে পরিণত হয়। বেদান্ত সেই স্বতন্ত্র অনির্ব্বাচ্য জ্ঞেয়প্রকৃতির স্বাধীন সত্তা স্বীকার করেন না। কাজেই যিনি বৈদান্তিক, তিনি বটব্যালমহাশয়ের ভাষা একটু ঘুরাইয়া বলিবেন, “যে প্রক্রিয়া দ্বারা আত্মা আপনার জ্ঞানরাশিকে আপনা হইতে বাহিরে নিক্ষেপ করে, আপনা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া জ্ঞেয়-পদার্থে পরিণত করে, তদ্দ্বারা ব্যক্তজগতের নির্ম্মাণ করে—অর্থাৎ আত্মা হইতে যেরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম ভূতসমষ্টি বিষয়ের আবির্ভাব হয়, —তাহার নাম দার্শনিক সৃষ্টি।”

বেদান্তমতে জ্ঞেয়, ব্যক্ত, প্রতীয়মান জগতের স্বরূপ কি, তাহা বলা হইল। উহা আত্মারই সৃষ্ট, আত্মারই কল্পিত; উহার ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে, কিন্তু পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই। এ বিষয়ে প্রাচ্যদর্শন ও প্রতীচ্যদর্শন একমত।

তৎপরে কথা, আত্মার স্বরূপ কি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী প্রাচ্য দার্শনিক ও হিউম্ ও হক্সলির ন্যায় প্রতীচ্য দার্শনিক এই আত্মারও অস্তিত্ব মানেন না। বেদান্ত উহার অস্তিত্ব মানেন; ভুলই হউক আর ঠিক্ই হউক, মানেন; এবং বলেন, এই আত্মা স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ; ইহার অস্তিত্ব-প্রতিপাদনের জন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নাই। এখন এই আত্মার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইতে গেলে বড় গোলে পড়িতে হয়। বেদান্তমতে আত্মাই যখন বিশ্বজগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা এবং সেই বিশ্বজগৎ যখন তৎপ্রতিষ্ঠিত-নিয়মানুসারেই অজ্ঞাত ভবিষ্যৎ উদ্দেশ্যকে লক্ষ্য করিয়া চলিতেছে, তখন আত্মাকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিতে হয়। বেদান্ত তাহাই বলিয়াছেন। বেদান্ত আত্মাকেই পুনঃপুন ঐ সকল বিশেষণে বিশিষ্ট করিয়াছেন। আত্মা সর্ব্বজ্ঞ—নতুবা অনাগত ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া জগদ্‌যন্ত্র চালান সম্ভবপর হইত না; আত্মা সর্ব্বশক্তিমান্, নতুবা পরিদৃশ্যমান জগতে যাহা-কিছু বিদ্যমান, সে সকলেরই তৎকর্তৃক সৃষ্টি সম্ভবপর হইত না। এইরূপে আত্মায় সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা আরোপ করিয়া বেদান্ত আত্মাকে অর্থাৎ আমাকে ঈশ্বর এই নাম দিয়াছেন। এখন বলা বাহুল্য, এই বেদান্তের ঈশ্বর খ্রীষ্টানসমাজের বা ব্রাহ্মসমাজের স্বীকৃত ঈশ্বর নহেন। নৈয়ায়িকাদি ঐশ্বরকারণিক দার্শ-

নিকেরা জীব হইতে স্বতন্ত্র যে জগৎকারণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, এ ঈশ্বর সে ঈশ্বরও নহেন। বৈষ্ণবদিগের ভাষা সকল সময়ে বুঝা যায় না। বৈষ্ণব দার্শনিকেরাও অনেকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর কল্পনা করিয়া তাঁহার সহিত জীবের ভিন্নত্ব ও সেব্যসেবকসম্বন্ধ কল্পনা করিয়াছেন। কেহ কেহ আবার এরূপ ভাষায় কথা কহিয়াছেন যে, তাঁহারা বেদান্ত-স্বীকৃত আত্মাকেই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করেন নাই, তাহা বলা দুষ্কর। বৈষ্ণবগণের চতুর্ব্যূহতত্ত্বের সহিত বৈদান্তিক অদ্বয়তত্ত্বের সমন্বয়চেষ্টা দেখিয়াছি। তবে বৈষ্ণব-সমাজের নেতৃগণের নিকট এই সমন্বয়চেষ্টা অনুমোদিত হইবে কি না, জানি না। অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, অদ্বয়মতে আমিই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, জগতের স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহর্ত্তা। পরিদৃশ্যমান চরাচরের "জন্মাদি" আমা হইতেই।

এইরূপে বেদান্ত আত্মায় জগৎকারণত্ব অর্পণ করিয়া উহাকে ঈশ্বরপদবাচ্য করেন ও সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি তাঁহাতে অর্পণ করেন। আবার অন্যদিকে তিনিই আত্মাকে সর্ব্বগুণবিবর্জ্জিত নিরুপাধিক শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এই একটা মহাসমস্যা। আত্মাকে নিরুপাধিক বলার তাৎপর্য্য আগে বুঝা যাউক। আমি আছি, এ বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। ইহা আমার পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ। অথচ সেই আমি কিংস্বরূপ, আমি কেমন, ইহা বুঝাইবার ও বলিবার ভাষা পাওয়া যায় না। কেন না, যাহা-কিছু জ্ঞানগম্য, তাহাই ভাষা দ্বারা প্রকাশযোগ্য ও বর্ণনীয়; কিন্তু যাহা জ্ঞানগম্য, তাহা বিষয়-শ্রেণিভুক্ত, তাহা বিষয়ী নহে। কাজেই আত্মার অর্থাৎ বিষয়ীর যদি কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে আত্মা বিষয়ী না হইয়া বিষয়ের অন্তর্গত হইয়া পড়ে। কাজেই কোন জ্ঞানগম্য ধর্ম্ম, কোন ভাষায় বর্ণনীয় গুণ, আত্মায় আরোপ করা চলে না। কাজেই আত্মাকে ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়। বাক্য মনের সহিত আত্মাকে না পাইয়া, আত্মার স্বরূপপ্রকাশে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসে। বড় জোর, তাহা বিশুদ্ধচেতনাস্বরূপ, এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নিরস্ত হইতে হয়। কিন্তু সেই চেতনা আবার কি, তাহা বুঝান চলে না।

এইরূপে বেদান্ত আত্মাকে নির্গুণ, নিরুপাধিক, অনির্ব্বাচ্য বলিয়া বর্ণনা করেন। হিউমের ন্যায় প্রপঞ্চমাত্র-স্বীকারী এইখানে আসিয়া বলেন, 'যাহার স্বরূপ কি, তাহা জানি না, বুঝি না, বুঝাইতেও পারি না, যাহার অস্তিত্বের প্রমাণ করিবার উপায় নাই, তাহার অস্তিত্বস্বীকার বৃথা জল্পনা।' ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধও প্রায় সেই কথাই বলেন। তিনি বলেন, 'যদি বাস্তবিকই সেইরূপ কোন অনির্ব্বাচ্য পদার্থ থাকে, ও তাহার নামকরণ নিতান্তই আবশ্যক হয়, তাহাকে শূন্য বলাই ভাল।' বেদান্ত জোরের সহিত বলেন, 'আমি উহাকে শূন্য বলিতে প্রস্তুত নহি। শূন্য বলারও যে ফল, নাস্তি বলারও সেই ফল। উহা নাস্তি, ইহা বলিতে আমি প্রস্তুত নহি। উহা নাস্তি নহে; আমি জানিতেছি, উহা অস্তি; উহার অস্তিত্ব

সম্বন্ধে আমি যেমন নিঃসংশয়, অন্য কোন পদার্থের অস্তিত্বসম্বন্ধে আমি তেমন নিঃসংশয় নহি। অথচ উহা কেমন, তাহা ভাষা দ্বারা বুঝাইতে পারি না।'

ভাষা দ্বারা বর্ণনীয় নহে, বুঝাইবার ভাষা পাই না, অতএব নাই—নাস্তিকগণের এই তর্ক বিচারসাপেক্ষ। বুঝিতে পারি, অথচ বুঝাইতে পারি না, এরূপ উদাহরণ অনেক আছে। একটা মোটা উদাহরণ দিব। মনে কর, সবুজ রঙ্; সবুজ রঙ্ কাহাকে বলে, তাহা আমি জানি; উহা আমার একটা পরিচিত প্রত্যয়। কিন্তু যে ব্যক্তি জন্মান্ধ, তাহাকে সবুজ রঙ্ কিরূপ, তাহা বুঝাইবার কোন আশা নাই। সেইরূপ যে ব্যক্তি অন্ধ নহে, অথচ সবুজ রঙ্ কখনও দেখে নাই, তাহাকেও আমি বর্ণনা দ্বারা সবুজ রঙ্ কি, তাহা বুঝাইতে পারিব না। তবে একটা গাছের পাতা তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিয়া বলিতে পারি যে, ইহাই সবুজ রঙ্। জন্মান্ধকে যেমন রঙ্ বুঝান যায় না, তেমনি জন্মবধিরকে শব্দ বুঝান চলে না। সেইরূপ চেতনা কি, তাহা আমি জানি, তাহা আমি বুঝিতে পারি, আমি উপলব্ধি করি; উহার একটা নাম দিতেও পারি; কিন্তু অন্যকে বুঝাইতে পারি না। হিউমের মত যিনি আত্মাকে উপলব্ধি করেন নাই, তাঁহাকে আমরা জোর করিয়া উহা উপলব্ধি করাইতে পারি না। আবার আত্মা যদি একের অধিক বহু থাকিত, যদি আত্মার সদৃশ বা সমধর্ম্মা অন্য-কিছু থাকিত, তাহা হইলেও সেই বস্তু নাস্তিককে দেখাইয়া বলা যাইতে পারিত, ইহাই আত্মা, অথবা আত্মা ইহারই মত। কিন্তু আত্মা বহু নহে; উহার সদৃশ বা সমধর্ম্মা অন্য কোন বস্তু নাই। উহা এক অদ্বিতীয় চেতন পদার্থ; জগতে আর দ্বিতীয় চেতন পদার্থ নাই। কাজেই যতক্ষণ নিজে না বুঝিবে, ততক্ষণ উহার স্বরূপ বুঝাইবার উপায় নাই।

তবে গোল এই যে, বেদান্ত এক মুখে আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করেন, অন্য মুখে আবার তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া বিবৃত করেন, এ কিরূপ? ইহার সামঞ্জস্য হয় কিরূপে? ঐ প্রকাণ্ড উপাধি বর্ত্তমান থাকিতে আত্মাকে নিরুপাধিক বলিব, একি ব্যাপার? একবার বলিতেছি, আমি জগতের স্রষ্টা; আবার বলিতেছি, আমি গুণবর্জ্জিত; এ কিরূপ ব্যাপার?

বেদান্ত এইরূপে উত্তর দেন। বেদান্ত বলেন, এই সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি উপাধি ভুয়া উপাধি—উহা অধ্যাস। যাহা যা নয়, তাহাকে তাহা মনে করার নাম অধ্যাস। রজ্জু সর্প নহে; উহাকে সর্প মনে করা অধ্যাস অর্থাৎ মিথ্যা আরোপ। আত্মায় কোন গুণ নাই, কোন উপাধি নাই; উহাতে যে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি উপাধি আরোপ করা হয়, উহাও অধ্যাস বা মিথ্যা ধর্ম্মের আরোপ। রজ্জু সর্পের মত দেখাইলে উহা সর্প হয় না; আত্মা সোপাধিক দেখাইলেও উহা সোপাধিক হয় না; প্রকৃতপক্ষে উহা নিরুপাধিক। উপাধি কেবল ভ্রম।

কি সর্ব্বনাশ! প্রতিপক্ষ বলিবেন, 'তবে এতক্ষণ ধরিয়া এত দুন্দুভিধ্বনি সহকারে প্রতিপক্ষ সহ এত বিতণ্ডার পর, আত্মাকে

জগৎকর্ত্তা বলিয়া সপ্রমাণ করিবার পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ছিল? এই যে প্রতিপাদন করিলে, "বিশ্বজগতের কর্ত্তা আর-কেহ নহে, আমি স্বয়ং; বিশ্বজগতের আমিই সৃষ্টি করিয়াছি; আমিই আমার উদ্দেশ্যানুরূপ করিয়া চালাইতেছি"; এসব কি অনর্থক? এতক্ষণ বলিতেছিলে সত্য; এখন বলিতেছ মিথ্যা; তোমার কথার মানে বোঝাই দায় হইল। তোমার কোন্ কথাটি গ্রহণ করিব?'

বেদান্তী বলেন, 'বন্ধু হে, একটু স্থির হও। আমার ভাষাটা হেঁয়ালি-গোছের হইতেছে বটে, কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে হেঁয়ালি থাকিবে না। ভাষাটা বড় অদ্ভুত জিনিষ; সত্য-মিথ্যা, এই শব্দ-দুটাই অনেকসময় গণ্ডগোল বাধায়। যাহাকে সত্য বলা যায়, তাহা এক হিসাবে সত্য, অন্য হিসাবে মিথ্যা। যাহাকে মিথ্যা বলা যায়, তাহা একার্থে মিথ্যা, অন্য অর্থে সত্য। মনে কর মরীচিকা—মরুভূমিতে জলভ্রম—ইহা সত্য না মিথ্যা? এক হিসাবে ইহা সত্য। যাহাকে আমরা জল বলি, তাহা একটা প্রত্যয়মাত্র বা কতিপয় প্রত্যয়ের সমষ্টিমাত্র—কতিপয় প্রত্যয় যুগপৎ বুদ্ধির সমীপস্থ হইলে উহাকে জল বলা যায়। বস্তুত জল বলিয়া আমার বাহিরে কিছু নাই। কিন্তু জলবুদ্ধি আছে, জলের প্রত্যয়টা আছে। মরীচিকাতে যে প্রত্যয় জন্মাইয়াছে, উহা জলেরই প্রত্যয়। যতক্ষণ ঐ প্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা জলেরই প্রত্যয়—যে প্রত্যয়সমষ্টিকে আমি জল নাম দিই, উহা সেই প্রত্যয়সমষ্টি। কাজেই উহা সত্য; অন্তত যতক্ষণ মরীচিকা থাকে, যতক্ষণ ঐ জলপ্রত্যয় থাকে, ততক্ষণ উহা সত্য। তার পর যখন অন্য প্রত্যয় উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বপ্রত্যয়কে ধ্বংস করে, জলপ্রত্যয় নষ্ট করিয়া দেয়, তখন বলা যায়, ঐ পূর্ব্ববর্ত্তী প্রত্যয় মিথ্যা। যতক্ষণ ঐ জলপ্রত্যয় ছিল, ততক্ষণ উহা সত্যই ছিল; ততক্ষণ তুমি মাথা খুঁড়িলেও আমি উহাকে জলের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য প্রত্যয় বলিতাম না। এখন যখন সে প্রত্যয় গিয়াছে, তখন উহাকে মিথ্যা বলিতে প্রস্তুত আছি। এতক্ষণ উহাকে সত্য বলিতেছিলাম, কিন্তু এখন জানিতেছি, উহা স্থায়ী সত্য নহে, উহা তাৎকালিক সত্য। যাহা স্থায়ী সত্য নহে, তাহাকে তৎকালে যে সত্য মনে করিয়াছিলাম, তাহারই নাম অধ্যাস। এখন নূতন প্রত্যয় আবির্ভাবের পর নূতন বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, অধ্যাস কাটিয়া গিয়াছে। সেইরূপ রজ্জুকে যখন সর্প বোধ হয়, ঐ বোধও একটা প্রত্যয়; তৎকালে উহা সত্য। কিন্তু সর্পবুদ্ধি কাটিয়া গেলে জানিতে পারি, ঐ বুদ্ধি তাৎকালিক সত্যমাত্র। এইরূপ স্বপ্ন এক হিসাবে সত্য, অন্য হিসাবে মিথ্যা। যতক্ষণ স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ উহার মত সত্য আর কিছুই নাই। কাহারও সাধ্য নাই, উহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; কিন্তু প্রবুদ্ধ অর্থাৎ জাগরিত হইলে সে অধ্যাস যায়; তখন উহা সত্য নহে, জানিতে পারি।

'আত্মার স্বরূপ বিচার করিতে গেলেও সত্য-মিথ্যা ঠিক্ এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

'এই যে জড়জগৎ, যাহা আমার বাহিরে আমি দেখি, উহাও একার্থে সত্য, অন্য অর্থে সত্য নহে। যতক্ষণ উহাকে আমি আমার বাহিরে আমা হইতে স্বতন্ত্রভাবে দেখি, ততক্ষণ উহা সত্য—কাহার সাধ্য উহাকে

মিথ্যা বলে। তখন উহা সত্য—উহা তাৎকালিক সত্য—উহা ব্যাবহারিক সত্য—কেন না, উহা কতকগুলি ইন্দ্রিয়লব্ধ বুদ্ধিগোচর প্রত্যয়ের সমষ্টি। উহার এই সত্যতা স্বীকার করিয়াই আমার জীবনযাত্রা চলিতেছে; নতুবা আমার জীবনই বা কোথায় থাকিত, আমার জগৎই বা কোথায় থাকিত! যতক্ষণ উহাকে ঐরূপ সত্য মনে করি, ততক্ষণ উহার অস্তিত্ব বুঝাইবার জন্য, উহা কোথা হইতে আসিল বুঝাইবার জন্য, উহার নির্ম্মাতার, উহার স্থষ্টিকর্ত্তার, অস্তিত্বকল্পনা আবশ্বক হয়। তা ত হইবেই। উহা যখন সত্য—তাৎকালিক সত্য, তখন উহার উৎপত্তি-স্থিতি-লয়ের কারণ অনুসন্ধান করিতেই হইবে। তখন আমরা অন্য কারণের সন্ধান না পাইয়া, প্রচলিত কারণের অসঙ্গতি দেখাইয়া, আত্মাকেই উহার কারণ বলিয়া, আত্মাকেই জগতের স্রষ্টা বিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করি। যতক্ষণ এই জগৎ সুব্যবস্থ সুনিয়ত উদ্দেশ্যানুযায়ী বৃহৎ যন্ত্ররূপে প্রতীত হয়, ততক্ষণ যাহাকে সেই যন্ত্রের নির্ম্মাতা ও চালক মনে করা যায়, তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভৃতি বিশেষণে বিশিষ্ট করিতে বাধ্য হই। অচেতন জড়জগৎ যখন আপনাকে আপনি উদ্দেশ্যমুখে চালাইতে পারে না, তখন যে একমাত্র চেতনপদার্থকে আমি জানি, সেই চেতন আত্মাকেই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করি। জড়জগৎ যে হিসাবে সত্য, আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্বাদিও ঠিক্ সেই হিসাবে সত্য। ইহাতে বিস্ময়প্রকাশের কারণ নাই।

'কিন্তু যখন বুঝিতে পারি, এই জড়জগৎ স্বপ্নসদৃশ, উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে পারি—উহা একটা অধ্যাসমাত্র। যাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, তাহাতে যখন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছি, তখন সেই আরোপ কেবল অধ্যাস। তখন বুঝিতে পারি, যাহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, উহা তাৎকালিক ব্যাবহারিক সত্যমাত্র, স্থায়ী পারমার্থিক সত্য নহে। সেই কল্পিত জগতে যে নিয়মের, যে ব্যবস্থার, যে উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব দেখিতেছিলাম, জগৎই যখন কল্পনা, তখন সে সকলই কল্পনা। জগৎই যখন অধ্যাস, সে সকলই তখন অধ্যাস। তখন সেই মিথ্যাজগতের স্রষ্টা, বিধাতা, নিয়ন্তা কল্পনারই বা প্রয়োজন কি? যাহা নাই, তাহার আবার সৃষ্টি কি? তাহার আবার নিয়ন্তা কি? ঐ সকল বিশেষণ তখন অর্থশূন্য হইয়া দাঁড়ায়।

'বন্ধ্যার পুত্র যেমন অর্থশূন্য, ঘোড়ার ডিমের যেমন অর্থ হয় না, অস্তিত্বহীন পদার্থের স্থষ্টিকর্ত্তা, তেমনই অর্থশূন্য। জ্ঞানোদয়ে এই অর্থশূন্যতা বুঝিতে পারি। তখন আর আত্মায় কর্ত্তৃত্ব-নিয়ন্তৃত্ব প্রভৃতি আরোপের আবশ্যকতা থাকে না। জগৎকে সত্য ধরিয়াই আত্মাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্ বলিতেছিলাম। জগতের সত্য যখন ব্যাবহারিক সত্য হইল, তখন আত্মারও ঈশ্বরত্ব ব্যাবহারিকভাবে সত্য। লোকব্যবহারের জন্য, জীবনযাত্রার সুবিধার জন্য, আমি জগৎকে সত্য ও আত্মাকে জগতের কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলাম। জগৎকে যদি সত্য বল, আত্মাকেই উহার কর্ত্তা বলিতে হইবে। অন্য কর্ত্তা কাহাকেও খুঁজিয়া পাওয়া যা[illegible] কিন্তু যখন অধ্যাসের লোপ হয়, তখ[illegible]

কেই মিথ্যা বলিয়া জানি, তখন আত্মাতে আর জগতের কর্তৃত্ব আরোপের প্রয়োজন থাকে না। যাহা নাই, তাহার আর কর্ত্তা কি? কাজেই ব্যাবহারিক হিসাবে আত্মা ঈশ্বর ও সোপাধিক; পরমার্থত আত্মা কর্তৃত্ব-হীন, নির্গুণ ও নিরুপাধিক।'

অদ্বয়মতে আমি পরমার্থত উপাধিশূন্য, কিন্তু ব্যবহারত উপাধিযুক্ত। এক ভাবে দেখিলে আমার কোন গুণ নাই, কর্তৃত্ব পর্য্যন্ত নাই, অন্যভাবে দেখিলে আমিই জগৎ-কর্ত্তা। এই জগৎকর্তৃত্বরূপ উপাধি, যাহা আমি আমাতে আরোপ করিয়া মৎকল্পিত সৃষ্টিপ্রণালীর ব্যাখ্যা করি, ইহার পারিভাষিক নাম মায়া। বেদান্তের ভাষায়, আত্মা মায়োপাধিক হইলে ঈশ্বর হয়, অর্থাৎ আমি আমাতে মায়ানামক উপাধি আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি। ঐন্দ্রজালিককে মায়াবী বলে, সে ব্যক্তি যে ক্ষমতায় দৃষ্টিবিভ্রম উৎপাদন করিয়া শূন্যমধ্যে ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করে, কাটামুণ্ডে কথা কহায়, আমগাছে নারিকেল ফলায়, সেই ক্ষমতার নাম মায়া। বাহ্যজগৎ এইরূপ একটা প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল; কাজেই যে পুরুষ সেই ইন্দ্রজাল উৎপন্ন করে, সে মায়াবী, সে মায়ানামক-উপাধিযুক্ত। ঐন্দ্রজালিকের উৎপাদিত ঐ সকল অদ্ভুত দৃশ্যের বাস্তবিক অস্তিত্ব কিছুই নাই; ঐন্দ্রজালিকেরও বস্তুগত্যা আমগাছে নারিকেল ফলাইবার ক্ষমতা নাই। অজ্ঞলোকে ঐন্দ্রজালিকে যে অলৌকিক ক্ষমতা অর্পণ করে, ঐন্দ্রজালিকের সেরূপ ক্ষমতা কিছুই নাই। তবে যে সে ঐরূপ আশ্চর্য্য কৌশল দেখায়, তাহা দর্শকগণেরই অজ্ঞতার ফল। যে জানে, সে ঐন্দ্রজালিকের মায়ায় প্রতারিত হয় না; সে ঐ সকল কৌশলকে মিথ্যা দৃষ্টিভ্রম বলিয়াই জানে ও ঐন্দ্রজালিককেও অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন মানুষ বলিয়া মনে করে না। সেইরূপ আত্মা যে জগতের সৃষ্টি করে, সে জগৎও অলীক পদার্থ; যে ইহা জানে না, সে প্রতারিত হয়; তাহার নিকট আত্মা মায়াবী, অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন পদার্থ; আর যে জগৎকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া জানে, সে জানে, আত্মায় ঐরূপ ক্ষমতার আরোপ আবশ্যক নহে। আত্মা প্রকৃতপক্ষে নির্গুণ ও উপাধিশূন্য। যে ব্যক্তি এই কথাটুকু জানে না, সে বদ্ধ; আর যে জানিয়াছে, সে মুক্ত।

বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ কি, তাহা এখন বুঝা যাইবে। উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা বুঝা গেল। বিষয় একটা অধ্যাস; উহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, ব্যাবহারিক অস্তিত্ব আছে। বিষয়ীর ব্যাবহারিক ও পারমার্থিক, উভয়বিধ অস্তিত্বই আছে; তবে ব্যবহারত উহা মায়াবলে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, অতএব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্; কিন্তু পরমার্থত উহা উপাধিরহিত, নিষ্ক্রিয়, কর্তৃত্বহীন। এই উভয়ের সম্বন্ধ কিরূপ হইতে পারে? আমি আমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রাকৃতিক শক্তিনিচয়ের অধীন, সসীম, সঙ্কীর্ণ, সুখদুঃখভাগী, জরা-মরণশীল ক্ষুদ্র জীব বলিয়া মনে করি। কিন্তু তাহা অধ্যাসমাত্র। প্রকৃত সম্বন্ধ ঠিক ইহার বিপরীত। আমিই বরং জগতের স্রষ্টা নিয়ন্তা বিধাতা বলিলে ঠিক্ হয়। আমিই জগৎকে ঐরূপভাবে গড়িয়াছি ও ঐরূপভাবে চালাইতেছি, তাই জগৎ ঐরূপ দেখায় ও ঐরূপ চলে। এইরূপ বলিলে বরং ঠিক্ হয়।

কিন্তু তাহাও সম্পূর্ণ ঠিক্ নহে। পরমার্থত আমি ঐরূপ কিছুই করি না। আমি ঐরূপ করি বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র। আমি কিছুই করি না। ঐন্দ্রজালিক কাটামুণ্ডে কথা কহায় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু উহাও বোধমাত্র; ঐন্দ্রজালিক তাহা করে না। অতএব আমি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ জীব।

এ পর্য্যন্ত যে আত্মার কথা বলা গেল, যাহাকে বিষয়ী বা জীব এই নাম দেওয়া হইল, সে আমি; আর কেহই নহে। আমিই একমাত্র জীব, এবং এই জীবই ব্রহ্ম, এই আমিই ব্রহ্ম। এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, জীবাত্মাই যদি একমাত্র অদ্বিতীয় পদার্থ, জীবই যখন ব্রহ্ম, তখন আবার 'পরমাত্মা'-নামটা বেদান্তের ভাষায় ব্যবহৃত হয় কেন? আত্মা বা জীবাত্মা বা জীব শব্দ ব্যবহারেই যখন সকল কাজ চলে, তখন 'পরমাত্মা'নামক আর-একটা আত্মার কল্পনা করিয়া শেষে সেই পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদপ্রতিপাদনরূপ উৎকট পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? পরমাত্মার নাম আদৌ উঠে কেন? পরমাত্মা যদি জীবাত্মার সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, তবে পরমাত্মা এই পৃথক্ নামকরণের প্রয়োজন কি?

প্রয়োজন কি, তাহা শারীরকভাষ্যের আরম্ভেই একটি কথা আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়। ভাষ্যকার যাবতীয় পদার্থকে বিষয়ী ও বিষয়, এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন—বিষয়ী আমি, আর বিষয় আমা-ছাড়া আর সব। এই দুয়ের সম্বন্ধ আলো আর আঁধারের মত সম্পূর্ণ বিপরীত বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। যাহা বিষয়ী, তাহা বিষয় নহে; যাহা বিষয়, তাহা বিষয়ী নহে। যে দেখে, সেই বিষয়ী; যাহা দেখা যায়, তাহা বিষয়। কিন্তু তার পরেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, এই বিষয়ী অর্থাৎ আত্মা সম্পূর্ণ অবিষয় নহে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যক্ষ নহে—অর্থাৎ আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। এই কথাটা প্রণিধানযোগ্য। আমি যেমন তোমাকে জানি, রামকে জানি, শ্যামকে জানি, তেমনি আমি আমাকেও জানি। আমাকে আমি জানি না, এ কথা আমি বলিতে পারি না। আমি একদিকে জ্ঞাতা, অন্যদিকে আমারই জ্ঞেয়; আমিই আমার অহংবৃত্তির গোচর। যাহা জ্ঞানগম্য, যাহা জানা যায়, তাহাকেই যদি বিষয় বলা যায়, তাহা হইলে আমি একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। পাশ্চাত্যদর্শনেও Ego-নামক আমাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। এককে বলা হয় Empirical Ego—অর্থাৎ বিষয় আমি; অন্যকে বলা হয় Pure Ego বা Transcendental Ego—অর্থাৎ বিষয়ী আমি। বেদান্তশাস্ত্রে এই বিষয়-আমার বা জ্ঞানগম্য-আমার পারিভাষিক নাম জীবাত্মা; আর এই বিষয়ী আমার বা জ্ঞাতা আমার পারিভাষিক নাম পরমাত্মা।

এই উভয় আমার মধ্যে সম্বন্ধ কি? বলা বাহুল্য, ইনিও যে আমি, উনিও সেই আমি। আমিই আমাকে জানি, এই জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা আমি ও কর্ম্ম আমি, উভয়ই এক ও অভিন্ন আমি। ইহাতে মতদ্বৈধের সম্ভাবনা নাই। অথচ অন্যভাবে দেখিলে উভয়কে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়। কিরূপে, দেখা যাক্।

আত্মা একাধারে বিষয়ী ও বিষয়—ভাষ্যকারের এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা গেল। এই বিষয়ীর নাম পরমাত্মা ও বিষয়স্বরূপে প্রতীয়মান আত্মার নাম জীবাত্মা। আমিই আমাকে দেখি; যে আমি দেখে, সে পরমাত্মা; যে আমাকে দেখা যায়, সে জীবাত্মা। এই জ্ঞাতা আমি নির্ব্বিকার, নিষ্ক্রিয়; আর জ্ঞানের বিষয় আমি পরিবর্ত্তনশীল, বিকারশীল, জড়ের ঘাতপ্রতিঘাতে মুহ্যমান, জড়জগৎকর্ত্তৃক অভিভূয়মান, জরামরণশীল, কর্ম্মপর, সংসারে ভ্রমমাণ। এইরূপে দেখিলে উভয়ে ভিন্ন, আবার উভয়েই এক। পরমাত্মাও যে, জীবাত্মাও সে, বেদান্তের এই কথাটার উপরেই দ্বৈতবাদীর যত আক্রোশ। কিন্তু এই আক্রোশের কোন কারণই নাই। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে, দ্বৈতবাদী হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করেন। অদ্বয়বাদীর ঐ উক্তির সরল অর্থ যে, বিষয়ী আমি ও বিষয় আমি একই ব্যক্তি। যে দেখে ও যাহাকে দেখে, সে একই ব্যক্তি। উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নাই। আমিই আমাকে দেখি, এখানে দেখা-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম, উভয়েই এক অভিন্ন ব্যক্তি। ইহারই নাম অদ্বয়বাদ। আমি একজন ব্যতীত আর দুই জন নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম্।

ইংরেজিতে personal identity নামে একটা কথা আছে। উহার অর্থ কালিকার আমি ও আজিকার আমি একই ব্যক্তি। কিন্তু এই ঐক্য জ্ঞেয়-আমার ঐক্য; জ্ঞাতা আমার ঐক্য নহে। কাল আমি আমাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, আজ ঠিক্ সেইরূপ দেখিতেছি না, কিন্তু বস্তুগত্যা সেই আমি অবিকৃত আছি, ইহা বুঝানই ঐ উক্তির তাৎপর্য্য।

উভয়েই এক; কেন না, কালও যে আমি ছিলাম, আজও ঠিক্ সেই আমিই আছি। দেখিতে ভিন্ন বোধ হইলেও উভয়ের ঐক্যে কেহ সন্দেহ করেন না। বাল্যের আমি ও যৌবনের আমি ও আজিকার বৃদ্ধ আমি, একই আমি; সে বিষয়ে কাহারও সংশয় নাই। বোধ হইতেছে যেন আমার কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে, অথচ পূর্ব্বেও যে আমি ছিলাম, এখনও সেই আমি আছি।

জ্ঞেয়-আমার বিকারসত্ত্বেও এই ঐক্য অর্থাৎ personal identity কিরূপ ঐক্য, তাহা লইয়া পাশ্চাত্যপণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঐক্যকে ঐক্য বলা যাইতে পারে না। কাল যে গাছটি দেখিয়াছিলাম, আজও সেই গাছটি দেখিয়া আমি বলি, উহা সেই একই গাছ। কালিকার গাছে ও আজিকার গাছে এই ঐক্য প্রকৃত ঐক্য নহে। কাল উহাতে যে পাতা, যে ফুল ছিল না, আজ সে পাতা, সে ফুল জন্মিয়াছে। কাল উহাতে যটা ডাল ছিল, তাহা আজ নাই; ঝড়ে একটা ডাল ভাঙিয়াছে। কালিকার গাছ ও আজিকার গাছ সর্ব্বাংশে এক নহে, উহা অংশত এক। পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে ঐ পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ক্রমশ ঘটিয়াছে। একবারে অধিক পরিবর্ত্তন হইলে হয় ত বলিতাম, এ গাছ সে গাছ নহে, তাহার স্থলে আর-একটা গাছ কেহ বসাইয়া গিয়াছে। কিন্তু এই ক্রমিক পরিবর্ত্তন, এই আংশিক

পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেখিলে আমরা তাহা না বলিয়া বলি, সেই গাছই আছে। কিন্তু বস্তুত সেই গাছ নাই। কাজেই কালিকার গাছের ও আজিকার গাছের ঐক্য সম্পূর্ণ ঐক্য নহে। সেইরূপ কালিকার আমার ও আজিকার আমার ঐক্য পূরা ঐক্য—ষোল-আনা ঐক্য—নহে। কাল যে আমাকে জানিতাম সে আমি ও আজ যে আমাকে জানিতেছি সে আমি, কখনই সর্ব্বতোভাবে এক আমি নহে। কাল আমি সুখী ছিলাম, আজ আমি দুঃখী; কাল আমি ধনী ছিলাম, আজ গরিব; কাল মূর্খ ছিলাম, আজ পণ্ডিত। তবে কতক মিলও আছে। কালিকার আমায় যে যে গুণ ছিল, আজিকার আমায় তাহার অনেক আছে; তবে সব নাই। কাজেই জ্ঞেয়-আমার এই ঐক্য পূর্ণ ঐক্য নহে, উহা আংশিক ঐক্য। আমার এই পরিবর্ত্তন ধীরে ধীরে ঘটিয়াছে, ক্রমশ ঘটিয়াছে; সেই-জন্ম আমি বলি, সে আমি ও এ আমি এক আমি। কিন্তু এই একের অর্থ প্রায় এক; পূরা এক নহে। এ বিষয়ে যিনি আলোচনা চাহেন, তিনি হক্সলির লিখিত হিউমের জীবনবৃত্তান্তের ঐ অংশ পাঠ করিবেন।

আজ আমি যেমন আছি, কাল আমি কি ঠিক্ তেমনিটি ছিলাম? আমার স্মৃতি কি বলে? আমার স্পষ্ট মনে হইতেছে, কাল আমি দুঃখে অভিভূত ছিলাম; শোকে ম্রিয়মাণ ছিলাম; আজ আমার সে অবস্থা নাই। সে অবস্থার স্মৃতি আছে বটে; কিন্তু দুঃখের সে তীব্রতা নাই। আবার কাল আমার জ্ঞানের সীমা যতদূর বিস্তৃত ছিল, আজ তদপেক্ষা অধিক প্রসার লাভ করিয়াছে। ইতোমধ্যে আমি ম্যাক্‌বেথ পড়িয়া ফেলিয়াছি; ইতোমধ্যে জয়চন্দ্র ও শ্যামচাঁদের সহিত আমার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে; ইতোমধ্যে আমি দূরবীণ দিয়া আকাশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি; ইতোমধ্যে আমি রায়-বাহাদুর খেতাব পাইয়া উল্লসিত হইয়াছি। এইরূপ চারিদিক্ আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, কালিকার আমি আর আজিকার আমি ঠিক্ সমান নহি। কাল আমার সহিত জগতের ঘাতপ্রতিঘাত যেরূপ চলিয়াছিল, আজ ঠিক্ সেরূপ চলিতেছে না। কাল আমি আমাকে যে ভাবে, যে মূর্ত্তিতে জানিতাম, আজ আমি আমাকে ঠিক্ সে ভাবে, সে মূর্ত্তিতে জানিতেছি না। এইরূপ বাল্যকালের আমাতে ও যৌবনের আমাতে ও বার্দ্ধক্যের আমাতে, সুস্থ আমাতে ও রুগ্ন আমাতে, সুখী আমাতে ও দুঃখী আমাতে অনেক প্রভেদ। এই প্রভেদ আমার জ্ঞানগম্য। অতি শৈশবকালে যখন আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম, সেকালের স্মৃতিটুকু সেকালের-আমার যে অস্পষ্ট পরিচয় দিতেছে, সেই আমি ও আজিকার প্রৌঢ়, দৃপ্ত, কম্মপর আমি, কত ভিন্ন। তার আগে আরও শৈশবে আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা ত মনেই হয় না; স্মৃতি কোন কথাই বলে না; অথচ তখনও আমি ছিলাম। কেমন ছিলাম, ঠিক্ বলিতে পারি না; এমন ছিলাম না, তাহা নিশ্চয়। কাজেই যে আমি আমার বিষয়, সে আমি নিত্যপরিবর্ত্তনশীল; সে আমি কাল একরকম ছিলাম, আজ অন্যরকম আছি; সম্ভবত আগামী

কাল অন্যরূপ হইব। ক্ষণে ক্ষণে সেই আমার পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। কোন দুই ক্ষণে সে আমার মূর্ত্তি ঠিক্ একরকম থাকে না। বলা বাহুল্য, এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল আমি বিষয়-আমি। এই আমি আমার জ্ঞানগম্য; ইহাকে আমি দেখিতেছি, ভাবিতেছি, মনে করিতেছি। এই জ্ঞেয়-আমার বৈদান্তিক নাম-জীব। জীব নিত্যপরিবর্ত্তনশীল, এবং এই পরিবর্ত্তনের হেতু অন্বেষণ করিলে দেখা যাইবে, বাহ্য জড়জগতের সহিত ঘাত-প্রতিঘাতই তাহার এই বিকারের হেতু। বাহ্যজগতের অধীন বলিয়াই জীব কখনও সুখী, কখনও দুঃখী, কখনও মূর্খ, কখনও পণ্ডিত, কখনও দুর্ব্বল, কখনও সবল, কখনও শিশু, কখনও বৃদ্ধ। জীবের এই বিকারপরম্পরা সত্য বলিয়া এখন মানিয়া লওয়া গেল।

কিন্তু তার পরে প্রশ্ন, জ্ঞেয়-আমি সবিকার, কিন্তু জ্ঞাতা আমিও কি সবিকার? যে আমি আমার এই পরিবর্ত্তনের সাক্ষী, যে ইহা বসিয়া-বসিয়া দেখিতেছে, তাহারও কি বিকার আছে, পরিবর্ত্তন আছে? সেও কি জড়জগতের অধীন? এ বিষয়ে অহং-প্রত্যয় কি বলে?

অহংপ্রত্যয় বলে না। কে একজন ভিতরে বসিয়া বসিয়া জীবের এই পরিবর্ত্তন-পরম্পরা ঘটিতে দেখিতেছে, নিজের তাহার বিকার নাই। এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল বিষয়-আমার পশ্চাতে আর-এক আমি বসিয়া-বসিয়া স্থিরভাবে এই সকল পরিবর্ত্তন নিরীক্ষণ করিতেছে—সেই আমার স্পন্দন নাই, তাহার চক্ষে নিমেষ নাই, তাহার কোন বিকার নাই, পরিবর্ত্তন নাই। সে বসিয়া-বসিয়া এই বিষয়-আমার নিরন্তর পরিবর্ত্তন দেখিতেছে, নিষ্ক্রিয়, নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার ভাবে দেখিতেছে;—এই নিত্য পরিবর্ত্তনের সে চিরন্তন বিনিদ্র সাক্ষী, অথচ এই পরিবর্ত্তনব্যাপারে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, উদাসীন সাক্ষী আমি, বিষয়ী আমি; সে সর্ব্বদা বিষয়-আমাকে নির্নিমেষ চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়াছে। জড়-জগতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিষয়-আমি নাচিতেছি, কাঁদিতেছি, হাসিতেছি,—কখন চেতন ও জাগ্রত, কখন স্বপ্নাবস্থ, কখন বা সুষুপ্ত,—ক্রীড়াপর, কর্ম্মশীল,—দুঃখী, সুখী,—রাগী, দ্বেষী, ঈর্ষী, ঘৃণী,—এখন এমন, তখন তেমন,—কাল এইরূপ, আজ অন্যরূপ;—কিন্তু বিষয়ি-আমি নিশ্চল, নিস্পন্দ, সদা-জাগ্রত, সদা-প্রকাশমান থাকিয়া এই ক্রীড়ার, এই চাঞ্চল্যের, এই বিকারের নিত্যসাক্ষী। বেদান্তশাস্ত্রে এই বিষয়ি আমার নাম পরমাত্মা।

বিষয়-আমি ও বিষয়ি-আমি, উভয়ের স্বরূপ কি, তাহা যথাশক্তি বুঝাইলাম। বিষয়-আমি আজ যেমন আছে, কাল তেমন ছিল না; যৌবনে যেমন, বাল্যে তেমন নয়, শৈশবে আবার অন্যরূপ। জন্মের পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল কি না, কে বলিতে পারে? যদি থাকে, কিরূপ ছিল, তাহা আমি জানি না। শৈশবের অতি অস্পষ্ট স্মৃতি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু জন্মান্তর যদি থাকে, সেই পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি কিছুই নাই। তখন আমি কিরূপ ছিলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার জন্মের পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ

বৎসর, পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে আমি কেমন ছিলাম, আমি ছিলাম কি ছিলাম না, তাহা আমি বলিতে পারি না। অথচ সেই পাঁচ বৎসর, পঞ্চাশ বৎসর, পঞ্চশত বৎসর পূর্ব্বে বিষয়রূপী জড়জগৎ কিরূপ ছিল, তাহা আমি কতক বলিতে পারি। প্রত্যক্ষপ্রমাণে বলিতে পারি না, কিন্তু অনুমানবলে বা শাব্দপ্রমাণবলে বলিতে পারি। সে সময়ে আমার জন্মের পূর্ব্বে, জগতের মূর্ত্তি কিরূপ ছিল, কোথায় কি হইতেছিল, কোথায় কি ঘটিতেছিল, তাহা আমার জ্ঞানের বিষয়। তাহা আমি, বিষয়ী আমি—এখান হইতে অস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ঐ ক্লাইব পলাশী-বাগানে লড়াই করিতেছেন,—ঐ জয়চন্দ্র মুসলমানকে নিমন্ত্রণ করিতেছেন,—ঐ দিগ্বিজয়ী সেকন্দার সসৈন্যে সিন্ধুনদ পার হইতেছেন,—ঐ আর্য্যগণ হলস্কন্ধে গোধনসঙ্গে ভারতপ্রবেশ করিতেছেন,—ঐ ধরাপৃষ্ঠে মাষ্টোডন মেগাথীরিয়াম বিচরণ করিতেছে, মানুষ তখন নাই,—ঐ মহাসাগরে বৃহৎ কুম্ভীর, বৃহৎ মীন চরিয়া বেড়াইতেছে, স্তন্যপায়ী তখনও আবির্ভূত হয় নাই: ঐ উত্তপ্ত ধরাপৃষ্ঠ মুহুর্মুহু ভূকম্পে আন্দোলিত হইতেছে, তখন প্রাণীর আবির্ভাব হয় নাই ;—ঐ সৌরনীহারিকা সৌরজগতের পরিধি পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ঘূর্ণমান, কেহ তাহা দেখিবার নাই ;—কিন্তু আমি এখান হইতে বসিয়া-বসিয়া তাহা দেখিতেছি ;—আমি জড়জগতের এই কল্পব্যাপী পরিবর্ত্তনের সাক্ষী। বিষয়ী আমি এইখানে বসিয়া নির্ব্বিকারভাবে,—নির্নিমিষে, উদাসীনের ন্যায় বিষয়-আমার অতীত যৌবনের অতীত শৈশবের, 'রাত্রিদিন ধুকধুক তরঙ্গিত দুঃখসুখ' এর অবেক্ষণ করিতেছি ; আবার বিষয়-আমি যখন ছিলাম না, অথবা কেমন ছিল, কোথায় ছিল, তাহার ঠিকানা নাই, তখন বিষয় জড়জগৎ কোথায় ছিল, কেমন ছিল, কিরূপে ঘুরিতেছিল, ফিরিতেছিল, অভিব্যক্ত হইতেছিল, তাহাও এখানে বসিয়া-বসিয়া দেখিতেছি। সে কোন্ কালের কথা—সূর্য্যমণ্ডল তখন ছিল না—চন্দ্রমণ্ডল তখন ছিল না—আকাশে তখন নক্ষত্র দেখা দিত না অচেতন ঘূর্ণমান জড় নীহারিকা, তাহাও হয় ত তখন ছিল না—আসীদিদং তমোভূতম্—সেই জগতের আদিম অবস্থা—তার পর কতকাল অতীত হইয়া গেল, মাস গেল, অব্দ গেল, যুগ গেল, কল্প গেল, আমি এইখানে বসিয়া নির্ব্বিকার নিষ্ক্রিয় প্রশান্ত নিত্য মুক্ত শুদ্ধ বুদ্ধ স্বয়ংপ্রকাশ চেতনা-স্বরূপ আমি এইখান হইতে সমস্ত দেখিতেছি। সমগ্র অতীতের আমি সাক্ষী—আমি বিষয়ী—আমি আত্মা—আমি পরমাত্মা—আমি ব্রহ্ম। অহং ব্রহ্মাস্মি।

এখন বেদান্তের অভিপ্রায় অনেকটা স্পষ্ট হইয়া আসিল। জড়জগৎ ত বিষয়, উহা অধ্যাস উহা মায়া। কাহার মায়া? উত্তর আমার মায়া। আমার অস্তিত্ব আমি যত সহজে মানিব, জড়জগতের অস্তিত্ব তত সহজে মানিব না। কিন্তু সেই আমিই বা কিংস্বরূপ? বেদান্ত বলেন, আমারও দুই মূর্ত্তি—আমিও একাধারে বিষয়ী ও বিষয়। আমি আমাকেই দেখি। যে দেখে, সে বিষয়ী; যাহাকে দেখে, সে বিষয়। যে বিষয়ী, তাহার নাম দাও পরমাত্মা বা ব্রহ্ম ; যে বিষয়, তাহার

নাম দাও জীবাত্মা বা জীব। জীবাত্মা নিত্য-বিকারশীল; জড়জগতের অধীনতায় উহাতে কেবলই বিকার ঘটিতেছে। পরমাত্মা নির্ব্বিকার; সে জীবাত্মাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার এই বিকারপরম্পরা উদাসীনভাবে দেখিতেছে। অতএব দুই ভিন্ন বলিয়াই আপাততঃ বোধ হয়। অথচ দুই অভিন্ন। দুই আমিই এক আমি। আমি আমাকে দেখি, এ স্থলে যে কর্ত্তা, সেই কর্ম্ম। আমি আমাকেই দেখি—অন্য কাহাকেও দেখি না। আমি যখন সুখী হই, তখন আমি আমাকেই সুখী মনে করি, অন্যকে সুখী মনে করি না। ইহা অতি সহজ কথা। দ্রষ্টা আমি ও দৃশ্য আমি, জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, ব্রহ্ম ও জীব, উভয়ই এক, সর্ব্বতোভাবে এক। ইহাই জীবব্রহ্মের অভেদবাদ। ইহাই অদ্বয়বাদ। অদ্বয়বাদ আর কিছুই নহে। ইহাতে রাগ করিবার কিছুই নাই।

বর্ত্তমান পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মধ্যে উইলিয়ম জেম্‌সের নাম খ্যাতিলাভ করিতে চলিয়াছে। ইনি এই বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিব।* আশা করি, বেদান্তের অভিপ্রায়, যাহা বুঝাইবার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করা গেল, তাহা যদি এখনও অস্পষ্ট থাকে, ইহাতে আরও স্পষ্ট হইবে; তাঁহার Text-book of Psychologyর দ্বাদশ অধ্যায়ে এই আত্মতত্ত্বের বিচার আছে। তিনি গোড়াতেই আরম্ভ করিয়াছেন—"Whatever I may be thinking of, I am always at the same time more or less aware of *myself*, of my *personal existence*. At the same time it is *I* who am aware; so that the total self of me, being as it were duplex, partly known and partly knower, partly object and partly subject, must have two aspects discriminated in it, of which for shortness we may call one the *Me* and the other the *I*." (পৃঃ ১৭৬)। ইহার অর্থ, আমি যেমন অন্য বিষয় জানি, তেমনি আমাকেও জানি। এবং সে কে জানে? আমিই জানি। জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম আমার নাম দেওয়া হইল Me —বেদান্তের বিষয়-আমি অথবা জীব। আর কর্ত্তা আমার নাম হইল I—বিষয়ী আমি অথবা ব্রহ্ম। তৎপরে বলিতেছেন—"I call these 'discriminated aspects' and not separate things, because the identity of *I* with *me*, even in the very act of discrimination, is perhaps the most ineradicable dictum of common sense, and must not be undermined by our terminology here." (পৃঃ ১৭৬)। অর্থাৎ এই জ্ঞাতা আমি ও জ্ঞেয় আমি, একই আমি—ভিন্নভাবে দেখিলেও উহারা ভিন্ন নহে—ভিন্ন নাম দেওয়া হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন হইতে পারে না। ইহাই বেদান্তের অদ্বয়বাদ। বেদান্তও বলেন, যে জীব, সেই ব্রহ্ম। জ্ঞেয়-আমি জীব ও জ্ঞাতা আমি ব্রহ্ম; কিন্তু উভয়ই এক। দুই নাম বলিয়া দুই নহে।

ঐ জ্ঞেয়-আমার স্বরূপনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া জেম্‌স্ বলিয়াছেন যে, এই জ্ঞেয়-আমার ঐক্য

—personal identity—পূরা ঐক্য নহে। এই জ্ঞেয়-আমি বস্তুত বিকারশীল। "If in the sentence "I am the same that I was yesterday," we take the 'I' broadly, it is evident that in many ways I am *not* the same. As a concrete Me, I am somewhat different from what I was: then hungry, now full; then walking, now at rest; then poorer, now richer; then younger, now older; etc. So far, then, my personal identity is just like the sameness predicated of any other aggregate thing. It is a conclusion grounded either on the resemblance in essential aspects, or on the continuity of the phenomena compared. The past and present selves compared are the same just so far as they *are* the same, and no further." (পৃষ্ঠা ২০১—২০২)। অর্থাৎ কালিকার গাছ আর আজিকার গাছ, যেমন এক গাছ হইলেও পূরা এক গাছ নহে, সেইরূপ কাল যে আমাকে জানিতাম ও আজ যে আমাকে জানিতেছি, উহারা এক আমি হইলেও পূরাপুরি এক নহে।

কাজেই জ্ঞেয়-আমি বিকারশীল। কিন্তু জ্ঞাতা আমার স্বরূপ কি? লেখকের মতে —"The 'I' or 'Pure Ego,' is a very much more difficult subject of inquiry than the Me. It is that which at any given moment *is* conscious, whereas the Me is only one of the things which it is conscious *of*. In other words, it is the *Thinker*. Is it the passing state of consciousness itself, or is it something deeper and less mutable? The passing state we have seen to be the very embodiment of change. Yet each of us spontaneously considers that by 'I', he means something always the same. This has led most philosophers to postulate behind the passing state of consciousness a permanent substance or Agent whose modification or act it is. The Agent is the thinker. 'Soul' 'transcendental Ego' 'Spirit' are so many names for this more permanent sort of Thinker." (পৃঃ ১৯৫—১৯৬)। অর্থাৎ যে জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয়-আমার বিকারের ও চাঞ্চল্যের সাক্ষী, সে যেন নির্ব্বিকার। সেই Permanent Agent এর বৈদান্তিক নাম পরমাত্মা বা ব্রহ্ম। বৌদ্ধ অথবা হিউম এই সাক্ষীকে দেখিতে পান না। তাঁহাদের মতে ঐ passing state of consciousness—ক্ষণিক বিজ্ঞানই—সমস্ত।

এই জ্ঞাতা আমি নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু সে বিষয়ে জেমসের সিদ্ধান্ত কি? তিনি বৌদ্ধের দিকে, না বেদান্তের দিকে? তাঁহার প্রশ্ন—"Does

there not then appear an absolute identity [with regard to the thinker] at different times? That something which at every moment goes out and knowingly appropriates the Me of the past, and discards the non-me as foreign, is it not a permanent abiding principle of spiritual activity identical with itself wherever found?" (পৃঃ ২০২)। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বৌদ্ধের দিকে ঝোঁক দিয়া বলিয়াছেন—"The states of consciousness are all that psychology needs to do her work with. Metaphysics or Theology may prove the soul to exist; but for psychology the hypothesis of such a substantial principle of unity is superfluous" (পৃঃ ৩০৩)। অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের পক্ষে ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞান ব্যতীত কোন নির্ব্বিকার আত্মার বা পরমাত্মার অস্তিত্বস্বীকার আবশ্যক নহে। কেন না, "Successive thinkers numerically distinct, but all aware of the same past in the same way, form an adequate vehicle for all the experience of personal unity and sameness which we actually have." (পৃঃ ২০৩) অর্থাৎ পরস্পর অসম্বদ্ধ পূর্ব্বাপর ক্ষণিক-বিজ্ঞানের প্রবাহ বর্ত্তমান; প্রত্যেক ক্ষণিক-বিজ্ঞান তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণিক-বিজ্ঞানের নিকট হইতে তাহার অতীত প্রত্যভিজ্ঞার সমষ্টি ধার করিয়া লয়; ইহা মনে করিলেই আত্মাকে কেন এক ও নির্ব্বিকার বলিয়া বোধ হয়, তাহা বুঝা যাইবে। ইহা খাঁটি বৌদ্ধের কথা। বৈদান্তিক বলেন, তথাস্তু, ক্ষণিক বিজ্ঞান পর-পর উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববিজ্ঞানের সমস্ত জ্ঞানসমষ্টি উদরসাৎ বা আত্মসাৎ করিয়া লয়, স্বীকার করিলাম। কিন্তু এখানে থামা চলিবে না। কেন না, ঐ "পর-পর" কথাটায় গোল আছে। পর-পর বলিলেই একটা কালক্রমিক ধারাবাহিক বিজ্ঞানপ্রবাহ মনে আসে। কিন্তু এই ধারাবাহিকতা, এই পারম্পর্য্য, ব্যাপারখানা কি? আমি যেমন জড়জগৎকে আমার সম্মুখে প্রক্ষেপ করিয়া তাহাকে দেশে বিস্তীর্ণ মনে করি, কিন্তু সেই দেশ কেবল কল্পিত দেশ; দর্পণের পশ্চাতে কল্পিত দেশের সহিত বা স্বপ্নদৃষ্ট দেশের সহিত উহার পারমার্থিক ভেদ নাই; সেইরূপ এইক্ষণে বসিয়াই জ্ঞেয়-আমাকে পশ্চাতে প্রক্ষেপ করিয়া একটা অতীত কালের কল্পনা করি—মনে করি, কাল আমি এমনি ছিলাম, পরশু আমি ইহা করিয়াছি, চল্লিশবৎসর আগে আমি মাতৃক্রোড়ে বেড়াইতাম—তারও আগে আমি ছিলাম না, তবে আমার পিতাপিতামহ ছিলেন, ম্যামথ-ম্যাষ্টোডন ছিল—ইত্যাদি। এই কালও ত আমারই একটা কল্পনা। দেশও যেমন কল্পনা, কালও তেমনি কল্পনা। দেশ কাল উভয়ই আমার আমাকে দেখিবার দ্বিবিধ রীতি। দুইটা ভিন্ন রকমের উপায়। আমার বাহিরে যেমন দেশও নাই, তেমনি কালও নাই। আমার দেশব্যাপ্তি কেহই স্বীকার করিবেন না। আমার কালব্যাপ্তিই

বা কেন স্বীকার করিব? বস্তুত আমি দেশেও ব্যাপ্ত নহি, কালেও ব্যাপ্ত নহি।

বস্তুগত্যা আমি এখন এইক্ষণে বর্ত্তমান, এইটুকু স্বীকার করিতে আমি বাধ্য। পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণ বা পরবর্ত্তী ক্ষণ, অতীত বা ভবিষ্যৎ, স্বীকারে আমি বাধ্য নহি। আমি অতীতকাল কল্পনা করিয়া তাহার কিয়দংশমাত্র ব্যাপিয়া আমাকে বর্ত্তমান মনে করি; কিন্তু মনে করি মাত্র। আমি অনাগত কালের আশা করিয়া তাহার কিয়দংশ অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকিব, এইরূপ প্রতীক্ষায় রহিয়াছি—কিন্তু উহা আমার আশামাত্র ও প্রতীক্ষামাত্র। সমস্ত অতীত ও সমস্ত অনাগত আমার কল্পনা, আশা ও প্রতীক্ষা। পরমার্থত উহা অস্তিত্বহীন। জ্ঞেয়-আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব থাকিতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমার পক্ষে উহার অস্তিত্ব নাই।

কালই যেখানে কল্পনা—উহা জ্ঞাতা আমি কর্ত্তৃক জ্ঞেয়-আমিকে ছড়াইয়া দেখিবার একটা ফন্দিমাত্র—সেখানে কালের পরম্পরা—ইহা আগে, ইহা পরে—এই সকল উক্তি লোকব্যবহারমাত্র। উহা ব্যাবহারিক সত্য—পারমার্থিক সত্য নহে। বিষয়ী আমি—সাক্ষী আমি—জ্ঞাতা আমি—পরমাত্মা আমি—ব্রহ্ম আমি—কালোপাধিশূন্য; আমি কালের বাহিরে।

তাই যদি হইল, তবে আমি permanent—নিত্য কি না, এ প্রশ্ন উঠিতে পারে না। নিত্য বলিলেই কালব্যাপক বুঝায়। কিন্তু জ্ঞাতা আমি কালব্যাপক নহি, নিত্যও নহি। আমি এখন আছি, ইহা ঠিক। অতীত কালে সেই আমি ছিলাম কি না, ভবিষ্যতে আমি থাকিব কি না, এ প্রশ্নের অর্থ হয় না।

এইরূপ উত্তর যে হইতে পারে, সে বিষয়ে জেম্‌সের কতক সংশয় ছিল। তাই তিনি হাতে রাখিয়া বলিয়াছেন, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উত্তর এইরূপ; তবে Metaphysics কিংবা Theology অন্যরূপ উত্তর দিতে পারেন। বেদান্তী তাহাতে আপত্তি করিবেন না। মনোবিজ্ঞানশাস্ত্র ব্যাবহারিক শাস্ত্র; জেম্‌স্ স্পষ্টাক্ষরে উহাকে natural science এর অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। পরমার্থান্বেষী বেদান্তের মতে সাক্ষী পরমাত্মা এখনি বর্ত্তমান—অতীতে উহা বর্ত্তমান ছিল কি না, ভবিষ্যতে উহা থাকিবে কি না, সে প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেন না, অতীত ও ভবিষ্যৎ পরমাত্মাতে অবস্থিত। পরমাত্মা স্বয়ং কালোপাধিবর্জ্জিত; উহা অদ্বয়; উহা অখণ্ড। উহার একটুকরা কাল ছিল, একটুকরা আজ আছে, এমন মনে করা চলে না। অধ্যায়ের উপসংহারে তিনি বলেন—"This *Me* is an empirical aggregate of things objectively known. The *I* which knows them cannot itself be an aggregate." (পৃঃ ২১৪)। জ্ঞেয়-আমাকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে; কিন্তু জ্ঞাতা আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাবা চলে না। অপিচ, "For psychological purposes it (the I) need not be an unchanging metaphysical entity like the Soul, or a principle like the transcendental Ego, viewed as out of time." (পৃঃ ২১২)। বেদান্তী বলেন,

তথাস্তু, মনোবিজ্ঞানের পক্ষে উহাই যথেষ্ট ; কিন্তু পারমার্থিক শাস্ত্রের পক্ষে উহাকে unchanging entity বলিতে চাহি না—কেন না, unchanging বলিলে কালব্যাপ্তি আসে ; তবে উহাকে out of time বলিতে পারি।

এখন বুঝা যাইবে, বেদান্ত কেন একমুখে পরমাত্মাকে নিত্য নির্বিকার বলেন, পরে আবার যেন সহসা সাবধান হইয়া বলেন, না, না, ব্রহ্ম তাহাও নহেন। যাহার নিকট অতীত ভবিষ্যৎ অর্থশূন্য, তাহাকে নিত্য বলাও চলে না। ব্রহ্মের স্বরূপনির্দ্দেশে—অবশেষে, ইহা নয়, ইহা নয়, বলিয়াই নিরস্ত থাকিতে হয়।

আশা করি, এখন অদ্বয়বাদের তাৎপর্য্য বুঝা গেল। আমি আমাকে জানি। যে জানে, সে নিরুপাধিক ব্রহ্ম। যাহাকে জানে, সে সোপাধিক জীব ; সে ক্ষুদ্র, চঞ্চল, বিকারশীল, জরামরণের অধীন। অথচ উভয়ই এক। যে জানে ও যাহাকে জানে, সে একই ব্যক্তি। যে নিরুপাধিক, সেই আবার সোপাধিক, এই সমস্যাপূরণের উপায় কি ? ইহার উত্তরে বেদান্ত বলেন, ঐ উপাধি কল্পিত উপাধি। মায়াকল্পিত জগতের যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন সেই জগতের অধীনতা প্রকৃত অধীনতা নহে। ঐরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু উহা বোধমাত্র। আবার কাল যখন একটা কল্পিত উপাধি, তখন জীবের যে কালব্যাপ্তি, যে পরিবর্ত্তন, যে বিকার দেখা যায়, উহাও কল্পিত। কাজেই জীব বিকারশীল নহে, চঞ্চল নহে, ক্ষুদ্র নহে। বিকারশীল বোধ হয়, কিন্তু উহা বোধমাত্র। উহা ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তির নামান্তর অবিদ্যা। ঐ বুদ্ধি জ্ঞান নহে, উহা জ্ঞানাভাব। জ্ঞানাভাবেই আমরা জীবকে চঞ্চল মনে করি, ও উহাকে দেশ জুড়িয়া কল্পিত জগতের অধীন এবং কাল জুড়িয়া সংসারচক্রে ভ্রমণশীল ভাবি। জ্ঞানোদয়ে জানিতে পারি, উহা তেমন নহে। কেন না, আমিই আমাকে জানি ; এখানে জ্ঞাতা আমারও যেমন কোন উপাধি নাই, জ্ঞেয়-আমারও তেমনি কোন বাস্তবিক উপাধি থাকিতে পারে না। কেন না, উভয় আমিই এক আমি। ইহা যে জানে, সে মুক্ত। যে জানে না, সে বদ্ধ।

মোটা কথায় এই মুক্তির নামান্তর জ্ঞানোদয়। কোন্ জ্ঞানের উদয় ? জগতের স্বাধীন অস্তিত্ব আমাকে ছাড়িয়া নাই, এই জ্ঞানের উদয়। এই গোড়ার কথাটুকু মানা কঠিন। জড়বাদী ও দ্বৈতবাদী এইখানে আসিতে পিছলিয়া পড়েন। এইটুকু পর্য্যন্ত আসিলে আর বাকি সব আপনি আসে। জগৎ কল্পনা, কিন্তু সেই কল্পনায় ব্যবস্থা দেখি, শৃঙ্খলা দেখি। সেই সুব্যবস্থ সুশৃঙ্খলরূপে প্রতীয়মান জগতের কল্পনা করিতে চেতন সৃষ্টিকর্ত্তা—Personal God—আবশ্যক। এইজন্য বার্কলি জীব হইতে স্বতন্ত্র চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছেন। হিউম্ বলিয়াছেন, ঐ জাগতিক ব্যবস্থা কেন এমন, তাহা জিজ্ঞাসায় লাভ নাই। বৌদ্ধও সেই পথে গিয়াছেন। বেদান্ত বলেন, তজ্জন্য স্বতন্ত্র চেতন ঈশ্বরের কল্পনা আবশ্যক নহে। যে একমাত্র চেতন পদার্থকে আমরা জানি, তাঁহাকেই জগৎকর্ত্তৃত্ব দিতে

কোন বাধা নাই। সেই জগৎকর্ত্তৃত্বের নাম মায়া। আত্মাতে মায়া আরোপ করিলে উহার ঈশ্বরত্ব জন্মে; উহা সৃষ্টিক্ষম হয়। তবে জগৎ যেমন অধ্যাস, সেই মায়াও তেমনি অধ্যাস। আবার যদি তর্ক উঠে, এই ক্ষুদ্র জীব, যে জগতের অধীন, সে জগতের কর্ত্তা হইবে কিরূপে; তদুত্তরে বলা হয়, এই ক্ষুদ্রত্ব আত্মায় আরোপের প্রয়োজন কি? আমি আমাকে ক্ষুদ্র মনে করি বটে, জ্ঞাতা আমি জ্ঞেয়-আমাকে বিকারশীল মনে করি বটে, কিন্তু তাহা ভুল, তাহা অবিদ্যা। ক্ষুদ্রত্ব জগতের অধীনতার ফল; জগৎই যখন কল্পনা, তখন সেই ক্ষুদ্রত্বও কল্পনামাত্র, অবিদ্যামাত্র। যতক্ষণ সেই ভুল থাকে, অবিদ্যা থাকে, ততক্ষণই আমি বদ্ধ। যখন সেই ভুল যায়, তখনই আমি মুক্ত।

কাজেই এই মুক্তির উপায় জ্ঞান—এই জ্ঞানলাভেই মুক্তি ঘটিবে—মরণকালের জন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে না। জীবন থাকিতেই মুক্তি ঘটিবে—জীবন্মুক্তিই মুক্তি।

সচরাচর বলা হয়, মুক্তির পর আর সুখদুঃখ থাকে না, মুক্তির পর আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই সকল বাক্যও সরলভাবে গ্রহণ করা উচিত। মুক্তির পর অর্থাৎ জীবন্মুক্তির পর সুখদুঃখ কেন থাকিবে না? সুখদুঃখ থাকিবে বৈ কি। বেদান্ত বলেন, প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে। মুক্ত হইলেও যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, আগুনে হাত পুড়িবে, বাঘের সম্মুখে পড়িলে পলাইতে হইবে। বেদান্তের ভাষায় প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভুগিতেই হইবে; তবে সেই সকল আর আমাকে বাঁধিতে পারিবে না; ফলভোগী হইয়াও আমি নির্লিপ্ত থাকিব। সরল ভাষায় ইহার অর্থ এই যে, সুখদুঃখের বোধ ঘটিবে; তবে জ্ঞানোদয়ের পর সেই সুখকে ও সেই দুঃখকে কেবল মিথ্যা-সুখ ও মিথ্যা-দুঃখ বলিয়া, কেবল স্বপ্নভুক্ত সুখদুঃখের মত বলিয়া, জানিব। মুক্তির পূর্ব্বে উহাকে সত্য মনে করিতেছিলাম, এখন উহা ব্যাবহারিক সত্যমাত্র বলিয়া জানিব।

আর জন্মান্তরপরিগ্রহ? মুক্তপুরুষকে আর সংসারে ফিরিতে হয় না, এই বাক্যের মর্ম্ম কি? যে মুক্ত, তার পক্ষে দেহটাই অধ্যাস; তার পক্ষে দেহধর্ম্ম মরণঘটনাটাই অধ্যাস; তার পক্ষে মরণ একটা প্রত্যয়মাত্র। মরণই যেখানে নাই, সেখানে আর জন্মান্তরপরিগ্রহ কি? তাহার পক্ষে ইহলোকই বা কি, আর পরলোকই বা কি? স্বর্গ, নরক, পরকাল, এমন কি, সমস্ত ভবিষ্যৎ তাহার নিকট অবিদ্যমান। জড়জগৎই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত বোধ হয়। অবিদ্যাগ্রস্ত জীব আপনাকে কাল ব্যাপিয়া অবস্থিত দেখে, কিন্তু অবিদ্যামুক্ত জীব, যে বিষয়ী ব্রহ্মের সহিত সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন, সে স্বয়ং দেশকালনিরপেক্ষ। তাহার পক্ষে সম্মুখ-পশ্চাৎ নাই, তাহার পক্ষে অতীত ও ভবিষ্যৎ, উভয় শব্দই অর্থশূন্য।

মুক্তপুরুষ কর্ম্ম করিবেন কি না, ইহার উত্তরও এখন সহজ হইবে। প্রারব্ধকর্ম্ম ও সঞ্চিতকর্ম্মের ফলভোগে সে যেমন বাধ্য, তেমনই সে তাহার ব্যাবহারিক ইহজীবনে হেয়বর্জ্জন ও উপাদেয়গ্রহণ করিতেও বাধ্য।

যখন ক্ষুধা পাইলে আহার করিতে হইবে, তখন গার্হস্থ্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর কন্থা গায়ে জড়াইয়া ধর্ম্মকে ফাঁকি দিলে চলিবে না। 'কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ'—কর্ম্ম করিয়াই শতবৎসর জীবন ইচ্ছা করিবে —বদ্ধ ও মুক্ত, উভয়ের প্রতি বেদান্তের এই আদেশ। মুক্তের কামনা নাই, কেন না, তাঁহার নিকট পরকাল অর্থশূন্য। কাজেই মুক্তের কর্ম্ম নিষ্কাম কর্ম্ম; উহা তাঁহাকে বাঁধিতে পারে না।

মুক্তির অর্থ বুঝা গেল ও মুক্তির উপায়ও বুঝা গেল। মুক্তির উপায় জ্ঞান—মুক্তির উপায়ান্তর নাই। অন্য অর্থে প্রযুক্ত অন্যরূপ মুক্তির অন্য পন্থা থাকিতে পারে; কিন্তু বেদান্তে যে মুক্তির কথা বলে, সেই মুক্তির জন্য কেবল জ্ঞানের পন্থা; ইহার জন্য কর্ম্ম আবশ্যক নহে, ইহার জন্য ভক্তি আবশ্যক নহে। তাহা বলিলে কর্ম্মের বা ভক্তির নিন্দা করা হয় না। কর্ম্মের পন্থার বা ভক্তির পন্থার অন্য স্থলে অন্য উদ্দেশ্যে সার্থকতা আছে; সেখানে জ্ঞানের পন্থা কিছুই নহে। মুক্তির জন্য কিন্তু জ্ঞানের পন্থা। সেই জ্ঞান কোন mystic জ্ঞান নহে; উহার কোন esoteric অর্থ নাই। উহা নির্ম্মল শুভ্র বিশুদ্ধ জ্ঞান—সেই জ্ঞানলাভের জন্য নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ঐহিক ও পারত্রিক ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ ও শমদমাদিসাধনা আবশ্যক; শ্রবণমননাদি সেই জ্ঞানলাভে সাহায্য করে; শ্রুতিবাক্য ও গুরুবাক্য তাহাতে সাহায্য করে। ইহার অর্থ অতি সরল অর্থ—ইহার ভিতর কোন বুজরুকি নাই।

বেদান্তের স্থূল কথাগুলি এখন একবার সংক্ষেপে আবৃত্তি করা যাক।

(১) একমাত্র চেতনপদার্থ বর্ত্তমান—উহা আমি—উহার অস্তিত্ব জ্ঞানগম্য ও স্বতঃসিদ্ধ। উহা দেশকালনিরপেক্ষ নির্গুণ নিরুপাধিক পদার্থ। কাজেই উহার স্বরূপ ভাষাদ্বারা অপ্রকাশ্য। ইহা নহে, ইহা নহে, এইরূপ অভাববাচী বিশেষণে উহা বুঝাইতে হয়।

(২) এই আমি আমার বাহিরে একটা প্রকাণ্ড দেশের কল্পনা করিয়া সেই দেশে কল্পিত জড়জগৎকে প্রক্ষেপ করি; কল্পিত-দেশমধ্যে তাহাকে ব্যবস্থা করিয়া সাজাই। এখানে সূর্য্য রাখি, ওখানে চন্দ্র রাখি, এখানে পৃথিবী রাখি ইত্যাদি; ও সেই সূর্য্যচন্দ্রপৃথিবীকে বাঁধা নিয়মে ঘুরাই।

পুনশ্চ, আমার বাহিরে এক প্রকাণ্ড কালের কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত কালে আমার সৃষ্ট জগৎকে প্রক্ষেপ করি। তাহার কিয়দংশকে বলি অতীত, কতকটাকে বলি বর্ত্তমান, ও বাকিটাকে বলি ভবিষ্যৎ।

পুনশ্চ, এই দেশ ব্যাপিয়া ও কাল ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত জগৎকে একটা উদ্দেশ্যের অভিমুখে পরিচালনা করি।

(৩) এই দেশকালে সজ্জিত ব্যবস্থানুযায়ী ও উদ্দেশ্যানুসারী জগতের সৃষ্টির জন্য আত্মাতে যে ক্ষমতা আরোপ করা হয়, উহার নাম দেওয়া হয় মায়া। কিন্তু জগৎ যেখানে কল্পিত, সেই সৃষ্টিক্ষমতাও সেখানে আরোপমাত্র বা অধ্যাসমাত্র। উক্ত-মায়া-আরোপে নিরুপাধিক আত্মা সোপাধিক বলিয়া প্রতীত হয় বটে, কিন্তু সে-ও প্রত্যয়-

মাত্র। এই সোপাধিকরূপে প্রতীত অর্থাৎ মায়াযুক্ত আত্মার নাম দেওয়া হয় ঈশ্বর—কেননা, ইনিই কল্পিত জগতের কল্পনাকারক, সৃষ্ট জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। জগতের কল্পিত প্রকাণ্ডত্ব ও বৃহত্ত্ব দেখিয়া তাহার সৃষ্টিকর্ত্তাতেও, অর্থাৎ ঈশ্বরেও, সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি আরোপ করা হয়।

(৪) আর একটি অদ্ভুত কথা এই যে, আমি যেমন আমা হইতে পৃথক্ জড়জগতের কল্পনা করিয়া আপনাকে উহার স্রষ্টা ও নিয়ন্তা বা ঈশ্বর মনে করিতে বাধ্য হই, সেইরূপ আমিই আবার আমাকে আমা হইতে পৃথক্‌রূপে দেখিতে পাই। উক্ত কল্পিত জড়জগৎ যেমন আমার জ্ঞানগম্য বিষয়, এই আমিও তেমনই আমার জ্ঞানগম্য বিষয়। অধিকন্তু, এই বিষয়-আমাকে আমি আমা হইতে পৃথক্ দেখিয়া তাহার সহিত মৎকল্পিত জড়জগতের একটা সম্বন্ধ আরোপ করি। আমাকে সর্ব্বাংশে সেই জগৎ হইতে ক্ষুদ্র, সেই জগতের বশতাপন্ন, সেই জগতের সহিত সম্বন্ধ বজায় রাখিবার জন্য হেয়বর্জ্জনে ও উপাদেয়গ্রহণে সর্ব্বদা ব্যাকুল ও তদর্থ ক্রিয়াশীল, জড়জগতের আঘাতসহ ও সেই আঘাতে পরিবর্ত্তনশীল, সুখদুঃখভোগী, জরামরণশীল বলিয়া মনে করি। কিন্তু ইহা মনে করা ভুল। এই ভ্রান্তির নাম দেওয়া হয় অবিদ্যা;—বস্তুত জড়জগৎই মিথ্যা ও জড়জগতের সহিত আমার এই কল্পিত সম্বন্ধও মিথ্যা। আমি বিকারশীল বলিয়া আমার নিকট প্রতীয়মান হইলেও এই জ্ঞানগম্য-আমি জ্ঞাতা আমি হইতে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন। বিষয়-আমাকে যে বিষয়ি-আমি হইতে পৃথক্ বোধ করি ও বিষয়-আমাকে কল্পিত জগতের অধীন মনে করি, তাহা ভুল, তাহা অবিদ্যা।

(৫) কাজেই যিনি আত্মা, অর্থাৎ যে অনির্ব্বাচ্য চৈতন্যস্বরূপ পদার্থকে 'আমি'নাম দেওয়া হয়, তিনিই একদিকে ঈশ্বর, অন্যদিকে জীব। মায়ার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগৎকর্ত্তা, জগতের প্রভু ঈশ্বর; আর অবিদ্যার উপাধি আমাতে আরোপ করিয়া আমি জগতের অধীন, জগতের দাস জীব। কিন্তু স্বরূপত যে ঈশ্বর, সেই জীব।

(৬) এই তত্ত্ব জানিলেই মুক্তি ঘটে; অর্থাৎ জগৎকে কল্পনামাত্র বলিয়া বুঝা যায় ও জীবকে তাহার অনধীন বলিয়া বুঝা যায়। তখন সুখদুঃখ, ইহ-পরকাল, জন্মমরণ, সংসার, সমস্তই প্রত্যয়মাত্র বলিয়া জানা যায়। তখনই পূর্ণ জাগরণ হয়; তাহার পূর্ব্বে স্বপ্ন। কাজেই যে মুক্ত, সে বুদ্ধ।

(৭) আমি কেন আপনাতে এই মায়ার আরোপ করিয়া জগতের সৃষ্টি করি, আর কেনই বা আপনাতে এই অবিদ্যার আরোপ করিয়া সেই জগতের দাসত্ব করি, তাহার উত্তর বোধ করি নাই। এখানে সকলেই নিরুত্তর। বেদান্ত বলেন, উহাই আমার স্বভাব; বৈষ্ণব বলেন, উহা আমার লীলা বা খেয়াল; বৌদ্ধ ও অজ্ঞানবাদী বলেন, উহা জিজ্ঞাসা করিও না। পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ইহার উত্তরে ঋষিমুখে বলাইয়াছেন—

ইয়ং বিসৃষ্টির্যত আবভূব
যদি বা দধে যদি বা ন।

যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
সো অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥

এই সৃষ্টি যাঁহা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে, তিনিই ইহা করিয়াছেন বা তিনি ইহা করেন নাই ; যিনি পরমব্যোমে অবস্থান করিয়া ইহার অধ্যক্ষ, তিনিই তাহা জানেন, অথবা তিনিও তাহা জানেন না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

দিন ও রাত্রি।*

সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। অন্ধকার অবগুণ্ঠনের অন্তরালে সন্ধ্যার সীমন্তের শেষ স্বর্ণলেখাটুকু অন্তর্হিত হইয়াছে। রাত্রিকাল আসন্ন।

এই রাত্রিই মিলনের প্রকৃত সময়—উৎসবের আনন্দ এখনই ঘনীভূত হইতে থাকে।

এই আনন্দরজনীর আরম্ভকালে আমাদের উৎসবদেবতাকে প্রণাম করিয়া মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি এই যে, দিন এবং রাত্রি প্রত্যহই আমাদের জীবনকে একবার আলোকে একবার অন্ধকারে তালে তালে আঘাত করিয়া যাইতেছে—ইহারা আমাদের চিত্তবীণায় কি রাগিণী ধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে? এইরূপে প্রতিদিন আমাদের মধ্যে যে এক অপরূপ ছন্দ রচিত হইতেছে, তাহার মধ্যে কি কোন বৃহৎ অর্থ নাই? আমরা এই যে অনন্ত গগনতলের নাড়িস্পন্দনের ন্যায় দিনরাত্রির নিয়মিত উত্থানপতনের অভিঘাতের মধ্যে বাড়িয়া উঠিতেছি, আমাদের জীবনের মধ্যে এই আলোক-অন্ধকারের নিত্য গতিবিধির একটা তাৎপর্য্য কি গ্রথিত হইয়া যাইতেছে না? তটভূমির উপরে প্রতি বর্ষায় যে একটা জলপ্লাবন বহিয়া যাইতেছে এবং তাহার পরে শরৎকালে সে আবার জল হইতে জাগিয়া-উঠিয়া শস্যবপনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এই বর্ষা ও শরতের গতায়াত তটভূমির স্তরে স্তরে কি নিজের ইতিহাস রাখিয়া যায় না?

দিনের পর এই যে রাত্রির অবতরণ, রাত্রির পর এই যে দিনের অভ্যুদয়, ইহার পরম বিস্ময়করতা হইতে আমরা চিরাভ্যাসবশত যেন বঞ্চিত না হই! সূর্য্য একসময়ে হঠাৎ আকাশতলে তাহার আলোকের পুঁথি বন্ধ করিয়া-দিয়া চলিয়া যায়—রাত্রি নিঃশব্দকরে আর-একটি নূতন গ্রন্থের নূতন অধ্যায় বিশ্বলোকের সহস্র অনিমেষ-নেত্রের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়, ইহা আমাদের পক্ষে সামান্য ব্যাপার নহে।

এই অল্পকালের পরিবর্ত্তন কি বিপুল, কি আশ্চর্য্য! কি অনায়াসে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই

* গত ৭ই পৌষ বোলপুর শান্তিনিকেতনের সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

বিশ্বসংসার ভাব হইতে ভাবান্তরে পদার্পণ করে! অথচ মাঝখানে কোন বিপ্লব নাই, বিচ্ছেদের কোনো তীব্র আঘাত নাই, একের অবসান ও অন্তের আরম্ভের মধ্যে কি স্নিগ্ধ শান্তি, কি সৌম্য সৌন্দর্য্য!

দিনের আলোকে, সকল পদার্থের পরস্পরের যে প্রভেদ, যে পার্থক্য, তাহাই বড় হইয়া, স্পষ্ট হইয়া, আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়া উঠে। আলোক আমাদের পরস্পরের মধ্যে একটা ব্যবধানের কাজ করে—আমাদের প্রত্যেকের সীমা পরিস্ফুটরূপে নির্ণয় করিয়া দেয়। দিনের বেলায় আমরা যে-যার আপন-আপন কাজের দ্বারা স্বতন্ত্র, সেই কাজের চেষ্টায় সংঘাতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধও বাধিয়া যায়। দিনে আমরা সকলেই নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজেকে জয়ী করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত। তখন আমাদের আপন-আপন কর্ম্মশালাই আমাদের কাছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আর-সমস্ত বৃহৎ ব্যাপারের চেয়ে বৃহত্তম—এবং নিজ নিজ কর্ম্মোদ্যোগের আকর্ষণই জগতের আর-সমস্ত মহৎ আকর্ষণের চেয়ে আমাদের কাছে মহত্তম হইয়া উঠে।

এমন-সময় নীলাম্বরা রাত্রি নিঃশব্দপদে আসিয়া নিখিলের উপরে স্নিগ্ধ করস্পর্শ করিবামাত্র আমাদের পরস্পরের বাহ্যপ্রভেদ অস্পষ্ট হইয়া আসে—তখন আমাদের পরস্পরের মধ্যে গভীরতম যে ঐক্য, তাহাই অন্তরের মধ্যে অনুভব করিবার অবকাশ ঘটে। এইজন্য রাত্রি প্রেমের সময়, মিলনের কাল।

ইহাই ঠিক করিয়া বুঝিতে পারিলে জানিব—দিন আমাদিগকে যাহা দেয়, রাত্রি শুদ্ধমাত্র যে তাহা অপহরণ করে, তাহা নহে, অন্ধকার যে কেবলমাত্র অভাব ও শূন্যতা আনয়ন করে, তাহা নহে—তাহারও দিবার জিনিষ আছে এবং যাহা দেয়, তাহা মহামূল্য। সে যে কেবল সুপ্তির দ্বারা আমাদের ক্ষতিপূরণ করে,—আমাদের ক্লান্তি অপনোদন করিয়া দেয় মাত্র, তাহা নহে। সে আমাদের প্রেমের নিভৃত নির্ভরস্থান; সে আমাদের মিলনের মহাদেশ।

শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি। শক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল, প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। আমাদের চিত্ত যাহাদিগকে ভালবাসে, সংসারে কেবল তাহাদেরই মধ্যে সে বিরামলাভ করে, আমাদের চিত্ত যখন বিশ্রামের অবকাশ পায়, তখনই সে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসিতে পারে। জগতে আমাদের যথার্থ যে বিরাম, তাহা প্রেম;—প্রেমহীন যে বিরাম, তাহা জড়ত্বমাত্র।

এই কারণে কর্ম্মশালা প্রকৃত মিলনের স্থান নহে, স্বার্থে আমরা একত্র হইতে পারি, কিন্তু এক হইতে পারি না। প্রভুভৃত্যের মিলন সম্পূর্ণ মিলন নহে, বন্ধুদের মিলনই সম্পূর্ণ। বন্ধুত্বের মিলন বিশ্রামের মধ্যে বিকশিত হয়—তাহাতে কর্ম্মের তাড়না নাই, তাহাতে প্রয়োজনের বাধ্যতা নাই। তাহা অহেতুক।

এইজন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্ম্মের বেগ যখন

শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম, সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্ম্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ, সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে, তখন আমাদের স্নেহপ্রেম সহজ হয়— আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।

তাই বলিতেছিলাম, রাত্রি যে কেবল হরণ করে, তাহা নহে, সে দানও করে। আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই; এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্ত্তৃত্ব-অভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে-পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্ঘাটিত হইয়া যায়।

আমরা একই সময়ে সীমাকে এবং অসীমকে; অহংকে এবং অখিলকে, বিচিত্রকে এবং এককে সম্পূর্ণভাবে পাইতে পারি না বলিয়াই একবার দিন আসিয়া আমাদের চক্ষু খুলিয়া দেয়, একবার রাত্রি আসিয়া আমাদের হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটিত করে। একবার আলোক আসিয়া আমাদিগকে কেন্দ্রের মধ্যে নিবিষ্ট করে, একবার অন্ধকার আসিয়া আমাদিগকে পরিধির সহিত পরিচিত করিতে থাকে।

এইজন্ত রাত্রিই উৎসবের বিশেষ সময়। এখন বিশ্বভুবন অন্ধকারের মাতৃকক্ষে আসিয়া সমবেত হইয়াছে। যে অন্ধকার হইতে জগৎচরাচর ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, যে অন্ধকার হইতে আলোকনির্ঝরিণী নিরন্তর উৎসারিত হইতেছে, যেখানে বিশ্বের সমস্ত উদ্যোগ নিঃশব্দে শক্তিসঞ্চয় করিতেছে, সমস্ত ক্লান্তি সুপ্তিসুধার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নবজীবনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে, যে নিস্তব্ধ মহান্ধকারগর্ভ হইতে একএকটি উজ্জ্বল দিবস নীলসমুদ্র হইতে একএকটি ফেনিল তরঙ্গের ন্যায় একবার আকাশে উত্থিত হইয়া আবার সেই সমুদ্রের মধ্যে শয়ান হইতেছে, সেই অন্ধকার আমাদের নিকট যাহা গোপন করিতেছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক প্রকাশ করিতেছে। সে না থাকিলে লোকলোকান্তরের বার্ত্তা আমরা পাইতাম না, আলোক আমাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিত।

এই রজনীর অন্ধকার প্রত্যহ একবার করিয়া দিবালোকের স্বর্ণসিংহদ্বার মুক্ত করিয়া আমাদিগকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তঃপুরের মধ্যে আনিয়া উপস্থিত করে, বিশ্বজননীর এক অখণ্ড নীলাঞ্চল আমাদের সকলের উপরে টানিয়া দেয়। সন্তান যখন মাতার আলিঙ্গনপাশের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচ্ছন্ন হইয়া কিছুই দেখেনা-শোনেনা, তখনই নিবিড়তরভাবে মাতাকে অনুভব করে—সেই অনুভূতি দেখা-শোনার চেয়ে অনেক বেশি ঐকান্তিক—শুদ্ধ অন্ধকার তেমনি যখন আমাদের দেখা-শোনাকে শান্ত করিয়া দেয়, তখনই আমরা এক শয্যাতলে নিখিলকে ও নিখিলমাতাকে আমাদের বক্ষের কাছে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিকটবর্ত্তী করিয়া

অনুভব করি। তখন নিজের অভাব, নিজের শক্তি, নিজের কাজ বাড়িয়া-উঠিয়া আমাদের চারিদিকে প্রাচীর তুলিয়া দেয় না, অত্যুগ্র ভেদবোধ আমাদের প্রত্যেককে খণ্ড-খণ্ড পৃথক্-পৃথক্ করিয়া রাখে না, মহৎ নিঃশব্দতার মধ্য দিয়া নিখিলের নিশ্বাস আমাদের গায়ের উপরে আসিয়া পড়ে, এবং নিত্য-জাগ্রত নিখিলজননীর অনিমেষদৃষ্টি আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যক্ষগম্য হইয়া উঠে।

আমাদের রজনীর উৎসব সেই নিভৃত-নিগূঢ় অথচ বিশ্বব্যাপী জননীকক্ষের উৎসব। এখন আমরা কাজের কথা ভুলি, সংগ্রামের কথা ভুলি, আত্মশক্তি-অভিমানের চর্চ্চা ভুলি, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রসন্ন মুখচ্ছবির ভিখারী হইয়া দাঁড়াই—বলি, জননি, যখন প্রয়োজন ছিল, তখন তোমার কাছে ক্ষুধার অন্ন, কর্ম্মের শক্তি, পথের পাথেয় প্রার্থনা করিয়াছিলাম—কিন্তু এখন সমস্ত প্রয়োজনকে বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া তোমার এই কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, এখন একান্ত তোমাকেই প্রার্থনা করি। আমি তোমার কাছে এখন আর হাত পাতিব না—কেবলমাত্র তুমি আমাকে স্পর্শ কর, মার্জ্জনা কর, গ্রহণ কর! তোমার রজনী-মহাসমুদ্রে অবগাহন-স্নান করিয়া বিশ্বজগৎ যখন কাল উজ্জ্বলবেশে নির্ম্মল-ললাটে প্রভাত-আলোকে দণ্ডায়মান হইবে, তখন যেন আমি তাহার সঙ্গে সমান হইয়া দাঁড়াইতে পারি—তখন যেন আমার গ্লানি না থাকে, আমার ক্লান্তি দূর হয়—তখন যেন আমি অন্তরের সহিত বলিতে পারি—সকলের কল্যাণ হউক্ কল্যাণ হউক্, যেন বলিতে পারি—সকলের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁহাকে আমি দেখিতেছি,—তাঁহার যাহা প্রসাদ, তিনি অদ্য সমস্তদিন আমাকে যাহা দিবেন, তাহাই আমি ভোগ করিব, আমি কিছুতেই লোভ করিব না।

প্রাতঃকালে যিনি আমাদের পিতা হইয়া আমাদিগকে কর্ম্মশালায় প্রেরণ করিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনিই আমাদের মাতা হইয়া আমাদিগকে তাঁহার অন্তঃপুরে আকর্ষণ করিয়া লইতেছেন! প্রাতঃকালে তিনি আমাদিগকে ভার দিয়াছিলেন, সন্ধ্যাকালে তিনি আমাদের ভার লইতেছেন। প্রত্যহই দিনে-রাত্রে এই যে দুই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে আমাদের জীবন আন্দোলিত হইতেছে—একবার পিতা আমাদিগকে বহির্দ্দেশে পাঠাইতেছেন, একবার মাতা আমাদিগকে অন্তঃপুরে টানিতেছেন, একবার নিজের দিকে ধাবিত হইতেছি, একবার অখিলের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, ইহার মধ্যে আমাদের জীবন ও মৃত্যুর গভীর রহস্যচ্ছবি আলোক-অন্ধকারের তুলিকাপাতে প্রতিদিন চিত্রিত হইতেছে।

আমাদের কাব্যে-গানে আয়ুঃঅবসানের সহিত আমরা দিনান্তের উপমা দিয়া থাকি—কিন্তু সকল সময়ে তাহার সম্পূর্ণ ভাবটি আমরা হৃদয়ঙ্গম করি না, আমরা কেবল অবসানেরই দিক্‌টা দেখিয়া বিষাদের নিশ্বাস ফেলি—পরিপূরণের দিক্‌টা দেখি না। আমরা ইহা ভাবিয়া দেখি না, প্রত্যহ দিবাবসানে এত-বড় যে একটা বিপরীত ব্যাপার ঘটিতেছে, আমাদের শক্তির যে এমন-একটা বিপর্য্যয়দশা উপস্থিত হইতেছে,

তাহাতে ত কিছুই বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে না, জগৎ জুড়িয়া ত হাহাকারধ্বনি উঠিতেছে না, মহাকাশতলে বিশ্বের আরামেরই নিশ্বাস পড়িতেছে।

দিবস আমাদের জীবনেরই প্রতিকৃতি বটে। দিনের আলোক যেমন আর-সমস্ত লোককে আবৃত করিয়া আমাদের কর্ম্মস্থান এই পৃথিবীকেই একমাত্র জাজ্বল্যমান করিয়া তুলে—আমাদের জীবনও আমাদের চতুর্দ্দিকে তেমনি একটি বেষ্টন রচনা করে. —সেইজন্যই আমাদের জীবনের অন্তর্গত যাহা-কিছু, তাহাই আমাদের কাছে এত একান্ত, ইহার চেয়ে বড় যে আর-কিছু আছে, তাহা সহসা আমাদের মনেই হয় না। দিনের বেলাতেও ত আকাশ ভরিয়া জ্যোতিষ্কলোক বিরাজ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে পাই কই? যে আলোক আমাদের কর্ম্মস্থানের ভিতরে জ্বলিতেছে, সেই আলোকই বাহিরের অন্য-সমস্তকে দ্বিগুণতর অন্ধকারময় করিয়া রাখে। তেমনি আমাদের এই জীবনকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া শতসহস্র জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্ররহস্য নানা আকারে বিরাজ করিতেছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই কই? যে চেতনা, যে বুদ্ধি, যে ইন্দ্রিয়শক্তি আমাদের জীবনের পথকে উজ্জ্বল করে, আমাদের কর্ম্মসাধনেরই পরিধিসীমার মধ্যে আমাদের মনোযোগকে প্রবল করিয়া তোলে, সেই জ্যোতিই আমাদের জীবনের বহিঃসীমার সমস্তই আমাদের নিকটে অগোচর রাখিয়া দেয়।

জীবনে যখন আমরাই কর্ত্তা, যখন সংসারই সর্ব্বপ্রধান, যখন আমাদের সুখদুঃখচক্রের পরিধি আমাদের আয়ুকালের মধ্যেই বিশেষভাবে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, এমন-সময় দিন অবসান হইয়া যায়, জীবনের সূর্য্য অস্তাচলের অন্তরালে গিয়া পড়ে, মৃত্যু আমাদিগকে অঞ্চলে আচ্ছন্ন করিয়া কোলে তুলিয়া লয়। তখন সেই-যে অন্ধকারের আবরণ, সে কি কেবলি অভাব, কেবলি শূন্যতা? আমাদের কাছে কি তাহার একটি সুগভীর ও সুবিপুল প্রকাশ নাই? আমাদের জীবনাকাশের অন্তরালে যে অসীমতা নিত্যকাল বিরাজ করিতেছে, মৃত্যুর তিমিরপটে তাহা কি দেখিতে দেখিতে আমাদের চতুর্দ্দিকে আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে না? তখন কি সহসা আমাদের এই সীমাবচ্ছিন্ন জীবনকে অসংখ্য জীবনলোকের সহিত যুক্ত করিয়া দেখিতে পাই না? দিবসের বিচ্ছিন্ন পৃথিবীকে সন্ধ্যাকাশে যখন সমস্ত গ্রহদলের সঙ্গে নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে সংযুক্ত করিয়া জানিতে পারি, তখন সমস্তটির যেমন একটি বৃহৎ ছন্দ, একটি প্রকাণ্ড তাৎপর্য্য আমাদের চিত্তের মধ্যে প্রসারিত হইয়া উঠে, তেমনি মৃত্যুর পরে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত আমাদের জীবনের বিপুল তাৎপর্য্য কি আমাদের কাছে অতি সহজেই প্রকাশিত হয় না? জীবিতকালে যাহাকে আমরা একক করিয়া,—পৃথক্ করিয়া দেখি, মৃত্যুর পরে তাহাকেই আমরা বিরাটের মধ্যে সম্পূর্ণ করিয়া দেখিবার অবকাশ পাই। আমাদের জীবনের চেষ্টা, আমাদের জীবিকার সংগ্রাম যখন ক্ষান্ত হইয়া যায়, তখন সেই গভীর নিস্তব্ধতায় আমরা আপনাকে অসীমেরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই, নিজের ব্যক্তি-

গত সীমার মধ্যে নহে, নিজের সংসারগত শক্তির মধ্যে নহে।

এইরূপে জীবন হইতে মৃত্যুতে পদার্পণ দিন হইতে রাত্রিতে সংক্রমণেরই অনুরূপ। ইহা বাহির হইতে অন্তঃপুরে প্রবেশ—কর্ম্ম-শালা হইতে মাতৃক্রোড়ে আত্মসমর্পণ—পরস্পরের সহিত পার্থক্য ও বিরোধ হইতে নিখিলের সহিত মিলনের মধ্যে আত্মানুভূতি।

শক্তি আপনাকে ঘোষণা করে, প্রেম আপনাকে আবৃত রাখে। শক্তির ক্ষেত্র আলোক, প্রেমের ক্ষেত্র অন্ধকার। প্রেম অন্তরালের মধ্য হইতেই পালন করে,—লালন করে, অন্তরালের মধ্যেই আকর্ষণ করিয়া আনে। বিশ্বের সমস্ত ভাণ্ডার বিশ্বজননীর গোপন অন্তঃপুরের মধ্যে। তাই আমরা কিছুই জানি না—কোথা হইতে এই নিঃশেষ-বিহীন প্রাণের ধারা লোকে লোকে প্রবাহিত হইতেছে, কোথা হইতে এই অনির্ব্বাণ চেতনার আলোক জীবে জীবে জ্বলিয়া উঠিতেছে, কোথা হইতে এই নিত্যসঞ্জীবিত ধীশক্তি চিত্তে চিত্তে জাগ্রত হইতেছে। আমরা জানি না—এই পুরাতন জগতের ক্লান্তি কোথায় দূর হয়, জীর্ণ-জরার ললাটের শিথিল বলিরেখা কোথায় কোন্ অমৃত-কর-স্পর্শে মুছিয়া-গিয়া আবার নবীনতার সৌকুমার্য্য লাভ করে, জানি না—কণা-পরিমাণ বীজের মধ্যে বিপুল বনস্পতির মহাশক্তি কোথায় কেমন করিয়া প্রচ্ছন্ন থাকে। জগতের এই যে আবরণ, যে আবরণের মধ্যে জগতের সমস্ত উদ্যোগ অদৃশ্য হইয়া কাজ করে,—সমস্ত চেষ্টা বিরামলাভ করিয়া যথাকালে নবীভূত হইয়া উঠে, ইহা প্রেমেরই আবরণ! সুপ্তির মধ্যে এই প্রেমই স্তম্ভিত, মৃত্যুর মধ্যে এই প্রেমই প্রগাঢ়, অন্ধকারের মধ্যে এই প্রেমই পুঞ্জীকৃত—আলোকের মধ্যে এই প্রেমই চঞ্চলশক্তির পশ্চাতে থাকিয়া অদৃশ্য, জীবনের মধ্যে এই প্রেমই আমাদের কর্ত্তৃত্বের অন্তরালে থাকিয়া প্রতি-মুহূর্ত্তে বলপ্রেরণ, প্রতি-মুহূর্ত্তে ক্ষতিপূরণ করিতেছে।

হে মহাতিমিরাবগুণ্ঠিতা রমণীয়া রজনি, তুমি পক্ষিমাতার বিপুল পক্ষপুটের ন্যায় শাবকদিগকে সুকোমল স্নেহাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া অবতীর্ণ হইতেছ; তোমার মধ্যে বিশ্বধাত্রীর পরমস্পর্শ নিবিড়ভাবে, নিগূঢ়ভাবে অনুভব করিতে চাহি। তোমার অন্ধকার আমাদের ক্লান্ত ইন্দ্রিয়কে আচ্ছন্ন রাখিয়া আমাদের হৃদয়কে উদ্ঘাটিত করিয়া দিক্—আমাদের শক্তিকে অভিভূত করিয়া আমাদের প্রেমকে উদ্বোধিত করিয়া তুলুক্, আমাদের নিজের কর্ত্তৃত্বপ্রয়োগের অহঙ্কার-সুখকে খর্ব্ব করিয়া মাতার আলিঙ্গনপাশে নিঃশেষে আপনাকে বর্জ্জন করিবার আনন্দকেই গরীয়ান্ করুক্।

হে বিরাম-বিভাবরীর ঈশ্বরি মাতা, হে অন্ধকারের অধিদেবতা, হে সুপ্তির মধ্যে জাগ্রত, হে মৃত্যুর মধ্যে বিরাজমান, তোমার নক্ষত্রদীপিত অঙ্গনতলে তোমার চরণ-চ্ছায়ায় লুণ্ঠিত হইলাম। আমি এখন আর কোনো ভয় করিব না, কেবল আপন ভার তোমার দ্বারে বিসর্জ্জন দিব; কোনো চিন্তা করিব না, কেবল চিত্তকে তোমার কাছে একান্ত সমর্পণ করিব; কোনো চেষ্টা করিব

না, কেবল তোমার ইচ্ছায় আমার ইচ্ছাকে বিলীন করিব; কোনো বিচার করিব না, কেবল তোমার সেই আনন্দে আমার প্রেমকে নিমগ্ন করিয়া দিব, যে—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্তি অভিসংবিশন্তি।"

ঐ দেখিতেছি, তোমার মহান্ধকার রূপের মধ্যে বিশ্বভুবনের সমস্ত আলোকপুঞ্জ কেবল বিন্দু-বিন্দু-জ্যোতীরূপে একত্র সমবেত হইয়াছে। দিনের বেলায় পৃথিবীর ছোট ছোট চাঞ্চল্য, আমাদের নিজকৃত তুচ্ছ আন্দোলন আমাদের কাছে কত বিপুল-বৃহৎ রূপে দেখা দেয়।—কিন্তু আকাশের ঐ যে নক্ষত্রসকল, যাহাদের উদ্দাম বেগ আমরা মনে ধারণাই করিতে পারি না, যাহাদের উচ্ছ্বসিত আলোকতরঙ্গের আলোড়ন আমাদের কল্পনাকে পরাস্ত করিয়া দেয়,—তোমার মধ্যে তাহাদের সেই প্রচণ্ড আন্দোলন ত কিছুই নহে, তোমার অন্ধকার বসনাঞ্চলতলে, তোমার অবনত স্থিরদৃষ্টির নিম্নে তাহারা স্তন্যপাননিরত সুপ্তশিশুর মত নিশ্চল, নিস্তব্ধ। তোমার বিরাট্ ক্রোড়ে তাহাদের অস্থিরতাও স্থিরত্ব, তাহাদের দুঃসহ তীব্রতেজ মাধুর্য্যরূপে প্রকাশমান। ইহা দেখিয়া এ রাত্রে আমার তুচ্ছ চাঞ্চল্যের আস্ফালন, আমার ক্ষণিক তেজের অভিমান, আমার ক্ষুদ্র দুঃখের আক্ষেপ, কিছুই আর থাকে না,—তোমার মধ্যে আমি সমস্তই স্থির করিলাম, সমস্ত আবৃত করিলাম, সমস্ত শান্ত করিলাম, তুমি আমাকে গ্রহণ কর—আমাকে রক্ষা কর,—

"যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।"

আমি এখন তোমার নিকট শক্তি প্রার্থনা করি না, আমাকে প্রেম দাও; আমি সংসারে জয়ী হইতে চাহি না, তোমার নিকট প্রণত হইতে চাই; আমি সুখদুঃখকে অবজ্ঞা করিতে চাহি না, সুখদুঃখকে তোমার মঙ্গলহস্তের দান বলিয়া বিনয়ে গ্রহণ করিতে চাই। মৃত্যু যখন আমার কর্ম্মশালার দ্বারে দাঁড়াইয়া নীরবসঙ্কেতে আহ্বান করিবে, তখন যেন তাহার অনুসরণ করিয়া, জননি, তোমার অন্তঃপুরের শান্তিকক্ষে নিঃশঙ্কহৃদয়ের মধ্যে আমি ক্ষমা লইয়া যাই,—প্রীতি লইয়া যাই,—কল্যাণ লইয়া যাই,—বিরোধের সমস্ত দাহ যেন সেদিন সন্ধ্যাস্নানে জুড়াইয়া যায়, সমস্ত বাসনার পঙ্ক যেন ধৌত হয়, সমস্ত কুটিলতাকে যেন সরল, সমস্ত বিকৃতিকে যেন সংস্কৃত করিয়া যাইতে পারি! যদি সে অবকাশ না ঘটে, যদি ক্ষুদ্রবল নিঃশেষিত হইয়া যায়, তবু তোমার বিশ্ববিধানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া যেন দিন হইতে রাত্রে, জীবন হইতে মৃত্যুতে, আমার অক্ষমতা হইতে তোমার করুণার মধ্যে একান্তভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারি! ইহা যেন মনে রাখি—জীবনকে তুমিই আমার প্রিয় করিয়াছিলে, মরণকেও তুমিই আমার প্রিয় করিবে,—তোমার দক্ষিণহস্তে তুমি আমাকে সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলে, তোমার বামহস্তে তুমি আমাকে ক্রোড়ে আকর্ষণ করিয়া লইবে,—তোমার আলোক আমাকে শক্তি দিয়াছিল, তোমার অন্ধকার আমাকে শান্তি দিবে।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নারী।

(১)

উষার কিরণপাতে হেরি তোমা' পেলব কলিকা
কুসুমিত কিশোরী বালিকা
স্মিতবিকসিত মুখে জাগাইয়া রাখ অনুখন
প্রিয় তব পিতার ভবন
নদীকূলে সন্ধ্যাকালে শিবপূজারতা কুতূহলা
হে কুমারি কুসুমকুন্তলা।

(২)

পূর্ব্বাহ্ণে নেহারি তোমা' নব-পট্টাম্বর-পরিহিতা
মুগ্ধমুখী অয়ি বিলজ্জিতা
নবীন প্রণয়ডোরে বদ্ধ কর তব প্রাণপতি
নববধূ অয়ি তুমি সতি!
জননীর বক্ষ হ'তে ছিঁড়ি তারে লহে গো দুর্ব্বার
কমনীয় দু'বাহু তোমার।

(৩)

মধ্যাহ্ণে নেহারি তোমা' মূর্ত্তিমতী জননীর বেশে
গৃহাঙ্গনে দাঁড়াইলে হেসে
যেটুকু আপন প্রেমে হরেছিলে লক্ষগুণ তার
হাস্যমুখে দাও অনিবার
শান্তি আর স্নেহরূপে ঝরে পড় শতধা হইয়া
নিজ দুঃখসুখ পাশরিয়া।

(৪)

প্রদোষে নিরখি তোমা' শুভ্রবেশা তাপসী গম্ভীরা
ধ্যানপরায়ণা অয়ি ধীরা
জগতের বহু ঊর্দ্ধে নিত্য তুমি রহ আনন্দিতা
অয়ি পুণ্যকুসুমভূষিতা
কল্যাণ করুণহস্তে নিত্য তুমি কর বরষণ
আশীর্ব্বাদে নবীন জীবন।

(৫)

হে কুমারি তব স্নিগ্ধ বিকশিত হসিত বদন
হবে মম নয়ননন্দন

হে কিশোরি তব প্রেম তুচ্ছ করি বিশ্ব চরাচর
হবে কি গো আমার নির্ভর
হে জননি! তব স্নেহ আলোকিত করিয়া ভুবন
বহি' লবে আমার জীবন
তাপসিনি! দিবসান্তে শ্রান্ত শির চরণে তোমার
সঁপি' দিব কল্যাণি আমার।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

উত্থান।—শ্রী—কাব্যানন্দ প্রণীত। মূল্য ৵০ তিন আনা।

এখানি একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তক। আমাদের দীনতা-হীনতা, দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা বোধ হইতেছে কাব্যানন্দমহাশয়ের বুকে বড় বাজিয়াছে। তাই তিনি তাঁহার মর্ম্মপীড়ামূলক এই ছন্দোবদ্ধ দরখাস্ত অভিষেকোৎসব উপলক্ষে সম্রাটের দরবারে পেশ করিয়াছেন। ভরসার স্থল এই যে, দরখাস্তখানি ঠিকানায় পৌছিবে না।

মুখবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"শিশু পুত্র, কতক অভিমান, কতক রোষ, চোখের কোণে কতখানি অশ্রু, কতখানি রোষরাগ লইয়া যে ভাবে পিতার নিকট আব্দার জানায়, 'উত্থান' বা 'Appeal to the Emperor' সেই ভাবের মূল লইয়া সৃষ্ট। পুত্রের সে অভিমান, সে রোষ, পিতার রুষ্টির কারণ না হইয়া তুষ্টির কারণই হয়, এবং পিতা পুত্রের আব্দারে বা আপীলে তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া থাকেন; উত্থানের আপীলও সেই মূলের উপর স্থাপিত।" বেশ কথা; কিন্তু ধেড়ে ছেলে যদি নিজের অভাব নিজে পূর্ণ করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল পিতার কাছে বা আর কাহারও কাছে ঘ্যান্ঘ্যান্ করে, তাহা অসহনীয়। তদ্ব্যতীত, এ ক্ষেত্রে আব্দার পূর্ণ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। সম্রাট্ ইচ্ছা করিলেও আমাদের অভাব মোচন করিতে পারেন না; তাহা তাঁহার সাধ্যাতীত। সে ভারটা আমাদিগকে নিজে লইতে হইবে। তাহা যেদিন পারিব, সেদিন বিশ্ববিধাতাও আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবেন। যতদিন না পারিব, ততদিন—যাহার প্রবৃত্তি হয়, সে কাব্যানন্দমহাশয়ের ন্যায় অরণ্যে রোদন করিবার সুখ উপভোগ করিতে পারে।

পুস্তকখানির গুণাগুণসম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, সখের ভারত-বিলাপ বা ভারতভিক্ষা সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, ইহাও তাহাই—বিশেষত্ব কিছু দেখিলাম না। ইহার মধ্যে 'উপক্রম'-শীর্ষক কবিতাটির প্রশংসা করা যায়।

স্নেহময়ী।—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী বি. এ ; এল্. এম্. এস্. প্রণীত। মূল্য ১৲ এক টাকা।

এই উপন্যাসখানি পড়িয়া আমরা বুঝিয়াছি যে, গ্রন্থকার একজন সহৃদয় ব্যক্তি। সংসারের রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য, অনাচার-অত্যাচার দেখিয়া গ্রন্থকার ব্যথিত। এই সকলের প্রতিবিধান বা প্রশমনকল্পে একটি 'সেবকের দল' কল্পনা করিয়া তিনি এই উপন্যাসখানি রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য যে প্রশংসনীয়, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে ; তবে, উপন্যাসের দ্বারা যে এরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন উপায় হয়, এমত আমাদের মনে হয় না।

উপন্যাসখানির একটু বিশেষত্ব আছে। উপন্যাসের নায়িকার রূপের মহিমাকীর্ত্তন শুনিয়া শুনিয়া কান ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। এখন কিছুদিন রূপের মাহাত্ম্যকে অব্যাহতি দিয়া আমাদের উপন্যাসলেখকেরা গুণের গৌরব কীর্ত্তিত করিয়া তৎপ্রতি লোকচিত্ত-আকর্ষণের চেষ্টা করিলে ভাল হয়—সমাজেরও মঙ্গল হয়, আমরাও হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচি। বর্ত্তমান স্থলে, আর্থর্ হেল্প্সের 'রিয়াল্মা'নামক উপন্যাসের অনুকরণে, গ্রন্থকার সুরেন্দ্রনাথবাবু এই উপন্যাসের নায়িকাকে কৃষ্ণবর্ণা, কুরূপা, কিন্তু সর্ব্বগুণালঙ্কৃতা করিয়া গড়িয়াছেন। গুণবতী, আর্ত্তসেবা-পরায়ণা, মাতৃভাবানুপ্রাণিতা হইতে হইলেই যে কুরূপা হইতে হইবে, এমন কোন কথা নাই; তবে, সম্ভবত সুরেন্দ্রবাবু নূতন পথ ধরিয়াছেন বলিয়াই খানিকটা আড়ম্বর-বাহুল্য প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছেন।

এই উপন্যাসে ঘটনার কল্পনায় ও অবতারণায় শিল্পনৈপুণ্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। উৎকৃষ্ট উপন্যাসে যে সকল গুরুতর ঘটনা ঘটে, তাহার জন্য যথেষ্ট আয়োজন উপন্যাসের মধ্যেই সন্নিবেশিত থাকে। এই পুস্তকে তাহার অভাব দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শরচ্চন্দ্রের গোপন-বিবাহ ও বিধুভূষণের আত্মহত্যার চেষ্টার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুস্তকের ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী। গ্রন্থকারের বর্ণনাশক্তিও প্রশংসনীয় ; এই পুস্তকের দশম পরিচ্ছেদ তাহার পরিচয়-স্থল। উচ্চ অঙ্গের উপন্যাস না হইলেও লোককে ইহা পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। সচরাচর বাঙ্লা উপন্যাসের অনেক ঊর্দ্ধে ইহার স্থাননির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

হত্যাকারী কে?—উপন্যাস। শ্রীপাঁচকড়ি দে প্রণীত। মূল্য ॥৶০ দশ আনা মাত্র।

এখানি একখানি ডিটেক্‌টিভের গল্প, এবং সে হিসাবে, ইহাতে বিবৃত ঘটনার সমাবেশে এবং অনুসন্ধানের প্রণালীতে কারিকরির পরিচয় পাওয়া যায়। অক্ষয়বাবু যে একজন সুদক্ষ ডিটেক্‌টিভ, ইহা গ্রন্থকার দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে, গ্রন্থকারকে জিজ্ঞাসা করি, এরূপ পুস্তকে কাব্যরসাবতারণার চেষ্টা কেন? বিশেষত ফাঁসীর আসামী যোগেশচন্দ্রের মুখে তাহা বড়ই অসঙ্গত। পুস্তকখানির কাগজ ভাল, ছাপা ভাল, ভাষাও প্রশংসার্হ। শুনিলাম, মূল্য যদিও দশ আনা লেখা আছে, কিন্তু পাঁচ আনা করিয়াই ইহা বিক্রীত হয়।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

ধর্ম্মপ্রচার।*

'এস আমরা ফললাভ করি' বলিয়া হঠাৎ উৎসাহে তখনি পথে বাহির হইয়া পড়াই যে ফললাভের উপায়, তাহা কেহই বলিবেন না। কারণ কেবলমাত্র সদিচ্ছা এবং সদুৎসাহের বলে ফল সৃষ্টি করা যায় না—বীজ হইতে বৃক্ষ এবং বৃক্ষ হইতে ফল জন্মে। দলবদ্ধ উৎসাহের দ্বারাতেও সে নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে না। বীজ ও বৃক্ষের সহিত সম্পর্ক না রাখিয়া আমরা যদি অন্য উপায়ে ফললাভের আকাঙ্ক্ষা করি, তবে সেই ঘরগড়া কৃত্রিম ফল খেলার পক্ষে, গৃহসজ্জার পক্ষে অতি উত্তম হইতে পারে—কিন্তু তাহা আমাদের যথার্থ ক্ষুধানিবৃত্তির পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী হয়।

আমাদের দেশে আধুনিক ধর্ম্মসমাজে আমরা এই কথাটা ভাবি না। আমরা মনে করি, দল বাঁধিলেই বুঝি ফল পাওয়া যায়। শেষকালে মনে করি, দল বাঁধাটাই ফল।

ক্ষণে ক্ষণে আমাদের উৎসাহ হয়, প্রচার করিতে হইবে। হঠাৎ অনুতাপ হয়, কিছু করিতেছি না। যেন করাটাই সব চেয়ে প্রধান—কি করিব, কে করিবে, সেটা বড়-একটা ভাবিবার কথা নয়।

কিন্তু এ কথাটা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা দরকার যে, ধর্ম্মপ্রচারকার্য্যে ধর্ম্মটা আগে, প্রচারটা তাহার পরে। প্রচার করিলেই তবে ধর্ম্মরক্ষা হইবে, তাহা নহে, ধর্ম্মকে রক্ষা করিলেই প্রচার আপনি হইবে।

পূর্ব্বে যে বৃক্ষের উপমা দিয়াছি, সেটা পুনর্ব্বার উত্থাপন করিব। বৃক্ষ প্রকৃতির নিয়মে বীজ হইতে বাড়িয়া-উঠিয়া পরিণতি-লাভ করে। সে ত একস্থানে স্তব্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহার সেই পরিণতিলাভের মধ্যেই, সেই স্তব্ধতার মধ্যেই একটা প্রচারের নিয়ম আছে। সেই নিয়মে ক্রমশ সেই বৃক্ষ হইতে সুবিপুল অরণ্যের সৃষ্টি হইতে থাকে। গাছ হইয়া উঠাই যদি তাহার সর্ব্বপ্রধান কাজ না হইত, তবে আপনাকে প্রচার তাহার পক্ষে অসম্ভব হইত। যে শান্তি, যে স্তব্ধতার মধ্যে থাকিলে পরিপূর্ণ রসাকর্ষণের ব্যাঘাত হয় না—বৃক্ষের সেই শান্তি, সেই স্তব্ধতা ভাবী অরণ্যের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। উৎসাহের উদ্দাম

* ১২ই মাঘ আলোচনাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে সিটিকলেজহলে বঙ্গদর্শন-সম্পাদক-কর্ত্তৃক পঠিত।

চাঞ্চল্য তাহার পক্ষে সফলতার কারণ নহে। তাহাকে গভীরভাবে শিকড় নামাইতে হইবে, তাহাকে বিস্তীর্ণভাবে ডালপালা মেলিতে হইবে, তাহাকে ধীরভাবে সমস্ত পল্লব দিয়া সূর্য্যালোক গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হইলে তাহার পরে যাহা ফল ফলিবার, তাহা ফলিবে।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে আমাদের ধর্ম্মচর্চ্চার গভীরতা যে পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, আমাদের ধর্ম্মসমাজের চাঞ্চল্যও সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে। 'এস আমরা সভা করি, এস আমরা প্রচার করিতে বাহির হই,' এই বলিয়া আমরা পরস্পরকে উত্তেজিত করি এবং প্রভূতপরিমাণ অপরিণত শক্তির অপব্যয় করিয়া থাকি।

শুদ্ধমাত্র নিষ্ফলতাই যদি ইহার পরিণাম হইত, তবে ইহাকে আমি তত অধিক ক্ষতি বলিয়া গণ্য করিতাম না। কৃষিকার্য্য যে কিছুই জানে না, সে যদি উৎসাহসহকারে বীজবপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে যে কেবল ফসল না জন্মিয়াই অনিষ্ট করে, তাহা নহে, বীজও নষ্ট হয়। আধ্যাত্মিক সত্যকে যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা জীবনের মধ্যে লাভ না করিতে পারিয়াছে, সে ব্যক্তি এই সত্য-প্রচারের ভার লইলে কেবল যে প্রচার-কার্য্য ব্যর্থ হয়, তাহা নহে, সত্য ম্লান হয়, সত্য অসত্য হইয়া উঠে।

দুর্ভাগ্যক্রমে ধর্ম্মপ্রচারের অধিকার-সম্বন্ধে আমরা বড় অধিক চিন্তাই করি না। ধর্ম্মের পুরাতন কথাগুলিকে যেমন-তেমন করিয়া পুনঃপুন আবৃত্তি করিয়া যাইবার জন্ম ইচ্ছা, অবকাশ এবং বাক্‌পটুতা থাকিলে আর বেশি-কিছুর প্রয়োজন হয় না, এই-রূপ আমাদের ধারণা। সকল কর্ম্মের অপেক্ষা ধর্ম্মপ্রচারের ব্যবসায়ে যোগ্যতার প্রয়োজন অল্প আছে, আমাদের ব্যবহারে এইরূপ প্রমাণ হয়। মনে করি, উৎসাহ এবং অহমিকাই প্রচারকের পক্ষে যথেষ্ট সম্বল। মনে করি, প্রচারের অভাবেই দেশে ধর্ম্মের অবনতি হইতেছে, সাধনা এবং অভিজ্ঞতার অভাবে নহে।

মনুষ্যত্বের সমস্ত মহাসত্যগুলিই পুরাতন এবং 'ঈশ্বর আছেন' এ কথা পুরাণতম। এই পুরাতনকে মানুষের কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখাই মহাপুরুষের কাজ। জগতের চিরন্তন ধর্ম্মগুরুগণ কোনো নূতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা নহে—তাঁহারা পুরাতনকে তাঁহাদের জীবনের মধ্যে নূতন করিয়া পাইয়াছেন এবং সংসারের মধ্যে তাহাকে নূতন করিয়া তুলিয়াছেন। একদিন সরস্বতীনদীতীরে তপোবনচ্ছায়ায় ভারতের ঋষি উচ্ছ্বসিতস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন :—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ—
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"

হে দিব্যধামবাসি অমৃতের পুত্রগণ, সকলে শোন—আমি সেই জ্যোতির্ম্ময় তিমিরাতীত মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মুক্তির অন্য কোনো পথ নাই।

ইহা নূতন সত্যের কথা নহে, ইহা নূতন উপলব্ধির কথা। ঋষির এই উপলব্ধির উচ্ছ্বাসই আমাদিগকে স্পর্শ করে, সচেতন

করে, আমাদের বোধশক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলে। পুরাতন মহাসত্য এইরূপ নব নব উপলব্ধির দ্বারাতেই মনুষ্যের মধ্যে সজীব হইয়া, নূতন হইয়া বিরাজ করে।

নব নব বসন্ত নব নব পুষ্প সৃষ্টি করে না—সেরূপ নূতনত্বে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা আমাদের চিরকালের পুরাতন ফুলগুলিকেই বর্ষে বর্ষে বসন্তে বসন্তে নূতন করিয়া দেখিতে চাই। সংসারে যাহা-কিছু মহোত্তম, যাহা মহার্ঘতম, তাহা পুরাতন, তাহা সরল, তাহার মধ্যে গোপন কিছুই নাই; যাঁহাদের অভ্যুদয় বসন্তের ন্যায় অনির্ব্বচনীয় জীবন ও যৌবনের দক্ষিণ-সমীরণ মহাসমুদ্রবক্ষ হইতে সঙ্গে করিয়া আনে, তাঁহারা সহসা এই পুরাতনকে অপূর্ব্ব করিয়া তোলেন—অতি পরিচিতকে নিজজীবনের নব নব বর্ণে, গন্ধে, রূপে সজীব, সরস, প্রস্ফুটিত করিয়া মধুপিপাসুগণকে দিগ্‌দিগন্ত হইতে আকর্ষণ করিয়া আনেন।

অতএব নূতন আবিষ্কার মানুষের কাছে যত গৌরবের, পুরাতনকে উপলব্ধি মানুষের কাছে তদপেক্ষা অল্প গৌরবের নহে। মনুষ্য-সমাজে কাব্যের সমাদর তাহার প্রমাণ। যাহা-কিছু মানুষের চিরকালের সামগ্রী, কাব্য তাহাকেই মানুষের উপলব্ধির কাছে চিরদিন নূতন করিয়া রাখে। এই যে সূর্য্যোদয়-সূর্য্যাস্ত, এই যে নিশীথনক্ষত্র-সভার নিস্তব্ধতা, এই যে ঋতুপর্য্যায়ের প্রাণময় সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্য, এই যে জন্মমৃত্যুর নিঃশব্দ গতায়াত, সুখদুঃখের অনন্ত আবর্ত্তন, প্রবৃত্তির তরঙ্গলীলা, স্নেহপ্রেমের অবসানহীন সংখ্যাবিহীন সংসারব্যাপী আকর্ষণপাশ, ইহাদের দ্বারা আমরা নিরন্তর বেষ্টিত হইয়া আছি—অথচ নিয়ত অভ্যাসে ইহাদের অপরিমেয় রহস্য, ইহাদের অপরিসীম বিস্ময়করতা আমাদিগকে স্পর্শ করে না। সংসারে মাঝে মাঝে এমন লোক জন্মে, অভ্যাস যাহাকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না, নিখিল বিশ্বের রসসমুদ্র তাহার প্রত্যেক তরঙ্গের দ্বারা যাহার চিত্তকে অব্যবহিতভাবে আহত করে, জাগ্রত করে, ধ্বনিত করিয়া তোলে; সেই কবির অনুভূতির ভিতর দিয়াই, আমরা যে বিশ্বের মধ্যে আছি, সেই বিশ্বকে হৃদয়ের মধ্যে লাভ করি; যাহা চিরদিনের স্থূলভতম সামগ্রী, তাহা যে কি পরম পদার্থ, তাহা জানিতে পারি; জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যাহাকে প্রতিদিন পাইয়া প্রতিদিনই হারাইয়াছি, সেই মহাশ্চর্য্য নিখিলের রসস্পর্শ আমাদের বোধগম্য হয়।

কিন্তু যাহার স্বভাবত এই নূতন-অনুভূতির ক্ষমতা নাই, সে যদি কেবলমাত্র হিত-কামনায় অথবা যশঃপ্রার্থী হইয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়, তবে সে অনিষ্ট করে। চির-পুরাতন তাহার হাতে চিরনবীন না হইয়া জীর্ণতর হইয়া উঠে। কবির হস্তে যে ভাষা ভাবের যৌবনসঞ্চার করে, অকবির হস্তে সেইগুলিই ভাবকে জরাক্রান্ত করিয়া তুলে। সেই শব্দবিন্যাস পাঠকদের অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং সেই অভ্যস্ত প্রাণহীন শব্দের বেষ্টনে ভাবের সজীবতা থাকে না।

ধর্ম্মপ্রচারসম্বন্ধে এ কথা বিশেষরূপে খাটে। আমরা ধর্ম্মনীতির সর্ব্বজনবিদিত সহজ সত্যগুলি এবং ঈশ্বরের শক্তি ও করুণা প্রত্যহ পুনরাবৃত্তি করিয়া সত্যকে কিছুমাত্র

অগ্রসর করি না, বরঞ্চ অভ্যস্তবাক্যের তাড়নায় বোধশক্তিকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলি। যে সকল কথা অত্যন্ত জানা, তাহাদিগকে একটা নিয়ম বাঁধিয়া বারংবার শুনাইতে গেলে, হয় আমাদের মনোযোগ একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, নয় আমাদের হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠে।

বিপদ্ কেবল এই একমাত্র নহে। অনুভূতিরও একটা অভ্যাস আছে। আমরা বিশেষ স্থানে বিশেষ ভাষাবিন্যাসে একপ্রকার ভাবাবেগ মাদকতার ন্যায় অভ্যাস করিয়া ফেলিতে পারি। সেই অভ্যস্ত আবেগকে আমরা আধ্যাত্মিক সফলতা বলিয়া ভ্রম করি—কিন্তু তাহা একপ্রকার সম্মোহনমাত্র।

এইরূপে ধর্ম্ম যখন সম্প্রদায়বিশেষে বদ্ধ হইয়া পড়ে, তখন তাহা সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশ লোকের কাছে হয় অভ্যস্ত অসাড়তায়, নয় অভ্যস্ত সম্মোহনে পরিণত হইয়া থাকে। তাহার প্রধান কারণ, চিরপুরাতন ধর্ম্মকে নূতন করিয়া বিশেষভাবে আপনার করিবার এবং সেই সূত্রে তাহাকে পুনর্ব্বার বিশেষভাবে সমস্ত মানবের উপযোগী করিবার ক্ষমতা যাহাদের নাই, ধর্ম্মরক্ষা ও ধর্ম্মপ্রচারের ভার তাহারাই গ্রহণ করে। তাহারা মনে করে, আমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিলে সমাজের ক্ষতি হইবে।

এইরূপে অযোগ্যতার হস্তে ধর্ম্ম যখন অসত্য হইয়া উঠে, তখন নানা দুর্নিমিত্ত দেখা দিতে থাকে। তখন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম শান্তির পরিবর্ত্তে বিরোধ, রসের পরিবর্ত্তে তর্ক, বিনয়ের পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতা আনিয়া উপস্থিত করে। তখন সঙ্কীর্ণতা এমনি বেষ্টন করিয়া ধরে যে, ঔদার্য্যকে ধর্ম্মবিরোধী বলিয়াই বোধ হয়। এই কারণেই ইতিহাস দেখিলে দেখা যায়, ধর্ম্মের নামে সংসারে যত অন্যায়, যত অমঙ্গলের সৃষ্টি হইয়াছে, এমন স্বার্থের নামেও হয় নাই। এবং আজও প্রতিদিন দেখিতে পাই, সভ্যনামধারী বড় বড় জাতি নিদারুণ স্বার্থসংগ্রামে ধর্ম্মকে আপনার দলভুক্ত ও ঈশ্বরকে আপনার পক্ষপাতী বলিয়া ঘোষণা করিতে লেশমাত্র সঙ্কোচ অনুভব করে না।

ধর্ম্মকে যাহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করে, তাহারা ক্রমশই ধর্ম্মকে জীবন হইতে দূরে ঠেলিয়া দিতে থাকে। ইহারা ধর্ম্মকে বিশেষ গণ্ডী আঁকিয়া একটা বিশেষ সীমানার মধ্যে বদ্ধ করে। ধর্ম্ম বিশেষ দিনের, বিশেষ স্থানের, বিশেষ প্রণালীর ধর্ম্ম হইয়া উঠে। তাহার কোথাও কিছু ব্যত্যয় হইলেই সম্প্রদায়ের মধ্যে হুলুস্থূল পড়িয়া যায়। বিষয়ী নিজের জমির সীমানা এত সতর্কতার সহিত বাঁচাইতে চেষ্টা করে না,—ধর্ম্মব্যবসায়ী যেমন প্রচণ্ড উৎসাহের সহিত ধর্ম্মের স্বরচিত গণ্ডী রক্ষা করিবার জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে। এই গণ্ডীরক্ষাকেই তাহারা ধর্ম্মরক্ষা বলিয়া জ্ঞান করে। বিজ্ঞানের কোনো নূতন মূলতত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলে তাহারা প্রথমে ইহাই দেখে যে, সে তত্ত্ব তাহাদের গণ্ডীর সীমানায় হস্তক্ষেপ করিতেছে কি না; যদি করে, তবে ধর্ম্ম গেল বলিয়া তাহারা ভীত হইয়া উঠে। ধর্ম্মের বৃন্তটিকে তাহারা এতই ক্ষীণ করিয়া রাখে যে, প্রত্যেক বায়ুহিল্লোলকে তাহারা

শত্রুপক্ষ বলিয়া জ্ঞান করে। ধর্ম্মকে তাহারা সংসার হইতে বহুদূরে স্থাপিত করে—পাছে ধর্মসীমানার মধ্যে মানুষ আপন হাস্য, আপন ক্রন্দন, আপন প্রাত্যহিক ব্যাপারকে, আপন জীবনের অধিকাংশকে লইয়া উপস্থিত হয়। সপ্তাহের এক দিনের এক অংশকে, গৃহের এক কোণকে বা নগরের একটি মন্দিরকে ধর্মের জন্য উৎসর্গ করা হয়—বাকি সমস্ত দেশকালের সহিত ইহার একটি পার্থক্য, এমন কি, ইহার একটি বিরোধ ক্রমশ সুপরিস্ফুট হইয়া উঠে। দেহের সহিত আত্মার, সংসারের সহিত ব্রহ্মের, এক সম্প্রদায়ের সহিত অন্য সম্প্রদায়ের বৈষম্য ও বিদ্রোহভাব স্থাপন করাই, মনুষ্যত্বের মাঝখানে গৃহাবচ্ছেদ উপস্থিত করাই যেন ধর্মের বিশেষ লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

অথচ সংসারে একমাত্র যাহা সমস্ত বৈষম্যের মধ্যে ঐক্য, সমস্ত বিরোধের মধ্যে শান্তি আনয়ন করে, সমস্ত বিচ্ছেদের মধ্যে একমাত্র যাহা মিলনের সেতু, তাহাকেই ধর্ম বলা যায়। তাহা মনুষ্যত্বের এক অংশে অবস্থিত হইয়া অপর অংশের সহিত অহরহ কলহ করে না—সমস্ত মনুষ্যত্ব তাহার অন্তর্ভূত—তাহাই যথার্থভাবে মনুষ্যত্বের ছোট-বড়, অন্তর-বাহির সর্ব্বাংশের পূর্ণ সামঞ্জস্য। সেই সুবৃহৎ সামঞ্জস্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মনুষ্যত্ব সত্য হইতে স্খলিত হয়, সৌন্দর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। সেই অমোঘ ধর্মের আদর্শকে যদি গির্জ্জার গণ্ডির মধ্যে নির্ব্বাসিত করিয়া-দিয়া অন্য যে-কোনো উপস্থিত প্রয়োজনের আদর্শদ্বারা সংসারের ব্যবহার চালাইতে যাই, তাহাতে সর্ব্বনাশী অমঙ্গলের সৃষ্টি হইতে থাকে। আপাতত ধর্ম্মের প্রয়োজন নাই, আপাতত সত্য অব্যবহার্য্য, কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইয়া যথাসময়ে ধর্ম্মকে স্বীকার করিলেই চলিবে, এ কথা যদি আমরা স্পষ্ট না-ও বলি, প্রতিদিন কর্ম্মের দ্বারা বলিয়া থাকি। ইহার কারণ, ধর্মকে আমরা আংশিক করিয়া, খণ্ডিত করিয়া, সুদূর করিয়া, সম্প্রদায়গত, মন্ত্রগত, বিশেষ-অনুষ্ঠান-গত করিয়া রাখি—তাহাকে পূজার বিষয় বলিয়া জানি, ব্যবহারের সামগ্রী বলিয়া মনে করি না। সংসারে যেমন একএকটি প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উপযুক্ত একএকটি ভোগ্য-বিষয় আছে, ধর্মকে সেইরূপ ভক্তিপ্রবৃত্তির বিলাসপরিতৃপ্তির উপযোগী ক্ষণকালীন ভোগায়োজন বলিয়াই জানি। সেই সময়টা বক্তৃতা, সঙ্গীত, মন্ত্রোচ্চারণ প্রভৃতির দ্বারা একটা ভাবাবেগ উৎপাদন করিয়া ধর্মসাধন করিলাম বলিয়া একটা আরাম অনুভব করি এবং পরক্ষণেই সংসারে প্রবেশ করিয়া সেই ক্ষণিক সংযম, সেই ভক্তিবৃত্তির ক্ষণিক উদ্যমের শাসনপাশ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শৈথিল্যের মধ্যে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকি।

কিন্তু ভারতবর্ষের এ আদর্শ সনাতন নহে। আমাদের ধর্ম রিলিজন্ নহে, তাহা মনুষ্যত্বের একাংশ নহে—তাহা পলিটিক্স হইতে তিরস্কৃত, যুদ্ধ হইতে বহিষ্কৃত, ব্যবসায় হইতে নির্ব্বাসিত, প্রাত্যহিক ব্যবহার হইতে দূরবর্ত্তী নহে। সমাজের কোনো বিশেষ অংশে তাহাকে প্রাচীরবদ্ধ করিয়া মানুষের আরাম-আমোদ হইতে, কাব্যকলা হইতে, জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে তাহার সীমানা-রক্ষার

জন্য সর্ব্বদা পাহারা দাঁড়াইয়া নাই। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ প্রভৃতি আশ্রমগুলি এই ধর্ম্মকেই জীবনের মধ্যে, সংসারের মধ্যে সর্ব্বতোভাবে সার্থক করিবার সোপান। ধর্ম্ম সংসারের আংশিক প্রয়োজন সাধনের জন্য নহে, সমগ্র সংসারই ধর্ম্মসাধনের জন্য। এইরূপে ধর্ম্ম গৃহের মধ্যে গৃহধর্ম্ম, রাজত্বের মধ্যে রাজধর্ম্ম হইয়া ভারতবর্ষের সমগ্র সমাজকে একটি অখণ্ড তাৎপর্য্য দান করিয়াছিল। সেইজন্য ভারতবর্ষে, যাহা অধর্ম্ম, তাহাই অনুপযোগী ছিল—ধর্ম্মের দ্বারাই সফলতা বিচার করা হইত, অন্য সফলতা দ্বারা ধর্ম্মের বিচার চলিত না।

এইজন্য ভারতবর্ষীয় আর্য্যসমাজে শিক্ষার কালকে ব্রহ্মচর্য্য নাম দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষ জানিত, ব্রহ্মলাভের দ্বারা মনুষ্যত্ব-লাভই শিক্ষা। সেই শিক্ষা ব্যতীত গৃহস্থ-তনয় গৃহী, রাজপুত্র রাজা হইতে পারে না। কারণ গৃহকর্ম্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ, রাজকর্ম্মের মধ্য দিয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভারত-বর্ষের লক্ষ্য। সকল কর্ম্ম, সকল আশ্রমের সাহায্যেই ব্রহ্ম-উপলব্ধি যখন ভারতবর্ষের চরমসাধনা, তখন ব্রহ্মচর্য্যই তাহার শিক্ষা না হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু অধুনা ব্রহ্মলাভকেই আমরা জীবনের একমাত্র সম্পূর্ণতা ও লক্ষ্য বলিয়া যখন জ্ঞান করি না—যখন আমরা ধনমানের অর্জ্জনকে, ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরকে, ভোগ-সুখের চরিতার্থতাকেই সকলের উচ্চে রাখিয়াছি, এমন কি দেশহিত-লোকহিতকে যখন আমরা দশের অনুবর্ত্তনস্বরূপে অন্ধ-ভাবে পালন করিয়া যাই—ব্রহ্মের সহিত যুক্ত করিয়া তাহার নিত্যসত্যতা দেখি না, তাহার বিশুদ্ধিরক্ষা করি না, তাহাকে সঙ্কীর্ণ করিয়া নষ্ট করি—ক্ষুদ্রের অনুরোধে বৃহৎকে, উপস্থিতের অনুরোধে চিরন্তনকে, স্বাদেশিকতার অনুরোধে মনুষ্যত্বকে, প্রয়োজনের অনুরোধে কল্যাণকে বিসর্জ্জন দিই, তখন স্বভাবতই ব্রহ্মচর্য্যের স্থান ব্রাহ্মসমাজ অধিকার করে, তখন সমস্ত জীবনের সাধনার পরিবর্ত্তে দলবদ্ধ সাপ্তাহিক উপাসনাই প্রধান হইয়া উঠে এবং তখন ব্রহ্মসাধনার মূল্য এতই কমিয়া যায় যে, যে ইচ্ছা বেদীতে আরোহণ করিয়া যাহা ইচ্ছা বলিয়া গেলে আমরা বিশেষ বিস্মিত হই না। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে"—যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাকেই যদি পরা বিদ্যা বলিয়া জানিতাম, প্রতিদিনের কর্ম্মে সেই অক্ষর পুরুষকে সমস্ত জীবনের মধ্যে লাভ করাই যদি একমাত্র লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতাম—যদি আমাদের প্রার্থনা সত্য হইত, আমাদের লক্ষ্য ধ্রুব হইত, তবে নিজে নিজে ব্রাহ্মনাম ধরিয়া, ব্রহ্মনামের ধ্বজা তুলিয়া সঙ্কীর্ত্তন করিয়া, প্রচারফণ্ডে কিছু কিছু চাঁদা দিয়া অন্য সকল সমাজের চেয়ে আপনাদিগকে বড় মনে করিয়া আনন্দিত থাকিতাম না।

যে যাহা যথার্থভাবে চায়, সে তাহার উপায় সেইরূপ যথার্থভাবে অবলম্বন করে। য়ুরোপ যাহা কামনা করে, বাল্যকাল হইতে তাহার পথ সে প্রস্তুত করে, তাহার সমাজে, তাহার প্রাত্যহিক জীবনে সেই লক্ষ্য জ্ঞাত-সারে এবং অজ্ঞাতসারে সে ধরিয়া রাখে। এই কারণেই য়ুরোপ দেশজয় করে, ঐশ্বর্য্য-লাভ করে, প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের সেবা-

কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া আপনাকে পরম চরিতার্থ জ্ঞান করে। তাহার উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে বলিয়াই সে সিদ্ধকাম হইয়াছে। এই জন্য য়ুরোপীয়েরা বলিয়া থাকে, তাহাদের পাব্লিক্-স্কুলে, তাহাদের ক্রিকেট্‌ক্ষেত্রে তাহারা রণজয়ের চর্চ্চা করিয়া লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে।

এককালে আমরা সেইরূপ যথার্থভাবেই ব্রহ্মলাভকে যখন চরমলাভ বলিয়া জ্ঞান করিয়াছিলাম, তখন সমাজের সর্ব্বত্রই তাহার যথার্থ উপায় অবলম্বিত হইয়াছিল। তখন য়ুরোপীয় রিলিজন্-চর্চ্চার আদর্শকে আমাদের দেশ কখনই ধর্ম্মলাভের আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিত না। সুতরাং ধর্ম্মপালন তখন সঙ্কুচিত হইয়া বিশেষভাবে রবিবার বা আর-কোনো বারের সামগ্রী হইয়া উঠে নাই। ব্রহ্মচর্য্য তাহার শিক্ষা ছিল, গৃহাশ্রম তাহার সাধনা ছিল, সমস্ত সমাজ তাহার অনুকূল ছিল—এবং যে ঋষিরা লব্ধকাম হইয়া বলিয়া উঠিয়াছিলেন—

> "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্ত-
> মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"

যাঁহারা বলিয়াছিলেন—

> "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"

তাঁহারাই তাহার গুরু ছিলেন।

ব্রহ্ম বলিতে আমাদের পিতামহরা যতখানি বুঝিয়াছিলেন, আমরা যদি ততখানি না বুঝি, ব্রহ্মসাধনাকে তাঁহারা যতদূর ব্যাপক করিয়া দেখিয়াছিলেন, আমরা যদি ততদূর দেখিতে প্রস্তুত না থাকি, তবে এতদিন ধরিয়া প্রচুর আড়ম্বরে আমরা একি নিষ্ফলতার চর্চ্চা করিয়া আসিতেছি! তবে তাঁহাদের উচ্চারিত পবিত্র মন্ত্রগুলি লইয়া আমরা একি বাল্যলীলায় প্রবৃত্ত হইয়াছি! একি বিদ্রূপ! একি ব্যঙ্গ! আমাদের দেশের দ্বিজদিগের উপনয়নক্রীড়া, আমাদের দেশের আধুনিক লোকাচার ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম, ইহাই কি আমাদের পৈতৃকধর্ম্মের বিকৃত-অনুকরণ-মূলক যথেষ্ট বিরূপতা নহে—আবার ব্রাহ্মসমাজও কি প্রাচীননামের সহিত আধুনিক অসঙ্গতি যোগ করিয়া আর-এক নূতন প্রহসনের অবতারণা করিবেন?

ধর্ম্মকে যে আমরা সৌখীনের ধর্ম্ম, ব্রহ্মকে যে আমরা সৌখীনের ব্রহ্ম করিয়া তুলিব;—আমরা যে মনে করিব, অজস্র ভোগবিলাসের একপার্শ্বে ধর্ম্মকেও একটুখানি স্থান দেওয়া আবশ্যক, নতুবা ভব্যতারক্ষা হয় না, নতুবা ঘরের ছেলেমেয়েদের জীবনে যেটুকু ধর্ম্মের সংস্রব রাখা শোভন, তাহা রাখিবার উপায় থাকে না;—আমরা যে মনে করিব, আমাদের আদর্শভূত পাশ্চাত্যসমাজে ভদ্রপরিবারেরা ধর্ম্মকে যেটুকুপরিমাণে স্বীকার করা ভদ্রতারক্ষার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করেন, আমরাও সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদের অনুবর্ত্তন করিয়া অগত্যা সেইটুকুপরিমাণ ধর্ম্মের ব্যবস্থা না রাখিলে লজ্জার কারণ হইবে; তবে আমাদের সেই ভদ্রতাবিলাসের আস্‌বাবের সঙ্গে ভারতের সুমহৎ ব্রহ্মনামকে জড়িত করিয়া রাখিলে আমাদের পিতামহদের পবিত্রতম সাধনাকে চটুলতম পরিহাসে পরিণত করা হইবে।

যাঁহারা ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সেই ঋষিরা কি বলিয়াছেন? তাঁহারা বলেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্ ॥"

'বিশ্বজগতে যাহা-কিছু চলিতেছে, সমস্তকেই ঈশ্বরের দ্বারা আবৃত দেখিতে হইবে—এবং তিনি যাহা দান করিয়াছেন, তাহাই ভোগ করিতে হইবে—অন্যের ধনে লোভ করিবে না।'

ইহার অর্থ এমন নহে যে, 'ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী' এই কথাটা স্বীকার করিয়া লইয়া, তাহার পরে সংসারে যেমন ইচ্ছা, তেমনি করিয়া চলা। যথার্থভাবে ঈশ্বরের দ্বারা সমস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া দেখিবার অর্থ অত্যন্ত বৃহৎ—সেরূপ করিয়া না দেখিলে সংসারকে সত্য করিয়া দেখা হয় না এবং জীবনকে অন্ধ করিয়া রাখা হয়।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বম্"—ইহা কাজের কথা—ইহা কাল্পনিক কিছু নহে—ইহা কেবল শুনিয়া জানার এবং উচ্চারণদ্বারা মানিয়া লইবার মন্ত্র নহে। গুরুর নিকট এই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া লইয়া তাহার পরে দিনে দিনে পদে পদে ইহাকে জীবনের মধ্যে সফল করিতে হইবে। সংসারকে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেখিতে হইবে। পিতাকে সেই পিতার মধ্যে, মাতাকে সেই মাতার মধ্যে, বন্ধুকে সেই বন্ধুর মধ্যে, প্রতিবেশী, স্বদেশী ও মনুষ্যসমাজকে সেই সর্ব্বভূতান্তরাত্মার মধ্যে উপলব্ধি করিতে হইবে।

ঋষিরা যে ব্রহ্মকে কতখানি সত্য বলিয়া দেখিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের একটি কথাতেই বুঝিতে পারি—তাঁহারা বলিয়াছেন—

"তেষামেবৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্য্যং যেষু সত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।"

'এই যে ব্রহ্মলোক অর্থাৎ যে ব্রহ্মলোক সর্ব্বত্রই রহিয়াছে—ইহা তাঁহাদেরই, তপস্যা যাঁহাদের, ব্রহ্মচর্য্য যাঁহাদের, সত্য যাঁহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত।' অর্থাৎ যাঁহারা যথার্থভাবে ইচ্ছা করেন, যথার্থভাবে চেষ্টা করেন, যথার্থ উপায় অবলম্বন করেন। তপস্যা একটা কোনো কৌশলবিশেষ নহে, তাহা কোনো গোপন-রহস্য নহে—"ঋতং তপঃ সত্যং তপঃ শ্রুতং তপঃ শান্তং তপো দানং তপো যজ্ঞস্তপো ভূর্ভুবঃস্বুবর্ব্রহ্মৈতদুপাস্যৈতৎ তপঃ"—ঋতই তপস্যা, সত্যই তপস্যা, শ্রুত তপস্যা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ তপস্যা, দান তপস্যা, কর্ম্ম তপস্যা এবং ভূর্লোক-ভুবর্লোক-স্বর্লোকব্যাপী এই যে ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনাই তপস্যা। অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা বল, তেজ, শান্তি, সন্তোষ, নিষ্ঠা ও পবিত্রতা লাভ করিয়া, দান ও কর্ম্ম দ্বারা স্বার্থপাশ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তবে অন্তরে-বাহিরে, আত্মায়-পরে, লোকলোকান্তরে ব্রহ্মকে লাভ করা যায়।

এরূপ উপলব্ধি কখনই শুদ্ধমাত্র ভাবের দ্বারা, সপ্তাহে সপ্তাহে শ্রবণ ও কীর্ত্তনের দ্বারা হইতে পারে না, ইহা প্রতিদিনের কর্ম্মের দ্বারাই সম্ভবপর। পরের সেবা না করিয়া আমরা কেবল দূরে বসিয়া ধ্যান করিয়া পরকে আপনার করিতে, আপনার বলিয়া জানিতে পারি না।' পরকে যে পরিমাণে আপনার করিব, সেই পরিমাণেই ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্বকে উপলব্ধি করিব—সেই উপলব্ধিই সত্য উপলব্ধি—তাহা আমাদের অন্তরগত আত্মরচিত কুহেলিকা নহে। এই উপলব্ধির পরিমাণ পাওয়া যায়, ইহাকে পরীক্ষা করিতে পারি—এই উপলব্ধির আদর্শ গ্রহণ করিলে

আত্মপ্রবঞ্চনার আর উপায় থাকে না। নিখিলের মধ্যে সত্যভাবে আমি ব্রহ্মকে পাইতেছি কি না, আমার প্রতিদিনের কর্ম্মই তাহার প্রমাণ। উপনিষদ্ বলেন, যিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি "সর্ব্বমেবাবিবেশ" —সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন। পরের মধ্যে আমাদের হৃদয়ের প্রবেশাধিকার কতখানি বাড়িল, ইহার দ্বারাই আমাদের আত্মার মধ্যে আমরা ব্রহ্মানুভূতির পরিমাণ যথার্থভাবে নির্ণয় করিতে পারি। বিশ্ব হইতে আমরা যে পরিমাণে বিমুখ হই, ব্রহ্ম হইতেই আমরা সেই পরিমাণে বিমুখ হইতে থাকি। আমরা যদি সম্প্রদায়ের মধ্যে আমাদের মনকে সঙ্কুচিত করিয়া আনি, তবে ব্রহ্ম হইতেই আমাদের মনকে সঙ্কুচিত করি। আমরা যদি আপনাদিগকে ব্রাহ্মনামে বিশেষভাবে চিহ্নিত করিয়া হিন্দুসমাজের অপর অংশকে সেই চিহ্নের সাহায্যেই হৃদয়ের স্থান হইতে বঞ্চিত করি, তবে ব্রহ্মের নাম লইয়া ব্রহ্মকেই দূরবর্ত্তী করিয়া রাখি। "সর্ব্বমেবাবিবেশ"— আমরা যথার্থ আত্মীয়ভাবে যতদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিব, ততদূর পর্য্যন্তই আমাদের ব্রহ্মলাভ। আমরা ধৈর্য্যলাভ করিলাম কি না, অভয়লাভ করিলাম কি না, ক্ষমা আমাদের পক্ষে সহজ হইল কি না, আত্মবিস্মৃত মঙ্গলভাব আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হইল কি না —পরনিন্দা আমাদের পক্ষে অপ্রিয় ও পরের প্রতি ঈর্ষার উদ্রেক আমাদের পক্ষে পরম লজ্জার বিষয় হইল কি না—বৈষয়িকতার বন্ধন, ঐশ্বর্য্য-আড়ম্বরের প্রলোভনপাশ ক্রমশ শিথিল হইতেছে কি না—এবং সর্ব্বাপেক্ষা যাহাকে বশ করা দুরূহ, সেই উদ্যত আত্মাভিমান বংশীরববিমুগ্ধ ভুজঙ্গমের ন্যায় ক্রমে ক্রমে আপন মস্তক নত করিতেছে কি না, ইহাই অনুধাবন করিলে আমরা যথার্থভাবে দেখিব, ব্রহ্মের মধ্যে আমরা কতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারিয়াছি—ব্রহ্মের দ্বারা নিখিলজগৎকে কতদূর পর্য্যন্ত সত্যরূপে আবৃত দেখিয়াছি। ব্রহ্মকে যে পরিমাণে স্বীকার করিব, অহঙ্কারকে সেই পরিমাণেই খর্ব্ব করিতে হইবে।

ব্রহ্মের সাধনা আমাদের দেশে ত নূতন সাধনা নহে। যাঁহারা ব্রহ্মকে লাভ করাকেই যথার্থ লাভ বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাঁহারা যে সাধনা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি কি শ্রদ্ধা হারাইতে হইবে? আমরা—যাহারা ব্রহ্মকে তেমন করিয়া সর্ব্বতোভাবে চাহিতেছি না, আমরাই কি সাধনার নব নব প্রণালী কেবলমাত্র বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবন করিবার অধিকারী? যদি সত্যসঙ্কল্প সত্যাচারী সাধুদিগের বহুকালের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধারক্ষা করা সঙ্গত বোধ করি, তবে যে মন্ত্রকে আর্য্য গৃহিগণ বেদের সারভূত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই গায়ত্রীমন্ত্রের সাহায্যে দিনের মধ্যে অন্তত একবার বিশ্বলোকের মাঝখানে দাঁড়াইয়া বিশ্বসবিতার সহিত আমাদের যোগ অনুভব করিয়া লইতে হইবে। ইহাই ব্রহ্মসুরে জীবনের সুর বাঁধিয়া লওয়া। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ —গায়ত্রীর এই যে ব্যাহৃতি-অংশ—এই ব্যাহৃতির দ্বারা একবার পৃথিবী-অন্তরিক্ষ, একবার নিখিলভুবনকে মনের মধ্যে আহরণ করিয়া আনিতে হইবে,—নিজেকে সমস্ত সঙ্কীর্ণসীমা হইতে মুক্ত করিয়া এই লোক-

লোকান্তরপরিবেষ্টিত বিশ্বের সহিত যুক্ত বলিয়া জানিতে হইবে—অনন্ত দেশকালের সহিত, জল-স্থল-আকাশের সহিত, চন্দ্র-সূর্য্য-নক্ষত্রের সহিত আপনাকে একাত্ম করিয়া অনুভব করিতে হইবে। তাহার পরে স্তব্ধ হইয়া বলিতে হইবে—তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি—যে নিখিললোকের সহিত আমি সম্মিলিত, এই নিখিলের যিনি সবিতা—এই নিখিল অহরহই যাঁহার রশ্মি-বিকিরণ, তাঁহারই শক্তি ধ্যান করি—এই ভূর্ভুবঃ স্বঃ—এই নিখিল ভুবনই তাঁহার অবিরাম শক্তির প্রকাশ। এই শক্তিকে যে ধ্যানদ্বারা সর্ব্বত্র অনুভব করিব, সেই ধ্যানের শক্তি কোথা হইতে আসিতেছে? ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ—যিনি আমাদিগকে ধী-প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহা হইতেই। বাহিরে বিশ্ব তাঁহারই বিকিরণ, অন্তরে চৈতন্য তাঁহারই প্রেরণা। তাঁহারই প্রেরিত এই ধী দ্বারা আমরা সর্ব্বত্র তাঁহারই শক্তি দেখিতেছি—তাঁহারই প্রেরিত এই ধী'র সহায়তায় আমরা সূর্য্যকে তাঁহারই দ্বারা দীপ্ত, বায়ুকে তাঁহারই দ্বারা নিশ্বসিত, পৃথিবীকে তাঁহারই দ্বারা দৃঢ় বলিয়া জানিলাম—তাঁহারই প্রেরিত এই ধীসূত্রে আত্মার সহিত নিখিলকে ও নিখিলের সহিত নিখিলসবিতাকে সম্মিলিত করিয়া ধ্যান করিলাম।

কিন্তু এইখানেই শেষ নহে—ইহা আরম্ভমাত্র। এই ভূর্ভুবঃস্বর্লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া যে ধ্যান করা—অন্তরে-বাহিরে সর্ব্বত্র সেই সর্ব্বশক্তিমানের শক্তিকে মনন করিয়া লওয়া, ইহা ব্রহ্মোপাসনার উদ্বোধনমাত্র। তাহার পরে সংসারের মধ্যে, প্রাত্যহিক ব্যাপারের মধ্যেই প্রতিদিন ব্রহ্মোপাসনাকে বিশেষভাবে বিচিত্রভাবে সম্পূর্ণ করিতে হইবে। এককে অনেকের মধ্যে, ধ্রুবকে চঞ্চলের মধ্যে, মঙ্গলকে সুখদুঃখের মধ্যে পদে পদে ধারণা করিয়া লইতে হইবে। তবেই এই উপাসনা অন্তরে-বাহিরে সত্য হইয়া উঠিবে। ইহাকে সুদূর ভাবলোকের মধ্যে খণ্ডিত করিয়া আমাদের মানবত্বের অধিকাংশ হইতেই, আমাদের নিকটতর প্রত্যক্ষতর জীবন হইতেই, বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিলে ব্রহ্ম-উপলব্ধির সম্ভাবনা থাকে না এবং সংসারও সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে।

আমরা বিশ্বের অন্তসর্ব্বত্র ব্রহ্মের আবির্ভাব কেবলমাত্র সাধারণভাবে জ্ঞানে জানিতে পারি। জল-স্থল-আকাশ-গ্রহ-নক্ষত্রের সহিত আমাদের হৃদয়ের আদানপ্রদান চলে না—তাহাদের সহিত আমাদের মঙ্গলকর্ম্মের সম্বন্ধও নাই। আমরা জ্ঞানে-প্রেমে-কর্ম্মে অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে কেবল মানুষকেই পাইতে পারি। এইজন্য মানুষের মধ্যেই পূর্ণতরভাবে ব্রহ্মের উপলব্ধি মানুষের পক্ষে সম্ভবপর। নিখিল মানবাত্মার মধ্যে আমরা সেই পরমাত্মাকে নিকটতম অন্তরতম রূপে জানিয়া তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ব্রহ্ম এই মনুষ্যত্বের ক্রোড়েই আমাদিগকে মাতার ন্যায় ধারণ করিয়াছেন, এই বিশ্বমানবের স্তন্যরসপ্রবাহে ব্রহ্ম আমাদিগকে চিরকালসঞ্চিত প্রাণ, বুদ্ধি, প্রীতি ও উদ্যমে নিরন্তর পরিপূর্ণ করিয়া রাখিতেছেন, এই বিশ্বমানবের কণ্ঠ হইতে ব্রহ্ম আমাদের মুখে পরমাশ্চর্য্য ভাষার সঞ্চার করিয়া দিতেছেন, এই বিশ্বমানবের

অন্তঃপুরে আমরা চিরকালরচিত কাব্য-কাহিনী শুনিতেছি, এই বিশ্বমানবের রাজ-ভাণ্ডারে আমাদের জন্য জ্ঞান ও ধর্ম্ম প্রতি-দিন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে। এই মানবাত্মার মধ্যে সেই বিশ্বাত্মাকে প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের পরিতৃপ্তি ঘনিষ্ঠ হয়—কারণ মানব-সমাজের উত্তরোত্তর বিকাশমান অপরূপ রহস্যময় ইতিহাসের মধ্যে ব্রহ্মের আবির্ভাবকে কেবল জানামাত্র আমাদের পক্ষে যথেষ্ট আনন্দ নহে, মানবের বিচিত্র প্রীতিসম্বন্ধের মধ্যে ব্রহ্মের প্রীতিরস নিশ্চয়ভাবে অনুভব করিতে পারা আমাদের অনুভূতির চরম সার্থকতা এবং প্রীতিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণাম যে কর্ম্ম, সেই কর্ম্মদ্বারা মানবের সেবারূপে ব্রহ্মের সেবা করিয়া আমাদের কর্ম্মপরতার পরম সাফল্য। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি, কর্ম্মবৃত্তি—আমাদের সমস্ত শক্তি সমগ্রভাবে প্রয়োগ করিলে তবে আমাদের অধিকার আমাদের পক্ষে যথাসম্ভব সম্পূর্ণ হয়। এইজন্য ব্রহ্মের অধিকারকে বুদ্ধি, প্রীতি ও কর্ম্ম দ্বারা আমাদের পক্ষে সম্পূর্ণ করিবার ক্ষেত্র মনুষ্যত্ব ছাড়া আর কোথাও নাই। মাতা যেমন একমাত্র মাতৃসম্বন্ধেই শিশুর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা নিকট, সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সংসারের সহিত তাঁহার অন্যান্য বিচিত্র সম্বন্ধ শিশুর নিকট অগোচর এবং অব্যবহার্য্য—তেমনি ব্রহ্ম মানুষের নিকট একমাত্র মনুষ্যত্বের মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা সত্যরূপে, প্রত্যক্ষরূপে বিরাজমান এই সম্বন্ধের মধ্য দিয়াই আমরা তাঁহাকে জানি, তাঁহাকে প্রীতি করি, তাঁহার কর্ম্ম করি। এই-জন্য মানবসংসারের মধ্যেই, প্রতিদিনের ছোট-বড় সমস্ত কর্ম্মের মধ্যেই ব্রহ্মের উপাসনা মানুষের পক্ষে একমাত্র সত্য উপাসনা। অন্য উপাসনা আংশিক— কেবল জ্ঞানের উপাসনা, কেবল ভাবের উপাসনা,—সেই উপাসনাদ্বারা আমরা ক্ষণে ক্ষণে ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারি, কিন্তু ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারি না। মানুষই মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ —এবং সেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষের মধ্যে ব্রহ্মেরই আবির্ভাবকে প্রত্যক্ষতম করিয়া জানা মানবজীবনের চরম চরিতার্থতা। তাহা যদি না জানি, সংসারের সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে, জন্মমৃত্যু-সুখদুঃখ-লাভক্ষতির মধ্যে সেই নিস্তব্ধকে, সেই ধ্রুবকে যদি লাভ না করি, তবে স্নেহপ্রেমদয়াকে মোহ এবং সংসারকে মায়ামরীচিকা বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে এবং প্রতি মুহূর্ত্তের আকর্ষণ-কেই প্রতিমুহূর্ত্তে সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য না করার কোন কারণ থাকিবে না। মনুষ্য-ত্বকে, মানবসংসারকে যদি সর্ব্বান্তঃকরণে সেই ভূমার দ্বারা আবৃত দেখি, তবে বিশ্বমানবের সহিত প্রত্যেক মানবের নিত্যসম্বন্ধ, সত্যসম্বন্ধ যথার্থভাবে উপলব্ধি করি, তবে নিরন্তর সেই সম্বন্ধ বাহিয়া ব্রহ্মের আনন্দধারা পান করি— অসত্য অন্যায় আমাদের চিত্ত হইতে দূর হয় এবং কদাচ কাহা হইতেও আমরা ভয়-প্রাপ্ত হই না।

এইরূপে বিশ্বসংসারের মধ্যে ব্যাপকভাবে ও মানবসংসারের মধ্যে বিশেষভাবে ব্রহ্ম-লাভের সাধনাকে ব্রাহ্মসমাজ খর্ব্ব করিয়া আনিয়াছেন কেন?

এ কথা সকলেই জানেন, অনেক সময়ে মানুষ যাহাকে উপায়রূপে আশ্রয় করে, তাহাকেই উদ্দেশ্যরূপে বরণ করিয়া

লয়, যাহাকে রাজ্যলাভের সহায়মাত্র বলিয়া ডাকিয়া লয়, সেই রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া বসে। আমাদের ধর্ম্মসমাজ-রচনাতেও সে বিপদ্ আছে। আমরা ধর্ম্ম-লাভের জন্য ধর্ম্মসমাজ স্থাপন করি, শেষকালে ধর্ম্মসমাজই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। আমাদের নিজের চেষ্টারচিত সামগ্রী আমাদের সমস্ত মমতা ক্রমে এমন করিয়া নিঃশেষে আকর্ষণ করিয়া লয় যে, ধর্ম্ম, যাহা আমাদের স্বরচিত নহে, তাহা ইহার পশ্চাতে পড়িয়া যায়। তখন, আমাদের সমাজের বাহিরে যে আর কোথাও ধর্ম্মের স্থান থাকিতে পারে, সে কথা স্বীকার করিতে কষ্টবোধ হয়। তখন আমাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজ-বিস্তারকেই ধর্ম্মবিস্তার বলিয়া মনে করি—ব্রহ্ম এবং ব্রাহ্মসমাজ আমাদের কাছে প্রায় এক কথা হইয়া দাঁড়ায়, সেইজন্য ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিলেই আমরা ব্রাহ্ম হইলাম বলিয়া জগতের অন্যসকলের সহিত বিশেষত্ব অনুভব করি। ইহার ফল হয় এই যে, ব্রহ্ম-উপলব্ধির স্বাভাবিক প্রকৃষ্টক্ষেত্র যে বিশ্বসংসার—তাহার প্রতি আমাদের দৃষ্টিই থাকে না—ব্রাহ্মসমাজ তাহা অপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠে—এবং এই ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া ছাড়া ব্রহ্মোপাসনাকে আমরা গণ্য করিতেই চাই না। ইহা হইতে ধর্ম্মের বৈষয়িকতা আসিয়া পড়ে। দেশলুব্ধগণ যে ভাবে দেশ জয় করিতে বাহির হয়, আমরা সেই ভাবেই ব্রাহ্মসমাজের ধ্বজা লইয়া বাহির হই। অন্যান্য দলের সহিত তুলনা করিয়া আমাদের দলের লোকবল, অর্থবল, আমাদের দলের মন্দির-সংখ্যা গণনা করিতে থাকি। মঙ্গলকর্ম্মে মঙ্গলসাধনের আনন্দ অপেক্ষা মঙ্গলসাধনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় হইয়া উঠে। দলাদলির আগুন কিছুতেই নেবে না, কেবলি বাড়িয়া চলিতে থাকে। যখন ব্রহ্মের প্রচার ভুলিয়া গিয়া আমাদের ব্রহ্মকে প্রচার করিতে চাই, যখন মানুষকে ভুলিয়া গিয়া আমাদের সমাজকে বড় করিয়া দেখি, যখন মঙ্গলকে আমাদের কৃত না বলিতে পারিলে সুখবোধ হয় না; তখন ধর্ম্মসমাজের দ্বারাতেই ধর্ম্মের যথার্থ বিপর্য্যয়দশা উপস্থিত হয়। আমাদের এখনকার প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, ধর্ম্মকে যেন আমরা ধর্ম্মসমাজের হস্তে পীড়িত হইতে না দিই, ব্রহ্মকে যেন বিশেষচিহ্নধারী ব্রহ্মব্যবসায়ীদের একাধিকৃত পণ্যদ্রব্যের মত না দেখি। আমরা যেন নিজের সমাজের উন্নতিতেই ব্রহ্মের মহিমা প্রত্যক্ষ না করি—সকল সমাজের মধ্যেই ব্রহ্মের অমোঘশক্তি কার্য্য করিতেছে, ইহাই বিশ্বাস করিয়া ও লক্ষ্য করিয়া আমরা যেন সমস্ত মানবের গৌরবে আপনাদিগকে মহীয়ান্ জ্ঞান করিতে পারি। ব্রহ্ম ধন্য—তিনি সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে, সর্ব্বজীবে ধন্য—তিনি কোনো দলের নহেন, কোনো সমাজের নহেন, কোনো বিশেষ ধর্ম্মপ্রণালীর নহেন, তাঁহাকে লইয়া ধর্ম্মের বিষয়কর্ম্ম ফাঁদিয়া বসা চলে না। ব্রহ্মচারী শিষ্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি"—'হে ভগবন্, তিনি কোথায় প্রতিষ্ঠিত আছেন?' ব্রহ্মবাদী গুরু উত্তর করিলেন—"স্বে মহিম্নি"—'আপন মহিমাতে।' তাঁহারই সেই মহিমার মধ্যে তাঁহার প্রতিষ্ঠা অনুভব করিতে হইবে—আমাদের রচনার মধ্যে নহে।

জ্ঞানতৃপ্ত প্রশান্তাত্মা যে গুরু, যিনি আপন সার্থকজীবনের প্রজ্বলিত হোমাগ্নি-শিখার দ্বারা আমাদের চিত্তে সহজেই ব্রহ্মাগ্নি সঞ্চার করিয়া দিতে পারেন, আমি সেই গুরুর আসনে বসিয়া কোনো কথা বলিতেছি না —সুতরাং আমার কথার যতটুকু মূল্য, তাহা আপনারা বিচার করিয়াই গ্রহণ করিবেন, ইহা জানিয়াই সাহস করিয়া আমার চিন্তিত বিষয়কে আপনাদের নিকটে কিয়ৎপরিমাণে ব্যক্ত করিলাম। আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে পথ দিয়া চলিয়াছি, সে পথে এতদিন কিছু লাভ করি নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে—কিন্তু সম্প্রতি আমরা এমন একটি সংশয়াপন্ন স্থানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, যেখানে পুনর্ব্বার ভাল করিয়া দিঙ্‌নির্ণয় করিয়া লওয়া আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। ইহাই অনুভব করিয়া যে ভাবনা, যে নিষ্ফলতার আশঙ্কা মনে জন্মিয়াছে, সম্পূর্ণ সত্যের মধ্যে জীবনকে সম্পূর্ণ সার্থকতা দিবার যে আকুলতা মনে উদয় হইতেছে, তাহারই তাড়নায় আমি এই আলোচনা উপস্থিত করিয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে আজকাল যে অপরিতৃপ্তি, যে অসন্তোষের ভাব সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহার প্রধান কারণ, ব্রাহ্মসমাজ দীর্ঘকাল ভাঙনের কাজেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছে, গড়নের কাজে মন দিতে পারে নাই। লড়াইয়ের দিনে বিচ্ছেদবিরোধ, আঘাত-প্রতিঘাতই সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠে—রক্ষণ ও গঠনের জন্য শান্তি ও প্রীতির প্রয়োজন। যতদিন আমরা কেবল সৈন্যের ভাবে, আঘাতকারীর ভাবেই সমাজে থাকিব, ততদিন আমাদের জীবন অনেকটা-পরিমাণে কৃত্রিম হইতেই বাধ্য। ততদিন আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকের সহিত মিলনের সহস্র সূত্রকে অগ্রাহ্য করিয়া অনৈক্যের কেবল দুটি-একটি কারণকেই চোখের সম্মুখে খাড়া করিয়া, তাহাকেই অপরিমিত বৃহৎ করিয়া, আপনাদিগকে চারিদিক্ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষুদ্র করিয়া, জাতীয় প্রাণসঞ্চারের সুমহৎ প্রবাহ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া রাখিতেছি। এরূপভাবে অধিককাল চলে না। টবের মধ্যে যেটুকু মাটি থাকে, তাহাতে সৌখীন ফুলগাছ কিছুকাল শোভা দিতে পারে—কিন্তু বনস্পতি তাহাতে বাড়ে না, তাহাতে বাঁচে না। তাই ব্রাহ্মসমাজের শাখাপ্রশাখার মধ্যে শীর্ণতা, তাহার পুষ্পপল্লবের মধ্যে শুষ্কতা উত্তরোত্তর অধিক করিয়া দেখা দিতেছে। এইরূপে চিরস্থায়ী বিরোধের ভাবে পৈতৃকসমাজের মধ্যে আপনাদিগকে প্রাণপণে পৃথক্ করিয়া রাখিলে স্বাস্থ্য কখনই থাকে না, ধর্ম্ম প্রত্যহই পীড়িত হইতে থাকে। যে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা এই বিচ্ছেদবিরোধ প্লাবিত হইয়া একেবারে লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে—যে ব্রহ্মোপাসনার দ্বারা সাম্প্রদায়িক বালুতটকে উদ্বেলিত করিয়া দিয়া আমাদের হৃদয়ের উদার প্রবাহ দেশের সর্ব্বত্র অবাধে প্রবাহিত হইতে পারে, আমি ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মসমাজে নহে, আমাদের সমাজে, হিন্দুসমাজে, সেই ব্রহ্মোপাসনা একান্তমনে প্রার্থনা করি। আমি জানি, মন্ত্রোচ্চারণই ব্রহ্মোপাসনা নহে, সাকার-নিরাকার-বাদসম্বন্ধে বিশেষ কোনো মতকে স্বীকার করাই ব্রহ্মোপাসনা নহে। আমি জানি, হিন্দুসমাজে

যাঁহারা ব্রাহ্মনাম ধারণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রীতির দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মঙ্গলকর্ম্ম দ্বারা, একাগ্রনিষ্ঠা দ্বারা, পবিত্রজীবনের দ্বারা সংসারের মধ্যে ব্রহ্মকে সত্যভাবে স্বীকার ও উপলব্ধি করিতেছেন। অতএব সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আছি বলিয়াই স্বাতন্ত্র্যজনিত যে একটা কৃত্রিম দম্ভ উপস্থিত হয়—যে দম্ভ সত্য হইতে, ব্রহ্ম হইতে আমাদিগকে নিরস্ত করে, সেই দম্ভ হইতে যেন আপনাদিগকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখিতে পারি—এবং চতুর্দ্দিকের সকলের মধ্যে ব্রহ্মের ঐক্যযোগে অকুণ্ঠিতহৃদয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করি—সকলকেই যেন বুঝিতে পারি—কোথাও যেন আমাদের বাধা না থাকে।

বিরোধের ভাবের মধ্যেই ভিত্তি নিহিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজ দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া অতিসতর্কতাবশত সর্ব্বদা তাহাকে শঙ্কান্বিত হইয়া থাকিতে হইয়াছে। এটা ব্রাহ্মমতের বিরোধী, ওটা পৌত্তলিকতার গন্ধবিশিষ্ট, এইরূপ বাচবিচার করিতে করিতে সে আপনাকে এমন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাঁধিয়াছে যে, আপনাকে কৃশ করিয়া, নীরস করিয়া আনিয়াছে। 'ইহা নয়, ইহা নয়' বলিয়া কেবলি বর্জ্জন করিয়া করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্মকে কেবল 'নেতি'ত্বপ্রধান কঙ্কালমাত্র করিয়া তুলিলে, তাহা আমাদের হৃদয়কে তৃপ্ত করিতে পারে না—তাহার 'ইতি'ত্ব-অংশ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত—তাহা বর্ণগন্ধরসবিরল। এই শুষ্কতা অনুভব করিয়া তৃষার্ত্তচিত্তে আমি অদ্য সেই ব্রহ্মের উপাসনা প্রার্থনা করি—যিনি রূপরসকে পরিহার করেন না, সমস্ত রূপরসই যাঁহার অন্তর্গত—সমস্তকেই যিনি আবৃত করিয়া আছেন। অগ্নি-বায়ু-জল-চন্দ্র-সূর্য্য বৈদিক ঋষিদের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিক্ষণে ভক্তির সামগাথা নানা সুরে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহারা এই পরমবিস্ময়রসাবহ বিশ্বজগৎকে জড়পিণ্ড বলিয়া দেখেন নাই। ইহার বিরাট্ প্রাণ তাঁহাদের প্রাণকে স্পর্শ করিয়াছে, বিশ্বের আত্মা তাঁহাদের আত্মাকে আহ্বান করিয়াছে। আমরা এই আশ্চর্য্য নিখিলের মধ্যে, এই অনির্ব্বচনীয় রহস্যপুঞ্জের মধ্যে এমনভাবে সঞ্চরণ করিতেছি, যেন কোথাও মহিমা কিছুই নাই। যেন ব্রহ্মকে কেবল স্বরচিত বাক্যের মধ্যে, স্বপ্রতিষ্ঠিত শুষ্ক ভিত্তিচতুষ্টয়ের মধ্যে ছাড়া আর কোথাও ভক্তি করিবার নাই। ইহাতে যে নম্রতাবিহীন শুষ্কতার চর্চ্চা করা হয়, তাহাতে "রসো বৈ সঃ" সেই রসসমুদ্রের মাঝখানে থাকিয়াও আমাদের হৃদয় উদ্ধত, কঠিন, আমাদের জীবন সঙ্কীর্ণ ও নিষ্ফল হইতে থাকে। আমরা যেন অগ্নিকে, জলকে, ওষধিবনস্পতিকে শূন্য বলিয়া জ্ঞান না করি, আমরা যেন এই বিশ্বভুবনকে প্রাণের দ্বারা, আত্মার দ্বারা, বিস্ময়ের দ্বারা, ভক্তির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে পারি, তাহাকে আমাদের জ্ঞানের এক শুষ্ককোণে না ফেলিয়া রাখি; তাহাকে 'ঈশা বাস্য'—তাহাকে ব্রহ্মের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া দেখিতে পারি। একদিন দেখিয়াছিলাম, একজন ক্লান্ত কৃষক দ্বিপ্রহর-রৌদ্রে "মা" বলিয়া নদীর জলে অবগাহন করিয়াছিল। তাহার সেই উচ্ছ্বসিত মাতৃসম্বোধন আমার কাছে তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত সত্য বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। ইহা কল্পনা নহে, রূপক নহে—যিনি সত্যই

মা, মার মধ্যে যিনি মা হইয়া আছেন, যিনি চিরন্তন মা, তিনিই এই শীতল নদীধারার মধ্যে সেই কর্ম্মক্লান্ত তাপিতকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন—এই নদীস্রোতের মধ্যেই স্তন্যদায়িনী স্নেহপ্লাবিনী মা প্রত্যক্ষ। সেইখানেই যদি বিশ্বমাতাকে প্রণাম করি, তবে তাঁহাকে সত্য প্রণাম করা হয়। সুপক্ক ফল যখন সুধারসে আমাদের রসনাকে তৃপ্ত করে, তখন সেই মধুর স্বাদের মধ্যে যদি জননীর স্নেহ লাভ করিতে পারি, তবে সেই লাভের মধ্যেই ব্রহ্মানন্দলাভ সত্য। সেই 'রসো বৈ'কে বক্তৃতার অলঙ্কারে নহে, প্রকৃতভাবেই প্রভাতে-সন্ধ্যায়, গিরিনদীকাননে, স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে-রূপে যখন প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া সৌন্দর্য্যে-মাধুর্য্যে-মহিমায় সমস্ত জগৎকে দেদীপ্যমান দেখিব—তখনই আমাদের উপাসনাকে ব্রহ্মোপাসনা নাম দিবার অধিকার লাভ করিব—তখন সমস্ত তর্কবিতর্ক, বিরোধবিদ্বেষ, চারিদিকের সহিত সমস্ত বিচ্ছেদ অনায়াসে সূর্য্যোদয়ে কুয়াশার মত কাটিয়া যাইবে।

যাহা বলিতেছি, এ কথা নূতন নহে—ব্রহ্ম সর্ব্বত্র আছেন, এ কথা পুরাতন; ইহা ভারতবর্ষের বনস্পতি বটবৃক্ষের ন্যায় প্রাচীন। কিন্তু সেই বটবৃক্ষ যদি আপনাকে প্রতিমুহূর্ত্তে নবীন না করিতে পারে, তাহার পল্লব যদি দিনে দিনে নূতন না জন্মে, তাহার রসসঞ্চার যদি প্রতিক্ষণে নূতন না হয়, তবে তাহা মৃত কাষ্ঠমাত্র। ব্রহ্মমন্ত্রকে আমাদের সমগ্র জীবনের সহিত, আমাদের সমগ্র সমাজের সহিত যদি অহরহ যুক্ত করিয়া রাখি, তবেই তাহাকে অহরহ নবীন রাখিয়া তাহার ফলচ্ছায়া, তাহার স্বাস্থ্যসৌন্দর্য্য ভোগ করিতে পারিব। তাহাকে সত্যরূপে রক্ষা করিলেই সে আমাদিগকে সত্যভাবে রক্ষা করিবে।

এই কথা স্বীকার করিলেই ইহার উপায় অন্বেষণ ও অবলম্বন করিতে হইবে। সে উপায় কোনো অবহেলাকৃত ব্যাপার নহে, সে উপায় অবকাশের দিনে ক্ষণকালীন আয়োজনমাত্র নহে। জীবনের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্তই তাহার উদ্যোগ। সেই উদ্যোগে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। প্রথমে শিক্ষা, পরে চর্চ্চা ও পরে সম্ভোগ—প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য, পরে সংসারধর্ম্ম ও পরে ব্রহ্মসহবাস,—প্রথমে উদ্যোগ, পরে সাধনা ও পরে দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাজে যথার্থভাবে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে—আর ত কোন সংক্ষিপ্ত কৌশল জানি না।

অতএব বিশ্বজগতে ও মানবসংসারে যথার্থ ব্রহ্ম-উপলব্ধির প্রকৃত সাধনা বালককালের ব্রহ্মচর্য্যপালনের দ্বারাই আরম্ভ করিতে হইবে। তখন হইতে সংযম-নিয়মের দ্বারা সবল-নির্ম্মল হইয়া, চিত্তকে শান্ত ও প্রসন্ন করিয়া, অন্তঃকরণকে ভক্তিশ্রদ্ধাদ্বারা জগতের মধ্যে সজীব-সরস-ভাবে ব্যাপ্ত করিয়া, কল্যাণ-কর্ম্মের প্রাত্যহিক অনুষ্ঠান দ্বারা মঙ্গলভাবকে জীবনের মধ্যে সহজ করিয়া তুলিয়া, অহিংসা ও দয়াপ্রেমের দ্বারা সকল চেতনজীবের সহিত যুক্ত হইয়া, ঐশ্বর্য্যবিলাসকে তুচ্ছ জানিয়া, লোকভয়-মৃত্যুভয়কে ঘৃণা করিয়া, ত্যাগনিষ্ঠ আত্মদমনের দ্বারা ধৈর্য্যবীর্য্য শিক্ষা করিয়া, তবে আমরা সত্যভাবে সংসারের মধ্যে মানবজীবনকে ব্রহ্ম-উপলব্ধির দ্বারা

সার্থক করিতে পারি। নতুবা যথেচ্ছাচারের মধ্যে, ভোগৈশ্বর্য্যের আত্মম্ভরিতার মধ্যে, নানা আকর্ষণের বিক্ষেপবিক্ষোভের মধ্যে, আমাদের আধুনিক সমাজের অসত্য ও অর্থহীন অসঙ্গতির মধ্যে ভূমার প্রতি অন্তরাত্মার একাগ্রলক্ষ্যস্থাপনের শিক্ষা, সকল রসের মধ্যে সেই রসস্বরূপের আনন্দ আস্বাদনের অভ্যাস আমাদের কখনই ঘটিবে না। তাহা যদি না ঘটে, তবে দলবদ্ধ হইয়া ব্রাহ্ম-নাম নিজেরা গ্রহণপূর্ব্বক ব্রহ্মনামপ্রচারের আড়ম্বর আমাদের পক্ষে অশোভন, অসঙ্গত, অসত্য হইবে—জগতের মধ্যে যাহা পূর্ণতম সত্য, জীবনের মধ্যে যাহা চরমতম সফলতা, তাহাকে আমরা কেবল সভা করিয়া, নিয়ম করিয়া, বক্তৃতা করিয়া সঙ্কীর্ণ করিব, মিথ্যা করিব, ধ্বংস করিব ও স্পর্দ্ধাসহকারে, উত্তমসহকারে, বিপুল আয়োজন সহকারে সম্প্রদায় বাঁধিয়া আত্মঘাতী হইব।

হে বিপদ, এস।

(১)

হে বিপদ, এস!
সজল আনতচক্ষে ভীতিবিকম্পিত বক্ষে
রাখি দৃষ্টি, এস দেবি, এস।
পতি-পুত্র-সর্ব্বহারা, অনাথ-বিধবা-পারা,
গালে হাত দিয়া, সতি, কাছে এসে বোস।

(২)

সদ্যঃস্নাতা কালিন্দীর জলে
সন্ধ্যাসমা, হে বিপদ, তব মুখ-কোকনদ,
বিষাদ বুলায় হস্ত সে নীল উৎপলে!
নীহারিকা-মুক্তাহার তোমার ও অশ্রুধার,
প্রীতি-রাকা-শশী হাসে সুন্দর আঁচলে!

(৩)

এস, দেবাঙ্গনা!
র‍্যাফেলের খরদৃষ্টি হেন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি
হেরে নাই!—তুমি মম অপূর্ব্ব ম্যাডোনা!
শিশু খ্রীষ্টে কোলে করি, এস রাজরাজেশ্বরি,
শোভা-সাগরের অয়ি কমল-আসনা!

(৪)

এস, নন্দরাণি!

হেন যশোদার কথা কে শুনেছে কবে কোথা?
ভাগবতে নাহি হেন সুধামাখা বাণী!
শ্রীহরিরে কোলে করি এস রাজরাজেশ্বরি,
কি ফুল্ল-সরোজ ওই চরণ-দুখানি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

গণেশপূজা।

অগ্রহায়ণের বঙ্গদর্শনে "সিদ্ধিদাতা গণেশ" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখকমহাশয় আমাদের দেবমন্দিরে গণপতির আবির্ভাবের যে কাল নিরূপণ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। তিনি গণপতিকে যত আধুনিক বলিতে চাহেন, গণপতি ততটা আধুনিক নহেন। খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর বহুপূর্ব্বে গণপতি পূজা পাইতেন, তাহা অনুমানের কারণ আছে।

ঋগ্বেদসংহিতার মধ্যে "গণপতি" এই নাম দেখা যায়। যথা—দ্বিতীয়মণ্ডলে ত্রয়োবিংশতিতম-সূক্ত-মধ্যে ঋক্—

> গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে
> কবিং কবীনামুপমশ্রবস্তমম্।
> জ্যেষ্ঠরাজং ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পত
> আ নঃ শৃণ্বন্নূতিভিঃ সীদ সাদনম্॥

এই ঋকের গণপতি কিন্তু আমাদের বিঘ্নরাজ গণপতি নহেন। উক্ত ঋকের দেবতা ব্রহ্মণস্পতি। তাঁহাকেই "গণানাং গণপতিং" বলা হইতেছে। ভাষ্যকার সায়ণও তাহাই বলিয়াছেন, যথা—

"হে ব্রহ্মণস্পতে, গণানাং দেবাদিগণানাং সম্বন্ধিনং গণপতিং স্বীয়ানাং পতিং…ত্বা ত্বাং হবামহে আহ্বয়ামঃ।"

এই গণপতি আমাদের গণেশ না হইলেও গণপতি উপাধিটা অতি প্রাচীন, তাহা পাওয়া গেল।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অন্তর্গত যাজ্ঞিকী অথবা নারায়ণীয়া উপনিষদে আমাদের গণেশকে পাওয়া যায়। ঐ আরণ্যকের অন্তিম অর্থাৎ দশম প্রপাঠক যাজ্ঞিকী উপনিষৎ নামে পরিচিত। ঐ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকেই কতিপয় দেবতার উদ্দেশে কয়েকটি গায়ত্রীমন্ত্রের উল্লেখ আছে। মন্ত্রকয়টি উদ্ধৃত করিলাম—

১। পুরুষস্য বিদ্ম সহস্রাক্ষস্য মহাদেবস্য ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

২। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি।
তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

৩। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো দন্তিঃ প্রচোদয়াৎ॥

৪। তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি।
তন্নো নন্দিঃ প্রচোদয়াৎ॥

৫। তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাসেনায় ধীমহি।
তন্নঃ ষণ্মুখঃ প্রচোদয়াৎ ॥
৬। কাত্যায়নায় বিদ্মহে কন্যকুমারী ধীমহি।
তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ঐ মন্ত্রগুলির মধ্যে প্রথম দুইটির উদ্দিষ্ট মহাদেব; পরবর্ত্তী তিনটির উদ্দিষ্ট গণেশ, নন্দি, কার্ত্তিকেয় ও শেষটির উদ্দিষ্ট দেবতা "কাত্যায়ন", "কন্যকুমারী", "দুর্গি"। বলা বাহুল্য, ইনি গণেশজননী কাত্যায়নী দুর্গা।

গণেশের উদ্দিষ্ট তৃতীয় মন্ত্রটির সম্বন্ধে সায়ণের ভাষ্য এইরূপ :—

"বীজাপূরগদেক্ষুকার্ম্মুকেত্যাগমপ্রসিদ্ধমূর্ত্তিধরং বিনায়কং প্রার্থয়তে। তৎপুরুষায় * * * প্রচোদয়াদিতি। গজসমানবক্ত্রত্বেন দীর্ঘস্য তুণ্ডস্য বক্রকলসাদিধারণার্থং বক্রত্বম্। দন্তিঃ মহাদন্তঃ।

অতএব স্বীকার্য্য যে, যাজ্ঞিকী উপনিষদের সময়ে বক্রতুণ্ড মহাদন্তদেবতার পূজা প্রচলিত এবং ইঁহার সহিত মহাদেবের সম্বন্ধও স্থাপিত হইয়াছিল।

এখন যাজ্ঞিকী উপনিষদের কাল লইয়া তর্ক চলিতে পারে। মোক্ষমূলর এককালে বলিয়াছিলেন, আরণ্যকসমূহ সূত্ররচনার পূর্ব্ববর্ত্তী, অর্থাৎ তাঁহার মতে ৬০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী। একালের মতে বৈদিক সাহিত্যের কাল আরও পিছাইয়াই গিয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রাচীনত্বে সন্দেহ করিবার কারণ নাই; কিন্তু যাজ্ঞিকী উপনিষদের প্রাচীনত্বে কিছু সন্দেহ আছে। ঐ উপনিষৎ আরণ্যকের মধ্যে "খিলরূপ" বা পরিশিষ্টভাগ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী তিন প্রপাঠক অর্থাৎ তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম, অষ্টম ও নবম প্রপাঠক তৈত্তিরীয় উপনিষৎ নামে গণ্য। তৈত্তিরীয় উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য লিখিয়াছেন; তৎপরবর্ত্তী যাজ্ঞিকী উপনিষদের লেখেন নাই। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ও যাজ্ঞিকী উপনিষদে আকাশপাতাল ভেদ। পাতা উল্টাইলেই ভেদ স্পষ্ট দেখা যায়। যাজ্ঞিকী উপনিষৎকে ব্রহ্মবিদ্যা বলাই কঠিন; উহা মন্ত্রতন্ত্রে পরিপূর্ণ—পাঠের সময় মনে হয়, বেদ পড়িতেছি না, তন্ত্র পড়িতেছি। সায়ণাচার্য্যের সময়ে দ্রাবিড়দেশে চলিত যাজ্ঞিকী উপনিষদে চৌষট্টি অনুবাক বর্ত্তমান ছিল। অন্ধ্রদেশে আশী, কর্ণাটে চুয়াত্তর, অন্যত্র উননব্বই অনুবাক প্রচলিত ছিল। কাজেই বুঝা যাইতেছে, উহাতে কালক্রমে প্রক্ষিপ্ত অংশ বাড়িয়া গিয়াছে। সায়ণ স্বয়ং দ্রাবিড়ানুগায়ী চৌষট্টি অনুবাকের ভাষ্য করিয়াছেন।

সন্দেহের এই সকল কারণ থাকিলেও যখন যাজ্ঞিকী উপনিষৎ বহুকাল হইতে অপৌরুষেয় শ্রুতিবাক্য বলিয়া গৃহীত হইয়া আসিতেছে, তখন ইহা খৃষ্টীয় পঞ্চমশতাব্দীর তুলনায় বহুপ্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ করা যায় না।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী।

নৌকাডুবি।

২৯

পরদিন কমলা যখন ঘুম হইতে জাগিল, তখন ভোর রাত্রি। চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, ঘরে কেহ নাই। মনে পড়িয়া গেল, সে জাহাজে আছে। আস্তে আস্তে উঠিয়া দরজা ফাঁক করিয়া দেখিল, নিস্তব্ধ জলের উপর সূক্ষ্ম একটুখানি শুভ্র কুয়াশার আচ্ছাদন পড়িয়াছে—অন্ধকার পাণ্ডুবর্ণ হইয়া আসিয়াছে এবং পূর্ব্বদিকে তরুশ্রেণীর পশ্চাতের আকাশে স্বর্ণচ্ছটা ফুটিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে নদীর পাণ্ডুর নীলধারা জেলে-ডিঙির শাদা-শাদা পালগুলিতে খচিত হইয়া উঠিল।

কমলা কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না, তাহার মনের মধ্যে কি-একটা গূঢ়-বেদনা পীড়ন করিতেছে। শরৎকালের এই শিশির-বাষ্পাম্বরা উষা কেন আজ তাহার আনন্দ-মূর্ত্তি উদ্‌ঘাটন করিতেছে না? কেন একটা অশ্রুজলের আবেগ বালিকার বুকের ভিতর হইতে কণ্ঠ বাহিয়া চোখের কাছে বারবার আকুল হইয়া উঠিতেছে? এই নদীতীরের দৃশ্য কাল তাহার পুলকিত কৌতূহলকে কেবলি দোলা দিতেছিল, রাত্রির মধ্যে কি-এমন পরিবর্ত্তন হইল, যাহাতে বাহিরের আহ্বানে তাহার হৃদয় আর সাড়া দিল না?

হঠাৎ কমলার মনে হইল, সে অত্যন্ত একলা; তাহার কেহ নাই। কালও রমেশের সঙ্গ তাহার চারিদিকে ঘিরিয়া ছিল, আজ মাঝখানে যেন একটা ফাঁক হইয়া গেছে। বৃন্ত শিথিল হইয়া আসিলে ফুলটি যেমন ভয়ে-ভয়ে থাকে, বৃহৎ পৃথিবীর মধ্যে আজ কমলা তেমনি একটা ভয় অনুভব করিতে লাগিল। তাহার শ্বশুর নাই, শাশুড়ি নাই, সঙ্গিনী নাই, স্বজন-পরিজন কেহই নাই, এ কথা কাল ত তাহার মনে ছিল না—ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে, যাহাতে আজ তাহার মনে হইতেছে, একলা রমেশমাত্র তাহার সম্পূর্ণ নির্ভরস্থল নহে? কেন মনে হইতেছে, এই বিশ্বভুবন অত্যন্ত বৃহৎ এবং সে বালিকা অত্যন্ত ক্ষুদ্র?

কমলা অনেকক্ষণ দরজা ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নদীর জলপ্রবাহ তরল স্বর্ণস্রোতের মত জ্বলিতে লাগিল। খালাসিরা তখন কাজে লাগিয়াছে, এঞ্জিন্ ধক্-ধক্ করিতে আরম্ভ করিয়াছে—নোঙর-তোলা ও জাহাজ-ঠেলাঠেলির শব্দে অকালজাগ্রত শিশুর দল নদীর তীরে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এমন-সময় রমেশ এই গোলমালে জাগিয়া-উঠিয়া কমলার খবর লইবার জন্য তাহার দ্বারের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। কমলা চকিত হইয়া, আঁচল যথাস্থানে থাকা-সত্ত্বেও তাহা আর-একটু টানিয়া আপনাকে যেন বিশেষভাবে আচ্ছাদনের চেষ্টা করিল।

রমেশ কহিল, "কমলা, তোমার মুখ-হাত ধোওয়া হইয়াছে?"

এই প্রশ্নে কেন যে কমলার রাগ হইতে পারে, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুতেই বলিতে পারিত না। কিন্তু হঠাৎ

রাগ হইল। সে অন্যদিকে মুখ করিয়া কেবল মাথা নাড়িল মাত্র।

রমেশ কহিল—"বেলা হইলে লোকজন উঠিয়া পড়িবে—এইবেলা তৈরি হইয়া লও না!"

কমলা তাহার কোন উত্তর না করিয়া একখানি কোঁচানো শাড়ী, গামছা ও একটি জামা চৌকির উপর হইতে তুলিয়া-লইয়া দ্রুতপদে রমেশের পাশ দিয়া স্নানের ঘরে চলিয়া গেল।

রমেশ যে প্রাতঃকালে উঠিয়া কমলাকে এই যত্নটুকু করিতে আসিল, ইহা কমলার কাছে কেবল যে অত্যন্ত অনাবশ্যক বোধ হইল, তাহা নহে, ইহা যেন তাহাকে অপমান করিল। রমেশের আত্মীয়তার সীমা যে কেবল খানিকটা-দূর পর্য্যন্ত, এক জায়গায় আসিয়া তাহা যে বাধিয়া যায়, ইহা সহসা কমলা অনুভব করিতে পারিয়াছে। তাই তাহারও মনের মধ্যে একটা রাশ টানিবার ভাব আসিয়াছে। রমেশের নিকট হইতে সে যে আপনাকে কোন্ সীমায় কতদূর প্রত্যাহরণ করিয়া আনিবে, ইহাই ভাবিয়া তাহার হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিতেছে। কোনো তর্কযুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সুস্পষ্ট চিন্তা না করিয়াও রমেশের সহিত সম্বন্ধের মধ্যে কমলা একটা শূন্যতা, একটা লজ্জাজনক দৈন্য অনুমান করিতেছে। ইতিপূর্ব্বে রমেশের কাছে সে যেরূপ সহজ-স্বাভাবিক-ভাবে ছিল, আজ তাহা কমলা আর রক্ষা করিতে পারিতেছে না। শ্বশুরবাড়ী কোনো গুরুজন তাহাকে লজ্জা করিতে শেখায় নাই—মাথায় কোন্ অবস্থায় ঘোমটার পরিমাণ কতখানি হওয়া উচিত, তাহাও তাহার অভ্যস্ত হয় নাই —কিন্তু রমেশ সম্মুখে আসিতেই আজ যেন অকারণে তাহার বুকের ভিতরটা লজ্জায় কুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

রমেশেরও মন আজ ভাল ছিল না। সে যে একটা অনিশ্চিতের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছে, ভাল-মন্দ যাহা হোক্ একটা পরিণামের আভাস সে যে দেখিতে পাইতেছে না, কেবল অদৃষ্টের আঘাত খাইয়া চলিয়াছে, নিজের জোরে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, এ ভাবনা তাহাকে পীড়ন করিতেছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল যে, ভাগ্য যদিও প্রতিকূল ছিল সন্দেহ নাই, তথাপি নিজের স্বভাবগত দুর্ব্বলতাই তাহাকে এই বিপাকের মধ্যস্রোতে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। কোনো-একটা সময়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া একটা গন্তব্যপথ অবলম্বন করা উচিত ছিল। সে সময়টা কখন্ আসিয়াছিল এবং সে পথটা কি, তাহা রমেশ এখনো ঠিকমত নির্ণয় করিতে পারে না—কিন্তু ইহা তাহার কাছে নিশ্চয় বোধ হইতেছে যে, যদি তাহার চরিত্রে দ্বিধাবিহীন বল যথেষ্ট থাকিত, তবে সে সময়ও তাহার অগোচরে পার হইয়া যাইত না,—সে পথও তাহার সম্মুখে সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইত। আজ সে যে-ভাবে চলিয়াছে, তাহা নিতান্তই ঘৃণার হাস্যজনক—তাহা পুরুষোচিত নহে। আজ তাহার কোনো কর্ম্ম নাই, কোনো সঙ্কল্প নাই,—গতি আছে, গন্তব্য নাই,—যত দিন যাইতেছে, ততই তাহার জীবন একটা অদ্ভুত নিষ্ফলতার মধ্যে জড়িত হইয়া পড়িতেছে। সঙ্কটের সময় নিজের সমস্ত শক্তি খাটাইবারই একটা সুখ আছে—কিন্তু

সঙ্কট ঘনাইতেছে, অথচ শক্তি কোন কাজ করিতেছে না, নিজের হাত হইতে সমস্ত রাশ খসাইয়া-দিয়া চোখ-বাঁধা ঘোড়ার মর্জ্জি অনুসারে খানাখন্দের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছি, পুরুষের পক্ষে এমন ধিক্কার আর কিছুই নাই। রমেশ তাহার উদ্দেশ্যহীন নদীযাত্রায় আপনাকে কাপুরুষ বলিয়া বারবার লাঞ্ছিত করিতে লাগিল। রমেশ মনে মনে নিজেকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলিতে লাগিল— "'তুমি যে অন্যায় কর নাই' ইহাই তোমার সান্ত্বনার কারণ নহে—তুমি কাপুরুষ—কাপুরুষের ভাগ্যে সফলতা নাই—কাপুরুষ, সন্তরণশক্তিহীন মজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় নিজেকে ও নিজের সমস্ত আশ্রয় ও আশ্রিতকে অতলের দিকে টানিয়া লইয়া যায়।'

স্নান সারিয়া কমলা যখন তাহার কাম্‌রায় আসিয়া বসিল, তখন তাহার দিনের কর্ম্ম তাহার সম্মুখবর্ত্তী হইল। কাঁধের উপর হইতে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা লইয়া কাপড়ের পোর্ট্‌ম্যাণ্টো খুলিতেই তাহার মধ্যে ছোট ক্যাশ্‌বাক্সটি নজরে পড়িল। এই ক্যাশ্‌বাক্সটি পাইয়া কাল কমলা একটি নূতন গৌরব লাভ করিয়াছিল। তাহার হাতে একটি স্বাধীন শক্তি আসিয়াছিল। তাই সে বহুযত্ন করিয়া বাক্সটি তাহার কাপড়ের তোরঙ্গের মধ্যে চাবি-বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কমলা সে বাক্স হাতে তুলিয়া-লইয়া উল্লাসবোধ করিল না। আজ এ বাক্সকে ঠিক নিজের বাক্স মনে হইল না ইহা রমেশেরই বাক্স। এ বাক্সের মধ্যে কমলার পূর্ণস্বাধীনতা নাই। সুতরাং এ টাকার বাক্স কমলার পক্ষে একটা ভারমাত্র।

রমেশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কহিল —"খোলা বাক্সর মধ্যে কী হেঁয়ালির সন্ধান পাইয়াছ? চুপচাপ বসিয়া যে?"

কমলা ক্যাশ্‌বাক্স তুলিয়া-ধরিয়া কহিল— "এই তোমার বাক্স।"

রমেশ কহিল—"ও আমি লইয়া কি করিব!"

কমলা কহিল—"তোমার যেমন দরকার, সেই বুঝিয়া আমাকে জিনিষপত্র আনাইয়া দাও।"

রমেশ। তোমার বুঝি কিছুই দরকার নাই?

কমলা ঘাড় ঈষৎ বাঁকাইয়া কহিল, "টাকায় আমার কিসের দরকার!

রমেশ হাসিয়া কহিল, "এত-বড় কথাটা কয়জন লোক বলিতে পারে! যা হোক্, যেটা তোমার এত অনাদরের জিনিষ, সেইটেই কি পরকে দিতে হয়? আমিও লইব কেন?"

কমলা কোনো উত্তর না করিয়া মেজের উপর ক্যাশ্‌বাক্স রাখিয়া দিল।

রমেশ কহিল, "আচ্ছা কমলা, সত্য করিয়া বল, আমি আমার গল্প শেষ করি নাই বলিয়া তুমি আমার উপর রাগ করিয়াছ?"

কমলা মুখ নীচু করিয়া কহিল, "রাগ কে করিয়াছে?"

রমেশ। রাগ যে না করিয়াছে, সে ঐ ক্যাশ্‌ব্যাক্সটি রাখুক্—তাহা হইলেই বুঝিব, তাহার কথা সত্য।

কমলা। রাগ না করিলেই বুঝি ক্যাশ্‌বাক্স রাখিতে হইবে? তোমার জিনিষ তুমি রাখ না কেন?

রমেশ। আমার জিনিষ ত নয়—দিয়া

কাড়িয়া লইলে যে মরিয়া ব্রহ্মদৈত্য হইতে হইবে! আমার বুঝি সে ভয় নাই?

রমেশের ব্রহ্মদৈত্য হইবার আশঙ্কায় কমলার হঠাৎ হাসি পাইয়া গেল। সে হাসিতে হাসিতে কহিল—"কথ্খন না। দিয়া কাড়িয়া লইলে বুঝি ব্রহ্মদৈত্য হইতে হয়? আমি ত কখনো শুনি নাই।"

এই অকস্মাৎ হাসি হইতে সন্ধির সূত্রপাত হইল। রমেশ কহিল—"অন্যের কাছে কেমন করিয়া শুনিবে? যদি কখনো কোনো ব্রহ্মদৈত্যের দেখা পাও, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেই সত্য-মিথ্যা জানিতে পারিবে।"

কমলা হঠাৎ কুতূহলী হইয়া-উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, ঠাট্টা নয়—তুমি কখনো সত্যকার ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছ?"

রমেশ কহিল—"সত্যকার নয়, এমন অনেক ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছি! ঠিক খাঁটি-জিনিষটি সংসারে দুর্লভ।"

কমলা। কেন, উমেশ যে বলে—

রমেশ। উমেশ? উমেশ ব্যক্তিটি কে?

কমলা। আঃ, ঐ যে ছেলেটি আমাদের সঙ্গে যাইতেছে, ও নিজে ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়াছে।

রমেশ। এ সমস্ত বিষয়ে পর্য্যবেক্ষণশক্তিতে আমি উমেশের সমকক্ষ নহি, এ কথা আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। ব্রহ্মদৈত্যসম্বন্ধে আমার জ্ঞান অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ।

ইতিমধ্যে বহুচেষ্টায় খালাসির দল জাহাজ ভাসাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুদূর গেছে, এমন সময়ে মাথায় একটা চাঙারি লইয়া একটা লোক তীর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে হাত তুলিয়া জাহাজ থামাইবার জন্য অনুনয় করিতে লাগিল। সারেং তাহার ব্যাকুলতায় দৃক্‌পাত করিল না। তখন সে লোকটা রমেশের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "বাবু বাবু" করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়া দিল। রমেশ কহিল, "আমাকে লোকটা ষ্টীমারের টিকিটবাবু বলিয়া মনে করিয়াছে।"—রমেশ তাহাকে দুই হাত ঘুরাইয়া জানাইয়া দিল, ষ্টীমার থামাইবার ক্ষমতা তাহার নাই।

হঠাৎ কমলা বলিয়া উঠিল, "ঐ ত উমেশ! না না, ওকে ফেলিয়া যাইয়ো না—ওকে তুলিয়া লও!"

রমেশ কহিল, "আমার কথায় ষ্টীমার থামাইবে কেন?"

কমলা কাতর হইয়া কহিল, "না, তুমি থামাইতে বল বল না তুমি—ডাঙা ত বেশি দূর নয়!"

রমেশ তখন সারেংকে গিয়া ষ্টীমার থামাইতে অনুরোধ করিল. সারেং কহিল, "বাবু, কোম্পানির নিয়ম নাই।"

কমলা বাহির হইয়া গিয়া কহিল—"উহাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না—একটু থামাও! ও আমাদের উমেশ!"

রমেশ তখন নিয়মলঙ্ঘন ও আপত্তিভঞ্জনের সহজ উপায় অবলম্বন করিল। পুরস্কারের আশ্বাসে সারেং জাহাজ থামাইয়া উমেশকে তুলিয়া-লইয়া তাহার প্রতি বহুতর ভর্ৎসনা প্রয়োগ করিতে লাগিল। সে তাহাতে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কমলার পায়ের কাছে ঝুড়িটা নামাইয়া, যেন কিছুই হয় নাই, এম্‌নি ভাবে হাসিতে লাগিল।

কমলার তখনো বক্ষের ক্ষোভ দূর হয়

নাই। সে কহিল, "হাস্‌চিস্ যে! জাহাজ যদি না থামিত, তবে তোর কি হইত?"

উমেশ তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া ঝুড়িটা উজাড় করিয়া দিল। এক-কাঁদি কাঁচকলা, কয়েক-রকম শাক, কুমড়ার ফুল ও গোটাকতক বেগুন বাহির হইয়া পড়িল।

কমলা জিজ্ঞাসা করিল, "এ সমস্ত কোথা হইতে আনিলি?"

উমেশ, সংগ্রহের যাহা ইতিহাস দিল, তাহা কিছুমাত্র সন্তোষজনক নহে। গতকল্য বাজার হইতে দধিপ্রভৃতি কিনিতে যাইবার সময় সে গ্রামস্থ কাহারো বা চালে, কাহারো বা ক্ষেতে, এই সমস্ত ভোজ্যপদার্থ লক্ষ্য করিয়াছিল। আজ ভোরে জাহাজ ছাড়িবার পূর্ব্বে তীরে নামিয়া এইগুলি যথাস্থান হইতে চয়ন-নির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কাহারো সম্মতির অপেক্ষা রাখে নাই।

রমেশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল—"পরের ক্ষেত হইতে তুই এই সমস্ত চুরি করিয়া আনিয়াছিস্?"

উমেশ কহিল "চুরি করিব কেন? ক্ষেতে কত ছিল, আমি অল্প এই-কটি আনিয়াছি বই ত নয়, ইহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে?"

রমেশ। অল্প আনিলে চুরি হয় না? লক্ষ্মীছাড়া! যা, এ সমস্ত এখান থেকে লইয়া যা!

উমেশ করুণনেত্রে একবার কমলার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "মা, এইগুলিকে আমাদের দেশে পিড়িং-শাক বলে, ইহার চচ্চড়ি বড় সরেশ হয়! আর এইগুলো বেতো-শাক"—

রমেশ দ্বিগুণ বিরক্ত হইয়া কহিল, "নিয়ে যা তোর পিড়িং-শাক! নহিলে আমি সমস্ত নদীর জলে ফেলিয়া দিব।"

এ সম্বন্ধে কর্ত্তব্যনিরূপণের জন্য সে কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা লইয়া যাইবার জন্য সঙ্কেত করিল। সেই সঙ্কেতের মধ্যে করুণামিশ্রিত গোপন-প্রসন্নতা দেখিয়া উমেশ শাকসব্‌জিগুলি কুড়াইয়া চুপ্‌ড়ির মধ্যে লইয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

রমেশ কহিল "এ ভারি অন্যায়! ছেলেটাকে তুমি প্রশ্রয় দিয়ো না!"

রমেশ চিঠিপত্র লিখিবার জন্য তাহার কাম্‌রায় চলিয়া গেল। কমলা মুখ বাড়াইয়া দেখিল, সেকেণ্ডক্লাসের ডেক্ পারাইয়া জাহাজের হালের দিকে যেখানে তাহাদের দর্ম্মা-ঢাকা রান্নার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেইখানে উমেশ চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

সেকেণ্ডক্লাসে যাত্রী কেহ ছিল না। কমলা মাথায়-গায়ে একটা র‍্যাপার জড়াইয়া উমেশের কাছে গিয়া কহিল—"সেগুলা সব ফেলিয়া দিয়াছিস্ নাকি?"

উমেশ কহিল, "ফেলিতে যাইব কেন? এই ঘরের মধ্যেই সব রাখিয়াছি।"

কমলা রাগিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "কিন্তু তুই ভারি অন্যায় করিয়াছিস্! আর কখনো এমন কাজ করিস্ নে! দেখ্ দেখি, ষ্টীমার যদি চলিয়া যাইত!"

এই বলিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল, "আন্, বঁটি আন্!"

উমেশ বঁটি আনিয়া দিল। কমলা সবেগে উমেশের আহৃত তরকারি কুটিতে প্রবৃত্ত হইল।

উমেশ। মা, এই শাকগুলার সঙ্গে সর্ষে-বাটা খুব চমৎকার হয়।

কমলা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "আচ্ছা, তবে সর্ষে বাট্!"

এম্‌নি করিয়া উমেশ যাহাতে প্রশ্রয় না পায়, কমলা সেই সতর্কতা অবলম্বন করিল। বিশেষ গম্ভীরমুখে তাহার শাক, তাহার তরকারি, তাহার বেগুন কুটিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।

হায়, এই গৃহচ্যুত ছেলেটাকে প্রশ্রয় না দিয়াই বা কমলা থাকে কি করিয়া? শাকচুরির গুরুত্ব যে কতখানি, তাহা কমলা ঠিক বোঝে না—কিন্তু নিরাশ্রয় ছেলের নির্ভরলালসা যে কত একান্ত, তাহা ত সে বোঝে। ঐ যে কমলাকে একটুখানি খুসি করিবার জন্য এই লক্ষ্মীছাড়া বালক, কাল হইতে এই কয়েকটা শাক সংগ্রহের অবসর খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল, আর-একটু হইলেই ষ্টীমার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, ইহার করুণা কি কমলাকে স্পর্শ না করিয়া থাকিতে পারে?

কমলা কহিল, "উমেশ, তোর জন্যে কালকের সেই দই কিছু বাকি আছে, তোকে আজ আবার দই খাওয়াইব, কিন্তু খবরদার, এমন কাজ আর কখনো করিস্‌নে!"

উমেশ অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কহিল—"মা, তবে সে দই তুমি কাল খাও নাই?"

কমলা কহিল, "তোর মত দইয়ের উপর আমার অত লোভ নাই। কিন্তু উমেশ, সব ত হইল, মাছের জোগাড় কি হইবে? মাছ না পাইলে বাবুকে খাইতে দিব কি?"

উমেশ। মাছের জোগাড় করিতে পারি মা, কিন্তু সেটা ত মিনি পয়সায় হইবার জো নাই।

কমলা পুনরায় শাসনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সুন্দর দুটি ভ্রূ কুঞ্চিত করিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"উমেশ, তোর মত নির্বোধ আমি ত দেখি নাই! আমি কি তোকে মিনি পয়সায় জিনিষ সংগ্রহ করিতে বলিয়াছি?"

গতকল্য উমেশের মনে কি করিয়া একটা ধারণা হইয়া গেছে যে, কমলা রমেশের কাছ হইতে টাকা আদায় করাটা সহজ মনে করে না। তা ছাড়া, সবসুদ্ধ জড়াইয়া রমেশকে তাহার ভাল লাগে নাই। এইজন্য রমেশের অপেক্ষা না রাখিয়া, কেবল সে এবং কমলা, এই দুই নিরুপায়ে মিলিয়া কি উপায়ে সংসার চালাইতে পারে, তাহার গুটিকতক সহজ কৌশল সে মনে মনে উদ্ভাবন করিতেছিল। শাক-বেগুন-কাঁচকলা-সম্বন্ধে সে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াছিল, কিন্তু মাছটার বিষয়ে এখনো সে যুক্তি স্থির করিতে পারে নাই। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভক্তির জোরে সামান্য দই-মাছ পর্য্যন্ত জোটানো যায় না, পয়সা চাই—সুতরাং কমলার এই অকিঞ্চন ভক্ত-বালকটার পক্ষে পৃথিবী সহজ জায়গা নহে।

উমেশ কিছু কাতর হইয়া কহিল, "মা, যদি বাবুকে বলিয়া কোনমতে গণ্ডা-পাঁচেক পয়সা জোগাড় করিতে পার, তবে একটা বড় রুই আনিতে পারি!"

কমলা উদ্বিগ্ন হইয়া কহিল, "না না, তোকে আর ষ্টীমার হইতে নামিতে দিব না, এবার

তুই ডাঙায় পড়িয়া থাকিলে তোকে কেহ আর তুলিয়া লইবে না।"

উমেশ কহিল, "ডাঙায় নামিব কেন? আজ ভোরে খালাসিদের জালে খুব বড় মাছ পড়িয়াছে—এক-আধটা বেচিতেও পারে!"

শুনিয়া দ্রুতবেগে কমলা একটা টাকা আনিয়া উমেশের হাতে দিল—কহিল—"যাহা লাগে দিয়া বাকি ফিরাইয়া আনিস্।"

উমেশ মাছ আনিল, কিন্তু কিছু ফিরাইয়া আনিল না, বলিল, "একটাকার কমে কিছু-তেই দিল না।"

কথাটা যে খাঁটি সত্য নহে, তাহা কমলা বুঝিল—একটু হাসিয়া কহিল, "এবার ষ্টীমার থামিলে টাকা ভাঙাইয়া রাখিতে হইবে।"

উমেশ গম্ভীরমুখে কহিল, "সেটা খুব দরকার। আস্ত টাকা একবার বাহির হইলে ফেরানো শক্ত।

আহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া রমেশ কহিল, "বড় চমৎকার হইয়াছে! কিন্তু এ সমস্ত জোটাইলে কোথা হইতে? এ যে রুই-মাছের মুড়ো!" বলিয়া মুড়োটা সযত্নে তুলিয়া-ধরিয়া কহিল—"এ ত স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রম নয়—এ যে সত্যই মুড়ো—যাহাকে বলে রোহিতমৎস্য, তাহারি উত্তমাঙ্গ!"

যখন শুনিল, উমেশ ইহার সংগ্রহকর্ত্তা, তখন ক্ষণকালের জন্য মুখ বিকৃত করিয়া কহিল—"তা হোক্, জিনিষটা ভাল—শাস্ত্রে আছে—স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি, উমেশাদপি রোহিতম্! কিন্তু ও ছেলেটা—"

কমলা। তুমি এখন খাও ত। আমি তাকে খুব করিয়া বকিয়া দিয়াছি!

এইরূপে সেদিনকার মধ্যাহ্নভোজন বেশ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। রমেশ "ডেক্"-এ আরাম-কেদারায় গিয়া পরিপাক-ক্রিয়ায় মনোযোগ দিল। কমলা তখন উমে-শকে খাওয়াইতে বসিল। মাছের চচ্চড়িটা উমেশের এত ভাল লাগিল যে, তাহার ভোজ-নের উৎসাহটা কৌতুকাবহ না হইয়া ক্রমে আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিল। উৎকণ্ঠিত কমলা কহিল, "উমেশ, আর খাস্‌নে। তোর জন্য চচ্চড়িটা রাখিয়া দিলাম, আবার রাত্রে খাইবি!"

এইরূপে দিবসের কর্ম্মে ও হাস্যকৌতুকে প্রাতঃকালের হৃদয়ভারটা কখন্ যে দূর হইয়া গেল, তাহা কমলা জানিতে পারিল না।

ক্রমে দিন শেষ হইয়া আসিল। সূর্য্যের আলো বাঁকা হইয়া দীর্ঘতরচ্ছটায় পশ্চিম-দিক্ হইতে জাহাজের ছাদ অধিকার করিয়া লইল। স্পন্দমান জলের উপর বৈকালের মন্দীভূত রৌদ্র ঝিক্‌মিক্ করিতেছে। নদীর দুই তীরে নবীনশ্যাম শারদশস্যক্ষেত্রের মাঝ-খানকার সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া গ্রামরমণীরা গা ধুইবার জন্য ঘট কক্ষে করিয়া চলিয়া আসিতেছে।

কমলা পানসাজা শেষ করিয়া, চুল বাঁধিয়া, মুখহাত ধুইয়া, কাপড় ছাড়িয়া সন্ধ্যার জন্য যখন প্রস্তুত হইয়া লইল, সূর্য্য তখন গ্রামের বাঁশবনগুলির পশ্চাতে অস্ত গিয়াছে। জাহাজ সেদিনকার মত ষ্টেশন্-ঘাটে নোঙর ফেলিয়াছে।

আজ কমলার রাত্রের রন্ধনব্যাপার তেমন বেশি নহে। সকালের অনেক তর-কারি এ বেলা কাজে লাগিবে। এমন-সময়

রমেশ আসিয়া কহিল—মধ্যাহ্নে আজ গুরু-ভোজন হইয়াছে, এ বেলা সে আহার করিবে না।

কমলা বিমর্ষ হইয়া কহিল—"কিছু খাইবে না? শুধুকেবল মাছভাজা দিয়া—"

রমেশ সংক্ষেপে কহিল—"না, মাছভাজা থাক্!" বলিয়া চলিয়া গেল।

কমলা তখন উমেশের পাতে সমস্ত মাছ-ভাজা ও চচ্চড়ি উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিল। উমেশ কহিল, "তোমার জন্য কিছু রাখিলে না?"

সে কহিল—"আমার খাওয়া হইয়া গেছে।"

এইরূপে কমলার এই ভাসমান ক্ষুদ্র-সংসারের একদিনের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

জ্যোৎস্না তখন জলে-স্থলে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তীরে গ্রাম নাই—ধানের ক্ষেতের ঘন-কোমল সুবিস্তীর্ণ সবুজ জনশূন্যতার উপরে নিঃশব্দ শুভ্ররাত্রি বিরহিণীর মত জাগিয়া রহিয়াছে।

জাহাজের ছাদে একলা বসিয়া রমেশের হৃদয় এই উদাস আকাশের মাঝখানে হাহা-কার করিয়া উঠিয়াছে। যাহা হারাইয়াছে, যাহা পাইবার নহে, জীবনের যে অংশ ব্যর্থ হইয়াছে, তাহার শূন্যতা, তাহার বিপুলতা রাত্রের অপরিস্ফুটতার মধ্যে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া অসীম আকার ধারণ করিয়াছে।

আজ মধ্যাহ্নে সে একলা বসিয়া হেম-নলিনীকে একখানি পত্র লিখিতেছিল। তাহাতে এই কথা বলিয়াছিল যে, 'আমার গৃহে যে আমার স্ত্রী আছে, এ কথা লোকের বলিবার অধিকার আছে—এমন কি, একটি বালিকা এখনো আমাকে স্বামী বলিয়া জানে। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া পশ্চিমে চলিয়াছি। অথচ আমি তাহাকে বিবাহ করি নাই। এরূপ অদ্ভুত ভ্রম, এরূপ অসঙ্গত ব্যাপার যে কেমন করিয়া ঘটিতে পারে, তাহা আমি তোমাকে জানাইতে পারি। কিন্তু শুদ্ধমাত্র আমার কথার উপরে বিশ্বাস করিতে হইবে। তাহার অন্য প্রমাণ পাওয়া সম্ভব নহে, প্রমাণ লইবার চেষ্টাও নানাকারণে অন্যায় হইবে। সমস্ত প্রমাণের বিরুদ্ধে কেবল আমার কথা-মাত্রে তোমাকে বিশ্বাসস্থাপন করিতে বলিব, তোমার উপরে আমার এমন দাবী আছে কি না, জানি না। যদি সেই দাবী স্বীকার করিতে পার, তবে তোমাকে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিব—নতুবা আমার অপবাদ আমারি থাকিবে এবং আমার বিনা অপরাধের চরমদণ্ড তোমার হস্ত হইতে গ্রহণ করিয়া তোমাকে অপরাধী করিব না। ঈশ্বর তোমাকে সুখী করুন!'

কোনো একটা জায়গায় পৌঁছিয়া এই চিঠি রমেশ ডাকে দিবে বলিয়া স্থির করিয়া-ছিল। কিন্তু আজ এই জনশূন্য নিঃশব্দ সন্ধ্যাবেলায় এই চিঠির ভবিষ্যৎ উত্তরের মধ্যে রমেশ লেশমাত্র আশার কারণ দেখিতে পাইল না। তাহার মনে হইল, সে যেন প্রতিকূল উত্তর পাইয়াছে—যেন হেমনলিনী ঘৃণা করিয়া উত্তর দেয় নাই।

তীরে টিনের ছাদ দেওয়া যে ক্ষুদ্রকুটীরে ষ্টীমার-আপিস, সেইখানে একটি শীর্ণদেহ কেরাণী টুলের উপরে বসিয়া ডেস্কের উপর ছোট কেরোসিনের বাতি লইয়া খাতা লিখিতেছিল। খোলা দরজার ভিতর দিয়া

রমেশ সেই কেরাণীটিকে দেখিতে পাইতেছিল। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া রমেশ ভাবিতেছিল, 'আমার ভাগ্য যদি আমাকে ঐ কেরাণীটির মত একটি সঙ্কীর্ণ অথচ সুস্পষ্ট জীবনযাত্রার মধ্যে বাঁধিয়া দিত—হিসাব লিখিতাম, কাজ করিতাম, কাজে ত্রুটি হইলে প্রভুর বকুনি খাইতাম, কাজ সারিয়া রাত্রে বাসায় যাইতাম—তবে আমি বাঁচিতাম—আমি বাঁচিতাম!'

হেমনলিনী তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, তাহাকে অবিশ্বাস করিয়াছে, তাহাকে অপবাদক্ষালনের অবসরমাত্র দিতেছে না, আত্মীয়হীনের মৃতদেহের মত তাহাকে একটা অকূল অনিশ্চয়তার স্রোতের মধ্যে ভাসাইয়া দিয়াছে, এই কথা বারবার মনে করিয়া রমেশের বক্ষ অনিশ্বসিত দীর্ঘশ্বাসে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল।

ক্রমে আপিসঘরের আলো নিবিয়া গেল। কেরাণী ঘরে তালা বন্ধ করিয়া হিমের ভয়ে মাথায় র‍্যাপার মুড়ি দিয়া নির্জ্জন শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া ধীরে ধীরে কোন্ দিকে চলিয়া গেল, আর দেখা গেল না।

রমেশ তাহার সাম্‌নের টেবিলের উপরে দুইহাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া পড়িল—শব্দবিহীন জ্যোৎস্নারাত্রির পাণ্ডুবর্ণ সুদূরব্যাপিতা তাহাকে একটা আকার-আয়তনশূন্য পরিণামহীন নৈরাশ্যের মধ্যে নিরুদ্দেশ করিয়া দিল।

কমলা যে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া জাহাজের রেল ধরিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, রমেশ তাহা জানিতে পারে নাই। কমলা মনে করিয়াছিল, সন্ধ্যাবেলায় রমেশ তাহাকে ডাকিয়া লইবে। এইজন্য কাজকর্ম্ম সারিয়া যখন দেখিল, রমেশ তাহার খোঁজ লইতে আসিল না, তখন সে আপনি ধীরপদে জাহাজের ছাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহাকে হঠাৎ থম্‌কিয়া দাঁড়াইতে হইল, সে রমেশের কাছে যাইতে পারিল না। চাঁদের আলো রমেশের মুখের উপরে পড়িয়াছিল—সে মুখ যেন দূরে,—বহুদূরে; কমলার সহিত তাহার সংস্রব নাই। রমেশ যেন কমলার পক্ষে দিগন্তের মেঘের মত—মনে হয়, যেন মাঠ পার হইলেই তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে—কিন্তু মাঠ পার হইয়া দেখা যায়, সে যেমন দূরে ছিল, তেম্‌নি দূরেই আছে। আজ দিনের বেলা কাজকর্ম্ম-কথাবার্ত্তায় মধ্যে রমেশকে যথেষ্ট নিকটবর্ত্তী বলিয়াই মনে হইয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যাবেলার স্তব্ধতার মধ্যে রমেশ কোথায় চলিয়া গেছে? এখন তাহার কাছে যাইতে ভয় করে কেন? ধ্যানমগ্ন রমেশ এবং এই সঙ্গিবিহীনা বালিকার মাঝখানে যেন জ্যোৎস্না-উত্তরীয়ের দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছন্ন একটি বিরাট্ রাত্রি ওষ্ঠাধরের উপর তর্জ্জনী রাখিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতেছে!

রমেশ যখন দুইহাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া টেবিলের উপরে মুখ রাখিল, তখন কমলা ধীরে ধীরে তাহার কাম্‌রার দিকে গেল। পায়ের শব্দ করিল না, পাছে রমেশ টের পায় যে, কমলা তাহার সন্ধান লইতে আসিয়াছিল।

কিন্তু তাহার শুইবার কাম্‌রা নির্জ্জন, অন্ধকার—প্রবেশ করিয়া তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল, নিজেকে একান্তই

পরিত্যক্ত এবং একাকিনী বলিয়া মনে হইল —সেই ক্ষুদ্র কাঠের ঘরটা একটা-কোনো নিষ্ঠুর অপরিচিত জন্তুর হাঁ-করা মুখের মত তাহার কাছে আপনার অন্ধকার মেলিয়া দিল। কোথায় সে যাইবে? কোন্‌খানে আপনার ক্ষুদ্র শরীরটি পাতিয়া-দিয়া সে চোখ বুজিয়া বলিতে পারিবে, 'এই আমার আপনার স্থান?'

ঘরের মধ্যে উঁকি মারিয়াই কমলা আবার বাহিরে আসিল। বাহিরে আসিবার সময় রমেশের ছাতাটা টিনের তোরঙ্গের উপর পড়িয়া-গিয়া একটা শব্দ হইল। সেই শব্দে চকিত হইয়া রমেশ মুখ তুলিল এবং চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া দেখিল, কমলা তাহার শুইবার কাম্‌রার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া আছে। কহিল—"একি কমলা! আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমি এতক্ষণে শুইয়াছ! তোমার কি ভয় করিতেছে নাকি? আচ্ছা, আমি আর বাহিরে বসিব না—আমি এই পাশের ঘরেই শুইতে গেলাম—মাঝের দরজাটি বরঞ্চ খুলিয়া রাখিতেছি।"

কমলা উদ্ধতস্বরে কহিল—"ভয় আমি করি না!" বলিয়া সবেগে অন্ধকার ঘরের মধ্যে ঢুকিল এবং যে দরজা রমেশ খোলা রাখিয়াছিল, তাহা সে বন্ধ করিয়া দিল। বিছানার উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিয়া মুখের উপরে একটা চাদর ঢাকিল সে যেন জগতে আর-কাহাকেও না পাইয়া কেবল আপনাকে দিয়া আপনাকে নিবিড়ভাবে বেষ্টন করিল। রমেশ মনে করিয়াছিল, এতক্ষণে কমলা শুইতে গেছে—এ ছাড়া কমলাসম্বন্ধে আর-কিছু তাহার মনে করিবার ছিল না! কমলা দিনের বেলা কাজ করিবে এবং সন্ধ্যা হইলেই শুইতে যাইবে—কমলার আর-কিছুই প্রয়োজন নাই! রমেশ মনে করিয়াছে, কমলার ভয় করিতেছে! রাগে-লজ্জায় কমলা ঘুমাইতে পারিল না—তাহার চোখ-দুটা জ্বলিতে লাগিল, চোখে জল আসিল না। তাহার সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। যেখানে নির্ভরতাও নাই, স্বাধীনতাও নাই, সেখানে প্রাণ বাঁচে কি করিয়া?

রাত্রি আর কাটে না। পাশের ঘরে রমেশ এতক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিছানার মধ্যে কমলা আর থাকিতে পারিল না। আস্তে আস্তে বাহিরে চলিয়া আসিল। জাহাজের রেলিং ধরিয়া তীরের দিকে চাহিয়া রহিল। কোথাও জনপ্রাণীর সাড়াশব্দ নাই —চাঁদ পশ্চিমের দিকে নামিয়া পড়িতেছে। দুই ধারের শস্যক্ষেত্রের মাঝখান দিয়া যে সঙ্কীর্ণপথ অদৃশ্য হইয়া গেছে, সেই দিকে চাহিয়া কমলা ভাবিতে লাগিল, 'এই পথ দিয়া কত মেয়ে জল লইয়া প্রত্যহ আপন ঘরে যায়!' ঘর!—ঘর বলিতেই তাহার প্রাণ যেন বুকের বাহিরে ছুটিয়া আসিতে চাহিল! একটুখানিমাত্র ঘর—কিন্তু সে ঘর কোথায়! শূন্যতীর ধুধু করিতেছে—প্রকাণ্ড আকাশ দিগন্ত হইতে দিগন্ত পর্য্যন্ত স্তব্ধ! অনাবশ্যক আকাশ—অনাবশ্যক পৃথিবী—ক্ষুদ্র বালিকার পক্ষে এই অন্তহীন বিশালতা অপরিসীম অনাবশ্যক—কেবল তাহার একটিমাত্র ঘরের প্রয়োজন ছিল।

এমন-সময় হঠাৎ কমলা চম্‌কিয়া উঠিল —কে একজন তাহার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া আছে।

"ভয় নাই মা, আমি উমেশ। রাত যে অনেক হইয়াছে, ঘুম নাই কেন!"

এতক্ষণ যে অশ্রু পড়ে নাই, দেখিতে দেখিতে দুই চক্ষু দিয়া সেই অশ্রু উছলিয়া পড়িল। বড় বড় ফোঁটা কিছুতে বাধা মানিল না, কেবলি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ঘাড় বাঁকাইয়া কমলা উমেশের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া রহিল। জলভার বহিয়া মেঘ ভাসিয়া যাইতেছে,—যেম্‌নি তাহারি মত আর-একটা গৃহহারা হাওয়ার স্পর্শ লাগে, অম্‌নি সমস্ত জলের বোঝা ঝরিয়া পড়ে;—এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা যত্নের কথা শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুকভরা অশ্রুর ভার আর রাখিতে পারিল না। একটা-কোনো কথা বলিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু রুদ্ধকণ্ঠ দিয়া কথা বাহির হইল না।

পীড়িতচিত্ত উমেশ কেমন করিয়া সান্ত্বনা দিতে হয়, ভাবিয়া পাইল না। অবশেষে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এক-সময়ে বলিয়া উঠিল—"মা, তুমি যে সেই টাকাটা দিয়াছিলে, তার থেকে সাত-আনা বাঁচিয়াছে।"

তখন কমলার অশ্রুর ভার লঘু হইয়াছে। উমেশের এই খাপ্‌ছাড়া সংবাদে সে একটু-খানি স্নেহমিশ্রিত হাসি হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, সে তোর কাছে রাখিয়া দে। যা, এখন শুতে যা!"

চাঁদ গাছের আড়ালে নামিয়া পড়িল। এবার কমলা বিছানায় আসিয়া যেমন শুইল, অমনি তাহার দুই শ্রান্তচক্ষু ঘুমে বুজিয়া আসিল—প্রভাতের রৌদ্র যখন তাহার ঘরের দ্বারে করাঘাত করিল, তখনো সে নিদ্রায় মগ্ন।

ক্রমশ।

মনুষ্যত্ব।

"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত!" উত্থান কর, জাগ্রত হও—এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না—কিন্তু "উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত" এই বাক্য বার-বার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। সংসারের প্রত্যেক বাধা, প্রত্যেক দুঃখ, প্রত্যেক বিচ্ছেদ, কতশতবার আমাদের অন্তরাত্মার তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে আঘাত দিয়া যে ঝঙ্কার দিয়াছে, তাহাতে কেবল এই বাণীই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত,"—'উত্থান কর, জাগ্রত হও!' অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নব জাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে—কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব্ব বিকাশকে নির্ম্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে! কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে!

পুষ্পকে আজ প্রাতঃকালে বলিতে হয় নাই যে, 'রজনী প্রভাত হইল—তুমি আজ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠ!' বনে বনে আজ বিচিত্র পুষ্পগুলি অতি অনায়াসেই বিশ্বজগতের অন্তর্গূঢ় আনন্দকে বর্ণে, গন্ধে, শোভায় বিকশিত করিয়া মাধুর্য্যের দ্বারা নিখিলের সহিত কমনীয়ভাবে আপনার সম্বন্ধস্থাপন করিয়াছে। পুষ্প আপনাকেও পীড়ন করে নাই, অন্য কাহাকেও আঘাত করে নাই, কোন অবস্থায় দ্বিধার লক্ষণ দেখায় নাই, সহজ-সার্থকতায় আদ্যোপান্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে!

ইহা দেখিয়া মনের মধ্যে এই আক্ষেপ জন্মে যে, আমার জীবন কেন বিশ্বব্যাপী আনন্দকিরণপাতে এমনি সহজে, এমনি সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে না? সে তাহার সমস্ত দলগুলি সঙ্কুচিত করিয়া আপনার মধ্যে এত প্রাণপণে কি আঁকড়িয়া রাখিতেছে? প্রভাতে তরুণ সূর্য্য আসিয়া অরুণকরে তাহার দ্বারে আঘাত করিতেছে, বলিতেছে—'আমি যেমন করিয়া আমার চম্পককিরণরাজি সমস্ত আকাশময় মেলিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি সহজে আনন্দে বিশ্বের মাঝখানে আপনাকে অবাধিত করিয়া দাও!' রজনী নিঃশব্দপদে আসিয়া স্নিগ্ধহস্তে তাহাকে স্পর্শ করিয়া বলিতেছে, 'আমি যেমন করিয়া আমার অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্য হইতে আমার সমস্ত জ্যোতিঃসম্পদ্ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছি, তুমি তেমনি করিয়া একবার অন্তরের গভীরতলের দ্বার নিঃশব্দে উদ্ঘাটন করিয়া দাও—আত্মার প্রচ্ছন্ন রাজভাণ্ডার একমুহূর্ত্তে বিস্মিত বিশ্বের সম্মুখীন কর।' নিখিল জগৎ প্রতিক্ষণেই তাহার বিচিত্র স্পর্শের দ্বারা আমাদিগকে এই কথাই বলিতেছে—'আপনাকে বিকশিত কর, আপনাকে সমর্পণ কর, আপনার দিক্ হইতে একবার সকলের দিকে ফের, এই জল-স্থল-আকাশে, এই সুখদুঃখের বিচিত্র সংসারে অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মের প্রতি আপনাকে একবার সম্পূর্ণ উন্মুখ করিয়া ধর।'

কিন্তু বাধার অন্ত নাই—প্রভাতের ফুলের মত করিয়া এমন সহজে, এমন পরিপূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করিতে পারি না। আপনাকে আপনার মধ্যেই আবৃত করিয়া রাখি, চারিদিকে নিখিলের আনন্দ-অভ্যুদয় ব্যর্থ হইতে থাকে।

কে বলিবে, ব্যর্থ হইতে থাকে? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে অনন্ত জীবন রহিয়াছে, তাহার সফলতার পরিমাণ কে করিতে পারে? পুষ্পের মত আমাদের ক্ষণকালীন সম্পূর্ণতা নহে। নদী যেমন তাহার বহুদীর্ঘ তটদ্বয়ের ধারাবাহিক বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া, কত-কত পর্ব্বত-প্রান্তর-মরু-কানন-নগর-গ্রামকে তরঙ্গাভিহত করিয়া আপন সুদীর্ঘযাত্রার বিপুল সঞ্চয়কে প্রতিমুহূর্ত্তে নিঃশেষে মহাসমুদ্রের নিকট উৎসর্গ করিতে থাকে, কোনোকালে তাহার অন্ত থাকে না,—তাহার অবিশ্রাম প্রবাহধারারও অন্ত থাকে না, তাহার চরম বিরামেরও সীমা থাকে না—মনুষ্যত্বকে সেইরূপ বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া বিপুলভাবে মহৎ-সার্থকতা লাভ করিতে হয়। তাহার সফলতা সহজ নহে। নদীর ন্যায় প্রতিপদে সে নিজের পথ নিজের বলে, নিজের বেগে রচনা করিয়া চলে। কোনো কূল গড়িয়া, কোনো কূল ভাঙিয়া, কোথাও বিভক্ত হইয়া, কোথাও সংযুক্ত হইয়া, নব নব বাধা

দ্বারা আবর্ত্তবেগে ঘূর্ণিত হইয়া সে আপনাকে আপনি বৃহৎ করিয়া সৃষ্টি করিতে থাকে; অবশেষে যখন সে আপনার সীমাবিহীন পরিণামে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সে বিচিত্রকে অতিক্রম করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই মহান্ একের সহিত তাহার মিলন সম্পূর্ণ হয়। বাধা যদি না থাকিত, তবে সে বৃহৎ হইতে পারিত না—বৃহৎ না হইলে বিরাটের মধ্যে তাহার বিকাশ পরিপূর্ণ হইত না।

দুঃখ আছে—সংসারে দুঃখের শেষ নাই। সেই দুঃখের আঘাতে, সেই দুঃখের বেগে সংসারে প্রকাণ্ড ভাঙন-গড়ন চলিতেছে—ইহাতে অহরহ যে তরঙ্গ উঠিতেছে, তাহার কতই ধ্বনি, কতই বর্ণ, কতই গতিভঙ্গিমা। মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মত অসঙ্গত কিছুই হইতে পারিত না। এত দুঃখ ক্ষুদ্রের নহে। মহত্তেরই গৌরব দুঃখ। বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই সেই দুঃখের মহিমায় মহীয়ান্—অশ্রুজলেই তাহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছে। পুষ্পের দুঃখ নাই, পশুপক্ষীর দুঃখসামা সঙ্কীর্ণ—মানুষের দুঃখ বিচিত্র, তাহা গভীর, অনেক সময়ে তাহা অনির্বচনীয়—এই সংসারের মধ্যে তাহার বেদনার সীমা যেন সম্পূর্ণ করিয়া পাওয়া যায় না।

এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, মানুষকে আপন বৃহত্ত্বসম্বন্ধে জাগ্রত-সচেতন করিয়া তোলে, এবং এই বৃহত্ত্বেই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করিয়া তোলে। কারণ, "ভূমৈব সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—'অল্পে আমাদের আনন্দ নাই।' যাহাতে আমাদের খর্ব্বতা, আমাদের স্বল্পতা, তাহা অনেক সময়ে আমাদের আরামের হইতে পারে, কিন্তু তাহা আমাদের আনন্দের নহে। যাহা আমরা বীর্য্যের দ্বারা না পাই, অশ্রুর দ্বারা না পাই, যাহা অনায়াসের তাহা আমরা সম্পূর্ণ পাই না—যাহাকে দুঃখের মধ্য দিয়া কঠিনভাবে লাভ করি, হৃদয় তাহাকেই নিবিড়ভাবে, সমগ্রভাবে প্রাপ্ত হয়। মনুষ্যত্ব আমাদের পরমদুঃখের ধন, তাহা বীর্য্যের দ্বারাই লভ্য। প্রত্যহ পদে পদে বাধা অতিক্রম করিয়া যদি তাহাকে পাইতে না হইত, তবে তাহাকে পাইয়াও পাইতাম না—যদি তাহা সুলভ হইত, তবে আমাদের হৃদয় তাহাকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করিত না। কিন্তু তাহা দুঃখের দ্বারা দুর্লভ, তাহা মৃত্যুশঙ্কার দ্বারা দুর্লভ, তাহা ভয়বিপদের দ্বারা দুর্লভ, তাহা নানাভিমুখী প্রবৃত্তির সংক্ষোভের দ্বারা দুর্লভ। এই দুর্লভ মনুষ্যত্বকে অর্জ্জন করিবার চেষ্টায় আত্মা আপনার সমস্ত শক্তি অনুভব করিতে থাকে। সেই অনুভূতিতেই তাহার প্রকৃত আনন্দ। ইহাতেই তাহার যথার্থ আত্মপরিচয়। ইহাতেই সে জানিতে পায়, দুঃখের ঊর্দ্ধে তাহার মস্তক, মৃত্যুর ঊর্দ্ধে তাহার প্রতিষ্ঠা। এইরূপে সংসারের বিচিত্র অভিঘাতে, দুঃখবাধার সহিত নিরন্তর সংগ্রামে যে আত্মার সমস্ত শক্তি জাগ্রত, সমস্ত তেজ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, সেই আত্মাই ব্রহ্মকে যথার্থভাবে লাভ করিবার উদ্যম প্রাপ্ত হয়—ক্ষুদ্র আরামের মধ্যে, ভোগবিলাসের মধ্যে যে আত্মা জড়ত্বে আবিষ্ট হইয়া আছে, ব্রহ্মের আনন্দ তাহার নহে। সেইজন্য উপনিষদ্ বলিয়াছেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"—'এই আত্মা

(জীবাত্মাই বল, পরমাত্মাই বল) ইনি বলহীনের দ্বারা লভ্য নহেন।' সমগ্র শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে প্রয়োগ করিবার যত উপলক্ষ্য ঘটে, ততই আত্মাকে প্রকৃতভাবে লাভ করিবার উপায় হয়।

এইজন্যই পুষ্পের পক্ষে পুষ্পত্ব যত সহজ, মানুষের পক্ষে মনুষ্যত্ব তত সহজ নহে। মনুষ্যত্বের মধ্য দিয়া মানুষকে যাহা পাইতে হইবে, তাহা নিদ্রিত অবস্থায় পাইবার নহে। এইজন্যই সংসারের সমস্ত কঠিন আঘাত আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে—"উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত! প্রাপ্য বরান্ নিবোধত! ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি!"—'উঠ, জাগ! যথার্থ গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া বোধলাভ কর! সেই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম, কবিরা এইরূপ বলেন।'

অতএব প্রভাতে যখন বনে-উপবনে পুষ্প-পল্লবের মধ্যে তাহাদের ক্ষুদ্র সম্পূর্ণতা, তাহাদের সহজ শোভা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন মানুষ আপন দুর্গম পথ, আপন দুঃসহ দুঃখ, আপন বৃহৎ অসমাপ্তির গৌরবে মহত্তর, বিচিত্রতর আনন্দের গীত কি গাহিবে না? যে প্রভাতে তরুলতার মধ্যে কেবল পুষ্পের বিকাশ এবং পল্লবের হিল্লোল, পাখীর গান এবং ছায়ালোকের স্পন্দন, সেই শিশিরধৌত জ্যোতির্ম্ময় প্রভাতে মানুষের সম্মুখে সংসার—তাহার সংগ্রামক্ষেত্র—সেই রমণীয় প্রভাতে মানুষকেই বদ্ধ-পরিকর হইয়া তাহার প্রতিদিনের দুরূহ জয়-চেষ্টার পথে ধাবিত হইতে হইবে, ক্লেশকে বরণ করিয়া লইতে হইবে, সুখদুঃখের উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়া তাহাকে তরণী বাহিতে হইবে—কারণ, মানুষ মহৎ, কারণ, মনুষ্যত্ব সুকঠিন, এবং মানুষের যে পথ, "দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।"

কিন্তু সংসারের মধ্যেই যদি সংসারের শেষ দেখি, তবে দুঃখকষ্টের পরিমাণ অত্যন্ত উৎকট হইয়া উঠে—তাহার সামঞ্জস্য থাকে না। তবে এই বিষম ভার কে বহন করিবে? কেনই বা বহন করিবে? কিন্তু যেমন নদীর এক প্রান্তে পরমবিরাম সমুদ্র, অন্যদিকে সুদীর্ঘ-তট-নিরুদ্ধ অবিরাম-যুধ্যমান জলধারা, তেমনি আমাদেরও যদি একই সময়ে একদিকে ব্রহ্মের মধ্যে বিশ্রাম ও অন্যদিকে সংসারের মধ্যে অবিশ্রাম গতিবেগ না থাকে, তবে এই গতির কোনই তাৎপর্য্য থাকে না, আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা অদ্ভুত উন্মত্ততা হইয়া দাঁড়ায়। ব্রহ্মের মধ্যেই আমাদের সংসারের পরিণাম, আমাদের কর্ম্মের গতি। শাস্ত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ "যদ্যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ," যে-যে কর্ম্ম করিবেন, তাহা ব্রহ্মে সমর্পণ করিবেন'—ইহাতে একই কালে কর্ম্ম এবং বিরাম, চেষ্টা এবং শান্তি, দুঃখ এবং আনন্দ। ইহাতে একদিকে আমাদের আত্মার কর্ত্তৃত্ব থাকে ও অন্যদিকে যেখানে সেই কর্ত্তৃত্বের নিঃশেষে বিলয়, সেইখানে সেই কর্ত্তৃত্বকে প্রতিক্ষণে বিসর্জ্জন দিয়া আমরা প্রেমের আনন্দ লাভ করি।

প্রেম ত কিছু না দিয়া বাঁচিতে পারে না। আমাদের কর্ম্ম, আমাদের কর্ত্তৃত্ব যদি একেবারেই আমাদের না হইত, তবে ব্রহ্মের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতাম কি? তবে ভক্তি

তাহার সার্থকতালাভ করিত কেমন করিয়া? সংসারেই আমাদের কর্ম্ম, আমাদের কর্ত্তৃত্ব—তাহাই আমাদের দিবার জিনিষ। আমাদের প্রেমের চরম সার্থকতা হইবে,—যখন আমাদের সমস্ত কর্ম্ম, সমস্ত কর্ত্তৃত্ব আনন্দে ব্রহ্মকে সমর্পণ করিতে পারিব। নতুবা কর্ম্ম আমাদের পক্ষে নিরর্থক ভার ও কর্ত্তৃত্ব বস্তুত সংসারের দাসত্ব হইয়া উঠিবে। পতিব্রতা স্ত্রীর পক্ষে তাহার পতিগৃহের কর্ম্মই গৌরবের, তাহা আনন্দের—সে কর্ম্ম তাহার বন্ধন নহে, পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহা প্রতিক্ষণেই মুক্তিলাভ করিতেছে—এক পতিপ্রেমের মধ্যেই তাহার বিচিত্র কর্ম্মের অখণ্ড ঐক্য, তাহার নানাদুঃখের এক আনন্দ-অবসান,—ব্রহ্মের সংসারে আমরা যখন ব্রহ্মের কর্ম্ম করিব, সকল কর্ম্ম ব্রহ্মকে দিব, তখন সেই কর্ম্ম এবং মুক্তি একই কথা হইয়া দাঁড়াইবে, তখন এক ব্রহ্মে আমাদের সমস্ত কর্ম্মের বৈচিত্র্য বিলীন হইবে, সমস্ত দুঃখের ঝঙ্কার একটি আনন্দ-সঙ্গীতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে।

প্রেম যাহা দান করে, সেই দান যতই কঠিন হয়, ততই তাহার সার্থকতার আনন্দ নিবিড় হয়। সন্তানের প্রতি জননীর স্নেহ দুঃখের দ্বারাই সম্পূর্ণ—প্রীতিমাত্রই কষ্টদ্বারা আপনাকে সমগ্রভাবে সপ্রমাণ করিয়া কৃতার্থ হয়। ব্রহ্মের প্রতি যখন আমাদের প্রীতি জাগ্রত হইবে, তখন আমাদের সংসারধর্ম্ম দুঃখক্লেশের দ্বারাই সার্থক হইবে, তাহা আমাদের প্রেমকেই প্রতিদিন উজ্জ্বল করিবে, অলঙ্কৃত করিবে;—ব্রহ্মের প্রতি আমাদের আত্মোৎসর্গকে দুঃখের মূল্যেই মূল্যবান্ করিয়া তুলিবে।

হে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, আমার দৃষ্টি, শ্রবণ, চিন্তা, আমার সমস্ত কর্ম্ম, তোমার অভিমুখেই অহরহ চলিতেছে, ইহা আমি জানি না বলিয়াই, ইহা আমার ইচ্ছাকৃত নহে বলিয়াই দুঃখ পাই। আমি সমস্তকেই অন্ধভাবে বলপূর্ব্বক আমার বলিতে চাই—বলরক্ষা হয় না—আমার কিছুই থাকে না। নিখিলের দিক্ হইতে, তোমার দিক্ হইতে সমস্ত নিজের দিকে টানিয়া-টানিয়া রাখিবার নিষ্ফল চেষ্টায় প্রতিদিন পীড়িত হইতে থাকি। আজ আমি আর কিছুই চাই না, আমি আজ পাইবার প্রার্থনা করিব না, আজ আমি দিতে চাই, দিবার শক্তি চাই। তোমার কাছে আমি আপনাকে পরিপূর্ণরূপে রিক্ত করিব, রিক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিব। তোমার সংসারে কর্ম্মের দ্বারা তোমার যে সেবা করিব, তাহা নিরন্তর হইয়া আমার প্রেমকে জাগ্রত নিষ্ঠাবান্ করিয়া রাখুক্, তোমার অমৃতসমুদ্রের মধ্যে অতলস্পর্শ যে বিশ্রাম, তাহাও আমাকে অবসানহীন শান্তি দান করুক্। তুমি দিনে দিনে স্তরে স্তরে আমাকে শতদল পদ্মের ন্যায় বিশ্বজগতের মধ্যে বিকশিত করিয়া তোমারই পূজার অর্ঘ্যরূপে গ্রহণ কর!

বঙ্গমঙ্গল।

[খণ্ডকাব্য।]

প্রথম সর্গ।

(মন্ত্রণা।)

অর্জ্জন করিতে যশ, কর্জ্জন সুজন
কেমনে গর্জ্জন করি হেলায়ে তর্জ্জনী
আদেশিল সাধুশীল সচিবপ্রধান
রিজলিরে রিজলিউশন লিখিবারে ;
বর্ণিব সে স্বর্ণকীর্ত্তি। এ অর্ণবে হায়
কিরূপে উড়ুপে চড়ি পারি পার হতে ?
তুমি যদি হে ভারতি, নাহি ধর হাল ?
খাটুনিও নাহি বেশী পাটুনীর কাজে।
থাকিলেও ক্ষতি কিবা ? কার্য্যহীন তুমি
হবেই ত অচিরাৎ নূতন বিধানে ;
আগে থেকে দাঁড়-টানা শিখে রাখা ভাল।
পার কর বীণাপাণি, কাব্য-কালাপানি।

হিমালয়ে সিমলার তুঙ্গশৃঙ্গ যথা
নির্জ্জনে মার্জ্জন করে পর্জ্জন্য আপনি,
কর্জ্জন বসিয়া তথা কনক-আসনে
ভাবেন অমৃতবাণী বাণী-বিড়ম্বিনী,
সম্ভাষি সচিবে, মিত্রে, পাত্রে, কোতোয়ালে।
"বিদায়িতে ভারতীরে মারুতির রথে,
পূর্ণ আজি আয়োজন ; চূর্ণ আন্দোলন।
হে পাত্র ! পড়িয়া শাস্ত্র গাত্র দাহ কারো
নাহি হবে ; রবে সবে নীরবে জগতে।
ছল-ধরা রোগে ধরা ছিল প্রপীড়িত,
লুপ্ত হবে তাহা গুপ্ত-বিধির প্রচারে ;
ওহে মিত্র, নেত্র আজি উৎফুল্ল উল্লাসে।

শাস্তির কুলিশ দিব পুলিসের হাতে ;
আঁট ঢাল, কোতোয়াল, শ্রীঅঙ্গ মণ্ডিয়া।
সচিব! রচিব আমি অন্য নব-বিধি,
ঠাণ্ডা করি দেশ ; তুমি পাণ্ডা হও তার।
শুনি সে অমৃতবাণী জয়ধ্বনি করি
উঠিল সচিববৃন্দ ; বন্দী গাহে গান।

(বন্দীর গান।)

করিয়ে দরবার জেরবার
করেছ রাজাগণে।
রহিবে নামছাপা (ধামাচাপা)
পুলিস কমিশনে।
ইউনিবরসিটি, বরষটি
অস্ত না যেতে যেতে,
করিবে ভারতীর মতি স্থির,
কুলোর বাতাসেতে।
গুপ্ত বিল্ খুলি' বিল্‌কুল্-ই
মহিমা জারি হোলো।
প্রভুর জয়গানে একতানে
সকলে হরি বলো।

দ্বিতীয় সর্গ।

(উদ্যোগ।)

"মধুমাখা ইতিবৃত্ত প্রত্নতত্ত্বে জারি
করিলে সচিব তুমি ; বাঁচিল বাঙালী।
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ যে ছিল তিন দেশ ;
একসঙ্গে বঙ্গে তার শাসন গর্হিত।
বিশেষ বঙ্গের লোক বড় কথা কয়
ঝালাপালা করি' কর্ণ। জ্বালা দূর হবে,
কথা বন্ধ কর যদি কবন্ধ করিয়া।"
উচ্চারিয়া কথাগুলি হস্তে ল'য়ে ছুরি
দক্ষ সার্জ্জনের মত দাঁড়াল কর্জ্জন।

কহিলা সচিব তবে যুক্ত করযুগে :—
"ছুরি হেরি ডরি প্রাণে যদি ওঠে কাঁদি ;
কিম্বা যদি ধড় হ'তে স্বতন্ত্রিতে মাথা
শঙ্কা হয় প্রাণে তার ? কি হইবে প্রভু ?"
বর্ষি রসনায় লক্ষ ভর্ৎসনাবচন,
কহেন শ্বেতাঙ্গ-পতি :—"অঙ্গচ্ছেদ অতি
সোজা কথা ; মজা ওতে আছে বহুবিধ।
উহাতে চীৎকার করা ভাবপ্রধানতা।
বৈজ্ঞানিক জাতি মোরা, শিখাব এবার,
থাকে প্রাণ, ধড়-মুণ্ড বিভক্ত করিলে।
যতটুকু যাবে কাটা, ঠিক ততখানি
এনে দিব অন্য দেহ হইতে কাটিয়া ;
সবগুলা হবে তাজা সমান সমান।
বঙ্গ হতে কাট বঙ্গ ;—প্রত্যঙ্গ ত সেটা।
কলিঙ্গ কিষ্কিন্ধ জুড়ি উৎকলের সাথে
কর নব-দেহ-সৃষ্টি। ভাষার একতা
অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপে হইবে সাধিত।"
"তথাস্তু" বলিয়া সবে, শির করি নত—
রত হল নব-বিধি করিতে প্রচার।
হুঙ্কারে মেদিনী কাটে। উঠিল রোদন-
বুদ্ধিহীন-বঙ্গমুখে, অঙ্গচ্ছেদভয়ে।

(রোদনধ্বনি।)

মাথাটা কাটা গেলে
বাঁচিব জানি খাটি
শোভিব নব ডালে,
দেহটা দিলে ছাঁটি।
মঙ্গল হবে খাসা,
বিশেষ আছে জানা ;
জঙ্গলে পাবে বাসা,
অঙ্গের ছুটো ডানা।
অবোধ মোরা ওগো,
কাঁদিয়া মরি তবু :

বঙ্গটা বঙ্গে রাখো
করুণা করি প্রভু।

তৃতীয় সর্গ।

(সিদ্ধি।)

—তূণকচ্ছন্দ—

অস্ত্র-হস্ত লাট, মস্ত বঙ্গ-অঙ্গ ছেদিবে।
সাধ্য কার আজি তার ন্যায্য-কার্য্য রোধিবে?
মন্ত্র-পূত লাট-দূত দেশ দেশ ধাইল;
ভেদমন্ত্র—বেদতন্ত্র—কণ্ঠ তার গাইল।
হর্ষ-নেত্র পাত্রমিত্র লম্ফঝম্ফ ঝাঁপিল।
ঘোর রোল গণ্ডগোল; বঙ্গখণ্ড কাঁপিল।
রাজ্যখণ্ড লণ্ডভণ্ড হৈল তায় দুঃখ কি?
খণ্ড-শূন্য স্বেদ-পূর্ণ রৈল লাট-বাক্যটি।
দেব সর্ব্ব লাট-গর্ব্ব হেরি পুষ্প বর্ষিল;
বঙ্গ-মুণ্ড দেহ-পিণ্ড ছাড়ি ভূমি পর্শিল।
স্তব্ধ বঙ্গ, কর্ম্ম সাঙ্গ; লাট ঘাড় নাড়িল।
তূণকের ছন্দ ঢের বর্ণনায় বাঁড়িল।

মাথাটা গেল যবে, ভাথে সবে
দেহটা ঠাণ্ডা!
কেহ বা ভাবে মনে সংগোপনে
গেছে বা প্রাণ্‌টা।
উড়ের মাথা জুড়ে দিল ধড়ে,
তবুও নড়ে না!
আসাম দিল খাসা লম্বা নাসা,
শ্বাস যে পড়ে না।
টিপিয়া নাড়ী তার ফেরেজার
কহেন লাটকে,
"আবার দেহটিতে পার দিতে
মাথাটা আট্‌কে?"

কহেন লাট যে সে কড়াভাষে :—
"কোরো না বিজ্‌বিজ্‌!
জুড়িয়া দিলে মাথা, রবে কোথা
আমার Prestige ?"

খণ্ড হ'ল বঙ্গদেশ,
খণ্ডকাব্য হ'ল শেষ ;
বঙ্গের মঙ্গল আজি সাধিল কর্জ্জন।
শ্রীবঙ্গমঙ্গল গায় বঙ্গবাসী জন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সার সত্যের আলোচনা।

সার সত্যের আলোচনা একপ্রকার সাগর-মন্থন। তাহার সংক্ষোভে একদিক্ হইতে অমৃত এবং আর-একদিক্ হইতে হলাহল, দুই দিক্ হইতে দুই মহাতেজস্বী বস্তু বাহির হইয়া পড়ে। দেবতারা হলাহলকে অমৃতের গুণে অমৃত করিয়া তোলেন; অসুরেরা অমৃতকে হলাহলের গুণে হলাহল করিয়া তোলে। অমৃতও যেমন, বিষও তেমনি, দুইই ভাল, দুইই মন্দ। সদ্‌ব্যবহারের হস্তে দুইই ভাল; অসদ্‌ব্যবহারের হস্তে দুইই মন্দ। বিষকে সোপান করিয়া অমৃতে উত্থান করা হইলে বিষের সদ্ব্যবহার করা হয়; এরূপস্থলে বিষ খুবই ভাল। পক্ষান্তরে, অমৃতকে সোপান করিয়া বিষে অবতরণ করা হইলে অমৃতের অসদ্ব্যবহার করা হয়; এরূপস্থলে অমৃত বিষেরই সহোদর। বিষ কি? না, দ্বন্দ্ব-কলহ —বিচ্ছেদ— এবং দুঃখ-তাপ। অমৃত কি? না শান্তি, ঐক্য এবং আনন্দ। এ তো গেল ভাবের কথা; কাজের কথা হ'চ্চে এই যে, বিষকে জয় করিয়া অমৃতকে লাভ করিতে হইবে, যুদ্ধবিগ্রহের মধ্য দিয়া শান্তিতে পৌঁছিতে হইবে, বিজ্ঞানময় কোষের মধ্য দিয়া আনন্দময় কোষে উত্থান করিতে হইবে।

বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্মশরীরের চরম সীমা-প্রদেশ। তাহার পরেই আনন্দময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষের অধীশ্বরী হ'চ্চেন বুদ্ধি।

বিগত প্রবন্ধে দেখানো হইয়াছে যে, বুদ্ধির প্রধান অঙ্গ দুইটি— সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞান। আর, সেই সঙ্গে এটাও দেখানো হইয়াছে যে, সামান্য-জ্ঞানে আত্ম-সত্তা প্রকাশ পায় এবং বিশেষ-জ্ঞানে বস্তুসত্তা প্রকাশ পায়। সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-

জ্ঞানের মধ্যে খুবই যুদ্ধ চলিতেছে—মান্ধাতার আমল হইতে যুদ্ধ চলিতেছে। আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা'র মধ্যেও তথৈবচ। দর্শন-রাজ্যে যতপ্রকার বিবাদ-কলহ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে—যেমন সামান্য-বিশেষের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আত্মসত্তা এবং বস্তুসত্তা'র মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয়ের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কার্য্য এবং কারণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কর্ত্তা এবং কর্ম্মের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এবংবিধ সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র গোড়া'র সূত্র হ'চ্চে বিজ্ঞানের ভেদবুদ্ধি। সেই ভেদবুদ্ধিকে জয় করিয়া আনন্দময় কোষের সামঞ্জস্য, শান্তি এবং আনন্দে সমুত্থান করিতে হইবে। ইহারই নাম বিষকে জয় করিয়া অমৃতে উত্থান করা।

ভেদবুদ্ধিটি সামান্যা নারী নহেন—তিনি বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষের সন্ধিস্থানে নির্নিদ্র-নয়নে পাহারা দিতেছেন। যাত্রী দ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি বলেন—"দাঁড়াও! কে তুমি—অদ্বৈতবাদী না দ্বৈতবাদী? সাকারবাদী না নিরাকারবাদী?" যাত্রী যদি বলে—"আমি অদ্বৈতবাদী," তবে তাহাকে তিনি অতলস্পর্শ সমুদ্র দেখাইয়া বলেন—"গলায় পাথর বাঁধিয়া ঐ ঠাঁই ঝাঁপ দেও!" যাত্রী যদি বলে—"আমি দ্বৈতবাদী," তবে দুই দিকের দুই প্রবল স্রোতের মধ্যবর্ত্তী ঘূর্ণাচক্র দেখাইয়া তাহাকে বলেন—"ঐখানে যাও!" যাত্রী যদি বলে—"আমি সাকারবাদী", তবে তাহাকে তিনি কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষাণ দেখাইয়া বলেন—"ঐখানে গিয়া মাথা খোঁড়ো!" যাত্রী যদি বলে—"আমি নিরাকারবাদী," তবে তাহাকে তিনি প্রজ্বলিত হুতাশন দেখাইয়া বলেন—"উহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া ধোঁয়া হইয়া আকাশে মিশিয়া যাও!" এ-বাদীই হউন্, ও-বাদীই হউন্, আর যে-বাদীই হউন্—ভেদবুদ্ধির বক্র-কটাক্ষে পড়িলে বাদি-প্রতিবাদী উভয়েরই প্রাণ-সংশয় উপস্থিত হয়। ভেদবুদ্ধির হস্তে সত্যবাদী ব্যতীত আর কোনো বাদীরই পরিত্রাণ নাই। যাত্রী যদি সত্যসত্যই অমৃত-নিকেতনের প্রয়াসী হ'ন, তবে তাঁহার কথা স্বতন্ত্র। তিনি বলেন—"অদ্বৈতবাদ কাহাকে বলিতেছ, তাহাও আমি জানি না; দ্বৈতবাদ কাহাকে বলিতেছ, তাহাও আমি জানি না—জানিতে চাহি-ও না; আমি এখানে বাদাবাদ করিতে আসি নাই—পথ ছাড়ো!" এই বলিয়া তিনি ভেদবুদ্ধিকে পশ্চাতে ঠেলিয়া-ফেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হ'ন, আর, তৎক্ষণাৎ তাঁহার জন্য অমৃত-নিকেতনের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়।

পাশ্চাত্য-পণ্ডিত-মহলে সামান্য-জ্ঞান এবং বিশেষ-জ্ঞানের মধ্যে যুঝাযুঝি আরম্ভ হইয়াছে কখন্ হইতে? বিজ্ঞান-সূর্য্যোদয়ের বহুপূর্ব্বে সারা-ইউরোপ যে সময়ে মধ্যমাব্দের তামসী রজনীতে নিমগ্ন ছিল, সেই সময় হইতে। তখনকার কাল ছিল মঠধারী সন্ন্যাসী পণ্ডিতগণের প্রাদুর্ভাব-কাল। সেই সময়ে, সামান্য-জ্ঞান বিশেষ-জ্ঞানকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া-দিয়া বলপূর্ব্বক সিংহাসনে চড়িয়া বসিল।

সামান্য-জ্ঞানের বিষয়গুলা আবছায়া-রকমের পদার্থ। দেখিলে মনে হয়, একপ্রকার ভূতের নাচ। সেগুলা নির্বিশেষ-শ্রেণীর বস্তু—ফাঁকা বস্তু—বা ফক্কিকা। যেমন—সাধারণ

বৃক্ষ। বটবৃক্ষ নহে, অশ্বত্থবৃক্ষ নহে, ওষধি নহে, বনস্পতি নহে, কোনোপ্রকার বিশেষ বৃক্ষ নহে; অথচ বৃক্ষ! সাধারণ বৃক্ষ! নির্বিশেষ বৃক্ষ! পাশ্চাত্য মধ্যমাব্দের একদল পণ্ডিত বলিতেন যে, বিশেষ বিশেষ বৃক্ষ যেমন বাস্তবিক পদার্থ, নির্বিশেষ বৃক্ষও ঠিক্ তেম্নি-তরো একটা বাস্তবিক পদার্থ; ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল—বস্তুবাদী Realist। আর-একদল পণ্ডিত বলিতেন—নির্বিশেষ বৃক্ষ একটা মানসিক ভাবমাত্র, তা বই তাহা দৃশ্যমান বৃক্ষের ন্যায় বাস্তবিক পদার্থ নহে; ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল ভাববাদী conceptualist। তৃতীয় আর-একদল পণ্ডিত বলিতেন—নির্বিশেষ বৃক্ষ দৃশ্যমান বৃক্ষের ন্যায় বাস্তবিক পদার্থও নহে, মনঃকল্পিত আম্রবৃক্ষের ন্যায় মানসিক ভাবও নহে। নির্বিশেষ বৃক্ষ শুধুই-কেবল একটা নাম। ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক নাম ছিল নামবাদী। তিনদল পণ্ডিত পরস্পরের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধিয়া যুদ্ধে দাঁড়াইলেন—

(১) বস্তুবাদীর দল,
(২) ভাববাদীর দল,
(৩) নামবাদীর দল।

সামান্য-জ্ঞানের রাজ্যমধ্যে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়া রাজ্য ছারখার হইতে লাগিল। যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল! বিশেষ-জ্ঞান সামান্য-জ্ঞানের সহোদর ভ্রাতা। সামান্য-জ্ঞান আপনার সেই ভ্রাতাটিকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে! এ পাপের ফল হাতে-হাতে ফলিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? সামান্য-জ্ঞানের রাজ্য যখন রসাতলে যাইবার উপক্রম হইতেছে, সেই মুখ্য সময়টিতে বেকন্ জন্মগ্রহণ করিলেন। বেকন্ বিশেষ-জ্ঞানকে জিতাইয়া দিলেন। বেকনের লেখনীর চোটে ক্ষতবিক্ষত হইয়া সামান্য-জ্ঞান বেকনের শরণ যাচ্ঞা করিলেন। বেকন্ দুই ভ্রাতাকে ডাকিয়া আপনাদের মধ্যে রাজ্য আধাআধি ভাগ করিয়া লইবার ব্যবস্থা দিলেন। বিশেষ-জ্ঞানের ভাগে পড়িল ব্যাবহারিক সত্য; সামান্য-জ্ঞানের ভাগে পড়িল পারমার্থিক সত্য। দুই ভ্রাতার দুই পৃথক্ রাজ্য হইল বটে, কিন্তু দুই রাজ্যের সীমা-নির্দেশ লইয়া দোঁহার মধ্যে বিবাদ বাড়িল বই কমিল না। সজ্জনশ্রেষ্ঠ কাণ্ট্ দুই রণোন্মত্ত ভ্রাতার মাঝখানে পড়িয়া বিবাদ মিটাইতে গেলেন; লাভের মধ্যে হইল কেবল—দুই দিক্ হইতে খোঁচাখুঁচি পাইয়া বিবাদা-নলের চতুর্গুণ প্রজ্বলন। একা-বীর কাণ্ট্ কি করিবেন! তাঁহার দোষ নাই! তিনি ছিলেন হাড়ে-হাড়ে সত্যপ্রিয়—বিবাদপ্রিয় আদবেই না। তিনি দেখিলেন যে, আসলে দুই দলের মধ্যে বিবাদের কোনো কারণ নাই। দেখিলেন যে, একই সত্যের একদল পণ্ডিত দেখিতেছেন এ-পৃষ্ঠ, আর-একদল পণ্ডিত দেখিতেছেন ও-পৃষ্ঠ। ভারতবাসী হিমালয়ের দক্ষিণ-পৃষ্ঠের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিতেছে, ইহাই হিমালয়; তিব্বত-বাসী হিমালয়ের উত্তর-পৃষ্ঠের প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিয়া বলিতেছে, ইহাই হিমালয়। কিন্তু হিমালয়ের দুই পৃষ্ঠ কিছু-আর দুই হিমালয় নহে। হিমালয়ের দুই পৃষ্ঠ একই হিমালয়ের দুই পৃষ্ঠ। হইলে হইবে কি—সারা-ইউরোপ ভেদবুদ্ধির প্রধান অট্টালা-স্থান। একা-রথী কাণ্ট্ ক-দিক্ সাম্লাই-

বেন ? দেবানুগ্রহে কাণ্টের মনোমধ্যে অভেদ-জ্ঞানের অঙ্কুর গজাইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা বাড়িতে পাইল না। চারিদিকের ভেদবুদ্ধির কাঁটা-বনের পাল্লায় পড়িয়া তাহা মাথা তুলিতে-না-তুলিতেই কণ্টকাঘাতে মুস্‌ড়িয়া পড়িল। কাণ্টের আসল ভিতরের কথাটি যে কি, তাহা তিনি নিজেই বলিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—Thoughts without contents are empty, intuitions without concepts are blind। ইহাতে প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে যে, বিশেষ-জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্য-জ্ঞান ফাঁকা, তথৈব, সামান্য-জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ-জ্ঞান অন্ধ। পাতঞ্জল-যোগশাস্ত্রে প্রজ্ঞার একটা বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে ঋতম্ভরা। সত্য-ভরা জ্ঞানই জ্ঞান ; তা বই, ফাঁকা-জ্ঞানও যেমন, অন্ধ-জ্ঞানও তেমনি,—দুইই অজ্ঞানেরই নামান্তর। তবেই হইতেছে যে, বিশেষ-জ্ঞান ব্যতিরেকে সামান্য-জ্ঞান জ্ঞানই নহে ; তথৈব, সামান্য-জ্ঞান ব্যতিরেকে বিশেষ-জ্ঞান জ্ঞানই নহে। কাণ্ট্ এটা বেশ্ বুঝিয়াছিলেন যে, কাগচের যেমন দুই পৃষ্ঠ—জ্ঞানেরও তেমনি দুই পৃষ্ঠ। একপিট-ওয়ালা কাগচও অসম্ভব, একপিট-ওয়ালা জ্ঞানও অসম্ভব। কিন্তু হইলে হইবে কি— কাণ্টের মনোমধ্যে যখনি অভেদজ্ঞান মাথা তুলিয়াছে, তাহার পরক্ষণেই ভেদবুদ্ধির শিলাবৃষ্টিতে তাহা ধরাবলুণ্ঠিত হইয়াছে। তার সাক্ষী—

অভেদ-জ্ঞানের উন্মেষ।

"The understanding cannot see, the senses cannot think ; by their union only can knowledge be produced.—বুদ্ধি প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয় চিন্তা করিতে পারে না ; দুয়ের ঐক্যসূত্রেই জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভবে।

ভেদবুদ্ধির আক্রমণ।

But this is no reason for confounding the share which belongs to each in the production of knowledge. On the contrary, they should always be carefully separated and distinguished.—জ্ঞান যদিচ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি দুয়ের সংযোগাত্মক ঐক্যের উপরে ভর করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, কিন্তু তা বলিয়া দোঁহার (অর্থাৎ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির) দুই পৃথক্ শ্রেণীর কার্য্যকারিতা'কে একসঙ্গে জড়াইয়া খিচুড়ি পাকাইবার কোনো কারণ নাই, পরন্তু জ্ঞানের উৎপাদনে কাহার কিরূপ কার্য্যকারিতা, তাহা পৃথক্ করিয়া অবধারণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।

বলা বাহুল্য যে, কাণ্ট্ শেষোক্তপ্রকার অসাধ্যসাধনে অর্থাৎ দুয়ের দুইতরো কার্য্যকারিতার পার্থক্য-সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কেমন করিয়াই বা পারিবেন ? তিনি তো আর সিদ্ধপুরুষ নহেন। এ কথা খুবই ঠিক্ যে, দুই হাত নহিলে তালি বাজে না ; কিন্তু সেই তালির উৎপাদনে দুই হাতের কাহার কিরূপ কার্য্যকারিতা, তাহা তালিধ্বনির মধ্য হইতে খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কঠিন। কাণ্ট্ বলিয়াছেন—জ্ঞানের মূল উপাদান দুই ভাগে বিভক্ত—দেশকালের বৈচিত্র্য এবং সংবিতের যোগপ্রধান একত্ব Synthetic unity of apperception। তাহার মধ্যে দেশকালের বৈচিত্র্য ইন্দ্রিয়ের

দেওয়া, আর, সেই বৈচিত্র্যের মধ্যে যে এক নিরবচ্ছিন্ন যোগসূত্র বিতত হইয়া সংবিতের একত্ব প্রতিপাদন করে, সেই যোগসূত্রটা বুদ্ধির দেওয়া। কাণ্ট্ দেশকালের বৈচিত্র্যকে ইন্দ্রিয়ের ফাটকে আটক করিয়া রাখিবার মানসে সেই প্রবল অশ্বটাকে বুদ্ধিক্ষেত্র হইতে বলপূর্ব্বক টানিয়া রাখিতে কত-না চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু দুর্দান্ত অশ্বটা কিছুতেই বাগ মানিল না। কাণ্টের অভিপ্রায়-মতে দেশকাল গোড়ায় ছিল form of the senses ইন্দ্রিয়ের গ্রহণ-ক্ষেত্র, চরমে হইল pure intuition বুদ্ধি-বৃত্তির অধ্যবসায়-ক্ষেত্র। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কাণ্ট্ ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির মধ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর সংস্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন যথেষ্ট —কিন্তু তাহাতে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এই এই স্থলে কাণ্ট্ ভেদ-বুদ্ধির পক্ষ গ্রহণ করিয়া অভেদজ্ঞানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন; আর, সেই দোষেই অন্যান্য স্থলে তিনি ভেদবুদ্ধিকে পরাজয় করিয়া প্রকৃত সত্যে পৌঁছিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অভীষ্টফলে বঞ্চিত হইয়াছেন।

ভেদবুদ্ধি ভাল বই মন্দ নহে; কেন না, গোড়ায় তাহা আবশ্যক। কিন্তু তাহা যে-ক্ষেত্রে যে-পরিমাণে আবশ্যক, সেই ক্ষেত্রে সেই পরিমাণে ভাল, তাহার অধিক পরিমাণে ভাল নহে। তা ছাড়া, তাহা গোড়ায় ভাল, কিন্তু চরমে ভাল নহে। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করিয়া অভেদ-জ্ঞানে উত্থান করিতে হইবে—এটা যখন স্থির, তখন কাজেই সোপানের ব্যবস্থা-পারিপাট্যের জন্য ভেদবুদ্ধি খুবই ভাল। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করা ভাল, কিন্তু গম্যস্থান করা ভাল নহে। ভেদবুদ্ধিকে সোপান করিয়া বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগ বা কলকারখানার যুগ বা কলীয় যুগ বা কলিযুগ এ-যাবৎ-কাল উন্নতি-লাভ করিয়া আসিয়াছে; এক্ষণে, ভেদ-বুদ্ধিকে গম্যস্থান করিয়া দুর্গতির দিকে পদ-নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অধুনা-তন সুসভ্যম্মন্য সমাজে উচ্চ-নীচের প্রভেদ, ধনি-দরিদ্রের প্রভেদ, পণ্ডিত-মূর্খের প্রভেদ, আধ্যাত্মিক-আধিভৌতিকের প্রভেদ, মাত্রা ছাড়াইয়া সপ্তমে উঠিয়াছে। এ প্রভেদ মিথ্যা এবং কৃত্রিমতার বালির বাঁধের উপরে নির্লজ্জভাবে মাথা উঁচা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ-সভ্যতা গিয়াছে, ক্ষত্রিয়-সভ্যতা (chivalric সভ্যতা) গিয়াছে, এক্ষণে আসিয়াছে বৈশ্য-সভ্যতা (Mercantile সভ্যতা)। ইহার পরে হয় তো আসিবে শূদ্র-সভ্যতা—সেই পামরিণী সভ্যতা, যাহার মূল মন্ত্র হ'চ্চে শক্তের দাসত্ব এবং অশক্তের উপরে প্রভুত্ব। তাহার পরে পূর্ব্বদিকে যখন ব্রাহ্মণ-সভ্যতার অরুণ-জ্যোতি দেখা দিবে, তখন কলির রাত্রি পোহাইবে—ইহা বিধির লিখন। বলিলাম "ব্রাহ্মণ-সভ্যতা"। পাঠক হয় তো মনে করিবেন যে, মনুর আমলের সভ্যতা'র প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাহাকেই বল হইতেছে ব্রাহ্মণ-সভ্যতা। পাঠক আমাকে ক্ষমা করিবেন—মূলেই না। মনুর সময়ে ব্রাহ্মণ-সভ্যতার অন্তিমদশা ঘনাইয়া আসিয়া-ছিল, তাহা অব্রাহ্মণোচিত বিধানব্যবস্থাতেই সপ্রকাশ। শূদ্রের প্রতি মর্ম্মান্তিক বিদ্বেষ ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ নহে। শূদ্রের কর্ণে বেদ-

মন্ত্র প্রবেশ করিলে দ্রবীভূত তপ্ত সীসা দিয়া কর্ণে ছিপি আঁটিয়া-দেওয়া দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজার বিধান হইতে পারে—কিন্তু তাহা ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান হইতে পারে না। যখন সরস্বতীনদীর মুখে অবগুণ্ঠন ছিল না—যখন জাতিভেদ রাজশাসনের আজ্ঞাধীন ছিল না যখন পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞান অদ্বৈতবাদ-দ্বৈতবাদ, সাকারবাদ-নিরাকার-বাদ প্রভৃতি বাদাবাদ এবং মতামতের সংগ্রাম-ক্ষেত্র ছিল না, পরন্তু সর্ব্বলোকের মঙ্গল-কামনার উৎস ছিল—সেই সময়ে যে এক দেবস্পৃহণীয় সভ্যতা ব্রহ্মাবর্ত্তের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহারই প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমি বলিতেছি যে, রাত্রি পোহাইবার সময় পূর্ব্বে তাহা উদয়াচলে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, এবং রাত্রি পোহাইলে আবার তাহা উদয়াচলে অভ্যুত্থান করিবে।

এখনকার কালের রাক্ষসী সভ্যতা ভেদ-বুদ্ধির বালির বাঁধের উপরে প্রতিষ্ঠিত। এ সভ্যতা কল-কারখানার সভ্যতা; দয়া-ধর্ম্মের সভ্যতা নহে, মনুষ্যত্বের সভ্যতা নহে। ভেদবুদ্ধি সোপানমাত্র; তা বই, তাহা গম্যস্থান নহে। অভেদ-জ্ঞানই গম্যস্থান। কিন্তু ভেদবুদ্ধি এক্ষণে সোপান হইয়াই সন্তোষ মানিতেছে না; ভেদবুদ্ধি এক্ষণে আপনাকে গম্যস্থান এবং আদর্শ করিয়া দাঁড় করাইতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে; মরিবার পূর্ব্বে মরণ-কামড় দিবার জন্য বিকট দশন বাহির করিতেছে। সর্ব্বনাশকের দলবল (Nihilistএর দলবল) গোকুলে বাড়িতেছে। এ সভ্যতা মায়াচন্দ্রাক্ষসের মাতা মরীচিকা; বৈদ্যুতী তন্ত্রী মায়ামৃগ; রেলগাড়ি পুষ্পক-বিমান। প্রকৃত সভ্যতা হ'চ্চেন মনুষ্যত্ব-রূপিণী সীতাদেবী। সে সীতাদেবী এক্ষণে কোথায়? তাঁহার পরিত্যক্ত অলঙ্কার ভারতের পর্ব্বতে-প্রান্তরে, অরণ্যে-নগরে, গ্রামে-পল্লীতে ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। রেলগাড়িতে চড়িয়া দ্রুতগমনের জন্য অথবা বৈদ্যুত আলোকে রাত্রিকে দিন করিবার জন্য কিছু-আর মনুষ্য সৃষ্ট হয় নাই! মনুষ্যের মনুষ্যত্ব যদি গেল; দয়াধর্ম্ম গেল—সত্য গেল—ন্যায় গেল—ক্ষমা গেল; অর্থলোলুপত্ব এবং নীচত্ব যদি সভ্যতার আদর্শ-পদবীতে নিশান তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতে লজ্জিত না হইল; তবে বৈদ্যুতী তন্ত্রীতেই বা কি হইবে, রেল-গাড়িতেই বা কি হইবে! সংবাদপত্র-সহস্রের মিথ্যা-গর্ব্বোক্তি রাক্ষসী সভ্যতাকে দৈবী সভ্যতা করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে—Devilizationকে Civilization করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে; কিন্তু তাহা করিয়া লাভ কি? সত্য কি এতই লঘু-সামগ্রী যে, তাহা সংবাদপত্রের উদ্গীরিত মিথ্যার ঝঞ্ঝা-বায়ুতে উড়িয়া যাইবে?

প্রকৃত কথা যাহা বক্তব্য, তাহা এই—ভেদবুদ্ধি খুবই ভাল যদি তাহা সোপান হইয়াই ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু যদি তাহা গম্য-স্থানের উচ্চশিখরে দাঁড়াইয়া আপনাকে আদর্শরূপে প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করে, তবে তাহা ভয়ানক কালকূট। প্রসঙ্গক্রমে এবারে কতকগুলা মনের আক্ষেপ লেখনার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। বারান্তরে সূক্ষ্মশরীর হইতে কারণশরীরে—বিজ্ঞানময় কোষ হইতে আনন্দময় কোষে প্রয়াণ করি-বার পন্থা অন্বেষণ করা যাইবে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

জননী-জীবন।—শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৷৵০ দশ আনা মাত্র।

অসাধারণ মানবচরিত্রজ্ঞ নেপোলিয়ন বলিতেন, ফ্রান্সের মঙ্গল ও গৌরবের জন্ত সুমাতার ন্যায় প্রয়োজনীয় আর কিছুই নহে। শুধু ফ্রান্স বলিয়া কেন, সকল দেশ, সকল সমাজের সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। শৈশবের শিক্ষা মাতার উপরই নির্ভর করে, এবং শৈশবের শিক্ষাই সকল শিক্ষার মূল। সেই সময়ে যে বীজ উপ্ত হয়, তাহার ফল জীবনব্যাপী, জীবনান্তস্থায়ী। সুতরাং সমাজমাত্রেরই মঙ্গলের জন্ত সু-জননীর যেমন প্রয়োজন, এমন প্রয়োজন আর কিছুরই নহে। কেমন করিয়া সুমাতা হইতে হয়, কেমন করিয়া শিশুপালন করিতে হয়, কোন্ কোন্ বিষয়ে সতত সাবধান হইতে হয়, স্নেহাধিক্যবশত জননীগণ কি কি ভুল সচরাচর করিয়া থাকেন, এই সকল এবং এইরূপ বিষয়ের অনেক সদুপদেশ এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সুতরাং পুস্তকখানি যে স্ত্রীলোকমাত্রেরই পাঠ্য, এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে। ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল, কিন্তু কতকটা শিথিলতা পরিদৃষ্ট হয়। তবে, এমনও হইতে পারে যে, পুস্তকখানি স্ত্রীলোকদিগের জন্ত লিখিত বলিয়া খানিকটা অনাবশ্যক বিস্তার গ্রন্থকার প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন।

দুই-এক-স্থলে অসঙ্গতিদোষ দৃষ্ট হয়।

"কমলের মধু খেয়ে মন যার ভুলে।
সে কি আর উড়ে যায় শিমুলের ফুলে?"

এইপ্রকার পুস্তকে এ-রকম কবিতা সাজে না। গ্রন্থকার যে হিসাবে ইহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কবিতার অর্থ তাহা নহে।

অশ্রুধারা। শ্রীঅনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৷৵০ ছয় আনা মাত্র।

কেহ কেহ জীবিতাবস্থাতেই নিজের সমাধি-প্রস্তর-লিপি লিখিয়া রাখেন। পত্নী জীবিত থাকিতেই তাঁহার তিরোভাব কল্পনা করিয়া অনুকূলবাবু বিরহের কান্নাটা কাঁদিয়া রাখিলেন। অবশ্যকরণীয় কাজ বেলাবেলি সারিয়া রাখাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কি জানি, যদি অতঃপর তেমন সুযোগ না-ই ঘটে। অনুকূলবাবু যে দূরদর্শী, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

'গ্রন্থকারের নিবেদনে' প্রকাশ, তাঁহার কোন বন্ধু এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহাকে পুস্তক প্রকাশের জন্য অনুরোধ করিয়া বলেন—"আপনার গৃহলক্ষ্মী আপনার গৃহে এখনও সশরীরে বিরাজমানা। ঈশ্বর না করুন, তিনি যদি আপনার পূর্ব্বে পরলোকগমন করেন, তাহা হইলে আপনি তাঁহার নিমিত্ত কিরূপ অশ্রুধারা বর্ষণ করিবেন, তিনি জীবিত অবস্থায় তাহা জানিতে পারিয়া আপনার আদরের মাত্রা বাড়াইয়া দিবেন।" আহা, তাই হোক্! গ্রন্থরচনার ইহার অধিক সফলতা আর কি হইতে পারে?

পুস্তকের ভাষা উচ্ছ্বাসের ভাষা বটে; তবে এস্থলে বিরহটা নাকি প্রকৃত নহে, কাল্পনিক, তাই এমন সাধের উচ্ছ্বাসেও কৃত্রিমতা লক্ষিত হয়—যেন টানিয়া বুনিতে হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন।

নৌকাডুবি।

৩০

শ্রান্তির মধ্যে পরের দিন কমলার দিবসারম্ভ হইল। সেদিন তাহার চক্ষে সূর্য্যের আলোক ক্লান্ত, নদীর ধারা ক্লান্ত, তীরের তরুগুলি বহুদূরপথের পথিকের মত ক্লান্ত।

উমেশ যখন তাহার কাজে সহায়তা করিতে আসিল, কমলা শ্রান্তকণ্ঠে কহিল, "যা উমেশ, আমাকে আজ আর বিরক্ত করিস্ নে!"

উমেশ অল্পে ক্ষান্ত হইবার ছেলে নহে। সে কহিল, "বিরক্ত করিব কেন মা, বাটনা বাটিতে আসিয়াছি।"

সকালবেলা রমেশ কমলার চোখ-মুখের ভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "কমলা, তোমার কি অসুখ করিয়াছে?"

এরূপ প্রশ্ন যে কতখানি অনাবশ্যক ও অসঙ্গত, কমলা কেবল তাহা একবার প্রবল গ্রীবা-আন্দোলনের দ্বারা নিরুত্তরে প্রকাশ করিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

রমেশ বুঝিল, সমস্যা ক্রমশ প্রতিদিনই কঠিন হইয়া আসিতেছে। অতিশীঘ্রই ইহার একটা শেষ মীমাংসা হওয়া আবশ্যক। হেমনলিনীর সঙ্গে একবার স্পষ্ট বোঝাপড়া হইয়া গেলে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ সহজ হইবে, ইহা রমেশ মনে মনে আলোচনা করিয়া দেখিল। কিন্তু রমেশের নিকট এখন তাহাদের বাড়ীর দ্বার রুদ্ধ। সে বাড়ীর প্রবেশ-দ্বারে উদ্ধতস্বভাব যোগেনের সঙ্গে একটা প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা ও অপমানের সম্ভাবনা মনে পড়িলে রমেশের সমস্ত চিত্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বিশেষত রমেশ কল্পনা করিয়া লইয়াছে, সে বাড়ীতে এখন তাহার স্বপক্ষে কেহই নাই—থাকিবার কথাও নয়—রমেশের ব্যবহারে সন্দেহ না করিবে, এমন আশা শিশুর কাছেও করা যায় না। এমন জায়গায় সমস্ত বিরোধের মুখে নিজের জোরে অসঙ্কোচে গিয়া দাঁড়াইবে, রমেশের সেরূপ প্রকৃতিই নয়।

তাই সে হেমনলিনীকে যে চিঠি লিখিয়াছিল, সেখানা আর একবার পড়িয়া দেখিল। পছন্দ হইল না—ইহার মধ্যে জোর নাই—হতাশের হাল ছাড়িয়া দিবার ভাবেই লেখা। রমেশ যখন নিরপরাধ, তখন হেমনলিনীর তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে—ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। এ বিশ্বাস পাইবার যখন তাহার অধিকার আছে, তখন

সমস্ত বিরোধের, সমস্ত প্রতিকূল প্রমাণের মুখে তাহাকে এ বিশ্বাস যুদ্ধ করিয়া জয় করিয়া লইতে হইবে। হেমনলিনী যদি তাহাকে ভাল না বাসে, না বাসুক্; যদি ইতিমধ্যে তাহাকে সন্দেহ করিয়া, ঘৃণা করিয়া হেমনলিনী আর কাহারো সহিত বিবাহের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া থাকে, তা হউক্; কিন্তু একবার তাহাকে সব কথা শুনিতেই হইবে, তাহাকে বিশ্বাস করিতেই হইবে, তাহার পরে দুইজনে যে যাহার আপন আপন পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে।

এই বলিয়া রমেশ আবার চিঠি লিখিতে বসিল। একবার লিখিতেছে, একবার কাটিতেছে, এমন-সময়—"মহাশয়, আপনার নাম?"—শুনিয়া চম্‌কিয়া মুখ তুলিল। দেখিল, একটি প্রৌঢ়বয়স্ক ভদ্রলোক, পাকা গোঁফ, ও মাথার সাম্‌নের দিক্‌টায় পাৎলা চুলে টাকের আভাস লইয়া সম্মুখে উপস্থিত। রমেশের একান্ত নিবিষ্ট চিত্তের মনোযোগ চিঠির চিন্তা হইতে অকস্মাৎ উৎপাটিত হইয়া ক্ষণকালের জন্য বিভ্রান্ত হইয়া রহিল।

"আপনি ব্রাহ্মণ? নমস্কার। আপনার নাম রমেশবাবু—সে আমি পূর্ব্বেই খবর লইয়াছি—তবু দেখুন্, আমাদের দেশে নাম-জিজ্ঞাসাটা পরিচয়ের একটা প্রণালী। ওটা ভদ্রতা। আজকাল কেহ কেহ ইহাতে রাগ করেন। আপনি যদি রাগ করিয়া থাকেন ত শোধ তুলুন! আমাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি নিজের নাম বলিব, বাপের নাম বলিব, পিতামহের নাম বলিতে আপত্তি করিব না!"

রমেশ হাসিয়া কহিল—"আমার রাগ এত বেশি ভয়ঙ্কর নয়, আপনার একলার নাম পাইলেই আমি খুসি হইব।"

"আমার নাম ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী। পশ্চিমে সকলেই আমাকে 'খুড়ো' বলিয়া জানে। আপনি ত হিস্‌ট্রি পড়িয়াছেন? ভারতবর্ষে ভরত ছিলেন চক্রবর্ত্তী রাজা—আমি তেম্‌নি সমস্ত পশ্চিমমুল্লুকের চক্রবর্ত্তী খুড়ো। যখন পশ্চিমে যাইতেছেন, তখন আমার পরিচয় আপনার অগোচর থাকিবে না। কিন্তু মশায়ের কোথায় যাওয়া হইতেছে?"

রমেশ কহিল—"এখনো ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।"

ত্রৈলোক্য। আপনার ঠিক করিয়া উঠিতে বিলম্ব হয়, কিন্তু জাহাজে উঠিতে ত দেরি সহে নাই।"

রমেশ কহিল—"একদিন গোয়ালন্দে নামিয়া দেখিলাম, জাহাজে বাঁশী দিয়াছে। তখন এটা বেশ বোঝা গেল, আমার মন স্থির করিতে যদি-বা দেরি থাকে, কিন্তু জাহাজ ছাড়িতে দেরি নাই। সুতরাং যেটা তাড়াতাড়ির কাজ, সেইটেই তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিলাম।"

ত্রৈলোক্য। নমস্কার মহাশয়! আপনার প্রতি আমার ভক্তি হইতেছে। আমাদের সঙ্গে আপনার অনেক প্রভেদ। আমরা আগে মতি স্থির করি, তাহার পরে জাহাজে চড়ি—কারণ আমরা অত্যন্ত ভীরুস্বভাব। আপনি যাইবেন, এটা স্থির করিয়াছেন, অথচ কোথায় যাইবেন, কিছুই স্থির করেন নাই, এ কি কম কথা! পরিবার সঙ্গেই আছেন?

'হাঁ' বলিয়া এ প্রশ্নের উত্তর দিতে রমেশের মুহূর্ত্তকালের জন্য খট্‌কা বাধিল। তাহাকে নীরব দেখিয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"আমাকে মাপ করিবেন—পরিবার সঙ্গে আছেন, সে খবরটা আমি বিশ্বস্তসূত্রে পূর্ব্বেই জানিয়াছি। বৌমা ঐ ঘরটাতে রাঁধিতেছেন, আমিও পেটের দায়ে রান্নাঘরের সন্ধানে সেইখানে গিয়া উপস্থিত। বৌমাকে বলিলাম, 'মা, আমাকে দেখিয়া সঙ্কোচ করিয়ো না—আমি পশ্চিমমুল্লুকের একমাত্র চক্রবর্ত্তি-খুড়ো।' আহা, মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা।' আমি আবার কহিলাম, 'মা, রান্নাঘরটি যখন দখল করিয়াছ, তখন অন্ন হইতে বঞ্চিত করিলে চলিবে না, আমি নিরুপায়।' মা একটুখানি মধুর হাসিলেন, বুঝিলাম প্রসন্ন হইয়াছেন, আজ আর আমার ভাবনা নাই। পাজিতে শুভক্ষণ দেখিয়া প্রতিবারই ত বাহির হই, কিন্তু এমন সৌভাগ্য ফিবারে ঘটে না। আপনি কাজে আছেন, আপনাকে আর বিরক্ত করিব না। যদি অনুমতি করেন ত বৌমাকে একটু সাহায্য করি। আমরা উপস্থিত থাকিতে তিনি পদ্মহস্তে বেড়ি ধরিবেন কেন? না না, আপনি লিখুন—আপনাকে উঠিতে হইবে না। আমি বুড়োমানুষ, আমি পরিচয় করিয়া লইতে জানি।"

এই বলিয়া চক্রবর্ত্তি-খুড়া বিদায় হইয়া রান্নাঘরের দিকে গেলেন। গিয়াই কহিলেন, "চমৎকার গন্ধ বাহির হইয়াছে—ঘণ্টটা যা হইবে, তা মুখে তুলিবার পূর্ব্বেই বুঝা যাইতেছে। কিন্তু অম্বলটা আমি রাঁধিব মা—পশ্চিমের গরমে যাহারা বাস না করে, অম্বলটা তাহারা ঠিক দরদ দিয়া রাঁধিতে পারে না! তুমি ভাবিতেছ—বুড়াটা বলে কি—তেঁতুল নাই, অম্বল রাঁধিব কি দিয়া? কিন্তু আমি উপস্থিত থাকিতে তেঁতুলের ভাবনা তোমাকে ভাবিতে হইবে না। একটু সবুর কর, আমি সমস্ত জোগাড় করিয়া আনিতেছি।"

বলিয়া চক্রবর্ত্তী কাগজে-মোড়া একটা ভাঁড়ে কাসুন্দি আনিয়া উপস্থিত করিলেন। কহিলেন, "আমি অম্বল যা রাঁধিব, তা আজকের মত খাইয়া বাকিটা তুলিয়া রাখিতে হইবে, মজিতে ঠিক চারদিন লাগিবে। তার পরে একটুখানি মুখে তুলিয়া দিলেই বুঝিতে পারিবে, চক্রবর্ত্তি খুড়ো দেমাকও করে বটে, কিন্তু অম্বলও রাঁধে। যাও মা, এবার যাও, মুখহাত ধুইয়া লওগে! বেলা অনেক হইয়াছে। রান্না বাকি যা আছে, আমি শেষ করিয়া দিতেছি। আগুনের তা'তে মা'র মুখ যে একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। কিছু সঙ্কোচ করিয়ো না—আমার এ সমস্ত অভ্যাস আছে মা—আমার পরিবারের শরীর বরাবর কাহিল—তাঁহারই অরুচি সারাইবার জন্য অম্বল রাঁধিয়া আমার হাত পাকিয়া গেছে। বুড়ার কথা শুনিয়া হাসিতেছ—কিন্তু ঠাট্টা নয় মা, এ সত্য কথা!"

কমলা হাসিমুখে কহিল, "আমি আপনার কাছ থেকে অম্বল-রাঁধা শিখিব।"

চক্রবর্ত্তী। ওরে বাস্‌রে! বিদ্যা কি এত সহজে দেওয়া যায়! একদিনেই শিখাইয়া বিদ্যার গুমর যদি নষ্ট করি, তবে বীণাপাণি অপ্রসন্ন হইবেন। দুচারদিন এ বৃদ্ধকে খোসামোদ করিতে হইবে। আমাকে কি করিয়া খুসি করিতে হয়, সে তোমাকে

ভাবিয়া বাহির করিতে হইবে না—আমি নিজে সমস্ত বিস্তারিত বলিয়া দিব। প্রথম দফায় আমি পানটা কিছু বেশি খাই, কিন্তু সুপারি গোটা-গোটা থাকিলে চলিবে না। আমাকে বশীভূত করা সহজ ব্যাপার না—কিন্তু মার ঐ হাসি-মুখখানিতে কাজ অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। আহা, এমন হাসি ত আমি কোথাও দেখি নাই! ওরে, তোর নাম কিরে!"

উমেশ উত্তর দিল না। সে রাগিয়াছিল—তাহার মনে হইতেছিল, কমলার স্নেহ-রাজ্যে বৃদ্ধ যেন তাহার সরিক হইয়া-আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কমলা তাহাকে মৌন দেখিয়া কহিল, "ওর নাম উমেশ।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "এ ছোকরাটি বেশ ভাল। একদমে ইহার মন পাওয়া যায় না, তাহা স্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু দেখো মা, আমি তোমাকে লিখিয়া-পড়িয়া দিতে পারি, এর সঙ্গে আমার বনিবে। কিন্তু আর বেলা করিয়ো না, আমার রান্না হইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না।"

কমলা যে একটা শূন্যতা অনুভব করিতেছিল, এই বৃদ্ধকে পাইয়া তাহা ভুলিয়া গেল। তাহার প্রথম পরিচয়ের কুণ্ঠিত স্মিতহাস্য দেখিতে দেখিতে সকৌতুক কলহাস্যে পরিণত হইল।

রমেশও এই বৃদ্ধের আগমনে এখনকার মত কতকটা নিশ্চিন্ত হইল। সে বুঝিয়াছিল, কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধটা কমলার কাছেও প্রহেলিকা হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও কমলা সংসারে অনভিজ্ঞ, তবুও রমেশের ব্যবহারে সে একটা-কি বেতাল-বেসুর অনুভব করিতেছিল—এমন অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে একটা সহজভাব রক্ষা করা উত্তরোত্তর দুরূহ হইয়া উঠে। প্রথম কয়মাস যখন রমেশ কমলাকে আপনার স্ত্রী বলিয়াই জানিত, তখন তাহার আচরণ, তখন পরস্পরের বাধা-বিহীন নিকটবর্ত্তিতা এখনকার হইতে এতই তফাৎ যে, এই হঠাৎ প্রভেদ বালিকার মনকে আঘাত না করিয়া থাকিতে পারে না। এমন সময়ে এই চক্রবর্ত্তী আসিয়া রমেশের দিক্ হইতে কমলার চিন্তাকে যদি খানিকটা বিক্ষিপ্ত করিতে পারে, তবে রমেশ আপনার হৃদয়ের ক্ষতবেদনায় অখণ্ড মনোযোগ দিয়া বাঁচে।

"রমেশবাবু!"

"আজ্ঞে!"

"আপনারা বড়লোক—গোলাপজল অবশ্যই ব্যবহার করিয়া থাকেন। আচ্ছা দেখুন্ দেখি, একটু নমুনা আপনার জন্য আনিলাম—গন্ধটা কি-রকম?"

গোলাপজলের সম্বন্ধে রমেশের ব্যুৎপত্তি যে সাধারণের চেয়ে কিছুমাত্র বেশি ছিল, তাহা নহে, কিন্তু সে বলিল—"বাঃ. চমৎকার! এ কোথায় পাইলেন?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"এ আমার নিজের কারখানায় চোলাই করা। আপনারা ত মানুষের পরিচয় লওয়া আবশ্যক বোধ করেন না—কাজেই আমাকে নিজের পরিচয় নিজেই দিতে হয়। আমি গাজিপুরে থাকি। সেখানে আমি গবর্মেণ্ট্ স্কুলে পঞ্চমশ্রেণীতে অঙ্ক কষাই। কবিরাজিও করি। একটা দোকানও রাখিয়াছি—তাহাতে বিলাতি জিনিষ থাকে—সাহেবরা আমাকে ভালবাসে—সবাই আমার খরিদ্দার। যে বৎসর সুবিধা দেখি,

নিজে কিছু গোলাপজল প্রস্তুত করাইয়া লই। আমার মত লোক, যাহার কোনো যোগ্যতা নাই, তাহারো এম্‌নি পাঁচরকম উপায়ে দিন চলিয়া যাইতেছে। আপনার গোলাপজলের আবশ্যক হইলে আমাকে স্মরণ করিবেন— খাঁটি জিনিষ পাইবেন।"

রমেশ বৃদ্ধকে সাহায্য ও খুসি করিবার জন্য কহিল—"গোলাপজল নহিলে আমার চলেই না। অন্তত ছ-বোতল চাই—আপনার সেরা যা আছে—"

বৃদ্ধ চোখ টিপিয়া কহিলেন—"তবে আপনাকে একটা গোপনীয় কথা বলি, আর কাহাকেও ফাঁস করিবেন না। প্রথমশ্রেণীর গোলাপজলের দাম আটটাকা, দ্বিতীয়শ্রেণী চারটাকা, তৃতীয়শ্রেণী দুইটাকা। তিনটেই জিনিষ অবিকল এক—কিন্তু দায়ে পড়িয়া দাম তফাৎ করিতে হয়—কারণ জগতে একশ্রেণীর নির্ব্বোধ সকলে নয়!"

রমেশ হাসিয়া কহিল—"আমাকে তৃতীয়শ্রেণীর নির্ব্বোধের দলেই ফেলিবেন—আমি বহুমূল্য নির্ব্বুদ্ধিতার পক্ষপাতী নই।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"মাপ করিবেন, অমন কথা বলিবেন না—আপনি যেটাকে বহুমূল্য নির্ব্বুদ্ধিতা বলিলেন, সেটা অশ্রদ্ধার বিষয় নহে। দুটাকার জিনিষ চোখ বুজিয়া যাহারা আটটাকা দিয়া কিনিতে পারে, সেরূপ দরাজ মেজাজ রাজা-মহারাজার ঘরেই মেলে। যাহারা ঠকিতে ভয় করে, তাহারাই ঠিকদরে জিনিষ কিনিতে ব্যস্ত। মশায়, দাম কা'কে বলে? কোনো জিনিষের কি দাম আছে? যে বেশি দিতে পারে, সেই বেশি দাম দেয়! ভগবান্ যদি দিন দিতেন, তবে আপনাকে সত্যকথা বলিতেছি, আমি প্রথমশ্রেণীর নীচে এক পা নাবিতাম না! বলিব কি মশায়, আমার প্রাণটা বেয়াকুব্, পেটের দায়ে নিতান্ত বুদ্ধিমান্ হইয়া বসিয়া আছি।"

রমেশ হাসিতে হাসিতে কহিল—"বলেন্ কি?"

চক্রবর্ত্তী। তা সত্যই বলিতেছি! এই দেখুন্ না, যে পর্য্যন্ত বৌমাকে দেখিয়াছি—আমার প্রাণ বলিতেছে, সমস্ত কারখানাটা উজাড় করিয়া অন্তত একবার খাঁটি গোলাপজলে মালক্ষ্মীকে অভিষেকস্নান করাইয়া দেউলে হইতে পারিলে জীবন সার্থক হইত। অথচ দেখুন, আপনাকে ছ-বোতল গোলাপজল বারোটাকায় বিক্রি করিবার জন্য আত্মপরিচয় দিয়া উমেদারি করিতে আসিয়াছি। যাই বলুন রমেশবাবু, বৌমার মত অমন মিষ্ট হাসিটুকু আমি কোথাও দেখি নাই। কেবল মাকে হাসাইবার জন্য আজ সকালবেলা হইতে যে কত ভাঁড়ামিই করিয়াছি, তার আর সংখ্যা নাই। বৌমার হাসিবারও ক্ষমতা আছে—যা বলি, তাতেই হাসিয়া ওঠেন—তাঁর সেই শাদা হাসিতে আমার মন যেন গঙ্গাজলের ধারায় ধুইয়া যায়।

বলিতে বলিতে স্নেহের আনন্দে বৃদ্ধের চক্ষু ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল।

এমন-সময় অদূরে তাহার কাম্‌রার দ্বারের কাছে আসিয়া কমলা দাঁড়াইল। তাহার মনের ইচ্ছা, কর্ম্মহীন দীর্ঘমধ্যাহ্নটা সে চক্রবর্ত্তীকে একাকী দখল করিয়া বসে। চক্রবর্ত্তী তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"না না মা, এটা ভাল হইল না! এটা কিছুতেই চলিবে না!"

কমলা কি ভাল হইল না, কিছু বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য ও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। বৃদ্ধ কহিলেন—"ঐ যে ঐ জুতোটা! মালক্ষ্মি, তোমাদের পা-দুখানিকে বলে চরণকমল, মুচি-বেটারা যদি ঐ চরণ চামড়া দিয়া ঢাকিতে আরম্ভ করে, তবে পরশুরাম এবার কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া আর-কিছু করিবেন না পৃথিবীকে সাতাশবার নির্ম্মুচি করিয়া দিবেন, এ আমি নিশ্চয় লিখিয়া-পড়িয়া দিতে পারি! রমেশবাবু, এটা আপনা-কর্ত্তৃকই হইয়াছে। যা বলেন, এটা আপনারা অধর্ম্ম করিতেছেন—দেশের মাটিকে এই সকল চরণস্পর্শ হইতে বঞ্চিত করিবেন না, তা হইলে দেশ মাটি হইবে। রামচন্দ্র যদি সীতাকে "ডসনে"র বুট্ পরাইতেন, তবে লক্ষ্মণ কি চোদ্দবৎসর বনে ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতেন মনে করেন? কখনই না। আহা! কেবল ঐ কোমল পাদপদ্মের দিকে চাহিয়াই ত রাজার ছেলের প্রাণটা ভক্তিতে সরস হইয়া ছিল! মা, এই বৃদ্ধ সন্তানের এই আব্দারটি রাখিতে হইবে—ঐ পা-দুখানি ঢাকিলে চলিবে না! এ ত মেম্‌সাহেবের পা নয় যে, লজ্জায় লুকাইবে,—এ যে লক্ষ্মীর চরণ—এ ভক্তের আনন্দের জন্য, এ মুচির রোজ্‌গারের জন্য নয়!"

কমলা বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেল। সে পূর্ব্বে কোনোকালে জুতা পরে নাই। রমেশই তাহাকে জুতা পরাইয়াছে খুলিয়া ফেলিতে পারিলে সে ত বাঁচে—কিন্তু চক্রবর্ত্তীর কাছে চরণের স্তব শুনিয়া সে লজ্জায় তাহার পা-দুটি লইয়া কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না।

চক্রবর্ত্তী বলিয়া যাইতে লাগিলেন—"জুতা-পরা দেখিলে বড় ভয় হয় মা, পাছে হঠাৎ কোন্ একসময়ে দেখিব—ঐ সীঁথার সিঁদূরটুকুর উপরে একটা টুপি চড়িয়াছে। সত্য বলিতেছি, মাথার উপরে ঐ শাড়ীর ঘেরটুকু না দেখিলে নিজের মাকে বিমাতা বলিয়া ভ্রম হয়।"

লজ্জায় কমলার মুখ ক্ষণকালের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল। একদিন রমেশ তাহাকে টুপিও পরাইয়াছিল, কিন্তু সভ্যতার এই শাসন সে অধিকক্ষণ শিরোধার্য্য করিতে পারে নাই—সেই লাঞ্ছিত টুপিটা কলিকাতাসহরের বহুতর বিস্মৃত পদার্থের সহিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন অবস্থায় ম্যানিসিপাল্-রথযোগে ধাপার মাঠলোক প্রাপ্ত হইয়াছে। ঘোম্‌টার সহিত ফ্যাশানের সেই সেদিনকার ক্ষণকালীন বিরোধব্যাপার স্মরণ করিলে আজো কমলার লজ্জা রাখিবার স্থান থাকে না। কিন্তু ইস্কুলে থাকিবার সময় দায়ে পড়িয়া জুতা-পরাটা তাহার অভ্যাস হইয়া গেছে।

কমলার মুখের ভাব দেখিয়া রমেশ মুচ্‌কিয়া হাসিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন—"আমার কথা শুনিয়া রমেশবাবু হাসিতেছেন—মনে মনে ঠিক পছন্দ করিতেছেন না! না করিবারই কথা। আপনারা জাহাজের বাঁশী শুনিলেই আর থাকিতে পারেন না, একেবারেই চড়িয়া বসেন, কিন্তু কোথায় যে যাইতেছেন, তাহা একবারো ভাবেন না। আমরা সেকালের লোক, কেবলমাত্র বাঁশীর ডাকেই উপকূল ত্যাগ করি না, আগে গম্যস্থানটা ঠাহর করিয়া রাখি। হাসুন্—যেন কাঁদিতে না হয়, এই প্রার্থনা করি।

রমেশ হাসিয়া কহিল—"হাসি-জিনিষটা

সম্বন্ধে খুড়ো-মশায়ের পক্ষপাত আছে, সেটা বেশ দেখা গেল।"

রমেশের এই কথায় বৃদ্ধ উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক বলিয়াছেন রমেশ-বাবু! আমার পক্ষপাত আছে—আছে বটে! ভগবান্ আমাদের মুখে হাসি দিয়া যে একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন, গোঁফ চাপা দিয়া ঢাকিবার চেষ্টায় সেটা তিনি নিজেই একপ্রকার স্বীকার করিয়াছেন!"

রমেশ কহিল—"খুড়ো, আপনিই না হয় আমাদের গম্যস্থানটা ঠিক করিয়া দিন্ না। জাহাজের বাঁশীটার চেয়ে আপনার পরামর্শ পাকা হইবে।"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"এই দেখুন, আপনার বিবেচনাশক্তি এরি মধ্যে উন্নতিলাভ করিয়াছে—অথচ অল্পক্ষণের পরিচয়! তবে আসুন, গাজিপুরে আসুন! মা, সেখানে গোলাপের ক্ষেত আছে, আর সেখানে তোমার এই বৃদ্ধ ভক্তটাও থাকে। যাবে মা গাজিপুরে?"

রমেশও কমলার মুখের দিকে চাহিল। কমলা তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল। চক্রবর্ত্তী কহিলেন "দেখেছেন রমেশবাবু আর উপায় নাই! মাতৃস্নেহ জালে আটকা পড়িয়াছে! এখন আমি যদি বলি আমার বাড়ী মক্কায়, মাকে মক্কায় টানিয়া-লইয়া যাইতে পারি, তা সেখানে গোলাপের ক্ষেত থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হয়! কেমন, ঠিক কথা কি না?"

বৃদ্ধের উৎসাহে কমলা হাসিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী রমেশের গা টিপিয়া আস্তে আস্তে কানে কানে কহিলেন—"দেখিবেন রমেশবাবু, লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, বৌমা আমার হাসিতেছেন—একেবারে কোহিনুর—এ আমি আপনাকে লিখিয়া-পড়িয়া দিতে পারি।"

কমলার এই অজস্র মাধুর্য্যে রমেশ যে অন্ধ ছিল, তাহা নহে—কিন্তু পরের কাছে তাহার স্তব শুনিয়া এই মাধুর্য্যের দুর্ম্মূল্যতা রমেশের মনোযোগকে আজ যেন আরো বেশি করিয়া টানিয়াছে! কমলার সরল হাসিটুকু যে সুন্দর, তাহা রমেশ পূর্ব্বেই অনেকবার দেখিয়াছে; তাহাকে কোনো ছুতায় হাসাইতে সে ভালও বাসে, কিন্তু এই বৃদ্ধ স্তাবকের চোখ দিয়া এই হাসিকে সে যেন আজ দ্বিগুণ করিয়া দেখিয়া লইল।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন—"মা, এই দরজাটার কাছে দাঁড়াইয়া মনে মনে কি ভাবিতেছেন, তাহা আমি নিশ্চয় বলিতে পারি। বলিব? মার নিতান্ত ইচ্ছা, এই দুপুর-বেলাটায় আমাকে লইয়া ঘরের মধ্যে বসেন—আমাকে লইয়া একটু হাসেন, একটু গল্প করেন। তোমার ও ঘাড়নাড়া আমি বিশ্বাস করি না। যদি বল, আমি কেমন করিয়া মনের কথা জানিতে পারিলাম—আমারো মন যে ঐ কথাটাই বলিতেছে। তোমরা হাতে একটু সময় পাইলেই একটা কাহাকেও প্রশ্রয় দিয়া মাটি না করিয়া থাকিতে পার না। ছোট ছেলে যদি নিতান্ত কোলের কাছে না থাকে, তবে আমার বয়সের এক-আধটা অর্ব্বাচীন থাকিলেও উপস্থিতের মত কাজ চলিয়া যায়। রমেশবাবু, একটু মাপ করিবেন—আপনাকে এতক্ষণ অনেক সুবুদ্ধি ও সৎপরামর্শ দিয়াছি—এখন আমি ছুটি লইব—মা উত্তরোত্তর অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু মা, পান

একটু বেশি করিয়া সাজা হইয়াছে ত? মনে আছে ত, তোমার এই ক্ষীণদন্ত পোষ্যটির খুব চিকণ সুপারি না হইলে চলে না। কোথায় রে, উমেশ কোথায়?" শুনে যা, শুনে যা! তোর খাওয়া হইয়াছে ত? এখন এখানে মায়ের দরবার বসিবে—সব ক'টি সভাসদ্ একত্র হওয়া চাই!"

এইরূপে উমেশ এবং চক্রবর্ত্তীতে মিলিয়া লজ্জিত কমলার কাম্‌রায় সভাস্থাপন করিল। রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাহিরেই রহিয়া গেল। মধ্যাহ্নে জাহাজ ধক্‌ধক্ করিয়া চলিয়াছে। শারদরৌদ্ররঞ্জিত দুই তীরের শান্তিময় বৈচিত্র্য স্বপ্নের মত চোখের উপর দিয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। কোথাও বা ধানের ক্ষেত, কোথাও বা নৌকা-লাগানো ঘাট, কোথাও বা বালুর তীর, কোথাও বা গ্রামের গোয়াল, কোথাও বা গঞ্জের টিনের ছাদ, কোথাও বা প্রাচীন ছায়াবটের তলে খেয়াতরীর অপেক্ষী দুটি-চারটি পারের যাত্রী। এই শরৎমধ্যাহ্নের সুমধুর স্তব্ধতার মধ্যে অদূরে কাম্‌রার ভিতর হইতে যখন ক্ষণে ক্ষণে কমলার স্নিগ্ধ কৌতুক-হাস্য রমেশের কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, তখন তাহার বুকে বাজিতে লাগিল। সমস্তই কি সুন্দর, অথচ কি সুদূর! রমেশের আর্ত্ত জীবনের সহিত কি নিদারুণ আঘাতে বিচ্ছিন্ন! বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তীর মত একজন অপরিচিত ব্যক্তি, উমেশের মত একজন লক্ষ্মীছাড়া গৃহহীন, ইহারাও আজ এই শরৎমধ্যাহ্নের বিপুল মধুচক্রের একটি নিস্তব্ধ মধুকোষের কাছে নিঃসঙ্কোচে আনন্দে গুন্‌গুন্ করিতেছে, ইহারাও আজ এই চারিদিকের সামঞ্জস্যের মধ্যে সুন্দরভাবে যোগ দিয়াছে, এই শান্তির মধ্যে, মাধুর্য্যের মধ্যে ইহাদের কোথাও অনধিকার নাই—কিন্তু রমেশ নির্ব্বাসিত, বহিষ্কৃত! তাহার ব্যাকুল প্রাণটা এই চারিদিকের সহিত মিলিয়া এক হইয়া আজিকার এই নিভৃতমধ্যাহ্নে একটি হাসির দ্বারা, প্রীতির দ্বারা, একটি কল্যাণময়ী মধুরিমার দ্বারা আপনাকে পরিবেষ্টিত করিয়া সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য কাঁদিতেছে—আর তাহার কানে আসিতেছে বহুদূর আকাশের চিলের ডাক, ষ্টীমারের চক্রাহত জলের কলধ্বনি এবং কমলার হাস্যকূজিত আনন্দ-কণ্ঠস্বর!

৩১

কমলার এখনো অল্প বয়স—কোনো সংশয়, আশঙ্কা বা বেদনা স্থায়ী হইয়া তাহার মনের মধ্যে টি'কিয়া থাকিতে পারে না। সে এখনো আপন মনের উপরে বুক দিয়া চাপিয়া-পড়িয়া নিজের সুখদুঃখে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া তা' দিবার অভ্যাস লাভ করে নাই। তাই শরতের আকাশের মত তাহার স্বচ্ছ হৃদয়ে কালো মেঘ অশ্রুজলে গলিয়া-পড়িয়া দেখিতে দেখিতে প্রসন্ন হাসির আলোকে মিলাইয়া নির্ম্মল হইয়া যায়।

রমেশের ব্যবহারসম্বন্ধে এ কয়দিন সে আর কোনো চিন্তা করিবার অবকাশ পায় নাই। স্রোত যেখানে বাধা পায়, সেইখানেই যত আবর্জ্জনা আসিয়া জমে। কমলার চিত্তস্রোতের সহজ প্রবাহ রমেশের আচরণে হঠাৎ একটা জায়গায় বাধা পাইয়াছিল, সেইখানে আবর্ত্ত রচিত হইয়া নানা কথা বারবার একই জায়গায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বৃদ্ধ চক্রবর্ত্তীকে লইয়া হাসিয়া, বকিয়া,

রাঁধিয়া, খাওয়াইয়া কমলার হৃদয়স্রোত আবার সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল—আবর্ত্ত কাটিয়া গেল, যাহা-কিছু জমিতেছিল এবং ঘুরিতেছিল, তাহা সমস্ত ভাসিয়া গেল। সে আপনার কথা আর কিছুই ভাবিল না।

আশ্বিনের সুন্দর দিনগুলি নদীপথের বিচিত্র দৃশ্যগুলিকে রমণীয় করিয়া তাহারি মাঝখানে কমলার এই প্রতিদিনের আনন্দিত গৃহিণীপনাকে যেন সোনার জলের ছবির মাঝখানে একএকটি সরল কবিতার পৃষ্ঠার মত উল্টাইয়া যাইতে লাগিল।

কর্ম্মের উৎসাহে দিন আরম্ভ হইত। উমেশ আজকাল আর ষ্টীমার ফেল্ করে না—কিন্তু তাহার ঝুড়ি ভর্ত্তি হইয়া আসে। ক্ষুদ্র ঘরকন্নার মধ্যে উমেশের এই সকালবেলাকার ঝুড়িটা একটা পরম কৌতুহলের বিষয়। "এ কিরে, এ যে লাউ-ডগা! ওমা, সজনের খাড়া তুই কোথা হইতে জোগাড় করিয়া আনিলি? এই দেখ দেখ, খুড়োমশায়, টক-পালং যে এই খোট্টার দেশে পাওয়া যায়, তাহা ত আমি জানিতাম না!" ঝুড়ি লইয়া রোজ সকালে এইরূপ একটা কলরব উঠে। যেদিন রমেশ উপস্থিত থাকে, সেদিন ইহার মধ্যে একটু বেসুর লাগে—সে চৌর্য্য সন্দেহ না করিয়া থাকিতে পারে না। কমলা উত্তেজিত হইয়া বলে, "বাঃ, আমি নিজের হাতে উহাকে পয়সা গণিয়া দিয়াছি!"—

রমেশ বলে—"তাহাতে উহার চুরির সুবিধা ঠিক দ্বিগুণ বাড়িয়া যায়! পয়সাটাও চুরি করে, শাকও চুরি করে!"

এই বলিয়া রমেশ উমেশকে ডাকিয়া বলে—"আচ্ছা, হিসাব দে দেখি!"

তাহাতে তাহার একবারের হিসাবের সঙ্গে আর একবারের হিসাব মেলে না। ঠিক দিতে গেলে জমার চেয়ে খরচের অঙ্ক বেশি হইয়া উঠে। ইহাতে উমেশ লেশমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সে বলে, "আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব, তবে আমার এমন দশা হইবে কেন? আমি ত গোমস্তা হইতে পারিতাম, কি বলেন দাদাঠাকুর?"

চক্রবর্ত্তী বলেন, "পরের পাপের এত সূক্ষ্ম হিসাব যদি আমরা রাখিব, তবে চিত্রগুপ্ত যমের মাইনে খাইতেছে কিসের জন্য? রমেশবাবু, আহারের পর আপনি উহার বিচার করিবেন, তাহা হইলে সুবিচার করিতে পারিবেন—আপাতত আমি এই ছোঁড়াটাকে উৎসাহ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। উমশে, বাবা, সংগ্রহ করার বিদ্যা কম বিদ্যা নয়—অল্প লোকেই পারে। চেষ্টা সকলেই করে—কৃতকার্য্য কয়জনে হয়? রমেশবাবু, গুণীর মর্য্যাদা আমি বুঝি। সজনে-খাড়ার সময় এ নয়, তবু এত ভোরে এই বিদেশে সজনের খাড়া কয়জন ছেলে জোগাড় করিয়া আনিতে পারে বলুন্ দেখি! মশায়, সন্দেহ করিতে অনেকেই পারে—কিন্তু সংগ্রহ করিতে হাজারে একজন পারে!"

রমেশ। খুড়ো, এটা ভাল হইতেছে না, উৎসাহ দিয়া অন্যায় করিতেছেন।

চক্রবর্ত্তী। ছোঁড়াটা চুরি করিয়াছে কি না, নিশ্চয় জানা নাই, সুতরাং দণ্ড দেওয়া অসম্ভব; কিন্তু ও যে সজনের খাড়া আনি-

য়াছে, তাহা একেবারে প্রত্যক্ষ, সুতরাং উৎসাহ না দিয়া কি করি! ছেলেটার বিদ্যে বেশি নেই, যেটাও আছে, সেটাও যদি উৎসাহের অভাবে নষ্ট হইয়া যায় ত বড় আক্ষেপের বিষয় হইবে—অন্তত যে কয়দিন আমরা ষ্টীমারে আছি। ওরে উমেশ, কাল কিছু নিমপাতা জোগাড় করিয়া আনিস্—যদি উচ্ছে পাস্, আরো ভাল হয়—মা, সুক্তুনিটা নিতান্তই চাই—আমাদের আয়ুর্ব্বেদে বলে—থাক্, আয়ুর্ব্বেদের কথা থাক্, এদিকে বিলম্ব হইয়া যাইতেছে। উমেশ, শাকগুলো বেশ করে' ধুয়ে নিয়ে আয়!

রমেশ এইরূপে উমেশকে লইয়া যতই সন্দেহ করে,—খিট্‌খিট্ করে, উমেশ ততই যেন কমলার বেশি করিয়া আপনার হইয়া উঠে। ইতিমধ্যে চক্রবর্ত্তী তাহার পক্ষ লওয়াতে রমেশের সহিত কমলার দলটি যেন বেশ একটু স্বতন্ত্র হইয়া আসিল। রমেশ তাহার সূক্ষ্ম বিচারশক্তি লইয়া একদিকে একা, অন্যদিকে কমলা, উমেশ এবং চক্রবর্ত্তী তাহাদের কর্ম্মসূত্রে, স্নেহসূত্রে, আমোদ-আহ্লাদের সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে এক। এই দলের মধ্যে, আপনাকে মিলাইবার ক্ষমতা রমেশের নাই—সে চিন্তা করে, তর্ক করে, কর্ত্তব্যের মধ্যে, সম্বন্ধের মধ্যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখায় গণ্ডী আঁকে, কোনো জায়গায় আপনাকে অবাধে ছাড়িয়া দিতে পারে না। চক্রবর্ত্তী আসিয়া অবধি তাঁহার উৎসাহের সংক্রামক উত্তাপে রমেশ কমলাকে পূর্ব্বাপেক্ষা বিশেষ ঔৎসুক্যের সহিত দেখিতেছে, কিন্তু তবু দলে মিশিতে পারিতেছে না। বড় জাহাজ যেমন ডাঙায় ভিড়িতে চায়, কিন্তু জল কম বলিয়া তাহাকে তফাতে নোঙর ফেলিয়া দূর হইতে তাকাইয়া থাকিতে হয়, এদিকে ছোট ছোট ডিঙি-পান্সী-গুলো অনায়াসেই তীরে গিয়া ভিড়ে, রমেশের সেই দশা হইয়াছে।

পূর্ণিমার কাছাকাছি একদিন সকালে উঠিয়া দেখা গেল, রাশিরাশি কালো মেঘ দলে দলে আকাশ পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। বাতাস এলোমেলো বহিতেছে। বৃষ্টি এক-একবার আসিতেছে, আবার একএকবার ধরিয়া-গিয়া রৌদ্রের আভাসও দেখা যাইতেছে। মাঝগঙ্গায় আজ আর নৌকা নাই, দুএকখানা যা দেখা যাইতেছে, তাহাদের উৎকণ্ঠিত ভাব স্পষ্ট বুঝা যায়। জলার্থিনী মেয়েরা আজ ঘাটে অধিক বিলম্ব করিতেছে না। জলের উপরে মেঘবিচ্ছুরিত একটা রুদ্র আলোক পড়িয়াছে এবং ক্ষণে ক্ষণে নদীনীর এক তীর হইতে আর-এক তীর পর্যান্ত শিহরিয়া উঠিতেছে।

ষ্টীমার যথানিয়মে চলিয়াছে। দুর্যোগের নানা অসুবিধার মধ্যে কোনমতে কমলার রাঁধাবাড়া চলিতে লাগিল। চক্রবর্ত্তী আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মা, ওবেলা যাহাতে রাঁধিতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। তুমি খিচুড়ি চড়াইয়া দাও, আমি ইতিমধ্যে রুটি গড়িয়া রাখি।"

খাওয়াদাওয়া শেষ হইতে আজ অনেক বেলা হইল। দমকা হাওয়ার জোর ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। নদী ফেনাইয়া ফেনাইয়া ফুলিতে লাগিল। সূর্য্য অস্ত গেছে কি না, বুঝা গেল না। সকাল-সকাল ষ্টীমার নোঙর ফেলিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ছিন্নবিচ্ছিন্ন

মেঘের মধ্য হইতে বিকারের পাংশুবর্ণ হাসির মত একএকবার জ্যোৎস্নার আলো বাহির হইতে লাগিল। তুমুলবেগে বাতাস এবং মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

কমলা একবার জলে ডুবিয়াছে—ঝড়ের ঝাপটকে সে অগ্রাহ্য করিতে পারে না। রমেশ আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিল—"ষ্টীমারে কোনো ভয় নাই কমলা। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতে পার, আমি পাশের ঘরেই জাগিয়া আছি।"

দ্বারের কাছে আসিয়া চক্রবর্ত্তী কহিলেন —"মালক্ষ্মি, ভয় নাই, ঝড়ের বাপের সাধ্য কি, তোমাকে স্পর্শ করে!"

ঝড়ের বাপের সাধ্য কতদূর, তাহা নিশ্চয় বলা কঠিন, কিন্তু ঝড়ের সাধ্য যে কি, তাহা কমলার অগোচর নাই—সে তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া ব্যগ্রস্বরে কহিল "খুড়োমশায়, তুমি ঘরে আসিয়া বোস।"

চক্রবর্ত্তী সসঙ্কোচে কহিলেন, "তোমাদের যে এখন শোবার সময় হইল না, আমি এখন—"

ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, রমেশ সেখানে নাই—আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—"রমেশবাবু এই ঝড়ে গেলেন কোথায়? শাকচুরি ত তাঁহার অভ্যাস নাই!"

"কে ও, খুড়ো নাকি? এই যে আমি পাশের ঘরেই আছি!"

পাশের ঘরে চক্রবর্ত্তী উঁকি মারিয়া দেখিলেন, রমেশ বিছানার অৰ্দ্ধশয়ান অবস্থায় আলো জ্বালিয়া বই পড়িতেছে।

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "বৌমা যে একলা ভয়ে সারা হইলেন! আপনার বই ত ঝড়কে ডরায় না, ওটা এখন রাখিয়া দিলেও অন্যায় হয় না। আসুন্ এ ঘরে!"

কমলা একটা দুর্নিবার আবেগবশে আত্মবিস্মৃত হইয়া তাড়াতাড়ি চক্রবর্ত্তীর হাত দৃঢ়ভাবে চাপিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—"না, না খুড়োমশায়! না, না।" ঝড়ের কল্লোলে কমলার এ কথা রমেশের কানে গেল না, কিন্তু চক্রবর্ত্তী বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

রমেশ বই রাখিয়া এ ঘরে উঠিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কি চক্রবর্ত্তি-খুড়ো, ব্যাপার কি? কমলা বুঝি আপনাকে--"

কমলা রমেশের মুখের দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না, না, আমি উঁহাকে কেবল গল্প বলিবার জন্য ডাকিয়াছিলাম!"

কিসের প্রতিবাদে যে কমলা "না" "না" বলিল, তাহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে পারিত না। এই "না"র অর্থ এই যে, যদি মনে কর আমার ভয় ভাঙাইবার দরকার আছে—না, দরকার নাই! যদি মনে কর আমাকে সঙ্গ দিবার প্রয়োজন---না, প্রয়োজন নাই! সে কাহারো কাছ হইতে কোনো আবশ্যক দাবী করিতে রাজি নহে। সে এ কথা নিজে স্পষ্ট বোঝে না, কিন্তু না বুঝিয়াও সকলপ্রকার এক-তরফা সম্বন্ধের বন্ধন দূরে ফেলিয়া দিতে চায়! দরকার যদি দুইপক্ষেরই থাকে, তবে সে দরকারের মধ্যে কোনো দৈন্য থাকে না—কিন্তু কেবল কমলারই দরকার আছে, আরকাহারো কোনো দরকার নাই—আর-সকলে বই পড়িবে, সন্ধ্যাবেলায় আকাশে তাকাইয়া বসিয়া থাকিবে, টেবিলে ঘাড় গুঁজিয়া আপ-

নার চিন্তা আপনার মধ্যে পরিপাক করিবে—এ প্রকারের সম্বন্ধ কমলা আপনার সংস্রব হইতে সবেগে বৃর্জ্জন করিতে চায়। এ সব কথা সে এ কয়দিন ভুলিয়া ছিল, আজ এই ঝড়ের রাত্রে সমস্ত জাগিয়া উঠিল। বিপদের সময়. যাহাদের কোনো সম্বন্ধ নাই, তাহারাও একত্র হয়, যাহাদের সম্বন্ধ আছে তাহারা—বেশ কথা, তাহারাও যদি স্বতন্ত্র থাকিতে চায়, তবে কমলা রাত্রে জাগিয়া-বসিয়া চক্রবর্ত্তি-খুড়ার কাছে গল্প শুনিবে—কেহ যেন না মনে করে, গল্প-শোনা ছাড়া আর-কাহারো কাছে তাহার আর-কিছু প্রয়োজন আছে! না, না, কিছুতেই না!

পরক্ষণেই কমলা কহিল, "খুড়োমশায়, রাত হইয়া যাইতেছে, আপনি শুইতে যান, একবার উমেশের খবর লইবেন. সে হয় ত ভয় পাইতেছে!"

দরজার কাছ হইতে একটা আওয়াজ আসিল, "মা, আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

উমেশ মুড়িসুড়ি দিয়া কমলার দ্বারের কাছে বসিয়া আছে। কমলার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল—সে তাড়াতাড়ি বাহিরে গিয়া কহিল, "হ্যাঁরে উমেশ, তুই এই ঝড়-জলে ভিজিতেছিস্ কেন? লক্ষ্মীছাড়া কোথাকার, যা, খুড়োমশায়ের সঙ্গে শুইতে যা!"

কমলার মুখে লক্ষ্মীছাড়া-সম্বোধনে উমেশ বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়া চক্রবর্ত্তি-খুড়ার সঙ্গে শুইতে গেল।

রমেশ জিজ্ঞাসা করিল, "যতক্ষণ না ঘুম আসে, আমি বসিয়া গল্প করিব কি?"

কমলা কহিল, "না, আমার ভারি ঘুম পাইয়াছে!"

রমেশ কমলার মনের ভাব যে না বুঝিল, তাহা নয়, কিন্তু সে আর দ্বিরুক্তি করিল না—কমলার অভিমানক্ষুণ্ণ মুখের দিকে তাকাইয়া সে ধীরে ধীরে আপন কক্ষে চলিয়া গেল।

বিছানার মধ্যে স্থির হইয়া ঘুমের অপেক্ষায় পড়িয়া থাকিতে পারে, এমন শান্তি কমলার মনে ছিল না। তবু সে জোর করিয়া শুইল। ঝড়ের বেগের সঙ্গে জলের কল্লোল ক্রমে বাড়িয়া উঠিল। খালাসিদের গোলমাল শোনা যাইতে লাগিল। মাঝে মাঝে এঞ্জিন্‌ঘরে সারেঙের আদেশসূচক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। প্রবল বায়ুবেগের বিরুদ্ধে জাহাজকে স্থির রাখিবার জন্য নোঙর-বাঁধা অবস্থাতেও এঞ্জিন্ ধীরে ধীরে চলিতে থাকিল।

কমলা বিছানা ছাড়িয়া কাম্‌রার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ক্ষণকালের জন্য বৃষ্টির বিশ্রাম হইয়াছে, কিন্তু ঝড়ের বাতাস শরবিদ্ধ জন্তুর মত চীৎকার করিয়া দিগ্বিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। মেঘসত্ত্বেও শুক্লচতুর্দ্দশীর আকাশ ক্ষীণ আলোকে অশান্ত সংহারমূর্ত্তি অপরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিতেছে! তীর স্পষ্ট লক্ষ্য হইতেছে না, নদী ঝাপ্‌সা দেখা যাইতেছে, কিন্তু ঊর্দ্ধে-নিম্নে, দূরে-নিকটে, দৃশ্যে-অদৃশ্যে একটা মূঢ় উন্মত্ততা, একটা অন্ধ আন্দোলন যেন অদ্ভুতমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া যমরাজের উদ্যতশৃঙ্গ কালো মহিষটার মত মাথা-ঝাঁকা দিয়া-দিয়া উঠিতেছে।

এই পাগল রাত্রি, এই আকুল আকাশের দিকে চাহিয়া কমলার বুকের ভিতরটা যে

দুলিতে লাগিল, তাহা ভয়ে কি আনন্দে, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। এই প্রলয়ের মধ্যে যে একটা বাধাহীন শক্তি, একটা বন্ধনহীন স্বাধীনতা আছে, তাহা যেন কমলার হৃদয়ের মধ্যে একটা সুপ্ত সঙ্গিনীকে জাগাইয়া তুলিল। এই বিশ্বব্যাপী বিদ্রোহের বেগ কমলার চিত্তকেও বিচলিত করিল। কিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তাহার উত্তর কি এই ঝড়ের গর্জ্জনের মধ্যে পাওয়া যায়? না, তাহা কমলার হৃদয়াবেগেরই মত অব্যক্ত। একটা কোন্ অনির্দ্দিষ্ট, অমূর্ত্ত মিথ্যার, স্বপ্নের, অন্ধকারের জাল ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসিবার জন্য আকাশপাতালে এই মাতামাতি, এই রোষগর্জ্জিত ক্রন্দন! পথহীন প্রান্তরের প্রান্ত হইতে বাতাস কেবল "না" "না" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে নিশীথরাত্রে ছুটিয়া আসিতেছে—একটা কেবল প্রচণ্ড অস্বীকার!—কিসের অস্বীকার? তাহা নিশ্চয় বলা যায় না—কিন্তু না, কিছুতেই না, না, না, না!

৩২

পরদিন প্রাতে ঝড়ের বেগ কিছু কমিয়াছে, কিন্তু একেবারে থামে নাই—নোঙর তুলিবে কি না, এখনো তাহা সারেং ঠিক করিতে পারে নাই, উদ্বিগ্নমুখে আকাশের দিকে তাকাইতেছে।

সকালেই চক্রবর্ত্তী রমেশের সন্ধানে কমলার পাশের কাম্‌রায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, রমেশ তখনো বিছানায় পড়িয়া আছে, চক্রবর্ত্তীকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। এই ঘরে রমেশের শয়নাবস্থা দেখিয়া চক্রবর্ত্তী গতরাত্রির ঘটনার সঙ্গে মনে মনে সমস্তটা মিলাইয়া লইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল রাত্রে বুঝি এই ঘরেই শোওয়া হইয়াছিল?"

রমেশ এই প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া কহিল—"এ কি দুর্যোগ আরম্ভ হইয়াছে! কাল রাত্রে খুড়োর ঘুম কেমন হইল?"

চক্রবর্ত্তী কহিলেন, "রমেশবাবু, আমাকে নির্ব্বোধের মত দেখিতে, আমার কথাবার্ত্তাও সেই প্রকারের, তবু এই বয়সে আমাকে অনেক দুরূহ বিষয়ের চিন্তা করিতে হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলার মীমাংসাও পাইয়াছি—কিন্তু আপনাকে সব চেয়ে দুরূহ বলিয়া ঠেকিতেছে!"

মুহূর্ত্তের জন্য রমেশের মুখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া একটুখানি হাসিয়া কহিল—"দুরূহ হওয়াটাই যে সব সময়ে অপরাধের, তা নয় খুড়ো! তেলেগু-ভাষার শিশুপাঠও দুরূহ, কিন্তু তৈলঙ্গের বালকের কাছে তাহা জলের মত সহজ যাহাকে না বুঝিবেন, তাহাকে তাড়াতাড়ি দোষ দিবেন না এবং যে অক্ষর না বোঝেন, কেবলমাত্র তাহার উপরে অনিমেষ চক্ষু রাখিলেই যে তাহা কোনোকালে বুঝিতে পারিবেন, এমন আশা করিবেন না।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "আমাকে মাপ করিবেন রমেশবাবু! আমার সঙ্গে যাহার বোঝাপড়ার কোনো সম্পর্ক নাই, তাহাকে বুঝিতে চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা। কিন্তু পৃথিবীতে দৈবাৎ এমন একএকটি মানুষ মেলে, দৃষ্টিপাতমাত্রই যাহার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থির হইয়া যায়—তার সাক্ষী, আপনি ঐ দেড়ে সারেংটাকে জিজ্ঞাসা করুন,—বৌমার সঙ্গে ওর আত্মীয়সম্বন্ধ ওকে

এখনি স্বীকার করিতে হইবে— ওর ঘাড় করিবে —না করে ত ওকে আমি মুসলমান বলিব না। এমন অবস্থায় হঠাৎ মাঝখানে তেলেগুভাষা আসিয়া পড়িলে ভারি মুস্কিলে পড়িতে হয়! আপনি এ ক্ষেত্রে ঐ ভাষাটা নিজে জানেন বলিয়া আমার ব্যথাটা বুঝিতেছেন না— কিন্তু রমেশবাবু, আপনি যদি মালক্ষ্মীর ঐ কাঁচা-সোনার মুখখানি প্রথম দেখিতেন এবং তার পরেই হঠাৎ তেলেগুভাষার একখানা দুর্ব্বোধ মেঘ আসিয়া ঐ চাঁদমুখ ঢাকিয়া ফেলিবার জো করিত, তবে আপনি কি করিতেন বলুন্ দেখি! শুধুশুধু রাগ করিলে চলিবে না রমেশবাবু, কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন!”

রমেশ কহিল, “ভাবিয়া দেখিতেছি বলিয়াই ত রাগ করিতে পারিতেছি না—কিন্তু আমি রাগ করি আর না করি, আপনি দুঃখ পান আর না পান, তেলেগুভাষা তেলেগুই থাকিয়া যাইবে—প্রকৃতির এইরূপ নিষ্ঠুর নিয়ম।”—এই বলিয়া রমেশ একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল।

এই ঘটনার পর চক্রবর্ত্তীর সহিত কমলার সম্বন্ধ স্নেহে, করুণায়, অকথিত বেদনায় আরো যেন গভীর হইয়া আসিল। যাহা বুঝিবার জো নাই, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায় না, কিছু করা যায় না, প্রতিকার করিবার চেষ্টা মনে আসে, কিন্তু উপায় ভাবিয়া পাওয়া অসাধ্য হয়, সেইজন্য সমস্ত প্রতিহত উদ্যম অন্তরে অবরুদ্ধ স্নেহকেই অহরহ লালন করিতে থাকে।

ইতিমধ্যে রমেশ চিন্তা করিতে লাগিল, গাজিপুরে যাওয়া উচিত কি না। প্রথমে সে ভাবিয়াছিল, অপরিচিত স্থানে বাসস্থাপন করার পক্ষে বৃদ্ধের সহিত পরিচয় তাহার কাজে লাগিবে। কিন্তু এখন মনে হইল, পরিচয়ের অসুবিধাও আছে। কমলার সহিত তাহার সম্বন্ধ,—আলোচনা ও অনুসন্ধানের বিষয় হইয়া উঠিলে একদিন তাহা কমলার পক্ষে নিদারুণ হইয়া দাঁড়াইবে। তার চেয়ে যেখানে সকলেই অপরিচিত, যেখানে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার কেহ নাই, সেইখানে আশ্রয় লওয়াই ভাল।

গাজিপুরে পৌঁছিবার আগের দিনে রমেশ, চক্রবর্ত্তীকে কহিল, “খুড়ো, গাজিপুর আমার প্র্যাক্‌টিসের পক্ষে অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছি না, আপাতত কাশিতে যাওয়াই আমি স্থির করিয়াছি!”

রমেশের কথার মধ্যে নিঃসংশয়ের সুর শুনিয়া বৃদ্ধ হাসিয়া কহিলেন, “বারবার ভিন্ন-ভিন্ন-রকম স্থির করাকে স্থির করা বলে না—সে ত অস্থির করা। যা হউক্, এই কাশি যাওয়াটা এখনকার মত আপনার শেষ স্থির?”

রমেশ সংক্ষেপে কহিল—“হাঁ!”

বৃদ্ধ কোন উত্তর না করিয়া চলিয়া গেলেন এবং জিনিষপত্র বাঁধিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কমলা আসিয়া কহিল, “খুড়োমশায়, আজ কি আমার সঙ্গে আড়ি?”

বৃদ্ধ কহিলেন. “ঝগড়া ত দুইবেলাই হয়, কিন্তু একদিনও ত জিতিতে পারিলাম না!”

কমলা। আজ যে সকাল হইতে তুমি পালাইয়া বেড়াইতেছ?

চক্রবর্ত্তী। তোমরা যে মা আমার চেয়ে বড়-রকমের পলায়নের চেষ্টায় আছ, আর আমাকে পলাতক বলিয়া অপবাদ দিতেছ?

কমলা কথাটা না বুঝিয়া চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধ কহিলেন, "রমেশবাবু তবে কি এখনো তোমাকে বলেন নাই? তোমাদের যে কাশি যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

শুনিয়া কমলা 'হাঁ-না' কিছুই বলিল না। কিছুক্ষণ পরে কহিল, "খুড়োমশায়, তুমি পারিবে না, দাও, তোমার বাক্স আমি সাজাইয়া দিই।"

কাশি-যাওয়া-সম্বন্ধে কমলার এই ঔদাসীন্যে চক্রবর্ত্তী হৃদয়ের মধ্যে একটা গভীর আঘাত পাইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "ভালই হইতেছে, আমার মত বয়সে আবার নূতন জাল জড়ানো কেন?"

ইতিমধ্যে কাশী যাওয়ার কথা কমলাকে জানাইবার জন্য রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, "আমি তোমাকে খুঁজিতেছিলাম।"

কমলা চক্রবর্ত্তীর কাপড়চোপড় ভাঁজ করিয়া গুছাইতে লাগিল। রমেশ কহিল, "কমলা, এবার আমাদের গাজিপুরে যাওয়া হইল না। আমি স্থির করিয়াছি, কাশীতে গিয়া প্র্যাক্‌টিস্ করিব। তুমি কি বল?"

কমলা চক্রবর্ত্তীর বাক্স হইতে চোখ না তুলিয়া কহিল, "না, আমি গাজিপুরেই যাইব। আমি সমস্ত জিনিষপত্র গুছাইয়া লইয়াছি।"

কমলার এই দ্বিধাহীন উত্তরে রমেশ কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল কহিল, "তুমি কি একলাই যাইবে নাকি?"

কমলা চক্রবর্ত্তীর মুখের দিকে তাহার স্নিগ্ধচক্ষু তুলিয়া কহিল, "কেন, সেখানে ত খুড়োমশায় আছেন!"

কমলার এই কথায় চক্রবর্ত্তী কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন—কহিলেন, "মা, তুমি যদি সন্তানের প্রতি এতদূর পক্ষপাত দেখাও, তাহা হইলে রমেশবাবু আমাকে দুচক্ষে দেখিতে পারিবেন না।"

ইহার উত্তরে কমলা কেবল কহিল, "আমি গাজিপুরে যাইব!"

এ সম্বন্ধে যে কাহারো কোন সম্মতির অপেক্ষা আছে, কমলার কণ্ঠস্বরে এরূপ প্রকাশ পাইল না।

রমেশ কহিল, "খুড়ো, তবে গাজিপুরই স্থির।"

ঝড়জলের পর সেদিন রাত্রে জ্যোৎস্না পরিষ্কার হইয়া ফুটিয়াছে। রমেশ ডেকের কেদারায় বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এমন করিয়া আর চলিবে না। ক্রমেই বিদ্রোহী কমলাকে লইয়া জীবনের সমস্যা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া কাছে থাকিয়া দূরত্বরক্ষা করা দুরূহ। এবারে হাল ছাড়িয়া দিব। কমলাই আমার স্ত্রী—আমি ত উহাকে স্ত্রী বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। মন্ত্র-পড়া হয় নাই বলিয়াই কোনো সঙ্কোচ করা অন্যায়। যমরাজ সেদিন কমলাকে বধূরূপে আমার পার্শ্বে আনিয়া-দিয়া সেই নির্জ্জন সৈকতদ্বীপে স্বয়ং গ্রন্থিবন্ধন করিয়া দিয়াছেন—তাঁহার মত এমন পুরোহিত জগতে কোথায় আছে?"

হেমনলিনী এবং রমেশের মাঝখানে একটা যুদ্ধক্ষেত্র পড়িয়া আছে। বাধা, অপমান, অবিশ্বাস কাটিয়া যদি রমেশ জয়ী হইতে পারে, তবেই সে মাথা তুলিয়া হেমনলিনীর পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। সেই যুদ্ধের কথা মনে হইলে তাহার ভয় হয়—জিতিবার কোনো আশা থাকে না। কেমন করিয়া

প্রমাণ করিবে ? এবং প্রমাণ করিতে হইলে সমস্ত ব্যাপারটা লোকসাধারণের কাছে এমন কদর্য্য এবং কমলার পক্ষে এমন সাংঘাতিক-আঘাতকর হইয়া উঠিবে যে, সে সঙ্কল্প মনে স্থান দেওয়া কঠিন।

অতএব দুর্ব্বলের মত আর দ্বিধা না করিয়া, সঙ্কোচ না করিয়া কমলাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেই সকল দিকে শ্রেয় হইবে। হেমনলিনী ত রমেশকে ঘৃণা করিতেছে—এই ঘৃণাই তাহাকে উপযুক্ত সৎ-পাত্রে চিত্তসমর্পণ করিতে আনুকূল্য করিবে। এই ভাবিয়া রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের দ্বারা সেইদিক্‌কার আশাটাকে ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ক্রমশ।

বন্ধন।

সেদিন যে তুমি গিয়েছিলে খুলে চুলটি
দুলায়ে মোহন করেতে কমল-ফুলটি
একটি ক্ষুদ্র পাপ্‌ড়ি তাহার
খ'সে প'ড়েছিল বক্ষে আমার
বেগে বহেছিল পরশে যাহার
আমার হৃদয়-ধমনি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

কি যেন কানেতে বেজেছিল কোনো কথা কি
শুনিতে তাহাই আজি এ মরমব্যথা কি ?
সব কাজে আজি এ মোর পরাণ
ব্যাকুল শুনিতে তব প্রেমগান
কর মোরে আজি কর আহ্বান
বাহি এস তব তরণি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

একবার শুধু মিলাও আঁখিতে আঁখিটি
কর মোরে তব স্বর্ণখাঁচার পাখিটি

বদ্ধ কর্‌হ শৃঙ্খলে তব
তোমার বন্দী চিরদিন র'ব
অনিমেষে তব মুখ অভিনব
হেরিব দিবসরজনি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

এমনি রহিব চিরদিন মোরা দুজনায়
তুমি গো মুক্ত আমি বাঁধা তব পিঁজরায়
অক্ষয় থাক্‌ এ মোর বাঁধন
অনন্ত হোক্‌ এ প্রেমসাধন
আশা-ভরা মোর আকুল কাঁদন
চেয়ে আছে তব সরণি
হে মোর চিত্ত-হরণি !

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সার সত্যের আলোচনা

কাণ্টের মূলমন্ত্র।

দেশীয় দর্শনকারদিগের মূলমন্ত্র ওঙ্কার; কাণ্টের মূলমন্ত্র Synthetic unity of apperception অর্থাৎ সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। এই মূলমন্ত্রটির প্রভাবে কাণ্ট্‌ অভেদজ্ঞানের দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তবে যে, কেন তিনি অভেদজ্ঞানের মন্দিরে প্রবেশ করিলেন না—তাহা আশ্চর্য্য যদিচ খুবই, কিন্তু তাহার একটি নিগূঢ় কারণ আছে; তাহা এই :—

ভেদবুদ্ধির উপত্যকা হইতে যিনি অভেদজ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে চাহেন, তাঁহার উচিত একটি বিষয়ে সাবধান হওয়া—পথের মাঝে থামিয়া দাঁড়াইয়া তিনি যেন পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করেন। কাণ্ট্‌ অভেদজ্ঞানের দ্বারোপান্তে উপনীত হইয়াই চৌকাটে ঠোকর খাইয়া থামিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার কিয়ৎপরে যেম্নি তিনি পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন, আর অম্নি ভেদবুদ্ধির মায়ামৃগ তাঁহার জ্ঞানচক্ষুতে ধাঁদা লাগাইয়া হড়্‌হড়্‌ করিয়া তাঁহাকে নীচে টানিয়া-লইয়া চলিল। ইহারই নাম কিনারায় আসিয়া নৌকাডুবি। যাহাই হউক্‌ না কেন—যোগাত্মক ঐক্যের স্তায়

অমনতরো আর-একটা অভেদজ্ঞানের কপাট খুলিবার অব্যর্থসন্ধান-চাবি খুঁজিয়া বাহির করা সোজা কথা নহে। কিন্তু সে চাবিটি অবরুদ্ধ করিয়া রাখা আছে শক্তস্থানে—'বিশুদ্ধজ্ঞানের সমালোচনা' নামক দর্শন-গ্রন্থে। বহুপূর্ব্বে ধাত্রীমুখে শুনিয়াছিলাম যে, কোনো ক্ষুধাতুর পরিব্রাজক রাক্ষস-পুরীর রাজদ্বারে অতিথি হইলে তাহাকে খাইতে দেওয়া হয় লোহার কড়াই-ভাজা! তেমনি, কালে-ভদ্রে যদি কোনো সত্যপথের পথিক জ্ঞানের লোভ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কাণ্টের দর্শনগ্রন্থের মলাট্‌-কপাট উদ্ঘাটন করিয়া ভিতরে উঁকি দিতে সাহসী হ'ন, তবে ঠিক্‌ লোহার কড়াই-ভাজা না হউক্‌—তাহারই সহোদর-শ্রেণীর দন্তনিষূদন সারালো সামগ্রী তাঁহাকে পেট ভরিয়া খাইতে দেওয়া হয়। সচরাচর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, বদ্ধপরিকর পরিবেষক যদি বলেন—"আর চাই?", তবে ক্ষুধার্ত্ত অতিথি পরিবেষকের কার্য্যপটুতার প্রতি আহ্লাদপ্রকাশ করিয়া বলেন—"দিবে দেও! অধিকন্তু ন দোষায়;" কিন্তু কাণ্টের দ্বারের অতিথি তাহা বলেন না। তিনি কাষ্ঠহাসি হাসিয়া কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলেন—"যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্‌।" সহযাত্রিগণের সহিত কাণ্টের দর্শনমন্দিরে অতিথি হইয়া আমিও এক্ষণে ক্রমে বুঝিতে পারিতেছি যে, 'অধিকন্তু' বড় যে 'ন দোষায়', তাহা নহে, পরন্তু 'মরণায়'! অতএব "যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্‌," এইটিই ঠিক্‌! পোষ্টাই সামগ্রী অল্পস্বল্পই ভাল! আমি তাই পরিবেষকের দলে মিশিয়া সহযাত্রিগণের পাতে-পাতে এক-আধ মুটার অনধিক কাণ্টীয় অন্ন খুব বিবেচনার সহিত সুসাবধানে বিলি করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভোক্তা'রা হয় তো দুই-গ্রাস মুখে উঠাইতে-না-উঠাইতেই বলিবেন—"যথেষ্ট হইয়াছে—যৎ স্বল্পং তন্মিষ্টম্‌।"

সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য।

কাণ্ট্‌ যে বলিয়াছেন "সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য," তাহা বস্তুটা কি? বস্তুটা হ'চ্চে—পূর্ব্বের এক প্রবন্ধে যাহাকে আমি বলিয়াছি নিখিলবিশ্বের সার্ব্বাত্মিক ঐক্য। আমি তো এইরূপ বলিতেছি, কিন্তু কাণ্ট্‌ নিজে কিরূপ বলেন? কাণ্টের নিজের কথার তিনি নিজে যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বপ্রথমে বিবেচ্য। কাণ্টীয়-দর্শনের মোট কথাটার স্থূল-তাৎপর্য্য-সম্বন্ধে কাণ্ট্‌ তাঁহার নিজের যেরূপ অভিপ্রায় নিজে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার চুম্বক বিবরণ এই :—

(ক্ষেত্র দেখ)

একত্ব হ'চ্চে সংবিতের একত্ব (consciousnessএর একত্ব); যোগ হ'চ্চে কল্পনার যোগ; বৈচিত্র্য হ'চ্চে দেশকালের বৈচিত্র্য। ভেদবুদ্ধির পরামর্শ শুনিয়া কাণ্ট্‌ প্রথমে বৈচিত্র্য, যোগ এবং একত্ব, তিনকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ পাত্রে বিন্যস্ত করিলেন;—বৈচিত্র্য থুলেন দেশকাল-পাত্রে, যোগ থুলেন কল্পনা-পাত্রে, একত্ব থুলেন সংবিৎ-পাত্রে। তাহার পরে, একত্ব এবং বৈচিত্র্যের মধ্যবর্ত্তী সেই-যে কল্পনা-মূলক যোগ, সেই কল্পনা-মূলক

যোগের গাত্রে সংবিতের একত্ব সজ্ঘটিত করিয়া একমেটে যোগ'কে দোমেটে করিয়া গড়িয়া তুলিলেন, আর, সেই দোমেটে যোগের নাম দিলেন বুদ্ধির যোগ। কাণ্টের অভিপ্রায়ানুসারে, কল্পনার যোগ সংবিতের একত্ব হইতে আপনাকে অলগ্ রাখে; বুদ্ধির যোগ সংবিতের একত্বকে মাথার মুকুট করিয়া মস্তকে ধারণ করে। কাণ্ট্ এটাও কিন্তু বলেন যে, ও-দুই পৃথক্-শ্রেণীর যোগের মধ্যে কেবল একমেটে-দোমেটে'র প্রভেদ, তা বই —বস্তুত কোনো প্রভেদ নাই। কথাটা আর-কিছু না—গৃহবিড়াল বনে গেলেই যেমন বনবিড়াল হইয়া ওঠে, কল্পনার যোগ তেমনি সংবিতের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই বুদ্ধির যোগ হইয়া ওঠে। ফলে, সংবিতের ঐক্য একপ্রকার স্পর্শমণি; তাহার স্পর্শমাত্রে একমেটে যোগ দোমেটে হইয়া ওঠে—কল্পনার যোগ বুদ্ধির যোগ হইয়া ওঠে। কাণ্টের এই কঠোর বৈজ্ঞানিক-ধাঁচার কথাটিকে লৌকিক-ধাঁচার সভাভব্য পরিচ্ছদ পরিধান করানো আশু প্রয়োজনীয় হইয়াছে —কেন না, রাস্তার লোকে যদি উহাকে চিনিতে না পারিয়া একটা অদ্ভুত সঙ্ ঠাওরায়, আর, সেইরূপ ভ্রান্তির বশতাপন্ন হইয়া উহার গাত্রে ধূলিনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হয়, তবে তাহা আমার প্রাণে সহিবে না। অতএব নিম্নে প্রণিধান করা হো'ক্।

আরব্য-উপন্যাসের আবুল্‌হোসেন্ যখন কালিফের সিংহাসনে রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার কালিকে'র আমি এবং আজিকে'র আমি'র মধ্যে একত্বের ব্যত্যয় ঘটিয়াছিল খুবই। ব্যাপারটা যে কি, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রথমে তিনি জবুথবু বনিয়া গিয়াছিলেন; তাহার পরে বিপুল সাম্রাজ্যের কুহকে মুগ্ধ হইয়া আপনাকে সত্য-সত্যই রাজরাজেশ্বর মনে করিতে লাগিলেন। রাজা যেরূপে বসেন-দাঁড়ান, ভাবেন-চিন্তেন, বিচার করেন, আদেশজ্ঞাপন করেন, সমস্তই সত্ত-সত্ত তাঁহার মনোমধ্যে কল্পনার যোগসূত্রে গ্রথিত হইয়া-হইয়া নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বহিয়া চলিতে লাগিল। আবুল্‌হোসেনের কালিকে'র আমি'র সংস্রব হইতে তাঁহার আজিকে'র আমি দূরে সরিয়া দাঁড়াইবামাত্র তাঁহার কল্পনার বা মনোরথের যোটনা এবং যোজনা এই দুই জুড়ি-ঘোড়া উন্মত্তবেগে ছুটিতে লাগিল; আর, মাঝে-মাঝে থম্‌কিয়া-দাঁড়াইয়া পশ্চাতে পা ছুঁড়িয়া বুদ্ধি-সারথির চক্ষে রাশি-রাশি ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার দুইদিন পরে যখন কালিফ রাজাধিরাজ আবুল্‌হোসেনের ঘুম ভাঙাইবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রম ভাঙাইয়া দিলেন, তখন আবুল্‌হোসেনের বুদ্ধির হাড়ে বাতাস লাগিল বটে, কিন্তু তাঁহার সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হওয়াতে তাঁহার সাধের মনোরথ স্বর্গ হইতে রসাতলে নিপতিত হইয়া ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেল। যাহাই হোক্ না কেন—আবুল্‌হোসেনের পরশ্ব-তরশ্বের আমি এবং অদ্যকল্যের আমি'র মধ্যে অখণ্ডনীয় ধ্রুব ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল; আর, তাহা যখন হইল, তখন তাঁহার নিকটে বিগত দুইদিনের সমস্ত প্রহেলিকা দুধ্‌কে-দুধ্ জল্‌কে-জল্ হইয়া গেল। পূর্ব্বদিনে আবুল্‌হোসেনের মনোমধ্যে আজিকের সঙ্গে কালি-

পরশ্বের যোগসূত্রের খেই হারাইয়া গিয়াছিল; এক্ষণে সংবিত্তের ঐক্য প্রত্যাবর্ত্তন করা'তে সেই হারা-সন্ধানসূত্র খুঁজিয়া পাইতে আবুলহোসেনের একমুহূর্ত্তও বিলম্ব হইল না। আজি-কালি-পরশ্বের বিচিত্র ঘটনাবলীর সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে সংবিতের ঐক্যমূলক এই যে যোগ, ইহাকেই বলেন কাণ্ট্—বুদ্ধির যোগ। এখন তো আবুলহোসেনের মনে বুদ্ধির যোগ মাথা তুলিয়া-উঠিয়া আজি-কালি-পরশ্বের সমস্ত বৃত্তান্তের উপরে আলোকনিক্ষেপ করিতেছে; কিন্তু গতকল্য, তাঁহার মনোমধ্যে ঘোটনা এবং যোজনা, এই দুই প্রমত্ত-ঘোটক সাংবিত ঐক্যের লাগাম ছিঁড়িয়া কেমন উদ্দাম হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, তাহা তো দেখিয়াছ! তাহাকেই বলেন কাণ্ট্—কল্পনার যোগ। তাই বলি যে, যোগফণী যখন মণি হারাইয়া ইতস্তত ছুটাছুটি করে, তখন তাহারই নাম কল্পনার যোগ; পক্ষান্তরে, যোগফণীর মাথায় যখন মণি জ্বল্‌জ্বল্ করিতে থাকে, তখন তাহারই নাম বুদ্ধির যোগ। সে মণি কি? না, Synthetic unity of apperception সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য। মণিটার মূল্য কাণ্ট্ রীতিমত যাচাই করিয়া দেখিয়াছিলেন কি না, তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমাদের দেশীয় দর্শনকারেরা যুক্তি এবং শাস্ত্রের বাজারে তাহা তন্ন-তন্ন করিয়া যাচাই করিয়া দেখিয়া অবেশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, তাহা সাত-রাজার ধন মাণিক! সাত রাজা হ'চ্চেন ভূর্ভুব প্রভৃতি সপ্ত লোকের সপ্ত লোকপাল; আর, সাত-রাজার ধন হ'চ্চে সপ্তলোক বা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কেহ হয় তো বলিবেন, "পাগলের মতো কি বলিতেছ? সংবিৎকে বলিতেছ—নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড!"

"হাঁ, তাই আমি বলিতেছি! সংবিৎ নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই বটে! কিন্তু এ কথার অর্থ এবং তাৎপর্য্য এখন না—ইহার পরে ধীরে ধীরে ক্রমশ প্রকাশ্য।"

কাণ্টের ইতস্তত।

গোড়াতেই বলিয়াছি যে, কাণ্টের মূলমন্ত্র Synthetic unity of apperception সংবিতের যোগাত্মক ঐক্য; আর, আমাদের দেশীয় দর্শনকারদিগের মূলমন্ত্র ওঙ্কার। দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কেবল নামে। তাহার মধ্যে বিশেষ একটি দ্রষ্টব্য এই যে, সংবিতের যোগাত্মক ঐক্যকে যদি কেবলমাত্র একটা দার্শনিক-ছিন্নসত্তা-রূপে (abstract entity রূপে) গ্রহণ করা যায়, তবে তাহার সমস্ত গৌরব-মাহাত্ম্য সেই দণ্ডে ধূলিসাৎ হইয়া যায়। ইউরোপীয় দর্শনকারদিগের পাল্লায় পড়িয়া উঁহার ভাগ্যে ঘটিয়াছেও তাই! আমাদের দেশের দর্শনকারেরা যে সংবিতের প্রকৃত মর্য্যাদা অবগত ছিলেন, তাহা তাঁহাদের লেখনীর দুই-এক আঁচড়েই সপ্রকাশ। তা'র সাক্ষী পঞ্চদশীর গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন—

> মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
> নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেষা স্বয়ংপ্রভা॥

মাস, অব্দ, যুগ, কল্প, অনেকধা যাতায়াত করিতেছে—তাহার মধ্যে একাকী কেবল আপন প্রভায় আপনি প্রকাশমানা সংবিৎ

না-জানেন উদয়—না-জানেন অস্ত। সংবিতের শেষোক্তপ্রকার বিশ্বব্যাপী সার্ব্বাত্মিকতা কাণ্ট্ কিন্তু বুঝিয়াছিলেন; আর তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন বলিয়াই সংবিতের ঐক্য'কে ফাঁকা ঐক্য না বলিয়া বলিয়াছেন—যোগাত্মক (Synthetic) ঐক্য। কাণ্ট্. বুঝিয়াছিলেন, এটা সত্য—কিন্তু বুঝিয়াও বোঝেন নাই। কাণ্টের মনোমধ্যে এইরূপ ইতস্তত ঘটাইবার কর্ত্রী হ'চ্চেন আর-কেহ না—ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধি। কাণ্ট্ যে-অর্থে 'যোগাত্মক'শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে বাস্তবিকই এইরূপ বুঝায় যে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংবিতের যোগ সূত্রে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সম্বদ্ধ। এমন কি, কাণ্ট্ এ কথাও বলিতে ছাড়েন নাই যে, সমস্ত প্রাকৃতিক নিয়মের গোড়া-বন্ধনের কর্ত্রী একাকিনী কেবল সংবিৎ। দুঃখের বিষয় এই যে, কাণ্ট্ তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথাটি পষ্ট করিয়া বলিতে গড়ীমসী এবং ইতস্তত করিয়াছেন বড্ড বেশীমাত্রা। কাণ্ট্ বলিয়াছেন যে, সংবিতের ঐক্যস্ফুরণের পূর্ব্বে যোগের সঙ্ঘটনকার্য্য বা যোজনাকার্য্য কল্পনাকর্তৃক অজ্ঞাতসারে—অন্ধভাবে—সম্পাদিত হইয়া থাকে। কাণ্ট্‌কে জিজ্ঞাসা করি যে, জ্ঞাতা-কর্তৃক যে কার্য্য অজ্ঞাতসারে করা হয়, সে কার্য্যের কর্ত্তা জ্ঞাতা নিজে, অথবা প্রকৃতি, অথবা আর-কেহ? সুপ্তব্যক্তি যদি ঘুমের ঘোরে সহশায়ী ব্যক্তিকে প্রহার করে, তবে প্রহার করিল যে—সে কে? সুপ্তব্যক্তি নিজে, অথবা তাহার প্রকৃতি, অথবা আর-কেহ? যদি বল যে, সুপ্তব্যক্তি নিজে; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, সুপ্তব্যক্তি তাহার সেই নিজের কার্য্যের জন্য নিজে দায়ী, অতএব তাহাকে পুলিসে দেওয়া উচিত। যদি বল যে, সুপ্তব্যক্তি তাহার সে অজ্ঞানকৃত কার্য্যের জন্য দায়ী নহে—অথচ সে কার্য্য তাহার নিজেরই কার্য্য; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, অন্ধ প্রকৃতির কার্য্যও জ্ঞাতার নিজের কার্য্য। সাবধান! সম্মুখে একটা প্রবল ঘূর্ণার পাক ক্রোড় প্রসারিত করিয়া রহিয়াছে! সে ঘূর্ণার পাক এইরূপ:—

প্রথম কথা।

কল্পনার একমেটে যোগ সাংবিত ঐক্যের আয়ত্ত বহির্ভূত।

দ্বিতীয় কথা।

অথচ সে যোগের সংঘটন-ক্রিয়া—অর্থাৎ যোজনা-ক্রিয়া—জ্ঞাতা-কর্তৃক অজ্ঞাতসারে প্রবর্ত্তিত হয়।

তৃতীয় কথা।

এটা যখন স্থির যে, কাল্পনিক যোজনাক্রিয়া জ্ঞাতা-কর্তৃক অজ্ঞাতসারে প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ঐপ্রকার যোজনা-ক্রিয়ার ফল যে একমেটে যোগ, তাহাও অবশ্য জ্ঞাতা'র একত্বে আপাদমস্তক ওতপ্রোত। শেক্‌স্পীয়র্ বলিয়াছেন "there is method in madness" খ্যাপামি'র মধ্যেও একত্বের বাঁধুনি আছে। সে একত্ব, অবশ্য, জ্ঞাতারই একত্ব। একমেটে কাল্পনিক যোগের নিষ্পাদন-কার্য্যেও জ্ঞাতার-একত্বের হস্ত তবে আছে? জ্ঞাতার একত্বই তো সংবিতের একত্ব! যদি বল যে, সংবিতের একত্ব স্বতন্ত্র—জ্ঞাতার একত্ব স্বতন্ত্র; তবে প্রকারান্তরে বলা হয় যে, আমার জ্ঞানের কার্য্য আমার

আপনার কার্য্য নহে। অতএব তুমি যখন বলিতেছ যে, একমেটে কাল্পনিক যোগের নিষ্পাদন-কার্য্যেও জ্ঞাতার একত্বের হস্ত আছে, তখন তাহাতেই আপনা-আপনি প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সে কার্য্যে সাংবিত ঐক্যের হস্ত আছে। তবেই হইতেছে যে, কল্পনাপ্রধান একমেটে যোগক্ষেত্রেও সংবিতের ঐক্য আধিপত্য বিস্তার করিতে ক্ষান্ত হয় না। কিন্তু গোড়ায় তুমি বলিয়াছ যে, কল্পনার একমেটে যোগ সাংবিত ঐক্যের আয়ত্ত-বহির্ভূত (প্রথম কথা দেখ)। এই তো দেখিতেছি যে, তোমার কথার ল্যাজার সঙ্গে মুড়া'র মিল নাই।

কাণ্টের ন্যায় অত-বড় একজন দার্শনিক পণ্ডিতের অমন একটা স্পষ্ট অসঙ্গতি-দোষ এ-দেশীয় লোকের চক্ষে খুবই আশ্চর্য্য ঠেকে, কিন্তু ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধির চক্ষে উহা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে। ইউরোপীয় ভেদবুদ্ধির ওকালতির বাক্‌ঝাপটে অমনতরো গণ্ডা-গণ্ডা অসঙ্গতি-দোষ অবলীলাক্রমে পার পাইয়া যায়।

ওকালতির নমুনা।

সব সত্যই আপেক্ষিক সত্য—কোনো সত্যই ঠিক্ সত্য নহে; অতএব ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঠিক্ সত্য না হইলেও মহামূল্য আপেক্ষিক সত্য, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই! আমিও বলি যে, "ঘুমপাড়ানী মাসী-পিসী"র ন্যায় তাহা মহামূল্য ছেলে-ভুলানিয়া সত্য!

বারান্তরে আমি দেখাইব যে, কাণ্ট্ ভেদবুদ্ধির কুহকে মুগ্ধ হইয়া সাধ করিয়া ঐ পাকচক্র-খেল্‌নে-ওয়ালা অসঙ্গতি-সর্পটা'কে দুগ্ধ দিয়া গ্রন্থমধ্যে পুষিয়াছেন! কাণ্টের উচিত ছিল, গোড়াতেই জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের একত্ব (যোগ এবং বৈচিত্র্যের বস্তুগত একত্ব) প্রতিপাদন করা। তাহা না করিয়া —গোড়াতেই তিনি ভেদবুদ্ধির উকিলী-ফন্দিতে ঘাড় পাতিয়া-দিয়া জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদের বীজ বপন করিয়াছেন। শেষে তাই আপনার ফাঁদে আপনি পড়িয়া নাকালের একশেষ হইয়াছেন।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রামায়ণ ও সমাজ।

আমাদের সমাজে বিবাহপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইবার পরেই যৌথ-পরিবারের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। যৌথ-পরিবারের শিক্ষানীতিও শৃঙ্খলার দিকে। এই শিক্ষা ব্যক্তিগত সুখ ও বিলাস-চেষ্টার প্রতিকূলে এবং উহা পরার্থ-ত্যাগ-স্বীকারের প্রবর্ত্তক। যৌথ-পারিবারিক জীবন শান্তি লক্ষ্য করে এবং ইহা বিরুদ্ধ-উপাদানবিশিষ্ট চরিত্রগুলিকে গড়িয়া-পিটিয়া এক ছাঁচে পরিণত করিতে চেষ্টা পায়। যেরূপ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুর চড়াইয়া বা নাবাইয়া একটি ঐকতান ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়, পারিবারিক শান্তি ও সাম্য-

রক্ষার জন্ম সেইরূপ একপরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় প্রবৃত্তির সহজ গতি কতকপরিমাণে পরিবর্ত্তিত করিতে হয়—এক প্রীতির তীর্থে বিরুদ্ধ প্রকৃতিসমূহের সুখ-মিলন ঘটিয়া থাকে। সামঞ্জস্য ও শান্তির জন্ম একটা অবিরাম চেষ্টায় গার্হস্থ্যজীবন সুরক্ষিত থাকে এবং এক পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির একটা নৈতিক সুশিক্ষা হইয়া থাকে—কারণ প্রত্যেকের আত্মদমনের চেষ্টা না হইলে শান্তির আবির্ভাব সম্ভবপর হয় না।

যে জলরাশির স্বাভাবিক গতি আছে, তাহা আপন নির্ম্মলতা রাখিয়া চলিতে পারে; কিন্তু জল দাঁড়াইয়া গেলে উহা পঙ্কিল ও নানারূপে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। যৌথ-পরিবার যতদিন স্বভাবের অনুকূলে গতিশীল থাকে, ততদিন ইহার ন্যায় হিতকর প্রভাব আর-কোনরূপ সামাজিক অবস্থার হইতে পারে না, কিন্তু গতি স্থির হইলে ইহাও অনিষ্টকর হইয়া উঠে। জীবনকে নিয়মিত করিবার অত্যধিক চেষ্টার সঙ্গে স্বাভাবিক শক্তির যে অপচয় ঘটে, তাহাতে অদম্য উৎসাহ, স্বাধীন চিন্তা ও মৌলিকতার বিকাশ ভালরূপ হয় না, এবং গুরুজনের আনুগত্য প্রতিভাবিকাশের পক্ষে পদে পদে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। লোকে যে পরিমাণে সহিষ্ণু হয়, সেই পরিমাণে তাহার নিজের মতের প্রতি আস্থা ও স্বীয় শক্তির উপর বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়;—যৌথ-পরিবারে স্নেহের অনুশীলন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহাতে হৃদয় এমন কোমল হইয়া পড়ে এবং এত অসঙ্গত দুশ্চিন্তা ও সাবধানতা উৎপন্ন হয় যে, মহৎ উদ্দেশ্যগুলি পদে পদে বাধা পায়। আমাদের দেশে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে গমনোন্মুখ ব্যক্তির মা, খুড়ী, মাসী, ভগিনী ভাবিয়া আকুল হন এবং ছেলেটি একটু দৌড়াইয়া খেলিতে ছুটিলে স্নেহাতুর আত্মীয়গণ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া তাহার পাদক্ষেপ-নিয়মনের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। ইহার ফলে এই দাঁড়াইয়াছে যে, এক পরিবারের বহুলোক একত্র হইয়া অহরহ শিশুর জীবনরক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করে, অমনি স্বভাবও যেন একটি ক্রূর রহস্য দেখিবার জন্যই স্বীয় হিতকর বিধানগুলি লইয়া কার্য্যক্ষেত্র হইতে অপসৃত হয়। এদিকে নানারূপ অকর্ম্মণ্য উপদেশের হিড়িকে শিশুগুলি নিশ্চেষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির মত হইয়া যায়, আর সেই সঙ্গে অকালপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইতে চিরবঞ্চিত হইয়া পড়ে। শিশুকাল হইতে আমরা নিজের জন্ম ভাবিতে শিখি না, অপরে আমাদের ভাবনাগুলি ভাবিয়া দেয় এবং পিতামহী-মাতামহীর প্রণোদিত জীবনরক্ষার সাবধানতা আমরণ পশ্চাতে থাকিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিষয়ে কাপুরুষ করিয়া তোলে। শিশুকালে পা বাড়াইতে গেলেই আত্মীয়বর্গ যে আশঙ্কা দেখাইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহা ঘনীভূত হইয়া আমাদের উদ্যমের মুখ মুচ্ড়াইয়া দেয় এবং সর্ব্বপ্রকার উচ্চকার্য্যের জন্ম আমাদিগকে একান্তরূপে অযোগ্য করিয়া ফেলে। মুখে আমরা যতই পুরুষকারের গর্ব্ব করি না কেন, অনেকসময় যে যাত্রাকালে হাঁচি শুনিলে অন্তরাধিষ্ঠিত পঞ্চভূত ভয়ে শিহরিয়া উঠেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

যৌথ-পরিবার এখন একান্তরূপে কৃত্রিম

হইয়া উঠিয়াছে। স্বভাবের প্রয়োজন হইতেই পারিবারিক এই বন্ধন সৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু এখন এই বহুপূর্ব্বপ্রবর্ত্তিত প্রথা স্বভাবকে বহুদূরে ফেলিয়া একান্ত কৃত্রিমতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। আমরা আতপগৃহের তরুপল্লবের ন্যায় কতকটা অস্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছি; স্বভাবের মুক্তক্ষেত্র যে আমাদের আদিম ও প্রকৃত বাসস্থান, তাহা আমরা ভুলিয়া গিয়াছি;—কিন্তু তথাপি এ কথা স্থির যে, আমরা যতদূরেই স্বভাবকে সরাইয়া রাখিতে চেষ্টা করি, স্বভাব একদিন এই কৃত্রিম ও মিথ্যা মমতার বন্ধনবিস্তারী সমাজ হইতে তাহার স্বীয় সামগ্রী হরণ করিয়া লইবে; মৃত্যুর দিনে আমাদের মনে পড়িবে—যাহা শুভ, মৃত্যুর বিনিময়েও তাহাই আশ্রয় করা আমাদের উচিত ছিল; ভীতিদায়ক কৃত্রিম স্নেহের স্বর এই ক্ষুদ্রগৃহের প্রাচীরে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইবে—তাহার ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না, কিন্তু যে কল্যাণময়ী বাণী স্বর্গ হইতে মনুষ্যের কর্ণে নিরন্তর অভিঘাত করে, সেই শুভ আদেশ গ্রাহ্য করিয়া নির্ভীকভাবে কার্য্য করাই আমাদের সর্ব্বাবস্থায় শ্রেয়স্কর। মৃত্যু অতি ভীষণ, কিন্তু তাহার অপ্রার্থিত আলিঙ্গন অতি ভীরুব্যক্তিকেও একদিন স্বীকার করিতে হইবে,—কর্ত্তব্যসম্পাদনে মৃত্যুর ন্যায় মহান্ মহিমা আর কিসে দিতে পারে?

কিন্তু প্রথম যখন যৌথ-পরিবার-প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার অনতিপরে উহা এমন একটি অবস্থায় দাঁড়াইয়াছিল, যখন সমাজ স্বভাবের চিহ্নিত পথে চলিয়া স্বীয় বিধান রচনা করিত। এইজন্য ব্যক্তিগত-কর্ত্তব্যশিক্ষার পক্ষে যৌথ-পরিবার-প্রথা তখন একান্ত উপযোগী হইয়াছিল এবং উহাতে কৃত্রিমতার লেশস্পর্শ হইতে পারে নাই। যখন পিতৃস্নেহ ও মাতৃস্নেহ শুভ মন্দাকিনীর ন্যায় জীবনকে উর্ব্বরতা ও স্বাস্থ্যের শ্রী প্রদান করিত, অথচ তাহা মহাকর্ত্তব্যগুলি সম্পাদনের কোন অন্তরায় সৃষ্টি করিত না; যখন প্রেম যাহা চায়, দাম্পত্যবিধি প্রেমকে সেই অভীষ্ট বর দিয়া এক পুণ্যস্থলে অভিষিক্ত করিয়া রাখিত,—হৃদয়ের প্রগাঢ় বন্ধনই অঞ্চলবন্ধনের বাহ্যিক অনুষ্ঠানকে পবিত্রভাবে প্রকাশিত করিত; এখন যেরূপ বিবাহবদ্ধ দুইটি ভাগ্যহীন ব্যক্তি দুই ভিন্নমুখে তাকাইয়া পরস্পরের অনৈক্যজনিত ক্ষোভে দীর্ঘশ্বাসে জীবন কাটাইয়া দেয়,—স্বয়ংবর, গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত থাকায় দাম্পত্যের তখন এরূপ নিষ্ঠুর বিদ্রূপ সংঘটিত হইতে পারিত না,—যখন ভ্রাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি ও স্বামিভক্তি সম্বন্ধে চাণক্যপণ্ডিত নানারূপ শ্লোক সঙ্কলন করেন নাই ও পৌরাণিকগণ সাধারণকে সে পথে প্রবর্ত্তিত করিবার সাধু উদ্দেশ্যে স্বর্গ ও নরকের জল্পনায় নিরত হন নাই, অথচ ঐ সকল বৃত্তি স্বভাবতই সতেজ ও সুন্দর ছিল,—প্রেমের পুরস্কার ছিল প্রেম, সৎকর্ম্মের পুরস্কার ছিল আত্মতৃপ্তি, ইহা হইতে উচ্চতর স্বর্গের কল্পনা সমাজে প্রচলিত ছিল না; সেই যুগে সমস্ত বৃত্তির স্বাভাবিক উপায়ে বিকাশ ও চরিতার্থতা সম্পাদনের জন্য যৌথ-পরিবার-প্রথা উৎকৃষ্টরূপে মনুষ্যসমাজের উপযোগী ছিল।

সেইরূপ গৌরবোজ্জ্বল অবস্থা সমাজের কোনকালে হইয়াছিল কি না, জানি না; কিন্তু

সমাজ যে এইরূপ এক মহিমায় মণ্ডিত শান্তিময় নিকেতনে পৌছিতে পারে, রামায়ণকাব্যে সেই সম্ভাবনা যাথার্থ্যে পরিণত হইয়া অমরবর্ণে চিত্রিত হইয়া আছে। মনুষ্যের সংপ্রবৃত্তিনিচয়ের বিকাশ করিবার জন্য একটি মহাবিদ্যালয় আবশ্যক,—বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সমাজ সেই বিদ্যালয়ের স্থান গ্রহণ করিতে পারে নাই। সেই বিদ্যালয় স্বভাবের ছন্দে, উদার ধর্ম্মনীতির ভিত্তিতে গঠন করিতে হইবে—স্বর্গীয় পবিত্র আলোক এবং প্রাণসঞ্চারী বায়ুপথ নিরোধ করিয়া প্রাচীর তুলিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। রামায়ণে চিত্রিত যৌথ-পরিবার সেই মহাবিদ্যালয়।

এখানে দেখিতে পাই, রামসীতার প্রেম স্বাভাবিক প্রণয়িযুগ্মের প্রেম; উহা অবাধ, অপ্রমেয় ও সুন্দর, দাম্পত্যবিধি উহা পবিত্র করিয়া আকারিত করিয়াছে মাত্র। বিবাহপ্রথায় সামাজিক বলপ্রয়োগ দ্বারা দুই বিরুদ্ধ প্রকৃতির যে অবিরত মিলনচেষ্টা চলিতেছে এবং সহস্র নীতি ও ধর্ম্মের শ্লোক দুর্ভেদ্য হৃদয়দ্বারে প্রতিহত হইয়া নিরন্তর দাম্পত্যজীবনকে যে দুঃসহ ব্যথায় ব্যথিত করিতেছে, রামসীতার দাম্পত্য তাহা হইতে সম্পূর্ণরূপ পৃথক্ দৃশ্য দেখাইতেছে। এখানে স্বাভাবিক শীলতা সীতাকে পুরমহিলার কমনীয় সৌন্দর্য্য প্রদান করিয়াছে—কিন্তু স্বামীর বাহু অবলম্বনপূর্ব্বক বনযাত্রায় যে নির্ভীক অপূর্ব্ব প্রেমের মাহাত্ম্য সূচিত হইতেছে, তাহা খর্ব্ব করিবার জন্য কোন প্রতিবেশিনী স্বীয় রসনা দংশন করিয়া দাঁড়ান নাই এবং দম্পতির এই ব্যবহার নির্লজ্জতার চরম দৃষ্টান্ত কল্পনা করিয়া আত্মীয়াগণের গণ্ড লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠে নাই। স্বভাব যাহা চাহে, সমাজ এখানে তাহাই অনুমোদন করিতেছে। এস্থলে স্বাভাবিক প্রেম দাম্পত্যবিধিবদ্ধ হইয়া পুণ্যমঙ্গলময় হইয়া উঠিয়াছে এবং স্বভাববিধি ও সমাজবিধানের পরম ঐক্য দেখা যাইতেছে। বিশ্বনিয়ন্তা মাতৃগর্ভ হইতে যাঁহাদিগকে আমাদের পরমসহায় ও দক্ষিণবাহুর ন্যায় অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে সম্বদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এখন অনেকসময় কি নিষ্ঠুর ঔদাস্য ও স্নেহাভাব পরিলক্ষিত হইতেছে, অথচ বিষদুষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় এখন তাঁহারা যুক্ত থাকিয়া গার্হস্থ্যজীবনের স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নষ্ট এবং নানাপ্রকার অনর্থ উৎপন্ন করিতেছেন। কিন্তু ভরত ও লক্ষ্মণের স্নেহানুগ বশ্যতা কি সুন্দর ও স্বাভাবিক। হঠাৎ কোন অবস্থার তাড়নায় এক ভ্রাতা অপরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারেন, সম্পূর্ণ নিঃসম্পর্ক ব্যক্তির জন্যও অবস্থাবিশেষে মানুষ প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে পারে, কিন্তু ভরত ও লক্ষ্মণের মত জীবনসমর্পণের দৃষ্টান্ত বিরল। প্রাণদান অপেক্ষা জীবনদানের গৌরব সমধিক; প্রাণ একবার বই দেওয়া যায় না,—যদি বহুবার প্রাণ দেওয়ার কোন পথ থাকে, তবে তাহাকেই জীবনদান বলা যাইতে পারে। ভরত ও লক্ষ্মণ এইপ্রকারে জীবনদান করিয়াছিলেন। যৌথ-পরিবারের শিক্ষা ভিন্ন এই ভাবের জীবনোৎসর্গ সম্ভবপর নহে। স্বভাবের সঙ্গে যে-সমাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নাই, সে-সমাজে স্নেহ এরূপভাবে বিকাশ পায় না। এই স্থানেও দৃষ্ট হয়, কাব্যবর্ণিত সামাজিক জীবন স্বভাবের সঙ্গে

সহজ মিশ্রণের প্রীতিচ্ছটায় হাসিতেছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়ের অবস্থায় প্রাণের রক্ত দিয়া শিশুকে প্রতিমুহূর্ত্তে শত বিপদ্ হইতে রক্ষা করেন, তাঁহাদের ত্যাগ ও স্নেহের মধ্যে ভগবদ্দয়া মূর্ত্তিমতী,—পিতৃমাতৃভক্তিতে ঈশ্বরের পদে প্রদত্ত অঞ্জলীর পুষ্পগুলি সদ্য বিকাশ পাইয়া উঠে। যৌথ-পরিবারেই এই বৃত্তির সম্পূর্ণ বিকাশ পাইবার সুবিধা। রামের পিতৃভক্তিতে দেখা যায়, সমাজ স্বভাবপ্রদত্ত ভাবগুলি সুন্দররূপে বিকশিত করিতেছে মাত্র। কৌশল্যা যখন রামকে বলিতেছেন—"তোমাকে বনে যাইতে নিষেধ করিবার আমার শক্তি নাই,—তুমি স্বচ্ছন্দমনে বনে গমন কর,—যে ধর্ম্ম তুমি আশ্রয় করিলে, সেই ধর্ম্ম তোমাকে রক্ষা করিবেন;" কিংবা সুমিত্রা যখন লক্ষ্মণকে বলিতেছেন—"বৎস, হৃষ্টমনে বনে যাত্রা কর, রামকে দশরথ বলিয়া মনে করিও, সীতাকে আমার ন্যায় মনে করিও এবং অরণ্যকে অযোধ্যা বলিয়া জানিও;" তখন মনে হয়, অযোধ্যার সামাজিক শিক্ষা মাতৃস্নেহের সম্পূর্ণ বিকাশ করিয়াও স্বভাবের উন্নতধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় নাই। এখনকার মাতৃবর্গের আশঙ্কা হইতে সেই সকল স্নেহকম্পিত অথচ সুধীর আশিষবাণী কত অধিক গৌরব প্রকাশ করিতেছে। নিজের অপেক্ষা মহাগুণশালী কোন ব্যক্তির ভালবাসা পাইলে তাঁহাকে পূজা করিবার জন্য স্বভাবতই চিত্ত উদ্বেল হইয়া উঠে। এই স্বাভাবিক বৃত্তি গার্হস্থ্যজীবনে অনুচর্য্যার দ্বারা বিকশিত হয়। হনুমানের চরিত্রে আনুগত্যসম্পর্ক গৌরবান্বিত হইয়া উঠিয়াছে,—অযোধ্যার উচ্চ নৈতিকপ্রভাব বর্ব্বর জাতিগণের মধ্যেও উচ্চকর্ত্তব্যের অনুপ্রাণনা জন্মাইতেছে। যে দিক্ হইতেই দেখা যাউক, রামায়ণকাব্যে সমাজ ও স্বভাবের এক অপূর্ব্ব শুভমিলন দৃষ্ট হয়; মনুষ্য একত্র বাস করিয়া যে উন্নতি ও সৎশিক্ষালাভের প্রয়াসী ছিল, প্রকৃতি যেন এস্থলে তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রদান করিয়াছেন। আকাশের নীল প্রান্তভাগ যেরূপ সুদূর শ্যামাভ তরুশীর্ষের সঙ্গে একত্র মিশিয়া যায়, ব্যবচ্ছেদরেখার প্রতীতি হয় না, রামায়ণবর্ণিত সমাজ ও স্বভাবের নিয়ম সেইরূপ যেন এক বর্ণে এক ভাবে মিশিয়া গিয়াছে। এই কাব্যের এই অপূর্ব্বত্ব ইহার দিগ্বিজয়ি-কিরীট-স্বরূপ—এ বিষয়ে ইহার সমকক্ষ আর কোন কাব্য নাই। মহাভারতের সময় যৌথ-পরিবার সংযোগ অপেক্ষা অধিকতররূপে বিয়োগের মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল,—জ্ঞাতিবিরোধ মহাভারতের আখ্যানভাগ কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে; কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে ও যদুবংশের ধ্বংসে এই কথা সপ্রমাণ। এখন সমাজ ও স্বভাব আর পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া রাখে নাই, সমাজের অত্যূর্দ্ধে স্বভাবের স্বর্গ ক্রমশ সরিয়া পড়িতেছে—শাস্ত্রের ভেদ্ধিতে তাহা দর্শনীয় হইয়া উঠিয়াছে—সমাজ নিম্নে পড়িয়া মাটীর দিকে ধাবিত হইতেছে—মানুষ আর স্বভাবের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইতে সাহস পাইতেছে না,—কর্ত্তব্যের আলোর তীব্রতায় তাহার চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়,—এখন সে দৃষ্টি নিম্নদিকে আবদ্ধ রাখিয়া ধূলির ক্রীড়নক লইয়া ব্যস্ত হইয়াছে। পতনোন্মুখ পর্ণশালাকে যেমন নানারূপ কৃত্রিম অবলম্বন দ্বারা সমুন্নত

রাখিতে হয়, আমাদের স্বার্থশিথিল আশঙ্কা-জীর্ণ স্নেহের গৃহকে সেইরূপ এখন নানারূপ শাস্ত্রবচনের অবলম্ব দ্বারা কোনরূপে রক্ষা করিতে হইতেছে—কিন্তু গৃহটি বাসের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী হইয়া পড়িয়াছে। এখন আমরা গার্হস্থ্যজীবনের আদর্শকাব্য রামায়ণ পাইয়াছি, পারিবারিক স্নেহ স্বাভাবিকভাবে বিকাশ পাইয়া কিরূপ উন্নতধর্ম্মমূলক হইতে পারে, রামায়ণ পড়িয়া তাহা জানিতে পারিতেছি—কিন্তু রামায়ণকার এই মহাস্বপ্ন কোথায় পাইয়াছিলেন? নিশ্চয়ই সমাজ এই উন্নত ভিত্তির উপর একবার দাঁড়াইয়াছিল। জলবিম্বে যেরূপ গগন-মেদিনীর প্রতিচ্ছায়া ফুটিয়া উঠে, ক্ষুদ্র মনুষ্যসমাজেও তখন সেইরূপ সনাতন ধর্ম্ম ও নীতির প্রতিফলন হইয়াছিল—রামায়ণবর্ণিত সমাজ স্বপ্ন বলিয়া বোধ হয় না, উহা তৎকালীন সমাজের যথার্থ অবস্থা।

মনুষ্যের কতকগুলি এমন বিপদ্ আছে, যাহা হইতে সমাজ তাহাকে রক্ষা করে না—মৃত্যু, শোক, নানাপ্রকার নৈরাশ্য ও ব্যাধি চিরদিনই তাহাকে প্রপীড়িত করিতেছে। এই সমস্ত স্বাভাবিক দুঃখ ও বিপদ্ মনুষ্যজীবনকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে, অথচ আমাদের আধুনিক সমাজের শিক্ষাদীক্ষা এরূপ যে, তাহাতে আমাদিগকে বিপদে বিমুখ করিতে সর্ব্বদাই অভ্যস্ত করিতেছে। কল্য যাহার একটি পদ ডাক্তারে ছেদন করিয়া দিবে, তাহাকে কুশকণ্টকের আশঙ্কায় আতঙ্কিত করিয়া দূরদর্শী বলিয়া যিনি পরিচিত হইতে চান, তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয়ই তাহাতে প্রকট হইয়া উঠে। এদেশে সাবধানতার প্রতি প্রীতির মাত্রা বড় বৃদ্ধি পাইতেছে। হয় ত কোন নিগূঢ় শুভ অভিপ্রায়ে বিশ্বের মহাভিষক্‌রাজ আমাদের স্বর্ণপাত্রকে মৃৎপাত্রে পরিণত করিবেন, ময়ূরের পক্ষ হইতে হয় ত একটি একটি করিয়া পালক তুলিয়া লইবেন, যাহা একান্ত যত্নে রক্ষণীয়, তাহাকেই হয় ত নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে হরণ করিবেন; সুতরাং এই সম্পূর্ণ অনায়ত্ত অবস্থার দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, যাহা কর্ত্তব্য—যাহা শ্রেয়, কেবল তাহারই প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দুঃখকে মাথায় তুলিয়া লইতে হইবে। এইরূপ স্বেচ্ছা-বৃত দুঃখেই মনুষ্যের মহত্ত্ব।

রামায়ণ-কাব্য অপূর্ব্ব সামাজিক কাব্য। উহা যৌথ-পরিবারের প্রীতিসমুদ্রের উচ্ছলিত লীলা দেখাইতেছে, কিন্তু মানবগৃহের ঊর্দ্ধে আশ্বাস ও শান্তির যে জয়দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে, তাহারই অভয় ও নিত্য-উদ্দীপনাময় রব উহার চরিত্রবর্গকে কার্য্যে প্রবুদ্ধ করিতেছে। উহাতে হিন্দুগৃহের পবিত্র-প্রেমের চরমকথা উচ্চারিত হইয়াছে, অথচ আধুনিক হিন্দুগৃহের কাপুরুষতা ও ভীরুতা উহাকে স্পর্শ করে নাই। মাহাত্ম্যের দিব্য-দ্যুতিমণ্ডিত হইয়া উহার পাত্রবর্গ একটি চিরশুভ সহজ কর্ত্তব্যের পথ দেখিতেছিলেন,—রাজপ্রাসাদের বন্দিতানমুখরিত শুকালাপ-নিনাদিত কক্ষের স্বর্ণাস্তরণময় কোমল শয্যা এবং বন্য স্থণ্ডিলভূমি ও ইঙ্গুদীমূলস্থ তৃণশয্যা তাঁহাদের নিকট তুল্য ছিল। বরঞ্চ সাধুপুষ্পিত চিত্রকূটের অরণ্য অযোধ্যার শোভাসম্পদ্ অপেক্ষ অধিকতর হৃদয়াকর্ষী হইয়া উঠিয়াছে, —অযোধ্যাবাসী রাজকুমার অপেক্ষা দণ্ডকারণ্যের কৌপীনসার সন্ন্যাসীর চিত্র আমাদের

নিকট সমধিক শোভন ও প্রীতিপ্রদ। হিন্দুর গৃহে এই অভয় কর্ত্তব্যের পতাকা ফিরিয়া আসুক,—যে স্নেহমধুর গার্হস্থ্যচিত্রাবলী কর্ত্তব্যের স্বর্গীয়চ্ছটার অভাবে আজ জগচ্চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, তাহার উপর আর একবার মহালক্ষ্য ও উন্নত কর্ত্তব্যের জ্যোতীরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া পড়ুক;—রামায়ণকাব্যের গার্হস্থ্যজীবন যেমন উজ্জ্বল হইয়াছে, সেইরূপে আমাদের বর্ত্তমান জীবনকে উজ্জ্বল করিয়া আমাদের স্নেহ, দয়া, বিশ্বপ্রেম—যাহা সেই একটিমাত্র আলোকের স্পর্শ প্রতীক্ষা করিতেছে —কর্ত্তব্যের নবোদিত আলোক লাভ করিয়া জগতের চিরারাধ্য মূর্ত্তিতে আবিষ্কৃত হইবে। এখন আমরা কর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ, তাই কেহ বিশ্বাস করিতে পারি না যে, এই কাপুরুষতা-কলঙ্কিত জাতীয়জীবনের অভ্যন্তরে কতকগুলি এমন সৎপ্রবৃত্তি বিকাশ পাইয়াছে, যাহা পৃথিবীর অন্যত্র বিরল। আমাদের ক্ষমা শত্রুমিত্রকে সমভাবে বাহুপ্রসারণ করিয়া আলিঙ্গন করে; বৈষ্ণবগণ কাহাকেও ক্ষমা করিবার অধিকারই স্বীকার করেন না, তাঁহারা আপনাদিগকে সর্ব্বদা সকলের ক্ষমার্হ বলিয়াই মনে করেন। সজ্জন ও অসজ্জন, উভয়ের পাদসরোজে প্রণাম, এ কথা এই ভারতবর্ষের লোকেই বলিতে পারিয়াছেন। আমাদের দয়া কেবল মনুষ্যের মধ্যে আবদ্ধ নহে—সর্ব্বভূতের জন্য তাহার উদার ও মুক্ত পরিবেষণ,—কীটপতঙ্গতরুপুষ্পের প্রতিও তাহা বিমুখ নহে। আমাদের ঋষিগণ গলিতপত্র আহার করিয়া ধর্ম্মব্রত পালন করিতেন, শকুন্তলা আপনার পৃষ্ঠবিলম্বিত কেশরাশির শোভাসংবর্দ্ধনের জন্য একটি পল্লবকেও বৃক্ষচ্যুত করিতে পারিতেন না,—এ সকল কবিকল্পনা নহে,—বিশ্বপ্রেম এমনই উদার কোমলতায় হিন্দুর হৃদয় পূর্ণ করিয়াছিল। এখনও এদেশের গৃহলক্ষ্মীগণ গৃহের সামান্য পরিচারকদিগকেও অগ্রে ভোজন করাইয়া আপনারা সর্ব্বশেষে খাইয়া থাকেন। বিধবাগণের কঠোর ত্যাগের ছবি এখনও আমাদের চক্ষুর উপর বিরাজ করিতেছে। আধুনিক সভ্যতার বিলাসকলা-বিড়ম্বিত রমণীমণ্ডলীর নিকট নিবৃত্তির এই নির্ম্মল আদর্শ কি চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়া থাকিবে? আমরা "জাতি" এই শব্দের অর্থ বুঝি নাই, nationality কথা বিদেশীর; আমরা পক্ষপাতদুষ্ট ক্ষুদ্র গণ্ডীর সৃষ্টি করি নাই, আমাদের নীতি ও শিক্ষাদীক্ষা উদার, বিশ্বজনীন, প্রশস্ত। "সতত অভ্যাগত গুরু" "অহিংসা পরম ধর্ম্ম", প্রভৃতি কথাগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, আমরা জাতি কি বর্ণের প্রতি লক্ষ্য করি না,—আমাদের শিক্ষানীতি সমগ্র জগৎকে লক্ষ্য করে। আমাদের প্রেম, আমাদের ক্ষমা, আমাদের স্বার্থ ব্যক্তিগত নহে—জাতিগত নহে—উহা সর্ব্বজনীন, উহা উদার বায়ুমণ্ডলের ন্যায় বিশ্বব্যাপক,—বিশ্বরক্ষার চিরন্তন নিয়মাবলীর মধ্যে গণ্য। আমাদের ধর্ম্ম কে না জানে—পিতাপুত্রের সম্বন্ধের ভিতরে, বান্ধবতার ভিতরে, দাম্পত্য ও ভৃত্যভাবের ভিতরে, বাৎসল্যের রূপে, সখ্যের রূপে, মাধুর্য্যের রূপে, দাস্যের রূপে সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ। তাহার উচ্চ শান্তিনিলয় বেদান্তধর্ম্ম; সে রাজ্য কলহদুষ্ট, স্বার্থপুষ্ট, ব্যাধের ন্যায় লুব্ধ মনুষ্যজগতের অত্যূর্দ্ধে—যেখানে আমাদের হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ,

এই শান্তি ও ধর্ম্মের রাজ্য যেন সেইখানে। ইহার পরম পরিতৃপ্তি মনুষ্যকে চিরমৌনী করিয়া ফেলে, ইহা সমস্ত ভেদবুদ্ধি মুছিয়া-ফেলিয়া মনুষ্যের যে গম্ভীর, সৌম্য ও করুণার মূর্ত্তি প্রদর্শন করে, তাহা জগতে অতুলনীয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

পরলোকগত সতীশচন্দ্র রায়।

জীবনে যে ভাগ্যবান্ পুরুষ সফলতালাভ করিতে পারিয়াছে, মৃত্যুতে তাহার পরিচয় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। তাহাকে যেমন হারাই, তেমনি লাভও করি। মৃত্যু তাহার চারিদিকে যে অবকাশ রচনা করিয়া দেয়, তাহাতে তাহার চরিত্র, তাহার কীর্ত্তি, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবপ্রতিমার মত সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু যে জীবন দৈবশক্তি লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, অথচ অমরতালাভের পূর্ব্বেই মৃত্যু যাহাকে অকালে আক্রমণ করিয়াছে, সে আপনার পরিচয় আপনি রাখিয়া যাইতে পারিল না। যাহারা তাহাকে চিনিয়াছিল, তাহার বর্ত্তমান অসম্পূর্ণ আরম্ভের মধ্যে ভাবী সফল পরিণাম পাঠ করিতে পারিয়াছিল, যাহারা তাঁহার বিকাশের জন্য অপেক্ষা করিয়া ছিল, তাহাদের বিচ্ছেদ-বেদনার মধ্যে একটা বেদনা এই যে, আমার শোককে সকলের সামগ্রী করিতে পারিলাম না। মৃত্যু কেবল ক্ষতিই রাখিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র সাধারণের কাছে পরিচিত নহে। সে তাহার যে অল্প-কয়টি লেখা রাখিয়া গেছে, তাহার মধ্যে প্রতিভার প্রমাণ এমন নিঃসংশয় হইয়া উঠে নাই যে, অসঙ্কোচে তাহা পাঠকদের কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে আত্মমহিমা প্রকাশ করিতে পারে। কেহ বা তাহার মধ্যে গৌরবের আভাস দেখিতেও পারেন, কেহ বা না-ও দেখিতে পারেন, তাহা লইয়া জোর করিয়া আজ কিছু বলিবার পথ নাই।

কিন্তু লেখার সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যক্তি লেখকটিকেও কাছে দেখিবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়াছে, সে ব্যক্তি কখনো সন্দেহমাত্র করিতে পারে না যে, সতীশ বঙ্গ-সাহিত্যে যে প্রদীপটি জ্বালাইয়া যাইতে পারিল না, তাহা জ্বলিলে নিভিত না।

আপনার দেয় সে দিয়া যাইতে সময় পায় নাই, তাহার প্রাপ্য তাহাকে এখন কে দিবে? কিন্তু আমার কাছে সে যখন আপনার পরিচয় দিয়া গেছে, তখন তাহার অকৃতার্থ মহত্ত্বের উদ্দেশে সকলের সমক্ষে শোকসন্তপ্ত চিত্তে আমার শ্রদ্ধার সাক্ষ্য না দিয়া আমি থাকিতে পারিলাম না। তাহার অনুপম

হৃদয়মাধুর্য্য, তাহার অকৃত্রিম কল্পনাশক্তির মহার্ঘতা, জগতে কেবল আমার একলার মুখের কথার উপরেই আত্মপ্রমাণের ভার দিয়া গেল, এ আক্ষেপ আমার কিছুতেই দূর হইবে না। তাহার চরিত্রের মহত্ত্ব কেবল আমারি স্মৃতির সামগ্রী করিয়া রাখিব, সকলকে তাহার ভাগ দিতে পারিব না, ইহা আমার পক্ষে দুঃসহ।

তাহার জীবনের শেষ রচনাটি মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্ব্বে একখানি পত্রের সহিত আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছিল। সেই পত্রে অন্যান্য কথার মধ্যে তাহার ভাবী জীবনের আশা, তাহার বর্ত্তমান জীবনের সাধনার কথা সে লিখিয়াছিল—সে সব কথা এখন ব্যর্থ হইয়াছে—সেগুলি কেবল আমারি নিকটে সত্য—অতএব সেই কথাকয়টি কেবল আমি রাখিলাম—তাহার পত্রের অবশিষ্ট অংশ ও তাহার কবিতাটি এইখানে প্রকাশ করিতেছি।

সতীশের শেষ রচনাটি 'তাজমহল'নামক একটি কবিতা। কিছুদিন হইল, সে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছিল। আগ্রার তাজমহল-সমাধির মধ্যে সে মমতাজের অকালমৃত্যুর সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিল। অসমাপ্তির মাঝখানে হঠাৎ সমাপ্তি—ইহারও একটা গৌরব আছে। ইহা যেন একটা নিঃশেষবিহীনতা রাখিয়া যায়। পৃথিবীতে সকল সমাপনের মধ্যেই জরা এবং বিকারের লক্ষণ দেখা দেয়, সম্পূর্ণতা আমাদের কাছে ক্ষুদ্র সসীমতারই প্রমাণ দিয়া থাকে। অতুল সৌন্দর্য্য-সম্পদও আমাদের কাছে মায়া বলিয়া প্রতিভাত হয়; কারণ, আমরা তাহার বিকৃতি, তাহার শেষ দেখিতে পাই। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বিকশিত হইয়াছে, সে মুহূর্ত্তের শেষ কোথায়? অনন্তের মধ্যে তাহা অনন্ত হইয়া আছে—তাহা শেষ হয় নাই। অকাল-সমাপ্তিতে এই নিঃশেষবিহীনতা আমাদের চিত্ততন্ত্রীকে সুদীর্ঘ অনুরণনে ঝঙ্কৃত করিতে থাকে।

মমতাজের সৌন্দর্য্য এবং প্রেম অপরিতৃপ্তির মাঝখানে শেষ হইয়াই অশেষ হইয়া উঠিয়াছে—তাজমহলের সুষমাসৌষ্টবের মধ্যে কবি সতীশ সেই অনন্তের সৌন্দর্য্য অনুভব করিয়া তাহার জীবনের শেষ কবিতা লিখিয়াছিল।

সতীশের তরুণ জীবনও সম্মুখবর্ত্তী উজ্জ্বল লক্ষ্য, নবপরিস্ফুট আশা ও পরিপূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনের মাঝখানে অকস্মাৎ গত মাঘী পূর্ণিমার দিনে সমাপ্ত হইয়াছে। এই সমাপ্তির মধ্যে আমরা শেষ দেখিব না, এই মৃত্যুর মধ্যে আমরা অমরতাই লক্ষ্য করিব। সে যাত্রাপথের একটি বাঁকের মধ্যে অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু জানি, তাহার পাথেয় পরিপূর্ণ—সে দরিদ্রের মত রিক্তহস্তে জীর্ণশক্তি লইয়া যায় নাই।

পত্র।

ব্রহ্মবিদ্যালয়,
বোলপুর।

* * * * * *

আমি এই চিঠিতে 'তাজমহল' বলিয়া একটি কবিতা পাঠাইতেছি। এটা এখানে আসিয়া লিখিয়াছি।

দেখিয়াছি, তাজমহল দুটি ভাবে মনকে

রুদ্ধ করে। দিনের আলোকে, মলিন নরনারীর মধ্যে, ধূলা, শুষ্ক যমুনা, রেলের চীৎকার, ইংরাজের মূর্ত্তিমান্ কর্ম্মবেগ রেলগাড়ির দৌড়ের মধ্যে, কালের পরিহাসপূর্ণ লীলার মধ্যে—তাজমহলটাকে বড়ই বাহুল্য বলিয়া মনে হয়। সমস্ত মানুষের সঙ্গে সহানুভূতির রসে এই মর্ম্মরের রঙীন্ লতাপাতা উপচিত নয়। সমস্ত সংসারের সঙ্গে সমভূমিতে না দাঁড়াইয়া কবরটি যেন একটা উচ্চ জমির উপর দাঁড়াইয়াছে। ইহার Harmonious সৌষ্ঠব, ইহার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতা, ইহার বিরল চিত্রবিলাস—সমস্ত লইয়া ইহা যেন আমাদিগকে বাহিরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। বিশেষত বুদ্ধগয়ায় পূজার ভাবে আচ্ছন্ন নরনারীর ভক্তিপূর্ণ লীলায় তরঙ্গায়িত অশোক-রেলিংএর চিত্রমালা আগে দেখিয়া আসিয়াছিলাম বলিয়া তাজমহলের বিলাসের ভাবটাতে এত ব্যথা পাইয়াছিলাম। মনে হয়, চারিদিক্ হইতে সমস্ত বাজার, সমস্ত লোক উঠাইয়া দিয়া একটি নির্জ্জন প্রান্তরের মধ্যে রাখিয়া দিলেই তাজমহলের শ্রান্ত-উৎসার উৎসমুখগুলির রুদ্ধ শোকের প্রতি কতকটা সম্মান করা হয়।

এটা বড় নিষ্ঠুর ভাব। কিন্তু রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে তাজের Perfect harmonyটি যখন মনকে জড়াইয়া ধরে, তখন তাজকে আর নির্জীবভাবে, পার্থিবভাবে দেখিবার জো নাই। তখন তাজকে বাহুল্যবর্জ্জিত একটি নিগূঢ় গীতের মত করিয়া অনুভব করিতে ইচ্ছা হয়। বিশেষত আমি যখন দূরে আছি, তখন সেই ভাবেই তাজকে বেশি মনে পড়ে। আমি সেই ভাবটিই আমার কবিতাটিতে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি।

* * * * * *

এই গেল আমার মনের কথাটা—এখন কবিতার সৌষ্ঠব কতদূর হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার কথার অপেক্ষায় রহিলাম।

এবার দিল্লি, আগ্রা, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান দেখিয়া মনে আরও অনেক ভাব উঠিয়াছে—বাস্তবিক ৮ দিনের মধ্যে যেন খানিকটা বাড়িয়া উঠিয়াছি। * * *

বুদ্ধগয়ায় যখন অশোক-রেলিং দেখিলাম—রাঙা পাথরে যক্ষ আঁকা, যক্ষী আঁকা—নানা করুণার দৃশ্য আঁকা—বাড়িটি গাছপালায় ঢাকা, নির্জ্জন—চারিদিকে স্তূপ—একজন জাপানী penitent জাপান হইতে প্রেরিত বুদ্ধের কাছে থাকে—তিব্বত হইতে, সিমলা হইতে গরীব-দুঃখী আসিয়া বাস করিতেছে—বর্ম্মা হইতে কতগুলি ঘণ্টা উপহার পাঠাইয়াছে—তখন মনে হইল, এই ভারতবর্ষের একটি ছায়াঢাকা গ্রামের মধ্যে একটি করুণার উৎস আছে—কক্ষে কলস লইয়া সমস্ত এসিয়া-সুন্দরী সেখানে তৃষ্ণা মিটাইতে আসিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে সোনার পাতে ঢাকা বৌদ্ধমূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় এমন ভাবে নড়িয়া উঠিল যে, তেমন হৃৎকম্প আমি পূর্ব্বে কখনো অনুভব করি নাই।

কিন্তু বুদ্ধদেব আজ স্তম্ভিত। আপনি যে হিমালয়সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সেইরূপ আজ—"সে প্রচণ্ড গতি অবসান।" এই প্রচণ্ড করুণার উৎসটির স্তম্ভিত গাম্ভীর্য্যের নাড়া প্রাণে অনুভব করিয়াছি। অন্ধকার পৃথিবীর

সহিত মিল নাই—চতুর্দ্দিকে নূতন রাগিণী উঠিয়াছে—তাই বুদ্ধদেবও যেন ধরণীর বক্ষ-কোটরে প্রবেশ করিয়াছেন। আপনি যে "মন্দির" লিখিয়াছেন—"রচিয়াছিনু দেউল একখানি"—তাহাতে আপনি এই বুদ্ধদেবকে বাহির হইয়া আসিতে ডাক দিয়াছেন—বিশ্বের কর্ম্মের মধ্যে, আনন্দকোলাহলের মধ্যে তাঁহাকে সার্থক হইতে আহ্বান করিয়াছেন—তাহা যেদিন হইবে, সেদিন সত্য-সত্যই পৃথিবীতে নূতন আলো আবির্ভূত হইবে। আমি ঐ গানের অর্থ ভালরূপেই বুঝিয়াছি। কারণ, উহার আগের পর্দ্দা হইতে যে একটি গান উঠিতেছে, তার স্বর শুনিয়া এবার আমাকে অশ্রুতে অন্ধ হইয়া আসিতে হইয়াছে। আমার মনে হইয়াছে, যেন পৃথিবী অর্থাৎ সমস্ত মনুষ্যসাধারণের হৃদয় একটি নারী—এবং দিব্যসংবাদবাহী মহাপুরুষগণ ঐ নারীর প্রাণের প্রিয়। পুরুষ আসিয়া নারীকে যখন ভালবাসে, তখন নারী এক অপূর্ব্ব আনন্দে কাঁপিয়া উঠে। বুদ্ধদেবের ভালবাসার ডাকে অশোকপ্রমুখ নারীহৃদয় আনন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল—কল্যাণকর্ম্মে উৎসব বিস্তার করিয়া, কলাকাণ্ডে মঙ্গলভূষা পরিয়া ঐ নারী পুরুষটিকে হৃদয়ের মধ্যে বরিয়া লইয়াছিল।

কিন্তু কালের লীলায় ক্রমে সেই আনন্দমিলনের উৎসব থামিয়া গেল। আজ যেন বুদ্ধগয়ার পাহাড়গুলির মধ্যে শুষ্ক নৈরঞ্জনা ও মাহীর তীরে ছায়াঢাকা গ্রামটিতে পা ছড়াইয়া সেই নারী অন্ধের মত, অবচনার মত মন্দিরবক্ষকোটরে সেই পুরুষের ছবি লইয়া বসিয়া আছে। আজও তাঁর অবসন্ন হস্ত বর্ম্মা এবং জাপান এবং তিব্বত হইতে সমাগত কাঙালার মুখে অন্ন তুলিয়া দিতেছে—কিন্তু "সে প্রচণ্ড গতি অবসান!" ফল্গুর মধ্যে যে অপরিচ্ছন্ন নরনারী কাপড় ধুইতেছে, তাদের সঙ্গে ঐ নারীর হৃদয়ের কোনো যোগ আছে? ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট—কে যে সাহেব বিনা অপরাধে তাঁর এক চাপরাশি ছাড়াইয়া দিতে হুকুম করিতেছে, তার হৃদয়ে উহার কোনো প্রেরণা সঞ্চারিত হয়? তা ছাড়া, আমরা যে স্বচ্ছন্দমনে নানা বাজে কল্পনা লইয়া বেড়াইতেছি এবং সাহেবের রেলের তলে পড়িয়া মারা যাইতেছি, আমাদের সঙ্গেই বা তাহার কোথায় যোগ? স্তম্ভিত প্রকাণ্ড পাথরের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলি এবং অল্প একটুকুন্ অশোকের রেলিং এখনো যা বজায় আছে—তার আনন্দহিল্লোলিত ভক্তিভঙ্গিসুন্দর ছবিগুলি দেখিয়া আমার হৃদয় এইরকম একটা দুঃখের ভাবেই নাড়া পাইয়াছে! এই স্তম্ভিত পাথর মনের মধ্যে এমন একটি অবসাদের মেঘ ঘনাইয়া আনে যে, চোখের জলে আর কিছুই দেখা যায় না—আর উঠিয়া চলিবার সামর্থ্য যেন থাকে না।

* * * * * *

তাজমহল।

মর্ম্মরকবর নহে—নহে কভু নহে।
স্বরগের ফুলরাশি চিত্ত মোর কহে।
নন্দনবনের গাছে
যেই ফুল ফুটে আছে
তারি একরাশ সেথা স্তূপ হয়ে রহে,-
মর্ম্মরের নিরমাণ নহে কভু নহে।

নীল নদী যমুনার বক্ষ উজলিয়া
নন্দনেরি পুষ্পরাশি পড়েছে ঝরিয়া।
ফুলেরি নিশ্বাস লভি'
নিভেছে সে জীব-রবি,
কুসুমেরি ঘায় তাজ গিয়েছে মরিয়া!
নন্দনেরি ফুল সেথা পড়েছে ঝরিয়া।

শুভ্রতনু ঋষিবর চলেছিলা কবে
ঝঙ্কারিয়া সুরবীণা পূরণিমা-নভে।
শাজাহাঁর অঙ্কে লীন
মমতাজ সেই দিন
স্বপ্ন দেখেছিল এক প্রণয়-উৎসবে,—
বীণাধ্বনি বেজেছিল পূরণিমা-নভে।

যমুনাকল্লোল কানে এসেছিল তার—
ভাবিল সে এ রজনী না পোহাক্ আর!
অমনি তাহাই হ'ল
বীণা হ'তে খসে প'ল
প্রেমসখী মরণের চিহ্ন ফুলহার!
পূরণিমা রাতি সেই পোহাল না আর।

তাই তার মৃতমুখে সুখের স্বপন
ফুটেছিল চন্দ্রকলাসম বিমোহন।
সহস্র বিলাপে তাই
হাস্যরুচি মুছে নাই,
হাসি ঘিরে ঘুরিয়াছে আকুল কাঁদন—
তার মুখে ফুটে আছে সুখের স্বপন।

সে সুখহাসির তুলা নন্দনেরি ফুল,—
একরাশি ঢেলে গেছে সুরনারীকুল।
নাড়িয়া মন্দারশাখা,
পারিজাতে দিয়ে ঝাঁকা,
যমুনার তটভূমি করেছে আকুল!
সে সুখহাসির তুলা স্বরগেরি ফুল।

পাতশাহ গিরি ভাঙি' আনিয়া পাথর
রচেছে কি একখানি ধবল কবর?
আমি দেখি নাই তাহা,
দিবালোকে সবে যাহা
নেহারি প্রশংসাবাণী কহে বহুতর—
আমি দেখি নাই সেই মর্ম্মরকবর!

চৌদিকে উড়িছে ধূলি, দীপ্ত ভানু শিরে,
লাঙল চালায় চাষী বালুবক্ষ চিরে,
শুষ্ক নীর যমুনার,
তাহারি অদূরে আর
দীনহীন বিমলিন নরনারী ফিরে,—
শকটশ্বসিত ধূম উঠে নভ ঘিরে;—

আমি দেখি নাই সেই মর্ম্মরকবর!
জ্যোৎস্নাচন্দনের রসে রাত্রি জরজর—
তাজেরি হাসির মত
আধো চাঁদ অবনত

নিরখে পুঞ্জিত শুভ্র স্ফুট ফুলথর,—
ভরপুর যমুনার নীল কলেবর,—

সেই দেখিয়াছি আমি, কুসুমের স্তূপ
হাসিজ্যোৎস্নামাধুরীতে ধৌত অপরূপ !
শুনিয়াছি সুরবীণ—
চিত্তের মাঝারে লীন
আজো আছে—চিরদিন রহিবে স্বরূপ।
সেই দেখিয়াছি আমি কুসুমেরি স্তূপ।

মর্ম্মরকবর নহে—নহে কভু নহে—
কুসুমের রাশি সে যে চিত্ত মোর কহে !
নন্দনবনের গাছে
যেই ফুল ফুটে আছে
তারি সেথা একরাশ স্তূপ হয়ে রহে।

আগ্রাপ্রান্তরে।

ছিন্নপাখা মৈনাকের মত চারিধার
দুর্গ সারে-সার
পড়ি আছে পরিশ্রান্ত ধূলায় ধূসর কান্ত
তীরে যমুনার—
ছিন্নপাখা মৈনাকের মত সারে-সার।

গুম্বুজে বুরুজে হর্ম্ম্যে কবরে কেল্লায়
ধ্বংসরাশি ভায় !
মর্ম্মরে পাথরে স্বর্ণে সফেদ শোণিম বর্ণে
রাগিণী মিলায়—
সৌন্দর্য্যই শূন্যের মৃত্যুগীত গায়।

এই ধূলি-বিপাণ্ডুর প্রান্তরের মাঝে
যেন বসি আছে
অন্ধ এক নিশাচরী কিবা দিবা বিভাবরী
বিনাশের কাজে
ধূলি-বিপাণ্ডুর এই ধ্বংসরাশিমাঝে !

সে কভু জাগিবে নাক চিররাত্রিচরী,
হেথা রবে পড়ি'—
শত শত ইন্দ্রপুর সে শুধু করিবে চুর
মুষ্টিমাঝে ধরি'—
নিশ্বাসে উড়াবে ধূলি প্রান্তর-উপরি !

তারি পদপ্রান্ততলে আমি পড়ে' আছি,—
মনে লয় আজি
অতীত পাতালপুরে প্রপুতস্বর বহুদূরে
কর্ণে উঠে বাজি ;—
সেই গানে কান দিয়া পড়ে' আছি আজি !

রক্তমাখা শতদল হৃদয় আমার
ব্যথায় বিদার—
ছিন্ননাল হেথা পড়ি ধূলে যায় গড়াগড়ি
উঠিবে না আর !
এই ধূলিপুঞ্জ'পরে সমাধিশয়ন
করেছে রচন !
আনো আনো সুনির্ম্মল নীল যমুনার জল
কর প্রক্ষালন
বাঁচাও হৃদয়ে ঢালি বারি সঞ্জীবন !

হে জননি, সঞ্জীবনি, অমৃত পিয়াও !
ধূলা মুছে দাও !
সমাধিশয়ন হ'তে তুলি' মোর ধরি হাতে
বনান্তে পাঠাও !
হে জননি, কবরের ধূলি মুছে দাও !

৺সতীশচন্দ্র রায়

গণেশের পূজা।

ত্রিবেদী মহাশয়ের সমালোচনা পড়িয়া সুখী হইলাম। প্রাচীন কথার অনুসন্ধানে অনেক সন্দেহ থাকিয়া যায়; সেজেই এপ্রকার সমালোচনা বড় উপযোগী। ত্রিবেদী মহাশয়ের সুযোগ্য অনুসন্ধানে যখন গণেশের ইতিহাসে অন্য কোন পুরাতন কথা পাওয়া যায় নাই, তখন আমার ইতিহাসটা ঠিক হইয়াছে বলিয়া আনন্দিত হইতেছি। যে উপনিষৎখানির দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, উহা অত্যন্ত অর্ব্বাচীন। ওখানিতে যে উপনিষদের কোন লক্ষণ নাই, তাহা ত্রিবেদী মহাশয় বলিয়াছেন। ওখানি যে পৌরাণিকযুগের গ্রন্থ, তাহাতেও ভুল নাই; কারণ সমুদায় পৌরাণিক দেবতাদের নাম এবং একালের স্বরূপগুলি উহাতে আছে। পৌরাণিকযুগের দেবতাগুলি বৈদিক নহেন বলিয়াই পরবর্ত্তী সময়ে উঁহাদিগকে বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অনেক চাতুরীর খেলা হইয়া গিয়াছে। উপনিষদের নাম দিয়া বিশুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে 'আল্লার' নামেও উপনিষৎ প্রস্তুত হইয়াছিল। 'আল্লা' কথাটা না থাকিলে উহার সময় লইয়াও গোল উঠিতে পারিত।

শিব যখন সমুদায় পৌরাণিক অবয়বে পরিপূর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কতকগুলি প্রাচীন বৈদিক শ্লোকের সহিত একালের রচনা মিশ্রিত করিয়া এবং স্থানে স্থানে বৈদিক রচনারীতির অনুকরণ করিয়া রুদ্রাধ্যায় লিখিত হইয়াছিল। সায়ণাচার্য্য চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এখানিরও ভাষ্য লিখিয়াছেন। সকল দেবতাদের জন্যই ঐরূপ গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। বাহুল্যভয়ে দৃষ্টান্ত দিলাম না।

গণেশের নামে প্রথমত দ্রাবিড়দেশে একখানি বৈদিক গ্রন্থ প্রণীত হয়; সেখানি গণেশাথর্ব্বশীর্ষ। অথর্ব্ববেদের সহিত যুক্ত করিয়া গণেশের কথা বলিবার বিশেষ কারণ ছিল। বেদত্রয়ে ভূতপ্রেতাদির পূজা নাই; কিন্তু অথর্ব্ববেদে আছে। ঐ সকল ভূতপ্রেতপূজার উৎপত্তির ইতিহাস সময়ান্তরে লিখিব। এই ভূতপ্রেতপূজার জন্য অথর্ব্ববেদ বহুকাল পর্য্যন্ত আর্য্যদের অগ্রাহ্য ছিল। যে সকল ব্রাহ্মণ ভূতপ্রেতের পূজা করিতেন, তাঁহাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত। মনুর তৃতীয় অধ্যায়ের ১৬৪ শ্লোকে আছে যে, ঐ সকল ভূতযাজক ব্রাহ্মণেরা অপাংক্তেয় হইবেন। এই ভূতগুলির নামই ছিল 'গণ'। মনুসংহিতার "গণানাঞ্চৈব যাজকঃ" কথার অর্থ করিতে গিয়া একালের টীকায় লিখিত হইয়াছে, "বিনায়কাদিগণযাগকৃৎ।" গণেশের উৎপত্তি ঐ ভূতের বংশে বলিয়া, পরম্পরায় ঐ গণটা বিনায়কের সঙ্গে অচ্ছেদ্য রহিয়া গিয়াছেন। গণেশ যখন দেবতা হইলেন, তখন তাঁহার জন্য অথর্ব্ববেদ লইয়া জাল অথর্ব্ব-

শীর্ষ প্রস্তুত হইল। এখানির অর্ব্বাচীনতা অতি সহজেই উপলব্ধ হয়। ৮ম শতাব্দীর পরবর্ত্তী পুরাণের পরে যে ওখানি রচিত, তাহা অক্ষরদ্বারা গণেশনামের গুণবর্ণনা হইতে, এবং অন্যান্য দেবতার উপন্যাসে সুস্পষ্ট লক্ষিত হইবে। এই মাহাত্ম্যবর্ণনা-প্রণালী প্রথমত তন্ত্রেই উদ্ভূত হইয়াছিল। বৈদিক কথার সহিত একালের সংস্কৃত কথাগুলির বিষম সংযোগ দেখিয়াই জাল-রচনা ধরা পড়ে।

নারায়ণোপনিষৎ গণেশাথর্ব্বশীর্ষেরও পর-বর্ত্তী। উহা হইতে দুচারিটি কথা পর্য্যন্ত তুলিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে যেমন এক-দিকে অগ্নির 'লালীল'নাম আছে, অন্যদিকে আবার তেমনি সম্পূর্ণ একালের শব্দ লইয়া রচনা হইয়াছে। উহাতে পৌরাণিক গরুড়, নন্দি প্রভৃতি ত আছেনই, তা ছাড়া এমন কথা আছে, যাহাতে উহার অর্ব্বাচীনতা অবশ্যই স্বীকৃত হইবে।

'কন্যকুমারী'কথাটা ত্রিবেদী মহাশয় নিজেই তুলিয়াছেন। পার্ব্বতীর কুমারী কল্পনা করিয়া পূজা তান্ত্রিকযুগের একটা বিশে-ষত্ব। কোন প্রাচীন গ্রন্থে ঐ কল্পনা পারিবেন না। তান্ত্রিকপদ্ধতি যে দ্র নিকট হইতে হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হই সে কথাও পরে লিখিবার সঙ্কল্প আ

যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, গণে শীর্ষাদির সময় নিরূপিত হয় নাই নারায়ণোপনিষৎ প্রাচীন কি অ তাহা সম্পূর্ণ স্থির হয় নাই; তাহা ওখানি লইয়া গণেশের ইতিহাস লে না। কারণ যে গ্রন্থ উপনিষৎ বলিয়া রিত হইয়াও এদেশে উপনিষৎ বলি হয় নাই, তাহার প্রামাণিকতা অতি তাহার পর আবার যখন ঐ গ্রন্থের পাঠ্য কথা অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে যায় না, তখন আর ওখানি গ্রহণ কোন মীমাংসা করা চলে না। প্রাচীন করিতে হইলে অন্য প্রাচীনশা পাওয়া চাই, অথবা অন্য কোন সা অন্তত তাহার নিদর্শন পাওয়া সেগুলির অভাবে এবং ত্রিবেদী মহ নিজের প্রদর্শিত কারণগুলির জন্য অগ্রাহ্য করিতে হইতেছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুম

গণেশপ্রসঙ্গ।

দেখিতেছি আমার অনুসন্ধানের সুযোগ্যতা-টুকু ব্যতীত অন্যবিষয়ে লেখকমহোদয়ের সহিত আমার মতভেদ যৎসামান্য। নারায়ণোপনিষদের তারিখটা ঠিক হইলেই গণেশঠাকুরের বয়সের কতকটা f পাওয়া যায়। লেখকমহাশয়ের মা উপনিষৎখানি খ্রীষ্টের অন্তত আটশত পরের। অসম্ভব নহে। ঐ উপনিষ

ড়িয়া আমার যতদূর ধারণা হইয়াছে, াহার উপর লেখকমহাশয়ের প্রদত্ত প্রমাণ- ালি চাপাইয়াও উহা যে খ্রীষ্টের আটশত ২সর পূর্ব্বে হইতেই পারে না, তাহাও আমি পথ করিতে প্রস্তুত নহি। কাজেই হাজার- ড়েক বৎসর উভয়ের মধ্যে তফাত দাঁড়ায়। ারতবর্ষের পুরাতত্ত্বের বিচারে হাজার- ড়েক বৎসরের তফাত ধর্ত্তব্যই নহে। াজেই আমাদের মতভেদ যৎসামান্য।

লেখকমহাশয়ের অবলম্বিত বিচারপ্রণালী কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক। গণপতিঠাকুর অর্ব্বা- ন; অতএব যে গ্রন্থে তাঁহার উল্লেখ আছে, াহা অর্ব্বাচীন; অতএব ঐ অর্ব্বাচীন গ্রন্থে । গণেশঠাকুরের উল্লেখ দেখা যায়, া ঠাকুরও অর্ব্বাচীন।—এই বিচারপ্রণালী কিঞ্চিৎ আশঙ্কাজনক।

কাজেই পৌরাণিক বা তান্ত্রিক দেবতা- ত্রকে অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী ধরিয়া ইয়া যে বৈদিকগ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ াছে, তাহাও অষ্টমশতাব্দীর পরবর্ত্তী, রূপ এক নিশ্বাসে নির্দ্দেশ করিতে সাহস । না। বিশেষত পুরাণের ও তন্ত্রের উৎপত্তি ান্ সময়ে হইয়াছে, তাহারই যখন ঠিকানা ই।

পুরাণ বেদের সময়েও ছিল, আবার না যায় বোপদেবও পুরাণ রচনা করিয়া- লেন। তান্ত্রিক আচারের প্রাদুর্ভাব চরিতেও দেখি, আবার আকবার-বাদশার ামলেও দেখি।

"বৈশ্বানরায় বিদ্মহে লালীলায় ধীমহি তন্নো গ্নিঃ প্রচোদয়াৎ"—নারায়ণোপনিষদের এই ন্ত্রের 'লালীল' নাম গণেশাথর্ব্বশীর্ষ হইতে গৃহীত হইতে পারে; তাহার উল্টাও হইতে পারে। সায়ণ যখন ঐ মন্ত্রের ভাষ্য দেন নাই, তখন উহাকে প্রক্ষিপ্ত ধরিয়াও নারায়ণোপনিষদের প্রাচীনত্ব বজায় থাকিতে পারে। আর গণেশাথর্ব্বশীর্ষেরই যখন তারিখ জানি না, তখন ঐ বিচারও নিরর্থক।

আকবারের আমলে জাল উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল মানিলেও উপনিষৎমাত্রই জাল হয় না। যে কয়খানা উপনিষৎ শ্রুতি- শাস্ত্রমধ্যে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহার প্রাচীনত্বসন্দেহের পূর্ব্বে আরও পাকা প্রমাণ আবশ্যক।

শ্রুতিশাস্ত্রকে জাল হইতে রক্ষা করিবার জন্য এ দেশে যেমন যত্ন হইয়াছিল, অন্য কোন দেশে কোন সময়ে কোন শাস্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য তেমন যত্ন হয় নাই। ইহা সাহেবলোকেরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। যে কোন ব্যক্তি একটা রচনা করিয়া উহাকে চতুরাননের মুখনিঃসৃত বলিয়া পরিচয় দিলেই তাহা শ্রুতিবাক্য বলিয়া গৃহীত হইত না, যিনি প্রাচীন- শাস্ত্রের কিছু সংবাদ রাখেন, তিনিই ইহা বিশেষরূপে জানেন।

জাল উপনিষৎ আজিও রচিত হইতে পারে, কিন্তু উহা শ্রুতিবাক্য বলিয়া গণ্য হওয়া সহজ হইবে না।

ফলে নারায়ণোপনিষৎ কতদিনের, তাহা যখন স্থির করিবার সম্প্রতি কোন উপায় দেখিতেছি না, এবং তৎসম্বন্ধে লেখক- মহাশয়ের ও আমার মতে ভেদ যৎসামান্য, তখন এ বিষয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন নাই।

তবে একটা কথা বক্তব্য আছে। পাশ্চাত্য

পণ্ডিতদের ভারতবর্ষঘটিত পুরাতত্ত্বের বিচারে অবলম্বিত প্রণালীটা কতকটা এইরূপ :— ধরিয়া লও, পলাশীর লড়াইয়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কিছুই ছিল না; যিনি বলিতে চাহেন, অমুক জিনিষটা তৎপূর্ব্বে ছিল, প্রমাণের ভার তাঁহার উপর। এই বিষম ভার মাথায় লইয়া পুরাতত্ত্বব্যবসায়ীকে কিছুদূর চলিয়াই ক্লান্ত হইয়া থামিতে হয়। আবুল্‌ফজল্‌, আল্‌বিরুনি, ফাহিয়াং, মেগাস্থীনিস্‌ পর্য্যন্ত অতিকষ্টে ঠেলিয়াই সেইখানে থামিতে হয়। কেন না, মহাভারতে উল্লেখ অ বেদে উল্লেখ আছে, বলিতে গেলেই মহ বা বেদ পলাশীর লড়াইয়ের পূর্ব্বে ছি না, এই আর একটা নূতন বোঝা চাপে। এই প্রণালীটা ষোল-আনা নিক, এবং এতদ্দ্বারা প্রাপ্ত সিদ্ধান্তও খু হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু সে পথে গোড়ায় পৌছিতে পারিয়াছি, শপথে কিছু বেশীমাত্রায় সাহস হয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রি

গ্রন্থ-সমালোচনা।

যুগধর্ম্ম।—শ্রীঅমৃতলাল সেন গুপ্ত কর্ত্তৃক বিবিধ শাস্ত্র হইতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত। মূল্য ৵০ তিন আনা।

গ্রন্থকার বলেন যে, আর্য্য ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন যুগের জন্য যুগানুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মানুষ্ঠানপদ্ধতির ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরের জন্য নির্দ্দিষ্ট সাধনা কলিযুগের দুর্ব্বল জীবের পক্ষে অসাধ্য। তাহাদের পক্ষে হরিনামকীর্ত্তনই একমাত্র সাধনা ও নিস্তারের উপায়। বৃহন্নারদীয় পুরাণকর্ত্তা বলিয়াছেন—

> হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্‌।
> কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই যুগধর্ম্ম কাহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে? অমৃতলালবাবু মনুষ্য দূরে থাকুক, ব্রহ্মরুদ্রাদি দে যুগধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হইতে পারেন ন উদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য স্বয়ং ম ভূতলে অবতীর্ণ হইতে হয়। কলিযু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হই এবং তিনিই এ যুগের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক এই পুস্তকের সার কথা। চৈত অবতার বলিয়া মানেন এবং উপাস বর্ত্তমান সময়ে আমাদের সমা লোকের অপ্রতুল নাই। তাঁহা এই পুস্তকের আদর হইবে বলিয়া

শ্রীচন্দ্রশেখর মুখো